সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

নবম বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৬৮

This design is based on the cover-leaf of Indian Oxygen Limited's 1961 calendar which has been produced to commemorate the centenary of Rabindranath Tagore and Motilal Nehru.

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি ...."
সেই শতবর্ষ স্মরি
তোমারে প্রণাম করি।
দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
কলিকাতা-১৩

পালকি চলে
কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু-প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে···শ্যামল অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ··· কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে 'ময়ূরপঙ্খি নাও' —আবার কোথাও রয়েছে ঊর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু··· সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুলত তখন তিনি ঠাকুমা'র আমলের একটা পুরনো পালকির ভিতরে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পালকিটা যেন যাদুমন্ত্রে ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। 'জগতের আনন্দ-যজ্ঞে' নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পালকির মধ্যে বসে দেখা স্বপ্ন 'সত্য' হয়ে উঠেছে।
ডানলপ
কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম
DC-558 BEN

তুমি আমাদের ভাষা
তুমি আমাদের গান,
তুমি আমাদের চিন্তা
তুমি আমাদের প্রাণ,
তোমাকে নমস্কার —
রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ্মীবিলাস কর্তৃক প্রচারিত

"হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে,
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা: শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটি করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন...আজই!
SUNLIGHT SOAP
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।
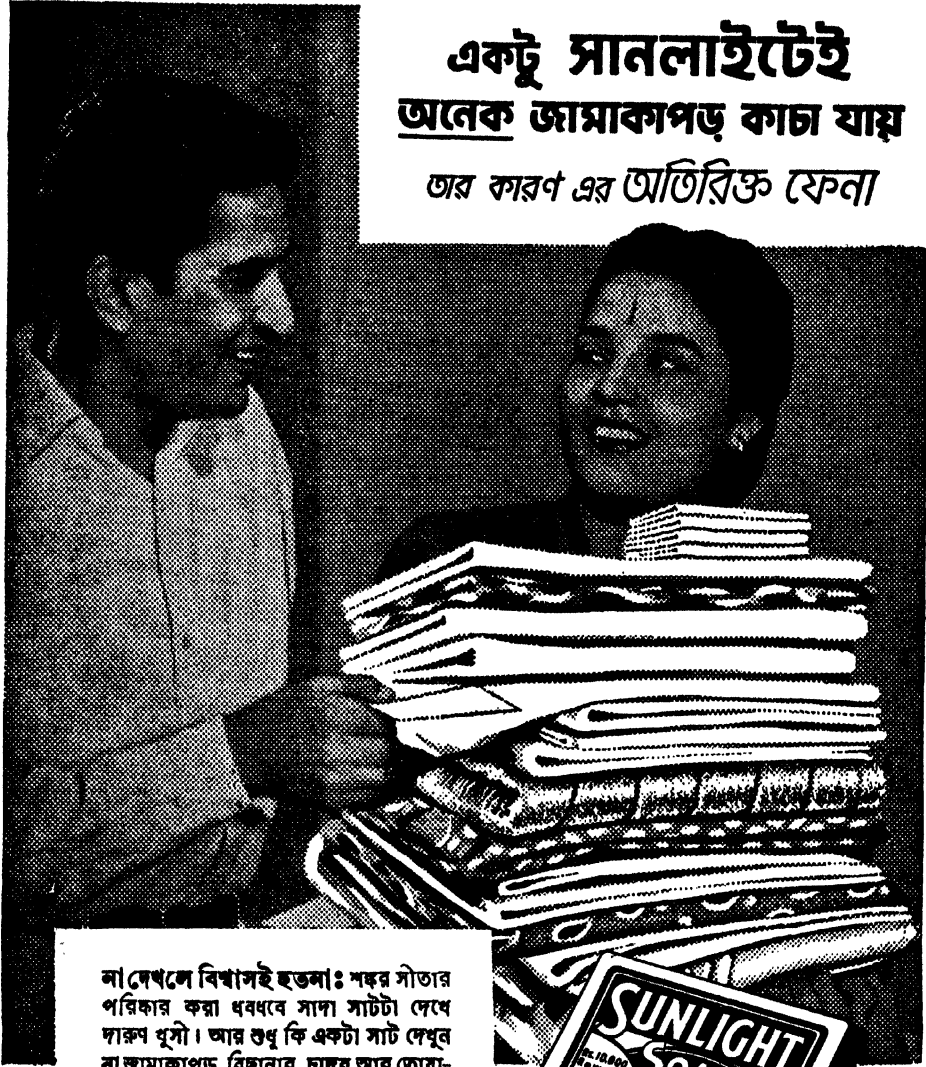
INDIA
AMOUNT
NO.
DATE
SERVICE INSTRUCTIONS
SENDER TO WRITE BELOW THIS LINE
BY SENDER E. G. "REPLY PAID", ETC.
নাম — ব্যানার্জী
ঠিকানা — টিএফ ৩১৬৭০
টেলিগ্রাফ অফিস নূতন দিল্লী

সত্যিই চড়ে আরাম...
IC সাইকেল
ইণ্ডিয়া সাইকেল
ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা

হলুদ
LUX
Yellow
সবুজ
LUX
Green
নীল
LUX
Blue
গোলাপী
LUX
Pink
বিচিত্র
রঙে রঙে
এক
অভিনব
রচনা!
বিশুদ্ধ, কোমল লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
লাক্স দেখুন ! বিচিত্র বরণ আর মানানসই রঙীন মোড়ক !
সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার অতি প্রিয় বিশুদ্ধ লাক্স—
চেহারার যত্ন নিতে যে সাবান আপনি চিরদিনই চেয়েছেন।
"এই বিচিত্র রঙের
মেলা থেকে আপনার মনের
মতো রঙ বেছে নিন!"
ওয়াহেদা রেহমানও
সেই কথাই বলেন
LUX
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
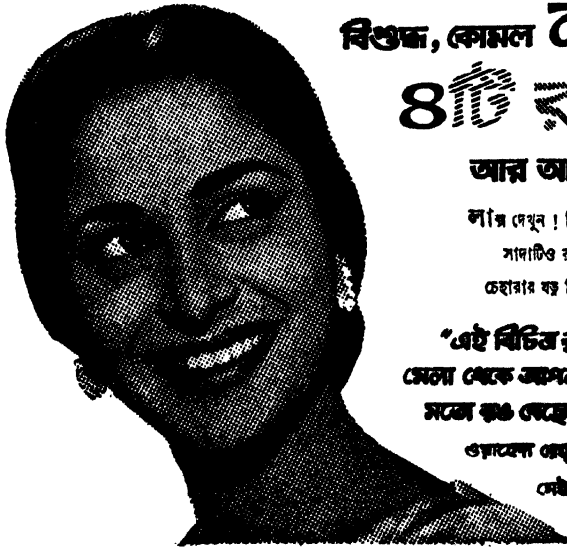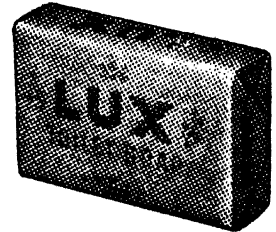
আপনার নিরাপত্তা আপনার হাতে —এবং আমাদের

৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬৮

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নবম বর্ষ। প্রথম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' আটষট্টি

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসর

হেমলতা ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় শীতকালে অগ্রহায়ণ মাসে। দিন তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০। বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের বাড়ীতে। বিয়ে করতে যেতে হয়নি তাঁকে শ্বশুরবাড়ি। পরিবারের বড় ছেলের ও ছোট ছেলের বিয়ে বাপ-মা-রা ঘটা করে দিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রথম কাজ ও শেষ কাজ বলে। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিদেবের শেষ পুত্র। মা নাই—আড়ম্বরে উদাসীন পিতা তখন হিমালয়বাসী। বিয়েতে ঘটা করে কে। ঘরের ছেলে নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়াভাবে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ধুমধামের সম্পর্ক ছিল না তার মধ্যে। পারিবারিক বেনারসী শাল ছিল একখানি—যার যখন বিয়ে হত সেইখানি ছিল বরসজ্জার উপকরণ। নিজেরই বাড়িতে পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করতে এলেন অন্দরমহলে—স্ত্রীআচারের সরঞ্জাম যেখানে সাজানো। বরসজ্জার শালখানি গায়ে জড়ানো রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির উপর। নূতন কাকিমার ? আত্মীয়া—যাকে সবাই ডাকতেন "বড় গাঙ্গুলীর স্ত্রী" বলে—রবীন্দ্রনাথকে বরণ করলেন তিনি। তাঁর পরণে ছিল একখানি কালোরঙের বেনারসী জরির ডুরে।

বিয়ের সময় কাকিমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে—সে যে কত বড় আশ্চর্য মানুষ—কাকে তিনি পেলেন, এর কোনো ধারণাই তাঁর ছিলনা। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল—শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদানস্থলে। বাড়ির অবিবাহিত বড় মেয়েগুলি সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমিও জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। দালানের একধারে বসবার জায়গা ছিল আমাদের। দেখলুম সেখানে বসে স্বচক্ষে কাকিমার সম্প্রদান।

সম্প্রদানের পর বরকনে এসে বাসরে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের বউ এলে তার থাকবার জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট করা ছিল আগে থেকেই। বাসর বসলো সেই ঘরেই। বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ভাঁড়কুলো খেলা আরম্ভ হল, ভাঁড়ের চালগুলি ঢালা-ভরাই হল

ভাঁড়-খেলা। রবীন্দ্রনাথ ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকীমা ত্রিপুরাসুন্দরী[১] বলে উঠলেন,

—ও কি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টে পাল্টে দিচ্ছিস কেন?

রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ি—নিজেই বর। তাঁকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়নি। তাই তাঁর লজ্জা সংকোচের কারণ ছিলনা। রবীন্দ্রনাথ বললেন, —

—জানোনা কাকিমা—সব যে উলট পালট হয়ে যাচ্ছে—কাজেই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ বাক্‌সিদ্ধ মানুষ—কথায় তাঁকে হারাতে পারবেনা কেউ। তাঁর কাকিমা আবার বললেন,

—তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে—তুই এমন গাইয়ে থাকতে?

রবীন্দ্রনাথের কন্ঠস্বর তখন কি চমৎকার ছিল, সে যারা না শুনেছে বুঝতে পারবেনা। আমরা যে কানে শুনেছি সে আমাদের কম সৌভাগ্য নয়। এখন সবই হারিয়ে গেছে—তবু যা পেয়েছি তাই রেখেছি মনে ধরে।

বাসরে গান জুড়ে দিলেন :

আ মরি লাবণ্যময়ী
কে ও স্থির সৌদামিনী
পূর্ণিমা জ্যোছনা দিয়ে
মার্জ্জিত বদনখানি
নেহারিয়া রূপ হায়
আঁখি না ফিরিতে চায়
অপ্‌সরা কি বিদ্যাধরী
কে রূপসী নাহি জানি।

দুষ্টুমি করে গাইতে লাগলেন কাকিমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। বেচারী কাকিমা রবীন্দ্রনাথের কান্ড দেখে জড়োসড়ো। ওড়নায় মুখ ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছেন। আরও একটা গান তখন গেয়েছিলেন—সেটা আমার স্মরণ নাই। সেদিনকার পালা ওখানেই শেষ।

কাকিমা প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—মাত্র এক বৎসরের বড় আমার থেকে। তাই তার সাথে আমাদের বেশ ভাব জমেছিল পরে। নানারকম ছেলেমানুষি গল্প হত খুব। নতুন কাকিমার এক বোনঝি নীরজা থাকতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে—তিনিও আমাদের গল্পের দলের একজন। কাকিমার বিবাহের তিনমাস পরে আরেকটি ঘটনা না বলে পারছিনা। নীপিসিমার[৩] প্রথমা কন্যা হিরন্ময়ীর বিবাহ। গায়েহলুদে দুপুরে আমরা নিমন্ত্রণে গিয়েছি। মধ্যাহ্ন ভোজনে বসতে প্রায় একটা বেজে গেল। খেয়ে উঠতে দুটো। সেই সময়ে কলকাতা মিউজিয়মে প্রদর্শনী খুলেছে নূতন। সেই প্রথম কলকাতায় প্রদর্শনীর প্রচলন। তিনটের সময় প্রদর্শনীতে যাবার জন্যে সকলে প্রস্তুত, আমরাও বাড়ি ফেরবার মুখে। মেজো কাকিমার[৪]

সঙ্গে কাকিমাও যাবেন প্রদর্শনীতে। বাসন্তীরঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরির কাজ করা পাড় বসানো শাড়ি পরেছেন কাকিমা। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কথায় বলে বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই রোগা কাকিমা দিব্যি দোহারা হয়ে উঠেছেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে এসে জুটলেন সেই সময় সেইখানে—হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি নিয়ে খেতে খেতে। কাকিমাকে সুসজ্জিত বেশে দেখে দুষ্টুমি করে গান জুড়ে দিলেন তাকে অপ্রস্তুত করবার জন্যে———

হৃদয় কাননে ফুল ফোটাও
আধো নয়নে সখি চাও চাও

এমন চড়া সুরে ধরেছেন যে জোর পেঁছে যায় সবার কানে—

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসোহে
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসোহে।
হৃদয়ে কাননে ফুল ফোটাও
আধো নয়নে সখি চাও চাও
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসোহে।

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী। ২। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী।
৩। স্বর্ণকুমারী। ৪। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী।

রবীন্দ্রনাথের গান

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

কবির কথা নূতন করে কি বলা যেতে পারে। কবির কথাতেই বলতে ইচ্ছে কি শোনাব কি গাব আমি আনন্দধামে। কিন্তু সে আনন্দধাম আজ কোথায়, তবু আমরা আজ তাঁর কবিতা ও গান আলোচনা করি শুধু আনন্দের জন্যেই—যে আনন্দই তার বাণীর শেষ-কথা ছিল। এই আনন্দের বাণী আলোচনা করেই আমরা তাঁর আনন্দের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারবো। আমি যদি কিছু দিতে পারি—সে শুধু শ্রদ্ধার অঞ্জলি—তাও তাঁর পূর্ব জীবন নিয়ে। হয়ত পুনরুক্তি কিছুটা হবে। কিন্তু হলেই বা দোষ কি? যদিও তিনি বিশ্বের, তবু তাঁর গৌরবের পরিস্ফুটনের স্থান জোড়াসাঁকো। তাঁর দীর্ঘ জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এ বাড়ি থেকে কিন্তু সেই দেহরক্ষা করতে হল এই বাড়িতেই।

তাঁর কোন দিকেরই শেষ নেই। গানের বিষয় সুর, কথা বা অন্য যে দিক দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক দেখা যাবে তার শেষ নেই। তাঁর সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ আজ অনেকের কাছেই কমবেশী জ্ঞাত, অনেকটা সাধারণ জ্ঞানের মত হয়ে গেছে। প্রথম দিকে এতটা সাধারণ-বোধ্য ছিল না এ বিষয়টি। এটা বরংচ সহজ। কারণ এটা ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই পাওয়া যাবে। তিনি কিছুকার জন্যে বাকী রেখে যান নি। তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে—নিজের গানের সম্বন্ধে—বলে গিয়েছেন। অন্য অনেকেও আলোচনা করেছেন।

সে সময় আমাদের মনে হয়নি যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার—কারণ তিনি ছিলেন আমাদের আত্মীয়। এখন যে তাঁর নানা দিক নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে সেটা খুবই আনন্দের, আমরা শুধু তাঁর স্মৃতিকথা দু'একটা বলতে পারি। এটা যদি তোমাদের কাছে ইতিহাস হয়, তবে যে ঘরে* তোমরা বসেছ—সেটা তার ভূগোল। আর অংক তো আছেই—গানের মাত্রায়।

অনেকে জানতে চায় কোন গান বা অভিনয় তিনি প্রথম করেন। প্রথম গান নীরব রজনী দেখ শান্ত জোছনায়। অনেকে বলে—জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ জ্বল।

প্রথম অভিনয় জোড়াসাঁকোর ঘরেই হয়। জ্যোতিকাকামশায়, পাকপাড়া এবং অন্যান্য বিশিষ্ট পরিবারের আনন্দের জন্য "বিয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে।" জ্যোতিকাকামশায় বিপক্ষে নিয়েছিলেন। আজ দেখি আমাদের স্মৃতির কোঠরে আর কিছুই লুকোনো নেই। সবই বেরিয়েছে।

অনেক গানকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন কিন্তু তাও পর্য্যন্ত আজ বেরিয়েছে।

বোধহয় জ্যোতিকাকার রচনা "মানময়ী" বলে আর একটি অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শী আমরা। সেটাও জোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। তাঁর সে ছোটবেলার গান বেশ হাসির।

ভানুসিংহের পদাবলীও ছেলেবেলার। তখন সিমলেয় গিয়েছি বেড়াতে, সেখানে গহন কুঞ্জ মাঝে গাইছি। সেদিন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—ইন্দু মানে বল। আমি ঠকে গেলুম।

বিবাহ উৎসবের গানগুলোও মনে পড়ে। আমরা সখি-টখি হতুম। পরিণতরূপের প্রথম অবস্থা সেটা। কিন্তু গাইতেন খুব ভাল। গলা ছিল পাখীর মত। একটানা কত যে গান গেয়ে চলতেন। তাঁর অভিনয়ের লক্ষ্মী-সরস্বতী যে কত মেয়েকে সাজতে হয়েছিল। প্রতিভা

দেবী একদিন সাজলেন সরস্বতী। তাঁকে আখ্যা দেওয়া হল সরস্বতী সাহেব। আমি একদিন সাজলুম লক্ষ্মী। একটা গান গাইলুম। তাকে সমালোচনা হল—ওরকম গেয়ো না, মনে হচ্ছে যেন পেট কামড়াচ্ছে।

পিয়ানোতে বসতেন জ্যোতিকাকামশায়—আর অক্ষয় চৌধুরী আর কবি গান গাইতেন আর রচনা করতেন। আর একজন ছিলেন বড় অক্ষয়—অক্ষয় মজুমদার। তিনি তখন দস্যুটস্যুর অভিনয় করতেন। বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা যে কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই।

একবার তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন—আগেকার গান আমার 'ইমোশ্যনাল' আর পরে 'এস্থেটিক্যাল' আমি বুঝি—প্রথমের গান ছিল সহজ আবেগময়—যেমন বাল্মীকি-প্রতিভার গান, পরে হ'ল সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী গান। বাল্মীকিপ্রতিভার গান যতটা স্পষ্ট আর সরল, পরের দিকে—ফাল্গুনী থেকে—খানিকটা হল রূপক। সব দিকেই এই রূপকের অভিব্যক্তি। একটু সাজিয়ে বলা। মায়ার খেলাটা আলোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এক সময়ে তিনি মায়ার খেলাকে ঢেলে বদলাতে চান। সেই থেকেই তার পরিবর্তনের ঝোঁকটা বোঝা যায়। সব সময় তিনি নিজের রচনাকে বদলাতেন।। কতকগুলো ভাবের জন্যে কতকগুলো পড়বার জন্যে।

ফাল্গুনীর প্রথম অভিনয়ের দৃশ্যেটি ভুলবো না। সমরেন্দ্র সিংহ অভিনয় করলো আর দৃশ্যেটি হ'ল রূপক। একটি নীল পর্দায় একটি গান, তাতে শুধু একটি লাল ফুল। অপূর্ব। তখনকার দর্মার তৈরী ডাকঘরের দৃশ্যটিও চমৎকার হল, অবনদাদা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন একটুখানি কাল্পনিক, স্বর্গীয় কুঁড়ে ঘর। চারিদিকে আলপনা দেওয়া।

ধর্মসংগীত একটু সরল হয়ে থাকে। ওঁর নিজের কিন্তু অন্য রকম ধারণা। আর শেষ বয়সে নৃত্যের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। সেদিন শান্তিনিকেতনে হয়ে ছিল নানাজাতির নাচ ও গান। আমার মনে হয় তিনি না থাকলেও তাঁর গান ও নৃত্যেকে নিয়ে আরও চর্চা করা উচিত—এটা শিল্প-রসিকদের একটি গুরু দায়িত্ব। তাঁর গানের কথাগুলোর ভাব অতি শক্ত। সে সব সময়ে বুঝতে হবে আগে। তাঁর গানে দুইই—কথা ও সুর—প্রধান। দুটো নিয়ে একটি তৃতীয় রসের সৃষ্টি হল। বড় ছোট এর মধ্যে নেই। তাঁর গানের মত এরকম শুভ সম্মেলন খুব কমই ছিল। অবশ্য সুর কি কথা কোনটি আগে তৈরী করতেন বলা শক্ত। সে গীতরস একটি অপূর্ব সৃষ্টি— একটি তৃতীয় জিনিষ।

রাগ তিনি খুব ভাল জানতেন বলেই তার মিশ্রণে ওস্তাদ ছিলেন। মিশ্রণে আপত্তি করেন অনেকে। কিন্তু মিশ্রণ তো আমাদের দেশে ছিলই। নতুন কিছু কি ছিল না? অবশ্য অতি আশ্চর্য মিশ্রণও তিনি করলেন—যেমন, আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। আজ তার মিশ্রণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক এবং ওস্তাদি গোঁড়ামি আজ খানিকটা শিথিল হয়েছে।

ভারী অঙ্গের দিকে তিনি বেশি যান নি। বরাবরই একটু হালকার দিকে ওঁর টান। ইস্কুলটা করবার পর থেকেই প্রত্যেক ঋতুতে ছেলেমেয়েদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করতে অনেক গান রচনা করেন। তাই শেষের দিকে ধর্মসংগীত অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিতীয় কারণ নাচের জন্যে। গানকে প্রাধান্য দেওয়া আলাদা আর তাকে নাচের উপলক্ষ্য করা অন্য জিনিষ। নৃত্যনাট্য জিনিষটিই একটি নতুন সৃষ্টি।

যন্ত্রসংগীতের দিক দিয়ে তাঁর গানের নতুন সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য অনেকে—যেমন

১. জোড়াসাঁকোর বাড়ী

অবনীদাদা এতে আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে শুধু এস্রাজ ও তানপুরা নিয়ে তাঁর গান গাইতে হবে। তখন হয়ত এর সুযোগ সুবিধে ও প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তিনি নিজে এদিকে যাননি।

তানের কথা কিছুটা বিবেচনা করবার সময় এসেছে। তবে সেটা খুব সন্তর্পণে করতে হবে। রমেশ (বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছুটা করেছে। খেয়াল অংগের কিছু কিছু আছে। কিন্তু তান যদি খেয়ালের বৈশিষ্ট্য হয় তবে তা নেইই। তান হচ্ছে সুরের কথাহীন বিস্তার। তানের উন্মেষ আছে এরকম গান—কেন পান্থ আ আ—ও বাদল মেঘে মাদল—আ আ— ।

একদিকে তিনি যেমন সংগীতের মুক্তি দিয়েছেন তেমনি তার অন্যদিকে বন্ধনও সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজী গানে রচয়িতা প্রধান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এত জনকে একই গান এতরকম শিখিয়েছেন যে আজ মারামারি হবার উপক্রম।

তানের দিকে পরীক্ষা করবার দিন এসেছে আজ। খুব সাধারণ নিয়ম আমার মনে হয়—এটা শুরু করা উচিত কথাকে অবলম্বন করে। তাতে একটু বৈচিত্র্য হয়। দুইটা একটা জিনিষ যা প্রচলন করা যেতে পারে। এর সামান্য আরম্ভ হয়েছে। তবে আনাড়ির হাতে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা। কতকগুলো গানে 'হারমনি' দেওয়া যেতে পারে। তবে দেখতে হবে সেটা যেন 'মেলোডি'-কে খর্ব করে, গানকে ভরাক্রান্ত না করে। "তোমার হল সুরু" ইত্যাদি গানে 'হারমনি' দিলে খুব ভাল হয়।

গতের সংগেও গান আমরা করেছি। তাও বেশ ভাল লেগেছে—অন্ততঃ আমাদের। যেমন —শ্যামল সুন্দর গানটি। **বিদেশিনী** বলে একটা গানেও আমরা চেষ্টা করেছি। যাদের বিদ্যালয়ের সংগে যোগ আছে তাঁর এক একটা 'পিওর' সুর—যেমন ভৈরবী নিয়ে আলোচনা করতে পারে। প্রথমে শুদ্ধ রূপটি আলোচনা করে পরে তাঁর বৈচিত্র্যগুলি দেখা যেতে পারে। ভৈরবী, কেদারা, ইমন—এই তিনটি তো খুবই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত যুগের সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিস্তৃত ব্যাপ্তির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী, সাহিত্যের নানা বিভাগে—কাব্যে, নাট্যে, গানে গল্পে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে ও উপন্যাসে—ক্রমবর্দ্ধমান রসবিৎ পাঠক-সমাজের চিত্তে রসের আলো জ্বালিয়া এক অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালার নবীন সাহিত্যরসিকদের মধ্যে—বিশেষতঃ যাহারা প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্যের আদর্শ, রীতি, নীতি ও পদ্ধতির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, নবযুগের উপযোগী নব্য-সাহিত্যের নব নব প্রকাশের দিকে উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—তাহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা যে চাঞ্চল্যতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির অতিবড় স্তাবক ও অন্ধ-ভক্ত-গণের চক্ষেও কবির অলৌকিক চিত্রচর্চার সাধনা ও চিত্রকলার আরাধনা আরও অদ্ভুত ও আশ্চর্য রসের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ফলে, তাঁহার অনেক পাকা ভক্তেরও পাকা ভক্তির গাঁথনী নাড়া দিয়া শিথিল করিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়কবির কিম্ভুত-কিমাকার চাক্ষুষ রূপসৃষ্টির মধ্যে—কবির উদ্দেশ্য কি তাহার বিফল গবেষণা করিয়া, কবির হাতে লেখা অদ্ভুত বর্ণ ও রেখা-সৃষ্টির মধ্যে—কোনও প্রশংসার বস্তু অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পান নাই। অনেকে চিন্তিত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে—হয়ত বা শেষ-বয়সে বিশ্ব-কবির বুদ্ধিভ্রংশ হলো। তাঁহারা শঙ্কিত হইলেন এই ভাবিয়া যে ইংরাজী কবি উইলিয়ম ব্লেকের মত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পক্ষীরাজ সাহিত্য-রাজ্যের সমস্ত ভূমি জয় করিয়া, অবশেষে পাগলামীর পরপারে পা ছুটাইল নাকি, কবির অনেক ভক্ত বিপাকে পড়িয়া, আমাকে পত্রাঘাত করিয়াছিলেন—প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কবির এই অদ্ভুত চিত্র-রচনার রহস্যের সন্ধান কোথায় মিলিবে?

ফ্রান্সে, জার্ম্মনীতে, ইংলণ্ডে, আমেরিকার নানা স্থানে, কবির এই অদ্ভুত-রীতির চিত্রমালার প্রদর্শনী স-সম্মানে উন্মোচিত হইয়াছিল, এবং সকল দেশের বিশিষ্ট কলা-রসিকরা কবির চিত্র-সৃষ্টিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার মালা-চন্দনে অভিষিক্ত করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ভক্তগণের চক্ষে ক্রমশঃ ব্যাপারটি খুবই জটিল ও ঘোরতর রহস্যে অন্ধকার হইয়া উঠিল। প্রথমে, কবি কলা-বিৎ অথবা কলাবিৎ কবি তাঁহার রূপ-সৃষ্টির উদাহরণগুলি তাঁহার ভক্তগণের চক্ষু হইতে সন্তর্পণে দূরে রাখিয়া ছিলেন! য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বে, তিনি তাহার চিত্রগুলি এদেশে প্রদর্শিত হইতে দেন নাই। পাছে, ভক্তদের বুকে আঘাত লাগে—পাছে তাঁহারা কবির রূপ-সৃষ্টিকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেন, পাছে তাঁহারা কবির চিত্রাবলীর মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ হইয়া কবির সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিমুখীভাব অবলম্বন করেন। য়ুরোপ ও আমেরিকার স্তুতিবাদ বহন করিয়া যখন কবির চিত্রমালা দেশে ফিরিল—তখন ভক্তদের ভক্তি-ভাঙ্গার আশঙ্কা অনেকটা তিরোহিত। সুতরাং, কবির অনুমতি অনুসারে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কবির চিত্রমালা এদেশে, কলিকাতার টাউন হলে, প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছিল! অনেক ভক্ত, শিষ্য সমালোচক ও কলা-রসিক আসিয়া বিস্ফারিত চক্ষে চিত্রমালা দেখিলেন,—কিন্তু কবির চিত্র সৃষ্টির রস আস্বাদন করিতে পারিলেন না। কবির কবিতা যে সব সমালোচক রস-বিচারের নিপুণ কৌশলে অনায়াসে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার রস আস্বাদন করেন, সেই সব নিপুণ সমালোচকের

সমালোচনা—শক্তি, চিত্রের চৌকাঠে আসিয়া মাথা কুটিয়া ফিরিল। অনেক সমালোচকের গর্ব, অভিমান ও দর্প চূর্ণ করিল এই দর্প-হারী চিত্র-মালা।

কবি মনে মনে হয়ত হেসেছিলেন এই কথা ভাবিয়া যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রতিভার পরিধি ও পরিমাণ সমালোচনার গজ-ফিতা দিয়া পরিমাপ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন,—তাঁহারা তাঁহার প্রতিভার এই নূতন বিকাশের পরিচয়ে শিহরিত হইলেন কেন? কবির চিত্রের এই হৃদয়বিদারক হেঁয়ালীর নিকট অনেককেই হার স্বীকার করিতে হইয়াছে। কারণ, প্রতিভার একটা দিক বুঝিব—আর একটা দিক দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব—এ কেমন কথা? কবির জয় হইল, সমালোচক ও ভক্তসম্প্রদায় হার মানিলেন! সমালোচক ও রসিক-সমাজের এই হার-স্বীকার,—বাঙলাদেশের আধুনিক কৃষ্টির ইতিহাসে একটি বড় সার্থক স্বীকৃতি ও অর্থ-পূর্ণ আত্ম-পরিচিতি।

যাঁহারা শিক্ষার অভিমান করেন, কৃষ্টির ও সংস্কৃতির বড়াই করেন, তাঁহাদের শিক্ষার ও কৃষ্টির পরিধি যে কেবল মাত্র লিখিৎ-পড়িৎ ভাষায় লিখিত বস্তুতে সীমাবদ্ধ, তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর কষ্টিপাথরের কঠিন পরীক্ষায়। কিন্তু, কি অতীত, কি বর্তমান যুগে, মানুষের মনীষার বিকাশ কেবল লিখিৎ-পড়িৎ বিদ্যার অক্ষরে সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের সভ্যতা, শিক্ষা ও সাধনা নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করে; কেবল মাত্র সাহিত্যে যাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ তাঁহাদের কাছে মানুষের মানসিকতার প্রকাশের বড় বড় মহাপ্রদেশগুলি চিরকালই অপরিচিত থাকে।

আসল কথাটা এই যে আমাদের আধুনিক চক্ষু কেবলমাত্র অভিধানের ভাষায় লিখিত "সাহিত্যে" অতি-মাত্রায় নিবদ্ধ থাকায়—রস-সৃষ্টির অন্যান্য বিকাশের বিভাগে আমরা দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িয়াছি—রূপ-শিল্পের ও রূপ-বিদ্যার 'অক্ষর' পরিচয় আমরা ভুলিয়া বসিয়া আছি। আমাদের রূপ-বুদ্ধি ও রূপদৃষ্টি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া আছে—এই কথাটাই আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। রূপ-শিল্পের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতা চেষ্টা করিয়া পাকা করিয়া তুলিয়াছি। এই সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার চর্চা চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং, কয়েক বৎসর পূর্বে যখন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ভারতের রূপ-শিল্পের ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করিলেন, রূপ-রাজ্যে এক নূতন বাণীর আহ্বান দিলেন, তখন বাঙলার লোচন-হীন সমালোচক-সম্প্রদায়, পরিহাস ও অবজ্ঞার প্রতিবাদ তুলিয়া অজ্ঞানতা ও অবজ্ঞার অন্তরালে আত্মসম্মান রক্ষণ করিয়াছিলেন।

সুতরাং, কবি যখন তাঁহার অপরূপ চিত্রের সম্ভার নিয়া নব্য-বাঙলাকে উপহার দিলেন তখন তাঁহার ভক্তরা বড়ই বিপদে পড়িলেন।

ভারতের নবীন চিত্রকলা পদ্ধতির দাবী—যে দাবী প্যারিস, বার্লিন ও নিউইয়র্কে প্রশংসা পাইলেও—অবজ্ঞার পরিহাসে পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রিয় কবি, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির—সারা বিশ্বের সার্বভৌম কবির চিত্র-সৃষ্টি যতই অনাসৃষ্টি হউক না কেন—তাহাকে ত অবজ্ঞা করিবার শক্তি ও সাহস আমাদের নাই। কবির রূপ-সৃষ্টির রস আস্বাদন করিয়া, সম্যক সমালোচনা করিয়া, তাহার মর্ম উদ্ঘাটন করিয়া তাহার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে আমরা বাধ্য।

সুতরাং গরজে পড়িয়া আমাদের রূপবিদ্যার 'অক্ষর' পরিচয়ে মনোনিবেশ করিতে হইল। কারণ, রূপবিদ্যার মূল-তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে না পারিলে, চিত্রসৃষ্টির মর্ম গ্রহণ করা অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু চিত্র-চর্চ্চার উপযোগী তৃতীয় চক্ষু রাতা-রাতি ফুটাইয়া তোলা যায় না, রূপবিদ্যার ভাষা একদিনেই দখল করা যায় না। সুতরাং কবির এই সব চিত্র-সৃষ্টি, যাহা আমাদের অশিক্ষিত

চক্ষুতে, 'অদ্ভুত' 'অপরূপ' বা "কিম্ভুত-কিমাকার" মনে হয়, তাহার মর্ম-গ্রহণ ও রস-বিচারের উপযোগী সমালোচনা-শক্তি আমরা কোথায় পাইব। যে কোনও ভাষার অক্ষর-পরিচয়, শব্দসঙ্কলন, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্র শিক্ষা না করিলে, সেই ভাষার অন্তঃস্থলের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটেনা, এবং সেই ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টির সহিত আমাদের মনের ঘনিষ্ঠ স্পর্শ ঘটে না, তাহা চৈনিক চিত্রই হউক, গ্রীক নাট্যকলাই হউক, কি সংস্কৃত কাব্যই হউক। কোনও একটা নূতন ভাষা শিখিতে হইলে, প্রথমে আমাদের মনের পূর্বসংস্কার ও মানসিক বাধা অপসারিত করিতে হয়, এবং শিষ্যের বিনয় ও শ্রদ্ধার নতশির লইয়া, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়—কারণ, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন,—কারণ, অশ্রদ্ধার চক্ষে জ্ঞানের পথ চিরকালই অবরুদ্ধ। আমাদের অপরিচিত ও দুরধিগম্য কোনও শিল্প সৃষ্টির মর্ম অনুসন্ধান করিতে হইলে উপাসকের অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, তাহার সম্মুখীন হইতে হয়, বিমুখীভাবের বিরুদ্ধ-বুদ্ধি লইয়া রসের মন্দিরের দ্বারা খোলা যায় না। প্রশ্নের আঘাতে শিল্পের দুয়ার মুক্ত হয় না—শিল্পের বক্তব্য ও বাণী মিনতির নম্রপথে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। ছবিকে কথা বলিবার অবসর দিতে হইবে—ছবির উপর অবিরত প্রশ্ন বৃষ্টি করিলে—তাহার "কথা" শুনিতে পাইব কেমন করিয়া?

কবি সার্বভৌমের চিত্রাবলীতে একটা সহজ কথা সুস্পষ্ট হইয়া আছে. সেটা এই যে—ছবিগুলি প্রকৃতির পরিচিত রূপের ইচ্ছা-পূর্বক লিখিত অনুলিপি নহে। কবির কলা-কৌশল কোনও পরিচিত বা নির্দিষ্ট রূপের নকল, প্রতিরূপ, বা প্রতিকৃতি লিখিতে চেষ্টা করে নাই। এই চিত্রমালার মধ্যে যদি কোনটি কোথাও, কোনও পরিচিত পুষ্প, বৃক্ষ, জীব বা মানুষের রূপের সাদৃশ্য বহন করে, এইরূপ সাদৃশ্য ইচ্ছাকৃত নহে, সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক। বাস্তবিকই, কবির চিত্র রচনার পশ্চাতে, কোনও বিশিষ্ট রূপের প্রতিকৃতি গড়িবার কোনও চেষ্টা বা অভিসন্ধি বিদ্যমান নাই। চিত্রগুলি চিন্তাহীন চেষ্টাহীন কলমবাজীর অবাধ বিচরণের প্রসূত আকস্মিক ফল। হাতের কলম কাগজের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া নানা অদ্ভুত রীতির মৌলিক কল্পনাকে রূপদান করিয়াছে—যেন কোনও বিশিষ্ট রূপের জন্যই কবির কলমকে দায়ী করা যায় না। যদি বলি কবির কলম রূপ-সৃষ্টির চেষ্টায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করে নাই,—কথাটা বোধ হয় ঠিক হইবে না। বোধ হয় এই কথা বলাই ঠিক হইবে যে—কবির অবচেতন মনের ইঙ্গিতে সুপ্ত মনের অজ্ঞাতসারে, হাতের কলম ছন্দময় রূপের সন্ধানে তীর্থ যাত্রা করিয়াছে,—মনের স্বাভাবিক ছন্দোগতির উৎসাহে যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত প্রেরিত হইয়া, কবির কলম রূপের সন্ধানে,—অন্ধের মত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াছে রূপ-সাগরে অবগাহন করে—"অরূপ রতন পাবো বলে।"

সুতরাং এই মানসিক ছন্দোগতির প্রেরণায় সৃষ্ট এই সব চিত্রাবলীর কোনও পরিচিত মূর্ত্তির আকস্মিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া, তাহাদের দোষ গুণের বিচার বা রস-প্রকৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না,—তাহাদের বিচার হইবে তাহাদের ছন্দোরেখার নানা বিচিত্র ভঙ্গীর বিশিষ্ট মূল্য দিয়া, তাহাদের আঁকা-বাঁকা রেখার বিশিষ্ট রস-রূপ দেখিয়া তাহাদের রেখাবলীর পরস্পর সম্পর্কিত রূপের সঙ্গতি ও ঐক্যতানের প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া এবং তাহাদের বিশিষ্ট মৌলিক ছাঁদে কল্পিত নূতন পরিকল্পনার রস বিচার করিয়া। সুতরাং, এই সব চিত্রাবলীর রেখা ও রূপ. তাহাদের নিজস্ব প্রকৃতির স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া বিচার করিতে হইবে, অন্য কোনও রূপের সাদৃশ্য বলিয়া নহে. একটা নূতন রীতির ছন্দোময় পরিকল্পনা গঠনের শক্তির তারতম্যের অনুসারে তাহাদের গুণ বিচার করিতে হইবে।

কোনও বিশিষ্ট রেখার রস-রূপ, কোনও বাঁকা রেখার বিশিষ্ট বঙ্কিম ঠাম, যাহার মধ্যে কোনও পরিচিত রূপের স্মৃতি জড়িত নহে. আমাদের চক্ষুকে সুমিষ্ট রসে রঞ্জিত ও অভিসিক্ত

করে—এই সুমিষ্ট রেখার সমাহার—তাহার ছন্দোগতির সহজ জীবনের সরল তরঙ্গ তুলে—তাহার নিজস্ব সাবলীল ধারা সযত্নে অনুসরণ করে,—যাহার মধ্যে তাহার জটিল নক্সার ছন্দোময় ঐক্যতান নানা রেখার সমাবেশে আপনি ফুটিয়া উঠে,—কিন্তু যাহার মধ্যে কোনও অভিধানের 'অর্থ' নাই, কিন্তু চোখের আনন্দ আছে প্রচুর। এই সব রেখার পরিকল্পনা কোনও মানুষের মনের ভাব ও চিন্তার প্রতীক বা অনুবাদ নহে—তাহারা তাহাদের নিজের মূর্তির নিজস্ব প্রকাশ—তাহারা রেখা সমষ্টির কাল্পনিক ছন্দোমঞ্জরী,—সঙ্গীতের ছন্দোবন্ধনের সহিত তাহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে, কারণ তাহারা রেখার সুরে নির্মিত সুমিষ্ট রসচক্র। যদি কথা-সাহিত্যের কোনও রচনা-রীতির সহিত ইহাদের তুলনা করি, তাহা হইলে বলিতে পারি এই শ্রেণীর চিত্ররচনা আমাদের ঠাকুরমাদের স্নেহের সুরে রচিত অর্থহীন ছন্দে গাঁথা "আবোল-তাবোল" গান, যাহা শুনিয়া শিশুরা সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। সঙ্গীত—পদ্ধতির 'তেলনা' গানের সংগেও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে—কারণ 'তেলনা' গানেও ছোট ছোট কুচো শব্দের সমাহারে ছড়া গাঁথার অনুরূপ সুমধুর ছন্দোগতি আছে।

ছেলে ভুলোনো ছড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়া—এই চিত্রাবলীতে শিশু সুলভ সরল দৃষ্টি ও উদ্দাম কল্পনার স্বতঃস্ফূর্তির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বিসদৃশ ও কঠিন হইল। কারণ, পৃথিবীর একজন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী, এবং একজন ঋষি-কল্প, জ্ঞান-বৃদ্ধ ও ধ্যানবৃদ্ধের উপর শিশু ভাবের আরোপ করিলে, কবির পরিণত মনীষার অপমান ও বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। কিন্তু, নিশ্চয়ই, শিশুচিত্তের সরল স্বচ্ছতা তাঁহার কলমের সৃষ্টি এই সব চিত্রমালায় দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার পরিণত বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই বিরোধী ভাবের সমন্বয় হয় কেমন করিয়া? আমাদের বলিতে হইবে— যে এই সৃষ্টিছাড়া রচনাগুলি কবির পরিণত মনের সুপ্ত অবস্থার অদ্ভুত কল্পনা,—যখন তাঁহার বৃদ্ধ মন সুপ্ত অবস্থায় কল্পলোকের স্বপ্ন দেখিত—এ সেই স্বপ্নলোকের বাতুল কল্পনা। এই তুরীয় অবস্থায়, অবচেতন মনের রুদ্ধ কারাগারের পরীর শিশুরা ছাড়া পায়—তাদের নাচন-কোঁদন ও তাণ্ডব লীলার সুরু হয়—এবং এই শিশুলীলার ছুটির ঘন্টায়, সুপ্ত-বৃদ্ধের শিশুমন কলমের আগায় নানা অদ্ভুত কল্পনার, মৌলিক রেখা-রচনার নয়ন-মুগ্ধকর স্বপ্নজাল রচনার অবকাশ পায়।

কবির এই শ্রেণীর চিত্রাবলীর রস বিচারের একটা বাধা এই যে এগুলি ইসলামী শিল্পের জ্যামিতিক রেখা-মূলক মৌলিক পরিকল্পনার মত, নিছক সাদৃশ্য-বিরোধী নৈরূপ্য-বাদী রূপ-কল্পনা নহে। তাহাদের অদ্ভুত রূপের পরিকল্পনার মধ্যে সময়ে সময়ে প্রকৃতির পরিচিত কোন কোন রূপ বা জীব-বিশেষের দূর সাদৃশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। এক একটি পরিকল্পনা একটা কিছু পরিচিত রূপের ক্ষীণ সাদৃশ্য বহন করে। যাহাকে 'চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি' এমন একটা কিছুর 'মতন' হেয়ালীর আভাষ এই সব চিত্রে অনেক সময় ফুটিয়া থাকে। এই তথাকথিত সাদৃশ্যের আভাষই রচনাগুলির দৌর্বল্যের দিকটা জাগাইয়া তোলে।

সাধারণতঃ রেখা চক্রগুলি তাহাদের প্রাথমিক 'ভ্রূণ' অবস্থায় নিছক নৈরূপ্যবাদে জন্মগ্রহণ করে, পরে কবির কলমের খোঁচায় নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভ করিয়া, একটা কিছুর ছায়া অবলম্বন করে—এই অবস্থার 'রূপ' কতকটা কাল্পনিক, কতকটা বাস্তবিক—কিন্তু শিল্পীর কলমের শেষ টানে ও অন্তিম আঁচড়ে, এবং এক অলৌকিক অপরিচিত কল্পনার স্বপ্ন রূপের মায়ার আবরণে, এই বাস্তবিকতার কাঠামো তিরোহিত হয়। স্বাভাবিক রূপের বাস্তব-রূপ অবাস্তবিকতার আবরণে আচ্ছন্ন হয় এবং পরিচিত রূপের সাদৃশ্য ও সত্ত্ব লোপ হয়। একটা কোনও পাখীর আকৃতির রেখা-পরিধি কল্পনার তাড়নায় রূপান্তরিত হইয়া এক নূতন রীতির, নূতন পদ্ধতির

পদ্মের মূর্তি গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে,—পক্ষান্তরে, হয়ত বা ফুলের রেখা তাহার স্বাভাবিক রূপ অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির অভিধানে নাই এমন এক নূতন জাতির পাখার মূর্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হয়। রেখার পাগলামী সৃষ্টির জগতে নূতন পর্যায়ের রূপ সৃষ্টির কসরৎ করে, কি হইতে কি হয় তাহার হদিস পাওয়া যায় না। কতগুলি রেখার আকস্মিক পরম্পরা একটা হয়ত অদ্ভুত রীতির পদ্মের সৃষ্টি করিতে সুরু করিল—কিন্তু রূপ-সৃষ্টির অর্দ্ধেক পথে শিল্পীর স্বেচ্ছাচারী কলম, ফুলের রূপকে অস্বীকার করিয়া বিপরীত পথে চলিল এবং সৃষ্টি-তত্ত্বের সমস্ত আইন-কানুন অবজ্ঞা করিয়া, এই ফুলের 'ভ্রূণ' অবশেষে মানুষের 'মতন' রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিল।

কয়েকটি রেখা-সমাহারের জটিল নক্সার গভীরতম প্রদেশে একটা ফুলের 'আভাষ' হয়ত ক্ষীণ রেখায় ফুটিয়াছে, কিন্তু ফুলের পথে না যাইয়া ফুলের জন্ম ও ভাগ্য অস্বীকার করিয়া, এমন একটা অদ্ভুত অবয়বের অপরিচিত জীবের আকৃতি সৃষ্টি করিয়া এই অনাসৃষ্টি জন্মলাভ করিল,—যাহার সঠিক সাদৃশ্য—কি উদ্ভিদ জগতে, জীব জগতে কি মনুষ্য জগতে কোথায়ও পাওয়া যায় না। এ যেন সৃষ্টিলীলার একটা পরিহাসের পন্থা—প্রহসনের পালা। এইরূপে কবির রূপকল্পনা পরিচিত ও অপরিচিত রূপলোকের দ্বন্দ্বের মধ্যে আপন আপন ভাগ্য অন্বেষণ করিয়াছে। কখনও কখনও তাহাদের অদৃষ্টে সম্ভব-লোকের রূপ-সাদৃশ্যে চমৎকার নক্সার নব কলেবর ও আকৃতি লাভ ঘটে,—কখনও বা ত্রিশঙ্কুর মত তাহারা সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যস্থায়ী শূন্যলোকে ঘুরিয়া বেড়ায় কারণ কবির করুণা তাহাদের কপালে অন্য কোনও সৌরূপ্যের সৌভাগ্য লিখিয়া দেয় নাই।

যাঁহারা রেখা-সমষ্টির ছন্দোগতির গুণ-বিচারের উপযোগী চক্ষু শিক্ষিত করিয়াছেন, যাঁহারা বাঁকা রেখার মাধুর্য্য ও নিছক রেখা-চক্রের নৃত্যগতির সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের সু-শিক্ষিত চক্ষে কবির রেখাসৃষ্টির নানা মৌলিক কল্পনায় একটা অভিনব আবেশ ও আকর্ষণ অনায়াসে অনুভব করিবেন। কারণ, প্রাচ্য-রীতির চিত্রকলায় তথা পশ্চিমদেশের অতি আধুনিক শিল্পকলার নবীনতম আদর্শে এই কথাটা সকল শ্রেণীর কলারসিক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, শিল্পীমাত্রেরই শুধু যে প্রকৃতির পরিচিত রূপ-মালার পথ বর্জন করিবার জন্মগত অধিকার আছে, তাহা নহে, পরন্তু, প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রকৃতির অভিধানে নাই—এইরূপ নিত্য নব নব রূপের সৃষ্টি করা শিল্পীর অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। এই নূতন সৃষ্টির পথে সত্যিকারের শিল্পী এমন এক অভিনব কাল্পনিক জগতের রূপ-সৃষ্টি করিয়া থাকেন যাহা কল্পনার স্বপ্নলোকের অভূতপূর্ব রূপে ও বর্ণে সমুজ্জল ও মহীয়ান। ভারতের শ্রেষ্ঠ কলারসিক ও রূপ-তত্ত্বের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় আনন্দ কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সরস সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহার একটি অক্ষম অনুবাদ আমি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। লেখাটি আমাদের দেশে অনেকেই পড়িবার সুযোগ পান নাই। আশাকরি রবীন্দ্রনাথের চিত্র রচনার এই আলোচনার নিবন্ধে তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে না। এই সমালোচনাটি কবির চিত্রাবলী ১৯৩০ সালে আমেরিকাতে প্রদর্শিত হইবার পর প্রকাশিত হয়ঃ

"ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাবলীর প্রদর্শনী কলারসিকদের চক্ষে বিশেষ কৌতুকপ্রদ এবং আদরের সামগ্রী—এই কারণে যে, বর্তমানকালের আদিমকালীন কলা-সৃষ্টির যথার্থ খাঁটী নিদর্শন এই সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হইল। এই প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে হয় যে-সমস্ত চিত্র-শিল্পী ও কলারসিকরা—যাঁহারা এতাবৎকাল য়ুরোপে প্রসূত কষ্টকল্পনার চেষ্টায় রচিত তথাকথিত আদিম-

রসের শিল্প সৃষ্টি ও কৃত্রিম সেকেলেপনা ও অসভ্যতার ভাণে নির্মিত রচনাকে আবাহন করিয়াছেন এবং উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দিত করিয়াছেন—তাঁহারা কবির চিত্র রচনা দেখিয়া আজ কি উত্তর দিবেন? তাঁহারা কি এই খাঁটী রূপরচনার সত্যবস্তুকে প্রশংসা করিবেন?

একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন অতি প্রতিভাবানজ্ঞানবৃদ্ধ মনীষী কাব্যকার, যেহেতু তিনি সারা পৃথিবীর একজন বিশ্ব-নাগরিক, যেহেতু তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এবং এসিয়া ও য়ুরোপের সমগ্র কৃষ্টির ইতিহাসের পরিপূর্ণ পরিচিতির মধ্য দিয়া জীবনের সর্বাঙ্গীন পরিচয় ও অনুভূতি অর্জন করিয়াছেন, সুতরাং মাত্র গত দুই বৎসরের সাধনায় রচিত তাঁহার এই চিত্রমালা পরিণত মনীষার শ্রেষ্ঠ ফল—কিম্বা তত্ত্ববিদ্যার দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয় জটিলতার ভারে অবনমিত ও অবসন্ন। এই কথা বলিলে ভুল বলা হইবে। সুতরাং এইসব রচনার মধ্যে আমরা যদি কোনও আধ্যাত্মিক প্রতীক সৃষ্টির কোনও গুপ্ত রহস্যের অনুসন্ধান করিতে যাই তাহা হইলে আমরা ভুল করিব। এগুলি কোনও হেঁয়ালী বা সাঙ্কেতিক ধাঁধাঁর উত্তর উদ্ধারের জন্য লিখিত হয় নাই।

অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তিত নূতন বাঙ্গালী চিত্র-শৈলী কিম্বা অন্য কোনও সাম্প্রতিক চিত্র-পদ্ধতির সহিত কবির এইসব চিত্র-রচনার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। এই কথাটা খুবই স্পষ্ট যে কবি তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় নানা রকমের চিত্রাদি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজের রচনার মধ্যে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এগুলি তাঁহার খাঁটী মৌলিক রচনা এবং তাঁহার মনের সহজ, সরল ও অকৃত্রিম প্রকাশ। এবং একজন পক্ককেশ সম্মানিত ও মাননীয় মানুষের অফুরন্ত অনন্ত ও চিরন্তন যৌবনের অদ্ভুত প্রমাণ ও পরিচয়। এই চিত্রগুলিতে বাল্যসুলভ সরলতা আছে—কিন্তু ছেলেমীর কোনও ছায়া নাই; শিশুসুলভ—কিন্তু শিশুজাত নহে।

এই রচনার অনেকগুলি দেখিয়া আমরা কৌতুকের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি, অনেকগুলি দেখিয়া আমরা হাসিতে পারি—ছেলেদের কল্পিত জগতের ছবি দেখিয়া যেমন আমরা হাসি—কিন্তু এইসব ছবি দেখিয়া তামাসা কিম্বা অবজ্ঞা করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইবে। কয়েকটি ছবি দেখিয়া আমাদের ধারণা হইতে পারে যে, কবি রেখা-বিদ্যার সহিত পরিচিত—কেমন করিয়া রেখাঙ্কন করিতে হয় সেটা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু এই রেখা-বিদ্যার পরিচয় তাঁহার সকল চিত্রেই বিদ্যমান নহে। সুতরাং যে যে চিত্রে ইহার প্রমাণ আছে কেবল সেগুলিকেই সুখ্যাতি করার কোনও অর্থ হইবে না,—যেমন যেগুলিতে রেখা-বিজ্ঞানের অভাব দেখিব—সেই অভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমস্ত চিত্রাবলীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করারও যেমন কোনও অর্থ হইবে না। এখনকার কালে চিত্রের জগতে অক্ষমতার বড়াই করা একটা নূতন ঢংয়ের প্রশস্তিবাদের সূত্রপাত হয়েছে এবং যাঁহারা কখনও রেখাঙ্কন করিতে শিখেন নাই এমন অসংখ্য চিত্রকরের অক্ষম রচনা দেখিয়া অনেক তথাকথিত সমালোচক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন—তাহার অনেক নিদর্শন আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। এবং এরকম এক শ্রেণীর চিত্রকর আমরা দেখিতে পাই যাঁহারা কোনওরূপ শিক্ষা বা সাধনার বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিবাদ করেন।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা, সাধনা বা মুন্সিয়ানার বিরুদ্ধে কোনও বিপরীত মত প্রচার করেন নাই। তিনি নিজে এই আয়াসলব্ধ শিক্ষা বা মুন্সিয়ানার কোন দাবী করেন না। এই কষ্টের শিক্ষার কোন দাবী না করিয়াই তাঁহার সহজ, সরল, অশিক্ষিত রচনা ও তাঁহার লীলাময় স্বপ্নের সৃষ্টিগুলি নিরহঙ্কারের নম্রতা নিয়া আমাদের নিবেদন করিতেছেন—আমাদের যেরূপ অভিরুচি হয় সেই দৃষ্টিতে আমরা এগুলি গ্রহণ করিব।

এই চিত্রমালায় একটি গুণ খুব পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে—সেটি হইল এই—এগুলি আদর্শ রূপে ও জাতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বয়স্কত্ব বা সাবালকতার ছাপ বহন করিতেছে তাহাদের সহজ সরলতার কানা ছাপাইয়া। এই গুণ অনায়াসে প্রকাশ পাইয়াছে নানা চিত্তহারী ও মনভোলানো রচনাতে, স্পষ্ট ছাঁদে কল্পিত সুন্দর ছন্দোবন্ধনে এবং আকৃতির পরিপাটি রেখা-পরিধিতে। এগুলি কোন বিশিষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ নহে, কিন্তু নিজের স্বতঃ-প্রকাশের মধ্যে সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই দিক হইতে চিত্রগুলিকে যথার্থ রহস্যময় সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। এবং অনেক মিথ্যাচারী কপট রহস্যবাদের ঝাপ্‌সা ও সস্তা ভাবুকতার চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে চিত্তহারী ও সুমধুর। কবির চিত্রমালায় ঐ শ্রেণীর কপট রহস্যবাদীদের সারূপ্য ও সাদৃশ্যের কোনও পরিচয় নাই।

ইংরাজী রহস্যবাদী চিত্রকর উইলিয়ম ব্লেকের (William Blake) রচনার সহিত তুলনা সহজেই উঠে। কারণ ব্লেকও ছিলেন একজন রহস্যবাদী কবি, যিনি তাঁহার উজ্জ্বল চাক্ষুষ কল্পনা-শক্তির উর্বর ভাণ্ডার হইতে এমন সব রূপসৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহার সাদৃশ্য প্রকৃতির রূপের মধ্যে পাওয়া যায় না—অথচ তাঁহার কাল্পনিক রূপ-রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক রূপের স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত ব্লেকের রচনার তুলনা আমরা আরও অনেক দূর টানিয়া নিয়া যাইতে পারি। ব্লেকের বেশী ভাগ চিত্র কবিতার উপর রচিত—পুঁথির কিনারায় লেখা টিকা-টিপ্পনী। রবীন্দ্রনাথের অনেক চিত্র, যেমন তিনি নিজেই আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার লেখার খসড়ার পাতার কিনারায় অদল বদল ও ভুল সংশোধনের সময় লাইনের মাঝে মাঝে কলম-বাজীর রেখা সঞ্চালনের আনন্দের মধ্যে তাঁহার অনেক চিত্রের আকস্মিক জন্মলাভ হইয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্রের উপর কোনও ব্যাখ্যাসূচক নামকরণ জুড়িয়া দিতে পারেন নাই—কেমন করিয়া পারিবেন?

এগুলি কোনও বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া লেখাচিত্রসৃষ্টি নহে—এগুলি তাঁহার নিজেকে কেন্দ্র করিয়া লেখা নিজস্ব চিত্র। এই দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়—বোধ হয় এগুলি তাঁহার কবিতা রচনার চেয়ে—তাঁহার সঙ্গীত রচনার অনুরূপ সৃষ্টি।

তাঁহার কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে, অন্তত তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর প্রমাণে বলা যায় যে, তিনি সত্যের নূতন আবিষ্কারের দাবী না করিয়াও তাঁহার গোষ্ঠীগত বা জাতীয় কৃষ্টি ও সাধনার সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন সংবেদনশীল সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা। সুতরাং তাঁহার বাণীর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিভার বক্তব্যের অপেক্ষা অধিকতর সার্থক ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অলঙ্ঘনীয় আবেদনের স্বর, ও সুর নিহিত আছে। সেই সুর, সেই স্বর, সেই ভাষা-সমস্ত ভারতের সম্মত এবং অতি পরিচিত ভাষা। তঁাহার কবিতা তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ ব্যক্তিত্বকে কিছুই প্রকাশ করে না—যদিও তাঁহার কবিতায় তাঁহার কাব্য-ধর্ম সুন্দর রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার চিত্রের মধ্যে এমন একটি নিবিড় ও সুমধুর ঘনিষ্ঠতা আছে—যাহার তুলনা ও রস-সাম্যতা পাওয়া যায় দুই বন্ধুর গোপন পত্রাবলীর প্রকাশে ও প্রচারে। কি বিচিত্র ও রঙ্গীন মানুষটির পরিচয় আমরা পাইতেছি তাঁহার চিত্রমালার মধ্যে। একখানি চিত্রে একটি আশ্চর্য্য ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহার মধ্যে শাইলক (Shylock) এবং ভীম মূর্ত্তি (Ivan-এর) আলেখ্য অদ্ভুত রসে সম্মিলিত হইয়াছে—যাহার মধ্যে গথিক গির্জার রঙ্গীন গবাক্ষের উৎকট রঙের গর্জনের প্রতিধ্বনি আছে। অন্যান্য চিত্রে—এমন সব মূর্ত্তির সাক্ষাৎ মেলে, যারা—কবির নিজের ভাষায়—"কোনও সম্ভব জন্তুর রূপের অত্যুক্তির সংযত প্রকাশ,—যারা অনির্দিষ্ট কারণে ভূমিষ্ঠ হবার সৌভাগ্য হারিয়েছে।

এমন সব পাখির পরিচয় আমরা পাই, যে সব পাখী কেবল আমাদের স্বপ্নের আকাশেই ডানা মেলে, এবং এমন সব নীড়ের মধ্যে বাসা বাঁধে—কবির চিত্র-পটে যাদের সুগোল রেখা-চক্রর আতিথেয়তার নিমন্ত্রণ লেখা আছে। অন্যান্য চিত্রে—মানুষের রূপের গাম্ভীর্য্য পশুর ব্যঙ্গ-মূর্ত্তির পরিহাসের মধ্যে সমাধিলাভ করেছে।

কোনও চিত্রে পাই—কোনও বংশীবাদকের বাঁশী শুনতে—ভীড় করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একটি দল যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গান এবং কবির নানা কবিতায় সূচিত অনন্তের ডাকের ছবিটি যেন একসঙ্গেই ফুটে উঠেছে।

আর এক ছবিতে দেখি এক নৃত্যমান গণেশের মূর্ত্তি—যাহার লক্ষণ হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের ধ্যানমূর্ত্তির লক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনও চিত্রে পাই বাঙ্গালী বালিকার সুললিত আলেখ্য যাহার মধুর রস Ivan the Terrible এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কোথাও দেখি রঙ্গীন ফুলের বিচিত্র গুচ্ছ; কোথাও দেখি কাগজের পাতায় লেখা কবিতার হস্তলিপি; কোথাও দেখি কোমল রেখায় টানা দিব্যলোকের দৃশ্য-চিত্র। বিষয়গুলি যত বিচিত্র তাহার লেখনভঙ্গীও তদ্রূপ বিচিত্র। যদিও প্রত্যেক ছবিখানি—একই কলম, কিম্বা একই ঝরণা কলমের উল্টো-মুখ দিয়ে লেখা, রঙ্গীন কালী বা রঙ্গের ভাঁড়ে ডুবিয়ে নেওয়া লেখনীর আঁচড়।

এই সব চিত্রের অঙ্কনভঙ্গীতে কোনও বাঁধাধরা পদ্ধতি বা নিয়ম নাই, যখন যে রকম রীতি মনে লাগে বা মনে আসে তাহাই যথেষ্ট। ছেলেদের মত কবি আঁকবার মুখেই চলতি কলমের গতির সঙ্গেই অঙ্কনের আঙ্গিক আবিষ্কার করে চলেছেন— যেখানে যে রীতি খাপ খায়—ভেবে-চিন্তে রস রচনার দৌড়ের মাঝ-খানে কোনও ছেদ বা বিরাম নাই সর্বক্ষেত্রেই উপকরণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। বড় হরপে লেখা ARTএর সৃষ্টিকরা কবির লক্ষ্যই নহে—কোনও অসুস্থ মানসিক অবস্থার প্রকাশ করাও কবির লক্ষ্য নহে। এমন কোনও শিল্প সৃষ্টি তাহার উদ্দেশ্য নহে যাহার দ্বারা আমাদের মনের উন্নতি লাভ হতে পারে, অথবা এমন কিছু রচনার উদ্দেশ্য নাই যাহার মধ্যে রচয়িতার পলাতক মন নিরাপদ আশ্রয়ে লুকাইয়া থাকিতে পারে। এই চিত্রসৃষ্টির মধ্যে কোনও পশ্চাৎবর্ত্তী, গূঢ়, প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি নাই—ইহাদের উদ্দেশ্য বিশ্ব-সৃষ্টির মত—যথার্থ স্বার্থশূন্য সরল ও নিষ্পাপ।" (আনন্দ কুমারস্বামী)

যাঁহাদের সঙ্গীতের কান আছে—সঙ্গীতের ভিত্তিগত তত্ত্বকথা, সুর-লোকের স্বরতত্ত্ব যাঁহারা কিছু কিছু বোঝেন—তাঁহারা এই রূপসৃষ্টির ভিত্তিগত তত্ত্বকথা, রূপরচনার আসল রহস্যের কথাটা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সঙ্গীত-শিল্পের অনেক কথা, অনেক তত্ত্ব, রূপ-শিল্পে খাটে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত তত্ত্বের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে রূপ-শিল্পের ভিত্তিগত তত্ত্ব ও সত্যকে সহজে বোঝা যাইবে। অমরা জানি যে সাতটি 'স্বর' এবং তার অন্তর্গত প্রায় ১২৮টি শ্রুতি হইল সুর-শিল্পের অক্ষর। এই অক্ষরের নানা সমষ্টি নিয়া সুরের শব্দ-ভাষা, অভিধান বা শব্দমালা রচিত হয়। চিত্র-শিল্পের ভাষাতেও সাতটি সুরের অনুরূপ সাতটি মূল বর্ণ আছে যথা—বেগুনী, তুঁতে, নীল, সবুজ, হরিৎ, কমলা এবং লাল। এই সাতটি রঙের যে কোনও দুইটি রঙের মধ্যে সুরের শ্রুতির মতন আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানা রঙের বিভিন্ন ওজনের রেশ বা বর্ণাভাষ 'টোন্' আছে।

এইরূপ সাতটি রঙের অন্তর্গত অসংখ্য বর্ণমালা আছে, যাহার সাহায্যে চিত্র-শিল্পী তাঁহার বক্তব্য চিত্রে লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। এই "বর্ণ"মালাকে চিত্র-শিল্পের 'স্বরবর্ণ' বলা যাইতে পারে। কারণ, বর্ণ একটা কোনও রূপ বা আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পরিচিত

হয় ও আত্মপ্রকাশ করে। এই রূপ বা আকৃতি প্রকাশ করিবার অক্ষর হইল 'রেখা' 'লাইন'। এই রেখা—মুখ্যতঃ দুই জাতীয়—সরল, 'সোজা' রেখা, আর বক্র বা 'বাঁকা' রেখা। রেখার ছোট-বড় ও সরু মোটা, হ্রস্ব-দীর্ঘতার অনুসারে, নানা ওজনের, নানা ছন্দের, নানা ভাব ও ভঙ্গী প্রকাশের সামর্থ্য আছে। এই রেখার নানা জাতীয় অক্ষরের সাহায্যে রূপ, আকৃতি বা অবয়বের জন্ম হয়। রেখা হইল রূপশিল্পের সাধারণ বর্ণমালা। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প—এই তিন শ্রেণীর রূপবিদ্যার আত্মপ্রকাশের অক্ষর হইল 'রেখা'। নানা শ্রেণীর, নানা রীতির, নানা ভঙ্গীর রেখার অক্ষরে রূপশিল্পের শব্দমালা গঠিত হয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক দৃশ্যে, জীব, জড় ও উদ্ভিদ্‌জগতের অধিবাসীরা নানা রীতির রেখায় নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া আছে। সাধারণত, আমাদের 'চোখেদেখার' জগতে, যে সব আকৃতি, অবয়ব ও রূপ আমরা দেখিতে পাই,—রেখার অক্ষর যে অসংখ্য বিভিন্ন রূপ রচনা করিতে পারে, প্রকৃতির নানা রূপে তাহার নিঃশেষ হয় নাই, অর্থাৎ, রেখার শব্দমালা অফুরন্ত, অপর্য্যাপ্ত,—প্রকৃতির রূপে তাহার কয়েকটি মাত্র প্রকাশ হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সৃষ্টি-তত্ত্বের মতে, আমাদের 'চোখে-দেখা' এই ক্ষুদ্র জগৎ ছাড়া আরও অন্যান্য জগৎ আছে, যাহার অধিবাসী সৃষ্ট জীব, ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নানা স্বতন্ত্র অবয়ব পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করিয়াছেন যে মার্স (MARS) বা মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী মানুষ, উদ্ভিদ ও শৈলমালার রূপ ও অবয়ব আমাদের পরিচিত জগতের মানুষ ও উদ্ভিদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের। আমাদের এই পরিচিত জগতের অতি-প্রাচীন স্মরণাতীত কল্পে, এমন সব ভিন্ন রূপ, অবয়ব ও পরিসরের জীব এককালে জীবিত ছিল, (যাহাদের বংশ এখন লুপ্ত হইয়াছে) যাহাদের রূপ ও আকৃতি, আধুনিক জগতের কোনও পশুর আকৃতির সঙ্গে মেলে না। বৈজ্ঞানিকরা এই সব প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের, অধুনা বিস্মৃত, নানা অদ্ভুত অবয়বের লুপ্ত পশুর 'হাড়-গোড়' সংগ্রহ করিয়া তাহার লুপ্ত রূপ পুনর্গঠিত করিয়া যাদুঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সব অদ্ভুত অবয়বের, অদ্ভুত রূপ দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন এ জগতের জীব নয়, কোনও স্বপ্ন-জগতের কল্পিত রূপ। প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রত্ন-জীব-বিজ্ঞান—Pre-historic Palaentology—এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত কল্পনার অপরূপ রূপের লুপ্ত-জীবের অবয়ব ও আকৃতি উদ্ধার করিয়াছে। এই সব অদ্ভুত অবয়বের রূপ দেখিলে মনে হয়, আমাদের ক্ষুদ্র পরিধি এখনকার "চোখে দেখার" জগতের জীব জন্তুর রূপের অতীত, অনেক অলৌকিক রসের, আশ্চর্য ছন্দের রূপ, জীব-সৃষ্টির ইতিহাসে লেখা আছে—যে রূপ এখন আমাদের দৃষ্টির—এমন কি আমাদের কল্পনারও অতীত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখনকার 'চোখ-দেখার' জগতে মেলে না,—এমন সব রূপের অস্তিত্ব যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত রূপের জগতের অফুরন্ত "শব্দ"মালার অনেক রূপ হইতেই আমরা বঞ্চিত হইয়া থাকিব। সৃষ্টিকর্ত্তার রূপের ভান্ডারে রূপের কল্পনা অফুরন্ত, অপর্য্যাপ্ত অসংখ্য। সৃষ্টিকর্ত্তার রূপের অভিধানে, রূপের শব্দ-মালা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতের প্রাচীন শিল্প-তন্ত্রে রূপ সাধক হইলেন ব্রহ্মার পুত্র——বিশ্বকর্ম্মার বরপুত্র। এই সৃষ্টিকর্ত্তার বংশধর, ভারতের রূপ-শিল্পীরা দাবী করেন যে, নূতন রূপ, সাধারণ মানুষের কল্পনার অতীত রূপ ও অবয়ব আবিষ্কার করিবার নূতন রূপ সৃষ্টি করিবার শিল্পীর জন্মগত অধিকার আছে। শিল্পীর রূপ-সাধনা, তাহার রূপ-কল্পনা, প্রকৃতির কয়েকটি অতি পরিচিত রূপের মামুলী 'শব্দ'মালার গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রকৃতির রূপের অভিধানে নাই—এরূপ অসংখ্য রূপের অভিনব রীতির অবয়বের কল্পনাও সৃষ্টি করা শিল্পীর কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। শিল্প-ধর্ম্মের এই স্বাধীন সৃষ্টিবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা অনেক

অভিনব রীতির পশু মানুষ ও দেবতার মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার আদর্শ আমাদের পরিচিত জগতের কোনও রূপের সঙ্গে মেলে না। তাহার কয়েকটি উদাহরণ হইল—'নরসিংহ', 'গণেশ', 'গরুড়' 'কামধেনু', কিন্নর, গন্ধর্ব্ব যালী, বা গজ-সিংহ। এইসব অপরূপ সৃষ্টির অনুরূপ নূতন রীতির রূপ-কল্পনার উদাহরণ ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশের শিল্পে আছে। চীনের ড্রাগন ভারতের অজগর সাপের অতি-প্রাকৃত মূর্ত্তি। ভারতের 'নরসিংহ' মূর্ত্তির অনুরূপ কল্পনা হইল মিশরের 'সেকমেটের' মূর্ত্তি—মানুষের স্কন্ধের উপর সিংহের মুখ বসান অলৌকিক ভয়ানক রসের মূর্ত্তি। গ্রীসের 'গর্গণ' মূর্ত্তি, ভারতের "কীর্ত্তিমুখের" অনুরূপ। প্রাচীন আসীরিয়ার পক্ষযুক্ত মানুষের মুখ সংযুক্ত বৃষের মূর্ত্তি, ভারতের 'কামধেনুর' রূপকল্পনার অনুরূপ। য়ুরোপে 'গথিক' যুগের নানা স্থাপত্যে ও গির্জ্জায় অদ্ভুত কল্পনার নানা পশুমূর্ত্তি আছে। প্যারিসের নোত্রদাম্ গির্জ্জায় অলিন্দর উপর কয়েকটি অদ্ভুত রসের নানা মূর্ত্তি আছে, যাহারা কতকটা ভারতের 'গরুড়' মূর্ত্তির অনুরূপ। সাদৃশ্যবাদী পণ্ডিতেরা—যাঁহারা রূপ শিল্পে নূতন কল্পনার অধিকার স্বীকার করেন না,—তাঁহারা এই স্বভাবের অতীত কল্পনার রূপের নাম দিয়াছেন "গুহাচারী ভৌতিক রূপ"—ইংরাজী ভাষায় যাকে বলা হয় Grottesque.

সার টমাস ব্রাউন স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—"প্রকৃতির অভিধানে অদ্ভুত কল্পনার স্থান নাই"। দ্রাবিড় দেশে দক্ষিণী শিল্পী কল্পনার বলে প্রকৃতির অভিধানে নাই এমন অনেক পশু-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হইল "ষরভ" এবং "যালী"। ষরভ একটি অদ্ভুত কল্পনার পশু-মূর্ত্তি। ইহার চারটি পা চার রকমের, একটি হল বাঘের, একটি হাতীর, একটি সিংহের আর একটি পাখীর পা। "যালী"র রূপে দ্রাবিড় শিল্পী দুটি বিভিন্ন জাতীয় পশুর আকার জুড়িয়া দিয়া একত্র করিয়া, এক অপরূপ "গজসিংহের" কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, "যালী" ও "ষরভের" রূপ ভারত শিল্পীর কল্পনায় প্রাকৃত রূপের অনেকটা বিপরীত, তথাপি এই অপরূপ অপ্রাকৃত রূপ-দুটিকে হাস্যাস্পদ কিম্বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টি-কৌশলে বেশ একটা সম্ভাব্যতার ছাপ এই সব পশু কল্পনায় আছে। মনে হয় যেন "যালীর" মত কোনও পশু ভারতবর্ষে কোনও অতি প্রাচীন, স্মরণের অতীত প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে জীবিত ছিল—এখন তাহার বংশ লোপ পাইয়াছে। প্রকৃতির আদর্শ ও সৃষ্টি "কাপি-বুক" অতিক্রম করিয়া নূতন কল্পনার অভিনব রসের রূপ সৃষ্টি করিবার অধিকার যে শিল্পীর আছে, ভারতের ভাস্কর্য্যের পশুচিত্রে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীতেও—আমরা ইহার অনুরূপ—নূতন কল্পনার পশুরূপের সৃষ্টির পরিচয় পাই।

আমরা অনেকেই জানি যে, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের চিত্তে কোনও অবচেতনার মুহূর্তে, নানা অদ্ভুত, অপরিচিত রূপ, বা মূর্ত্তির ছায়া আমাদের মনের মুকুরে ফুটিয়া ওঠে। মানুষের মনের অবরুদ্ধ মণিকোঠায় এইসব রূপের ছায়া, অব-ছায়া, নানা অতি-রূপ, অপরূপ, বিরূপ বাসা বাঁধিয়া আছে। সাধারণতঃ আমাদের চোখে দেখা বাহিরের জগতের মনোমুগ্ধকারী রূপের মায়া আমাদের ভুলাইয়া রাখে। কিন্তু আমাদের বাইরের রূপের-জগতের মোহ-পাশ হইতে যখন আমরা মুক্তি পাই—যেমন, স্বপ্নে অবসাদের মুহূর্ত্তে, মনের তুরীয় অবস্থায়, তখন এই অন্তরের রূপ-জগতের দরজা খুলিয়া যায়— তখন এই অন্তরের রূপলোকের অদ্ভুত অধিবাসীরা আমাদের অন্তরের দর্পণে ফুটিয়া ওঠে। যাঁহারা কোনও বিশিষ্ট সাধনা বা অভ্যাস দ্বারা এই বাইরের জগতের চেতনাকে স্তব্ধ করিতে পারেন, এই অবচেতনাকে, এই Sub-conscious অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারা রূপের এই অভিনব রত্নাকরকে মন্থন করিয়া নানা

নূতন জাতির রূপের-মণি-মাণিক্যের সাক্ষাৎ পান। সকল দেশের শিল্পীরা এই অবচেতনার অনুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া, এই সব "রূপহীন" রূপের প্রেত লোকের সাক্ষাৎ পান কিনা জানিনা। তবে আমরা জানি যে, য়ুরোপের অতি আধুনিক শিল্পীরা এই শ্রেণীর নানা নৈরূপ্যময় রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে।

য়ুরোপের এই নব্য-তন্ত্রের রূপ-সাধকরা কোনও অবচেতনার পথে এই অভিনব পর্য্যায়ের রূপের অনুসন্ধান করেন না।

আমাদের 'চোখে দেখা' পরিচিত রূপের জগৎকে অস্বীকার করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া, নিছক কল্পনার আশ্রয় নিয়া, তাঁহারা রেখা-বর্ণের নানা খাঁটি, নিছক রূপ-কল্পনা করিয়াছেন,—যে পরিকল্পনায় প্রকৃতির রূপের সহিত বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। য়ুরোপের প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বেই—একজন রুসীয় শিল্পী তাঁর নাম ক্যানদিনস্কী—এই নৈরূপ্যবাদ হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। ক্যানদিনস্কী এমন সব নূতন জাতির, নূতন রীতির ফুল ফল, লতা-বৃক্ষের রূপ চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন— প্রকৃতির রূপের জগতে তার তুলনা মেলা ভার। অথচ, রেখার মাধুর্য্যে, বর্ণের প্রখরতায় ও মধুর সামঞ্জস্যে এই মনগড়া, কল্পনার জগতের ফুল, ফল, লতা, বৃক্ষ,—চক্ষুর তৃপ্তি সাধনে রসমূর্ত্তির উপভোগ ও আস্বাদনের দিক দিয়া যথেষ্ট সুন্দর, যথেষ্ট মিষ্ট।

ভারতের, তথা পূর্ব-দেশের শিল্পীরা বহুপূর্বে প্রমাণ করেছেন, এবং য়ুরোপের শিল্পীরা সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে,—শিল্পের জগতে রসচক্রের রচনা করিতে হইলে, প্রকৃতির রূপকে যে নকল করিতে হইবে, এমন কিছু বাঁধাধরা নিয়ম নাই।

উপযুক্ত সাধন মুহূর্ত্তে, ভাবের আবেশে, রসের উল্লাসে, শিল্পী নিত্য নতুন রসরূপের সৃষ্টি করিবেন, যার তুলনা আনিতে স্বয়ং প্রকৃতি দেবী পরাস্ত ও পরাজিত হইবেন।

কারণ প্রকৃতির রূপ ব্রহ্মার কল্পনার একটি অধ্যায় মাত্র—অন্যান্য অধ্যায়—প্রকৃতির রূপের বিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী—এমন, অনেক রূপের কল্পনা আছে।

বিশ্বকর্মা—যিনি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার বর-পুত্র, তিনি নূতন নূতন রীতির পদ্ধতির মৌলিক রূপ-সৃষ্টি করিবার অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—যে সৃষ্টির রস-আস্বাদন ও দোষ-গুণ বিচারের একমাত্র আদর্শ—বর্ণ ও রেখার ছন্দ-গতি ও আকৃতি কল্পনার সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্য।

আসীরীয়, সাসানীয়, ভারতীয়, চৈনীক, পলিনেশীয় প্রভৃতি এসিয়া-মহাপ্রদেশের নানা শিল্পের নানা পদ্ধতির নব নব বিকাশে যে মৌলিক রূপ-সৃষ্টি ও নূতন পদ্ধতির সৌন্দর্য কল্পনার যে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে—তাহার পরিচয় লইতে বিমুখ হইয়াছিলেন এক শ্রেণীর অশিক্ষিত সমালোচকসম্প্রদায়,—যাহাঁদের দৃষ্টি-শক্তি, রূপশিল্পে নকলনবীশ ও বাস্তবিকতার ভ্রান্ত আদর্শের সীমাবদ্ধ রীতিতে পঙ্গু ও অন্ধ হইয়াছিল।

কবির প্রতিভার এই একটা নূতন দিকে আত্মপ্রকাশে, যে সব নূতন রূপ-সৃষ্টির কল্পনা আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—তাহার সাহায্যে আমরা রূপ-তত্ত্বের ভিত্তি-গত স্বকীয় আদর্শ কি, তাহা কিছু, কিছু বুঝিতে পারিতেছি। এবং এই জ্ঞানের ফলে, আমরা একটি কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি যে—শিল্প-কলা প্রকৃতির অতি পরিচিত রূপের প্রতিলিপি, অনুলিপি, বা অনুকৃতি মাত্র নহে,—শিল্পের অভিযান—রূপের নব নব রীতির অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জয়-যাত্রা।

বাঙ্গলার নূতন পদ্ধতির অনাদৃত চিত্র-শিল্পীরা, যাঁরা বাঙ্গলার কৃষ্টির ভোগ-মন্দিরের

অভুক্ত হরিজন, তাঁরা বোধ হয় এই কথা স্মরণ করিয়া আনন্দের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন যে—রবীন্দ্রনাথের মত একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রূপতত্ত্বের সত্য-মতে দীক্ষা-গ্রহণ, অক্ষরের অভিমানী সাহিত্যরথীদের পরাজয়—এবং নিরক্ষর শিল্পীগণের বিজয়বার্তাই বিঘোষিত করিতেছে। কারণ বাঙলার নবীন শিল্পী-সম্প্রদায়—যদি শিল্প চক্ষুহীন নীরস সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় না করিয়া থাকে—তাহাদের রূপ-তত্ত্ব জগতের শ্রেষ্ঠ কবির হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

কবির চিত্র-লিপি ইতিমধ্যে ভারতের নানাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে—এবং নানা মাসিক পত্রিকায় তাহার প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে—সুতরাং তাহার রূপ-সৃষ্টি শিক্ষিত সমাজে এক্ষণে সু-পরিচিত। কিন্তু, সুপরিচিত হইলেও তাঁহার চিত্রের মর্মকথা তাঁহার অতি বড় ভক্তের কাছেও এখন রহস্যে আবৃত সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে। কবি ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার চিত্রাবলীর একটি মনোরম সংস্করণ প্রকাশ করিয়া—তাঁহার চিত্রের প্রতি-লিপির সহিত কথার টীকা জুড়িয়া দিয়াছেন। এই টীকাবলীতে তাঁহার চিত্রাবলীর হেয়ালীর অর্থবোধের কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। কিন্তু, চিত্রের মর্ম-কথা যে কথায় লিখিয়া বুঝান যায় না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কবি রূপদেবতার নিকটে, প্রথমেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন।

"অয়ি! চিত্রলেখা দেবী ক্ষম মোরে,
তোমার মহিমা যদি খর্ব করে থাকি
দিতে গিয়ে বাক্যে ঘেরা সীমা,
বাক্যের অতীত তুমি!

আপন প্রকাশ আপনাতে নিয়ে সাথে,
নিজে দাও দেখা,
বচনের মল্লিনাথে ভ্রূক্ষেপ করনা ত কভু।"

চিত্রলেখার গুপ্তরহস্য কবির দুই একটি টীকায় ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে,—চিত্রসৃষ্টির প্রয়াস প্রকৃতির "কাপি বুকের" পুনরুক্তি নহে ঃ—

"অসীম শূন্যে একা, অবাক চক্ষু দূর রহস্য দেখা"।

"যে রূপকথার বিহঙ্গ তুমি, রেখায় তাহার বাসা।
অগোচরে ছিলে স্বপ্নে, আমার নাই
কোনো তার ভাষা ॥"

"কে জানে কার মুখের ছবি কোথায় থেকে ভেসে।
ঠেক্‌ল অনাহূত আমার তুলির ডগায় এসে ॥"

"বিস্মৃত যুগে গুহাবাসীদের মন
যে ছবি লিখিত ভিত্তির কোণে।
অবসরকালে বিনা প্রয়োজনে
সেই ছবি আমি আপনার মনে
করেছি অন্বেষণ ॥

রবীন্দ্রসংগীতের সুর-দলন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রষ্টার চেয়ে টীকাকারদের সংখ্যা যে বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। কেন না সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারণা, জ্ঞান ও প্রেরণা আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও, বেশীর ভাগ টীকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রুজির ক্ষেত্রে ঠিকাদারের ঠিকাদারির ফাঁদ থেকে বাঁচাই যেমন খেটে-খাওয়া লোকের কাম্য, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীকাকার-দের টাকাদারির ঘুর্ণি থেকে বাঁচাই হচ্ছে রস-দরিয়ার ডুবুরীদের লক্ষ্য। এ হুশিয়ারীটা বিশেষ করে এ যুগে খুবই দরকার কেন না শুধু যে খাদ্য-অখাদ্যের ব্যবসায়ীরাই বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, জ্ঞানপণ্যের ও রস-পণ্যের বণিকদের কোলাহলেও বাজার সরগরম। কিছু বেচতে গেলেই খরিদ্দারদের সামর্থের দিকে নজর দিতে হয়। রুচির বেশীর ভাগটাই হচ্ছে সামর্থ। বেশীর ভাগ লোক সামর্থের অভাবে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে পারে না তাই ব্যাপারীকে পাঁচ-মিশালি মাঝারি জিনিসই বেশী করে আনতে হয় বাজারে। রসের ক্ষেত্রেও খুব উচুদরের রস সৃষ্টির জন্যে যে মূল্য দিতে হয় সে মূল্য বেশীর ভাগ লোকের অন্তরের মঞ্জুষায় সঞ্চিত নেই। তাই রস-পণ্যের যারা ব্যাপারী তারা যে খরিদ্দার বুঝে সেরা জিনিসটাতে ভেজাল মিশিয়ে মাঝারি করে বাজারে চালাতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা যে দুঃখের এটা স্বীকার করতেই হবে। কেন না দেহের অন্নে ভেজাল যেমন সংঘাতিক আঘাত হানে, মনের অন্নে কুশ্রীর ভেজাল, নিচু সুরের মিশ্রণ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আঘাত হানে না।

কুড়ি বছর হোতে চললো রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে গেছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই তাঁর সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিতে ভেজাল মিশনোর যে আসুরিক প্রয়াস চারদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতো অল্পদিনের মধ্যেই যখন তাঁর গানের এই মর্মান্তিক অবস্থা, আরো কিছু বছর বাদে খাদের প্রাচুর্যে ও পীড়নে তাঁর গানের সোনা হয়তো একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।

এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নন। বিশ্ব-ভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তী কালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি স্বরলিপির বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হচ্ছে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্ম-প্রধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে তাঁদের সংগীত বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন, কেন বরদাস্ত করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা

দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজী নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়া ভাবে রবীন্দ্র-সংগীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকদের দ্বারা।

১। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এই গানটির স্বরলিপি ১৩৪২ সালে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'স্বরবিতান'-এর প্রথম খণ্ডে। ১৩৫৪ সালে 'স্বরবিতান'-এর যে সংস্করণ বের হয় তাতে সুরটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৩৫৬ সালের সংস্করণেও এই বদলানো সুরটিই বজায় রাখা হয়েছে। অশালীনতার পরাকাষ্ঠা এই যে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত-স্বরলিপির বই হিসেবে 'স্বরবিতান' এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে!

২। 'সখি, আঁধারে একেলা ঘরে' এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণেও এই গানের সুরটি অবিকৃত থাকে। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি অদল বদল করে দেওয়া হয়। অবিশ্যি এই ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বলে সেটা চালানো হচ্ছে।

৩। 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানের সুরটিকে বদল করে ছাপানো হয়।

৪। 'কোথা যে উধাও হোলো' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণে সুরটির উলটপালট করে স্বরলিপি বের হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের উপর অসীম করুণা দেখিয়ে, ও দিনেন্দ্রনাথের উপর কৃপা করে আবার ১৩৪৩ সালের সুরে ফিরে গেছেন এই মাতব্বরেরা।

৫। 'আমারে ডাক দিল কে' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে 'নবগীতিকা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৩৭ সালের সংস্করণেও সুরটি বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের বর্তমান অধীশ্বরদের কৃপা-দৃষ্টি লাভ করেনি। 'নবগীতিকা'-র ১৩৫৭ সালের সংস্করণে সুরটির পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬। 'আমায় ভুলতে দিতে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে 'গীতলেখা', প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৪২ সালের সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো। ১৩৬২ সালের সংস্করণে সুরটি বদলানো হয়েছে।

৭। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ 'বৈতালিক' স্বরলিপি-গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৩৩৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো। ১৩৬২ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত এই গানটির স্বরলিপির এমন পরিবর্তন করা হয়েছে যে তাঁর স্বরলিপি বাতিল করা হয়েছে বললেই সত্য বলা হবে।

৮। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির স্বরলিপি সংগীতবিদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের সুরটির বহু পরিবর্তন করা হয়েছে! এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই গানটির স্বরলিপির পরিবর্তন দিনেন্দ্রনাথ ও অন্যের দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ

আজ নেই' তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থতা বিচার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে 'অন্য'টির কথা বলা হয়েছে' সেই 'অন্য'-টি কে এবং তার কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিত কালে শ্রীমতী কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটিকে প্রামাণ্য বলে ধরা যেতে পারে। নতুন স্বরলিপির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

৯। 'ওহে জীবনবল্লভ' ও 'প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী' এই দুটি গানের স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্ম-সংগীত-স্বরলিপি'-তে (১৩১১-১৩১৮ সাল) প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬ সালে 'স্বরবিতান', চতুর্থ খণ্ডে এই দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়। কাঙালীচরণ সেনের স্বরলিপির সুর তখনও বজায় থাকে। ১৩৫৮ সালের স্বরবিতান-এর সংস্করণে এই দুটি গানেরই সুর বিকৃত করা হয়েছে।

১০। 'আজি বহিছে বসন্ত' 'মোরে বারে বারে ফিরালে,' 'অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী'—এই গানগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন প্রকাশ করেন 'ব্রহ্ম-সংগীত-স্বরলিপি'-তে। 'স্বরবিতান'-এর ১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানগুলির সুর বদল করা হয়েছে।

১১। 'স্বরবিতান', প্রথম খণ্ডের মোট ৪টি সংস্করণ বেরিয়েছে। প্রথম সংস্করণে 'সে আমার গোপন কথা' গানটির অন্তরাতে 'প্রাণ আমার বাঁশী শোনে' ছিলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'প্রাণ যে আমার বাঁশী শোনে' করা হয়। আবার নূতন সংস্করণে (১৩৬১) 'যে' কথাটী বাদ দেওয়া হয়েছে। গীতবিতানে তৃতীয় সংস্করণেও 'যে' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আর কতো উদাহরণ দেবো? এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব-ভারতীয় সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব' তাদের অপূর্বত্ব, তাদের অনন্য-সাধারণ মৌলিকত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন।

গ্রামোফোন কম্পানীও তাঁদের এই সুর-দলনী লীলার অনুরক্ত সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান রেকর্ড করবার অধিকার গ্রামাফোন কম্পানী কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে আদায় করেন, সে অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। বিকৃত সুর ও বিকৃত উচ্চারণ রবীন্দ্র-সংগীতের বহু রেকর্ড বিভীষিকা জাগিয়ে প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় স্বরূপ ব্যবহার না করে যদি তাঁর এই মহতী সৃষ্টির সত্য রূপটিকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সকলের কাছে ধরে দেওয়া তাঁদের চরম কর্তব্য বলে মনে করতেন তাহলে গ্রামোফোন কম্পানী অকিঞ্চিৎকর অর্থ দিয়ে যে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে তা কবে বন্ধ হয়ে যেতো।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুর-বিকৃতির জন্যে আমাদের রেডিও-কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নন। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গান তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁদের মর্জি মতো রবীন্দ্র-সংগীতের সুর একটু আধটু বদল করে গান। যেখানে তান আদবেই ছিলোনা সেখানে তান দিয়ে গান। এটা যে কতো বড়ো অশালীনতা তা বলে শেষ করা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার নিজের খেয়াল মতো রঙ (কাদা!) লেপবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে আসুরিকী লীলা সুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখে-ছিলেন দিলীপ রায়কে সেটিকে মানার দিক থেকে বেপরোয়া আধুনিকদের বাধা থাকলেও, জানার দিক থেকে আশা করি বাধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তুমি কি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি ত নিজের রচনাকে সে রকম ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি।..

যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম!....হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন।....কিন্তু আমার গানেত আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

এই হোলো রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে হুড়োহুড়ি চলছে তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত।

শুধু এই নয় আরও এক ধরণের ব্যভিচার সুরু হয়ে গেলে রাগ-রাগিণীর এলাকা-ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে নিয়ে। এ পর্যায়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বহু ব্রহ্মসংগীত। যে হেতু এই গানগুলি রাগ-রাগিনীর সুর-লোকের বাসিন্দে কোনো কোনো সংগীতজ্ঞ তাই ধরে নিয়েছেন যে রাগের শাস্ত্রসম্মত পুরো বিস্তার করবার অধিকার তাঁদের আছে এই গানগুলিতে। বাহার রাগে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক। এই গানটি মূলত বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ জায়গায় জায়গায় এমন দু একটি স্বর-যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করে দেখলে শুদ্ধ বাহার রাগে লাগে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো রাগ-রূপ সৃষ্টি করার কাজে লাগেন নি। তিনি সারাজীবন একটি সাধনাই করে গেছেন, আর সেটি হচ্ছে গান-সৃষ্টির সাধনা। গানের কাব্যাংশের বচনীয় ভাবটিকে অনির্বচনীয় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। এক কথায় কথা ও সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাধনা। এখন যদি কোনো ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত' গানটি মূলত বাহার রাগে রচিত বলে গানটিতে বাহার রাগের শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহলে তাঁর দুঃসাহসের প্রচুর তারিফ করেও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে কখনো রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটাবার আধার হিসাবে ব্যবহার করেন নি। সুরকে তিনি ব্যবহার করেছেন শুধু গানের কথার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। তাঁর গান একলা সুরের অ-দ্বৈত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। কথা ও সুরের দ্বৈত প্রকাশের লীলাভূমি তাঁর গান। তাই মূলত বাহার রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাব প্রকাশের তাগিদে তিনি বাহারের বাঁধা-ধরা স্বর-নক্সার মধ্যে অন্য স্বর অসঙ্কোচে মিশিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব, তাঁর স্বকীয়ত্বের প্রকাশ, তাঁর গান-সৃষ্টির অসাধারণত্ব। যে সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানগুলিকে তাদের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করবেন রাগ-রাগিণীর শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলবার বাসনায়, তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষত্বটুকুকে লোপ করে এক অনন্যসাধারণ গান-স্রষ্টার রচিত অসাধারণ সুরগুলিকে সাধারণ করে তুলবেন। এক কথায় এই সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ভাটপাড়ার বাসিন্দে করে তাদের জাতে তুলবেন বটে কিন্তু তাদের প্রাণে মারবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উদ্দেশ্য ও তাঁর সুর-রচনার উদ্দেশ্য তো বার বার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"সংগীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্টি শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে-দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"

তিনি বলছেন—"গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই। তাঁরা সংগীতকে চেতনহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত

অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁরা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন—"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকে বাহাল রাখিব না কেন?"

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ভোর সুর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বাহাল রেখেছেন। রাগ-রাগিণীর কাঠামোর শুদ্ধতার ও অশুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদবেই ব্যস্ত হন নি। যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হোলো কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেলো কি গেলো না, একমাত্র এইটেই ছিলো তাঁর দেখবার বিষয় ও ভাববার বিষয়। আজ তাই রাগ-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট-অভিমত-বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিযান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই সব গানগুলির বিকৃতিকৃত সুরের স্বরলিপি প্রকাশ করছেন, আবার এটাও লিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চলবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতিকৃত সুরও চলবে তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা বলতেই হবে যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সংগীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো শুধু বিশ্বভারতীয় নয়, সে দায়িত্ব দেশবাসীর।

সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে গেলে সংগীত ও সংগীতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণাগুলি আমাদের জানা একান্ত দরকার। এখন তাই সংগীত সম্বন্ধীয় তাঁর বিশেষ ধারণাগুলি ধরে দেবার চেষ্টা করবো।

তাঁর নিজের তৈরী গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেগুলি জানা থাকলে তাঁর গানগুলিকে থেঁতলাবার যে প্রক্রিয়া অধুনা এক দল লোক চালিয়ে চলেছেন, হয়তো সেটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"**আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে।**···হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে সরিক বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।"

দিলীপ রায়কে তিনি লিখছেন—"তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশ যে ভাবে হয়েছে আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্ব যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্রিত সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ এক হয়ে একান্ত হয়ে মিলিত।"

এবারে তাঁর গানগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবার যে খুসমেজাজী স্বাধীনতা অনেকে নিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন সেটি দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমার গানের বিকৃতি প্রতিদিন আমি এতো শুনেচি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।··ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট্‌পালট্‌ করতে সহজে পারে বলে তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্ম-বুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।"

আশা করা যাক যে তাঁর বেদনা-সিঞ্চিত এই কথাগুলি জানার পরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নিয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিকৃত করবার অপকর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত হবো।

সংগীতের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু এই তাল নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি, গানের প্রাণকে তালের গদাঘাতে হত্যা করবার যে বীভৎস কাণ্ড ওস্তাদী গানের আসরে প্রায়ই চোখে পড়ে সে যে সূক্ষ্মতম রসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দেবে এটা অতি সহজেই ধারণা করা যায়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়া-কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হতে থাকে।..সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে।"

নিছক কৌশল-জানা ওস্তাদদের হাতে পড়ে গান যে সুর ও তালের কসরৎ দেখানোর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেন না রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুরতালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেন না কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

তিনি বলছেন—"রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়।..এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিলতো, গান গাওয়াই যঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পেতো, লড়াইয়ের নয়।"

সব সৃষ্টির মতো গানও সংস্কারের শিকল পরে অচল হয়ে থাকতে পারে না। সংস্কার-বদ্ধ সৃজনীশক্তিহীন ওস্তাদেরা তাঁদের অভ্যস্ত সংস্কারের বাইরে সব কিছুই সন্দেহের চোখে, ভয়ের চোখে, এমন কি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। তবুও নতুন সৃষ্টি হবে, মানুষ সংস্কারের পাষাণ সরিয়ে সৃষ্টির ঝরণাকে বারে বারে মুক্তি দেবে। গানের বেলাও সেই কথা। সংস্কারের এই অত্যাচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরী হলেও নয়।..দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকে সে বড়ো বলে জানে প্রাণকে নয়।"

কিছু লোকের ধারণা যে আমাদের ভারতীয় সংগীত উৎকর্ষের এমন চূড়ায় পেঁাছে গেছে যার পরে আর কোনো শিখর তার চড়বার কিম্বা দখল করবার নেই। সৃষ্টিশক্তিতে দেউলে এই ভীরুদের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলছেন—"মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।"

তাঁর এই সত্যবাণীও স্মরণ রাখা দরকার যে "মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে।"

রবীন্দ্রকাব্যে গৃহধর্মিতা

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাবলী জনসাধারণের অনধিগম্য নহে। কবি স্বয়ং তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা তাঁহার "জীবন-স্মৃতি", "আত্ম-পরিচয়" প্রভৃতি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবির মৃত্যুর পূর্বে ও পরে নানাজনকে লিখিত তাঁহার বহু পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কবির আত্মীয় ও বান্ধবমণ্ডলী কর্তৃক কবি সম্বন্ধীয় বহু পুস্তকও লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত রচনা হইতে প্রাপ্ত সাংসারিক মানুষ রবীন্দ্রনাথের মনোরম ব্যক্তিত্বের পরিচয় তাঁহার কাব্যের মতই পাঠককে মুগ্ধ করে। পাঠক দেখিতে পাইবেন স্রষ্টা ও তত্ত্বদর্শী কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেন না, তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ রূপে কর্তব্যপরায়ণ সাংসারিক মানুষ। স্বামী পিতা আত্মীয় বন্ধু গুরু প্রভৃতি সাংসারিক সম্পর্কের হিসাবেও তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায়—

"Type of the wise, who soar but never roam,
True to kindred points of heaven and home."

গৃহস্থের জীবন ও গার্হস্থ্যধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কখনও হীন চক্ষে দেখেন নাই। সংসার ধর্ম্মকে তিনি কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবীকে লিখিত একটি পত্রাংশ হইতে বুঝা যাইবে, "তোমাদের সংসারটিকে সুধাপাত্রের মত করে, মৃত্যুর পূর্বে আমি একবার গৃহস্থ-ধর্মের অমৃত-রস পান করে যাই—এই আমার মনের লোভ এক এক বার মনকে চেপে ধরে।" (চিঠিপত্র—বিশ্বভারতী ৩য় খণ্ড)

গৃহস্থ-ধর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ রবীন্দ্র-কাব্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র-কন্যার পরস্পরের প্রতি প্রেম, প্রীতি স্নেহ ও ভক্তির আলেখ্য তাঁহার কাব্যের নানাস্থানে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে ও গৃহস্থ জীবনের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা কবির সহানুভূতিপ্রবণ চিত্তে ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে। গৃহ তথা পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের প্রতি কবির এই মমতাকে গৃহধর্মিতা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র কাব্যের এই প্রবণতার সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

"চৈতালি" কাব্যগ্রন্থে পুণ্যের হিসাব নামে একটী কবিতা আছে। কবিতাটীর মর্মার্থ এই যে এক সাধু স্বর্গে গিয়া চিত্রগুপ্তের খাতায় দেখিলেন যে যতদিন তিনি সংসারকে ভালবাসিয়াছেন ততদিন তাঁহার হিসাবে পুণ্য জমা করা হইয়াছে এবং যখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া দেবারাধনায় ব্যস্ত তখন তাঁহার পুণ্যের খাতায় জমার অঙ্ক শূন্য। সাধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলে চিত্রগুপ্ত হাসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন,—"বড় শক্ত বুঝা যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।"

চৈতালির বৈরাগ্য কবিতায় কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে সংসারে থাকিয়া সকলের সাহচর্যে প্রেম ও স্নেহের দান-প্রতিদানে যে পরমার্থ সঞ্চয় হয় গৃহত্যাগ করিয়া তাহা পাওয়া যায় না। দেবতার সন্ধানে গৃহত্যাগকারীর ব্যবহারে বিস্মিত দেবতাকে বলিতে হয়—"হায়, আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়! কবি এখানে বলিয়াছেন,

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ গন্ধময়! প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালিয়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে"

সংসারের প্রতি এই শ্রদ্ধা-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই তিনি বলিয়াছেন,

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত-হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।" —প্রাণ—কড়ি ও কোমল

সৃষ্টির আদিযুগ হইতে নর-নারী পরস্পরের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। বিশেষ এক নারী বিশেষ এক পুরুষের পদপ্রান্তে আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া ধন্য হয়, প্রেম-ধন্য পুরুষ আপনার হৃদয় শোণিতের বিনিময়েও এই দান লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন বিশিষ্ট সমালোচক নর-নারীর এই প্রণয়-লীলাকে "কান্তা-প্রেম" আখ্যা দিয়াছেন। কান্তা-প্রেম পার্থিব তথা গৃহজীবনের এক বিচিত্র মধুর অনুভূতি। রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তৃত আকাশে "কান্তা-প্রেম" চির-ভাস্বর মহিমায় বিরাজিত। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বৈষ্ণব কবিতায় যে লোকোত্তর সৌন্দর্য রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার উৎস কবির ব্যক্তিগত জীবন। বৈষ্ণব-কবি তাঁহার স্বীয় প্রেমিকার চিত্তের তীব্র ব্যাকুলতাই শ্রীরাধার মুখে অর্পণ করিয়াছেন। প্রিয়কে যাহা দেওয়া যায়, তাহা দেবতারও গ্রহণীয়। আমরা দেবতাকে প্রিয়ের সামনে বসাই ও দেবতাকে প্রিয়ের আসন দিয়া থাকি। সহস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন আমাদের প্রিয়জনকে দেবতার সমান মর্যাদা দেওয়ায় দেবতা রুষ্ট হন না, তাঁহার ইহাতেই তৃপ্তি। পার্থিব প্রেম ও প্রীতি তুচ্ছ করিবার নহে, দেবতারাও তাহার মূল্য বোঝেন, ইহাই এখানে কবির বক্তব্য (বৈষ্ণব-কবিতা)। পার্থিব প্রেমের মহিমায় আরও একস্থলে কবি বলিয়াছেন— অতি দীনতম মানুষও তাহার প্রিয়ার হৃদয়ে সম্রাটের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহার সকল দৈন্য ও লজ্জা প্রেয়সীর প্রেমের যাদু-মন্ত্রে দূরীভূত হইয়া যায়, প্রিয়তমা তাহার আপন মানুষের হাত ধরিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্যের নন্দনভূমি অমৃত আলয়ে লইয়া যায়। মুগ্ধ প্রেমিকের মুখ হইতে বাহির হয়—

"সেথা আমি জ্যোতিষ্মান,
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান।
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা।
সেথা মোরে আনিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী।"

গৃহবাসিনী মানবীর এই যে প্রেম, কবির চোখে ইহা স্বর্গের প্রেম হইতেও বড়। স্বর্গে কাহারও জন্য বেদনা নাই যত পাপী-তাপী সকলের জন্যই বেদনা বোধ করে। স্বর্গের অপ্সরীর রূপে মোহ আছে কিন্তু মানবীর ন্যায় সে অনুগতা ও বিশ্বস্তা নহে। মানবী শিশুকাল হইতেই তাহার প্রিয়তমের জন্য নিজেকে গাড়য়া তুলে, তাহার আশাপথ চাহিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখে। মানুষ জানে মর্তে তাহার গৃহ আছে, দুঃখ সুখে ভরা সংসারে তাহার অভ্যর্থনার অভাব হইবে না, এই জন্য মর্তই তাহার প্রিয়, মর্তবাসের জন্যই সে আকুল (স্বর্গ হইতে বিদায়—চিত্রা)। মানস সুন্দরী (সোনার তরী) কবিতায় কবি তাঁহার মানসীকে বলিতেছেন—

"কখনো কি বক্ষভার
নিবিড় বন্ধনে তোমা হৃদয় ঈশ্বরী
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে মধুর
মাধুর্যে তোমার। বাজিবে প্রীত সুখে
পড়িবে তোমার অশ্রু জল; প্রতিকাজে
রবে তব শুভ্র হস্ত দুটী; গৃহ-মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।"

মানস সুন্দরীর বন্দনা রচনা করিতে গিয়া কবি এখানে কোন নৈর্ব্যক্তিক ছবি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, গৃহবাসিনী কল্যাণী বধূর সুষমাময় মূর্তিখানিই তিনি এখানে আঁকিয়া ফেলিয়াছেন। সাকারের মাধ্যমে নিরাকারের উপলব্ধি চেষ্টার মত বিশ্বের কবিতারূপিনীর ধ্যানে বসিয়া কবি "গৃহের বনিতা"কে প্রতিমা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তাই তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

"গৃহের বনিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতা রূপে হয়েছে উদয়।"

তত্ত্বের সহিত ঘটনা মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথ যে কথামূলক কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের ও অন্যান্য সাংসারিক সম্বন্ধের বহু পবিত্র চিত্র আছে। গৃহস্বামীর কর্ম-স্থলে যাত্রা করিবার দিন, ঘরে গৃহিনী বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, প্রবাসে স্বামীর সুখ সুবিধার নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন আর আসন্ন বিদায়ের বেদনায় চক্ষু মুছিতেছেন। বিদায় লইবার সময় চারি বছরের মেয়েটী বিষণ্ণ নয়নে ম্লানমুখে বলিল, "যেতে নাহি দিব"। চাকুরী সর্বস্ব পরাধীন পিতাকে দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্মাহত শিশু কন্যার মূর্তি বুকে লইয়া তবুও যাত্রা করিতে হইল। বাঙ্গালী বধূর কল্যাণী মূর্তি, শিশুকন্যার পিতৃ পরায়ণতা ও বাঙ্গালীর গৃহাসক্তির একটী উজ্জ্বল আলেখ্য কবি অপূর্ব সমবেদনার সহিত এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। অল্পবিস্তর সকল বাঙ্গালীই এই করুণ অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত (যেতে নাহি দিব—সোনার তরী)। পিতার প্রতি কন্যার ও কন্যার প্রতি পিতার পারস্পরিক আকর্ষণের আর একটী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—"শেষচিঠি" কবিতায় (পুনশ্চ)। মাতা কন্যার একাত্মতা বাঙ্গালী মেয়ের সহনশীলতা ও সেবাপরায়ণতার নিখুঁত ছবি "পলাতকা"র নিস্কৃতি কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়।

"বধূ" কবিতায় সদ্য মাতৃক্রোড়বিচ্যুতা পল্লী বালিকার মর্মবেদনাকে কবি অপরূপ

সহানুভূতির সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রাম্য-বালিকা মহানগরীতে বধূরূপে আসিয়াছে, পল্লীর জন্য, মায়ের জন্য তাহার প্রাণ প্রতি নিয়ত হাহাকার করিতেছে। অপরাহ্নে তাহার মনে হয়,—"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল" এই সুরে তাহাকে কে যেন ডাকিতেছে। পাষাণকায়া রাজধানী বিরাট মুঠিতলে ব্যাকুল বালিকাকে যেন চাপিয়া মারিতে চায়— বালিকার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া বলে—

"কোথায় আছ তুমি, কোথায় মাগো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো
উঠিলে নব শশী ছাদের পরে বসি
আর কি রূপ-কথা বলিবি না গো।" (বধূ—মানসী)

"দশের ইচ্ছা বোঝাই কর।" বাঙ্গালী বধূর সুখ দুঃখের ইতিহাসও কবির তীক্ষ্ন দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই (মুক্তি—পলাতকা)।

স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র অথবা মাতা-কন্যার পারস্পরিক আকর্ষণের কারণ সহজবোধ্য। প্রভু ভৃত্যের যে সম্পর্ক তাহাকেও কবি সহজ ছন্দে তাঁহার "পুরাতন ভৃত্য" কবিতায় মহিমময় করিয়া তুলিয়াছেন। ভৃত্য আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অংগ হইলেও ভৃত্যকে লইয়া অপর কোন কবির কাব্য রচিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। প্রভুকে রোগমুক্ত করিতে গিয়া পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার আত্মদানের কাহিনী সাহিত্যে একটী স্থায়ী আসন পাইয়াছে।

পৈত্রিক ভিটার প্রতি, শৈশবের শতস্মৃতি মাখানো বাসভূমির প্রতি কি নিবিড় মমতাই না "দুইবিঘা জমির" মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবি যেন বর্তমানের লক্ষ লক্ষ বাস্তু-হারার বেদনাকে নিম্নের ছত্রকয়টীতে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন,

"ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি।
তবু নিশিদিন ভুলিতে পারিনে সেই দুইবিঘা জমি।
হাটে মাঠে ঘাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো ষোলো।
একদিন শেষে ফিরিবার দেশে বড়োই বাসনা হল।

* * * * * *

নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি।
গঙ্গাতীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্র কানন রাখালের খেলা গেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালো জল নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে।
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জলভরে।

গৃহ লক্ষ বাহু প্রসারিত করিয়া কবিকে বুকে আহ্বান করিয়াছে; গৃহ ও যাহাদের লইয়া গৃহ তাহাদের এই আহ্বানে কবি চিত্ত কখনও সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই।

প্রাচীন বাংলাগানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত

রাজ্যেশ্বর মিত্র

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে আজ একশ বছর হল। এই একশ বছর পরে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বাংলা গানের চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ বছর পূর্বের বাংলাগানের (মানে বাংলা কাব্যসংগীতের) চেহারা কেমন ছিল তা কি আমরা জানি? আমরা তা জানিনে বললে অত্যুক্তি হবে না এবং তার খোঁজ নেবার চেষ্টাও করি নি। আমাদের দেশই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে প্রাচীনের পটভূমিকায় নবীনের প্রতিষ্ঠা দেখতে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেন না, বর্ত্তমানকে আমাদের যতটুকু ভাল লাগে ততটুকু নিয়ে থাকি, তারপরে যাকে একদিন তুলে ধরি তাকেই অনায়াসে ফেলে দিই বিস্মৃতির অতল গর্ভে। এর ফলে আমাদের দেশে কিছুই পাওয়া যায় না, সব তথ্যই ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই প্রাক-রবীন্দ্রযুগের সংগীতের একটা রূপ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। শুধু প্রাক-রবীন্দ্রযুগই বা বলি কেন রবীন্দ্রযুগের সংগীতের যে সব নানাভিমুখী ধারা ছিল আজ তার স্বরূপও তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। রবীন্দ্রসংগীতকে জানতে বা বুঝতে হলে এই পিছনের এবং সমসাময়িক এই দুই ইতিহাসকে জানতে হবে, নইলে রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে শিক্ষা আমাদের পূর্ণ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ বছর আগের কথা—আচ্ছা আরো পঞ্চাশটা বছর যোগ করে দেড়শ করুন। এই দেড়শ বছর আগেকার সংগীত যে কী ছিল তা এখন অনুমান করে নিতে হয়। আমাদের জানা গানের মধ্যে এখনকার প্রচলিত ধ্রুপদের শুধু একটা উল্লেখই পাওয়া যায় দু-একখানা বই-এ। তখনকার ধ্রুপদ ছিল সংস্কৃতঘেঁষা অথবা পুরোপুরি সংস্কৃতই বলতে পারেন আর যে সব গান ছিল তা সেই পুরানো যুগের প্রবন্ধসংগীত। তাদের রূপ যে কিরকম ছিল এখন তা গেয়ে বোঝাবার উপায় নেই। নমুনাস্বরূপ একখানা গান উদ্ধৃত করছি। জয়দেবী প্রভাব তখনও বাংলা গানে খুব প্রকট সেটাও বোঝা যাবে।

জয় জগত বন্দিনী, বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।
শ্যাম মনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্যভয় ভঞ্জিনী, কঞ্জ খঞ্জনমীন গঞ্জি মৃগলোচনী॥
কান্তজিত দামিনী, পরম অভিরামিনী, ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদমর্দিনী।
মঞ্জুমৃদু হাসিনী, ললিতকলভাষিনী ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্ধিনী॥
সভগশৃংগারিণী, নবনববিহারিণী, বৃন্দাবিপিনবিনোদিনী গজগামিনী।
রাসরসরঙ্গিণী, মধুরতরঙ্গিণী, সকলরমণীমণি নরহরি স্বামিনী ।।

ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তথা চিতকতময়ো ছামিক ত্রিগও
তাকতা তা থৈয়া।
সারিরিগম্ পগম মম্মগরি সাস্মাতি অই তেয়া তেয়া
ডে নাং অই ঐ আ।।

রীতিমতো আলাপ বিস্তারের সংগে সর্গম যোগ করে এসব গান গাওয়া হত।

এর অব্যবহিত পরেই এলেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদী ঢঙ আমাদের জানা আছে কিন্তু একে ঠিক কাব্যসঙ্গীতের রূপ বলব না এবং কাব্যসংগীতে রামপ্রসাদী প্রভাবও খুব

বেশী নয়। ভারতচন্দ্র অনেক গান লিখেছিলেন। এ'র জীবিতকাল ১৭০৮ থেকে ১৭৬০ সাল। ভারতচন্দ্রের গানে আধুনিক রীতির স্পর্শ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। এ'র গানগুলি হচ্ছে টপ্পার যুগের গানগুলির অগ্রদূত। যেসব সুরে এবং তালে টপ্পাগুলি গাওয়া হত সেকালে ভারতচন্দ্রের গানেও সেই সব সুর-তাল ব্যবহৃত হয়েছে। গানের ভাষা দেখেও মনে হবে টপ্পায় আগের যুগের ভাষা।

খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী

একি অপরূপ রূপ তরুতলে
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণকালা নানাফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে
তড়িৎ লুটায় পায় ধরার আঁচলে।
কস্তুরী মিশালে মাখি কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে,
ভারত দেখিয়া যারে ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে।

এ'রই অব্যবহিত পরে নিধুবাবুর অভ্যুদয়। বর্তমান কাব্যসঙ্গীতের ইনিই হলেন প্রতিষ্ঠাতা। নিধুবাবুর কাব্য এবং টপ্পারীতির অতিশয় অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে টপ্পার প্রয়োগ ঠিক নিধুবাবুর রীতিকেই অনুসরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের রীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু হিন্দি টপ্পার রীতি গ্রহণ করেন নি—তিনি নিয়েছিলেন নিধুবাবুর প্রবর্তিত টপ্পার রীতি। হিন্দি টপ্পা ভেঙে যে তিনি গান রচনা করেন নি এমন নয় কিন্তু প্রধানত রবীন্দ্রনাথের টপ্পার স্টাইল বা গায়কী বাংলা টপ্পার, হিন্দির নয়। নিধুবাবুর রীতিতে টপ্পার তানে একটা বিশেষ আন্দোলন আছে যা হিন্দি ঢঙে নেই। অনেক সময় একটি সুরে দাঁড়িয়েও টপ্পার কাজ করা হয় নিধুবাবুর কায়দায়। এই সব বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সম্পূর্ণ বর্তমান।

নিধুবাবুর গানে সুরের বাঁধুনি যেমন পাকা তেমনি মনোহর তাঁর কাব্যরচনা।

নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই টপ্পার কিছু রকমফের হয় এবং এর থেকে একটি লঘুভঙ্গীর সৃষ্টি হয় যা খেমটা বা আড় খেমটা চালের গান বলে পরিচিত। এই রকম হবার একটি কারণ আছে। সে যুগে অনেক গান রচিত হতে লাগল যাতে পুরোপুরি টপ্পার প্রয়োগ একটু অতি-মাত্রায় গম্ভীর হয়ে পড়ে। তাই তার সুললিত ছন্দ এবং গতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য টপ্পাকে খানিকটা ভেঙে আনতে হল। এই ঢংটি গোপাল উড়ের যাত্রায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং এর প্রভাব তখনকার গানে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই রীতির উদাহরণস্বরূপ "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া" গানটির উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে এই ধরণের আড় খেমটার প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর বাল্যকালে এই রীতিটার খুবই প্রচলন ছিল। তাঁদের ছেলেবেলার গানের একটা লাইন তিনি লিখেছেন—"বেদেনী এক এলো পাড়াতে সাধের উল্কি পরাতে"—এই সব গানও এই আড় খেমটার ঢঙেই পড়ে। সে সময় এই শ্রেণীর গান অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত লঘু হয়ে গিয়েছিল। সে যুগের অনেক

নামকরা গান এই রীতিতে গাওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" গানটির উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ গান গাইতেন—তাঁর রচনায় এর উল্লেখ আছে। সরলা দেবীর শত-গানে এ গানটির একটি ভিন্ন সুরের স্বরলিপি আছে, কিন্তু সেটি প্রচলিত সুর নয়, তাঁর নিজস্ব সুর। এই আড় খেমটার বিভিন্ন ভঙ্গী ছিল এবং এই সব নানা ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন।

এই ঢঙের সঙ্গে ক্রমেই উচ্চতর কাব্যসঙ্গীতের সংযোগ ঘটে একটি চমৎকার রীতি গড়ে উঠেছিল। রাগসঙ্গীত এবং টপ্পার স্পর্শে এই সব গান অতিশয় মর্মস্পর্শী হত। রবীন্দ্রযুগের প্রাক্কালে এই ধরনের গানের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য,—বিশেষ করে তাঁর "কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভোলে হৃদয় ধনে" বা "নিতান্ত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি" এই ধরণের গানগুলি।

এই সব গানে আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে সেটি হচ্ছে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য। প্রথম দিকে টপ্পার যুগে অন্তরাতেই গান সমাপ্ত হত। তার পরে অন্তরাগুলি সাধারণত পর পর একই সুরে গাওয়া হত—ক্রমে ধীরে ধীরে কাব্যসঙ্গীত যখন নানা বৈচিত্র্য নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে উঠল তখন তাতে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য দেখা দিল। এই ধরণের সুরের যে কি বিপুল প্রভাব রবীন্দ্র-নাথের ওপর পড়েছে তা তাঁর এই রীতিতে রচিত গানগুলি বিচার করলেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্র-নাথের সুরসৃষ্টিতে সঞ্চারী একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। সুর-প্রয়োগে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার প্রমাণ তাঁর প্রত্যেকটি গানের সঞ্চারী।

প্রাচীন বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত এই ভাবেই গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের খেমটাচালের রচনা "ও কেন চুরি করে চায়," "মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে," "হেলা ফেলা সারা বেলা," "আজ তোমারে দেখতে এলেম," "বনে এমন ফুল ফুটেছে," "বুঝি বেলা বহে যায়," "বধূ তোমায় করব রাজা" এবং আরও বহু টপ্পাভঙ্গির গান যখন শুনতে পাই তখন তাঁর আগের যুগের এই ধরনের সুর মনে গুন গুন করে ওঠে। রবীন্দ্র-নাথ বাংলার যে প্রবহমান সঙ্গীতের রসে পরিপুষ্ট তাঁর রচনায় তার স্বাক্ষর অতি মধুর ভাবে রেখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও নবজাগরণ

সোমেন বসু

রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। বাংলা দেশের ইতিহাস এই একশো বছরে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্য, গান, চিত্রকলাকে বহু শতাব্দীর পথ পার করিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণায় যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা নানা প্রদেশের ভারতবাসীর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ করেছে। বহু শতাব্দীর সাধনায় দেশ এমন কবিকে পেয়েছে।

ভাবগত গভীরতার বিচারে রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্র-নাটক, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতির অসীম মূল্য সকলে স্বীকার করেছেন। সে স্বীকৃতি কোন বাহ্যশক্তির প্রভাবে নয়, নিজেদের আন্তরিক তৃপ্তির আনন্দে। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আমরা যথার্থ মূল্য আজও দিতে পারিনি। নানা সংশয়, নানাতর্ক, সন্দেহ জেগে ওঠে। সেটা হলো ভাবনার ক্ষেত্রে, বিচারের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে শুধু আমাদের কল্পনাকে, আমাদের অনুভূতিকেই উচ্চগ্রামে বাঁধেনি, তার মধ্যে যে আমাদের বুদ্ধির মুক্তির বাণীও আছে তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর একদল সমালোচক, যাঁরা নিজেদের সীমা সংকীর্ণ করে নিয়েছেন, তাঁদের রবীন্দ্রচিত্তের এই বিরাট প্রসার ও বিস্তৃতি, এই বলিষ্ঠ মননশীলতা ভাল লাগে নি।

বুদ্ধির মুক্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাধনা। সারাজীবন কত প্রবন্ধ লিখেছেন; কত সামাজিক তর্কে অংশ নিয়েছেন; আর সকলরকমের শাস্ত্র, মন্ত্রোচ্চারণ, আচার বিচার ও অন্ধ বিশ্বাসের জটিল জাল থেকে মনকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, প্রভাত আলোর মত মুক্ত জীবনবোধ তিনি পেয়েছিলেন—তাঁর কাব্যসাধনার উন্মেষ একদিন সকালবেলার সূর্যোদয়ের সঙ্গে। তিনি ছিলেন "সূর্যসনাথ"। সূর্য যার বন্ধু, চিন্তায়, ভাবনায় অনুভূতিতে অন্ধকার তিনি কেমন করে সইবেন। তার শেষ জীবন দেখি নারী চরিত্র আঁকতে গিয়েও তিনি জোর দিচ্ছেন বুদ্ধির উপরে; দেহের রূপ নয়, শুধু অনুভূতি নয়, বুদ্ধিদীপ্ত নায়িকারা তাঁর মন জুড়ে বসেছে।

বাংলাদেশে বুদ্ধির জাগরণ সুরু হয়েছিলো একালে রামমোহন রায়ের সঙ্গে সঙ্গে—সেই জাগরণের সার্থকতম পরিণতি দেখলুম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। বাংলা দেশের এই দেড়শো বছরের ইতিহাস নবজাগরণ বা রেণেসাঁর কাল বলে নির্ধারিত হয়েছে। কত নব নব চিন্তার উন্মেষ, কত বিচিত্র ভাবনার সংঘাত, এই যুগের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তার শেষ নেই। একদিকে নবজাগ্রত বুদ্ধি আর বিচার অন্যদিকে প্রাচীন সামাজিক চিন্তার অনুরক্ত ভক্তের দল—এদের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। সেই ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশে যে রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিল তার ফলে নবাবী শাসনের দাপট শিথিল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে সুরু হলো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন। জীবন, ধন, সম্পদ, সম্মান কোন কিছুরই নিরাপত্তা রইলো না। সৌভাগ্যের দিন ছিল যাদের তাদের ঘুম গেল ছুটে। যে মূল্য ও নীতিবোধের উপর দাঁড়িয়ে ছিল সমাজ তার চিহ্নমাত্র রইলো না। চতুর্দিকের বিভীষিকা ও সন্ত্রাসের মধ্যে বাঙ্গালীর মন আহত পশুর

মত লুকিয়ে বেড়াবার আশ্রয় খুঁজতে লাগলো। তার চিন্তার ক্ষমতা গেল ঘুচে, প্রাণের বাতাস উঠলো বিষাক্ত হয়ে। বিদেশী শাসকদের কাছে কেবলই লাঞ্ছনা আর অপমানের আঘাত জুটতে লাগলো। তখন নিজের বন্ধ দুয়ারের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক অনুশাসনের নিত্যনৈমিত্তিক চর্চাই একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ালো। নানা ধরণের বিকার সেদিনকার অবস্থাসম্পন্ন বাঙ্গালীদের জীবনে দেখা দিতে লাগলো। আভিজাত্যের বনিয়াদ টললেও মেকী আভিজাত্যের বহিরাঙ্গ সৌষ্ঠব সমান দীপ্তিতেই উজ্জ্বল হয়ে রইলো।

ইংরেজ শাসক তখন বণিকের বেশে এসেছে। মানবকল্যাণের কোন ব্রত তার নেই। ঐ যুগের কোম্পানীর ছোট বড় সব ধরণের কর্মকর্তারাই তখন সৎ-অসৎ যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জনে ব্যস্ত। স্বয়ং ক্লাইভ তখন দুহাতে টাকা লুটছেন। তাঁরপরে এসে হেষ্টিংস এই অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপ্ত করলেন। এই বেপরোয়া লুণ্ঠনের জন্য হিংস্র শক্তি, রাজশক্তি কোনটারই প্রয়োগেই বাধা ছিলনা। এমনি একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো যে ভারত-আগত ইংরাজদের মধ্যেও কেউ কেউ তার প্রতি বিরক্তি না জানিয়ে থাকতে পারলেন না ১৭৮৮ সালের জুলাই মাসে লেখা চিঠিতে প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ হেনরী টমাস কোলব্রুক তীব্র ভাষায় এই অবস্থার সমালোচনা করলেন।

শিক্ষা বিস্তারের কোন মহৎ উদ্দেশ্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দেখা গেলনা। স্যার উইলিয়াম জোনসের নেতৃত্বে যে প্রাচ্যবিদ্যাগবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হলো তার প্রতি সরকারের মৌখিক সমর্থন উল্লেখযোগ্য বাস্তব সাহায্যের রূপ নেয়নি। ১৭৮১ সালে কোম্পানীর শাসনের জন্য কেরাণী তৈরী করতে হেষ্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা সুরু করলেন। জোনাথান ডানকান কাশীতে খুললেন সংস্কৃত কলেজ । সাধারণ ভাবে দেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কোন পরিকল্পনাই কোম্পানী সরকারের ছিলনা। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সুরু তারও উদ্দেশ্য কোম্পানীর জন্য "রাইটার" তৈরী করা।

লর্ড মিণ্টো যখন এদেশের গভর্ণর জেনারেল তখন হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্যকে তার দুর্বল অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং য়ুরোপীয়দের কাছে তাকে পরিচিত করার জন্য কিছু ক্ষীণ প্রচেষ্টার উল্লেখ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্ত এই সব প্রচেষ্টার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরও যোগ ছিলনা। কয়েকজন মাত্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ পেয়েছিলেন-তার বেশী কিছু নয়।

শাস্ত্র চর্চা তখন কয়েকটি পুঁথি-পড়া ব্রাহ্মণের একচেটিয়া হয়ে পড়েছে। লোকাচার মুখে মুখে ফিরছে, নিত্য নতুন অনুশাসনে তার কলেবর স্ফীত হচ্ছে। বন্ধ সংস্কারের ঘোলা জল ধর্মাভিমানের অহংকারে আরও দূষিত হয়ে উঠছে। কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারে অনিচ্ছুক, ধর্মসংস্কারের অনিশ্চিত ফলাফলের ঝুঁকি নিয়ে নিজের আধিপত্য বিপন্ন করতে চায়না। এই চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে এলেন নতুন ভারতবর্ষের স্রষ্টা রামমোহন। কি আশ্চর্য চরিত্রের অধিকারী। কি পরিচ্ছন্ন, উদার, মুক্ত দৃষ্টি। সংস্কারের লূতাতন্তু জাল থেকে মন তাঁর স্বভাবতঃই মুক্ত। বিনা বিচারে গুরুবাক্য মেনে চলার ক্লীবত্ব স্পর্শ করেনি। অন্ধ ধর্মোন্মত্ততার বিকার তাঁর স্বভাবকে ভারসাম্যহীনতার কদর্য আকার দিতে পারেনি। জড় বুদ্ধির দিনে, দেশাচার ও ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের প্রতি নির্বিচার আনুগত্যের যুগে বুদ্ধির জাগরণ, যুক্তির অভ্যুদয় হলো রামমোহনের মধ্যে। গত দেড়শো বছর ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে, সমাজসংস্কারে, ধর্মচিন্তায় ও রাজনীতিতে ভারতবর্ষের যে অগ্রগতি দেখেছি তার প্রথম পদক্ষেপ রামমোহনের সাধনায়।

একথা মনে রাখতে হবে যে ইংরাজি শিক্ষাই রামমোহনের মনের মুক্তির কারণ নয়।

ইংরাজি শেখবার আগেই একেশ্বরবাদ নিয়ে তিনি গ্রন্থ লিখেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের চর্চা করতে করতেই তাঁর বুদ্ধির বিকাশ দেখা গেল। স্বার্থসর্বস্ব দ্বন্দ্ব পরায়ণ বাঙ্গালী চিত্তের সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন, তখন বাঙ্গালী দেখলো স্বাধীনতার এক নির্ভীক যোদ্ধাকে। মানব মনের মুক্তি—জড়ত্ব থেকে, অবিদ্যা থেকে, ভয় থেকে গ্লানি থেকে। তার কর্ম জীবনের বৈচিত্র্য প্রমাণ কচ্ছে তাঁর উদার বুদ্ধি ও আশ্চর্য প্রাণশক্তি। সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই, বেদান্ত প্রচারের অদম্য উৎসাহ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আন্দোলন, সাধারণ চাষীর জীবনের অবস্থা প্রকাশ করা, পাশ্চাত্য ধারায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তন—এ সব কিছুই ভারতবর্ষের নব জাগরণের সূচনা।

সংকীর্ণ, অন্ধ, গোঁড়া ও আচ্ছন্ন মনকে তিনিই নাড়া দিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দার্শনিক বেকনের যে ভূমিকা ছিল সে দেশের ইতিহাসে আমাদের দেশে রামমোহনের ভূমিকা তাই—এ কথা কেউ বলেছেন। কিন্তু রামমোহন শুধু বুদ্ধির মুক্তিদাতাই নয়—তিনি তাঁর প্রচণ্ড কর্মের আঘাতে দুদিক থেকে সেদিনকার বাঙ্গালী সমাজকে জাগালেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কর্মী হয়ে ছিলেন তাঁরা যেমন তাঁর উদার জীবনাদর্শের অংশীদার হলেন তেমনি যাঁরা শত্রুতা করলেন তাঁরাও জাগলেন। আঘাত না পেয়ে হিন্দুত্বের অটল অভিমানে যে সমাজপতিরা বুঁদ হয়েছিলেন তাঁরাও আত্মরক্ষার জন্য নড়ে উঠলেন। স্বপক্ষে বিপক্ষে যে ভাবেই হোক রামমোহনের আবির্ভাবের জন্যেই বাঙ্গালী জাগলো এ কথা না মেনে উপায় নেই। হিন্দুধর্মের বহু ঈশ্বরবাদকে তিনি আঘাত করলেন, সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধেও দল ছিলো। তিনি গড়লেন ব্রহ্ম সভা, নেশার-ঘোর-কাটা পণ্ডিতেরা তাঁকে ঠেকাতে শোভাবাজারে রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে গড়লো আত্মীয় সভা। হিন্দু কলেজের সংগঠনে অগ্রণী তিনিই—হিন্দু সমাজপতিরা অভিমানে ঠোঁট ফোলালেন—আমরা ওতে নেই। রামমোহন সরে দাঁড়ালেন।

যে নতুন সভ্যতার সামনে ভারতবর্ষ এসে দাঁড়ালো তাকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখবার নিবুদ্ধিতা তিনিই আমাদের কাটালেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিলনের যে সাধনা তিনি সুরু করলেন সে পথ ধরে আজও আমরা চলেছি। কখনো প্রবল উৎসাহে অন্ধ অনুকরণের মিথ্যা কুহকে ভুলেছি, কখনো ভারতীয়তার উন্নাসিকতায় দূরে সরে থেকেছি। এদুয়ের কি আশ্চর্য সম্মিলন তাঁর মধ্যে দেখলুম। তিনি একদিকে ধরলেন বেদান্ত, গড়লেন বাংলা ভাষা অন্যদিকে বললেন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চাই, চাই আধুনিক কালোপযোগী সংবাদপত্র চাই সর্বধর্মের সমন্বয়। দেশের প্রতি যথার্থ ভালবাসা ছিল, তাই পণখন্ডনের কালিমায় সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করেও "দেশ দেশ" বলে উন্মত্ত হন নি কখনো। তাঁর কাছে বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর সমস্যা যথেষ্ট গুরুত্ব পেলেও তা একান্ত হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রসঙ্গ তাঁর কথায় শেষ করি।

"The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we deeply perceive the liberal principles in politics and religion have been long graduallly, but steadily gaining ground not withstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots."

একদিকে জেগে উঠলেন রামমোহনের সঙ্গীরা—নানা সমাজ সংস্কারের কাজে যারা দুহাত বাড়িয়ে দিলেন অন্য দিকে জাগলো ঘুমিয়ে পড়া হিন্দুসমাজ। ব্রহ্ম সভা তীক্ষ্ন আক্রমণের কেন্দ্র হলো, পণ্ডিতের দল রামমোহনের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। এই জাগরণকে বলতে পারি

বুদ্ধির বিরুদ্ধে সনাতনী গোঁড়ামীর জাগরণ। তবু যে গোড়ামী অভ্যাসের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছিল তাকে বাঁচবার জন্য যুক্তি খুঁজতে হলো। সেই যুক্তি খুঁজতে গিয়ে নূতন প্রবাহের সঙ্গে কিছুটা আপোষ না করে উপায় রইলো না। রাধাকান্ত দেব পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন করলেন, যদিও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে তিনি একজন স্বাক্ষরকারী ছিলেন।

এ কথা মানতেই হবে রাধাকান্ত দেব ব্যক্তি হিসাবে মহৎ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কোন হীন কর্মের অভিযোগ ইতিহাসে কোথাও নেই। রামমোহনের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কতদূর গিয়েছিল তা রাধাকান্ত দেবকে দিয়ে সম্পূর্ণ বোঝবার উপায় নেই। তিনি ভদ্র ছিলেন, সুশিক্ষিত ছিলেন, গোঁড়া হলেও নীচু নজরের লোক ছিলেন না। তখন রামমোহনের নামে গান লিখে, তাঁর গাড়িতে কাদা ছুঁড়ে, তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করে হিন্দু সমাজ পতিরা নিজেদের দুর্বলতা আর চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর ভক্তদের অনেক ক্ষেত্রেই সমাজচ্যুত হতে হলো। বলা বাহুল্য এই নতুন করে বুদ্ধির জাগরণ তাঁদের খুব ভাল লাগেনি।

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের। যে ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের জন্য রামমোহন চেষ্টা করেছিলেন, সেই শিক্ষার প্রথম প্রত্যক্ষ ফল 'ইয়ং বেঙ্গল'। হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়া, ব্রাহ্মণ হলে পৈতে ছিড়ে ফেলা হিন্দু শাস্ত্রে প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধা জানানোর উন্মাদনা এই দলের যুবকদের পেয়ে বসলো। ভাঙ্গবার মন্ত্র তাদের একমাত্র মন্ত্র। সেই সঙ্গে সঙ্গে গড়বার কিছু ছিল না। যে উৎসাহ যে উন্মাদনা নিয়ে যা কিছু হিন্দু তারই বিরুদ্ধে তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন, তার কোন বুদ্ধি বা বিচার গত ভূমিকা ছিল না। কিছুদিনের জন্যে বাংলার সামাজিক আকাশ তাঁদের 'যুদ্ধং দেহি' রবে উদ্বেল হয়ে উঠলো। রাজা রামমোহনও সে আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার পেলেন না—তিনিও 'আপোষকামী' অভিযোগে চিহ্নিত হলেন।

রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা যেমন রামমোহনের আবির্ভাবের এক প্রতিক্রিয়া। তেমনি ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলও আর এক প্রান্তের প্রতিক্রিয়া। স্বাধীন চিন্তার ধ্বজা তুলেই তাঁরা হিন্দু সমাজকে আঘাত করেছিলেন, কিন্তু উৎসাহের আধিক্যে এও আর একধরণের উন্মত্ততার সৃষ্টি করলো। বাংলার ইতিহাসে প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভাব হয়েও কোন বলিষ্ঠ চিন্তা, কোন স্বচ্ছ যুক্তিবাদের অবতারণা না করেই ইয়ং বেঙ্গল দল ফুরিয়ে গেল। ঐতিহাসিকের ভাষায় "they faded out like a generation without fathers and children."

ইতিমধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ধোঁয়াটে একটা জাতীয়তার কথা কারো কারো মনের আনাচে কানাচে ফিরতে লাগলো। হিন্দু প্রতিক্রিয়ার প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্ত বল্লেন "স্বদেশের কুকুর ধরিব বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" আমার দেশ-এ অনুভূতির অঙ্কুর দেখা গেল যার প্রবাহ এক-টানা রঙ্গলাল থেকে উদ্গত হয়ে হেম-নবীনের মধ্য দিয়ে বিংশশতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত চলে এসেছে। এটাও হিন্দু প্রতিক্রিয়ার অঙ্গ। আমাদের দেশের লোকাচার পর্যন্ত সবই ভাল কেন বিদেশীদের নকল করবো—এই যুক্তির খড়্গ তখন সংস্কারবিরোধি হিন্দু নেতাদের প্রধান অস্ত্র। রামমোহন কখনো বলেন নি হিন্দুর সব খারাপ, বিলেতি জীবনের সব ভাল। তিনি দাঁড়িয়েছিলেন মূলতঃ বেদান্তের ভিত্তিতে। কিন্তু এই স্বদেশীয়ানার প্রতিক্রিয়া এলো ইয়ং বেঙ্গলের আত্যন্তিক সাহেবিয়ানার ফলেই।

এমন সময় যিনি এলেন তিনি বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে বুদ্ধির দ্বিতীয় মুক্তি-দাতা। তিনি ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত পণ্ডিত, গোঁড়া পরিবারের সন্তান,—তিনি বিদ্যাসাগর। এই আর একটি মুক্তমন দেখলুম যাকে হিন্দুয়ানীর অভিমান আচ্ছন্ন করতে পারেনি, বিকৃত সংকীর্ণ

জাতীয়তা যাঁর চরিত্রে কোন সুযোগেই প্রবেশ পথ পায়নি। ভগবৎবিশ্বাসের কোন স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর জীবনে নেই। ইংরেজী শেখবার পর প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিলনের মহৎ সাধনায় তিনিও রামমোহনের মত ব্রতী হলেন। দেশের প্রশংসায় ইনিয়ে বিনিয়ে স্তুতিকথা রচনা করেন নি তিনি। পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির তীব্র আঘাতে তিনি দেশের যা কুৎসিত, যা কদর্য তাকেই আক্রমণ করেছেন এবং সেই কর্মের দ্বারাই তাঁর দেশপ্রেম তাঁর জীবনেও জাতির ইতিহাসে সত্য হয়েছে। বিচারের দ্বারা যা করেছেন তাকে কোন শাস্ত্রবাক্যের কাছে বিকিয়ে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা, অব্রাহ্মণদের জন্যে সংস্কৃত কলেজের দ্বার উদ্ঘাটন, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁর ভূমিকা বুঝতে সাহায্য করে। দেশাচারের প্রতি তাঁর তীব্র আক্রমণ বাংলা সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠকদের অজানা নেই।

হিন্দু প্রতিক্রিয়া আবার ঘর সামলাতে নড়ে বসলো। রাজা রাধাকান্ত দেব ছত্রিশ হাজার লোকের সই-সবুদ সমেত যে আবেদন পাঠালেন তাতে স্পষ্টই বল্লেন যে স্বাক্ষরকারীদের 'চলতি আইন ও দেশাচার মানতে দেওয়া হোক'। পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি আর একটা আবেদন পাঠালেন তাতে বলা হলো "স্বাক্ষরকারীরা সরকারের অনুগত।....বাপমার কাছে ছেলেমেয়েরা যেমন প্রশ্রয় পায় তেমনি আমরা অনারেবল কোম্পানীর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।" যুক্তির বিরুদ্ধে পাওয়া গেল গতানুগতিকতার অযৌক্তিক সমর্থন আর কচি খোকাদের ছিঁচকাদুনী আব্দার।

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের দাপটে বিদ্যাসাগর যখন তার বিরুদ্ধবাদীদের একলাই ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীরা তাঁর প্রগতিশীল কর্মধারায় নানাভাবে হাত লাগিয়েছে। লেখাপড়া জানা কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ করেছে, পথে পথে বেড়ানো কবিয়াল দাশরথী রায় 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর লিখেছে। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেদিন বাংলা দেশে একটি লোকও ছিলনা যে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না জানিয়ে থাকতে পেরেছে। বুদ্ধির দ্বারা, চরিত্র-বলের দ্বারা, কর্মক্ষমতার দ্বারা বিদ্যাসাগর মনের মুক্তির পথে দেশকে অনেক এগিয়ে দিলেন।

হিন্দু প্রতিক্রিয়া যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে তখন এক অমিত শক্তিশালী, আশ্চর্য প্রতিভাধর পুরুষ তার নেতৃত্বের হাল ধরলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থী, জড়ত্বগ্রস্ত আলসে হিন্দু সমাজে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। তাঁর ছিল মনীষা, ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, ছিল দিগন্তে ছোঁওয়া কল্পনা আর ছিল তীব্র শক্তিশালিনী লেখনী। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে ছিল পরিচয়, গভীর অনুরাগ ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যে। দেশাত্মবোধের আবছা ধারণা হঠাৎ তাঁর কল্পনার স্পর্শে স্পষ্ট রূপ লাভ করলো। জাতীয়তার আন্দোলনে তাঁর উপন্যাস তাঁর গান পবিত্র গ্রন্থ, পবিত্র মন্ত্রের মর্যাদা পেলো। প্রাচীন গৌরব কাহিনী তাঁর লেখায় সজীব হয়ে উঠলো। এই তীব্র জাতীয়তাবাদ এই হিন্দুপ্রতিক্রিয়ার নবতম অবদান। সনাতনীদের মত এ শুধু শাস্ত্র আঁকড়ে বসে থাকা নয়, এ আশ্চর্য এক গতিশীল শক্তি যার প্রভাবে বাংলার ইতিহাস একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। হিন্দু ধর্মকে তিনি তাঁর কল্পনা অনুযায়ী নতুন রূপে সাজাতে লাগলেন। বহু জিনিষকে তিনি হিন্দু ধর্মের অংশ বলে মানলেন না—কৃষ্ণকে তাঁর কল্পনা দিয়ে আদর্শ মানুষ করে তুললেন।

কিন্তু হিন্দু প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বদলালেও বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মত যুক্তি-মার্গের পথিক নন। বুদ্ধির মুক্তি আনার যেটুকু সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল তা তাঁর অত্যধিক জাতীয়তাবোধ ও হিন্দুত্বের মোহে নষ্ট হয়েছে। বিধবা বিবাহ তিনি সমর্থন করেন নি, অবতার তত্ত্ব স্থাপনে তিনি অত্যন্ত উৎসুক, দেশমাতৃকার পুজার মন্ত্রে মন সীমিত—বিদেশের বাণীর আর স্থান নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে জড়বাদী বলে—মেটিরিয়াল প্রস্পারিটির অধিষ্ঠান-ভূমি বলে তিনি

ব্যঙ্গ করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুত্বের গর্বে আত্মহারা হয়েছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সমন্বয়ের উদার দৃষ্টি তাঁর কাছে বেশী প্রশ্রয় পায় নি। মেকলে যেমন বলেছিলেন কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থে যা আছে সারা প্রাচ্য সাহিত্যে তা নেই বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি বল্লেন

"Search through all the vaunted literature of Europe, rich as she is in literary treasures and find we something which is equal to the Hindu legend of Dhruba, of Prahlad, of Savitri, the wife of Satyaban, of Harishchandra."

মেকলের উক্তি আর বঙ্কিমের উক্তি একই সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ থেকে জাত। এর জন্ম ভাবে, ভাবনায় নয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই জাতীয়তাবোধ ইংরেজের দান—য়ুরোপীয় সভ্যতার ছাঁচেই একে আমরা পেয়েছি। সেদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাব য়ুরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। 'আমার দেশ'—এই অহংকার যখন বেড়ে ওঠে তখন আমার দেশের খারাপটাকেও আর খারাপ বলে মনে হয় না। সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ নিত্য দেখা গেছে। সেই দৃষ্টি-ভঙ্গির ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুসমাজরক্ষাকে তার অর্থহীন বহু রীতি নীতি রক্ষাকে কর্তব্য বলে মনে করেছেন। সংস্কার মুক্ত, স্বচ্ছ বুদ্ধি নিষিক্ত প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে যোগ ঘটলো না তাই। অসীম ক্ষমতা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি বুদ্ধির-জাগরণ-বিরোধী হিন্দু প্রতিক্রিয়ার নেতাই রইলেন।

তাঁর অনুসরণে আর যারা এলেন চরিত্রবলে নমস্য হলেও বুদ্ধির অগ্রগতি তাঁদের হাতে ঘটেনি। আরও তীব্র হলো স্বাজাত্যাভিমান ভূদেবের রচনায়। শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুদের নানা আচার বিচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাতড়াতে লাগলেন। চন্দ্রনাথ জাতিভেদের পক্ষে প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিমকে মুগ্ধ করে দিলেন। তাঁর আত্মকথায় তিনি বলেছেন যে বঙ্কিম নাকি তাঁর প্রবন্ধ পড়ে জাতিভেদে পুনর্বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তবে এই সব নেতাদের না ছিল কল্পনার শক্তি না ছিল চিন্তার শক্তি।

ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অতিরিক্ত ভণিতা না করেই বলছি আমি তাঁকে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা বলে মনে করি। ধর্মের সাধনায়, রাজনীতির প্রসঙ্গে, সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি কোন গুরুর প্রতি অন্ধ আনুগত্যে আচ্ছন্ন ছিলনা—সে গুরু 'হিন্দুধর্ম'ই হোক, আমাদের দেশই হোক, কোন শাস্ত্রবচন'ই হোক আর কোন ব্যক্তিই হোক। সুদীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্যজীবনে নানা মত, নানা মন্তব্য, নানা ধারণা তাঁর রচনায় আমরা পেয়েছি। তারা অনেক সময় সঙ্গতি রক্ষা করেনি, এমন কি অনবধান পঠনে তাদের পরস্পরবিরোধী বলেও মনে হতে পারে। তিনি জীবনকে প্রবাহ বলে জানতেন, জানতেন তা স্থির নয়। চলতে চলতে অভিজ্ঞতার বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মত বদলায়—আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যে হয়ে যায়। আজ যা নিয়ে তর্ক, যার জন্য প্রাণপণ আন্দোলন কাল নিতান্ত তুচ্ছ, অর্থহীন, অর্ধ রাত্রের প্রলাপ মনে হয়। কোন ধর্ম মত স্থির হয়ে প্রাচীর তোলেনি তাঁর মনের মধ্যে। একদা তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। কত পরিশ্রম, কত সময় ব্যয় করেছেন। শেষে যেদিন মনে হল আদি ব্রাহ্ম সমাজের আর জীবনের সঙ্গে যোগ নেই তখন নির্মমভাবে বলেছেন "একটা পরিবারের কোমরের সঙ্গে টাকার শৃঙ্খলে বাঁধা আদি ব্রাহ্ম সমাজ একটা প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা। আর কিছুকাল পরে স্বয়ং কটিটাই অন্তর্ধান করবে, আর যিনি বন্দী ছিলেন তাঁরও ঠিকানা পাওয়া যাবে না। কেবল শিকলটা ঝমঝম করবে। প্রথা জিনিষটা যেখানে সত্যকে বিদ্রূপ করে সেখানে সেই প্রথার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। শান্তি-নিকেতনের তাই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের

বাড়ীতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড় লজ্জা দেয়।"

এই একটি ঘটনার উল্লেখ থেকে এই সত্যই পাই যে মনের দিক থেকে যা আপনতম তাকেও ত্যাগ করবার, সমালোচনা করবার মত নিরাসক্ত, শান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত মনের তিনি ছিলেন অধিকারী। তাই দেশকে যত ভালবেসেছেন ততই নিষ্করুণ সমালোচনা করেছেন তার ত্রুটির তার দুর্বলতার, তার সংস্কারের। অথচ অনুকরণের বিরুদ্ধে তাঁর চেয়ে প্রবল সংগ্রাম কে করেছে। প্রাচীন জাতির আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন, অথচ প্রাচীনতার দোহাই দিয়ে বর্তমানের নিষ্ক্রিয় আধ্যাত্মিকতার ভণ্ডামীকে তিনি তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা বয়সে নানা মতামত তিনি প্রকাশ করেছেন—একটা মতকে দেবতা বানিয়ে আঁকড়ে থাকেন নি কখনো। য়ুরোপ সম্বন্ধে তাঁর ছিল বিরক্তি, আবার যখন ইংরাজকে ভাল করে জানলেন তখন য়ুরোপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপোষণ করতে দ্বিধা করেন নি।

অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে মনকে মুক্ত করবার কথা তিনি বরাবর বলছেন। এখানে তিনি রামমোহন-বিদ্যাসাগরের উত্তর সাধক। রাজনৈতিক মুক্তির চেয়ে মনের মুক্তিকে তিনি কম মূল্য দেননি। তাঁর সম্বন্ধে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "That Rabindranath very largely discredited mere traditional opinions, however holy they might be, is evident from his scathing criticisms of the traditional forms of Hinduism in which customary beliefs and scriptural texts had supplanted independent thinking. Rabindranath in all his criticisms of current Hindu society carries the red banner of a rational revolution. He is the most eloquent advocate of free rationalism."

বাংলাদেশের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে পরবশ হয়ে পড়েছে বলেই তার শক্তি লোপ পেয়েছে। তা নিজেকে জাগ্রত করতে পারেনি বলেই বাইরের যে কোন প্রভাব অতি সহজে তার উপরে ছাপ ফেলে। তিনি দুদিক থেকেই দেখিয়েছেন—ইউরোপ কেমন অতি সহজে চোখ ধাঁধিয়েছে আবার প্রাচীনতার মোহ কেমন করে আমাদের বুদ্ধিলোপ ঘটিয়েছে। এই দুমুখো বিপদের কথা তিনি বার বার বলেছেন। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (১৯০১) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন "কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে যোগসাধন করে না—বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরেজ যাহা পরে, যাহা খায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে"....তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপর নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে।....আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই-আমরা যদি কেবল তাহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শনের দাঁড় পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য।" এই ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ের প্রতি আমাদের দল বিশেষের আনুগত্য যে কল্যাণজনক নয় একথা তিনি বার বার বলেছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের আকর্ষণের মধ্যে যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ শুধু তা নিজে রক্ষা করলেন তাই নয় এ প্রসঙ্গে দেশবাসীকে সজাগ করবার চেষ্টা ক্রমাগতই করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের নেতাদের মধ্যে যে কর্মচঞ্চলতা দেখা যেতে লাগলো এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ যুক্তির দ্বারা ঘটনার গতির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন; আজকের দিনের সমাজ বিজ্ঞানের বিচারও ঐ একই কথা বলবে। তিনি বলছেন "ইংরেজের আগমনে যখন জ্ঞানের বন্ধন মুক্তি হইল,

যখন সকল মনুষ্যই মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হইল, তখনই ব্রাহ্মণধর্মের মূর্ছাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রাহ্মণ শূদ্রে সকলে মিলিয়া হিন্দুজাতির অন্তর্নিহিত আদর্শের বিশুদ্ধ মূর্তি দেখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শূদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই ব্রাহ্মণধর্মও জাগিবার উপক্রম করিতেছে।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা) বস্তুতঃ সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে হিন্দু-ধর্মের গতিশীলতা যখন জড়ীভূত নিদ্রার ঘোরে স্তিমিত হয়ে শেষে একেবারেই অনড় অচল স্থৈর্য লাভ করলো তখন নানা আবর্জনার স্তূপ জমে উঠলো তারই চার পাশে। স্বদেশীয়ানার গোঁড়ামীতে তারও জয়গান সুরু হলো-রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কথার তীক্ষ্ম সমালোচনা করে বলছেন "আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্তিস্তম্ভ নহে—ইহার অনেক-ছাই সুদীর্ঘকালের যত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেক সময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলির স্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব করি।"

চিন্তার স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবের অঙ্গ বলে মনে করতেন। দল বেঁধে মতবাদ প্রচারের তিনি বিরুদ্ধে। মনের স্বকীয়তা অনেক সময় দলগত উন্মাদনার চাপে চাপা পড়ে—"দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক, তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। "গোলে হরিবোল" ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। এই কারণেই ভক্তির প্রমত্ততা তিনি পছন্দ করেন নি। তাতে বুদ্ধিকে জড় করে দেয়। তাই 'নৈবেদ্য' কাব্যে বলেছেন 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে'—তা তার কাম্য নয়। নানা কৃত্রিম জড়তার প্রতি আমাদের ভক্তি দিনে দিনে বেড়ে চলে। তখন বুদ্ধি খাটানো নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। সমাজে তখন সত্যপরায়ণ লোকের চেয়ে নিত্য-গঙ্গাস্নানরত লোকের দাম যায় বেড়ে।

এই ভক্তিমার্গ ভারতবর্ষে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে সময় সময়। ভক্তির নির্বিচার প্রাবল্য থেকেই আসে মানসিক জড়তা। তখন বস্তুর বিচার তুচ্ছ হয়ে পড়ে যে কোন উপায়ে ভক্তি জানা-বার ব্যগ্রতাই প্রবল হয়ে ওঠে। মানসিক মুক্তির প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক এই ভক্তির বেসামাল আতিশয্য। যে মন চিন্তা করে তার সুনিশ্চিৎ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ঘটিয়ে তবে এই ভক্তির অভিযান। অযোগ্য ভক্তি' প্রবন্ধে তিনি এই যাকে তাকে ভক্তি করার ব্যগ্রতাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন, বলেছেন বুদ্ধিবিচার না থাকলে ভক্তির কোন যথার্থ সার্থকতা নেই। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন যা উল্লেখযোগ্য—"জিজ্ঞাসাবৃত্তির পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা—আমাদের দেশে আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যাগ্র হই।—যে মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিনা, যে পুরো-হিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ জানেনা তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও কুন্ঠাবোধ হয়না—এস্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে কেন পূজা করি। তাহার এক উত্তর এই যে অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ মনের জড়ত্ববশতঃ।"

এই ধরণের অজস্র উদ্ধৃতির দ্বারা দেখানো যেতে পারে আচার, ব্যবহার ও অভ্যাসের জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেবার বাণী তিনি সারা জীবন প্রচার করেছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের মুক্তির আন্দোলন যাঁরা করেছেন, যাঁরা নিশ্চল অকর্মণ্যতাকে আধ্যাত্মিকতা না বলে, আধুনিক জগতকে গ্রহণ কববার বাণী এনেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শ্রেষ্ঠতম। মনের মুক্তি-সংগ্রাম শুরু করে তিনি

আমাদের অন্যান্য সকল মুক্তির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। তাই যে অর্থে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা নেতা তার চেয়ে অনেক বড় অর্থে তাঁর নেতৃত্ব। তিনি মানুষের নেতা; মানবচিত্তকে স্বাধীন করার নেতা—স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস বাংলা দেশে বুদ্ধির জাগরণের ইতিহাস। তারই নেতৃত্ব ছিল রামমোহন-বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়েছিল—আহত হিন্দু সমাজ নিজের কলুষ ও গ্লানিকে আঁকড়ে ধরে আধ্যাত্মিকতার ভান করতে লাগলো। যা বহিরাগত ভালো তাকে গ্রহণ না করার জেহাদ ঘোষণা করতে লাগলো। এই অবস্থায় একে ধর্মের সম্মান না দিয়ে একটা সামাজিক বিকার বলা যেতে পারে—"এই বহু দেবদেবী' বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধ লোকাচার সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।—আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অন্ধ সংস্কারে শাখা পল্লবিত হইয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সর্বসাধারণ মানবজাতির রাজপথকে আমাদের নিকট হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছে।"

(প্রসঙ্গ কথা)

এ ধরণের একটা বিদ্বেষপ্রসূত অভিযোগ আছে যে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম পরিবেশের প্রতি অনুরক্ত বলেই হিন্দুসমাজের পরে তাঁর এত আক্রমণ। যে মুক্তির জন্য তাঁর সাধনা তার কণা-মাত্রও যে আমাদের সমাজপতিদের গোঁড়ামীকে টলাতে পারেনি এ অভিযোগ তারই প্রমাণ। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজকেও তীব্র আঘাত করেছিলেন তা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে উদ্ধৃত করেছি। কোন গোষ্ঠীগত ধর্মাচরণে যে তাঁর আসক্তি ছিলনা তার প্রমাণ তো তাঁর সারা জীবনের রচনায় ছড়িয়ে আছে। হিন্দুধর্মের যেটুকু ভাল মনে করেছেন, মনের উপলব্ধির সঙ্গে মেলাতে পেরে-ছেন সেগুলির ব্যাখ্যা তাঁর চেয়ে বেশী কে করেছে।

শিক্ষার জগতেও তিনি বিদ্রোহী। ঘরের পাঁচীল ভেঙ্গে মুক্ত অঙ্গনে ছাত্রদের মুক্তি দেবার তিনি পক্ষপাতী—শুধু কথায় নয় কাজেও। রাজনীতির জগতেও তাঁর চলাফেরা ঐ স্বকীয় বুদ্ধির বিচারমার্গেই। কোন দল, কোন মত, কোন ব্যক্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। নেশন বা ঐ জাতীয় কোন ধারণাকে তিনিই প্রথম যথার্থ য়ুরোপীয় চিন্তার ফলস্বরূপ হিসাবে দেখলেন। ইতিপূর্বে দেখা গেছে য়ুরোপীয় নেশনালিজমের যে যতবড় ভক্ত সেই তত ইউরোপ-বিদ্বেষী। এই আশ্চর্য চিন্তার-বিরোধকে তিনিই প্রথম কাটিয়ে উঠলেন। তিনি ইউরোপের অনেক ভাল জিনিষের প্রতি আন্তরিক প্রণাম জানিয়েছেন আবার তিনিই ইউরোপের ন্যাশনালিজমের বিষময় পরিণতির তীব্রতম সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম ভাগেই হিন্দুসমাজে আর এক প্রচন্ড শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হয়েছিল যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের চমক দিয়ে আসমুদ্র হিমাচলের হিন্দুসমাজকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যকে অবহেলা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু তাই নয় হিন্দুধর্মের আচারগত বহু ত্রুটি ও দুর্বলতাকেও তিনি তীব্র আক্রমণ করলেন। সে রকম নির্মম বিশ্লেষণ অনেক হিন্দুধর্মদ্বেষীর পক্ষেও করা সম্ভব হতোনা। এই মহান নেতা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়েও এ কথা না বলে পারিনা যে এত বীর্য, এত উদারতা, এত সাহস সব ঠেকে গেল একটা কথায় এসে তা হলো এই যে বেদ অভ্রান্ত, গুরুকে মানতেই হবে নইলে মুক্তি নেই, গুরু ছাড়া পথ নেই। এই সব কথা তাঁর জীবনব্যাপী সকল আলোচনার মূলে আছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে আমাদের কিছুতেই জড়বাদী করবেনা এছিল তাঁর

স্থির বিশ্বাস কারণ আধ্যাত্মিকতা যে আমাদের রক্তে। হিন্দুদের কতকগুলি ধারণা আছে যা অন্তর্দৃষ্টির মত। যা কিছুতেই বদলাবার নয়। যেমন তিনি বলছেন ঃ—

"What is in this life? You are Hindus and there is instinctive belief in you that life is eternal. Sometimes I have young men come and talk to me about atheism; I do not believe a Hindu can become an atheist. He may read European books and persuade himself he is a materialist, but it is only for a time. It is not in your blood." (The Future of India).

আহৃত জ্ঞান নয় রক্তের সঙ্গে লেগে থাকা হিন্দু সংস্কারই তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত বড়ো হলো। সাধারণ মানুষের মুক্তির কথা তিনি বলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনকে অন্ধবিশ্বাসের শেষ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারেন নি। বিবেকানন্দের চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু তাঁর জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তাঁর যে মূলগত পার্থক্য ছিল তার সেটী কি ধরণের পার্থক্য তাও রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ঃ—

"As far as I can make out Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life .... We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude toward truth is different. Truth cannot afford to be tolerant where it faces positive evil; it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible." (Conversations with Romain Rolland).

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা, বুদ্ধি ও মননের যে জাগরণ বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে বহুদিনের নিদ্রাচ্ছন্নতার গ্লানি থেকে উদ্ধার করলো তার চরম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। ভাব ও ভাবনার দিক থেকে তিনি এ যুগের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। আর বোধহয় সেইজন্যেই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর অনেক ভক্ত ও অনুরাগী থাকলেও দলগত মাতামাতি তাঁকে নিয়ে সুবিধে হয় নি। মানব চিত্তের যারা সাধক তাঁরা চিরদিনই একা। তাঁর অনুরাগী আমি তাঁকে গুরুদেব বলে মানি। তিনি নানাদিক থেকে আমার বুদ্ধিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়েছেন কিন্তু আচ্ছন্ন করেন নি। তাঁকে অভ্রান্ত বলে মানবার শিক্ষা তিনি দেননি, সেইখানেই তাঁর সঙ্গে অন্য সব বুদ্ধি-মাড়িয়ে দেওয়া মনের আলো নেভানো গুরুদের তফাৎ।

রবীন্দ্রনাথ কি ন্যাশানালিস্ট ?

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলস মন কোনো কিছুকে তলিয়ে দেখতে চায় না। হাতের কাছে যা কিছু এসে জোটে তাকে ব্যবহার করেই সে খুসি। সকলে যখন একটি জিনিসকে এই ভাবে ব্যবহার করছে তখন আমিই বা করবো না কেন— এই হচ্ছে অলস জড় মনের যুক্তি। যেমন কাঁদুনে গ্যাস কথাটি সংবাদপত্রের অতি বিজ্ঞ সম্পাদকদের দৌলতে বাংলা দেশে চালু হয়ে গেলো। অনেক লোককে শুধিয়েছি যে এই হাস্যকর ভুলটা কি করে চলতি রয়েছে। গ্যাসটাতো কাঁদে না, গ্যাসটা কাঁদায়। অতএব কাঁদুনে গ্যাস না হয়ে ওটাকে কাঁদানো গ্যাস, কিম্বা একটু কবিত্ব করতে ইচ্ছে থাকলে কাঁদানিয়া গ্যাসও বলা যেতে পারে। কিন্তু অলস মন পেয়েছে একটা কথা আর তাও আবার দোর্দণ্ডপ্রতাপ দৈনিক পত্রিকাগুলির অতি বিজ্ঞ সম্পাদকদের কাছ থেকে! অতএব সে কথা নিয়ে অত বিচার করবার প্রয়োজন কি? তাই এই হাস্যকর ভুল শব্দ প্রয়োগটি নির্বিবাদে চর্বণ করে চলেছে দেশের লোক।

এক্ষেত্রে এটার ফল কৌতুকজনক, কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে একটি শব্দের প্রয়োগ একটি ব্যক্তিকে কিম্বা একটি বস্তুকে বিকৃত করে দেখায়, ব্যক্তির কিম্বা বস্তুর সত্তার মিথ্যা পরিচয় দিয়ে দেয় সকলের কাছে।

এমনি একটি কথা হচ্ছে 'ন্যাশানালিষ্ট' আর এমনি একটি মানসিক বিকারের পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথকে 'ন্যাশানালিষ্ট' বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টায়।

একটি কথার অর্থকে সর্বার্থক করবার চেষ্টাও অলস বুদ্ধির অন্যতম লক্ষণ। তাই 'ন্যাশানালিজম' ও 'ন্যাশানালিষ্ট' এই কথা দুটির মানে আগে পরিস্কার করে নেওয়া দরকার।

ন্যাশানালিজম্ মানে স্বদেশপ্রীতি নয়, ন্যাশানালিষ্ট বলতে বোঝায় না সেই ব্যক্তিকে যে দেশকে ভালোবাসে। 'ন্যাশানালিজম্'এর অর্থ হচ্ছে নিজের দেশকে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে সেরা বলে গণ্য করার মতবাদ আর 'ন্যাশানালিষ্ট' হচ্ছে সেই লোক যে এই মতবাদের সমর্থক।

এই মতবাদের সমর্থক যারা তাদের মতে একমাত্র তাদেরই দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া সম্ভব এই পৃথিবীতে যা কিছু মহোত্তম ও সর্বোত্তম।

এই শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে তাদের নিজেদের দেশের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক আওতায় আনবার তাদের নৈতিক অধিকার আছে এই দাবীও ন্যাশানা-লিজমের পূজারীরা করে থাকে। নিজের দেশের ভৌগোলিক অপদেবতার পূজো ও সেই পূজোয় অন্য দেশের মানুষদের বলি দেওয়া এইটেই হচ্ছে ন্যাশানালিজমের আসল অর্থ। ক্যাপিটালিজমের উদ্ভবের সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ন্যাশানালিজমের মতবাদের উদ্ভব হয় ইয়োরোপে। তারপর ক্যাপিটালিজমের পুষ্টি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে এই ন্যাশানালিজম দুর্বল দেশ-গুলিকে দখল করে তাদের সব রস নিঙড়ে নেবার কাজে লেগে গেলো। সাম্রাজ্যবাদের প্রাণের রস হোলো ন্যাশানালিজম। এই কারণেই ন্যাশানালিজমকে স্বদেশপ্রীতির প্রতিশব্দ করে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করলে খুবই ভুল করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভালোবাসতেন, এই নিষ্প্রয়োজন বাচালতার দরকার আছে কি? রাজ-

নীতিব্যবসায়ীদের চেয়ে তিনি অনেক বেশী ভালোবাসতেন ভারতবর্ষকে। তবে তাঁর সেই ভালোবাসাকে, ভারতবর্ষের সত্য-সাধনার উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে কি ন্যাশানালিজম-মার্কা দেশ-প্রেম বলা যেতে পারে? আমার মতে সেটা কখনো বলা চলে না। স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন কিন্তু তখনও 'ন্যাশানালিষ্ট' বলতে যা বোঝায় তা হন নি তিনি। তিনি স্বদেশকে বিশ্বের চেয়ে বড়ো ভাবার অশালীনতা কখনো করেন নি, বিশ্বমানবকে তাঁর স্বদেশবাসীর নীচে আসন দেন নি কখনো। ১৩১১ সালে স্বদেশীসমাজ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"ইহা নিশ্চয়ই জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহার সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যখন ইহাতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্থ অঙ্গের ন্যায় সে কেবল ভারস্বরূপ বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।"

এই কথাগুলি একজন ন্যাশানালিষ্টের কথা নয়। ন্যাশানালিষ্ট এ জাতের কথা বলে না। এ কথাগুলি বিশ্ব-মানবতার সেবকের কথা। স্বদেশীর যুগেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রীতির অন্তরের সুর ছিলো বিশ্বজনীনতা। জাতির অস্তিত্বের সার্থকতা শুধু তার জৈবিক অস্তিত্বে নয়, বিশ্ব-মানবকে সে কী ভাবে সেবা করছে সেইটেই তার টিকে থাকার একমাত্র সার্থকতা—এই কথাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন স্বদেশীর যুগে।

আর এইটেই ভারতবর্ষের সব মহাপুরুষদের সাধনার অন্তরের সুর। ভারতবর্ষ কখনো ভৌগোলিক অপদেবতা—ন্যাশানালিজমের পায়ে বিশ্বকে ও বিশ্ব-মানবকে বলি দেয় নি। সত্য ও সত্য উপলব্ধি একান্তভাবে তারই ভৌগোলিক সত্তার একচেটিয়া অধিকার এই মূঢ় দর্পিত অজ্ঞতা ভারতবর্ষ তার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো প্রশ্রয় দেয় নি। সত্য পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ দ্বারা সীমিত নয়, সত্য এক ও বিশ্বজনীন—এই কথা হাজার বছরেরও অনেক আগে ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীকে শুনিয়েছিলো।

ভারতবর্ষ হজরত মহম্মদ ও যীশু খৃষ্টকে অবতার বলে স্বীকার করে। এই হোলো ভারতের সাধনার সত্য রূপ। যেখানে সত্য-উপলব্ধির সন্ধান পাওয়া গেছে সেইখানেই ভারতবর্ষ তার প্রণাম জানিয়েছে।।

তাই বিশ্বাত্মবাদ হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা। দেশাত্মবাদকে ভারতবর্ষ কখনো তার অন্তরের পুজো-কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করে নি।

রবীন্দ্রনাথও কখনো ন্যাশানালিজমকে, দেশাত্মবাদকে বিশ্বাত্মবাদের জায়গায় বসান নি। স্বদেশীর যুগেও না। তখনও দেশের মাটিতে বিশ্ব-মায়ের আঁচল পাতা রয়েছে—এই উপলব্ধির আলোতে ও সৌরভে তাঁর গান ভরপুর।

যে সত্য ভৌগোলিক সীমা মানে না সেই সত্যকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা। বিশ্বাত্মবাদকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ কখনো চিন্তা করে নি কিম্বা ধ্যান করে নি। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সব সৃষ্টির মূলে সেই বিশ্বাত্মা ও বিশ্ব-মানবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করবো তার কারণ এই নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হবো, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে। যদি বলো

এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হোলে আমি বলবো স্বজাতি অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয়, এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত আছে।......প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"একক বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একক বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা ও জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধাবিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সঙ্গে আমাদের অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।"
(ভারতবর্ষের ইতিহাস)

তাঁদের নিজেদের আল-বাঁধা মনের জাতীয়তাবাদী বিকারের সমর্থনে কিছু কিছু লোক রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ছিলেন এইটে প্রমাণ করবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন। সমুদ্রকে খিড়কির পুকুর প্রতিপন্ন করবার অসত্য চেষ্টার মতো এই চেষ্টাও নিস্ফল হবে। বিশ্বাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ কখনো জাতীয়তাবাদী ছিলেন না।

কয়েকটি অবিস্মরণীয় পত্র

রোমাঁ র‍্যলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

[১৯২৫ সালে রোমাঁ র‍্যলাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হল। র‍্যলাঁ চিঠিখানি তাঁর ডায়রীতে প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণান্তে এই চিঠিখানি তাঁকে লেখেন। ডক্টর বিমল শাসমল, চিঠিখানি মূল ফরাসী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন।
—সম্পাদক]

25th February, 1925.

My very dear friend,

I have come back broken and exhausted. I have come back to a country that is occupied with many other things and that has not the leisure at least to think about me or about my ideals. I feel I am unwanted here, at least for the moment. I fear my people may like to continue to consider my ideals of international amity as premature, even as a poetic luxury to which our epoch cannot permit to lend itself.

But, at the same time, I feel have a country of my own, a friend of my own and collaborators and workers for my cause. I discover all of them in one person, through you and through your profound friendship. This discovery gives me the force, the confidence and the closing joys at this hour of evening-tide of my life.

If I live a little more, if the physicians permit me the first thing I shall do is to come near you to beseech you for Santiniketan where you will find your place ready. The physicians say that, henceforth, I should pass the trying summer season in Europe. In that case, I shall build my summer residence next to that of yours in Suitzerland, so that the few last days of my life. I shall live not only as your friend but as your comrade in arms in the Great Cause.

Best of health and peace of mind to you and to your family.

Always yours,
RABINDRANATH TAGORE.

জালিয়ানওয়ালাবাগ ও রবীন্দ্রনাথ

(১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটলো। পাঞ্জাবের খবর তখন ভারতবর্ষে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য ইংরাজ সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কবির কাছে পাঠানো চিঠিপত্র তখন ঠিকমতো পেঁৗছচ্ছে না। বোধহয় মে মাসের মাঝামাঝি কোন সময়ে এ খবর শান্তিনিকেতনে পেঁৗছালো। ২৭শে মে শান্তিনিকেতন থেকে এলেন কলকাতায়। দেখা করলেন দেশনেতাদের সঙ্গে-প্রতিবাদে সভা করবার প্রস্তাব দিলেন। তাঁরা রাজী হলেন না। গান্ধীজীকে জানালেন যে দুজনে মিলে পাঞ্জাব যাবেন। গান্ধিজী রাজী হলেন না। তখন ২৯শে মে রাত্রিতে চিঠি লিখলেন ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে-স্যার টাইটেল ফিরিয়ে দিয়ে। সেই চিঠির ঐতিহাসিক মূল্য ভারতবাসীর কাছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত একটি মানুষের কাছে যে কোন দলিলের চেয়ে বড়। —সম্পাদক)

৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।
কলিকাতা, মে, ৩০, ১৯১৯

(ইওর এক্সেলেন্সি)

কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ড প্রয়োগবিধির বিশেষত্ব আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাহারা এইরূপে বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোক-হনন ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন এ কথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়ে নিজের সাফাই করিতে পারে না। পাঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদ পত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোন কোন কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্তা পীড়িতপক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল; যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাদের গভর্ণমেন্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন

করা এই গভর্ণমেন্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল। তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এই-টুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে আমার যে-সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার উদার-চিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরমশ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়। *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মূল চিঠি ইংরাজীতে লেখা—এ অনুবাদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের)

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ

(চেকোশ্লোভাকিয়ার 'সুদেতান' অংশ যখন হিটলারী প্ররোচনায় আত্মকর্তৃত্ব দাবী করলো তখন ম্যুনিক কনফারেন্সে বৃটেন ও ফ্রান্স সেই দাবী মেনে নিয়ে জারমানদের খুসী করবার চেষ্টা করলো রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই উদ্ধতের অন্যায় শক্তিকে সমর্থন করেন নি। তিনি অধ্যাপক লেসনি কে এই অবস্থা সম্বন্ধে যে চিঠি লিখলেন ১৯৩৮ সালের ১৫ই অক্টোবর তাতেই প্রমাণ পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর উৎকন্ঠা কত প্রবল ছিল। এ চিঠির বাংলা অনুবাদ না করে আমরা ইংরাজীটাই যথাযথ তুলে দিচ্ছি।—সম্পাদক)

Dear Dr. Lesny,

I feel so keenly about the suffering of your people as if I was one of them. For what has happened in your country is not a mere local misfortune which may at the best claim our sympathy, it is a tragic revelation that the destiny of all those principles of humanity for which the peoples of the west turned martyrs for three centuries rests in the hands of cowardly guardians who are selling it to save their own skins. It turns one cynical to see the democratic peoples betraying their kind when even the bullies stand by each other.

I feel so humiliated and so helpless when I contemplate all this, humiliated to see all the values, which have given whatever worth modern civilisation has, betrayed one by one, and helpless that we are powerless to prevent it. Our country is itself a victim of these wrongs. My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor even the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretended to be the saviours of humanity. I can only remind those who are not yet wholly demented that when men turn beasts they sooner or later tear each other.

As for your own country, I can only hope that though abandoned and robbed, it will maintain its native integrity and falling back upon its own inalienable resources will recreate a richer national life than before.

I am sending you a copy of my English rendering of a recent poem of mine, yet unpublished, in which my outraged sentiment has found its expression. You may use it as you like, though it will also be published in the November issue of the Visva-Bharati Quarterly. If you like I can also send you the Bengali original.

With best wishes and regards.

Yours sincerely,
RABINDRANATH TAGORE.

এই চিঠিতে যে কবিতার কথা আছে সেটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে 'নবজাতকে' ছাপা হয়েছে।

আমি সব নিতে চাইরে

"হারুনা মারু" জাপানী জাহাজে রবীন্দ্রনাথ যাচ্ছিলেন। পোর্টসেদ থেকে জাপানী পোষ্টকার্ডে ৭ই অক্টোবর, ১৯২৪ সালে দুটি চিঠি একটি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও অপরটি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখেন।

দেয়ালটি সেজেচে, বিড়ালটি সেজেচে, প্রদীপটি সেজেচে সবটি নিয়ে ঐ একটি মেয়ে। এর মধ্যে কোনোটিকে বাদ দিলে ঐ এক মেয়ের মধ্যে থেকেই বাদ পড়বে। অনেককে যখন সে এক করে নেয় তখনি একের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ পায়। এককে যে বৈরাগী একান্ত একের মধ্যে খোঁজে সে শূন্যের মধ্যে পৌঁছয়। ধূমকেতুর এক নিয়ে যে-খুসি গর্ব করুক, সমস্ত নক্ষত্র-লোকের এক না পেলে কবির মন খুসি হয় না। "আমি সব নিতে চাইরে" তার মানে আমি এক নিতে চাই।

'ফুলটি হয়ে ওঠেছে'

এই যে ফুলটি রয়েছে এক পাশে, সে ঐ জাহাজটাকে বলচে "কিছুতেই তুমি সুর মেলাতে পারচ না। তুমি দাস, তুমি বর্ব্বর, তোমার দাম তোমার মজুরীতে, তোমার দাম তোমার নিজের মধ্যে নেই"।

ফুলটি হয়ে ওঠেছে জাহাজটা হয়ে ওঠেনি—উভয়ের মধ্যে তফাৎটা চেয়ে দেখ।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনা সূচী

ইতিহাস ও আলোচনা

শ্রাবণ ১৩২৮

স্বদেশী প্রচেষ্টার ইতিহাস

অপ্রকাশিত ?

উদয়ন

১৩৪০

বৈশাখ

আশীর্বাদ

"যেন প্রসারিয়া উদয়রশ্মিজাল"

কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত

অপ্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ

সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ

রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১, ছন্দ, পরিশিষ্ট, পৃ ৪০৯

আশ্বিন

অদ্ভুত

দশটি কবিতা

[১] বাদ্‌শার মুখখানি গুরুতর গম্ভীর

খাপছাড়া

[২] কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে

খাপছাড়া

[৩] কনে দেখা হয়ে গেছে নাম তার চন্দনা

খাপছাড়া সংযোজন, রবীন্দ্ররচনাবলী ২১

[৪] বাংলাদেশের মানুষ হয়ে ছুটিতে যাও চিতোরে

খাপছাড়া

[৫] বেদনায় সারা মন করতেছে টন্‌টন্‌

খাপছাড়া

[৬] মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু
খাপছাড়া

[৭] বউ নিয়ে লেগে গেল বকাবকি
খাপছাড়া

[৮] পেন্‌সিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন
খাপছাড়া সংযোজন: রবীন্দ্র-রচনাবলী ২১

[৯] সর্দিকে সোজাসুজি সর্দি বলেই বুঝি
খাপছাড়া

[১০] নিজের হাতে উপার্জনে
খাপছাড়া

[**আশীর্বাদ লিপি**]
"ভারি কাজের বোঝাই তরী"
বালীবঙ্গশিশু বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রেরিত ও 'সাময়িকী'তে মুদ্রিত
[লেখন হইতে পুনর্মুদ্রিত]

পৌ ষ

রবীন্দ্রনাথের বাণী
বোম্বাইতে কবির বক্তৃতার আংশিক উদ্‌ধৃতি। 'সাময়িকী'তে মুদ্রিত

ফা ল্গু ন

মহাত্মাজীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ
ইউনাইটেড প্রেসের মারফৎ প্রকাশিত বিবৃতি 'সাময়িকী'তে মুদ্রিত

১ ৩ ৪ ১

বৈ শা খ

প্রণাম
বীথিকা, প্রণতি

ছন্দ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত
ছন্দ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

জ্যৈ ষ্ঠ

ছন্দের মাত্রা
ছন্দ, ছন্দের মাত্রা (২)

বিদায়বাণী
যাবার সময় হ'ল বিহঙ্গের
প্রান্তিক

নব পরিচয়
বীথিকা

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ
সিংহলে রোটারী ক্লাবে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা Ideals of an Indian University-র অনুবাদ।
সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কৃত

আ শ্বি ন

সুলতানের সুরে
প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
প্রথমস্তবক 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত
বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৫১ সংখ্যায় পুনরায় মুদ্রিত, 'সেদিন চৈত্রমাস' নামে
গীতবিতান ৩

কল্লোল

১৩৩১

বৈ শা খ

শেষ অর্ঘ্য
পূরবী

চৈ ত্র

অন্ধকার
পূরবী

১৩৩২

বৈ শা খ

মুক্তি
পূরবী

চিঠি
'আমার জগৎ' প্রবন্ধটির ভিতরকার কথা"। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪
অপ্রকাশিত[২]

আ শ্বি ন

শেফালি
"ওগো শেফালি :" গান

১৩৩৩

জ্যৈ ষ্ঠ

কবির কামনা
পরিশেষ, "দিনাবসান"
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ প্রবাসীতেও মুদ্রিত, "জন্মোৎসবের দিনে"

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ
শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত দুইখানি পত্র
১ তথাস্তু। কিন্তু দায়িত্ব তোমাদের। ......৮ বৈশাখ ১৩৩৩

২ এইমাত্র কোনো পত্রলেখক...৩ বৈশাখ ১৩৩৩

অপ্রকাশিত

১৩৩৪

বৈ শা খ

তোমার হাতের অরুণ লেখা

গান

জ্যৈ ষ্ঠ

লেখা

'লেখা' হইতে উদ্ধৃত

পরিশেষ

১৩৩৫

বৈ শা খ

নূতন

পরিশেষ

আ শ্বি ন

শরৎচন্দ্র সংবর্ধনা : রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ...

শরৎচন্দ্রের ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিনে কবি প্রেরিত আশীর্বাদ সংবর্ধনাসভার বিবরণী সহ মুদ্রিত

২৯ ভাদ্র ১৩৩৫

বিচিত্রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ সংখ্যাতেও মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

মা ঘ

চয়নিকা **: নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনের অভ্যর্থনা** সমিতির সভাপতির ভাষণ

চৈ ত্র

নবীন সাধক

'বসুধারা' হইতে উদ্ধৃত

পরিশেষ, আশীর্বাদ

কালি-কলম

১৩৩৩

আ ষা ঢ়

গান

স্বরলিপি সহ

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রা ব ণ

গান

স্বরলিপি সহ

হার মানালে গো

স্বরলিপি। রমা মজুমদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংশোধিত স্বরলিপি ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যায়

মা ঘ

গান

১. নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি

২. দিনের বেলায় বাঁশী তোমার

৩· আধেক ঘুমে নয়ন চুমে

ফা ল্গু ন

গান ও স্বরলিপি

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি

১ ৩ ৩ ৪

জ্যৈ ষ্ঠ

লেখা

'লেখা' বৈশাখ ১৩৩৪ হইতে পুনর্মুদ্রিত

পরিশেষ

শ্রা ব ণ

স্বরলিপি: আধেক ঘুমে নয়ন চুমে

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন বিভাগে পুনর্মুদ্রিত

স্বদেশী প্রচেষ্টার ইতিহাস

প্রথম ইংরেজী শিক্ষার মত্ততায় বাঙালী ছাত্রদের মনে স্বদেশী-বিদ্বেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী দেশের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের দৈন্য কল্পনা করিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিল এবং সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য অনুকরণই উন্নত culture বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা প্রযুক্ত অনেকে নাস্তিক ও অনেকে খৃষ্টান-ঘেঁষা হইয়া পড়িতেছিলেন।

সেই সময়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ ধর্মব্যাকুলতা অনুভব করিয়া প্রাচীন শাস্ত্র অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। যদিচ প্রচলিত ধর্মসংস্কার তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি স্বদেশের শাস্ত্রকেই ধর্মোন্নতির ভিত্তিরূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদ-উপনিষদের আলোচনা ও বিলাতী বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রভৃতির প্রচার বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশী ধর্ম হইতে স্বধর্মে ও বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন।

কেশববাবুরা যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের সহিত হিন্দুসমাজের বিচ্ছেদ সাধনের উপক্রম করিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজকে ত্যাগ করিলেন না; ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু সমাজের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। আধুনিক শিক্ষিত চিত্তকে স্বদেশের অভিমুখী করিবার এই প্রয়াস।

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে আধুনিক শিক্ষার সহিত স্বদেশী ভাবের সমন্বয় চেষ্টা বরাবর কাজ করিতে লাগিল। হিন্দুমেলা এই স্বদেশী ভাবের আর একটি অভ্যুত্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ নবগোপাল মিত্রকে সাহায্য করিয়া এই মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্বদেশী শিল্পের, স্বদেশী মল্লবিদ্যার, স্বদেশী games-এর প্রদর্শনী হইত—স্বদেশী-গান গীত ও স্বদেশী কবিতা আবৃত্ত হইত।

তারপর বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া দেশের শিক্ষিতগণকে মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া তুলিল। ইহার কিছুকাল পরে শশধরের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য।

ইতিমধ্যে রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া আমাদের পরিবারে সাধারণের অগোচরে স্বদেশী ভাবের বিশেষরূপ চর্চা হইতেছিল। গোপনে স্বদেশী দেশালাই ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত তাঁত প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বদেশীভাবের উত্তেজনাতেই খুলনা হইতে বরিশালে স্টীমার চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজ কোম্পানীর সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তৎকালে বরিশালে স্বদেশীর দল তাঁহার সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রচণ্ড উৎসাহে সংগ্রহ ও যাত্রী ভাঙানর কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এরূপ Fuller এর আমলে হইলে কি বিপদ হইত অনুমান করিবেন।

কন্‌গ্রেস গবর্ণমেন্টের আবেদনের দিকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টাকে প্রবৃত্ত করাইল।

সাধনা পত্রে ও তাহার পরে অন্যত্র আবেদন নীতি ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি চালনের দিকে মন দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বলেন্দ্রনাথ এবং আমাদের পরিবারের অনেকে যোগ দিয়া স্বদেশী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

এই স্বদেশী ভাণ্ডারের ভগ্নাবশেষের উপরে Indian Stores এর অভ্যুদয়।

ইহার অনতিকাল পরেই Provincial Conference-এ যাহাতে বাংলাভাষায় আপামর সাধারণের নিকট স্বদেশের অভাব আলোচনা করা যায়—যাহাতে ইংরেজী ভাষায় কেবল রাজার নিকট আবেদনেই আমাদের কর্তব্য নিঃশেষিত না হয় রাজসাহী কন্‌ফারেন্সে সত্যেন্দ্রনাথের নায়কতায় প্রথম সেই চেষ্টা করা হইয়াছিল,—পর বৎসর ঢাকাতেও সেই চেষ্টা করা যায়।

স্বদেশী movement-এর সঙ্গে এই সকল চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ধর্ম সম্বন্ধে যেমন আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের দিকে মন টানিয়াছিল— politics সম্বন্ধেও সেইরূপ কিছুদিন হইতে দেশের লোককে দেশের দিকেই টানিবার চেষ্টা চলিতেছিল। তৎকালে শিক্ষিত লোকেরা যেমন সহজে শাস্ত্রের দিকে স্বদেশী ধর্ম ও স্বসমাজের দিকে ফিরিতে চাহেন নাই এখনকার দিনেও সেরূপ শিক্ষিত agitation ওয়ালা সহজে আবেদনের পালা বন্ধ করিয়া স্বদেশের জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হন নাই।

নূতন পর্যায় বঙ্গদর্শনে এই আত্মশক্তি চর্চা ও স্বদেশী ভাবের দিকে দেশের চিত্ত আকর্ষণের জন্য উপদেশের প্রবর্তন করা হয় এবং বোলপুরের বিদ্যালয় স্থাপনও শিক্ষার ভার নিজের হাতে ও স্বদেশীভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী। তিনি ইংরেজী ধরণের বিদ্যালয় দেশীয় লোকের দ্বারা চালাইতে সুরু করেন—আমার চেষ্টা যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ যথাসম্ভব স্বদেশী রকম হয়।

এইরূপ আন্দোলন যখন দেশে ভিতরে ভিতরে চলিতেছিল, তখন যোগেশ চৌধুরী কলিকাতায় কন্‌গ্রেস শিক্ষা প্রদর্শনী খুলিয়া কন্‌গ্রেসের আবেদনপ্রধান ভাবকে স্বদেশী ভাবে দীক্ষিত করিবার প্রথম চেষ্টা করেন—তারপর হইতে এই প্রদর্শনী বৎসরে বৎসরে চলিতেছে।

ইতিমধ্যে আশু চৌধুরী বর্ধমান কন্‌ফারেন্সে পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়া গালি খান। কিন্তু দেশ অন্তরে অন্তরে স্বদেশীভাবে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে পার্টিশন ব্যাপার একটা উপলক্ষ মাত্র হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্পষ্টরূপে বিকশিত করিয়া তুলিল। বস্তুতঃ বয়কট করার ছোলেমানুষী ইহার প্রাণ নহে।

১৩১২ সনের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট লিখিত পত্র হইতে গৃহীত। এই খসড়া হইতে বড় করিয়া একটা প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনের জন্য লিখিবার ভার দীনেশ বাবুর উপর ছিল।

—ইতিহাস ও আলোচনা, শ্রাবণ ১৩২৮

আমার জগৎ

'আমার জগৎ' প্রবন্ধটির ভিতরকার কথা আপনি ঠিকই বুঝেচেন। চিনি জিনিসটাকে বিজ্ঞান অঙ্গারের তালিকায় ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে কিন্তু আমার সঙ্গে যেখানে সম্বন্ধ সেখানে চিনিতে অঙ্গারে অনেক তফাৎ। এই তফাৎটা যার কেন্দ্রস্থলে একজন আমি বস্তু আছে, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির বৈচিত্র্য। যার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধবশতই জগৎটা বিচিত্র তাকে সরিয়ে ফেললেই প্রলয়—তখন সবই এক। বিজ্ঞান যখন বলচে ঈথরের কম্পনই আলোক তখন সে আসল জিনিসটাকে বাদ দিচ্ছে—বস্তুত আলোক আমার মধ্যে,—আমার বাইরে যে কম্পনটা সে আলোকই নয়। বাঁশির ছিদ্রে যে হাওয়া খেলচে সেত সঙ্গীত নয়—আমার বোধের মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় ব্যাপার ঘটচে সেইটেই সংগীত। ঈথরের কম্পন, বাতাসের চাঞ্চল্য তথ্য মাত্র, তা সত্য নয়—তা অক্ষরের বিন্যাসমাত্র তা কবিতা নয়। তা সৃষ্টি নয় তা **নির্মাণ**। যা নির্মাণ তাকে মাপা যায় কারণ তা আংশিক। কবি কাব্যে যে অক্ষর বিন্যাস করেচে তাকে মাপা যায় কিন্তু কাব্যকে মাপা যায় না। সেটা আমার বোধের মধ্যে পেঁচেছে রূপকে পেরিয়ে অপরূপ হয়েছে। আলোক ও সংগীত মাপের জিনিস নয়, কেননা তা সৃষ্টি। সৃষ্টি কি না সর্জন—নিজেকে দান করা। কবি তাঁর কাব্যে নিজেকে দান করেন, সেটা একটা personal fact—কিন্তু অক্ষর বিন্যাসটা বিধি, সেটা impersonal। বিশ্বসৃষ্টির মূলেও একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে, সেই জন্যেই সেটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়—এর মাঝখানে একটা পদার্থ আছে সেটা সৃষ্টি নয় সৃষ্টির নিয়ম, সেটা ঈথরের কম্পন। বিজ্ঞান সেই নিয়মকেই বলচে জগৎ। কিন্তু নিয়ম জিনিসটা ত আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়—নিয়ম একটা চরম উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে—সুরবিন্যাসের নিয়ম মিথ্যা হত যদি সেটা গানের আনন্দে পর্যবসিত হয়ে সার্থক না হত। জগতের নিয়ম ব্যর্থ হত যদি সে নিয়ম কোনো ব্যক্তিরই বোধের মধ্যে অনির্বচনীয় উপায়ে জগৎরূপে প্রকাশিত না হত। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনঃ —আমার কাব্য যদি উপভোগ করতে চান তবে কোনো পাণ্ডার দ্বারস্থ হবেন না। আমার রচনা বোঝা যায় না বলে একটা বদনাম উঠেচে সেই বদনামটাই বোঝাবার পক্ষে বাধা দেয়। যদি মনে কোনো সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা না রাখেন তাহলে বুঝতে কিছুই গোল হবে না।

—কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩২

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

রবীন্দ্রনাথ ও আন্দামান রাজবন্দী-মুক্তি আন্দোলন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩৭ সালের জুলাই মাস। বাঙলায় খবর পোঁছয় যে আন্দামানের রাজবন্দীরা তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনবার দাবীতে অনশন সুরু করেছেন।

এই খবর পেয়ে আমরা সবাই খুব বিচলিত হই। আমি শরৎচন্দ্র বসুর কাছে গিয়ে এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করি। কলেজ থেকে ছাত্রদের টেনে বের করে একটা আন্দোলন সুরু করাই ছিলো আমার অভিপ্রায়। শরৎচন্দ্র আমার অভিপ্রায়কে আন্তরিক সমর্থন করলেও, স্কুলকলেজ থেকে ছেলেদের টেনে বার করা যাবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

এর দু একদিন পরে একদিন দুপুরে স্কটিশচার্চ কলেজের ফটকের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানাই আন্দামানের রাজবন্দীদের অনশনের সমর্থনে হরতাল করে বের হয়ে আসতে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই বের হয়ে আসে। স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলো। তারপর প্রতিটি কলেজে ঘুরে ছাত্রছাত্রীদের ডাক দিয়ে পথে বের করে নিই। দশহাজারের উপর ছাত্রছাত্রীর বিরাট মিছিল সেদিন এ্যাসেমব্লী ঘেরাও করে আন্দামান রাজবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনবার দাবী জানায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে। রাজবন্দীদের দেশে ফিরবার আন্দোলন যে শুধু সুরু হোলো তা নয়, বাংলার ছাত্র-আন্দোলনও সুরু হোলো আন্দামানের রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনবার আন্দোলন উপলক্ষ করে।

শরৎ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলুম। আন্দোলন তো একরকম সুরু করা গেলো। এখন এটাকে সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে চাই, তবেই আন্দোলন সকলের মনে আগুন জ্বালাবে। শরৎচন্দ্র ভরসা পেলেন না। বল্লেন ঃ কবিকে কি পাওয়া যাবে? উনি কি আসবেন? তার উপর তিনি অসুস্থ। শরৎচন্দ্র কবিকে অনুরোধ করতে ভরসা পেলেন না।

অগত্যা আমাকেই সে ভার নিতে হোলো। রবীন্দ্রনাথ তখন বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের বাড়ীতে আছেন। একদিন সকালে বরাহনগরে গিয়ে হাজির হলুম। দোতলার বারাণ্ডায় বসে ছিলেন তিনি। অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কবির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আস্তে আস্তে আন্দামানের রাজবন্দীদের কথা উঠোলুম। তাদের উপর যে কী পীড়ন চলছে, দেশের লোক যে কতো ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত, ছাত্রেরা যে কী রকম সাড়া দিয়েছে—সব তাঁকে জানালুম।

রাধাকমলবাবু আমার কথা শুনে একটু শ্লেষ করে বল্লেন—আন্দামানে তাঁরা অনশন নিয়ে খেলা সুরু করেছেন।

জ্বলে উঠলুম আমি। রবীন্দ্রনাথের সামনেই অধ্যাপক মহাশয়কে বল্লুম যে অনশন করবার তাগদ যদি তাঁর থাকতো তো বুঝতুম। ভরাপেটে এই মর্মান্তিক ব্যাপার নিয়ে রসিকতা করা রুচির পরিচয় নয়।

অধ্যাপক মহাশয় স্তব্ধ হলেন। রবীন্দ্রনাথ চুপ করে শুনছিলেন। বল্লুম তাঁকে—শুধু

একটি সন্ধ্যেবেলা দশ মিনিটের জন্যে তিনি যদি টাউন হলে মিটিংয়ে এসে দু'চারটি কথা বলেন তাহোলেই যথেষ্ট হয়। এতোগুলি ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনা যায়। তাঁর জন্যে টাউন হলের একতলায় মিটিংএর ব্যবস্থা হবে।

রবীন্দ্রনাথ রাজী হলেন। তারপরদিন সকালে তাঁর কাছে আসবো বলে বিদায় হলুম। সোজা চল্লুম শরৎ বসু মশায়ের ওখানে। মনে এমন আনন্দ হচ্ছে যেন উড়ে যাচ্ছি। অধীরতারও অন্ত নেই, পথ যেন ফুরোতেই চায় না।

কবি সম্মতি দিয়েছেন শুনে শরৎবাবু খুব খুসি হয়ে বল্লেন—এবারে সকলকে টেনে নেওয়া যাবে।

ঠিক হোলো ২রা আগষ্ট সন্ধ্যেবেলা টাউন হলের নীচের হলে সভা ডাকা হবে। পরদিন সকালে বরাহনগরে গেলুম। রবীন্দ্রনাথ একটি খসড়া করেছিলেন, সেটি দেখতে দিলেন।

২রা আগষ্ট সন্ধ্যেবেলা। টাউন হলের সামনে রাস্তায় হাজার হাজার লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। হলের মধ্যে নড়বার জায়গা নেই। রবীন্দ্রনাথ এলেন। সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দ। তাঁকে ধরে মঞ্চের উপর নিয়ে গেলুম। তিনি তাঁর বক্তৃতা পড়ে শোনালেন। ঘরের ভিতরে আর রাস্তায় হাজার হাজার কন্ঠে "আন্দামান রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনো"—এই ধ্বনি উঠ্ল। বক্তৃতা শেষ হতেই তাঁকে বাড়ী রওনা করে দেওয়া হোলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যে ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন সেটি "আন্দামান রাজবন্দীদের মুক্তি" কমিটির তরফ থেকে 'আন্দামান' বলে যে ইংরিজী ভাষায় পুস্তিকা আমি বের করি তাতে প্রকাশিত হয়। সেই বক্তৃতাটি তর্জমা করে দিলুম।

২রা আগষ্ট ১৯৩৭

তোমরা সবাই জানো যে আমি রাজনীতিক নই। তাই তোমরা মনে রেখো যে আজ সন্ধ্যে বেলায় যা বল্‌বো সেটা রাজনৈতিক সাধনের জন্যে নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন দলীয় হতে বাধ্য। আমি যা বলবো সেটা হচ্ছে ন্যায় ও মানবতার আহ্বানে বলা। এই আহ্বান কেউই উপেক্ষা করতে পারে না।

দু' সপ্তাহের উপর হয়ে গেলো প্রায় দু'শো রাজনৈতিক বন্দী আন্দামানে অনশন সুরু করেছেন। এই অনশনের খবর দীর্ঘকাল আমাদের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিলো। জনসাধারণের সেন্টিমেন্টকে এই ভাবে যে হৃদয়হীন উপেক্ষা দেখানো হয়েছে তাতে আমাদের জাতীয় অসহায়তাই পরিস্ফুট। ইংলণ্ড কিম্বা যে কোনো ডেমোক্রাটিক দেশে গভর্মেন্ট রাজবন্দীদের অনশনের মত এত গুরুতর ঘটনাকে এতোদিন ধরে গোপন রাখতে পারতো না।

রাজনৈতিক বন্দীরা আন্দামান থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। তাঁদের দাবী সংগত ও অতি সামান্য দাবী। রাজশক্তি যেখানে এদেশের লোকের অনুগত নয়, সেখানে এটা খুবই স্বাভাবিক যে যে সব রাজনৈতিক বন্দীদের ভারতবর্ষ থেকে হাজার মাইল দূরে একটি দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে তাদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে সন্দিহান থাকবে, উৎকণ্ঠিত থাকবে। এটাও অতি স্বাভাবিক যে দেশের লোক রাজবন্দীদের ভারতে ফিরিয়ে আনবার দাবী করবে কেন না ভারতের কারাগারের অমানুষিক কঠোরতা জনমতের চাপে কিছুটা কম করা সম্ভব।

দেখা যাচ্ছে রাজবন্দীদের আন্দামান থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেন্ট বাঙলার গভর্মেন্টের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া ভারত গভর্ণমেন্ট রাজবন্দীদের আর্জি এই

বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে সব বন্দীদের একসঙ্গে সই করা আর্জি ভারত গভর্ণমেন্ট বিচার করে দেখতে রাজী নন। গভর্ণমেন্টের যন্ত্রের হৃদয়হীনতা আর একবার জয়লাভ করলো ন্যায়বুদ্ধি ও মানবতার উপর।

ভারতবর্ষের যে প্রদেশগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা শাসনভার গ্রহণ করেছেন সেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যা কিছু বাধা ছিলো সব দূরে করা হয়েছে।

শুধু বাঙ্গলা প্রদেশেই শত শত ছেলে বিনা বিচারে বন্দী রয়েছে। এখানে রাজশক্তিকে যে দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না সেইটে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই যখন তখন প্রেসের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। বাঙ্গলার লোকেরা যে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করে তা মরুভূমির মরীচিকার মতই অবাস্তব।

অতীতে এর আগে আর একটি আন্দমানের রাজবন্দীদের মধ্যে অনশনের সময় আমরা তিনটি তরুণ জীবনকে খুইয়েছি। তাদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু ঘটে জোর করে খাওয়ানোর নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আছে তার ফলে। বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট কি সেই ট্র্যাজেডি আরো বেশী সংখ্যায় ঘটতে দেবেন এইবার? আমরাও কি সেটা ঘট্‌তে দেবো?

বাঙ্গলার গভর্ণমেন্টের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা বম্বে, মাদ্রাজ, ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের মতন উদার সহানুভূতি, মানবতার সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দী ও বিনা বিচারে আটক রয়েছেন যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করুন।

শাস্তি দেবার যে নির্মম ব্যবস্থা পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশে প্রচলিত আছে, মানুষের সভ্যতাকে ধিক্কার দেবার পক্ষে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা যথেষ্ট। কিছুকাল থেকে রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির বৃদ্ধি হয়েছে কতকগুলি পাশ্চাত্য দেশে। ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্ট এই ফ্যাসিষ্ট সংক্রামতার ছোঁয়াচ ও অভিব্যক্তি থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পায় নি। এই ফ্যাসিষ্ট সংক্রামতা আইনকেও পরোয়া করে না, মানবীয় স্বাধীনতার উপর সে অশ্রদ্ধাবান।

বাঙ্গলার শত শত তরুণ তরুণী অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিনা বিচারে আটক থেকে দৈহিক ও মানসিক দণ্ড ভোগ করেছে। তার ফলে এই হতভাগ্য প্রদেশে নিরাশার অন্ধকার ছেয়ে গেছে ঘরে ঘরে।

আইন ও বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন করবার যে জরুরী প্রয়োজন আছে সে সম্বন্ধে আমাদের শাসকদের কাছে দাবী জানাবার জন্যে আমার দেশবাসীরা আমাকে অনুরোধ করেন নি, তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন আইনের প্রয়োগে যে হৃদয়হীন কঠোরতা আছে সেই কঠোরতাকে কমাবার জন্যে তাঁদের যে দাবী তার সমর্থন করতে।

ইয়োরোপের ভূখণ্ডে 'ডেভিলস্ আইলাণ্ড', 'লিপারী,' 'কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প' ও আরো অন্যান্য বিশেষ তৈরী করা নরক তারা মানুষকে দণ্ড দেবার প্রদর্শনী হিসাবে সৃষ্টি করেছে। ইংলণ্ডে কিন্তু বন্দীদের তাদের মাতৃভূমি থেকে উপ্‌ড়ে নিয়ে তাদের কষ্ট বাড়াবার জন্যে এই ধরণের অভিশপ্ত কোনো জায়গা নেই।

যখন দেখি যে শুধু পরাধীন জাতির জন্যে তারা তাদের নিজেদের নিয়ম লঙ্ঘন করছে তখন এই ব্যবহারের পার্থক্যের অপমান আমাদের সকলকে লাঞ্ছিত করে।

আমার দেশের হয়ে আমি তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে

শতবর্ষ আগে যে রবির উদয় হয়েছিল; সে রক্তরাগে দিগদিগন্ত রাঙিয়ে অস্তমিত হয়েছে, তাও বিশ বছর হয়ে গেল।

সেই রাজনীতি প্রধান যুগে পরাধীন ভারতের কবির বাণী সর্বাত্মকভাবে সব সময় সকলের মনঃপূত হয়নি। ভারতের বাইরে সে বাণীর মর্যাদা দিয়েছে মাত্র মুষ্টিমেয় জনকয়েক আদর্শবাদী, স্বপ্নবিলাসী চিন্তানায়ক। আর আজ অস্তমিত ভারত রবির দীপ্তি কিভাবে বিশ্ব-সংসারময় আলোক বিকীর্ণ করেছে, তা অনুভব করা যাচ্ছে তাঁর জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা দেখে।

সেদিন আমেরিকা রবীন্দ্রনাথকে চরম অবজ্ঞা দেখিয়েছিল। ১৯৩০ সালের ভ্যানিটি ফেয়ার নামক মাসিক পত্রে যে ভাবে তিরস্কার করা হয়েছিল তাঁকে, তার কোন প্রতিবাদ হয়েছিল বলে শোনা যায়নি। ভ্যানিটি ফেয়ার লিখেছিল : We nominate oblivion for Sir Rabindra Nath Tagore because his mystical poems have been acclaimed chiefly by the pseudo-cultured, because in all his portraits he takes care to look as much like a holyman and a saint as possible, because he is the chief of all the Mahatmas and Swamis who swarm over here to spread their informations about India and finally because they visit the United States every few years, collect a comfortable sum in lecture fees and depart, giving out interviews in which they denounce America for her "Materialism".

(অর্থাৎ—বিস্মৃতির অতলে যাদের ডুবিয়ে দেওয়া উচিত তাদের মধ্যে আমরা সার রবীন্দ্রনাথ টেগোর-এর নাম প্রস্তাব করছি কারণ তাঁর হেঁয়ালিভরা কবিতাগুলি মুখ্যত সংস্কৃতির মুখোশধারীদেরই অভিনন্দনলাভ করে; কারণ সে ভদ্রলোক চেষ্টা করেন যাতে সব ছবিতে তাঁকে যতটা সম্ভব সাধুসন্তের মত দেখায়; কারণ ভারতের খবর প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সব মহাত্মা ও স্বামী ঝাঁকে ঝাঁকে এদেশে আসে, ওই ভদ্রলোক তাদের মধ্যে প্রধান; আর সর্বশেষ কারণ হল ওরা কবছর অন্তর অন্তর এদেশে আসে বক্তৃতার পারিশ্রমিক হিসেবে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তার পর যাবার সময় 'বস্তু তান্ত্রিকতার' জন্য আমেরিকাকে নিন্দা করে বাণী দিয়ে যান।)

আজ সেই আমেরিকাই রবীন্দ্রস্মৃতিতে সবচেয়ে কলকণ্ঠ। তাদের সরকারী প্রচার প্রতিষ্ঠানটির প্রচারে আমাদের ধারণা জাগছে যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে দেশে সশ্রদ্ধ আলোড়ন চলেছে। প্রতিদিন শুনছি আমরা : আমেরিকা টেগোরকে জানায় প্রণাম।

রুশদের অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুকূল মনোভাবের বিশেষ কারণ আছে। কম্যুনিস্ট সমাজের বাইরেকার চিন্তানায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সর্বপ্রথম সোভিয়েত সরকারের কর্মপ্রচেষ্টার সুফলগুলি সম্পর্কে লিখিত স্বীকৃতি দান করেছিলেন। অবশ্য সে স্বীকৃতি বাংলা

ভাষাভাষী সমাজের বাইরে প্রচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল ভারতের তদানীন্তন ইংরেজ রাজ প্রতিনিধি রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ খানির প্রচার বন্ধ করে দিয়ে।

আজ রুশদেশে বৈদেশিক সামাজিকতা চর্চার যে আলোড়ন চলেছে তাতে নানা দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার চলছে ব্যাপকভাবে। ভারতীয় সাহিত্য বলতে মহাভারত—কালিদাস-ভবভূতিই নয়, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্যও অনুদিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের রুশসংস্করণের বাহুল্য এবং সেগুলি বিক্রীর আধিক্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গুণগ্রাহিতার প্লাবনে নাও হতে পারে।

তবু ইদানীংকালে রবীন্দ্র মূল্যায়নের এই বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। কি করে তা সম্ভব হল সে কথা চিন্তার ও আলোচনার যোগ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইয়োরোপীয় চিন্তা-নায়কেরা যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের বাণীতে অভিভূত হয়েছিল, তার কারণ ছিল ঃ "ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহতপারা ছিন্নমুণ্ড শিবনেত্র দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা।" কিন্তু দূরদর্শী মনীষীদের যুদ্ধ বিভীষিকাতঙ্কিত মনে রবীন্দ্রনাথ যে দাগ কেটেছিলেন, তা রাজ-নীতিকদের মনে সঞ্চারিত হয়নি, জনসাধারণ তো দূরের কথা। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তদানীন্তন ইয়োরোপের এশিয়াস্থিত আত্মিক জ্ঞাতি জাপান তো রবীন্দ্রনাথকে 'পরাজিত জাতির কবি' বলে ধিক্কার দিয়েছিল, ইয়োনে নোগুচির সঙ্গে জাপানের চীন আক্রমণ প্রসঙ্গে পত্রমারফৎ বাদানুবাদের পর।

পরাজিত জাতির কবির মুখে শান্তির বাণী শোনায় শক্তিমানের দম্ভ ব্যাহত হত বলেই সে বাণীকে অবজ্ঞা করে ইয়োরোপ আর একবার রক্তপ্লাবন সৃষ্টি করলে, সে রক্তবন্যা ভাসিয়ে দিল সারা দুনিয়া। আর তাতে অবগাহন করেই জন্মগ্রহণ করলো নতুন পৃথিবী। জীবনের সর্বশেষ নববর্ষ উৎসবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ, তা সার্থক হল ভারতে মাত্র দুবছরের মধ্যে। দশ বছর যেতে না যেতে ইয়োরোপের শাসনাধীন অধিকাংশ জাতি স্বাধীন হল। বিজয়ী দেশগুলি অন্যান্য জাতিগুলির উপস্বত্ব ভোগের মূল্য দিতে চাইল না বলেই সম্ভব হল এই বিরাট মোক্ষণপর্ব। কাজেই প্রথম রক্ত ক্ষরণের ফলে যেখানে শুধু মুষ্টিমেয় চিন্তা-শীলেরাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের বাণী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, দ্বিতীয়বারের বৃহত্তর রক্তমোক্ষণে সেই প্রেম, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী যে সাধারণ মানুষের অন্তরে পরিব্যাপ্ত হবে তাই তো স্বাভাবিক, বিশেষ রক্ত দিতে হয়েছিল নায়কদের নয়, সাধারণ মানুষদের।

কিন্তু রবীন্দ্র গুণগ্রাহিতার এই বিশ্বব্যাপকতা হৃদয়ের পরিবর্তনের ফলেই যদি সম্ভব হত, তাহলে রবীন্দ্র জীবন দর্শনের প্রয়োগ দেখতে পেতাম বিশ্বজীবনে। যে সব রাজনৈতিক ধুরন্ধর রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাতে আজ সাষ্টাঙ্গে ভক্তিগদ্‌গদ, তাদের বাক্য ও কর্মের যতটুকু আমাদের কাছে পৌঁছায়, তার মধ্যে আমরা সেই জীবন দর্শনের এতটুকু প্রভাব খুঁজে পাইনা। অন্যকথা কি আমাদের দেশেই কি রবীন্দ্রজীবন দর্শনের গ্রহণের প্রবণতা চোখে পড়ে, কি সাধারণ মানুষের মধ্যে, কি অসাধারণে ?

তবে রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্‌যাপনের এই হুল্লোড় কেন ?

অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত ভারতবর্ষের বিরাট সম্ভাবনা উপলব্ধি করে এবং বিশ্ব-পরিস্থিতিতে এদেশের ভৌগোলিক ও উপাদানমূলক গুরুত্ব বুঝতে পেরে, দুনিয়ার সব রাষ্ট্রই আজ ভারতের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে ব্যগ্র। ইজ্‌ম্‌বাদের দ্বৈতসংগ্রামে, দুই মেরুতে অব-স্থিত দুই গোষ্ঠীই চাইছে ভারত নেহাৎ যদি তার দলভুক্ত না হয়, অন্তত বিপক্ষে যেন যোগ না

দেয়। ছোট ছোট অগ্রসর দেশগুলি চাইছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেড়ায় বাধা পেয়ে এতদিন তারা যে সোনার ভারতে বাণিজ্যের ফসল কুড়োতে পারেনি, আজ যেন তার ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারে। আর অনুন্নত সদ্যপরাধীনতা মুক্ত দেশগুলির কাছে ভারত তো সবদিক দিয়ে 'বড়দা'।

অতএব ভারতকে খুশী করতে হবে, শুড়শুড়ি দিতে হবে তাদের আত্মশ্লাঘায়, মর্যাদা দিতে হবে তাদের বাণীকে, প্রণাম জানাতে হবে সে বাণীর উদ্গাতা ঋষিকে। বিশেষ, ভারতের কর্ণধার নেহেরু যখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভক্তিমান; গুরুদেব বলে স্বীকার করেন তাঁকে; তাঁর বাণীকে সম্বল করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে চান; গুরুর চেলা হিসেবে মানবতার বাণী প্রচার করে বিপর্যস্ত দুনিয়াকে শান্তির পথ নির্দেশদানে শ্রদ্ধার আসন কামনা করেন, তখন সেই গুরুকে স্বীকার করাই তাঁর শিষ্যকে তোয়াজ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আমার এ বক্তব্য হয়তো অনেকেরই মনঃপূত হবে না। কারণ বিভিন্ন দেশের চিন্তা-নায়কদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত উচ্ছ্বাস শুনে তাকেই আমরা সাধারণ মানুষের এবং রাজনৈতিক নায়কদের মনোভাব জ্ঞান করে আত্মশ্লাঘা বোধ করছি। রুশ আদর্শ হয়তো অনেক কল্যাণ করতে পারবে দুনিয়ার, তবে আপাতত যতটা করেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল রাষ্ট্রের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি। এমনকি যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের জীবনে সরকারের তরফ থেকে কোনরকম হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও ঘোষণা করা হয়েছে এতদিন সে দেশেই রাষ্ট্র ক্রমশ ব্যাপকতর ক্ষমতাবিস্তারে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক ধুর-ন্ধরেরা যেখানে রবীন্দ্রভক্তি প্রকাশের কূটনীতি গ্রহণ করে, সেই নীতি জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হতে বাধ্য। আর পরিব্যাপ্ত সত্যি যদি নাও হয়, হয়েছে বলে ঢক্কানিনাদে প্রচার করা যেমন সহজ, তেমনি রাষ্ট্রস্বার্থের অনুকূল।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে রবীন্দ্র উৎসব সম্পর্কে সরকারী তথা সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উৎসাহের মূল প্রেরণাও নেহেরু তোষণ, এমন কথা মনে করা খুব অলীক হবে না। একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের ভাবে উদ্বুদ্ধ লেখক ও শিল্পী ভারতের সব ভাষা ভাষীর মধ্যেই আছে। এবং জনসাধারণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ পাঠের আগ্রহ বিরল নয়। আর সে আগ্রহ অনু-বাদেই সীমাবদ্ধ থাকেনি সবসময়, মূল রবীন্দ্রনাথ পড়বার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা শিখেছে এমন দুচার জন সব অঙ্গরাজ্যেই আছে। এত সত্বেও একথা মানতেই হবে যে, অবাঙ্গালী অঞ্চলগুলির মুষ্টিমেয় জনকয়েক প্রকৃত রবীন্দ্রগুণগ্রাহীদের উৎসাহে একটা জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত আধাসরকারী রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান কমি-টির নির্দেশে ও উৎসাহেই বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী অথবা সরকার সমর্থিত কিংবা সরকার সমর্থন লাভেচ্ছু প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত রবীন্দ্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বাংলা দেশের অনুষ্ঠান অবশ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশ্বভারতী সঙ্গীত পরিষদ, নাগরিক সমিতি, দক্ষিণী প্রভৃতি স্থায়ী ও সাময়িক প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলির অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলেও, প্রতি বছর যেসব রবীন্দ্রজন্মোৎসব হয় তার সংখ্যাও কম নয়। নববর্ষ না পড়তেই আগেভাগে সেরে নিয়েছে অতিকর্মতৎপরতার খ্যাতি-সম্পন্ন দুটি প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান।

উৎসবের আগ্রহ স্বাভাবিক ও সমীচিন। কবে কোন অজ্ঞাত যুগে শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র ও গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, আজও তার স্মারক উৎসব চলে। আর রবীন্দ্রনাথ,—যাঁর সাধনার ফল আমাদের ভাষা ও ভাষণ ক্ষমতা; যিনি এক জীবনে বাঙ্গলা ভাষাকে এগিয়ে দিয়েছেন চসারের যুগ থেকে এলিয়ট ও হাক্সলির যুগ পর্যন্ত; যিনি আমাদের দিয়েছেন জীবনদৃষ্টি, সঞ্চারিত

করেছেন জীবনবোধ, জীবন, জগৎ মানুষ ও প্রকৃতিকে বুঝতে ও আপনার করে ভালবাসতে শিখিয়েছেন; আমাদের কণ্ঠে দিয়েছেন গান, সুরের সঙ্গে ভাবের অভূতপূর্ব মিলনসাধন করেছেন, নাটক ও নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে রূপময়শিল্পসৃষ্টির নতুন দ্বার খুলে দিয়েছেন,— এককথায় আমাদের দুঃখে দিয়েছেন আশা, বিপদে দিয়েছেন শক্তি, আনন্দের রসদ জুগিয়েছেন অপর্যাপ্ত; সব অবস্থায় সবার প্রতি প্রেম অনুভব করবার মনোভাব সৃষ্টি করেছেন, বুদ্ধিকে করেছেন শাণিত বিচারবোধকে করেছেন সুসংগত, রুচিকে করেছেন মার্জিত, ক্রোধ ও উত্তেজনাকে করেছেন সংযত, অথচ উচ্ছ্বল প্রাণের উদ্বেল প্রকাশে সমান উৎসাহ দিয়েছেন, সামগ্রিক কল্যাণকে করেছেন একমাত্র লক্ষ্য—সেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসের কথা স্মরণ করে আনন্দ উৎসব করবোনা আমরা ?

রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের কর্মসূচীতে তাই উৎসবের প্রাধান্য। বলেন্দ্রনাথঠাকুর যা বলেছিলেন, "আমাদের উৎসবে অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা।" উৎসব প্রাণখুলে মিলবার অবকাশ সৃষ্টি করে দেয়, শুধু দেহের অবকাশ নয়, মনও চায় সবাইকে আপনার করে নিতে। এই সবাইকে আপনার করে নেওয়ার প্রবণতার মধ্যেই উৎসবের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর প্রকৃষ্টতম সার্থকতা সবাইকে আপনার করে নেওয়ার মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সার্থকতা যেমন ভাগবৎ-কথা শ্রবণে, চৈতন্য জন্মতিথির যেমন নামসংকীর্তনে, বুদ্ধ-পূর্ণিমায় যেমন জীবে দয়া।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসবের কর্মসূচীতে অনেক মেলা, অনেক সম্মেলন অনেক সমবেত সংগীত, অনেক নাটক ও নৃত্য নাট্যে সুসংহত টীম ওয়ার্ক-এর ব্যবস্থা হয়েছে। কতলোকে রবীন্দ্রভাবে ভাবিত হবে, দীক্ষিত হবে রবীন্দ্রনাথের রূপরসসুরের সাধনে।

কোনরকম অবজ্ঞা প্রকাশের উদ্দেশ্য নেই আমার। তবু বলছি, যারা একান্তজনসাধারণ, তাদেরই কাছে রবীন্দ্রমেলা ও রবীন্দ্র নৃত্যগীতনাটক অনুষ্ঠানে যোগদানের মূল্য সবচেয়ে বেশি। কোনদেশেই আপামর সাধারণ মহান কবির কাব্য, মহান সাহিত্যিকের সাহিত্য, চিন্তানায়কদের ধ্যানধারণা রপ্ত করে নিতে পারে না। যেদিন তা পারবে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। তারা দূর থেকে তাঁদের নাম শোনে, শ্রদ্ধা বোধ করে, দুচারটে ছিটেফোঁটার প্রত্যক্ষস্বাদ পায়। সাধারণের জীবন চলে মুষ্টিমেয় উচ্চ সমাজ তথা বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের আদর্শে; তাদের মূল্যবোধ ও উচ্চশ্রেণীর মূল্যবোধের নকলে গড়ে ওঠে। কাজেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে যদি রবীন্দ্র জীবনাদর্শনের চেয়ে রবীন্দ্র আনন্দরসই বেশি পরিবেশিত হয়, তাতে প্রমাদ গুণকার বা নাসাকুঞ্চন করবার কোন কারণ পাইনা আমি।

কিন্তু সর্বসাধারণে রবীন্দ্র আনন্দরস পরিবেশনের ব্যবস্থাটুকুও হচ্ছে না,' রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানসূচীতে এইটিই প্রথম ত্রুটি। কলকাতার ফুর্তির প্রাণ গড়েরমাঠমার্কা নিরন্তর এন্টারটেনমেন্ট পিয়াসী উচ্চ বিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাড়া কোন্ জনসাধারণকে পাত পাততে দেওয়া হচ্ছে শতবর্ষ উৎসবে ? তারা সব অনুষ্ঠানেই আনন্দ খোঁজে; অমৃতরূপী আনন্দ নয়, আনন্দের উত্তেজনাকর নেশা। তারা সর্ববিষয়ে এত বেশি জানে যে, তাদের শিখবার কিছুই নেই, তাদের মূল্যবোধ স্বার্থান্ধ তযুক্তি দিয়ে এমন লোহার ছাঁদে ঢালাই হয়ে আছে, যে কোনদিন তাতে সামান্য সংশোধন করতে রাজি হবে না তারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে তারা নাচ-গান-অভিব্যক্তি, আলোকসম্পাত, পোষাক, চেহারা উপভোগ করবে, সমালোচনা করবে; কিন্তু সবকিছু পেরিয়ে যেখানে রবীন্দ্র দৃষ্টি অসীম সার্থকতায় পৌঁছেছে—"জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে, যে অভাগিনী পাপের ভারে, চরণে তব বিনতা; ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা"—সে বাণী তাদের বধির কর্ণে ঢুকবে না, পাষাণ হৃদয়ে কোন রেখাপাত করবে না।

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসবের সরকারী বেসরকারী সব কর্মসূচীই ওই শ্রেণীর লোকেদের জন্য। গ্রামাঞ্চলে, এমনকি মফঃস্বল সহরেও কোন ব্যবস্থা নেই। একান্তভাবে স্থানীয় লোকের উদ্যোগে বিদগ্ধ রবীন্দ্ররুচির পরিবেশন কলকাতার বাইরে সম্ভব নয়। কলকাতার উদ্যোক্তারা সে দিকে দৃষ্টি দেবেন এমন কোন দায় পড়েনি তাঁদের। সরকারী রবীন্দ্র মেলাও বসবে ইডেন গার্ডেনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন বিভাগও পল্লীঅঞ্চলে রবীন্দ্ররস প্রচারের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে, এমন খবর শোনা যায়নি।

যায়নি কোনতরফ থেকেই। কারণ উদ্যোক্তা যারা সেই মধ্যবিত্ত বৈদগ্ধগর্বী ও বুদ্ধিজীবী সমাজও রবীন্দ্রভাবে ভাবিত নয়। তারা রবীন্দ্রনাথের নামে, তাঁর জন্মদিবস অথবা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্য করে সাংগঠনিক গ্ল্যামার অর্জনেই ব্যগ্র। রবীন্দ্রনাথকে যদি তারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতো, রবীন্দ্রভাবে যদি আপ্লুত হত তাদের সমগ্র সত্বা, তাহলে শুধু উৎসবের চেহারা নয়, সমগ্র সমাজের চেহারাই পালটে যেত।

একথা ঠিক যে কিছু অধ্যাপক অথবা সংস্কৃতিবান লোকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠ ও আলোচনা প্রভূত পরিমাণে চলে। তবে সে রকম লোকের সংখ্যা শিক্ষিতদের মধ্যেও শতকে না মেলয়ে এক। কয়েকটি জনপ্রিয় গান, গুটিকয়েক নন্দনরসের কবিতা, দুই একখানা উপন্যাস বা দুচারটি গল্পেই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের রবীন্দ্র-অধ্যয়ন সীমিত। যারা আজ সস্তায় রবীন্দ্ররচনাবলী ক্রয়ের জন্য ক্ষেপে গেছে, তাদের বেশির ভাগই পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটি পংক্তিও রবীন্দ্রনাথ পড়েনি কোনদিন, হয়তো পাঠ্যপুস্তকেও মূল লেখা বাদ দিয়ে শুধু নোটই পড়েছে। জীবনে দুটাকা দিয়েও একখানা বই কেনেনি যারা, আজ রবীন্দ্র হুজুগে সমগ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ পেতেই হবে তাদের ঘর সাজাবার জন্য, গৃহসজ্জায় বিদগ্ধ স্বীকৃতি লাভ করতে হবে।

আর যাঁরা পড়েন, যথেষ্ট পড়েন, মন দিয়ে পড়েন, প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, তাঁদেরও বুদ্ধির বিচার হল, ওগুলো পুঁথিগত। জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ইঙ্গিত যদি আপনি কোন অবস্থায় করে ফেলেন, সাফ জবাব পাবেন জীবন কাব্য নয়। অনেক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপককেও বলতে শুনেছি অমন কথা। ভাবখানা এই, কবিগুরু ওগুলো লিখেছিলেন,—যাতে ছাত্ররা ব্যাখ্যা লিখে পরীক্ষা পাশ করতে পারে; অধ্যাপকেরা পড়িয়ে জীবিকা, থীসিস লিখে ডক্টরেট ও কেতাব লিখে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন; আর নোট লেখকেরা অর্থ উপার্জন করতে পারেন অর্থপুস্তক লিখে।

কিন্তু অর্থের উপরে যে পরমার্থ, তারই সাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবন দেবতায় বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন, মানুষের প্রতি অবারিত প্রীতি, নিজের সম্পর্কে দম্ভহীন প্রত্যয়, জীবনে প্রেম, জ্ঞানে নিষ্ঠা, কর্মে আত্মনিয়োগ, সম্পদে নম্রতা, সংকটে শক্তি, বাহুতে বল, অন্তরে ভাব, বুদ্ধিতে কল্যাণ বোধ, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভবিষ্যতের প্রতি স্বাগত, যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক—এই তো রবীন্দ্রনাথ! প্রকৃতির নগণ্যতম রূপাভিব্যক্তিতে অন্তর পূর্ণ করে নেবার ক্ষমতা, অথচ অসীমের সঙ্গে একাত্মতা বোধ। যিনি সম্মানিত হতে চেয়েছেন নববীর বেশে, দুরূহ কর্তব্যভারে দুঃসহ কঠোর বেদনায়; অঙ্গ সজ্জিত করতে চেয়েছেন ক্ষতচিহ্ন অলংকারে, বিশ্বচরাচরে যাঁরা জন্মেনি বিস্বাদ 'ক্ষুদ্রখণ্ড হারাইয়া'। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা সেখানে নিষ্ঠুর হবার কামনা করেও যিনি দুর্বল ও অক্ষমের প্রতি শুধু ক্ষমাশীল সহানুভূতি নয়, সক্রিয় হস্তপ্রসারণের কর্তব্যনির্দেশ করছেন। এই রবীন্দ্রনাথকে যদি জীবনে গ্রহণ করতে না পেরে থাকি, ব্যর্থ সে রবীন্দ্র—অধ্যয়ন, সেই রবীন্দ্রানুরাগ

নিছক ভণ্ডামি। জানি যে পৃথিবীতে "হিংসা ব্যাঘ্রিনীর থরনখতলে চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্মকাজ," সেখানে হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে রবীন্দ্রজীবনাদর্শ খানিকটা খর্ব করে নিতে হয় প্রয়োজনবোধে, কিন্তু মূলত তাঁর জীবনদর্শন যদি গ্রহণ না করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আমার, আমি রবীন্দ্রনাথের, এ দম্ভ করার কতটুকু অধিকার আছে আমার ?

অথচ এই দম্ভ আজ শুনেছি, কিছুটা রক্তসম্পর্কের দাবিতে, কিছু ব্যক্তি সান্নিধ্যের, কিছুটা হয়তো বা রবীন্দ্রসম্পর্কিত গ্রন্থরচনার ভিত্তিতে। আজ যাঁরা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদযাপনে নেতৃস্থানীয়, তাঁরা যদি রবীন্দ্রভাবে কিছু মাত্র ভাবিত হতেন, তাহলে আজ রাষ্ট্রশক্তির কাছে নতজানু হয়ে থাকতো না বুদ্ধিজীবী সমাজ। বজ্রকণ্ঠে সত্যবাণী ঘোষণা করে, মনের সত্যকে লোভের কাছে বলি না দিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকেও সত্যপথে চালনা করতে পারতেন তাঁরা। ব্যর্থ বিপর্যস্ত নৈরাশ্যে ভরা জনগণকে আলোক দেখাতে পারতেন; রাষ্ট্রের মুখচেয়ে আত্মগ্লানির পঙ্কে ডুবে মরছে যারা, তাদের হয়ে 'আহা উহু' না করে, বাঁচবার প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারতেন তাদের মধ্যে।।

তা পারেননি কেউ, না কবি সাহিত্যিকেরা, না অধ্যাপক প্রচারকেরা, কারণ, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষা আমরা রপ্ত করে থাকলেও, তাঁর দেওয়া ভাব আমরা আত্মসাৎ করতে পারিনি, বাইরের জিনিষ করে রেখেছি, এবং তার কারণ, সে ভাব ক্ষুদ্র স্বার্থপরায়ণতার বিরোধী। আর পোষাকী রবীন্দ্র প্রীতি ও বহিরঙ্গ রবীন্দ্র পাঠ অন্তরে ক্ষুদ্রস্বার্থের জড় নষ্ট করতে পারে না।

এযে কতবড় দুঃখ তার সীমা পরিসীমা নেই। এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীর সৌরদীপ্তির পূর্ণপ্রকাশ বাঙময়তায়, আর সেই প্রকাশের ভাষায় আমাদের জন্মগত অধিকার। বাঙালীর হাজার দুর্ভাগ্যকে ছাপিয়ে উঠেছিল এই এক বিরাট সহজাত সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের উত্তরাধিকার আমরা হেলায় বিলিয়ে দিয়েছি। এতটুকু চেষ্টা করিনি সেই ভাষায় প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনদর্শন ব্যবহারে আমাদের সত্বাকে সরস করে নিতে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রজীবনসাধনার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হয়েও আমরা সে উত্তরাধিকার মুদ্রিত পত্রের গুপ্তগুহায় নিহিত করে রেখেছি, দেশী-বিদেশী সবাইকে 'তাই' দেখিয়ে আত্মশ্লাঘা বোধ করেছি, দেখ কতবড় সম্পদ আছে আমার, কিন্তু তা ভোগে লাগাতে পারিনি, বড় জোর গৃহসজ্জা করে রেখেছি। একি কম লজ্জা !

অবাঙালীর কাছে মূল রসের কতটুকুই বা পৌঁছে দিতে পারে অনূদিত রবীন্দ্র সাহিত্য। আজও তাই ভারতের অন্যপ্রদেশের ভারি ভারি লোকের মুখে শুনতে পাই, 'আই ডোন্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হাউ রবীন্দ্রনাথ গট দি নোবেল প্রাইজ'। সাহিত্যের ডক্টরেট ধারী ইয়োকে-আমেরিকানদের রবীন্দ্র জ্ঞানের দম্ভ আজও টমসন-এর বই পড়ায়; যে টমসন "অরূপ রতন"কে ইংরেজীতে করেছিলেন 'আগলি জেম'। সেই টমসন- এর মারফত রবীন্দ্রনাথকে কতটুকু যে তারা বুঝতে ও রসগ্রহণ করতে পারছে, তা সহজেই অনুমেয়। দুঃখ, এই আজও বাঙালী রবীন্দ্রবিশারদেরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইংরেজীতে বই লেখার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারছেন না। দীনতম অবস্থার গ্লানি ঘোচাবার যে সাতরাজার ধন এক মাণিক আছে আমাদের ঘরে, সে মাণিক্যের দীপ্তি আমরা যদি তুলে না ধরি, কে ধরবে ? রবীন্দ্রপাঠরূপ মধুর সাধ মেটাবার জন্য হয়তো অনুবাদের গুড় বিকল্প হিসেবে ব্যবহার্য হতে পারে। কিন্তু মূলের রসগ্রহণ যে না করবে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে হুমায়ুন কবীর রাষ্ট্রীয় কর্তব্যে অতিব্যস্ত। ডক্টর শ্রীকুমার ব্যানার্জি, অমিয় চক্রবর্তী, ভবানী ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়—এ'রা কেউ কি এদিক দিয়ে সচেষ্ট হতে পারেন না। অথচ অনুবাদের

ওপর আমাদের এমন ঝোঁক যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীপাঠ্যনির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত হয়। কোন্ দুঃখে ইংরেজীতে রবীন্দ্রকবিতা পড়বে বাংলার ছেলেরা ? আর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষায়ই বা অনূদিত রবীন্দ্র কবিতা পাঠের সার্থকতা কতটুকু ? এই সব সাধারণ বিচারও করেন না আমাদের শিক্ষাবিদেরা।

শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে ভারতসরকার রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনার ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছে টুয়ার্ডস্ ইউনির্ভাসাল ম্যান। এ জন্য সরকার তথা একাজের উদ্যোক্তা হুমায়ুন কবীর জাতির কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। কিন্তু বাঙালী পণ্ডিতদের রচিত ইংরেজী রবীন্দ্র আলোচনা গ্রন্থ এই উপলক্ষ্যে প্রকাশ করার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। আরও প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য দেশের মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাঙলা অধ্যাপনার প্রবর্ত্তন করা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে যদি আমরা আজও বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে না পারি, তবে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা হয়ে কি গৌরব লাভ করলো বঙ্গ ভাষা! একাজ সম্বন্ধে অবহিত না হলে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসবের সব আড়ম্বর ব্যর্থ। রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার খাড়া করা ছলনা মাত্র।

তবু আমরা সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেই করবো রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে। করাণ উৎসব-প্রিয় বাঙালীর ধর্মাচরণও উৎসব। তার দুর্গাপূজা একাধারে দুর্গোৎসবও বটে। কিন্তু "আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাইরের সমারোহ তার প্রধান অঙ্গ নয়।" আর পূজো বাদ দিয়ে উৎসব কোনদিন স্বীকার করিনি আমরা। পূজায় চাই শুদ্ধাচার, চাই মন্ত্রোচ্চারণে নিষ্ঠা ও প্রার্থনায় আন্তরিকতা। শুদ্ধাচার, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই হবে আমাদের রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রধান উপচার। রবীন্দ্র আদর্শে জীবন চালিত করবার ও রবীন্দ্র জীবন দর্শনে ভাবিত হবার সংকল্পই হবে প্রকৃত শুদ্ধাচার। সেদিকে আমাদের উদ্যোক্তাদের কতটা আগ্রহ আছে জানিনা, হয়তো এতটুকুও নেই।

তার বদলে রবীন্দ্রশতবর্ষ ব্যবসাদারি গওকা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এইচ, এম, ভি যখন শতবর্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীতের শতসংখ্যক রেকর্ড প্রকাশ করে, তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার করে আমরা তাদের তারিফ করি। যে প্রাচীন কাহিনীটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'সামান্য ক্ষতি' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন, সেই কাহিনী অবলম্বনের ওজুহাতে যখন উদয়শঙ্কর রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য প্রয়োগের আঙ্গিক সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেও তাকে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য ঘোষণা করেন, শতবর্ষ উৎসবকে ব্যবসাদারি কাজে লাগানোর সেই প্রচেষ্টা গ্লানিকর হয়ে পড়ে। নৃত্যনাট্যব্যবসায়ী উদয়শংকরের বেলায় সে ব্যবসাদারি প্রচেষ্টা যদি বা মার্জনা করা যায়, অব্যবসাদার পণ্ডিত ও নিঃস্বার্থ রবীন্দ্ররসপিপাসু বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে যখন দেখি রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উৎসবের সুযোগকে বাস্তব লাভের কাজে লাগাতে তখন তা অসহ্য হয়ে ওঠে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরাও বাঙলাভাষা সম্পর্কে দৈন্যবোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। জীবনে ও উচ্চশিক্ষায় যারা ইংরেজী-নবীশ হয়ে উঠতে পারেন নি, এযুগের মনুসংহিতার সেইসব শূদ্রদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে আবেদন করেছিলেন, সে আবেদন আজও বাঙলাদেশেই অগ্রাহ্য। পংক্তি ভোজনে তারা তো বসতে পাচ্ছেই না। বাইরেও তাদের পাত পাড়তে দেওয়ার প্রস্তাবে এখন পর্যন্ত তীব্র বিরোধিতা প্রকাশ পায়।

এসবের জন্য দুঃখ তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ যা যা নিষেধ করে গেছেন সেইগুলো করে তাঁর আত্মাকে আমরা নিগ্রহ করছি। 'রবীন্দ্র সরোবর' তাঁর

জীবিত কালে হলে মনের দুঃখে তিনি তাতে ডুবে মরতেন কিনা বলতে পারবো না, তবে পার্কের নাম রবীন্দ্রকানন করে আর সেখানে মাথায় কাক পায়রা বসে দাড়িতে শ্বেত আলিম্পন মাখানোর জন্য তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে, তার পরবর্তী পর্য্যায় অনুমান করতে গিয়েই মনে পড়ছে কবির কাতরোক্তি; দোহাই তোমাদের, একটা রাস্তার মাঝে আমার নামটাকে বেঁধে রেখোনা।

জীবনের যে রাজপথ বেঁধে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, সে পথ যেন দোখ নিয়ে অনুসরণ করতে পারি, আজ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সেই শুভবুদ্ধির বোধন হোক আমাদের মধ্যে। পথ দেখাও হে দেব দিবাকর আলোকে আকর!

রাখাল ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রসংগীত-শ্রোতার ভূমিকা

ভারতীয় সংগীতের জনপ্রিয়তার উপর কোনও পরিসংখ্যান কোনও দিন হয়েছিল কিনা জানা নেই তবে পরিবেশনের প্রাচুর্য্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে রবীন্দ্র সংগীত বাংগালী শ্রোতার কম প্রিয় নয়। রেডিও, গ্রামাফোন ছাড়াও এখন রবীন্দ্র সংগীতের বৈঠক বসছে ঘরে ঘরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাছাড়া প্রতিবছর যে অনুপাতে বিভিন্ন জায়গায় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন হয় তার থেকেও রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা কিছুটা আঁচ করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন লোকের মারফৎ রবীন্দ্রসংগীত ভাল লাগার কারণ জানতে গিয়ে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রসংগীতের যথার্থ সমঝদারীর অভাব এখনও রয়েছে। সংগে সংগেই কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন "তবেকি আমার নিজের মত করে কোনও শিল্প সমঝদারীর অধিকার আমার নেই?" উত্তরে তাহলে সেই পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, বলতে হবে "থাকতে পারে তবে ভাল লাগার একটা মাপকাঠি আছে তফাৎটা পেটুকের সন্দেশ ভাল লাগা, মিষ্টান্ন রসিকের সন্দেশ ভাল লাগা আর যথার্থ খাদ্য রসিকের সন্দেশ ভাললাগার মধ্যে অনুসন্ধান করুন।" শিল্প মাত্রেরই উপভোগ করবার একটা পদ্ধতি আছে। রবীন্দ্রসংগীতও এর ব্যতিক্রম নয়।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রধানতঃ তিনটি দিক আছে। ভাষা, সুর ও ছন্দ। কাব্য হিসাবে রবীন্দ্র সংগীতের তুলনা অন্য কোন সংগীতের সংগে করা চলেনা, এক কথায় অতুলনীয়,—যার জন্যে ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রসংগীতকে অর্থ-সংগীত আখ্যা দিয়েছেন। কাব্য রসিক শ্রোতা প্রায়ই রবীন্দ্রসংগীত শুনতে বসে ভাষার তারিফ করেন ও তার অন্তর্গত নিগূঢ় অর্থ টেনে বের করবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ গান করবার জন্য রচনা করলেও সেটা যখন কাব্য তখন তার অর্থ বা ভাবটুকুর তারিফ করবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু শব ব্যবচ্ছেদ করলে যেমন "অ্যানাটমী"তে জ্ঞানলাভ হয়, যথার্থ দৈহিক সৌন্দর্য্যের হৃদয়ংগম হয়না এ ক্ষেত্রেও কতকটা সেই ধরণের অনুভূতি লাভ করা স্বাভাবিক। তবু এই ধরণের সমঝদারী যে একান্ত নিস্ফল তা বলবো না কেননা এর মধ্যেও ভাল লাগার উপকরণ রয়েছে। কিন্তু সেই জিনিষটিকে ঠিক গান ভাল লাগা বলবো না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কবিতার উপকরণ হল ভাষা। ভাষার একটা দিক অর্থ আর একটা দিক সুর: এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।" বাস্তবিক কোন কোন গানে রবীন্দ্রনাথ দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব কথা শুনিয়েছেন কোথাও বা কাব্যিক চিত্রাঙ্কনে মেতেছেন। সেখানে কবি বা

দার্শনিক তাঁদের নিজস্ব ভাল লাগার মাপকাঠি বেছে নেবেন বইকি? তাঁদের কাছে গানের সমঝদারী পিছিয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই। এই পর্যায়ের ভাল লাগা গান হল,—আকাশ ভরা সূর্য্য তারা, অরূপ তোমার বাণী, তোমার অসীমে ইত্যাদি অথবা একলা রসে হের তোমার ছবি, কিছু বলব বলে এসেছিলাম ইত্যাদি। গানগুলি সুরের মূল্যায়নেও যথেষ্ট দামী কিন্তু তার সমঝদার হয়ত অপর শ্রোতা।

এক ধরণের শ্রোতা যাঁরা কেবল মাত্র সুরের মূল্যে গান যাচাই করেন তাঁদের সংখ্যাও রবীন্দ্রসংগীত সমঝদারীতে নিতান্ত অল্প নয়। হিন্দুস্থানী গান ভারতীয় সংগীতের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। বিভিন্ন রাগরাগিনীর মাধমে তার প্রকাশ। হিন্দুস্থানী সংগীতের বৈশিষ্ট্য সুরের রূপ বিস্তার। এ দিকে রবীন্দ্রসংগীত অগ্রসর না হলেও একই সুরের বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন গান রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনেক আছে। ভৈরবী, বেহাগ, বাহার, ইমন, কেদারা, মল্লার, ইত্যাদি অনেক রাগ রাগিনী দিয়ে গড়া অনেক গান কেবলমাত্র সুরের মিষ্টত্বেই অতুলনীয়, এবং তাই শুনে কারও যদি ভাল লাগে তাতে আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। আপত্তি হবে তখনই যখন কেবলমাত্র এই সুরের কষ্টি পাথরেই সমস্ত রবীন্দ্রসংগীত যাচাই করা হবে। হিন্দুস্থানী সুরজ্ঞরা প্রচলিত রাগ রাগিনীই জানেন। তার ব্যতিক্রম দেখলেই তাদের শ্রবণ পীড়িত হয়। রবীন্দ্রনাথের সুরের ইন্দ্রজাল এমনই বিস্তৃত যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত সুরের কাঠামোতে তাকে ফেলা যায় না। সুর সমঝদারীর এইটাই মুস্কিল।

তারপর হল রবীন্দ্রসংগীতের তাল গোনা। রবীন্দ্রসংগীতের অনেক গানে তাল নেই। অনেক গানে থাকলেও কড়াকড়ি নেই। আবার এমন অনেক গান আছে যেখানে গান বিশুদ্ধ তালে বাঁধা আছে। কাজে কাজেই তালজ্ঞ ব্যক্তি গানবিশেষের তাল রাখতে গিয়ে হোঁচট খান।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতারা মোটা মুটি দুটি ভাগে বিভক্ত,—একদল, যাঁরা উত্তরভারতীয় সংগীত সমঝদারীতে পারদর্শী আর একদল, যাঁরা কাব্য এবং সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীত বিচার করেন। সুতরাং সমঝদারী যে যথার্থ হয়না একথা বলাই বাহুল্য। আমরা এবার যথার্থ সমঝদারী পদ্ধতিটি আলোচনা করব।

"ওস্তাদী" বা যাকে আমরা চলতি কথায় "ক্লাসিকাল" গান বলে থাকি সেই গান অনেকেই বলেন যে তাঁরা বোঝেন না। ভাল থিয়েটার দেখে বা ভাল সাহিত্য পাঠ করে অথচ তাঁরা একথা বলেন না। আসলে "ক্লাশিকাল" গানের প্রতি আমাদের একটা অকারণ ভীতি আছে এবং তার প্রধান কারণ হল এই যে ক্লাশিকাল সংগীত বোদ্ধারা সাধারণের মধ্যে সব সময় "তুমি কি বুঝবে" এই মনোবৃত্তির প্রচার করেন। নানান গালভরা রাগ, তাল, ও কর্ত্তবের নামগুলি উচ্চারণ করে সাধারণ শ্রোতাদের চমকে দেন। তাই বোধকরি জনসাধারণের ক্লাশিকাল গান ভাল ক'রে শোনবারও সাহস নেই।

একথা সকলেরই মনে রাখা দরকার যে যথেষ্ট গান না শুনলে তার সমঝদারী হয় না। সংগীত বিজ্ঞানের বই পড়ে সমঝদার হওয়া যায় না। গানশুনে কোনটা "সা" বা কোনটা "পা" বলতে পারলেও সমঝদারী হবেনা কিম্বা গান করতে পারলেও যে সমঝদার হতে পারবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আসল কথা হল গান শুনে তার সুরটিকে চিনতে পারা। যেমন কোন বড় গল্প বা নভেলের মূল বক্তব্যটি না বুঝলে সেই গল্পটি পরিস্কার বোঝা যায়না গানের সুরও ঠিক তেমনি একটি জিনিষ। একবার শোনবার পর সেই সুরটি যতবার শোনা যাবে ততবারই তাকে চিনতে হবে। এটা কিছু একটা শক্ত কাজ নয় কেননা সুর শুনে চিনতে পারার গুণটি জন্মগত। যিনি চিনতে পারেন না তিনি রোগগ্রস্ত, যেমন রং দেখে চিনতে না পারা (কালার ব্লাইণ্ড) একটি রোগ।

তাই বলছিলুম যে গান শোনবার প্রাথমিক গুণটি যখন আপনার অধিকারে তখন অন্যের উন্নাসিকতায় ভীত না হয়ে যথেষ্ট গান শুনুন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

মনোযোগ দিয়ে গান শুনলে তবেই একটি সম্পূর্ণ সুরের গঠনকে চেনা যাবে। তখন যে কোনও স্বর শুনেই তাকে তার আগের উচ্চারিত ও পরে উচ্চারিত স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা যায় এবং কিছুটা কালক্ষেপের মধ্যে উচ্চারিত স্বরগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ পরিস্কার ফুটে ওঠে। সুরের প্রাথমিক গঠনগুলি এই ভাবে চিনতে পারা যায় এবং এই ধরণের সুরাংশগুলিকে মনদিয়ে শুনলে একটার পর একটা ছোট ছোট নিবন্ধে সাজিয়ে ফেলা যায়। এ যেন একটি গল্পের ছোট ছোট ঘটনাগুলি। তবে তফাৎ একটা আছে। গল্পের যে কোনও অংশ যেমন পাতা উল্টিয়ে "ঝালিয়ে" নেওয়া চলে গান শোনার ব্যাপারে তার উপায় নেই। সুরের ছোট ছোট নিবন্ধ গুলি একবার শোনার পর চিনে ফেলতে হবে যাতে প্রয়োজন মত মনে মনেই ঝালিয়ে নেওয়া চলে। এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা শক্ত বলেই গানের স্থায়ী অংশটুকুকে গায়ক বরাবর শুনিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রসংগীতও এর ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রসংগীতে প্রতিটি সুরের ছোট ছোট নিবন্ধ গুলি ভাষার পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শ্রোতার কানে আসে সুতরাং প্রতিটি সুরের নিবন্ধ পরিষ্কার বোঝা য়ায়। গানের মূল বক্তব্যটিও রবীন্দ্রসংগীতে বারংবার শুনানো হয়। রবীন্দ্রসংগীত শুনতে হলে তাই সম্পূর্ণ ভাবে মনটিকে শোনার কাজে ছেড়ে দিতে হবে। এক কথায় শ্রোতা হবে সহৃদয় এবং মননশীল।

সহৃদয়, মননশীল শ্রোতার শ্রবণ পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। গান শুনে সংগীত-পণ্ডিত ব্যক্তি যখন তার সুর, তাল লয় ইত্যাদি মিলিয়ে দেখেন যথার্থ শ্রোতা তখন খোলা মনে সংগীত শুধু কান পেতে শুনেন। শ্রবণেন্দ্রিয় নিষ্ঠার সঙ্গে মনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলে। কাজটি হল ওই গল্প পড়ার মতন সংগীত ঘটনাগুলিকে একটার পর একটা সাজিয়ে চলা। তিনি জানেন যে গল্প লেখকের মতনই গায়ক সংগীতের উপসংহার টেনে দেবেন তার জন্যে অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। এই উপসংহারটি না খুঁজে পেলেই তাঁর বিরক্তি আসে। এখন দেখা যাক এই সংগীত ঘটনাগুলো কি।

গল্প তৈরী হয় বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে; ছবি আঁকা হয় রং এর রেখায়; রবীন্দ্রসংগীত—ভাষা ও সুরের মিলনে। সেই ভাষা আবার ছন্দময়। নাটকের যেমন অঙ্কচ্ছেদ হয় রবীন্দ্রসংগীতেরও তেমনি চারটি তুক,—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। এরই ভেতর নাট্যের ছোট ছোট দৃশ্যের মতন ছোট ছোট সংগীত অভিব্যক্তিগুলি মূল অভিব্যক্তির প্রকাশ কে সাহায্য করে। যেমন বিভিন্ন নাট্য চরিত্রের সংঘাতে ছোট ছোট দৃশ্যগুলি রূপায়িত হয়, তেমনি সংগীতের এই ক্ষুদ্রতম অভিব্যক্তিগুলির উপাদান হল ভাষা তাল ও সুরের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

'কবে তুমি আসবে বলে' গানখানির চারটি তুক,—

স্থায়ী— কবে তুমি আসবে বলে
আমি রইব না বসে আমি চলব বাহিরে
শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে ঝরে
আর সময় নাহিরে।

অন্তরা— বাতাস দিল দোল দিল দোল
এবার ঘাটের বাঁধন খোল ও তুই খোল
মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহিরে।

সঞ্চারী— আজ শুক্লা একাদশী হেরে নিদ্রা হারা শশী

ঐ স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি

আভোগ— তোর পথ জানা নাই নাই বা জানা নাই
তোর নাই মানা নাই মনের মানা নাই
সবার সাথে চলবি রাতে
সামনে চাহিরে।

এখানে স্থায়ী অংশের মূল অভিব্যক্তি হল "আর সময় নাহিরে" এই কথাকয়টির সুর ও তাল বিন্যাসের মধ্যে। গানের মূল অভিব্যক্তিই হল এই কথাকয়টির বিন্যাসে তাই বারংবার প্রতিতুকের শেষে এই বিন্যাসটি শোনা যায়। সারা গানটির ভেতর এইটুকু অংশের স্বর বিন্যাস ও ছন্দ সম্পূর্ণ আলাদা এবং এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে গানটির মূলরস।

কেবল স্থায়ী অংশটুকুর এই যে উপসংহার তার মূলে রয়েছে ছোট দুটি অভিব্যক্তি,—

১। কবে তুমি আসবে বলে আমি রইব না বসে আমি চলবো বাহিরে।

২। শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি পড়্‌তেছে ঝরে।

এর ভেতর শুকনো ফুলের পাতাই করেছে সময়কে ত্বরান্বিত। এবং কবির চিন্তার মধ্যে এই অভিব্যক্তিটিই সম্পূর্ণ আকস্মিক তাই সুরটিও এসেছে আকস্মিক রূপে। পঞ্চম স্বরের উপর কিছুক্ষণ থেমে সুরটি হঠাৎ কোমল ধৈবত ঘুরে এসেছে। এর ফলে পাতা ঝরার অসহায় ভঙ্গীটুকু শ্রোতার কাছে ধরা পড়ে। এমনি করে প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি শ্রোতার কানে আপনিই এসে ধরা দেয়। এদিকে শাস্ত্রপণ্ডিত শ্রোতা দেখেন ঝিঁঝিট বা বেহাগ সুরটি গড়ে ওঠবার আগেই সুরের অনাসৃষ্টি কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

অন্তরার অভিব্যক্তিটুকু অপেক্ষা কৃত সরল কিন্তু সঞ্চারীতে এসেই মন চলে যায় স্বপ্ন সমুদ্রে চাঁদের খেয়া পারাণির পথে। সহৃদয় শ্রোতার কাছে এই অংশটি একটি ছবি। এখানে কোমল ধৈবত চাঁদের খেয়াকে দিয়েছে গতি। শ্রোতার কানে এই অলৌকিক ছবিটুকু সুরের যাদুস্পর্শে আপনিই পরিস্কার ফুটে ওঠে। প্রকৃত শ্রোতা যা শুনে মোহিত হয় সেটি বেহাগ বা ঝিঁঝিট নয় কিম্বা গ ম প দ ণ ব্যবহৃত রামকেলী, কালেংড়া নয়। সে শোনে সুর ও ভাষার এক অলৌকিক অভিব্যক্তি,—একটি খেয়া পারাণির উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত,—সে শোনে তালের বৈঠার আওয়াজ। এমনি করেই শুনতে হয় রবীন্দ্রসংগীত।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

[illegible]
[illegible]

মংপু পাহাড়ে

কুজ্ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর পানে ধ্যানে চাই যদ্দুর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এলো গেলো, মোলো এরি মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
~~[illegible]~~, ~~কত মাথাকাটাকাটি~~ ~~[illegible]~~ সত্যে-অসত্যে
~~[illegible]~~।
কত মাথা-কাটাকাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্য,
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
~~[illegible]~~ নিঠুরের স্বপ্ন ও মধুরের বিস্তার।

হেনকালে একদিন বৈশাখী গ্রীষ্মে,
টানা-পাখা-চলা সেই সেকালের বিশ্বে

স মা লো চ না

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

ছিন্নপত্রাবলী।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী। দশ টাকা।

১৮৯০ সালের আগষ্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা করেন। কিঞ্চিদধিক দুমাস তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। এই সময়ের দিনলিপি নানা নামে ১২৯৮/৯৯-এর সাধনায় প্রকাশিত হয়। চৈতন্য লাইব্রেরীতে তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধটি 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি। (ভূমিকা) প্রথম খণ্ড' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সমালোচ্য গ্রন্থের তিনটি অংশ। ১) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারিঃ ভূমিকা ২) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (দিনলিপি); ৩) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারিঃ খসড়া।

পূর্ব ও পশ্চিমের সম্পর্ক কি হবে এ নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার চিন্তানায়কেরা অনেকেই নিজের নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিমের শিক্ষা পদ্ধতিকে এ দেশে প্রচলিত করার জন্য রামমোহনের প্রচেষ্টা আজ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পূর্বের যা কিছু ভালো তাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করে পশ্চিমের ভালোকে গ্রহণ করা ছিল তাঁর নীতি। কিন্তু এর প্রতি-ক্রিয়াও ছিল প্রবল—অন্ধ উগ্র দেশাত্মবোধের অনিবার্য পরিণতিতে এমন কথা প্রায়ই শোনা যেতে লাগলো যে এ দেশের সব ভাল পাশ্চাত্যের সব খারাপ। বিশেষ করে নবীন হিন্দুয়ানীর ঢেউ প্রবল হলো যখন—তখন পশ্চিমকে জড়বাদী আখ্যা দিয়ে ছোট করবার চেষ্টা বারবার হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্বকীয় বিচারবুদ্ধির আলোকে আলোকিত। পশ্চিম সম্বন্ধে অন্ধ মোহ তাঁর ছিলনা, সাহেবীয়ানার সৌখীনতা তাঁকে কখনো পেয়ে বসেনি। য়ুরোপীয় জীবনের উদ্দাম চঞ্চলতা, প্রচণ্ড গতিবেগ মানুষকে সন্তোষ থেকে সরিয়ে নিয়ে সুখের সন্ধানে ছোটাচ্ছে। তাতে কর্মের গৌরব যত বাড়ছে জীবনের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা সেই পরিমাণেই অতৃপ্ত থাকছে। অন্য-দিকে আছে এই বিপুল ভারতবর্ষ-তার স্বভাবে আছে শান্তি আর অবকাশের জন্য ক্ষুধা। একটি শান্ত নিভৃত পরিবেশে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার বিপুল শান্তি ভারতবর্ষ কামনা করে। এই দুই সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের কুৎসিত খেলা অনেকদিন চলেছে। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য দৃষ্টি সে পথে না গিয়ে সমন্বয় সাধনার পথ সন্ধান করেছে।

ভূমিকার প্রথমে ভারতবর্ষীয় মেজাজের সম্বন্ধে কবি বলছেন "আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয়; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময় নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি।" এই মেজাজের বশেই জগত থেকে আমরা শুচিবায়ুগ্রস্ত বৃদ্ধার মত দূরে সরে থেকেছি। সংসারটার সর্বত্রই মলিন, কেবল আমরাই সনাতন পবিত্র এই অভিমানে আমরা বাইরের জগতকে এড়িয়ে

গেছি। কিন্তু আজ বাইরের জগত আমাদের বেড়া ভেঙে প্রবল বেগে এসে ঢুকে পড়েছে আমাদের ঘরে। এ অবস্থায় "প্রাণমান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার বিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না—যেন এই বিশাল বিশ্বাসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচারাস্তা, আর্যজনের কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসারতা, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।"

বাইরের আলো হাওয়া ঘরে ঢুকতে দেবনা, নিজেদের অচল পবিত্রতায় অনড় হয়ে থাকবো একেই তিনি বলেছেন আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা। এই কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন "অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে।" এর থেকে বাঁচবার লড়াই বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সুরু হয়েছিল। সে লড়াই নতুন করে সুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ছুৎমার্গের বাঁধ ভেঙে বাইরের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন "এখন সমস্ত জাতিকে রক্ষা করতে হবে, কেবল টিকি এবং পৈতেটুকু নয়। আপনার সমগ্র মনুষ্যত্বকে মানবের সংস্রবে আনতে হবে।" সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই তাই আমরা নিজেদের প্রাচীনতার অহংকারে এত সহজে ভুলে থাকি।

পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে কত যে কুৎসা রটনা হয়েছে তার শেষ নেই। তার একটি হলো এই যে শিক্ষা পেলে নারী হৃদয়হীন হয়ে ওঠে। অতএব স্ত্রীশিক্ষা চলবেনা। এ কথা এমনই বুদ্ধিহীনতার কথা যা নিয়ে তর্ক করা নিছক সময়ের অপব্যয় বলে মনে হয়। তবু এরই উত্তর তাঁকে দিতে হলো, তিনি বল্লেন "শিক্ষা এমন একটা অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা নয় যাতে করে নারীকে পুরুষ করে দিতে পারে।....শিক্ষিত রমণীও রোগের সময়ে প্রিয়জনকে প্রাণপণে শুশ্রূষা করে থাকেন, শোকের সময়ে স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধি প্রভাবে তপ্তহৃদয়ে যথাকালে যথাবিহিত সান্ত্বনাসুধা বর্ষণ করেন।" বর্তমানের অন্ধবিশ্বাস সর্বস্ব হিন্দুসমাজকে তিনি প্রাচীন সভ্যতার 'প্রেতযোনি' বলেছেন। এই অবস্থায় প্রাচ্য পাশ্চাত্তের ভালকে যদি মেলাতে হয় তবে সজীব মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ও আস্থা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।

ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রার দুর্বলতাগুলি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় জীবনের যেটি মূল ত্রুটি সেটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দুঃসাধ্য পরিশ্রম, যন্ত্রের বিপুল ব্যবহার, এমনি উপকরণবহুল করে তুলেছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যা মানুষকে তার অন্তর থেকে দুর্বল করে তুলছে। তিনি বলছেন "যেমন জাহাজে তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশদিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে।......এরকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত।" এরই সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যে এই কর্মমুখর সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থা কত বিপন্ন। সমাজের প্রবল কর্মস্রোত স্ত্রীলোকের অবস্থাকে অসংগত করে তুলেছে। এই সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ শক্তির প্রবলতা দুর্বলের আশ্রয় হরণ করেছে। প্রবল নদী যেমন নিজের পথে নিজেই বালির চর গড়ে বাধার সৃষ্টি করে তেমনি "য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে।"

পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের দ্বারা উভয়েরই দুর্বলতা কাটবে। য়ুরোপ নেবে ভারতীয় প্রকৃতির সন্তোষ আর ভারতবর্ষ নেবে য়ুরোপীয় জীবনের উৎসাহ; বলিষ্ঠতা।

যাঁরা এই সমস্যাটিকে ভাল করে জানতে চান তাঁদের "য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী" পড়তেই হবে। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও মনীষা দিয়ে এই সমস্যাটিকে যে ভাবে বিচার করেছিলেন তা চিন্তাশীল পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করবে এবং এই সমস্যাটি সম্বন্ধে আজ সত্তর বছর পরেও আমাদের ভাবিত করবে।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালার আর একটি গ্রন্থ আমাদের হাতে এলো। এ বইয়ের কিছু অংশ 'ছিন্নপত্র' নামে আগে ছাপা হয়েছে। নতুন বইটিকে ছিন্নপত্রের বৃহত্তর সংস্করণ বলা ভুল—একে সম্পূর্ণ নতুন বই বললেও অন্যায় হবে না। নামকরণটি ভালই হয়েছে—পুরানো বইয়ের নামটিকে বজায় রেখেই একটি নতুন নামে বইটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই গ্রন্থপঞ্জীতে সরবরাহ করা হয়েছে। সংক্ষেপে যেটুকু সকলের না জানলেই নয় তা হলো এই— ১) ১৮৮৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে চিঠিগুলি লেখেন। ২) ১৩১৯ সনে প্রকাশিত ছিন্নপত্রে ১৪৫টি চিঠি ছিল সংক্ষিপ্ত আকারে। এই গ্রন্থে সেগুলির পূর্ণতর পাঠ পাওয়া গেল। ৩) নতুন চিঠি (যা ছিন্নপত্রে ছিল না) এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে আরও ১০৭টি। ৪) ইন্দিরা দেবীর দুটি বাঁধানো খাতায় যে ভাবে এই চিঠিগুলি পাওয়া গেছে বর্তমান গ্রন্থে সেইভাবেই তারা স্থান পেয়েছে।

"ছিন্নপত্রাবলী" আলোচনায় আমার যাঁকে প্রথমেই মনে পড়ছে তিনি হলেন ইন্দিরা দেবী। লেখাটা যেমন খুবই বড় কথা, লেখানোটাও তেমনি অল্প নয়। চিঠি জিনিষটার সংগে অন্য ধরণের লেখার তফাৎ এই যে এর একজন নির্দিষ্ট পাঠক আছে। সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর মত সে অজানা নয়। তার মন তার স্বভাব, তার শিক্ষা, তার গ্রহণ করবার ক্ষমতা সবই পত্র লেখকের জানা থাকে। লেখকের রচনার মান নির্ভর করে তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মনের গভীরতার উপর। এই ক্ষেত্রে ইন্দিরা দেবীর কি গুণ ছিল যাতে কবিকে তিনি সুদীর্ঘ পত্র রচনায় লাগাতে পেরেছিলেন? রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইন্দিরা দেবী সম্বন্ধে বলছেন তাঁকেই লেখা ১৮৯৪ সালের ৭ই অক্টোবরের চিঠিতে, "তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভাল লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।"

শুধু নিজের স্মৃতি-কথাই নয় এই ছিন্নপত্রগুলিও বাংলা সাহিত্যের জন্য সযত্নে রক্ষা করে ইন্দিরা দেবী আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা পেয়েছেন। কবির পূর্ণ যৌবনের বিচিত্র সৃষ্টির অন্তরালে যে ভাবপ্রবাহ চলেছিল তার চিহ্ন রয়েছে এই চিঠিগুলিতে। সেদিক থেকে এই বিস্তৃততর ও নতুন চিঠিগুলির মূল্য অসীম।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলির বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা সমকালীনে করেছি। সে সব কথার পুনরুক্তি না করে সাধারণভাবে অন্য যে কয়েকটি বিষয় আমাদের চোখে পড়েছে তারই উল্লেখ করবো।

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো মনোভাবের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে তিনি কি আশ্চর্যভাবে গানের সুরগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি যে শুধু গানের টেকনিকের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন নি, প্রত্যেকটি সুরের একটি নিজস্ব ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন, এই সুরগুলিকে

নতুন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছিলেন তার অজস্র প্রমাণ ছিন্নপত্রাবলীতে আছে। পাতা খুললেতেই চোখে পড়লো ২১শে নবেম্বর ১৮৯৪ তারিখে লেখা চিঠি—"কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগ-শোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি—ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়।" এমনি বহু সুরের ভাবরূপ দেখা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে গান রচনার বিচিত্র মানসিক অবস্থার পরিচয়ও পাওয়া যাবে। যেমন ১৮৯৪ সালে ১০ সেপ্টেম্বর লেখা একটি চিঠিতে "রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধহয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই—এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে, কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছেনা।" এমনি বহু উদ্ধৃতি দ্বারা তাঁর এই মনোভাব প্রকাশের চেষ্টাটিকে বোঝা যেতে পারে। ৫ই জুলাই ১৮৯২ সালের চিঠিতে তিনি নিজেই একথাটিকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন "যদি সব সময়েই এইরকম এক একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যেত তাহলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে—বেশ অনেকগুলো ভূপালী....এবং করুণ বর্ষার সুর—অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান—গান প্রায় কিছুই জানিনে বল্লে হয়।"

এই রাগিনীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎকে তিনি যে দেখেছেন এবং দেখবার সাধনা করেছেন তা সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগীরাই জানেন। ছিন্নপত্রের জগৎ, পদ্মার উপর বোটে দিন কাটানোর জগতে সেই সুরের রঙ মাখানো জগৎ দেখার ব্যাকুলতা সুরু হয়েছে। শুধু নিজের জীবনেই যে তিনি গানের জগৎ রচনা করতে চেয়েছেন তা নয়, বাড়ীর ছেলে মেয়েদেরও গানের রাজ্যে প্রবেশের পথ খুলতে চেয়েছেন। ১৩৫ নং চিঠিতে বলছেন "বেলি যদি দিশী এবং ইংরাজী সঙ্গীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে। সেদিন অভী যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়—পৃথিবীতে মিষ্টি গলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর।

আর কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। সেদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিঠি হলো ১৪৪নং চিঠি। যে কথা "আত্মপরিচয়"র প্রথম প্রবন্ধে লিখেছেন তারই পূর্বাভাস এই চিঠিতে আছে :— "প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়— এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বাহির্‌ভূত আর একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপর আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ।"

আর একটি চিঠির প্রতি বিশেষভাবে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হলো ১৭৬ নং চিঠি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে এ ধারণা তাঁর মনে দৃঢ় ছিল যে গদ্যের ভাষা আর পদ্যের ভাষায় একটা সুনিশ্চিত পার্থক্য আছে। গদ্য হলো আটপৌরে আর পদ্য হলো আলোয় রঙে, অলংকারে একটি সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা আবৃত। পরবর্তীকালে তিনিই অগ্রণী হয়ে পদ্যের ভাষাকে অবগুন্ঠন খুলিয়ে কাজের ভাষার কাছাকাছি করে এনেছেন। ১৮৯৪ সালেই ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাকে একটি আশ্চর্য ভবিষ্যদবাণী বলে মনে হয়। ঠাকুরদাসবাবু কিছুকাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে চাকরী করেন। বাংলা গদ্যের লেখক হিসাবে তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল। তিনি যে কথা বলেছিলেন তা রবীন্দ্রনাথ তখন স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষার আশ্চর্য বিবর্তন কেমন করে তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন —"মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পদ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে।—ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশী কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন—বোধহয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।"

উল্লেখযোগ্য বহু চিঠি আছে যা পাঠকরা সাহিত্য পাঠের আনন্দে পড়বেন এবং বিষয় বিশেষের প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পত্রে আকৃষ্ট হবেন। এ অভিযোগ আমাদের বরাবরই আছে যে এ চিঠিগুলিতে ব্যক্তি হৃদয়ের উত্তাপ বড় অল্প। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপ্রেম আর আত্মবিশ্লেষণ এমন একটি সুকুমার ভদ্রতা ও শালীনতার দ্বারা মণ্ডিত যে সাধারণ জীবনযাপনের কাহিনী প্রায় নেই-ই। তবে কয়েকটি চিঠি আছে যার মধ্যে শিশু কন্যা মীরার প্রতি পিতৃস্নেহ প্রকাশের উচ্ছ্বাসে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আর একটু সহজ ও নিকট ভাবে পাই।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ছটি ছবি, দুটি ফোটোগ্রাফ ও ইন্দিরা দেবীর অনুলিখনের একপাতা গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্র-অনুরাগী মাত্রেই এ পত্রসঞ্চয় সংগ্রহ না করে পারবেন না।

সোমেন বসু

রূপ থেকে অপরূপ
এ কী দেখি !
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাসহারা !
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন !
(চিত্রাঙ্গদা)
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
• কলিকাতা-১ •

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

রবীন্দ্রনাথ

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

একটি গ্রামের রূপান্তর

একদিকে ধানের ক্ষেত ও অন্য ধারে বনে জঙ্গলে ঘেরা একটি নগণ্য গ্রাম আজ এক **বিরাট** ইস্পাত নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেখতে দেখতে বছর দু'য়েকের মধ্যেই দুর্গাপুরের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঢালাইয়ের জন্য পিগ্-আয়রন, রি-রোলারের জন্য ফরজিং ব্লুম ও বিলেট, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্‌শন এবং রেলওয়ের জন্য **স্লিপার** ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরে তৈরি আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বিশাল ইস্পাত কারখানাটির চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হলে আরো বহু **জিনিস** উৎপাদিত হবে।

দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ্ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ ষ্টোনেক পার্কস্ এণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেবল্ গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

ISCON-24 BEN

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মানেহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন যে অচেনার বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নবম বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ আটষট্টি

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

প্রত্যেক দেশের সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার। খেতের ফসল যারা বোনে আর কাটে তাদের মহত্ত্ব আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত হয়েছে—কবিও 'কৃষাণের জীবনের শরিক'-হওয়াকে এক পরম লক্ষ্য বলে মেনেছিলেন—কিন্তু যারা এ সত্যকে স্বীকার করেছেন যুগে যুগে, কখনো বলেছেন সর্বমানবের উদ্দেশে "শৃন্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ;" কখনো বলেছেন সন্তোষ অবলম্বন করে "কৃষিমিৎকৃষস্ব"; কখনো বা "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়"; আবার "সবার উপরে মানুষ সত্য" বা "Workers of all countries unite"—তারা সকলেই ফসল বুনেছেন মানুষের চিত্তভূমিতে আর সে মানস ফসলের উপযোগিতা খেতের ফসলের চেয়ে কোন অংশেই কম উপাদেয় নয়। মানুষের চিত্ত বিকাশের এই নিদর্শনগুলিই একত্রিত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে, নিজের গৌরবেই যা মহাকালকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করেছে চিরন্তনতা। উপস্থিত বর্তমানকে যোগ্য মহত্ত্ব দিয়েও তাই এই চিরন্তন সম্পদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রত্যেক দেশ ও জাতির পক্ষে তাই নিজের ভাবসম্পদের অনুসন্ধান, মূল্যায়ন ও মর্যাদা নিরূপণ একান্ত করণীয়তার কোঠায় পড়ে।

ভারতবর্ষের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে তার চিত্তভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্পদ কালের বিচারেই শুধু নয় মহত্ত্ববিচারেও বিশ্বের দরবারে অনন্যতার দাবী রাখে। সৃষ্টির মূলে যে এক পাগল আছেন যাঁর তাণ্ডবনৃত্যের অভিঘাতে বারবারই জগতের ধারাবাহিকতা বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মানুষের প্রয়াসকে যিনি নিয়ত ধ্বংসের মধ্য দিয়েই উজ্জীবিত করে রাখেন, তাঁরই প্রভাবে যুগপ্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যও যথেষ্ট পরিমাণে বিপর্যস্ত—কোন ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা তাই আজ বহুবিঘ্নসংকুল। তবু সেই পথে উদ্যম নিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণাই মনে হয় মহাকালের নৃত্যছন্দের বাণী। সব কিছু যথাবস্থিত সুশৃংখল থাকলে মানুষ সেই উত্তরাধিকারকে পিতৃদত্ত সম্পত্তির মতই উদাসীনতা নিয়ে গ্রহণ করত, আজ যখন তা হয়ে উঠেছে প্রয়াসলভ্য তখনই তার মহার্ঘতা পরিস্ফুটতর হয়েছে। আমাদের পক্ষে এ স্বীকৃতি দুঃখকর হলেও সত্য

যে আমাদের জাতির গৌরবের উৎসসন্ধানে যাঁরা ব্রতী হয়েছেন সদ্য অতীত পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে প্রধান মনীষীরা অধিকাংশই বৈদেশিক। যে ভাষায় তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও বিচার প্রকাশ করেছেন তাও স্বাভাবিক ভাবেই অভারতীয়। বর্তমান ভারতীয় তাই জ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক চিন্তাশীলদের কাছে ঋণ স্বীকার করতে বাধ্য।

এই ভূমিকার প্রয়োজন বলা দরকার। অগৌরবের হলেও একান্ত নতুন কোনো কথা বলার অধিকার হয়ত আমরা প্রায় হারিয়েছি। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় প্রতিটি কোণ অন্বেষিত হয়েছে এবং সে অন্বেষণের আজ শুধু নতুন তথ্য উদ্ধারের দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করা যেতে পারে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ভারতবিদ্যাবিদ বহু পণ্ডিত এ দেশে এখনও পূর্বের মতই আছেন যাঁদের মতের নবীনতা ও প্রামাণ্য আমাদের একান্ত গৌরবের বস্তু তবু একথাও অবিস্মরণীয় যে অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বিচারে পূর্বপক্ষ হয়ে দেখা দেয় বৈদেশিক মত। অনেক ক্ষেত্রেই তাই বর্তমান গবেষণা পূর্বমতবিবেচনার রূপ নিয়েছে। অবশ্য দুঃখ বা অভিমান হলেও তত লজ্জার কারণ নেই যতটা আছে পণ্ডিতম্মন্যদের অবিচারিত উক্তিতে। যে বিনয় ও নিষ্ঠাকে ভারতবর্ষ আবহমান কাল পাণ্ডিত্যের লক্ষণ বলে মেনে এসেছে, অধুনা তা আর যেন স্বীকৃতি পাচ্ছেনা। তাই বোধহয় এমন সব মত প্রকাশ করেও আধুনিক সমলোচক অহঙ্কৃত অনুভব করেন যাতে তার অসমগ্রদর্শিতাই সূচিত করে। রবীন্দ্রসাহিত্য বিচারেই এ যুগের মানুষ বিদ্যার দম্ভবশে যে মত প্রকাশ করতে অকুণ্ঠিত, প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি আরও কত অবাস্তব হতে পারে তার অনুমান কষ্টসাধ্য নয়।

একথা বলার উদ্দেশ্য অবশ্যই এ নয় যে সাহিত্যে কোন বিচার চলবে না। যে ভক্তি কাউকে মেনে নিয়েই অধৈর্য হয়ে পড়ে তা শুধুই চাটুবাদ। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে তুলনাত্মক আলোচনার উদ্দেশ্য কদাচ এ নয় যে বাল্মীকিকে মহত্তর কবি বলতে হলে কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথকে হেয় করতে হবে, বা গায়টে ও ইয়েটসকে শক্তিমত্তর প্রমাণ করতে হলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অগভীর বা মিথ্যাশ্রিত বলতে হবে। মাৎসর্যবুদ্ধি বলি একে, আর অন্যের শুভকে যারা দ্বেষ করে তারা নিজের শুভও লাভ করে না। তা পণ্ডশ্রম।

ভূমিকার উপসংহারে তাই বক্তব্য দাঁড়াচ্ছে যে জাতীয় ভাবসম্পদের বিচারে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব একান্ত অবলম্বনীয়। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ কখোনই মিথ্যা বিশ্বাস নয়। শ্রদ্ধা হল সম্প্রত্যয়। কবি ও তার কাব্যের প্রতি বিশ্বাস নিয়েই অগ্রসর হতে হয়, নিজের পূর্বগঠিত সিদ্ধান্ত তাতে খুঁজতে গেলেই সুবিধাবাদের আশ্রয় আবশ্যিক হয়ে পড়ে, তখন কবির রচনায় যা অনুপস্থিত তাই খুঁজে বেড়াতে হয়। যা আছে তারই উপর গড়ে উঠবে সিদ্ধান্ত, বিপরীত পদ্ধতি নয়। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিতে দেখলে কেবল যে গুণই খুঁজে পাব তা নয় বহু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নজরে পড়বে। একথা তখন বললে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে শেকসপীয়রের ট্রাজিডিতে জীবনরহস্যের যে গভীর জটিল রূপ পাই তা কালিদাস বা বস্তুতঃ কোন সংস্কৃত নাটকেই অনুপস্থিত এবং সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে এ ঘোষণাও করব যে কালিদাসের শকুন্তলা জীবনের যে রূপটিকে, প্রেমবোধের যে অপূর্ব প্রকাশকে দুঃখসুখের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করেছে তারও প্রতিরূপ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।

এই মনোভাব নিয়েই সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম একটি বিভাগের, সংস্কৃত নাট্যকলারূপ ও তার বিকাশের অনুসন্ধান এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য। নাটক বলতে প্রাচীন ভারতীয় মনীষা কী বুঝতেন এবং নাটকের যে লক্ষণ প্রচলিত হয়েছে তার বিচার এই দুটি বিষয়ই

প্রাচীন ভারতীয়দের সৌন্দর্যবোধ ও কলাপ্রয়োগনৈপুণ্যের সঙ্গে জড়িত; সুতরাং বর্তমান ভারতীয়দের এ সম্বন্ধে সচেতনতার মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।।

আশ্চর্যজনক হলেও সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে উপলব্ধ প্রাচীনতম গ্রন্থ কোন নাটক নয়, তা হল ভরতমুনি রচিত 'নাট্যশাস্ত্র'। স্বাভাবিক ভাবে লক্ষণ গ্রন্থ রচিত হয় পরে, আগে আসে লক্ষ্যগ্রন্থ। এখানে ব্যতিক্রমটি লক্ষণীয়। লক্ষণরচয়িতা ভরতমুনির সামনে কোন কোন নাটক উপস্থিত ছিল তা আর আজ জানার উপায় নেই, তবে একথা নির্বিবাদে মানতে হবে যে আদর্শ হিসাবে বেশ কিছু নাটকই লক্ষ্য রূপে উপস্থিত ছিল তাঁর সম্মুখে, তাঁর লক্ষণরচনায় যাদের ব্যবহার অবিসম্বাদিত। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়শতকের গ্রীক দার্শনিক (এবং আলংকারিক) অ্যারিষ্টটলের অলংকার গ্রন্থে যেমন তাঁর কালপর্যন্ত রচিত সকল গ্রীকনাটকের সমালোচনা ও মর্যাদা নিরূপণ পাই তেমনি মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র সেই কালে উপলব্ধ সকল নাটককেই ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। লক্ষণরচয়িতা ভরত পূর্বভাবী নাট্যকারদের নামোল্লেখ করেন নি, নাটকের ও না, তাই সে সম্বন্ধে এটুকু মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এছাড়া কালের প্রশ্নও বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালক্রমবিচার সমস্যাজটিল। ভারতবিদ্যাবিদ মাত্রই জানেন কালনিশ্চয়ের কত বাধা। সে জটিলতা এড়িয়ে শুধু এটুকু নির্বিবাদে মানতে আপত্তি নেই যে নিশ্চিত কালনির্ণয় না হলেও মোটামুটি যে পৌর্বাপর্য বিদ্বৎমহলে স্বীকৃত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য। সেই হিসাবে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রকে রাখা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব প্রথম থেকে খৃষ্টোত্তর প্রথম শতকের মধ্যে। রচয়িতা ভরতের কাল হয়ত আরও পূর্ববর্তী কেননা নাট্যশাস্ত্রের বর্তমান রূপটিই যে প্রাচীনতম রূপ নয় একথা স্পষ্ট। গদ্যাংশ, আর্যাছন্দ ও অনুষ্টুপ শ্লোকের সংমিশ্রণে রচিত এই বিশালকায় ৩৬ অধ্যায়ের গ্রন্থখানি যে ক্রমশঃ রূপান্তর পেয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছে এ সম্বন্ধে সংশয় করা চলেনা। ঐতিহ্য অনুসারেও আদিভরত, বৃদ্ধভরত ইত্যাদির উল্লেখ এই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক শব্দটি বাংলায় যে অর্থে নাটক ব্যবহৃত হয় তা থেকে কিছু ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। বাংলায় নাটক একটি জাতিবাচক সামান্য সংজ্ঞা—প্রহসনাদি সব রকমের অভিনেয় বস্তুমাত্রই নাটক। কিন্তু সংস্কৃতে নাটক একটি বিশিষ্ট প্রকারের অভিনেয় সাহিত্য রচনার নাম। মুখ্যত দশ প্রকারের অভিনেয় রচনা স্বীকৃত হয়েছে—সমগ্র রচনা বোঝানোর জন্য সংস্কৃতে নাট্য, রূপ ও রূপক এই তিনটি শব্দ প্রযুক্ত হয়। রূপকের পরিবর্তে ব্যাপক অর্থে নাটক শব্দের প্রয়োগ বাংলায় দেখা যায়। ভরতের গ্রন্থ তাই 'নাট্যশাস্ত্র' আর অনেক পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকার ধনঞ্জয়ের গ্রন্থের নাম 'দশরূপ' বা 'দশরূপক'। অবশ্য সমগ্র নাট্যকে বোঝানোর জন্যও নাটক শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃতে দেখা যায় এবং আশ্চর্য এই যে এই প্রয়োগ সর্বাগ্রে যিনি করেছেন তিনি বাঙালী। সাগর নন্দী তার নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'নাটকলক্ষণ-রত্নকোশ' এবং তাতে সমগ্র নাট্যপ্রকারের আলোচনাই করেছেন। সম্ভবতঃ আচার্য দণ্ডী যে 'পৌরস্ত্যা কাব্যপদ্ধতি'র সাদর উল্লেখ করেছেন সেই পদ্ধতির অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন গৌড়ীয় সাগর নন্দী।

উত্তরকালের সব নাট্যশাস্ত্রীয়দের প্রধান অবলম্বন ছিল ভরতের মহাগ্রন্থ। ভরত থেকে প্রাচীনতর কোন নাট্যশাস্ত্রী ছিলেন কি না এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এই বিষয়ে আমরা কেবল দুটি নাম জানি। নাম দুটিই পাওয়া গিয়েছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্রে—শিলালি ও কৃশাশ্ব—এবং

বৈয়াকরণ নিজের সূত্রে এঁদের দুজনকেই নটসূত্র রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এঁদের নাম মাত্রই অবশিষ্ট আছে আর আছে অমরকোশে এঁদের নামে নটের নাম। শিলালির অনুযায়ীদের বলা হোত 'শৈলূষ' আর কৃশাশ্বের অনুগামীদের 'জয়াজীব'; 'ভরত' বা "ভারত" বললেও সেই এক নটকেই বোঝাত। এঁদের রচনা অনুপলব্ধ তাই এই দুই আচার্যের বিচার্য বিষয় কী ছিল নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য—তবে ইরেজ পণ্ডিত যত অনায়াসে এই নটসূত্রকে নাট্যসম্পর্ক রহিত মূকাভিনয়বিষয়ক (Pantomime) রচনা মেনে নিয়ে পাণিনির যুগে নাট্যের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করেছেন তাও সংগত মনে হয় না। Pantomime জাতীয় রচনার সংগে সংস্কৃত সাহিত্যে স্বীকৃত 'নৃত্তে'র কিছু সাদৃশ্য আছে। নৃত্য ও নৃত্তের ভেদ নির্ণয়ে বলা হয়েছে যে নৃত্যের অবলম্বন হোলো ভাবমাত্র আর নৃত্ত নির্ভর করে অভিনয়শূন্য কেবল তাল ও লয়াশ্রিত অংগবিক্ষেপের উপর—এই উভয়ই আবার রসাশ্রিত অভিনয়ক্রিয়ামণ্ডিত 'নাট্য' থেকে পৃথক। নটশব্দ সুতরাং কেবল নর্তকমাত্রকে বোঝায় না নট বলতে অভিনেতা, নর্তক ও নৃত্তকৃৎ সবই বুঝি। সুতরাং ভরতপূর্বকালে নাটকের অন্য কোনো প্রবল প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত একথা মানাই সংগত যে নাটকের প্রবৃত্তি সে যুগে আংশিকভাবে স্বীকার্য।

শিলালি, কৃশাশ্ব ও ভরত এই তিনজন ছাড়াও বহু নাট্যশাস্ত্রীর উল্লেখ ও মত সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানে দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কোহল, মাতৃগুপ্ত, ভট্টনায়ক, লোল্লট, শংকুক, নন্দিকেশ্বর আদির নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের প্রত্যেকেই নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে হয় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন নয় তো নাট্যশাস্ত্রের টীকা লিখেছিলেন। নন্দিকেশ্বর রচিত 'অভিনয় দর্পণ' মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিতও হয়েছে। সুতরাং এঁদের রচনা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হলেও একথা প্রমাণিত হয় যে নাট্যসম্পর্কিত বিচার সংস্কৃতে নিজস্ব একটি ব্যাপক ও সুদীর্ঘ পরম্পরার সৃষ্টি করেছিল। ভরতোত্তর কালে মুখ্য নাট্যগ্রন্থগুলিকে কালানুক্রমিক ভাবে নিম্নরূপে সাজানো চলে। সাগর নন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোশ (৯২০-১১০০); ধনঞ্জয়ের দশরূপক (৯৭৪-৯৯৬); অভিনবগুপ্তের নাট্যশাস্ত্রটীকা অভিনব ভারতী (১০২০ খৃঃ): শারদাতনয়ের ভাবপ্রকাশন (১১৭৫-১২৫০); রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্রের নাট্যদর্পণ (১১০০-১১৭৫); শিংগভূপালের নাটকপরিভাষা (১৩৩০) ও রূপগোস্বামীর নাটকচন্দ্রিকা (১৪৭০-১৫৫৪)। ইতিমধ্যে সাহিত্যদর্পণ রচয়িতা বিশ্বনাথ নাট্যশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্রকে একসূত্রে বেঁধেছেন। সুদীর্ঘ কালের পর আলংকারিকদের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ যেন ঋণ স্বীকার করলেন নাট্যশাস্ত্রীদের কাছে। রসকে যাঁরা কাব্যের আত্মরূপে স্বীকার করেন তাঁদের ভরত মুনির ঋণ অবশ্য স্বীকার্য। কাব্যের ক্ষেত্রে রসের মহত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে অনেক পরে—প্রাথমিক আলংকারিকেরা রসকেও অলংকার ভাবতেই অভ্যস্ত ছিলেন, কাব্যাত্মা নয়। ধ্বনিকারই প্রথম সহৃদয় যিনি ভরতমুনির সূত্রকে আশ্রয় করে রসের পূর্ণাংগ বিচার করেন এবং প্রমাণিত করেন—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ।' নাট্যশাস্ত্র থেকেই রসের স্বরূপ গ্রহণ করলেও কাব্য ও নাট্য এই দুটি পৃথক সম্প্রদায় চলে আসছিল বরাবর—অবশেষে দৃশ্য ও শ্রব্য রূপে কাব্যের বিভাগ করে বিশ্বনাথ এই উভয় অংগকে একত্র করলেন সুস্পষ্টভাবে।

সংস্কৃত নাটকের সংগে নাট্যশাস্ত্রগ্রন্থগুলির সম্পর্ক লক্ষণীয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পর দ্বিতীয় স্থান ধনঞ্জয়ের দশরূপকের। কালক্রমানুসারে এর মধ্যবর্তী যুগে নাট্যশাস্ত্রসম্বন্ধী আলোচনা অবশ্যই চলে আসছিল যে আলোচনার ইংগিত ভরতটীকাকারদের রচনায় পাই। ভরতের পর ধনঞ্জয়ের কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের নাটক সম্পর্কিত আলোচনা আজ আর পাওয়া যায় না—আংশিক উদ্ধৃতিরূপে ছাড়া। কিন্তু এমন কল্পনা নিতান্তই সংগত যে ভরতমুনির ধারা

ও উত্তরকালীন ধারা, যার প্রাচীনতম উপলব্ধ প্রতিভূ দশমশতাব্দীর ধনঞ্জয়,—এই দুইয়ের মধ্যে একটি চারিত্রিক প্রভেদ আছে। পূর্ববর্তী ধারাটিকে স্বাভাবিক বা Practical এবং পরবর্তী ধারাটিকে সৈদ্ধান্তিক বা Theoretical বলতে পারি। নাটকরচনার গৌরবময় যুগ খৃষ্টীয় প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকেই সংস্কৃত নাটকের নিশ্চিত অবনতি কাল সূচিত হয়—কোনো প্রথম শ্রেণীর নাটক এর পর রচিত হয়নি। তাই নাট্যরচনার সজীব ধারার সঙ্গে উত্তরকালের নাট্যশাস্ত্রীদের কোন যোগ ছিল না—বস্তুতঃ ধনঞ্জয়ের যোগও সংদিগ্ধ। ধনঞ্জয় ও তার পরবর্তী আলোচকেরা শাস্ত্রীয় বিচারই করেছেন মুখ্যত, নাটক রচনা ও অভিনয়ের বিশেষ বিশেষ সমস্যা তাঁদের এ বিচারে প্রবৃত্ত করেছিল বলে মনে হয় না। তাই ধনঞ্জয় থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত নাট্যালোচনায় কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই পাই, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেখি পূর্বকৃত লক্ষণের কিন্তু নতুন নতুন নাটকের উল্লেখ বা সমালোচনা পাই না। বস্তুতঃ বিশ্বনাথের দ্বারা উদাহৃত নাট্যরচনাগুলি অধিকাংশই দশরূপক থেকে গৃহীত। ধনঞ্জয় কেবল নাট্যের দশটি রূপেই মেনেছেন, উত্তর কালে আরও দশ বারটি উপরূপকের কল্পনা হয়েছে যাদের উদাহরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন- উদাহরণং মৃগ্যম্—খুঁজে নাও বাপু।

কিন্তু ভরতের প্রখ্যাত রসসূত্রের ব্যাখ্যাকারী যে কজন সমালোচকের নাম পাওয়া যায়, এবং কোহল, মাতৃগুপ্ত প্রভৃতির যতটুকু মতামত রক্ষিত হয়েছে তা থেকে এমন অনুমান করা সঙ্গত মনে হয় যে এঁরা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এঁদের রচনাগুলি পূর্ণভাবে রক্ষিত না হবারও অন্যতম কারণ সম্ভবত বিদ্বজ্জনের উপেক্ষা। অভিনেতাদের ও নাট্যকারদের সাহায্যের জন্যই প্রধানত লিখিত ও তাঁদেরই মধ্যে প্রচলিত এঁদের রচনাগুলি শাস্ত্রীয় বিদ্বানদের স্বীকৃতি অনায়াসে পায়নি, ভরতকে মুনি বলে মানলেও এবং অলংকার সম্বন্ধে বহু বিষয়ে তাঁর কাছে ঋণী হলেও আলংকারিকেরা ভরতকে তাঁর যথার্থ গৌরব দিতে সর্বদাই কুণ্ঠিত ছিলেন। নাট্যবিদ্যা ও তার প্রয়োগ ব্রাহ্মণদের পক্ষে অপ্রশস্ত এই—সিদ্ধান্তও এই মনোভাবের মূলে নিশ্চয়ই কাজ করেছে। যেটুকু আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি তা হল এই যে ধনঞ্জয় ও তৎপরবর্তী নাট্যসমালোচকদের দৃষ্টিকোণ ছিল পাণ্ডিত্যমূলক এবং নাটকের বিকাশ ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এঁদের বিচারে প্রায় অনুপস্থিত। ভরতমুনির ব্যাপক লক্ষণগুলিকে এঁরা বুদ্ধির দীপ্তিতে যথাযথ করেছেন এবং নিয়মের কঠোরতার দ্বারা অনেক পরিমাণে নাটকের সজীবতাকে কুণ্ঠিত করেছেন। ভবভূতির করুণরসের পরম চমৎকারও এঁদের দৃষ্টিতে করুণরসের মুখ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারেনি—ধনঞ্জয়ের সঙ্গে সকলে একমতই রয়ে গিয়েছেন যে শৃঙ্গার ও বীর ছাড়া নাটকে অন্য কোন রস মুখ্য হতে পারেনা। মুদ্রারাক্ষসের ঘটনাবৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক কথাবস্তু এদের স্বীকার করাতে পারেনি যে পুরাণ ও বৃহৎ কথা আদির অতি প্রাচীন কাহিনী ছাড়াও, তুলনায় অর্বাচীন কালের কাহিনীও নাটকে সফল হতে পারে।

সংস্কৃত নাটকের বসন্তকাল শেষ হয়েছে ৮০০ থেকে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই। যে কখানা শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার জন্য আমরা যথার্থ গৌরব দাবী করতে পারি তাদের সবগুলিই খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে নবম শতকের মধ্যে রচিত। এই সব নাট্যকারদের সামনে নাট্যরচনা ও অভিনয়ের সজীব পরম্পরা বিদ্যমান ছিল, নাট্যরচনার ব্যাপারে এঁরা শাস্ত্রমুখাপেক্ষী ছিলেন না। কালিদাসকে বলতে শুনি ভাস সৌমিল্ল কবিপুত্র আদির নাম। ভাসের নাটকগুলির মুখ্যতম লক্ষণ দেখি তাদের সজীবতা আর রঙ্গমঞ্চোপযোগিতা—কবির শব্দপ্রয়োগনৈপুণ্য বা শ্লোকরচনাশক্তি নয়।

সংস্কৃত নাটকের স্বরূপ ও মৌলিক প্রকৃতি জানতে হলে তাই অধুনা একমাত্র অবলম্বন

ভরতের নাট্যশাস্ত্র আর উপলব্ধ নাটকগুলি। ধনঞ্জয় থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত সব সমালোচক ভরতের চিন্তাকেই প্রোজ্জ্বল করে তুলতে সহায়ক হবেন—মূল প্রবৃত্তি বা নাট্যকারের প্রেরণা ও সমস্যার স্বরূপটি এখানে দুষ্প্রাপ্য।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শিলালি ও কৃশাশ্বের উল্লেখ মিললেও ভরত মুনির চর্চা নেই। এ থেকে ভরতের উত্তরকালীনতার নিশ্চিত প্রমাণ নয়, ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়। মোটামুটি নাট্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি, প্রসার ও পরিবর্ধিতরূপের কাল মানা হয়েছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত। ভরতের এই মহাকায় গ্রন্থ নাট্যরচনা, নাট্যাভিনয়, সম্পূর্ণ অভিনয়কলা ও প্রাসঙ্গিক নৃত্য মুদ্রা আদি সব বিষয়ের আকর ও প্রাচীনতম রচনা। এর মহত্ত্ব তাই ললিতকলা ও সাহিত্যবিদ্যা—এই উভয়ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট। আচার্য অভিনবগুপ্তপাদের টীকা, 'অভিনবভারতী' পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার সমন্বয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই টীকার সাহায্যে নাট্যকলার ব্যাবহারিক দিকটি অনেকাংশে বোধগম্য হয়ে উঠেছে। সহৃদয় ঔদার্যের সঙ্গে গভীরতম জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল আচার্য অভিনবগুপ্তপাদে আর তাই এ'র দুখানি টীকাই—নাট্যশাস্ত্রের উপর 'অভিনব ভারতী' এবং ধ্বন্যালোকের উপর 'লোচন'—বিদ্বৎমহলে বিশেষ সম্মানিত।

ভরতমুনির আর্ষ মহত্ত্ব অন্যান্য দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রবর্তক ঋষিদের মত নয়। তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক আহূত হয়ে স্বর্গে অভিনয়াদির ব্যবস্থা করতেন এমন কথার প্রমাণ ভরতের নিজের রচনা ও নাট্যকারদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। সম্ভবত নাট্যসম্পর্কিত বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভরতের ঋষিখ্যাতির সূত্রপাত এবং উত্তরকালীন মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি ইত্যাদির সশ্রদ্ধ উল্লেখে অমরত্বপ্রাপ্তি। কালিদাসও তাঁকে দিয়ে নাটকের অভিনয় করিয়েছেন [বিক্রম ঃ ২য় অঙ্ক], আবার ভবভূতিও [উত্তর ঃ ৪র্থ অংক]।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভরতমুনির নিজস্ব বিবৃতি তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়েই ঋষিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভরত বিস্তৃতভাবে বিবৃত করেছেন নাট্যোৎপত্তিকথা। লক্ষণ বলতে ঠিক ঠিক যা বোঝায় তদনুসারে নাটকের কোনো লক্ষণ ভরত করেননি, কিন্তু নাটকের স্বরূপটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন তার প্রয়োজন, অভিনয়ের উপলক্ষ্য, প্রয়োগ ও দর্শকদের বিবরণ দিয়ে। বিবরণটি উল্লেখনীয়।

পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে নাট্যোৎপত্তিবিবরণ আরম্ভ হয়েছে। নাট্যবেদের উদ্ভব কেন ও কাদের জন্য, এর অঙ্গসংখ্যা কত, অঙ্গের প্রামাণ্য কী আর এর প্রয়োগবিধিই বা কী—এই পাঁচটি প্রশ্নের জবাবে ভরতমুনি বলেছেন যে সংসারে পাপের প্রাদুর্ভাব দেখে ইন্দ্রাদিদেবগণের প্রার্থনানুসারে পিতামহ ব্রহ্মা এই সার্ববর্ণিক নাট্যবেদের রচনা করেন। প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর এতে পাওয়া যাচ্ছে। সর্বমানবের কল্যাণকামনাই নাট্যবেদের জননী এবং মানুষমাত্রের জন্যই এর উদ্ভব। এই প্রসঙ্গেই ভরত বলেছেন যে সত্যযুগে নয় ত্রেতাযুগে নাট্যের উৎপত্তি হয়েছিল। পৌরাণিক ঐতিহ্য অনুসারে সত্যযুগে মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রবল থাকে বলে সুখের প্রতি মোহ বা দুঃখের প্রতি বিরাগ থাকে না, মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মপথে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ত্রেতাযুগে মানুষ সুখকামী ও দুঃখবিরোধী হয়ে ওঠে। সহজ সুখের প্রত্যাশা তাই মানুষকে পাপের পথে টেনে আনে। এমন লোককে সৎপথে রাখতে হলে রাজদণ্ডের আশ্রয় অনিবার্য। রাজনিয়ন্ত্রণ ছাড়াই যাতে ধর্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তারই উপায় খোঁজার পরিণামে নাট্যবেদের আবির্ভাব। সত্যযুগে সত্য নিজেই ছিল আকর্ষক, এখন তাকে সুন্দর করে তোলার আবশ্যকতা অনুভূত

হয়। নাট্যের পঞ্চমবেদত্ব প্রতিপাদন ক'রে এর সর্বাতিশায়িতা এবং ব্রাহ্মণাদি সব বর্ণের পক্ষেই উপাদেয়তা দেখানো হয়েছে। বেদের অগম্য স্থানেও নাট্যবেদের গতি এর মহত্বসূচক বৈশিষ্ট।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রশ্নের বিচার এখানে সংগত। সংস্কৃতসাহিত্যের যুগবিভাগ মোটামুটি এই রকম—বৈদিক বা শ্রুতিকাল; পৌরাণিক বা স্মৃতিকাল এবং ঐতিহাসিক কাল। বৈদিকযুগে নাটক ছিল কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে বহু বিচার হয়েছে; ভরতের এই বিবৃতি থেকে এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা চলে। উল্লিখিত সত্যযুগকে যদি বৈদিকযুগ ভাবি তাহলে তৎপরবর্তী যুগে নাট্যবেদের উৎপত্তি মানতে হয়। নাট্যবেদ রচনায় পিতামহ চার বেদেরই সাহায্য নিয়েছিলেন একথা লিখে ভরতমুনি যেন স্পষ্টত ইঙ্গিত করেছেন যে বৈদিককালে নাটকের সত্তা ছিল না। আবার নাট্যবেদসৃষ্টিতে অন্যান্য বেদ উপকরণ জুগিয়েছে একথা বলে ভারতের আদি-সাহিত্য বেদের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের আঙ্গাঙ্গিভাব দেখানো হয়েছে। 'ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য [বা সংলাপ], সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় [চার প্রকারের-আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য] এবং অথর্ববেদ থেকে রস আহরণ ক'রে' ব্রহ্মা নাট্যবেদের সৃষ্টি করেন—ভরতের এই উক্তির তাৎপর্য নিম্নরূপ মনে হয়। বেদমন্ত্রের সস্বর পাঠ, বেদমন্ত্রগান, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ও অলৌকিক চমৎকার ভরা অথর্ববেদের প্রয়োগ—এই থেকেই নাট্যসাহিত্যের প্রধান তত্ত্বগুলি—সংলাপ, গান, অভিনয় ও রস সমাহৃত হয়েছে। যজুর্বেদাবিদ অধ্বর্যুকে বিচিত্রবর্ণের পাগড়ি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে দেখে আঙ্গিক ও নেপথ্য অভিনয়ের ধারণা দানা বেঁধেছিল এবং সামগানের গীতিভাগ জুগিয়েছিল গীতপ্রয়োগের ধারণা—এটা খুবই স্বাভাবিক। অথর্ববেদে প্রধানত পাওয়া যায় জাদুমন্ত্র, মারণ, বশীকরণ শান্তিমন্ত্র ইত্যাদি। এগুলির প্রভাব ও পরিণাম অলৌকিক বলেই অথর্ববেদের সঙ্গে অলৌকিক রসের সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। আর ঋকমন্ত্র কখনো গাওয়া হত না, স্বরসংযোগে পাঠ করা হত, তাই সংলাপের ধারণা এসেছে ঋগবেদ থেকে। ঋকমন্ত্রই অধ্বর্যুর উচ্চারণে বাচিক অভিনয়ের রূপ নেয়। এভাবে বৈদিক অনুষ্ঠান থেকে নাটকের ধারণা অংকুরিত হয়েছিল একথা ভাবা চলে।

এই প্রসঙ্গেই ঋগবেদের সংবাদসূক্তের উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। প্রায় ১৫।১৬টি সংবাদসূক্ত সমগ্র ঋগবেদে পাওয়া যায়। এগুলির সবই দুজনের বা তিনজনের মধ্যে কথোপকথন। কোনো এক সময় এরই সঙ্গে গদ্যাংশ যুক্ত ছিল এবং এগুলিই প্রাচীনতম নাটকের খণ্ডিত অবশেষ এমন সিদ্ধান্ত কোনো কোনো বিদ্বান করেছেন। বিলুপ্ত অংশের কল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া চলে না বলেই সে মত সর্বজনগ্রাহ্য হয় নি। তবে এই সংবাদ বা সংলাপ প্রধান সূক্তগুলির মধ্যে কতকগুলি যে নাটকীয় একথা অস্বীকার করা যায় না; আর তাই সংবাদসূক্ত থেকে নাট্যোৎপত্তি হয়েছিল এ সম্বন্ধে Sylvan Levi প্রমুখ পাশ্চাত্য বিদ্বানদের সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার বিশেষ কোনো বিরোধ নেই। ভরতের ইঙ্গিতটি এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদিক কালে পূর্ণ পরিণত নাটক ছিল না একথা বলেছি। নাটকের জন্য আবশ্যক সব উপকরণ-সংলাপ, সংগীত, অভিনয়, রসের ধারণা-এ সবই ছিল পৃথক পৃথক ভাবে। এই সব উপকরণকে মিলিয়ে আনন্দ পাওয়ার ও দেওয়ার অপূর্ব এক সাধনরূপে নাটকের উদ্ভব হয়েছে আরও পরে, সম্ভবত পৌরাণিক কালে। বৈদিকসমাজ নৃত্যগীত ইত্যাদি কলার প্রতি উদাসীন ছিল না আর তাই নাটকের অনুল্লেখ সে কালে এর পূর্ণ বিকশিত রূপের অভাবই সূচিত করে।

এ ছাড়া, বৈদিককাল ভারতীয় সাহিত্যের 'উষাকাল। বেদের কবিরা অনুভবের ক্ষেত্রে দ্রষ্টা। *জগৎসংসারকে তার বিচিত্ররূপে তাঁরা দেখেছেন পরমদেবতার* এক কাব্য রূপে, যে কাব্য 'ন মমার ন জীর্যতি। অনুভব যখন একান্ত অব্যবহিত এবং পূর্ণরূপে বাস্তব তখন সে অনুভবকে

কবিতা-রূপ হয়ত দেওয়া চলে, কেননা কবিতা সেদিক থেকে অনেক বেশি ব্যক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু নাট্য-রূপ দেওয়া কঠিন। ব্যক্তিগত অনুভবকে দর্শক সাধারণের অনুভবযোগ্য করে দেখাতে হবে—এ ভাবনার মূলে জটিলতার মানসিক ক্রিয়া আবশ্যক। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্বের বিয়োগবেদনায় ব্যথিতহৃদয় আদিকবির মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শোক শ্লোকরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু নাট্যকারকে অনেক ভাবনা ও কল্পনার সংমিশ্রণ করে তবে নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে হয়। তাই অনুভবকে নিজ চিন্তার জারকরসে পরিপক্ক করার পরই তাকে দৃশ্যরূপ দেওয়া সহজ হয়। বৈদিক কবি সন্ধ্যারাগের মাধুরীতে প্রত্যক্ষ করেছেন ঊষাদেবীকে, বিরাট আকাশের পটভূমিতে দেখেছেন শক্তিমান ইন্দ্রদেবকে, তাদের রূপকল্পনাও করেছেন মহত্তর মানুষেরই আদর্শে-তবু নিজেদের অনুভবের অব্যবহিত স্বরূপকে নাটকীয় করে তোলা সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। বৈদিক ইন্দ্রকে, রুদ্রকে বা বিষ্ণুকে ইন্দ্রঠাকুর ও কৃষ্ণঠাকুর রূপে পাওয়ার জন্য পৌরাণিক কালের ব্যবধান আবশ্যক ছিল। সেই ইন্দ্রকেই আমরা পুরাণে পাই কিন্তু তখন তার রূপান্তর হয়েছে। প্রকৃতির দুর্ধর্ষ ভয়ংকর সৃজন নাশন শক্তি কল্পনার প্রলেপ পেয়ে অনেক কোমল ও অভিগম্য হয়েছে। বৈদিক কবি করেছেন সত্যকে প্রত্যক্ষ আর লৌকিক কবি সেই প্রত্যক্ষ সত্যকে তরলীকৃত ক'রে রমণীয় করে তুলেছেন। একদিকে সত্য নিজের গৌরবেই প্রধান, অন্যদিকে সুন্দরের সচেতন ভাবনা সেই সত্যকে প্রিয় করে তুলেছে। বেদে তাই উদাত্ততম কাব্য আছে, আছে স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনার গগনচারণ; নেই ভেবে চিন্তে গড়ে তোলা মনোহর কাহিনী।

নাটকের উৎপত্তির সঙ্গে নগরের সম্বন্ধটিও লক্ষণীয়। নাটকের রচনা ও অভিনয় সে যুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও নাগরিকরুচির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করত। আর তাই নাটককে অনায়াসেই নাগরিক সভ্যতার উপহার বলতে পারি। রঙ্গমঞ্চ ও তার বিপুল আয়োজনের বর্ণনা ভরতেই পাই আর অধিকাংশ নাটকের স্থানও হয় উজ্জয়িনী, নয় পাটলিপুত্র বা অন্য কোনো নগর। এর থেকে নগরের সঙ্গে নাটকের একটা সম্পর্ক করা চলে। বৈদিকযুগে নগর গড়ে উঠতে আরম্ভ করেনি এবং নগরের মহত্ত্বও স্বীকৃত হয়নি। আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্তে গৃহবাচক বেশ কিছু শব্দ একত্রিত করলেও নগর বা পুরবাচক শব্দের কোনো চর্চা করেননি। নগরের গৌণতা এ থেকে অবশ্যই সূচিত হয়। এদিকে রামায়ণে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নগর-পত্তনের কাহিনী শোনাচ্ছেন এবং রামায়ণের কাল ত্রেতাযুগ। সুতরাং ত্রেতাযুগে কোনো সময় নাটকের উৎপত্তি হয়েছিল ভরতের এই মত বিশেষ যুক্তিসহ মনে হয়। ঐ সঙ্গে রামায়ণে নট-নর্তকের উল্লেখও স্মরণীয়।

ভরতের বিবরণে ফিরে আসা যাক। বেদ থেকেই উপকরণ নিয়ে নাট্যবেদ রচিত হয়েছিল একথা বলে ভরত যে ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে এই যে নাট্যসাহিত্য ধর্মভিত্তিক। মানুষের কল্যাণ ধর্মমার্গেই সম্ভব এবং ধর্মপথকেই আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা নাটকের মূলে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সাহিত্যের প্রথম প্রবৃত্তি ধর্মের প্রেরণাতেই হয়েছে, ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়।

নাট্যবেদ রচনা করার পরই পিতামহ ভরতকে ভার দিলেন তার প্রয়োগ করতে। ভরত তার একশো ছেলে ও উপহার পাওয়া অপ্সরাদের দল নিয়ে প্রথম নাট্য-অধিকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। পিতামহ ভরতকে বললেন যে অভিনয়ের যোগ্যতম কাল সমুপস্থিত—এই মহেন্দ্রবিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে নাট্যের প্রয়োগ হোক। আজ্ঞানুসারে ভরত দেবতাদের সামনে

নান্দীগান করে যে কাহিনীর অনুকরণাত্মক অভিনয় করলেন তার বিষয় ছিল "যথা দৈত্যাঃ সুরৈর্জিতাঃ।" বলা বাহুল্য, অসুরদের পরাভব অভিনীত হ'তে দেখে সুরগণ প্রসন্ন হলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই ভরতবর্ণিত বহু উপহার দিলেন নাট্যপ্রয়োক্তাদেব।

কিন্তু এই প্রয়োগ নির্বিঘ্ন ছিল না। প্রথম অভিনয় হয়েছিল মুক্ত আকাশের নিচে। সেখানে দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে অসুরেরাও উপস্থিত ছিল এবং বলাই বেশি যে দেবতাদের এই বিজয়কাহিনী তাদের প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। শক্তি তাদের প্রধান অবলম্বন আর তাই ভরতমুনি আর তার দলকে তারা সন্ত্রস্ত করে তুলল। ইন্দ্র অসুরদের একটি দণ্ড নিয়ে আক্রমণ করলেন এবং বিঘ্নকারীদের জর্জর করে দিলেন। অন্যান্য দেবতারাও অভিনেতাদের রক্ষা করার ভার নিলেন। দেবতাদের এই সাহায্যে কৃতজ্ঞ ভরত বিস্তৃত পূর্বরঙ্গ-বিধির প্রবর্তন করলেন, যার প্রধান লক্ষ্য হোলো জর্জরদণ্ডের উপাসনা ক'রে সর্বদেবতার করুণা ও সাহায্য কামনা । পূর্বরঙ্গ তাই নাটকের বাইরের জিনিষ, বিপদ থেকে বাঁচার প্রেরণায় এর উদ্ভব। কেবল নান্দীকে নাটকের অঙ্গীভূত করে নেওয়া হয়েছে কেননা মঙ্গলাচরণ করাকে ভারতীয় মনীষী চিরকালই অনিন্দিত শিষ্টাচার ভেবে এসেছেন।

প্রথম নাট্যাভিনয়ের এই বর্ণনা থেকে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়। অভিনয়বিধি এবং নাটকের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য এই অভিনয়ের বিবৃতিকেই আধার ক'রে দেখানো হয়েছে। পুনরায় নাটক অভিনয় করার আগে ভরতমুনি এবার দলবল নিয়ে ব্রহ্মার কাছে সংরক্ষার আবেদন জানালেন। অসুরদের বাধাদানই নাট্যাভিনয়ের প্রধান অঙ্গ রঙ্গগৃহের প্রেরণা দিল। ব্রহ্মার আদেশে স্বর্গীয় শিল্পী নির্মাণ করলেন নাট্যগৃহ এবং যাতে কোনোরকমেই অবাঞ্ছিত জন-সমাগম না ঘটে তার জন্য সব দিকে দেবতারা ও যক্ষগন্ধর্বেরা নিজের নিজের স্থান নিলেন। নাট্যকলার পূর্ণ পরিণতির সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। নাটকের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে একদিকে নটনটী ও অন্যদিকে প্রেক্ষক বা দর্শক আপেক্ষিক সম্বন্ধে যুক্ত। অসুরদের রঙ্গগৃহে প্রবেশনিরোধের দ্বারা আদর্শ দর্শকের স্বভাবের প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভরতের কালে নাট্যকলার ধারণা কতখানি বিকশিত হয়েছিল তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়।

বিঘ্নকারী অসুরদের উপস্থিত ক'রে ভরতমুনি নাটকের স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। আত্মাবমাননায় বিক্ষুব্ধ অসুরদের প্রতি পিতামহের সান্ত্বনা বাক্য নাটকের স্বরূপ বোঝার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। পিতামহ এই নবীন নাট্যকলার সমর্থনে অসুরদের বললেন যে নাটক দেবতাদের বা অসুরদের কারও একাধিকারের বস্তু নয়। এতে তো সমস্ত সংসারের ভাবানুকীর্তন হবে। অনুকীর্তন পদটি প্রয়োগ করার পর আরও স্পষ্ট ক'রে মুনি বলছেন-ধার্মিকদের ধর্মাচরণ, কামীদের কামক্রিয়া, দুষ্টের দমন, বীরের উৎসাহভাবনা, উপহাস্যের উপহাস—সব রকমের মানবপ্রচেষ্টারই প্রতিরূপ হবে এই নাটক। নাট্যকে তাই ব্রহ্মা বলেছেন-'লোকবৃত্তানুকরণ', 'সপ্তদ্বীপানুকরণ' আবার 'কৃতানুকরণ'। বলা বাহুল্য, অনুকরণ বলার দ্বারা ভরতের প্রতি অসুরদের ক্রোধের অযৌক্তিকতা দেখানো হয়েছে। দেবতাদের গৌরবিত করার জন্য অসুরদের ছোটো করা হয় নি, নাট্যকার তো সত্যপালান মাত্র করেছেন।

অসুরেরা প্রসন্ন হয়েছিল কিনা এবং নিজেদের গৌরব দেবার জন্য কোনো নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল কিনা সে প্রশ্নের উত্তর ভরত দেননি। তবে এ বিবরণ পড়ার পর স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্ন জাগে—নাটকে কি জীবনের যথার্থ চিত্রণ মাত্রই হবে?—তার উত্তর তিনি স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। ফোটোগ্রাফী কবি নাট্যকারের ক্ষেত্র নয়, তাঁদের ক্ষেত্রকে বরং চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা

করা চলে। নাটক যদিচ লোকবৃত্তানুকরণ তবু অনুকরণেই অনুকরণের শেষ নয়। উপদেশ-প্রদানকে ভুললে চলবে না। তাই পিতামহকে দিয়েই বলানো হয়েছে যে নাট্য হিতোপদেশজনক, সমগ্র জনসমাজের শান্তিপ্রদ এবং বিনোদজনক হবে। রস ও ভাব আদির যথাস্থান প্রয়োগের দ্বারা এবং বেদ-ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যা থেকে 'আখ্যানপরিকল্পনের' দ্বারা নাট্য আনন্দদানের সাধন হবে।। আখ্যান পরিকল্পন, হিতোপদেশ ও বিনোদজনকত্বের সম্বন্ধ দেখিয়ে ভরতমুনি নাট্য-সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, উত্তরকালীন আলংকারিক আচার্য মম্মটের ভাষায় তাকেই বলা হয়েছে 'কান্তাসম্মিত উপদেশ'।

সাহিত্যের উপদেশমূলকতা একটি বহু বিতর্কিত বিষয়। ভারতীয় চিন্তায় রসাস্বাদের অব্যবহিত ফল হিসাবে পরম আনন্দকে স্বীকার করা হয়েছে, তবে তার সহচারী পরিণাম সর্বদাই উপদেশ একথা ও বলা হয়েছে। মানুষের সাধারণ অনুভবের ক্ষেত্রে চিন্তন-অনুভূতি-সংকল্প যেমন সহচারী, রসানুভব বা aesthetic experience এর ক্ষেত্রেও মানসক্রিয়ার ঐ তিনটি অঙ্গই উপস্থিত থাকে। তবে রসানুভবের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ক্রিয়ার প্রাধান্য আর অন্যান্য অনুভবের ক্ষেত্রে প্রথমোক্তটি প্রধান। দার্শনিক বিচারের সূক্ষ্মতা আমাদের চিন্তনপ্রধান বোধের আনন্দ দেয় আর কাব্যের রূপাত্মক বর্ণনা দেয় অনুভূতিপ্রধান চমৎকারের আস্বাদ। তাই যে উপদেশ বোধের ক্ষেত্র থেকে আমাদের ক্ষেত্রে পৌঁছোয় তাকে প্রচার বলা চলে না। উপদেশ যখন কবির অনুভবের লোকোত্তর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে পাঠকের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয় তখন তাই রসস্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। আর, কবিও কদাচিৎ সোজাসুজি উপদেশ দেন না। যে কবি দেন তাকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলি না। এই জন্যই আচার্য অভিনব ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন—নাট্যের উপদেশ গুরুর উপদেশ নয়, নাট্য উপদেশ দেয় বুদ্ধিকে বিকশিত করার দ্বারা।

অসুরেরা অভিনয় দেখে খেপেছিল কেননা তারা সহৃদয় নয়। বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে নিজের চিত্তের ভাবাত্মক ঐক্য যারা অনুভব করেন তারাই সহৃদয়। এ'রা স্বার্থদৃষ্টি পরিহার করে সামান্য দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখেন, তাই কেউ উপদেশ দিচ্ছে এ অনুভব তাঁদের হয় না, নিজেরই সিদ্ধান্তরূপে তাঁরা আনন্দস্বাদের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রেরণা পান। মানুষের অহংকারবোধকে ক্ষুণ্ণ না করে, বরং তারই সংকীর্ণতা দূর করিয়ে বরণীয় বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আর হেয় বিষয়ের প্রতি বিরাগ জাগিয়ে তোলার এমন উপায় বস্তুত অদ্বিতীয়। কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতেই কাব্যকে সংস্কৃত আলংকারিকেরা বারবার বলেছেন 'অলৌকিক', বলেছেন রসাস্বাদ 'স্বানুভবৈকগম্য'।

এখানে অনুকরণ কথাটির সামান্য আলোচনা করা উচিত। অনুকরণকে মানুষের আদিম-বৃত্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও অনুকরণ থেকে বস্তুত যে ভাব জাগে তার প্রকাশ হাসিতে। অন্যের অনুকরণ করতে দেখে হাসি পাওয়াই স্বাভাবিক এবং ভরতমুনি তা জানতেন বলেই স্পষ্ট বলেছেন "পরচেষ্টানুকরণাৎ হাসঃ সমুপজায়তে।" তবে এখানে অনুকরণ শব্দের কী অর্থ?

এই প্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্তের বিচারটি সংক্ষেপে উপস্থিত করা উচিত হবে। এখানে অনুকরণ মানে কখনোই নকল করা নয়, কেননা, সে জাতীয় নকল কে কার করবে। অনুকরণের জন্য আদর্শের জ্ঞান আবশ্যক। রামচন্দ্র বা দুষ্যন্তকে কে দেখেছে যে অনুকরণ করবে? অন্যের চিত্তবৃত্তির অনুকরণও সম্ভব নয়। অভিনেতার শোক তারই, অনুকারী নায়কাদির নয়। কতকগুলি চেষ্টার অনুকরণ হতে পারে কিন্তু তাও রামসদৃশ হতে পারে না, বড় জোর সমান জাতীয় হবে। এ ছাড়া যে রূপে রাম ইত্যাদিকে নাটকে উপস্থিত করা হয় তা তাদের মৌলিক রূপ নয়। রামায়ণের রাম ভগবানের অবতার, কিন্তু ভবভূতির রাম সর্বাংশে

তিনিই নন, ইনি কবিকল্পিত মানুষ। যদিচ রামচরিত নাটক দেখতে বসে রামায়ণের জ্ঞান বশে রাম সম্বন্ধে বিশেষ বুদ্ধি জাগে, কিন্তু সে বুদ্ধি স্থায়ী হয় না। প্রত্যক্ষ অভিনয়ক্রিয়া সে বোধকে ব্যাহত করে এবং বিশেষ বুদ্ধি বিদূরিত হয়ে সামান্য বুদ্ধি জাগ্রত হয়। রামায়ণের রাম মানুষ মাত্রে পরিণত হন। নাটকের ক্ষেত্রে এই সাধারণীকরণ বিশেষ মহত্বপূর্ণ। তাই অনুকরণ মানে অনুভাবন, অনুকীর্তন বা অনুব্যবসায়। এ সব ক্ষেত্রেই অনুশব্দের দ্বারা একটি পূর্বরূপের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আদর্শকেই ভিত্তি করে কবিকল্পিত রূপায়ণ—এরকম মানে করতে পারি অনুকরণ পদটির। আচার্য বলেছেন লৌকিক বা বাস্তবিক করণ থেকে নাটকীয় করণকে ভিন্ন করার জন্য অনুকরণ বলা হয়েছে, আপেক্ষিকতা মাত্র সূচিত করছে বলে মুনির প্রয়োগটি নির্দোষ।

নাটক থেকে রসাস্বাদ কেমন করে হয় তার একটি সংক্ষেপ বিবরণ দেবার পর ভরতমুনির নাট্যলক্ষণবিচারের উপসংহার করা উচিত হবে। রসাস্বাদের এই মানসক্রিয়া আচার্য অভিনবগুপ্তের নিপুণ ব্যাখ্যানুসারে উপস্থিত করা হচ্ছে।

নাটক দেখতে বসে নাটকীয় চরিত্রে কবিকল্পনার সমারোপ হওয়ায় অভিনয়ের স্থান ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য গৌণ হয়ে যায় আর রাম, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ দেখে তাঁদের প্রসিদ্ধ চরিতকথা কী ভাবে প্রত্যক্ষ হতে পারে এ সম্বন্ধে অসম্ভাব্যতার নিরাকরণ হয় ও মনে হয় যে দৃশ্যমান নাটকটি রামাদির আচরণকে ভিত্তি করেই অনুরচনা। প্রসিদ্ধ রামচন্দ্রের জীবনটিই প্রত্যক্ষ করছি এই ভাবনাকে মধুর গান ও নাচ পুষ্টতর করে এবং নাট্যকে আরও হৃদয়গম্য করে তোলে। চতুর্বিধ অভিনয় নটনটীদের ব্যক্তিস্বরূপটিকে আড়াল করে এবং প্রস্তাবনা ইত্যাদির দ্বারা নাটক দেখার বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। হৃদয়কে এভাবে প্রভাবিত করার পর নাট্য দর্শকের স্বীয় অনুভূতি সমৃদ্ধ হৃদয়ে সুখদুঃখ ইত্যাদির অনুভব জাগিয়ে তোলে, আর এই উদ্বোধিত অনুভবই দর্শকের অন্তরে এক বিশেষ জ্ঞানময় আনন্দ বা বোধবিস্তৃতির রূপ নেয়। এই সংবিদানন্দই রসন, আস্বাদন, চমৎকার, চর্বণ ইত্যাদি শব্দ দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই অনুভব অনন্য।

রসানুভবের ক্ষেত্রে কারণ ও কার্য দুইই নিজের অন্তর। হৃদয়ের পূর্ব অনুভূতিই নবীন রসানুভূতির কারণ, আর দুইই অন্তর্লীন। তাই রসাস্বাদকে 'আত্মানন্দসমুদ্ভব' বলা হয়েছে। দৃশ্যমান অভিনেতা অভিনেত্রী ও তাদের অঙ্গবাক্যবেশভঙ্গিমা কেবল দর্শকের মানস-অনুভবকে উদ্বোধিত করে তোলে মাত্র আর উদ্বুদ্ধ সেই চিত্ত নিজেরই প্রকাশময় সত্তার আস্বাদে চমৎকৃত হয়। এ ব্যাপারে কাব্য ও নাটক উভয়েরই সাম্য আছে। তবে কাব্যের আস্বাদে প্রত্যক্ষ করার প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণীকরণ সেখানেও হয় কিন্তু দর্শকের চিত্তবৃত্তি বাইরের কোনো বাস্তব আলম্বন না পেয়ে অন্তর্মুখী হয়ে থাকে, যাকে 'নিমগ্নাকারিকা' চিত্তবৃত্তি বলেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। নাট্যে প্রত্যক্ষীকৃত হয় বলেই নায়ক-নায়িকা, তাদের ক্রিয়াকলাপ ও মনোভাব, অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব, হৃদয়কে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে এবং আস্বাদের তারতম্য না হলেও রসব্যঞ্জনাকে দ্রুততর করে থাকে।

ভরতমুনি নাটকের কোনো বাঁধাধরা লক্ষণ করেন নি। তিন চার বার তিনি নাটকের অভিনয় করেছেন এবং নিজের সেই অভিজ্ঞতাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। একাধারে নাট্যকার ও নাট্যসঞ্চালক হওয়ার জন্যই ভরতমুনি শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতাকে মহত্ত্ব দেন নি কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে

যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেই সবের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রস্তুত করেছেন। বলা বাহুল্য, এতে নাটকের স্বরূপটি বিশেষ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্য কথায় বলা চলে যে ভরতমুনির দৃষ্টিকোণ academic নয়, তাই তাঁর করা নাটক লক্ষণ বেশ ঢিলে ঢালা, খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে রচিত দর্শন আদি বিষয়ের লক্ষণের সুমিতশব্দপ্রয়োগ তাতে নেই।

যিনি নিজে কবি বা নাট্যকার তাঁর পক্ষে কাব্য বা নাটকের যথাযথ লক্ষণ রচনা করা অবশ্যই কঠিন। তদুপরি কাব্যসাহিত্যের স্বরূপে প্রাতিস্বিকতার (subjectivity) স্থান এতই বড় যে তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা প্রায় সাধ্যাতীত। তাই বহু চেষ্টা করেও কাব্যের সর্বসম্মত লক্ষণ আজও রচিত হল না। যা কিছু সূক্ষ্ম তাকে বোঝাতে গেলে তাই প্রতীকের আশ্রয় অনিবার্য। ঔপনিষদিক ঋষিও ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে উপমা ও রূপকের সাহায্য নিয়েছেন, কবিপদ্ধতি ও ঋষিপদ্ধতির এখানে মিল আর তাই কবিকেও ঋষির মতই ক্রান্তদর্শী আর মনীষী বলা হয়েছে। সুতরাং ভরত বলেছেন যতটা, উহ্যও রেখেছেন ততটাই।

তাই বলে ভরতকৃত লক্ষণের গুরুত্ব কমছে না। বরং মুনির লক্ষণই সত্যটিকে ঠিকমত প্রকাশ করেছে। উত্তরকালে নাটক যখন ক্রমশ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্যরচনামাত্রে পর্যবসিত হতে আরম্ভ করেছে, তখন নাটকের লক্ষণ করেছেন ধনঞ্জয়, আর সেই লক্ষণই পরে সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে। ভরতের বিবরণাত্মক লক্ষণ আর ধনঞ্জয়ের সূত্রাত্মক লক্ষণ দুটির সামান্য বিচার করলেই একথা স্পষ্ট হবে যে ধনঞ্জয়ের লক্ষণে নাটকের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বটি প্রায় অনুপস্থিত, তা নিষ্প্রাণ।

অবশ্য ভরতমুনির পদাংক অনুসরণ করেই ধনঞ্জয় নাটকের সুসংহত লক্ষণ করেছেন— "অবস্থানুকৃতি র্নাট্যম্"। ভরত নাটক বস্তুটিকে বোঝানোর জন্য ১৬।১৭টি শ্লোক রচনা করেছেন [অ ১০২—১১৮] এবং প্রত্যেকটি শ্লোকই নাটকের স্বরূপ বোঝার জন্য আবশ্যক। চারদিক থেকে যেন আলোকপাত করে মুনি তাঁর নাট্যবস্তুটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নাট্যকার, অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় ও প্রেক্ষক—এর কোনো একটি অংগও এখানে উপেক্ষিত হয় নি। ধনঞ্জয় সোজাসুজি ভরতের একটিমাত্র শ্লোককে আধার করেই নিজের লক্ষণ রচনা করেছেন। ভরতের শ্লোকটি এই—"নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্। লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্ ।। [অ ১১২] কেবল অবস্থা ও তার অনুকৃতি বললে যে নাটকের ধারণাটি স্পষ্ট হয় না তা আগেই বলেছি। ধনঞ্জয়, তদুপরি, অনুকৃতির বিশেষ কোনো অর্থের প্রতিও সংকেত করেন নি। অবস্থার অনুকৃতি কাব্যেও হয়, কথা সাহিত্যেও হয় সুতরাং এটা স্বরূপ-লক্ষণ হতে পারে না। যদিচ ধনঞ্জয় ও নাট্যকে তার দৃশ্যতার জন্য রূপ বা রূপক আখ্যা দিয়েছেন তবু এতে সম্পূর্ণ ভাবটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। ভরতের বিস্তৃত লক্ষণে, এতদতিরিক্ত, ভাবানুকীর্তন, হিতোপদেশজনন, বুদ্ধিবিবর্ধন, আখ্যানপরিকল্পন ও বিনোদজনন ইত্যাদি শব্দগুলির প্রয়োগ পাই নাট্যের বিশেষণরূপে। এবং বলাই বেশি যে এগুলির দ্বারা নাটকের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্তুত হয়েছে, শাস্ত্রসংগত সূত্রাত্মক লক্ষণ যদি বা নাই হয়।

ভরত ও ধনঞ্জয়ের তুলনা করলে একথা স্পষ্টই মনে হয় যে পূর্বোক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিকোণটি উদার এবং পরোক্ত ব্যক্তির, সংকীর্ণ। একজন নিজের বিশিষ্ট কীর্তির স্বরূপটিকে যতখানি সম্ভব প্রাঞ্জল করতে চেয়েছেন আর অন্যজন তাকে শাস্ত্রীয় সীমায় বেঁধে একটি গতানুগতিক লক্ষণ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বোধহয় এঁদের দুজনের দৃষ্টিকোণের সংগে গ্রীক আলংকারিক অ্যারিষ্টটল ও রোমান আলোচক হোরেসের দৃষ্টিকোণের তুলনা চলে। অনেক বিষয়ে ধনঞ্জয় অকারণেই দৃঢ়, যেমন নাটক ও প্রকরণে বীর ও শৃংগার ছাড়া অন্যরস প্রধান হবে না বা শান্ত

রসের নাটকে প্রয়োগই হবে না ইত্যাদি। এ সব বিষয়ে ভরত নাট্যকারকে স্বতন্ত্রতা দিয়ে নিজস্ব গভীর অনুভব ও সহৃদয়তার প্রমাণ দিয়েছেন।

সংক্ষেপে এখানে আমাদের বিচারের পরিণামটি বলা যেতে পারে।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান নাটকীয় ধারণাকে অঙ্কুরিত করেছিল। ঋক্, যজুঃ ও সাম তিনটি বেদ যথাক্রমে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় এবং গীতিপ্রয়োগের সম্ভাব্য ভিত্তি। অথর্ববেদের যাদুমন্ত্র ও মানুষের চিত্তবৃত্তির উপর তার প্রভাব রসতত্ত্বের চেতনা এনেছে। বৈদিক সংবাদসূক্ত থেকে সংলাপপ্রয়োগ রীতির বিকাশ প্রায় নিঃসন্দেহে মানা চলে।

নাগরিক সভ্যতার উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে নাটকীয় ধারণা ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। এবং কালক্রমানুসারে বেদোত্তর পৌরাণিক কালে পরিণত নাটকের উদ্ভব হয়। নাটকের পরিণত রূপের পূর্বে সম্ভবতঃ বাংলা দেশের যাত্রা জাতীয় অভিনয় হোতো কিন্তু নাটকীয় ধারণার পরিণতি রঙ্গমঞ্চকল্পন ও নির্মাণের সঙ্গে জড়িত।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের একটি পৃথক সমাজ ছিল এবং তাদের দলপতিরা উৎসবাদি উপলক্ষ্যে অভিনয়ের আয়োজন করার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। রাজা বা ধনীরা অভিনয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজক ছিলেন এবং সার্থক নটনটীদের পুরস্কৃত করা হোত।

বেদ ও ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে দলীয় নাট্যকার নিজের কল্পনা মিশিয়ে তার নাট্যরূপ প্রস্তুত করতেন। নাটকের সঙ্গে নাচ, গান ও বাজনা তিনটিই সংযুক্ত ছিল।

নাটক-অভিনয়ের উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার ছিল না, ছিল হিতোপদেশ। আদর্শ মানবমানবীর জীবনকে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থিত করে দর্শকের চিত্তে সত্যের প্রতি অনুরাগভাবনা জাগিয়ে তোলাই অভিনয়ের লক্ষ্য ছিল। দর্শক কিছু শেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে যেতেন না, আনন্দ পাওয়ার জন্যই যেতেন এবং যাতে তাদের চিত্তে ধর্ম ও ন্যায়ের প্রেরণা স্বতই উৎসারিত হয় সেই ছিল অভিনয় ও নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য। নাট্যের সফলতা নির্ভর করত দর্শকের এই স্বত উৎসারিত ভাবনার উপর।

নাটকের এই হিতোপদেশ একটি অপূর্ব বস্তু। গুরুর উপদেশ এ নয়। গুরুর উপদেশ আমরা শুনি ও বুঝি কিন্তু নাটকের উপদেশ আমরা আস্বাদ করি। পূর্বোক্ত উপদেশ মানুষকে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান দেয়, আর নাট্যের উপদেশ করায় আন্তর তত্ত্বের আস্বাদ। উপদেশকে আস্বাদ্য করে তোলাতেই নাটকের সার্থকতা আর নাট্যকারের রসসিদ্ধি।

উপসংহারে তাই আমরা একথা বলতে পারি যে সংস্কৃত নাটকের মূলে গভীর মানব-প্রেম কাজ করেছে। মানবজীবনে দুঃখের স্থানকে সংস্কৃত কবি-নাট্যকার লঘু করে দেখেন নি, তাকেই জীবনের চরম পরিণাম ভাবতে অস্বীকার করেছেন। অধর্মের দ্বারা যে সমৃদ্ধি তা যে সমূলে বিনষ্ট হয় এ বিশ্বাস তাঁদের দৃঢ়মূল ছিল বলেই দুঃখান্ত নাটকের মধ্য দিয়ে সে সত্যকে তাঁরা দেখান নি। মানুষের করুণ বিলাপের মধ্য দিয়ে তাকে অনুতাপপরিশুদ্ধ করে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে অস্তিত্ব, বিষ্ণুর কাছ থেকে বৃত্তিত্রয় এবং শিবের কাছ থেকে নৃত্য ও মুদ্রা পেলেও নাট্য ব্রাহ্ম বা বৈষ্ণব বা শৈব হয়ে ওঠে নি। সামান্য মানবের সামূহিক কল্যাণ ভাবনাতেই নাট্যের সমুদ্ভব ও এতে সর্বমানবের স্থান। মূলীভূত নাট্যধারণার বীজ থেকে পূর্ণপরিণত নাটকের বিকাশ কোন কলাত্মক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ঘটেছিল, ভারতমনীষার সেই সিদ্ধি ভিন্ন বিচারের অপেক্ষা রাখে।

নাট্যশাস্ত্রে নৃত্ত ও নৃত্য

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রীয় নাট্য-পরিকল্পনার মধ্যে নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ উপদিষ্ট হয়েছে। গান্ধর্বের প্রাচীনতম নিরুক্ত ও ঐতিহ্যের ("গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে"২৮ অঃ) মধ্যে গীত, বাদ্য ও নৃত্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাট্য প্রয়োগ ব্যাপারের সঙ্গে গান্ধর্ব সংশিলষ্ট হওয়ার ফলে নৃত্ত ও নৃত্য নাট্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। তাহলেও 'নৃত্ত'* নামে ব্যাপার মুখ্যত নাট্যের অঙ্গ নয়।

নাট্যশাস্ত্রে 'নৃত্ত' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে; নৃত্য শব্দের অবহুল প্রয়োগ আছে। উভয় পক্ষেই যাবতীয় প্রয়োগ সঙ্গত। **নাট্যশাস্ত্র ব্যতীত অপর সমস্ত গীতবাদ্য-নৃত্ত-নৃত্য নাট্যবিষয়ক শাস্ত্রে** নৃত্ত ও নৃত্য শব্দ দুটির যথেচ্ছা প্রয়োগ এবং অসঙ্গত প্রয়োগই বৈশিষ্ট্য! কোষকারের দোষ নেই।

নাট্যশাস্ত্রে 'নৃত্ত' অর্থে সর্বত্রই তাণ্ডব-বস্তু সূচিত হয়েছে। 'নৃত্য' অর্থে সর্বত্রই কোনও বিভাব-ভাব সিদ্ধির সাধক নৃত্ত বা নর্তন সূচিত। 'লাস্য' শব্দটি কদাপি নৃত্ত, বা নৃত্য, বা নর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ২০ অঃ ১৩৬ শ্লোকে 'লাস্য' শব্দ (লস্ ধাতুর শোভা অর্থে) বিলাস অর্থেই সূচিত হয়েছে। পরতন্ত্রগত নৃত্য পরিভাষা দ্বারা প্রভাবিত পাঠক সম্ভবত 'লাস্য' শব্দের নৃত্যার্থে প্রয়োগের অভাব দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারেন। কিন্তু, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। নাট্যশাস্ত্রে 'মুদ্রা-নৃত্য' নেই; মুদ্রা শব্দটি নেই। "মুদ্রক" শব্দ আছে; এক প্রকার গীতের বিশেষণ রূপে। সাম্প্রতিক প্রবন্ধে মুদ্রানৃত্য (বা মুদ্রানৃত্ত) সংক্রান্ত ইতিহাসের আলোচনা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক।

প্রসঙ্গত, পার্বতীর সঙ্গে লাস্য-নৃত্তের (বা লাস্য নৃত্যের) উদ্ভব কাহিনী ভরতোত্তর কোনও নৃত্যসম্প্রদায় কর্তৃক কল্পিত হয়েছিল। কল্পনাটি মূলে অপক্ক। সাধারণ লোকসমাজে অনেক অপক্ব অর্দ্ধপক্ক কল্পনা সিদ্ধ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; যেমন কাঁচ-কলা। এস্থলে অপক্কতাই কল্পনা, কারণ কাঁচ-কলা কখনও পাকে না, তবে শুকিয়ে বা পচে যেতে পারে। তাই তাহলেও লোক ব্যবহারে কাঁচকলা সিদ্ধপক্ক মনে করা হয়। যাই হক, সঙ্গীতরত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেব অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাস্ত্র রচনার মধ্যে ঐ অপক্ক কলা-কল্পনাকে কি হেতু স্থান দিয়েছেন বুঝতে পারলাম না। ঐ গ্রন্থের টীকাকার (যিনি নিজকে "চতুর কল্লিনাথ" বলেছেন) এতৎ প্রসঙ্গে একাক্ষর-সম্বল টীকাও করেননি, এই হেতুতে (সম্ভবতঃ) যে মূলগ্রন্থের ছিদ্রচ্ছাদন কল্পে অতিশয় জটিল টীকা জাল প্রস্তুত করা, অথবা প্রসঙ্গ একেবারে উল্লঙ্ঘন করাই ছিল টীকারচনার শিষ্ট পদ্ধতি। শার্ঙ্গদেবের প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত সার হল যথা পার্বতীই লাস্য নৃত্যের উদ্ভাবক, এবং লাস্য নৃত্য হল "মকরধ্বজ-বর্ধনম্।" এবং অবশ্য, পার্বতী ভরতের সম্মুখেও লাস্য নৃত্ত করেছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে মানব, ঈশ্বরীকল্পা তদীয়া পত্নী পার্বতীকেও মানব, ভরতকে মনুষ্য বিশেষ রূপে স্বীকার করব এতে ক্ষতি নেই। পার্বতী ভরতের সম্মুখে নৃত্ত বা সুকুমারাঙ্গ নৃত্য করুন, তাতেও অসঙ্গতি নেই। কিন্তু—সেই নৃত্ত বা নৃত্যকে "মকরধ্বজবর্ধন" মনে করে মহাদেব বা পার্বতী বা ভরত কার কি লাভ হয়েছিল, বুঝা অসম্ভব। বরং অনাদি কাল থেকে বেশ্যা-

গণ লাস্য নৃত্য করে, এখনও করে, এবং পরেও করবে, এরকম তত্ত্বপ্রস্তাবনা (ইং থিসিস্) সমীচীনতর, কারণ এর মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্তমান।

নৃত্তের ঐতিহ্য

নাট্যশাস্ত্রে ৪ অধ্যায়ের আরম্ভে একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আছে। ভরত মুনির বাক্য দ্বারা এই কাহিনী বাহিত হয়েছে। ব্রহ্মা ও ভরত মহাদেবের সমক্ষে 'ত্রিপুরদাহ' নামে ডিমসংজ্ঞক নাট্য প্রয়োগ করেছিলেন। মহাদেব স্বয়ং এই নাট্যের নায়ক হলেও ব্রহ্মা-ভরত এই নাট্যের মধ্যে মহেশ্বরোচিত নৃত্ত প্রযোজিত করতে অক্ষম হয়েছিলেন, কারণ সেই নৃত্ত করণ-অঙ্গহার-রেচক ইতি মৌলিক উপাদান দ্বারা প্রয়োগ বা উদ্ভাবনের রহস্য ব্রহ্মা-ভরতাদির অজ্ঞাত ছিল। মহাদেব উক্ত প্রকার নৃত্তের প্রয়োজন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে ঐ অজ্ঞাত-পরিচয় নৃত্তপদ্ধতি উপদেশ করতে অনুরোধ করলে মহাদেব তদনুচর তণ্ডুনামে ব্যক্তিকে আদেশ করেছিলেন; বলেছিলেন "ভরতের উপকারার্থে" উক্ত অঙ্গহারাদির প্রয়োগ উপদেশ কর। অতঃপর, তণ্ডু নানাকরণযুক্ত অঙ্গহারপ্রয়োগ সকল উপদেশ করেছিলেন। ভরতমুনি শেষে বলছেন "সম্প্রতি এই ব্যাপার সকলই উপদেশ-ব্যাখ্যান করব"।

একে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী মনে করার হেতু এই যে ঘটনা, ঘটনাশ্রিত ব্যক্তিদের বাক্-প্রসঙ্গ, এবং শ্রুতি-ধারক ব্যক্তির অস্তিত্ব ইতি সমস্তই আহৃত রয়েছে। শ্রুতিচ্ছেদ ঘটেনি। বিষয় প্রসঙ্গ লৌকিক বা অলৌকিক যে রূপেই হক কাহিনীর ধারক-বাহক বা প্রচারক ব্যক্তির সন্ধান বা পরিচয় না থাকলে সেই কাহিনী শ্রুতিচ্ছেদ দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। নির্দোষ কাহিনী থেকে নির্দোষ সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা যায়। কিন্তু, শ্রুতিচ্ছেদ যুক্ত কাহিনী থেকে নির্দোষ সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা অসম্ভব। ৪ অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনী থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা যায়।

প্রথম, নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে ব্রহ্মাই সর্বপ্রথম কবি। **ভরত সর্বপ্রথম নাট্যপ্রযোক্তা এবং অঙ্গহারাদি সমন্বিত নৃত্তের সর্বপ্রথম গ্রাহক, ধারক ও বাহক।** তণ্ডু **নামে ব্যক্তি বিশেষ উক্ত নৃত্তের সর্বপ্রথম শিক্ষক।** মহাদেব নামে ব্যক্তি বিশেষ উক্ত নৃত্তের সর্বপ্রথম কর্তা অথবা উদ্ভাবক। "বাল্মীকি অথবা কশ্চিৎ শুক্রাচার্যই সর্বপ্রথম কবি" ইতি দ্বিধাগ্রস্ত জনশ্রুতির পূর্বে কোনও কালে "ব্রহ্মা সর্ব প্রথম কবি" ইতি শ্রুতি প্রবাহিত ছিল।

দ্বিতীয়, নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে "অমৃতমন্থন" ও "ত্রিপুরদাহ" নামে দুটি নাট্যই আদ্যতম।

তৃতীয়, **পূর্বরঙ্গে এবং নাট্যে কি প্রকার উপলক্ষে উৎকৃষ্ট নৃত্তের যোজনা প্রথম উপদেশ করা হয়েছিল,** এই কাহিনীর মধ্যে সেই উপলক্ষের বীজশ্রুতি আছে। কিন্তু, এই ঘটনাকে

*[অভিধানে নট্ ধাতুর অর্থে নৃত্ত বা নর্তন পঠিত হয়। ফলে নট ও নৃতি ধাতু উভয়ই একার্থবাচক হয়ে পড়ে। অমর কোষ মতে আবার তাণ্ডব, নটন, নাট্য লাস্য ও নৃত্য সমস্তই নর্তন বাচক। অথচ 'নৃত্ত' শব্দটি নেই। যে কালে কোষকার নাট্য নৃত্য ও লাস্য এই তিনটি শব্দ একার্থ বোধক রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তখন বুঝতে হবে সমসাময়িক কাব্য সাহিত্যকারগণ ঐ তিনটি শব্দকে একার্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন; অর্থাৎ বস্তু রূপগত বিভিন্নতার বোধ এঁদের মস্তিষ্ক থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। এরকম অচিন্ত্য ভেদাভেদ বুদ্ধির নিদর্শন একটি প্রবাদ বাক্যের মধ্যে ধরা আছে, যথা "যার নাম চালভাজা তাকেও বলি মুড়ি। যার মাথায় পাকা চুল তাকেই বলি বুড়ি!"

নৃত্তোৎপত্তি বলা যায় না। যথা 'বিশ্বকর্মা রথের চক্র উদ্ভাবন করেছিলেন' বললে রথ নির্মাণেরও বহু পূর্বকাল থেকে সাধারণ শকটযানের চক্রনির্মাণ পক্ষে বিশ্বকর্মাই উদ্ভাবক এরূপ সিদ্ধান্ত অযুক্ত। কে কবে সর্বপ্রথম চক্র নির্মাণ করেছিল এরূপ প্রশ্নই অসমীচীন। অনাদিকাল থেকে নৃত্ত চেষ্টা বর্তমান। ভরত মুনি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। "সৃষ্টির আদিতে সর্বপ্রথম কে নৃত্ত উদ্ভাবিত করেছিল" ইত্যাকার মূঢ়প্রশ্ন করে তিনি মহাদেবকে বিরক্ত করেননি। মহাদেব ও নির্বোধ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি বলেননি যে তিনিই সর্বপ্রথম নৃত্তোদ্ভাবক। বরং তাঁর কথার ভাবে বুঝা যায় (১) ত্রিপুর দাহের ঐতিহ্য মহাদেব জানতেন, (২) মহাদেব লোকনৃত্তের ('ইং ফোক্-ডানস্) অতিরিক্ত বিশিষ্ট এমন নৃত্ত ও নাট্য পদ্ধতি অবগত ছিলেন, যা ব্রহ্মা ও ভরত জানতেন না, এবং (৩) মহাদেব নিজেই নৃত্ত শিল্পী ছিলেন।

চতুর্থ নাট্যশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে ভরত মুনি তণ্ডুর নিকট অঙ্গহার নৃত্তের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিলেন; তণ্ডু স্বয়ং মহাদেবের শিষ্য ছিলেন। অর্থাৎ—মহাদেব-তণ্ডু-ভরত ইতি শ্রুতি-সূত্র। এবং এইই যথেষ্ট; নচেৎ হয় অনবস্থা, না হয় অলীক অপ্রামাণিক কল্পনার জাল রচনা করতে হয়। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ ঐ নিন্দনীয় কার্যটি করেননি। অপরাপর নৃত্যসম্প্রদায় সকল ঐ রকম কার্য করেছেন, এবং জালটি সর্বভারতীয় সংস্কৃতিকে অষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রেখেছে*।

শাখা-ঐতিহ্য, শাখা-শ্রুতি

উক্ত মূল ঐতিহ্যের অনুপূরক রূপে দুটি শাখা-শ্রুতি বা শাখা-ঐতিহ্য নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি পাওয়া যায় ৪ অধ্যায়ে ২৪৬ শ্লোকের উত্তরার্ধ থেকে ২৫৮ শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত স্তরে (শ্লোক সংখ্যা বিপর্যস্ত)। দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় ৩১ অধ্যায়ে ২২৬ শ্লোক থেকে ২২৯ শ্লোক স্তরে। সংগ্রহ শাস্ত্রের সম্পাদকবর্গ তথা মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ এই দুটি শাখা-শ্রুতিকে অবিকল তদ্রূপেই রক্ষা করেছেন। কেবল, প্রথম শাখাটি স্বস্থান ভ্রষ্ট রূপে সংকলিত হয়েছে।

সম্প্রতি প্রথম শাখাটি অনুশীলনীয়। বিশেষ হেতু এই যে নাট্যশাস্ত্রে (ছায়াভূমিক ও কাণ্ডপল্লব উভয় অংশেই) 'পিণ্ডীবন্ধ' নামে যে নৃত্ত প্রযোজনা উপদিষ্ট হয়েছে, সেই "পিণ্ডীবন্ধনৃত্ত" সম্বন্ধে পরবর্তী কালের সমস্ত সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন; অথচ, এঁরা নৃত্তোপদেশ সংক্রান্ত অন্যান্য ভরত বচন উদ্ধৃত করতে বিস্মৃত হননি! প্রথম শাখার মধ্যেই পিণ্ডীবন্ধের উৎপত্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ আছে।*

*[আধুনিক ভারতের ক্ষুদ্র-মহৎ বিদ্যালয়ের মধ্যে সাঙ্গীতিক ইতিহাসের অনুপ্রবেশ ও পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে গীত-বাদ্য এবং বিশেষ ভাবে নৃত্তের সংক্রান্ত ঐ জালটিও অনুপ্রবেশ করছে। কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেলে কল্পনার সূতা দিয়ে রিপু সেলাই" হচ্ছে।]

*[নাট্যশাস্ত্রের রচনার পরে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ সকলের মধ্যে মতঙ্গ-প্রণীত "বৃহদ্দেশী" ও শার্ঙ্গদেব-প্রণীত "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থদ্বয় উজ্জ্বলতম। অপর সমস্তই মানস-গড্ডলিকা প্রয়াস মাত্র। সাই হক, উক্ত দুই গ্রন্থের মধ্যে উত্তম মননশীলতা ও রচনা পারিপাট্য হেতুতে "সঙ্গীতরত্নাকর" অতুলনীয় গ্রন্থ। তা হলেও, এই গ্রন্থকে আমি "নাট্যশাস্ত্রের শ্রীমান অনুজতুল্য" রূপে উল্লেখ করেছি। কারণ, অনুজ শ্রীমান হলে ও মধ্যে মধ্যে অগ্রজবাক্যের যাথার্থ বিস্মৃত হন। "সঙ্গীতরত্নাকর" পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তোপদেশ অগ্রাহ্য করেছেন, অথবা বিস্মরণ করেছেন।]

পিণ্ডীবন্ধ প্রসঙ্গের অবতারণা

প্রসঙ্গারম্ভের দুটি শ্লোকে বঙ্গানুবাদ ও অর্থ উদ্ধার করেছি।

"শঙ্করকে রেচক ও অঙ্গহার কর্ম (নৃত্ত কর্ম) সহকারে নৃত্তমান দেখে পার্বতীও ললিত অঙ্গকর্ম-প্রয়োগ সহকারে নৃত্ত করেছিলেন" ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥ ৪অঃ।

অর্থ-তাৎপর্য। পরবর্তী শ্লোক সকলের স্পষ্ট বর্ণনা থেকে সঙ্গত অনুমান হয়, সেই স্থানে ও সেই কালে অন্যান্য অনেক দেব-দেবতা উপস্থিত ছিলেন। পার্বতী ললিত অঙ্গকর্ম প্রয়োগ করেছিলেন ("সুকুমার প্রয়োগেণ" মূল পাঠ্য) বলার তাৎপর্য এই যে শঙ্কর উদ্ধত প্রয়োগ করেছিলেন।

"দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত হলে সন্ধ্যাকালে মহেশ্বর মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহ বাদ্যের সহযোগে, পুনশ্চ ভাণ্ড, ডিণ্ডিম ও গোমুখ বাদ্যের সহযোগে, এবং শেষে পণব-দর্দুরাদি অপর বহু আতোদ্য-ধ্বনির সহযোগে, এবং লয়তাল নিয়মানুগ বহু অনুগমনকারী ব্যক্তিগণের সঙ্গে অঙ্গহার প্রয়োগ দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে নৃত্ত করেছিলেন॥" ২৪৭-২৪৮-১৪৯ ॥ ৪ অঃ।

অর্থ-তাৎপর্য। বাদ্য সহযোগের ক্রমান্বয়ে ত্রিবিধত্ব উল্লেখের হেতু এই যে মৃদঙ্গাদি বাদ্যযোগ পর্যায় আরম্ভিক ও বিলম্বিত লয়-তালে প্রযুক্ত হয়েছিল; মধ্যপর্যায়ে ভাণ্ডাদির সহযোগ ঘটেছিল মধ্য লয় ও তালে; এবং শেষ পর্যায় পণবাদির সহযোগ ঘটেছিল দ্রুতলয় ও তালে। এই শ্লোকে বর্ধমানক যোগের উত্তরোত্তর দ্রুত-সাধ্যত্বের সূচনা ও করা হল। প্রসঙ্গান্তরে বর্ধমানক-যোগের বস্তু-রূপ আলোচ্য। মূল পাঠে "অনুগৈঃ (অনুগামী ব্যক্তিদের সঙ্গে) শব্দের তাৎপর্য এই যে নন্দীপ্রমুখ বিশিষ্ট দিব্যগণ ব্যতীত অপর সর্ব দেবতারাও লয়তাল বশে নৃত্ত করেছিলেন। নন্দীপ্রমুখ দিব্যগণ বিশেষ সেই নৃত্তে যোগ দান করেন নি; কারণ, সকলেই নৃত্ততৎপর হলে বাদ্যসহযোগকারী বলতে কেউ থাকে না।

এই শ্লোকে পিণ্ডীবন্ধ প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। পিণ্ডীবন্ধ অর্থাৎ গুচ্ছীকরণ, অথবা বহু স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত ভাবে নর্তন। অতঃপর,

পিণ্ডীমভ্রান্ততো দৃষ্টবা নন্দীভদ্রমুখা গণাঃ।
চক্রুর্নামানি পিণ্ডীনাং বন্ধাংশ্চৈব সলক্ষণান্ ॥ ২৪৯-২৫০ ॥

অর্থ। নন্দীপ্রমুখ দিব্যগণ সকল (যাঁরা মাত্র বাদ্য সহযোগ করছিলেন) অভ্রান্ত পিণ্ডীবন্ধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে সেই সকল পিণ্ডীবন্ধের প্রত্যেকটির বিশিষ্ট সলক্ষণ নামকরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত ঘটেছিল, ইতি বিশিষ্ট একটি পিণ্ডীবন্ধ, যার মধ্যে মহেশ্বর ও অপর বহু দেব-দেবতা যুগপৎ নৃত্ত করেছিলেন। কিন্তু, এইটেই সর্বপ্রথম পিণ্ডীবন্ধ প্রচেষ্টা নয়! কি হেতু? অভ্রান্ত প্রবর্তনা বলতে এইটেই প্রথম ছিল; সুতরাং লক্ষণ দ্বারা বুঝতে হবে, এর ও পূর্বে স্বর্গে মর্ত্যে বহু রূপে পিণ্ডবন্ধ নৃত্ত প্রবর্তিত ছিল, কিন্তু প্রবর্তনার মধ্যে ভ্রান্তি দোষ ছিল। "পিণ্ডম্ অভ্রান্ততঃ দৃষ্টবা" অর্থ "অভ্রান্তারূপেণ প্রযুক্তম্ এব পিণ্ডীং দৃষ্টবা" ইতি; (নতু অভ্রান্ত প্রত্যক্ষেণ এব পিণ্ডীং দৃষ্টবা দিব্যগণাণাং ভ্রান্ত প্রত্যক্ষস্য অসম্ভবত্বাদ্ ইতি) ফল কথা, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পরে মহাদেব ও অনুগদেব-দেবতারা যে পিণ্ডী নৃত্ত সাধিত করেছিলেন, সেই পিণ্ডীনৃত্তই সর্বপ্রথম অভ্রান্ত পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রবর্তনা।

প্রশ্ন হ'তে পারে, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস নামে ঘটনার পূর্বেই যদি স্বর্গে দেব-দেবতাগণ ও মর্তে স্ত্রীপুরুষগণ পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত করেছিলেন, তাহ'লে, এ'রাই বা কোন্ নৃত্ত শিক্ষকের নিকট দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করেছিলেন? এর উত্তর এই যে, আফ্রিকাই হ'ক, বা ইউরোপই হ'ক, বা ভারতই হ'ক অন্যত্র হ'ক, এবং জুলু স্ত্রীপুরুষ হ'ক, বা শ্বেতকায় বল্-ডান্স্ চারী স্ত্রী

পুরুষ হ'ক, বা হনোলুলু দ্বীপবাসী আম্রবর্ণ স্ত্রীপুরুষই হ'ক, —এ'রা যাঁর নিকটে দীক্ষা-শিক্ষা-প্ররোচনা লাভ করেছিলেন সেই আদ্য ব্যক্তিই সর্বদেব-দেবতা ও মনুষ্যের আদি নৃত্তগুরু ছিলেন। তাঁর নাম হ'ল উৎসবানন্দময়ী জীবপ্রকৃতি!

অতঃপর, (৪ অঃ ২৫০ শ্লোকের শেষার্ধ থেকে ২৫৫ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) নন্দীভদ্র সতের'টি পৃথক দেব-দেবতার নামে সতেরো রকমের পিন্ডীবন্ধ নৃত্তকে বিশেষিত করেছিলেন। যথা বৃষপিন্ডী (ঈশ্বরী প্রবর্তিত), পাদসী (সাক্ষাৎ নন্দী প্রবর্তিত), সিংহবাহিনী (চন্ডিকা প্রবর্তিত), তার্ক্ষ্য (বিষ্ণু প্রবর্তিত), পদ্ম (ব্রহ্মা প্রবর্তিত), ঐরাবতী (ইন্দ্র প্রবর্তিত), হ্যষ (মন্মথ প্রবর্তিত), শিখা (কার্তিকেয় প্রবর্তিত), রূপ (শ্রী বা লক্ষ্মী প্রবর্তিত), ধারা (জাহ্নবী প্রবর্তিত), পাশ (যম প্রবর্তিত), নদী (বরুণ প্রবর্তিত), যাক্ষী (কুবের প্রবর্তিত), হল(বলভদ্র বা বলদেব প্রবর্তিত), সর্প (নাগবর্গ প্রবর্তিত), মহা (গণেশ্বর প্রবর্তিত), রৌদ্রী (অন্তকনাশক রুদ্র প্রবর্তিত)। অতঃপর, বলা হয়েছে

এবমন্যাস্বপি তথা দেবতাসু যথাক্রমম্।
বজ্রভূতাঃ প্রযোক্তব্যাঃ পিন্ডীবন্ধাঃ সুচিহ্নিতা ॥ ঃ যথাক্রমে

অর্থাৎ। পূর্বোক্ত দেবতাগণের অধিকন্তু অন্যান্য দেবতাগণের যথাক্রমে আচরিত পিন্ডী-বন্ধ নৃত্ত সকল সুচিহ্নিত ও বজ্রভূতরূপে প্রয়োগ করা উচিত।

তাৎপর্য। "বজ্রভূতাঃ পিন্ডীবন্ধাঃ" অর্থ এই যে—নাট্যের অবসরে যখন পিন্ডীবন্ধ নৃত্ত প্রযুক্ত হবে, তখন, রঙ্গপীঠের উপরে ক্রমান্বয় প্রয়োগের রূপে পিন্ডীবন্ধ নৃত্ত প্রবর্তিত হ'তে থাকবে; এক দলের পর অন্য দল ইতি ক্রমে। কিন্তু, পরিবেশ রচনার্থে অন্য কতিপয় তন্নাট্য সংশিলষ্ট দেবতাগণের প্রস্তরমূর্তিবৎ অচল পিন্ডীবন্ধ সকলও প্রয়োগ করা উচিত। **"বজ্রভূতাঃ" অর্থে ইং 'ট্যাবলো' মনে করা যায়।** অথবা, যদি কিয়ৎকাল পর্যন্ত বিগ্রহবৎ স্থিরাসন গ্রহণে যোগ্যা অভিনয় কুশলা পাত্রী না পাওয়া যায় তাহ'লে বজ্রভূতা মূর্তিই অগত্যা প্রযোজ্য। এ পক্ষে বজ্রভূতা অর্থে চিত্রপটে "বাস্-রিলিফ" রূপে অনুকারিত মূর্তি বুঝায়। নতুবা, রঙ্গপীঠের মধ্যে যথার্থতঃ প্রস্তর মূর্তির উপস্থাপনা ও অপসারণ কার্য অনর্থক শ্রম হেতুতে অনুচিত বিবেচ্য। অতঃপর, সংক্ষিপ্ত শ্রুতিপ্রমাণ যথা

রেচিতাশ্চাঙ্গহরাশ্চ পিন্ডীবন্ধ স্তথৈব চ।
সৃষ্টা ভগবতা দত্ত স্তান্ডিনে মুনয়ে তথা ॥
তান্ডিনাঽপি ততঃ সম্যগ্ গানভণ্ডে সমন্বিতঃ ॥
নৃত্তপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স এব তান্ডবঃ স্মৃতঃ ॥

অন্বয়ার্থ। অথ কস্মিনংশ্চিদ্ এব পূর্বপ্রসঙ্গে সকরণাঙ্গহার নৃত্তস্য উৎপত্তিরহস্যাং কথয়িত্বা ভরতমুনিঃ সম্প্রতি রেচকাঙ্গহারশোভিতস্য পিন্ডীবন্ধ নৃত্তস্যাপি সৃষ্টিরহস্যং উদাহৃত্য সমগ্রতঃ তান্ডবনৃত্তস্য প্রামাণ্যমপি সর্শয়তি যথা। ভগবতা তন্ডুনা হোব পুনঃ রেচিতাঃ রেচকলক্ষণযুক্তাঃ তথা চ অঙ্গহারাঃ অঙ্গহার সমেতাঃ পিন্ডীবন্ধাঃ পিন্ডীবন্ধঃ নৃত্তভেদা সৃষ্টা বিকল্পিতা। পিন্ড-শব্দেন অত্র অনেক পাত্রপাত্রীণাং আশ্লেষনৃত্তং সূচিতম ইতি। তাদৃশস্য নৃত্তস্য এব নাট্যকর্মসু নিবদ্ধ প্রয়োগঃ পিন্ডীবন্ধঃ ইতি। ন্যূনকল্পেন বন্ধত্রয়ং নাট্যে প্রযোজ্যং ভবেৎ ইত্যর্থং বহু-বচনপ্রয়োগঃ অবগন্তব্যঃ। তথা চ তেনৈব ভগবতা তন্ডুনা স্ববংশসন্তানায় তান্ডিনে মুনয়ে তৎ-পিন্ডীবন্ধ প্রয়োগঃ দত্তঃ অর্পিতঃ অভবৎ নাট্য প্রয়োগসিদ্ধর্থম্ ইতি বিশেষঃ। তান্ডিনা অপি ততঃ তদনন্তরং গানভান্ডসমন্বিতঃ গানং চ ভান্ডবাদ্যং চ তাভ্যাং সহযুক্তঃ ইতি এব সম্যক্ নাট্য-যোজ্যতয়া প্রকৃষ্টঃ নৃত্তপ্রয়োগঃ সৃষ্টঃ উদ্ভাবিতঃ অভবদ্ ইতি। তাদৃশস্য এব নৃত্তপ্রয়োগস্য

তণ্ডুতাণ্ডিসমুদ্ভবহেতোঃ তাণ্ডবম্ ইতি নাম তন্নৃত্তবিশেষং ভারতীয়াং সিদ্ধিং লেভে ইতি শেষঃ।

অর্থ-তাৎপর্য। পূর্বে 'ত্রিপুরদাহ' নামে নাট্য প্রয়োগের আখ্যান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মহাদেব তণ্ডুকে বললেন ভরতমুনিকে বর্ধমানকযোগ এবং অঙ্গহার-করণসমেত নৃত্তের বিদ্যা ও প্রয়োগ শিক্ষাদান করো। এই রূপে তণ্ডুর শিক্ষাধীনে ভরতমুনি করণাঙ্গহারবহুল নৃত্ত-বিদ্যা লাভ করেছিলেন। এই ব্যাপারে রেচক প্রয়োগের প্রাধান্য বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। একক নৃত্তই এর লক্ষ্য ছিল। অতঃপর, ভরত মুনি পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তবিশেষের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

এতৎ প্রসঙ্গে তিনি মহাদেব ও সম্মিলিত দেবতাগণের আচরিত নৃত্তের কাহিনী বলেছেন। যদি উদাহরণ প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে উৎকৃষ্ট উদাহরণই প্রয়োগ করা উচিত; এই হল অলৌকিক উদাহরণের হেতু। অন্যথা, ধরাধামেও পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত প্রবর্তিত ছিল। কিন্তু ধরাধাম বা ভারতবর্ষ বিচিত্রসংস্কারাপন্ন মানব কুল দ্বারা অধ্যুষিত। এর মধ্যে কোথায়, কোন্ কালে ও কোন্ কুল কি উপলক্ষে পিণ্ডীবন্ধ এবং উত্তম পিণ্ডীবন্ধ প্রয়োগ করেছিল, তার প্রমাণ সংগ্রহ করা বস্তুত অসম্ভব। এই হেতুতে ভরত মুনি লৌকিক নিদর্শন উদাহৃত করেন নি।

অতঃপর নৃত্তগত ঐতিহ্যের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি রূপে আমরা মনে করব যে মহাদেব ও পার্বতী উভয়ই নৃত্ত বিশারদ ছিলেন। ব্রহ্মা ও ভরত লোকপ্রমাণগত নৃত্ত অবগত থাকলেও নাট্যোচিত নৃত্ত-নৃত্য প্রয়োগের বিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন না। তণ্ডু নামে জনৈক শিবভক্ত ব্যক্তি মহাদেবের আদেশে প্রথমে ভরতমুনিকে একক নৃত্ত পরিপাটির যোগ্য অঙ্গহার বহুল নৃত্তের বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। সেই তণ্ডু পুনশ্চ তাঁর অপত্য বিশেষ তাণ্ডীকে রেচকাঙ্গহার সমন্বিত পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের প্রয়োগ পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। ভরত মুনি অবশ্যই এই তাণ্ডী নামে নৃত্ত বিশারদ ব্যক্তির নিকটে গানভাণ্ডসমন্বিত পিণ্ডীনৃত্ত প্রয়োগের দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যে হেতু তণ্ডু-তাণ্ডী ইতি পিতাপুত্র সর্বরূপ উৎকৃষ্ট নৃত্তের বিদ্যা ও ব্যবহার প্রয়োগ করতেন, অতএব ভারতীয় নাট্যনৃত্ত সম্প্রদায়ের গুর্বাচার সিদ্ধির বার্তায় উৎকৃষ্ট ও সমগ্র নৃত্তের ও নৃত্ত-বিদ্যার নাম "তাণ্ডব" ইতি প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই তাণ্ডব নৃত্তবিদ্যার সমূহগত ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে (১) স্ত্রী-পুরুষ ভেদে নাম-ভেদ ছিল না*। দেহ বিশ্লেষণ বিদ্যার (ইং অ্যানাটমি) মূলগত দৃষ্টিতে যেমন স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বিদ্যানাম ভেদ নেই, অনুরূপ ভাবে, নৃত্তবিদ্যার উপাদানিক বস্তু-কর্ম পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ অনুযায়ী বিদ্যানাম ভেদ (যথা পরবর্তী কালের তাণ্ডব ও লাস্য ভেদ) থাকতে পারে না। বিশেষতঃ, পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তকরণে স্ত্রীপুরুষযুগ্ম সিদ্ধির পক্ষে নামভেদ তথা পুনরায় সংযোজনা হাস্যকর। যাঁরা তাণ্ডব ও লাস্য ইতি নামভেদ দ্বারা বস্তুভেদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁরা একেবারেই জানতেন না যে নাট্যশাস্ত্রে যুগ্মবন্ধ বা পিণ্ডীবন্ধ উপদিষ্ট হয়েছে। (২) তাণ্ডব মাত্রই করণ-অঙ্গহার রেচক ইতি ন্যূনতম লক্ষণত্রয় দ্বারা সাধ্য। পরন্তু, 'করণ' ব্যাপার অঙ্গহার ও রেচকের সাধারণ এই হেতুতে কোনও শ্লোকে করণের অনুল্লেখ দ্বারা সিদ্ধান্তচ্যুতি ঘটে না। (৩) সমগ্রতঃ তাণ্ডব প্রয়োগ 'সুকুমার' ও 'উদ্ধত' ইতি দ্বিবিধ প্রবর্তনার অধিকৃত। যথা—৪ অঃ ৩১২ ও ৩১৩ শ্লোক।

*[তখন 'ভ্রকুংস' অর্থাৎ স্ত্রীবেশধারী পুরুষের নৃত্ত ছিল না; যে সময়ে অমরকোষ রচিত হয়েছে, তার পূর্বে সমাজের সাংস্কৃতিক দুর্যোগানিবন্ধন স্ত্রীনৃত্ত শিল্পীর অভাব ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। সংগ্রহশাস্ত্র বা নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নের বহু পরবর্তী কালে ঐ বিকৃত প্রচেষ্টা উদ্ভূত হয়ে থাকবে।]

দেবস্তুত্যাশ্রয়গতং যদঙ্গং তু ভবেদিহ।
মাহেশ্বরৈরঙ্গহারৈ রুদ্ধতৈ স্তৎ প্রযোজয়েৎ ।।
যত্র শৃঙ্গার সম্বন্ধং গানং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ম্।
দেবৈঃ কৃতৈ রঙ্গহারৈ **ললিতৈঃ** তৎপ্রযোজয়েৎ ।।

নির্গলিত অর্থ যথা, রৌদ্ররসাত্মক স্তুতিগানের সঙ্গে নৃত্ত যোজনা পক্ষে **মহেশ্বরসুলভ উদ্ধত অঙ্গহার** প্রযোজ্য। যে ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষাশ্রয় ও শৃঙ্গাররস সংশিলষ্ট গীত-নৃত্ত যোজনীয়, সে ক্ষেত্রে **দেবকৃত ললিত অঙ্গহার** সহকারে নৃত্ত প্রযোজ্য। সুতরাং—স্ত্রী বা পুরুষ যেরূপ ভূমিকাই হক, রৌদ্র পরিবেশ হলে মহেশ্বরনিদর্শিত উদ্ধত তান্ডব প্রয়োগ করা বিধেয়। এবং স্ত্রী বা পুরুষ যে রূপ নৃত্তভূমিকাই হক। শৃঙ্গার পরিবেশ স্থলে দেবগণ-সুলভ (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) ও ললিত (অর্থাৎ সুকুমার) তান্ডবই প্রযোজ্য। অত্র "স্ত্রী পুরুযাশ্রয়" শব্দ দ্বারা নাট্যস্থ অঙ্ক স্থাপন* পরিবেশই গ্রাহ্য।

এই হল প্রাচীন ভারতীয় নৃত্ত-সংস্কৃতির সর্বোত্তম দিগ্‌ভাস। নাট্য শাস্ত্রের এবং এক মাত্র নাট্যশাস্ত্রেরই কারিকা একে স্থির ও সমুজ্জ্বল রূপে ধারণ করে রেখেছে। অন্য কোনও সঙ্গীত-গ্রন্থে বা নৃত্তশাস্ত্রে এরকম আভাস নেই।

অর্বাচীন কালের 'লাস্য' ও বিভ্রান্ত মতবাদ

অর্বাচীন কালের শাস্ত্রদৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের অবলোপ এর কারণ হলেও এক মাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণ ও আবির্ভূত হয়েছিল। বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রসকে কামপ্রভব মনে করাই হয়েছিল কাব্য-সাহিত্যকারদের প্রাথমিক মানস-তিমির ব্যাধি। অনুষঙ্গরূপে কাব্যবন্ধ রচনার মধ্যে বেশ্যা-নায়িকার অবতারণা করার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে দ্বার উন্মুক্ত থাকলেও পথটি প্রশস্ত ছিল না। পরবর্তীকালে, খিড়কির দরজার পথটিও সুপ্রশস্ত করেছিলেন কাব্য সাহিত্যকারেরা। সমসাময়িক উন্মাদনার তরঙ্গে লোকনৃত্ত ও নাট্যনৃত্তের মধ্যে লাস্য বা কামবিলাস বিভ্রমই হয়ে পড়েছিল প্রধান কথা। গৃহস্থ গোষ্ঠী ও গান্ধর্বগোষ্ঠীতে যেটা ছিল স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের শৃঙ্গারললিত সুকুমার নৃত্ত, তার পরিবর্তে দেখা দিল বৈশিক বিলাসী গোষ্ঠীর কামতান্ত্রিক লসদ্‌ভঙ্গির লাস্য নৃত্য।

অন্যান্য নৃত্তশাস্ত্রকার বা সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের কথা ত্যাগ করা যাক। শার্ঙ্গদেব তৎপ্রণীত 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থের নর্তনাধ্যায়ে লাস্য-নৃত্তের ইতিহাস খ্যাপনা প্রসঙ্গে বলেছেন "পার্বতী বাণাত্মজা উষাকে লাস্য উপদেশ করেছিলেন। উষা দ্বারকাবাসিনী গোপাঙ্গনাগণকে, পুনঃ উক্ত গোপযোষিদ্‌গণ সৌরাষ্ট্রবাসিনী বহু স্ত্রীলোককে লাস্য নৃত্তে দীক্ষিত করেছিলেন। সৌরাষ্ট্র স্ত্রীগণ নানা জনপদাস্পদা নারী সকলকে লাস্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই রূপে পরম্পরা ক্রমে লাস্য নৃত্য (অথবা নৃত্ত?) জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল" (সঙ্গীতরত্নাকর ৭ম নর্তনাধ্যায় ৪ শেলাক থেকে ৭ শেলাক স্তর)। শার্ঙ্গদেবের মতে এই হল ঐতিহ্য ও শ্রুতি।

যাই হক, শার্ঙ্গদেব পরেই বলেছেন

লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজবর্ধনম্ ।। ৩২ ।। ঐ।

*[নাট্যমাতৃকাগণের অঙ্কে, অর্থাৎ ক্রোড়ে বিভিন্নতঃ রসভাবনিষ্ঠা শ্রব্যদৃশ্য বস্তু সকলকে আরূঢ় করা হয়, এই অর্থে 'অঙ্ক'· ২০ অঃ ১৪ শেলাকে শেলাকে "অঙ্ক ইতি রূঢ়শব্দো ভাবরসৈশ্চ রোহয়ত্যর্থান্ ইতি সংজ্ঞা।]

তবে কি বুঝতে হবে, বাণরাজ দুহিতা উষার কাল থেকে আরম্ভ করে সৌরাষ্ট্র-স্ত্রীগণের লাস্য শিক্ষার কাল পর্যন্ত সময়ে মকরধ্বজ অগ্নি নির্বাপিত প্রায় হয়েছিল। নচেৎ কৈলাসপ্রস্থ থেকে পার্বতী নেমে এসে বাণরাজ দুহিতাকে উক্ত মকরধ্বজবর্ধন লাস্য শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন কি হেতু! এবং ভারতের এত জনপদ থাকতে দ্বারকা ও সৌরাষ্ট্র নামে জনপদের মনুষ্য গণই বা কি কারণে মকরধ্বজ বৈরাগ্য গ্রস্ত হয়েছিলেন, শার্ঙ্গদেব এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন নি। টীকাকার চতুর কল্লিনাথ নিতান্তই নিরীহ মৌন অবলম্বন করেছেন। এঁর চাতুর্য বুঝি। সংস্কৃতভাষায় রচিত গ্রন্থ একবার শাস্ত্রখ্যাতি লাভ করলে আর রক্ষা নেই! টীকাকার কিছুতেই সেই রচনা বা মতবাদের ভ্রম খ্যাপিত করবেন না; অতএব, মৌনই হল চতুরতা। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভাষ্য-টীকার পক্ষে এরকম মৌনচতুরতা বিশেষ ক্ষতিকর নয়। কিন্তু—টীকাভাষ্য বা ব্যাখ্যা বা সম্পাদনা ইংরাজি (বা বাংলা) ভাষায় রচিত হলে বিশেষ দোষ ঘটে। কারণ, এক স্থানের আবর্জনা সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পার হয়ে, অধিকতর বিকৃত অনুশীলনার উদ্ভাবক হয়।

শার্ঙ্গদেব ও তৎপ্রণীত ঐ গ্রন্থকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই সমালোচন প্রসঙ্গ করেছি। শার্ঙ্গদেবের কিছু পূর্বকাল থেকে প্রচলিত 'লাস্য' নৃত্ত এখনও পর্যন্ত 'মকরধ্বজবর্ধন' রূপে প্রযুক্ত হচ্ছে। এই প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু পার্বতীর সঙ্গে এর ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করাই মহদ্‌ভ্রান্তি। অন্য ভ্রান্তি হল, এই ভ্রান্ত ইতিহাসকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গরূপে মনে করা বা ব্যাখ্যা করা। আধুনিক ইংরাজি তথা ভাষা অনুবাদক বা গবেষকগণ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আর কিছু না হক কৃপাদৃষ্টি পূর্বক এ বিষয়ে মনোযোগী হলে মৎসদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি আশান্বিত হবে।

অতঃপর, নৃত্ত বিষয়ে ঐতিহ্যের দ্বিতীয় শাখা আলোচ্য।

৩১ অধ্যায়ে 'আসারিত' গীত সকলের প্রয়োগের সঙ্গে 'বর্ধমানক' নামে নৃত্ত যোগের যুগপৎ প্রয়োগ বিষয়ে বিশিষ্ট উপদেশ আছে (২২৫ শ্লোক থেকে আরম্ভ)। বর্ধমানক যোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ যথাক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যথা

নিহত্য দারুণং ঘোষং রুদ্রেণামিততেজসা।
নৃত্তমুৎপাদিতং পূর্বং চিত্রতাণ্ডবসংজ্ঞিতম্ ॥ ২২৬ ॥ ৩১ অঃ

কা-সং 'দারুণং' স্থলে 'দানবং' আছে। "দানবং" শুদ্ধ পাঠ মনে করি।

অর্থ। পুরাকালে অমিততেজা রুদ্র ঘোর নামে দানবকে বধ করেছিলেন এবং তদনন্তর 'চিত্রতাণ্ডব' নামে নৃত্ত উৎপাদিত করেছিলেন।

তাৎপর্য। শত্রুনিধনান্তে বিজয়োৎসব ও নৃত্ত কর্ম ইতিপূর্ব কাল থেকে প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। কিন্তু, অভিনব প্রকার নৃত্তের উদ্ভাবন খুবই বিরল। 'চিত্রতাণ্ডব' অর্থাৎ 'অদ্ভূত-তাণ্ডব' অথবা অদ্ভুতরসাত্মক তাণ্ডব নৃত্ত।

অঙ্গ ভূতগণৈঃ সর্বৈ স্তস্মিন্ কালে মহাত্মভিঃ।
বর্ধমানমিদং সৃষ্টং পিণ্ডীবন্ধৈ র্বিভূষিতম্ ॥ ২২৭ ॥ ৩১ আঃ।

অর্থ। বিশেষতঃ উৎসব-তৎপর ভূতগণ সকলে সেই সময়ে বহুপিণ্ডীবন্ধ দ্বারা বিভূষিত এই (সম্প্রতি বক্ষ্যমান) বর্ধমান-নৃত্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য। সহ,=উৎসব, যজ্ঞ; উৎসব বা যজ্ঞে আত্মনিবিষ্ট ইতি মহাত্মা। ভূত শিবের বা রুদ্রের অনুচর। ভূতগণ নৃত্ত করতে করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত রূপে পিণ্ডীবন্ধ হয়েছিলেন। এই পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তাবসরে তাঁরা বর্ধমান নৃত্তযোগ উৎপাদিত করেছিলেন। ভরত বাক্যের গূঢ় অভিপ্রায় এই

যে উৎসব নৃত্তমাত্রেই পিণ্ডীবন্ধ নৃত্ত স্বতই আবির্ভূত হয়। পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু, এই ঘটনার মধ্যে স্ত্রীলোক নৃত্ত করেনি। এবং, সাধারণ পিণ্ডীবন্ধে বর্ধমানক যোগ আবির্ভূত হয় না; কিন্তু, এই ভূতগণ প্রবর্তিত পিণ্ডীবন্ধ নৃত্তের মধ্যে বর্ধমানক যোগ আবির্ভূত ও সুসম্পাদিত হয়েছিল। এই কারণেই ভরত মুনির কালেও ঐ ঘটনা গুর্বাচার-সিদ্ধ সংবাদ রূপে প্রচলিত ছিল।

পরে, ২৩১ শ্লোক থেকে ২৬৬ শ্লোক পর্যন্ত বৃহৎ স্তরে নানাবিধ বর্ধমানক যোগের লক্ষণ ও প্রয়োগ সংকেতিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রবেশ করার আপাতত প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়।

গীত বাদ্য ও নৃত্তের প্রয়োগ লয়, কলা ও তালের অধীন। **লয়** তিন রকম, যথা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত (৩১ অঃ ৪ শ্লোক)। মন্দ বা বিলম্বিত লয়ই প্রমাণকলাকে জ্ঞাপিত করে। অতঃপর, গীত বাদ্য বা নৃত্ত কালে বিলম্বিত লয় ক্রমশঃ দ্রুত হয়ে মধ্য লয়, এবং মধ্য লয় ক্রমশঃ দ্রুত হয়ে দ্রুততম লয়ে অবসিত হয়। **সাধারণত, লয়ের বৃদ্ধি পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 'কলা' কালের সংকোচ ঘটে। 'কলা'** হল গীত, বাদ্য ও নৃত্তের সেই ক্ষুদ্রতম বস্তু-পরিমাণ, যার মধ্যে ছন্দঃ ও ছন্দোগত সৌন্দর্যের আভাস থাকে। যেমন, 'চন্দ্রকলা'। চন্দ্ররূপকে অসংখ্য অংশে বিভাগ করা যায়। কিন্তু, প্রতিপদের চন্দ্রাংশই সেই ন্যূনতম রূপ-কলা যার মধ্যে সমগ্র চন্দ্ররূপের ন্যূনতম ঔপাদানিক ছন্দঃ ও সৌন্দর্য আভাসিত হয়। কলার মধ্যে পূর্ণত্বের ভবিতব্য ও ইঙ্গিত থাকে। ইংরাজিতে কলা= ক্যাডেন্স্, ক্যাডেন্স্ অব মিউজিক্যাল ফ্রেইজ। কলার সংকোচ নিবন্ধন 'তাল' ও সংকোচ প্রাপ্ত হয়।। **তাল** অর্থ প্রামাণিক কাল-বিভাগ পরিমান। যথা 'মনুষ্যদেহ নবতাল পরিমিত'। অর্থাৎ, সুস্থ যুবা পুরুষের দেহ-দীর্ঘতাকে নয়টি তাল প্রামাণিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। অনুরূপ অর্থে ৩১ অঃ বর্ণিত তাল। ইংরাজিতে লয়=টেম্পো; তাল=টেম্পো মেজার্।

বর্ধমানক যোগ অসাধারণ ব্যাপার। বিলম্ব-মধ্য ক্রমে লয় দ্রুতত্বের দিকে পরিণামী হলেও কলা ও তালের সংকোচ ঘটে না। অর্থাৎ কালগত কলা ও তাল অপরিবর্তিত থেকে যায়। অঙ্ক-শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বলা যায়—বর্ধমানক যোগে কর্মবৃদ্ধি বা প্রযত্নবৃদ্ধি ঘটে, ডাইনামিজম্ বর্ধিত হয়, এবং এক কালে অধিকতর শক্তিক্ষয় ঘটতে বাধ্য। সুতরাং, বর্ধমানক যোগ শক্তিহীন পুরুষ বা অবলার সাধ্য নয়। নৃত্তকর্মে বর্ধমানক যোগ মাত্র পুরুষ নর্তকের পক্ষেই বিহিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই হেতুতেই ১১ অধ্যায়ে পুরুষ পক্ষে ব্যায়ামবিধি উপদিষ্ট হয়েছে; স্ত্রীলোকের পক্ষে নয়।

অন্যপক্ষে, একটি ব্যাপার ও লক্ষ্য করা যায়, সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত পক্ষে লয় ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে, অথচ, কলা ও তাদের আপেক্ষিক সংকোচ ঘটছে। একে বর্ধমানক যোগ বলা যায় না। যথা, আধুনিক সেতার-সরোদ বাদকদের চেষ্টিত ক্রমশ দ্রুতলয়ের বাদন। শেষে, 'গৎ' এর কলা হিস্-টিরিয়া রোগের আক্ষেপের মতো রূপ ধারণ করে! **এতে করে' শক্তিক্ষয়ের হার বাড়ে না; কিন্তু উত্তেজনার হার বাড়তে থাকে।** ততক্ষণে আধুনিক শ্রোতৃবর্গও হিষ্টিরিয়ার কবলে পতিত হ'ন; উভয় পক্ষের দিকে নিরীক্ষণ করলে মনে হয় যেন সুখের অন্ত নেই! একে বর্ধমানক যোগ না 'সীতাভোগ' বলাই উচিত। সীতা অর্থে মদ্য ও হয়, মাদকতাও হয়; তারই ভোগ=সীতাভোগ!

এ বিষয়ে কিন্তু উৎকৃষ্ট 'কত্থক' নৃত্য ও লহরা-বাদ্য উভয়ই উপভোগ্য ব্যতিক্রম। কারণ, লয় দ্রুত হ'তে থাকলেও কলা ও তাল পূর্বরূপ থেকে যায়। প্রসঙ্গান্তরে এর আলোচনা করা যাবে।

অতঃপর, পরিতুষ্টশ্চ তং দৃষ্টবা সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ।
প্রদদৌ চ বরং শ্রেষ্ঠং সহ দেব্যা মহাসুরঃ ॥ ২২৮ ॥ ঐ ।

অর্থ। পত্নীসহ বৃষধ্বজ (মহাদেব, রুদ্র) সেই পিন্ডীবন্ধ সহকৃত বর্ধমানক নৃত্ত দেখে পরিতুষ্ট হয়েছিলেন এবং দেবীর সহিত মহাসুর (মহাদেব) শ্রেষ্ঠ বর দান করেছিলেন।

তাৎপর্য। প্রকারান্তরে বলা হল নাট্যে রৌদ্ররস পরিবেশনের মধ্যে প্রথম গণের সাধ্য পিন্ডীবন্ধ সহকৃত বর্ধমান-নৃত্ত যোগ প্রযুক্ত হয়, তাহ'লে রঙ্গপীঠের যথাযোগ্য স্থানে শিব-পার্বতীর ভূমিকাও অধিস্থাপিত করা উচিত। এবং নৃত্তশেষে তাঁরা বরদান সূচক কিছু বাক্যও উচ্চারিত করবেন*। অতঃপর, সেই বাক্যের অনুবাদ যথা—

তল্লক্ষ্যলক্ষণযুতং মার্গযুক্তিবিধিক্রমৈঃ।

বর্ধমানং প্রযোক্তারো যাস্যন্তি শিবগৌরবম্ ॥ ২২৯ ॥ ঐ।

এস্থলে প্রসঙ্গ হ'ল মহেশ্বর-নায়কাশ্রিত উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রয়োগের মধ্যে রৌদ্ররসাশ্রয় অঙ্কে পিন্ডীবন্ধ সহকৃত বর্ধমানক নৃত্তের অবতারণা। এই শ্লোকের অর্থ —

প্রযোক্তৃগণ যদি সম্মিলিত ভাবে মার্গযুক্তি, বিধিও ক্রম সকল পালন করে, উপদিশ্যমান লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত এই বর্ধমান নৃত্ত প্রয়োগ করেন, তাহ'লে তাঁরা শিবগৌরব প্রাপ্ত হ'ন।

শিবগৌরব অর্থ,—কল্যাণ মিশ্রিত গৌরব বা মর্যাদা। মর্যাদা বা সম্মান সর্ব ক্ষেত্রে কল্যাণ সহকৃত হয় না। মার্গযুক্তি, বিধি ও ক্রম সংক্ষেপে আলোচ্য।

মার্গযুক্তি=মার্গাসারিত গীত-বাদ্যের যোজনা (৫ অঃ পূর্বরঙ্গ কর্ম, ২১ শ্লোক) মার্গ অর্থ রঙ্গপীঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ব্যবস্থিত রঙ্গমার্গদ্বয় (ইং উইংস্)। এর মধ্যে 'আসারিত' (অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উপবিষ্ট গায়ক-বাদক দল যে গীত বাদ্য প্রয়োগ করেন) প্রয়োগই সংক্ষেপে 'মার্গযুক্তি' শব্দ দ্বারা সূচিত। প্রসঙ্গত, ৩১ অধ্যায়ে আসারিৎ ও উৎসারিত প্রয়োগ ভেদ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ২২৫ শ্লোকে বলা হয়েছে

আসারিতেষু গীতেষু বর্ধমানেষু চৈব হি। আসারিতানাং সংযোগো বর্ধমানক ইষ্যতে ॥

বলাই বাহুল্য, আসারিত গীতের সঙ্গে বাদ্য যোজনা=আসারিত বাদ্যপ্রয়োগ।

'বিধি' অর্থাৎ বর্ধমানক ও পিন্ডীবন্ধ প্রয়োগ বিষয়ক বিধি। ক্রম অর্থাৎ বিধিদৃষ্ট পারম্পর্য। তাৎপর্য। উৎকৃষ্ট নাটক অবলম্বিত নাট্য পক্ষেই পিন্ডীবন্ধ শোভিত বর্ধমান নৃত্ত প্রয়োগ করা উচিত। যে কোনও নাট্যে এই অনুষ্ঠান প্রযোজ্য নয়। যথা উৎকৃষ্ট ঘৃত-তন্ডুল-ওষধির ব্যবস্থা সহযোগে পোলাও প্রস্তুত পক্ষে তার মধ্যে আমিষখন্ড, বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্ প্রক্ষেপনীয়। তাই ব'লে—পান্তভাতের মধ্যে আমিষখন্ডাদি কদাচ প্রক্ষেপনীয় নয়*।

যাই হক, বরদান শ্রুতি ও মিথ্যা নয়। যে পাচক উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করে, ভোক্তৃবৃন্দ সদ্য বরদানে তাকে আপ্যায়িত করেন। বরদান নিষ্ফল হয় না। অন্য সামাজিক ব্যক্তি সেই পাচককে অন্বেষণ করে কার্যে নিযুক্ত করেন। কল্যাণসহকৃত মর্যাদা লাভ তার পক্ষে নিশ্চয়ই ঘটে।

এই স্থানে নৃত্তের আদিতম ও উৎকৃষ্ট শ্রুতি-ঐতিহ্য শেষ হল। অতঃপর নৃত্তের বস্তু-তত্ত্ব আলোচ্য।

* ভরতমুনি কোথাও অপ্রয়োজনে কথা-কাহিনী উদাহৃত করেন নি।

*[উৎকৃষ্ট, ও মহেশ্বর-নায়কাশ্রিত নাটকের পরিকল্পনাই লুপ্ত, পিন্ডীবন্ধ ও লুপ্ত, রৌদ্ররসবিভাবিত বর্ধমানক নৃত্ত ও লুপ্ত! মাত্র কারিকাপ্রস্তরীভূত নাট্যশাস্ত্র কতিপয় উপদেশকে অঙ্কে ধারণ করে এমন ও বর্তমান। নাট্যশাস্ত্রের কারিকাগুলি ছাই-ভস্ম হলে কবে কোন্ কালে উড়ে যেত! কিন্তু—পাথরের গাঁথুনি দীর্ঘায়ু লাভ করে, এই যা!]

আলব্রেখ্‌ট ভেবর

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রেসলাউ নামক স্থানে আলব্রেখ্‌ট ভেবর জন্মগ্রহণ করেন। ব্রেসলাউ, বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তর তিনি ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকতর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কিছুকাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভেবর বার্লিন প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রাচ্যবিদ্যা তথা সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। বার্লিন আগমনের কিছুকাল পরেই তঁহার সম্পাদিত শুক্ল যজুর্বেদের একটি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণের প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয় (১৮৪৯)। ইহার শেষ অংশ ১০ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। শুক্ল যজুর্বেদের প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার সময়েই ভেবর বার্লিনের সরকারী গ্রন্থশালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত এই সব হস্তলিখিত পুঁথির বিশদ বিবরণ সহ তালিকা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিন হইতে প্রকাশিত হয়[১]। ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথির বিজ্ঞান সম্মত তালিকা পুস্তক রচনায় কেহ হাত দেন নাই। ভেবরের বহু পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী এ যাবৎ অজ্ঞাত বহু মূল্যবান পুস্তকের সন্ধান জানিতে পারেন। ভেবর প্রদর্শিত অপ্রকাশিত পুঁথির পরিচয় পদ্ধতি এখনও আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে। এই গ্রন্থ তালিকা রচনা করিতে গিয়া ভেবর সংস্কৃত ভাষা ভাণ্ডারের যেসব মহামূল্যবান রত্নরাজির সন্ধান পান তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াই ভেবর সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এই সূত্রে আহরিত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ভেবর ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বহু নিবন্ধ রচনা করেন। এই সমস্ত রচনার বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ও ব্যাপক। বৈদিক জ্যোতিষতত্ত্ব হইতে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কৃষ্ণোপাসনা এই সব ছিল ভেবর প্রণীত নিবন্ধাবলীর উপজীব্য বিষয়। এইগুলির কিয়দংশ "বার্লিন একাডেমি অফ্ সায়েন্স" পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ভেবর এই একাডেমির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি ভেবরের নিজস্ব পত্রিকায় (ইণ্ডিশে ষ্টুডিয়েন) প্রকাশিত হয়[২]। প্রাচ্যবিদ্যার ইতিহাসে ভেবর পরিচালিত এই পত্রিকাটি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত এই পত্রিকার অধিকাংশ ছিল প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত ভেবরের নিবন্ধাবলী।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভেবর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনান্তকাল পর্যন্ত তিনি এই কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ভেবর প্রণীত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নামে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়[৩]। সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা ভারতবর্ষের অথবা বিদেশের কোন পণ্ডিত এ যাবৎ করেন নাই। ভেবরের এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত ভাষার একমাত্র নির্ভর যোগ্য পুস্তক ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইংরাজীতে অনূদিত

হইয়া সবিশেষ আদৃত হয়[৮]। এ যাবৎ এই ইংরাজী অনুবাদের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া প্রায় শতবর্ষকাল ধরিয়া পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পঠিত হইয়া আসিতেছে। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণটি ভেবর তাঁহার সহযাত্রী ভারত-বিদ্যাবিৎ রোট্‌ ও ব্যোটলিঙ্কের নামে তাঁহাদের সংস্কৃত অভিধান রচনা সমাপ্তির স্মারক চিহ্ন হিসাবে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু মনীষীর অবিচ্ছিন্ন সাধনার ফলে বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্যাবলী জানা গিয়াছে, যাহা ভেবরের সময়ে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ হয় নাই। বর্তমান কালে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে দেশী বিদেশী কয়েকজন পণ্ডিতের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এই সব পুস্তকে নবলব্ধ তথ্যাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তথাপি এই সব আধুনিক কালে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ভেবরের লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকে মর্যাদা ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, পথিকৃৎ ভেবর আজিও এই বিভাগের দিক্‌ পালের আসন অধিকার করিয়া আছেন।

ভারতীয় সাহিত্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আবিষ্কারের কৃতিত্বও একান্ত ভাবে ভেবরের প্রাপ্য। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে প্রচলিত প্রাকৃতভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা সর্বপ্রথম ভেবর কর্তৃকই আরব্ধ হয়। প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্যা বিশারদ বুলের এর সাহায্যে প্রাকৃত ভাষায় রচিত বহু অপ্রকাশিত পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে বার্লিনে প্রেরিত হয়। ভেবর এই পুঁথিগুলির বিস্তৃত পরিচয় তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থতালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেন[৯]।

প্রায় সার্দ্ধ সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থতালিকার অর্ধেকের বেশী অংশ প্রাকৃত (জৈন) সাহিত্যের উপর লিখিত হইয়াছিল। প্রতিটি পুস্তকের প্রচুর উদ্ধৃতিসহ বিশদ আলোচনা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। জৈনধর্ম ও সাহিত্য উভয় শ্রেণীর পুস্তকই ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে "পালিটেক্সট্‌ সোসাইটি" স্থাপিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বাহন পালিভাষা চর্চার পথ সুগম হয়। বহু পণ্ডিতের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত পালিটেক্সট সোসাইটি পালিসাহিত্যের লুপ্ত রত্নগুলি মুদ্রিত করিয়া উহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এ যাবৎ অনাদৃত জৈন ধর্ম ও সহিত্য ও উহার বাহন প্রাকৃতভাষা ভেবরের একক চেষ্টাতেই পুনরুজ্জীবিত হয়। স্বসম্পাদিত "ইণ্ডিশে ষ্টুডিয়েনে" জৈনধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভেবর যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন উহা তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় আজিও সমধিক আদরণীয় আকর গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। জৈন-প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনায় ভেবর পূর্বসূরিদের কোন সাহায্য পান নাই। কারণ ইতিপূর্বে কেহই এই অজ্ঞাত জ্ঞান-জগতে পদার্পণ করেন নাই। অভিধান জাতীয় কোন গ্রন্থের সাহায্যও ভেবর পান নাই, সংস্কৃতে অপ্রচলিত প্রাকৃত শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করিতে ভেবরকে কি দুঃসহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভেবর অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ ও মূল সহ প্রকাশ করেন। সুষ্টু সম্পাদন ও অনুবাদের জন্য এইগুলি ইউরোপে বিশেষভাবে আদৃত হয়। ভেবর সম্পাদিত ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে কালিদাস কৃত মালবিকাগ্নি মিত্র, অশ্ব ঘোষ কৃত বজ্র সূচি, শতপথ ব্রাহ্মণ, অদ্ভুত ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রাকৃত ভাষায় রচিত হালের গাথা সপ্তশতীর অনুবাদ ও সম্পাদনা ভেবরের জীবনের অপর এক কীর্তি। প্রাচ্য বিদ্যা-বিশারদদের মধ্যে ভেবেরের নাম এই জন্য চিরস্মরণীয় যে তাঁহার মত অপর কেহ এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে বা নূতন আলোক সম্পাত করিতে পারেন নাই। ভেবরের বিপুল

অধ্যবসায় ইউরোপীয় পাণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয় ছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভেবর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তিনি বার্লিন নগরীতে পরলোক গমন করেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভেবর বহু সংখ্যক যোগ্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করেন। ভেবরের জীবনের পরিণত অবস্থায় ইউরোপের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির সংস্কৃতের অধ্যাপক পদসমূহের প্রায় অধিকাংশই তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ভেবরের পি-এই-ডি উপাধি প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক জার্মান ভাষায় ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভেবরের সম্মানার্থে উৎসর্গীকৃত "গুরু-পূজা-কৌমুদী" নামীয় এই গ্রন্থের নিবন্ধকারেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ভেবরের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিৎ বুলর এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচর্চার ক্ষেত্রে ভেবরের অতুলনীয় ও বিপুল সাধনার পরিমাণ বিশ্লেষণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ভেবর অতিশয় উদার হৃদয় ও অমায়িক ছিলেন। মহত্ত্ব ছিল তাঁহার স্বভাব জাত। ভারত বিদ্যাচর্চায় কনিষ্ঠগণকে উৎসাহিত করা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত। তরুণ বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লেভি ভারতবর্ষের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করিয়া প্যারিস হইতে "ডক্টরেট" লাভ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনে (৭) ডাঃ সিলভা লেভি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে ভেবর নিয়মিত যোগদানকারী ছিলেন, সম্মেলনে ভেবরের অনুপস্থিতি শিবহীন যজ্ঞ বলিয়া উদ্যোক্তারা মনে করিতেন। খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত ভেবর এই অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। লেভির নাম শুনিয়া প্রায় দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ ভেবর উপযাচক রূপে লেভির আসনের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন ও তাঁহাকে ভারতবিদ্যাচর্চায় প্রচুর উৎসাহ দান করেন। জ্ঞান-বৃদ্ধ ভেবরের অমায়িকতা ও উৎসাহ বাণীতে লেভি এতদূর মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যান যে এই ঘটনা তিনি কোন দিন জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে একজন পণ্ডিতের সহিত অপর একজন পণ্ডিতের মতবিরোধ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। পণ্ডিতচূড়ামণি ম্যাক্সমুলরের সহিত নানা বিষয়ে ভেবরের মত বিরোধ ছিল কিন্তু ইহাতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের হানি নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলরের পি-এইচ্-ডি উপাধি প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনেকের সহিত ভেবরও তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অভিনন্দন পাইয়া ম্যাক্সমুলর ভেবরকে পত্র লিখিয়া জানান যে সর্বপেক্ষা ভেবরের অভিনন্দনই তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছে কারণ তাঁহারা দুই জনেই এক কালে একই সাধনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, নানা বিষয়ে তাঁহাদের বাদানুবাদ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

ভেবরের জ্ঞান সাধনা জীবনান্ত কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বেও তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে লিখিত রচনাগুলি পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দেশ বিদেশের বহু মনীষী ও প্রতিষ্ঠান ভারততত্ত্ব বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য প্রয়োজন হইলেই ভেবরের শরণাপন্ন হইতেন। ভেবর স্বহস্তে লিখিত পত্র দ্বারা এই সব প্রতিষ্ঠান ও মনীষীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতেন। অতিরিক্ত পাঠের ফলে বিশেষতঃ জৈন প্রাকৃতের গ্রন্থ তালিকা রচনার গুরু শ্রমে ভেবরের দৃষ্টিশক্তি গুরুতর রূপে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। প্রায় দৃষ্টিহীন ভেবর এই সময়েও পুত্র অথবা সহকারীর সাহায্যে নিজের জ্ঞান সাধনা অব্যাহত

রাখিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত যে সব ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন—তাঁহাদের নিকট প্রাচ্য বিদ্যা পারঙ্গম মনীষী হিসাবে ভেবরের নাম অতি শ্রদ্ধেয়। বাঙলা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্রের" কল্যাণে ভেবরের নামটি বাঙলার সাধারণ পাঠকগণের নিকটও অপরিচিত নহে। কৃষ্ণচরিত্রের নানাস্থানে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপ আমেরিকার ভারততত্ত্ব বিদ্‌গণের মতামতকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তীব্রতম কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে ভারত বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভেবরের উপর।

কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "ভেবর সাহেব কোনমতে হিন্দু দিগের জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন হিন্দুরা চন্দ্র নক্ষত্র মণ্ডল ব্যাবিলনীয় দিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে।....তবে দুখের বিষয় আমি স্বদেশীয় পাঠক-দের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদের জন্য লিখিনা।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুজাতির মাহাত্ম্য খর্ব করাই যেন ছিল ভেবরের ভারতচর্চার উদ্দেশ্য। ভেবরের কালে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ভারতে ও বিদেশে অতি অল্প তথ্যই পরিজ্ঞাত ছিল। এই অল্প তথ্যের মূলধন লইয়া ভেবর ও তাঁহার সহযাত্রিরা ভারতবিদ্যার দুরূহ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতীয় আর্যজাতির বংশধরেরা যখন তাঁহাদের অতীত ঐতিহ্যের ও সম্পদের কোন সংবাদ রাখিতেন না অথচ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অপরকে অসভ্য বর্বর মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন থাকিতেন সেই সময়ে ভেবর ও তাঁহার সতীর্থেরা ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভেবর হয়ত কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সততা সন্দেহাতীত ছিল। একথা বঙ্কিমচন্দ্র একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই।

ভেবর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—"বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যেক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের গৌরব সেদিনকার জার্মানির অরণ্য নিবাস বর্বরদের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক ইহা প্রমাণ করিতে তিনি অতি যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখৃষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল এমন বিবেচনা করার মুখ্য প্রমাণ নাই (কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ভেবরের মন্তব্য দুরভিসন্ধি প্রসূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ভেবরের মন্তব্য অজ্ঞতা প্রসূত অথবা ভেবর যথেষ্ট পণ্ডিত নহেন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লিখিতে পারিতেন। ইহা না করিয়া তিনি ভেবরের জর্মনকুলে জন্ম লইয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল, ভারত সভ্যতার অর্বাচীনতা প্রমাণ করিতে পারিলে জাতি হিসাবে ইংরাজের কিছু সুবিধা মিলিতে পারিত। জার্মান ভেবরের পক্ষে ভারত সভ্যতাকে ইচ্ছা পূর্বক হীন প্রমাণ করিয়া কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশা ছিল না—মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের ইহা বুঝিতে পারা উচিত ছিল। বঙ্কিমের ভাষায় ভেবরের মত ছিল এই যে যীশুখৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল এমন বিবেচনা করার কোন মুখ্য প্রমাণ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় ভেবর বিচারক সদৃশ আত্ম প্রত্যয় লইয়া একথা বলেন নাই যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল না। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল ইহার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। প্রমাণ নাই বলা আর অস্তিত্ব অস্বীকার সমার্থক নহে। ভেবরের বহু পরবর্তী উত্তর সাধক ডাঃ উইন্টারনিৎজ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য যে সব উপা-

দানের সাহায্য পাইয়াছেন নিঃসঙ্গ পথিক ভেবরের কালে তাহা অজ্ঞাত বা দুষ্প্রাপ্য ছিল। ডাঃ উইন্টারনিৎজের পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে আদৃত হইয়াছে। উইন্টারনিৎজের মতে মহাভারতের আখ্যান ভাগ যতই প্রাচীন হউক না কেন, খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে মহাকাব্যরূপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না অথবা থাকিলে ও সুপরিজ্ঞাত ছিল না। মহাভারতের প্রচলিত রূপ খৃঃ পূর্ব চতুর্থ হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দ এই দীর্ঘ-কালের সৃষ্টি। দেখা যাইতেছে ভেবরের মতের সহিত উইন্টারনিৎজের মতের অনৈক্য অল্প, ঐক্যই অধিক। ডাঃ উইন্টারনিৎজ বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন আর মন্দভাগ্য ভেবরের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে 'হিন্দু বিদ্বেষী' ও 'বর্বর জর্মন জাতির বংশধর' উপাধি। উপাধিদাতা স্বয়ং শতাব্দীর ভারতের অন্যতম মনীষী বঙ্কিম-চন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ভেবরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছেন তাহার ঔচিত্য বিচার ভেবরের জীবনী ও কর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই করণীয় এই কর্তব্য বোধেই বঙ্কিম-চন্দ্র কর্তৃক ভেবর দূষণ প্রসঙ্গ অনীহার সহিত আলোচিত হইল।

"বন্দেমাতম" মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চির পূজনীয় কিন্তু তিনি যাহা কিছুই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাই যে বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত ইহা মনে করা সংগত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমূলর সম্বন্ধেও কটূক্তি করিয়া গিয়াছেন। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ব্যাঙ্গোক্তি ও কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হইতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্রোক্তি বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। ভেবর, ম্যাক্সমূলরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের প্রভাব ভারতবাসী বিশেষভাবে বাঙ্গালী পাঠকের অন্তর হইতে অপনোদিত হইলে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে রক্ষণশীল হিন্দু-মানসিকতার প্রতিভূ ছিলেন। বঙ্কিমের কালে নাস্তিক্য, খৃষ্টধর্ম, নব-সৃষ্ট ব্রাহ্ম ও সংস্কার বাদী হিন্দু আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গা-ভিঘাতে বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থা নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "আক্রান্ত" সমাজ ও মানসিকতায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে এই যুগে চারিদিকে আতঙ্কের অলীক ছায়ামূর্তি দর্শন অস্বাভাবিক নহে। এই কারণেই ভেবর, ম্যাক্সমূলর, হুইটনি প্রভৃতি একনিষ্ঠ ভারত সাধকদের সাধনাকেও বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া ছিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বমতে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়াবেগের প্রভাব অধিক। অপরের প্রতি যাবতীয় কটূক্তি ও বিরূপ সমালোচনা নিজের সযত্ন লালিত ধ্যান ধারণাগুলির প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে করিতে হইয়াছিল। ব্যক্তিগত লাভক্ষতি অথবা ঈর্ষার বশে বঙ্কিমচন্দ্র কাহাকেও আক্রমণ করেন নাই—ইহা মনে রাখাও আমাদের কর্তব্য।

1. Die Handschriften-Verzeichnisse der Koninglichen Bibliothek (Zu Berlin), 1853. 2. Indische Studien, 17 Vols. (1850-1885). 3. Akademische Verlesungen Uber Indische Literaturgeschichte—A. Weber, Berlin, 1852. 4. History of Indian Literature (Trubner's Oriental Series).—A. Weber. 5. Kerzeichmisse der Sanskrit and Prakrit Handschriften der Koninglichen Bibliothek Zu Berlin), 1886. 6. Ueber die Leilingen Schriften der Jaina Indische Studien, Vols. 16 & 17, 1883-1885. 7. International Congress of Orientalists.

র বী ন্দ্র গ্র ন্থা লো চ না

[রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বইগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে যাব। বর্ণানুক্রম অনুসারে বইগুলির আলোচনা হবে। লেখক সোমেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত রবীন্দ্র অভিধানে অচলয়াতন, অনুবাদ চর্চা, অরূপরতনের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু আদ্যক্ষরের বর্ণক্রমই রক্ষা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্ণানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হলোনা। যেমন এ সংখ্যায় যাচ্ছে আলোচনা ও আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। বর্ণানুক্রম অনুযায়ী আগে আসা উচিত ছিল অন্যান্য গ্রন্থের যেমন আকাশ প্রদীপ, আত্মশক্তি ইত্যাদির। 'আ' আদ্যাক্ষর ধরে বইগুলির আলোচনা হবে-পরবর্তী বর্ণের ক্রম এগিয়ে পেছিয়ে যেতে পারে। 'আ' শেষ হলে আদ্যাক্ষর ক্রমানুযায়ী ই-ঈ ইত্যাদি চলতে থাকবে——সম্পাদক]

আলোচনা

(১৫ই এপ্রিল) ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য গ্রন্থ। এটির কোন দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি। রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে এটি স্থান পেয়েছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থটির মূল্য ছিল একটাকা। জীবনস্মৃতিতে আলোচনা সম্পর্কে লিখছেন :—"আলোচনা নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির পরিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব ব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোন মূল্য আছে কিনা এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির পরিশোধের স্থান কি তাহা জানি না, কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

এই গ্রন্থের কিছু কিছু লেখা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি এই

ডুব দেওয়া — ভারতী বৈশাখ ১২৯১
ধর্ম — ভারতী চৈত্র ১২৯০
সৌন্দর্য ও প্রেম — ভারতী আষাঢ় ১২৯১
কথাবার্তা — ভারতী শ্রাবণ ১২৯১
আত্মা — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রাবণ ১৮০৬ শক
বৈষ্ণব কবিরগান — নবজীবন, কার্তিক ১২৯১

আলোচনা রবীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মভাবমূলক গদ্যরচনা নয়। ইতিপূর্বে ছবি ও গানের যুগে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ লিখেছিলেন। বিবিধ প্রসঙ্গের শেষ প্রবন্ধ সমাপন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বিবিধ প্রসঙ্গ "একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত

ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহার সকলগুলি কি আমি মানি, না বিশ্বাস করি? সেগুলি আমার চির-গঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।" তাঁর এই কথাতেই রচনাগুলির চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জীবনস্মৃতিতে বলেছেন "যখন সন্ধ্যাসংগীত লিখিতেছিলাম তখন খণ্ড গদ্য 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাতসংগীত যখন লিখিতেছিলাম কিম্বা তাহার কিছু পর হইতে ওইরূপ গদ্য লেখাগুলি 'আলোচনা' নামক গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়া ছাপা হইয়াছিল। এই দুই গদ্যগ্রন্থে যে-প্রভেদ ঘটিয়াছে তাহা পড়িয়া দেখিলেই লেখকের চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন হয় না।"

আলোচনার প্রথম প্রবন্ধে ডুব দেওয়াতে রবীন্দ্রনাথ আবার এই জাতীয় রচনার সম্বন্ধে নিজের মনোভাব বলেছেন "যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেলনা, কেবল কতকগুলো কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন কথাটাই বা সত্য। বালুকা সম্বন্ধে যে কথাই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায়না, একটা কথা মুখস্ত করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন! কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে! তাঁহাদের কথা শোনে কে! তাহারা কোন দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না উঠে।"

অর্থাৎ এই রচনা সম্বন্ধে কবির পূর্ববক্তব্য প্রয়োগ করা চলে যে এগুলির কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য নেই, এগুলি 'গঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল এই মাত্র।' আলোচনার প্রবন্ধগুলির নাম—ডুব দেওয়া, ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রেম কথাবার্তা, আত্মা ও বৈষ্ণব কবির গান। এগুলি প্রত্যেকটির আবার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ আছে।

আলোচনা সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই কাব্যরচনাকে বালকের রঙের বাক্স লইয়া খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার গদ্যরচনাকেও সেইরকম রঙিন বাক্য লইয়া খেলার কথা বলিয়াছি। কিন্তু চিন্তাশীল মানুষের মন কেবল বহির্বিষয়ী জগতের রঙিন খেলায় তৃপ্ত থাকে না; সে মনোজগতের অনন্ত লীলারাশিকে পর্যবেক্ষণ করিতে বিশ্লেষণ করিতে ভালবাসে, নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া হয়, লিখিতে লিখিতে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, তর্ক করিতে করিতে সত্য প্রকাশ পায়। সেইজন্য একশ্রেণীর মনীষীরা নিরন্তর লেখেন, কথা বলেন, লিখিতে লিখিতে ভাবেন ও ভাবিতে ভাবিতে লেখেন-এটা পরের জন্য নহে নিজের জন্যই মুখ্যত ইহার প্রয়োজন।

"যৌবনের রচনা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' গ্রন্থখানিকে তাঁহার গদ্যগ্রন্থ সংগ্রহ হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন কিন্তু তরুণ কবি ও মনীষীর এই রচনার মধ্যে যে-গভীর মননশক্তির আভাস পাই তাহাকে আমরা তাচ্ছিল্য করিতে পারিনা।.. আলোচনার রচনাগুলি 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখার মত হালকা রচনা নয়, বয়স্ক চিন্তাশীল প্রায়-দার্শনিকের মত গভীর গম্ভীর ও জটিল।"

আলোচনার প্রবন্ধগুলির ব্যাখ্যা তাদের নামে পাওয়া যাবে।

অবশেষে একটি কথা বাকী থাকে। দেবেন্দ্রনাথ তখন চুঁচুড়ায় বাস করেন। নানারকমের শোক পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন।

যে মন গতিশীল ও সজীব সে কোন বদ্ধ মতামতের জলাশয়ে ডুব দেয়না। সচল চিন্তার

প্রবাহে সে বিরোধী চিন্তাকেও নিজের মধ্যে অবাধে আশ্রয় দেয়। শুধু মননের একটা নিজস্ব মূল্য ও আনন্দ আছে-বলাবাহুল্য সে রসের রসিক আমাদের দেশে বেশী নেই। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এই মননের ধর্ম দেখে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে যা বলেছিলেন (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ প্রবাসী) তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সত্য। তিনি বলেছেন-"সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনা করেছেন কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ওঁর সঙ্গে আমার তহবিলের তুলনা হয়না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ওঁর পথ চলতি মন নিয়ে।"

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ—১৩৪৮ সালে আষাঢ় মাসে আশ্রমের রূপ ও বিকাশ বিশ্বভারতী পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। তখন দুটি মাত্র প্রবন্ধ ছিল এতে আশ্রমের শিক্ষা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।

১৩৫৮ সালে ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি হিসাবে এই গ্রন্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নব প্রকাশিত গ্রন্থটির চিত্রালংকার করেন নন্দলাল বসু। প্রথম প্রকাশকালের প্রবন্ধ দুটি ছাড়া আর একটি প্রবন্ধ নতুন সংস্করণে যুক্ত হয়েছে সেটির নাম আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা।

নবসংস্করণের প্রথম প্রবন্ধ 'আশ্রমের শিক্ষা', দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', তৃতীয় প্রবন্ধ 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা'।

১৯৩৬ সালে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ-এর অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়া হয়। সেগুলি 'শিক্ষার ধারা' নামে একটি গ্রন্থে গ্রথিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধ তাতেই স্থান পায়। প্রবাসীর ১৩৪৩ সালের আষাঢ় সংখ্যাতেও প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৩৫১ সালে নবসংস্করণ 'শিক্ষা' গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পায়।

আশ্রমের শিক্ষা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সের ছেলেদের এবং তাদের সঙ্গে বয়স্ক শিক্ষকদের ব্যবহারের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ছেলেদের স্বভাবে যে দুর্বলতাগুলি দেখা যাচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজের মতামত বলেছেন। তাঁর মনের মধ্যে তপোবনের একটা স্বপ্ন ছিল। তপোবনের কাল চলে যাবার পরেও যে মূর্তিটি ভারতবর্ষের সংস্কারে জেগে রইল তা হলো 'কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানস মূর্তি", 'বিলাস মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি।' তপোবনের আদর্শ তাঁর বহুদিনের। সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন "যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্য সাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন একসময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিক কালের কোন একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।"

আধুনিক যুগে যাকে আমরা স্কুল বলি তাকে রবীন্দ্রনাথ মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন না। স্কুল নিতান্তই একটা যন্ত্র। যে গুরুর ব্যক্তিসত্বার স্পর্শে শিষ্য নিজের অন্তর্জাগরণ অনুভব করে সে গুরু শিক্ষার কারখানাঘরে থাকবেন কেমন করে। আশ্রমের শিক্ষায় 'ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।' গুরু কি রকম হবেন এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে গুরু-শিষ্যে 'প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।' তাঁর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি না বাঁচে তাহলে ছাত্রদের সঙ্গে নিবিড় যোগ ঘটাবে কি করে। দ্বিতীয়তঃ চাই অসীম ধৈর্য আর স্বাভাবিক স্নেহ। রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে

দিয়েছেন "শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নন। কঠিন শাসন, রূঢ় ব্যবহার ছাত্রদের প্রতি নিয়তই শিক্ষকের অবিচারকে প্রবল করে তোলে। কঠোর শাসননীতিকে শাসয়িতার অযোগ্যতার প্রমাণ বলেই তিনি জানেন।

ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর প্রথম কথা যা মনে হয়েছে তা হলো এই—"ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী।" অভ্যাসের কৃত্রিমতার জালে তাদের বেঁধে রাখতে গেলে তারা ছটফট করে "সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবী করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে।" বর্গস' ও আরণ্যক ঋষিরা বলেছেন—সবকিছুই প্রাণে স্পন্দিত হচ্ছে। শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালের বাইরে তিনি ছেলেদের দেহে মনে বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দিতে চান। এই কারণেই শুধু খেলা ধুলা নয়, "আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।"

ছাত্রদের সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা উপকরণবিরল জীবনে অভ্যস্ত হওয়া। আশ্রমে সহরজীবনের উপকরণ লুব্ধতাকে বর্জন করতে হবে। বস্তুর প্রতি আত্যন্তিক মোহ চিত্তবৃত্তির স্থূলতাকে প্রকাশ করে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে তা হলো মনের জিনিষ এবং "সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে।"

তৃতীয়তঃ ছাত্রদের মধ্যে আত্মকর্তৃত্বের বোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে 'অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা চলবেনা। আশ্রমবিদ্যালয়ে আত্মকর্তৃত্বের অবকাশ পেয়ে তারা অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে রক্ষা পাবে, এই ছিল কবির পরিকল্পনা।

চতুর্থতঃ তিনি দেখেছেন আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের একান্ত অভাব। ছাত্রদের এই নিরৌৎসুক্য, আন্তরিক নির্জীবতাও কাটাতে হবে। তাই আশ্রমে যে শিক্ষার স্বপ্ন তাঁর ছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলছেন "প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে।"

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকজন মানুষের কথা বলেছেন যাঁরা তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয়কে প্রাণ দিয়ে সেবা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার ও তার ছেলে হরিশ।

তারপর একে একে আছে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, সতীশ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও নন্দলালবসুর কথা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে তিন মাসের বড়ো ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধবের গার্হস্থ্য নাম) ১১ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলায় খন্যান গ্রামে জন্মেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানে যে পরিচিতি দেওয়া আছে তা তুলে দেওয়া হলো ঃ—

তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমে গুরুদেব বলে ডেকেছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে বলছেন যে নৈবেদ্যর কবিতাগুলি সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধব "তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন কর্তে হচ্ছে।"

ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে যোগ দেন কয়েকটি ছাত্র নিয়ে। তাঁর নিজস্ব একটি স্কুল ছিল কলকাতা সিমলা ষ্ট্রীটে। সেই স্কুলের ছাত্ররাই বোলপুর বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। প্রকৃতপক্ষে

আশ্রম পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁরই হাতে গিয়ে পড়লো। সে সম্বন্ধেও আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।" সেই অর্থসংকটের দিনে সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব ও রেবাচাঁদ অধ্যাপনার ভার বহন করে আশ্রমকে বাঁচিয়েছেন।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তারপরে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তীব্রভাষায় তিনি বিপ্লববহ্নি জাগিয়ে তুললেন। তারপর একদিন বোধহয় মনে মনে একে পথবিচ্যুতির গ্লানি মনে করে দুঃখও পেয়েছিলেন। চার অধ্যায়ের কাহিনী লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধবের এই পরিবর্তন স্মরণ করেছেন।

রেবাচাঁদ ছিলেন ব্রহ্মবান্ধবের শিষ্য। তিনি সিন্ধুদেশবাসী। পরে অণিমানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন—যে রেবাচাঁদ খৃষ্টান বলে মহর্ষি তাঁকে বিদ্যালয়ে নেওয়াতে আপত্তি করেন।

রেবাচাঁদ ১৯০২ সালে আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন। আশ্রমের পুরানো ছাত্র গৌরগোবিন্দ বাবু তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন "১৯০২ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন একবার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন ও ছাত্রদের একখানি বাঁধানো সচিত্র বাইবেল উপহার দিয়ে যান। পুস্তকটি ইংরাজীতে লেখা, অক্ষরগুলি বড় বড়, প্রতি পৃষ্ঠায় ছবি ছিল।" বইটিতে গৌরগোবিন্দবাবুর আগ্রহ দেখে রেবাচাঁদ তাঁকে ছবিগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এই নিয়েই খৃষ্টান রেবাচাঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। (এই তথ্য প্রকাশ করেছেন উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় ৩রা বৈশাখ ১৩৬৮ যুগান্তরে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব' প্রবন্ধে।) আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলছেন "কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় রেবাচাঁদ খৃষ্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ-কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোন আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন 'তোমরা কিছু ভেবোনা। আমি ওখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।" রেবাচাঁদ অণিমানন্দ হবার পরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় অণিমানন্দের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ১৯০৯ সালে পুরস্কার বিতরণ করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালের লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অণিমানন্দকে লিখেছেন

"Dear Animananda

Of your wonderful method of teaching I have often expressed my hearty appreciation which I can repeat and say that it gives me very great pleasure to learn that your Boys own Home has received its desert in the warm approval of such a great expert as Dr. Sadler. This institution is the fruit of your own tapasya, of the years of your strenous self-sacrifice and lavish pouring out of your sympathetic intelligence for the cause of boys education.

Very sincerely yours
Rabindranath Tagore"

রেবাচাঁদের শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসা সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর On the edges of time গ্রন্থে বলছেন যে শৃঙ্খলার যে ধারণা রেবাচাঁদের ছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

মেলেনি। তাই রেবাচাঁদকে আশ্রম ছেড়ে যেতে হয়। তিনি বলছেন "A Sindhi disciple of Brahmabandhab Upadhyaya, Rewachand....joined shortly afterwards as a teacher of English. He was a Roman Catholic and a strict disciplinarian; his was the kind of discipline learnt on the cricket field and applied to every day life. This hardly appealed to father and clashed with the ideal of freedom and self-determination which he sought to establish in the Asrama; as a consequence Rewachand had to leave very soon.

তৃতীয় জন হলেন সতীশচন্দ্র রায়। এই অল্পবয়সের তরুণটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের শুধু গভীর ভালবাসা নয় গভীর শ্রদ্ধাও ছিল। এ প্রবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা সতীশচন্দ্রের ব্যক্তিরূপটিকে অল্প কথায় ফুটিয়ে তোলে :—

"একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা করো। সতীশ বললেন দেবনা পরীক্ষা। কারণ পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার চালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে। "কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলোনা। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম।"

এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁর পরমবন্ধু অজিত চক্রবর্তী জানাচ্ছেন :— "১২৮৮ সালের মাঘে সতীশচন্দ্র বরিশাল জিলার অন্তর্গত উজিরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতামহ স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র রায় বরিশালে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। জমিদারীর ভগ্নদশায় সতীশ সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ হন। বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ইনি বরাবর অধ্যয়ন করিয়া সেখান হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। বি. এ. পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছেন তখন কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহার পরিচয় ঘটে এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ সাংসারিক উন্নতির আশা জলাঞ্জলি দিয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জীবন উৎসর্গ করেন।.. পশ্চিমে একবার ভ্রমণ করিতে গিয়া সতীশচন্দ্র বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৩১০ সালের পূর্ণিমার দিনে ২২ বৎসর বয়সে বোলপুরে প্রাণত্যাগ করেন।"

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জানা যাবে সতীশচন্দ্রের 'গুরুদক্ষিণা' গ্রন্থের ভূমিকায় আর বনবাণীর 'শাল' কবিতায়।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সঙ্গে সতীশচন্দ্রের যোগ কত নিবিড় ছিল তা রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই ফুটেছে :—"এই আশ্রমের একপ্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃন্ময় কুটিরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম সমাজ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্ধ্বদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখনকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।" শাল কবিতায় এই সম্বন্ধেই বলছেন :—

কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকা, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনের মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।

সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় যা বলেছেন তার কিছু কিছু তুলে দেওয়া হলো :—

"তোমরা যে দুটি মধুকরের মত শান্তিনিকেতনের নীলকাশ শতদলের প্রচ্ছন্ন মধুটুকু স্তব্ধ হইয়া আনন্দে উপভোগ করিতেছ ইহা আমার পক্ষে সুসংবাদ।....তোমরাও পুঁথিগত অভ্যস্ত বিদ্যার পথ, সহস্রের পথ, সমালোচকের পথ ছাড়িয়া নিজের অন্তরতম ধ্রুব আদর্শের এক মহাপথ ধরিয়া সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইবে এই আমি আশা করিতেছি। সতীশের সম্মুখে একটি সার্থক পরিণাম প্রতীক্ষা করিয়া আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি।" (অজিতকুমারকে লেখা চিঠি ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, আলমোড়া)

"আজ সতীশের মৃত্যুবাৎসরিক—মাঘী পূর্ণিমার দিন আজ। সতীশকে তুমি জাননা নামই শুনে থাকবে। গুরুদেব আজ বলছিলেন যে তাঁর মত একদিকে অমন ভাবরসে সৌন্দর্যে মহত্ত্বে উদ্বেল হৃদয় অন্যদিকে অমন কঠোর তপস্বী অত বড় ত্যাগী তিনি আর কাউকে দেখেন নি—বলছিলেন যে তাঁকে ভিতর থেকে যদি কেউ চালনা করে থাকে তা সতীশ করেছেন। (অজিত চক্রবর্তীর লেখা চিঠি ১৩১৬ সাল)

"সতীশের জীবনটুকু আমাদের বিদ্যালয় এবং আমাদের সাধনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। সে আমাদের বিদ্যালয়কে শক্তিও দিয়েছে সৌন্দর্যও দিয়েছে—স তপোহতপ্যত। এবং সে আনন্দে নন্দিত হয়েছে। তার সেই জীবনের দামটি ক্রমেই আমাদের কাছে সত্য হয়ে উঠতে থাকবে। আমাদের বিদ্যালয়ের মূল সুরটি, সেই কবি তপস্বী তরুণ যুবা ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ত্যাগ এবং লাভের সম্পূর্ণতাটুকু তার ঐ কয় দিনের জীবনে সে পবিত্র এবং মধুর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে—আমাদের সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে তার সেই সুরটি নিশ্চয়ই ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। তার নির্মল জীবনের তীর্থসলিল একেবারে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে, সে আমাদের বিদ্যালয়ের অভিষেক করে গেছে।....সতীশের মৃত্যুদ্বারা আমাদের এই সাধনা অমৃতের অধিকার লাভ করেছে।" (অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা ২৪শে মাঘ ১৩১৫-র চিঠি)

"আমি নিশ্চয় জানি রথীর অধ্যাপনা কার্যে তোমার যত্নের ত্রুটি হইবে না তাই আমি এত নিশ্চিন্ত আছি। বিদ্যালয় খুলিলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে আমি সেই কথাই ভাবি। নূতন দুজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার সংকল্প হইয়াছে। বিপিনবাবু ত শীঘ্রই আসিবেন। আরো একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া গেলে তুমি বোধকরি রথীর প্রতি পুরা মনোযোগ দিতে পারিবে। রথীকে সাহিত্যে যথার্থভাবে দীক্ষিত করা সম্বন্ধে তুমি ছাড়া আর কাহারো প্রতি আমি নির্ভর করিতে পারিনা। কেবল সাহিত্যে কেন তুমি তাহাকে মনুষ্যত্বেও অগ্রসর করিতে পারিবে।" (সতীশচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি) "সতীশের কাছে ইংরাজী কমপজিসন-এর চর্চা করিস। তুই সাহিত্যের অত্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষক পাইয়াছিস—এই অবসরে যদি তোর সাহিত্যে অধিকার ও রসগ্রাহিতা না জন্মে তবে তোর শিক্ষা ব্যর্থ হইবে।" (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা ১৯০৩ সালের চিঠি)

সতীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব জানা গেল। এবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের মনোভাব কেমন ছিল তার কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ—

"গুরুদেব বলিয়াছেন আত্মালোচনা করিতে গিয়া morbid হয়ে পড়োনা। morbid

কেন হইব? আমার স্বাস্থ্য কি এতই খারাপ? আমার সহজ আনন্দকে কেন দমাইতে যাইব কেন morbid হইব? জীবনের রস কি আমি কিছুমাত্র পাই নাই? হায়! প্রতিদিন আমি কি একটি সৌন্দর্যের কাছে আসিতেছি!....গুরুদেবের স্নেহই তো আমার জীবনের উপরে সূর্য-রশ্মির মতো পড়িয়াছে। ফুলের উপরে প্রভাতের সূর্যরশ্মি পড়িলে সে যাহা অনুভব করে তাহা আমি একটু একটু যেন বুঝিতে পারি।" (সতীশচন্দ্রের ডায়ারী)

"(স্কুল জীবনে) গুরুদেবের কবিতাই যেন আমাকে ধরিয়াছিল। সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আজ উদয়াচলে ঘাটে আসিয়া ঠেকিয়াছি। রবির কিরণ প্রত্যক্ষভাবে আমার মর্মের ভিতরে নামিয়া মধু ভান্ডারটিকে পূর্ণ করিতেছে, দলগুলিকে বর্ণে পূর্ণ করিতেছে।" (সতীশ চন্দ্রের ডায়ারী)

"শ্রীযুক্ত রবিবাবুর লাইনস অনুসারে বাংলার ছন্দশাস্ত্র লিখিব কল্পনা করিতেছি কিন্তু সেও ভবিষ্যৎ জানে। শ্রীযুক্ত রবিবাবু একটু পরম সুন্দর prose লিখিয়াছেন। (বসন্তযাপন, বঙ্গদর্শন ১৩০৯) রবিবাবু prose-এ কলম ধরিয়াছেন এবার আমরা বাংলার আর এক চমৎকার কবিত্বমন্দিরের সিংহদ্বার খুলিব। 'গুরুদেবের' রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তর পারে অদ্ভুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে হৃদয়হর মুখ দেখিতে পাই উঁহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি—কারণ কি জান? এই দেখ চারিদিকে দুপুরের রৌদ্র নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে—এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্টি আছে তাহা বুঝানো যায় না—এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ সুদূর আকাশ হইতে আমাদের উপবনে আমাদের প্রাণের উপর চাঁপাফুলের জ্যোতি ফেলিয়াছে—মাঠের একদিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেকদিকে পালাইতেছে—যে এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে আর মনে পড়িতেছে অন্তর বাহিরসুন্দর আমার ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেইজন্য ইচ্ছা হইতেছে উঁহাকে নানা 'মধুর নামে' জ্ঞাপিত করি, তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে গুরুদেব বলিলাম।" (১৩০৯ সালে অজিত চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)

সতীশচন্দ্র ক্ষণিকার একটি সমালোচনা লেখেন। সেটি আশ্বিন সংখ্যা ১৩০৯ সমালোচনীতে প্রকাশিত হয়।

অজিতকুমার চক্রবর্তী অল্প বয়সে বি, এ, পাশ করে আশ্রমের শিক্ষক গোষ্ঠিতে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তাঁর সম্পূর্ণ মনোনিবেশ তাঁর জীবনের প্রধান কথা। সতীশচন্দ্র রায় যখন বি, এ, পরীক্ষা না দিয়ে আশ্রমে যোগ দিতে যাচ্ছেন তখন অজিতকুমারও সেই বাসনাই প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মাতৃ অনুরোধে বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে তার পর তিনি আসেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই বলছেন "অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরাজী সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চঅংগের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল।"

মোহিতচন্দ্র সেনের পরে যথার্থ রবীন্দ্র-সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে সুরু হয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে সঙ্গেই। তিনি শুধু প্রথম যুগের সমালোচক নন তিনি যে শ্রেষ্ঠতম সমালোচক এ বিষয়েও বোধ করি বিশেষ তর্ক নেই। জীবনদেবতা তত্ত্বের তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করলেন। রাজা, ডাকঘর, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, প্রভৃতি এবং গীতাঞ্জলি, গীতিমালা প্রভৃতি কাব্যের যে আলোচনা তিনি প্রবাসীতে প্রকাশ করেন সেইগুলিই একত্রে কাব্যপরিক্রমা নামে সঞ্চিত

হয়েছে।

অজিত চক্রবর্তী ছিলেন সুগায়ক ও সুঅভিনেতা। 'চিঠিপত্র' গ্রন্থগুলিতে তাঁর এই দিকটির সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। প্রথম বিশী মহাশয় তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থে অজিতকুমার সম্বন্ধে বলছেন—"অজিত বাবু বাংলা দেশে যে শুধু রবীন্দ্রবাণীর দোভাষীর কাজ করিতেন এমন নয়, আশ্রমের অধিবাসীদের কাছেও তিনি রবীন্দ্রবাণীর যেন দোভাষী ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায়, তাহার মর্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সাহায্য অপরিহার্য ছিল—অনেক সময় আমার তো মনে হইত ছাত্রদের চেয়ে বয়স্ক অধিবাসীদের উপরেই তাঁহার প্রভাব বেশি কার্যকর হইয়াছিল।" প্রথম দিকে দিনেন্দ্রনাথঠাকুরের সংগে তিনিও আশ্রমে সংগীতশিক্ষকের কাজ করেন।

দশ বছব কাজ করার পর অজিতকুমার আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন। এই ছেড়ে আসার কারণ সম্বন্ধে জীবনীকার প্রভাতকুমারের বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করা গেল ঃ—আমাদের মনে হয় কিছুকাল হইতে অজিত কবি সম্বন্ধে বেশ একটু critical হইতেছিলেন। গত এক বৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন চরিত রচনা ব্যপদেশে অজিতকে কলিকাতায় বেশির ভাগ সময় থাকিতে হয়। কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজের সহিত অজিতের ঘনিষ্ঠতা হয় এই সময়ে। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে সকলেই রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন না, অনেকে বিরোধী না-হইয়াও ক্রিটিক, আবার কেহ কেহ নিছক নিন্দাকারী। মোট কথা, এই ক্রিটিক সমাজের সহিত মেলামেশি ও বার্কবিতণ্ডার ফলে অজিত রবীন্দ্রনাথকে ক্রমেই critically বিচার করিতে আরম্ভ করেন। যে একদেশ-দৃষ্টি লইয়া তিনি এতাবৎকাল আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন ও কবির রচনাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বৃহত্তর বহির্জগতের সংস্পর্শে আসিয়া বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। কবির নূতন রচনাসমূহ সম্বন্ধে অজিতের পূর্বের অন্তসংস্কার অনেকখানি দূরে হইয়া যায়। মোটকথা অজিতের মন নানা কারণের যোগে রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া আসিতেছিল; কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্যসমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা"

এই কারণটির সংগে সংগেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অজিত চক্রবর্তীর অর্থনৈতিক সংকটকেও আশ্রম ত্যাগের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও অজিতকুমারের প্রতি কবির স্নেহ কমেনি।

১৩২৫ সালে অজিতকুমারের মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

মোহিতচন্দ্র সেন বিদ্যালয়ের সংগে অল্প দিনের জন্য যুক্ত হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর যোগ ঐটুকুই নয়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ—প্রথম যেদিন আমার সংগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন।"

মোহিতচন্দ্র সেনের পিতা জয়কৃষ্ণ সেন কুচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই তিনি সাহিত্যপ্রীতি ও দর্শনে উৎসাহ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নববিধানপন্থী। তিনি ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে, দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পাশ করেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাব্যগ্রন্থাবলীর সম্পাদন করেন। তিনি বহরমপুর ঢাকা, হুগলী ও কলকাতার মেট্রোপলিটান রিপণ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন।

কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় মোহিতচন্দ্র লিখছেন ঃ—"যিনি কথার সাহায্যে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন তিনি কবি; কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি— যিনি শুধু চিত্রাঙ্কণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব-অপরূপ ঝংকারগুলি আনিতে পারেন। যিনি জীবনের একটি সামান্যতম সত্যকে পরিস্ফুট ও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারেন তিনি কবি—কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার কবিতায় সমগ্র জীবনের সুগম্ভীর বিজয়গীতি শ্রুত হয়। যিনি সত্য ও ছন্দের সাহায্যে পাঠকের মনে আনন্দসৃজন করেন তিনি কবি, কিন্তু উচ্চতর কবি তিনি—যাঁহার নিজের আনন্দ এত স্বাভাবিক ও যথেষ্ট যে পাঠক কণামাত্র আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পরেন 'আমি আগন্তুক মাত্র আমার অপেক্ষা কবির নয়ন অশ্রুতে অধিক সমাকীর্ণ, আমার অপেক্ষা কবির হাস্য আনন্দ অধিক উদ্ভাসিত।' এইখানেই রবীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব।"

মোহিতচন্দ্রের এই ভূমিকা রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের প্রথম যথার্থ আলোচনা।

১৩১০ সালের মাঘ মাসে বোলপুর বিদ্যালয় কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে উঠে যায়। সেখানে মোহিতচন্দ্র সেন হেডমাষ্টার হয়ে যান। ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ আবার বিদ্যালয় চলে আসে শান্তিনিকেতনে। সেখানে তিনি বিদ্যালয় নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পেলেন। সে কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতাও ছিল তাঁর। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাইরে—চিঠিপত্রের মারফৎ তাঁর নির্দেশ আসতো।

কিন্তু বোধহয় মোহিতচন্দ্রের স্বাস্থ্যের জন্যই কয়েকমাস পরে বিদ্যালয়ের নানা কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা যেতে লাগলো। পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুললে মোহিতচন্দ্র বিদায় নিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এইখানেই শেষ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনার ব্যাপারে কতদূর নির্ভর করতো মোহিতচন্দ্রের উপর তার প্রমাণ আছে ২৮শে শ্রাবণ ১৩১০ সালে লেখা (কার্তিক ১৩৪৯ বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত) একটি চিঠিতে।—

"এডিটরের দায়িত্ব আপনার। যখন থামতে হবে, বলবেন 'বাস্'। আপনি কল চালিয়েছেন—এখন 'furiously rash driving' বলে আমার নামে নালিশ করতে পারবেন না। ক্রমে উত্তাপ যত বাড়িতে থাকে চাকাও তত ছুটে চলে। যতই লিখচি নিজের ভিতরে যে বালকান্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন একটা জায়গায় তো থামা আবশ্যক—সে সম্বন্ধে কিন্তু আমার একলার প্রতি নির্ভর করে থাকবেন না—রাশ টেনে ধরবেন।"

মোহিতচন্দ্র যে অর্থ বিশ্বভারতীতে দান করেছিলেন তার সম্বন্ধে ২৬শে ফাল্গুন ১৩০৯ তারিখে বলছেন ঃ আপনার দান যে আমাদের পক্ষে কি অমূল্য হইয়াছে তাহা আপনাকে কেমন করিয়া জানাইব? ধনীর দানে আমাদের বাহ্য অভাব মোচন হইত মাত্র কিন্তু আপনার দানে আমাদের বল এবং নিষ্ঠা বাড়িয়া গেছে।....আপনি আমাকে দুঃসময়ে হঠাৎ সচেতন করিয়া অনেকদূরে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অধ্যাপকেরাও নূতন প্রাণ পাইয়া দৃঢ়তর নিষ্ঠার সহিত এই বিদ্যালয়ের অন্তর্নিহিত মহৎ আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য আত্মোৎসর্গে সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন তাহা আমি অনুভব করিতেছি।"

প্রবন্ধে উল্লিখিত শেষ ব্যক্তিটির নাম নন্দলাল বসু। শিল্পাচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এসে পাকাপাকিভাবে যোগ দেবার আগেই একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তখন কবি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (১২ই বৈশাখ ১৩২১)

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত ভারতী চিত্ত
বঙ্গলক্ষ্মী ভান্ডারে সে যে যোগায় নূতন বিত্ত।

এর কিছুকাল পরে নন্দলালবসু স্থায়ীভাবে যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনে। অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম ছাত্র নন্দলাল শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে ভারতীয় শিল্প সাধনার যে ধারা প্রবাহিত করলেন তারই ভিন্ন ভিন্ন স্রোত ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। বড় চাকরীর বেশী সম্মানের লোভ তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। শিক্ষক নন্দলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন "ছোট বড় সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিষ্টের একাত্মতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।" এই প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর আদর্শ নিত্যকাল অচল অনড় হয়ে থাকবে এ তিনি আশা করেন না। নানা লোক আসবে তাদের শক্তি ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য আশ্রমকে বৈচিত্র্যদান করবে। পরিবর্তমান কাল পুরানো ভিত্তির উপরে নিজের নতুন রূপ ফুটিয়ে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ তাতে আশঙ্কিত নন। তিনি বলছেন "এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালেব ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সঙ্গীত রক্ষা হয়না।"

আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা—এই প্রবন্ধটি আশ্রমের রূপ ও বিকাশের দীর্ঘতম প্রবন্ধ ১৩৪০ আশ্বিন প্রবাসীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাল্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেবার প্রসঙ্গ বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করেছেন। আর লরেন্স, শিবধন বিদ্যার্ণব, সতীশ রায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কথা স্মরণ করে শান্তিনিকেতন আশ্রম গঠনের মর্মকথাটিকে প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ না থাকলে মানুষের মনুষ্যত্ব যে অসম্পূর্ণ সে কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। কলকাতার বাঁধাধরা নিয়মের স্কুলগুলির প্রতি তাঁর বিরক্তি ছিল এবং তিনি নিজের জীবনেও সেই সব বিদ্যালয়ের বাঁধন মানেন নি। বাঁধনহীন শিক্ষার আনন্দ তাঁকে গভীরতর অধ্যয়নের উৎসাহ যোগাতে লাগলো। "শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশী অথচ ভার গেল কমে।"

তার পর সংসারে প্রবেশ করে যখন রথীন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেবার প্রশ্ন উঠলো তখন নিজের ধারণাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার সুযোগ এলো। তখনকার দিনে স্কুল কলেজের নির্দিষ্ট শিক্ষাধারার বাইরে ঘরের ছেলেদের পাঠানো অনেক আত্মীয় পছন্দ করেন নি। সেই কথা স্মরণ করে তিনি বলছেন "শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যে রকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থায় গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানতো এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করতো তা স্বীকার করতে।" প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য লাভে উৎসুক ছেলেরা যখন নানারকম দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয় তখন আমরা তাদের বাধা দিয়ে নিরুৎসাহ করি, তাতে আত্মনির্ভরতা বাড়ে না। সে সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলছেন, "একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তারে ভীরুতাবশতঃ বঞ্চিত করিনি।"

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে যারা তখন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আয়োজনে ব্যাপৃত তার মধ্যে লরেন্স, শিবধন বিদ্যার্ণব, সতীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির কথা আছে।

শিক্ষক লরেন্সের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "তার পড়বার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিলনা" লরেন্সের চরিত্রটি স্পষ্ট করে বোঝবার জন্য তিনি লরেন্সের রেশম-কীট সেবার কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। ১০ই আষাঢ় ১৩০৬ সালের চিঠিতে জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন "—লরেন্স স্নান-আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরাজজাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি. উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা ঊনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না।"

তারপর আছে শিবধন বিদ্যার্ণবের কথা। শিবধন বিদ্যার্ণব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা হলো এই ঃ—ঠাকুর পরিবারের নিকটাত্মীয় কারো বিবাহ বাসরে সত্যব্রত সামশ্রী মহাশয়ের সামগান করার কথা ছিল। অনেক বড়ো বড়ো লোক সেখানে হাজির। সামশ্রী মহাশয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্য একজনকে সামগান করতে পাঠালেন। প্রথমে মনক্ষুন্ন হলেও সমবেত সকলে শেষ পর্যন্ত তাঁকেই সামগান করতে দিলেন। তিনি যখন সুরু করলেন তখন দেখা গেল তাঁর বেদমন্ত্রোচ্চারণও অত্যন্ত উন্নত স্তরের। এই নতুন মন্ত্রপাঠকই শিবধন বিদ্যাণর্ব। সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি জোর করেই বিদ্যার্ণবকে ধরে নিয়ে গেলেন মহর্ষির কাছে। মহর্ষি তাঁর মন্ত্রোচ্চারণে আনন্দিত হলেন এবং তাকে সভাপন্ডিত নিয়োগ করলেন।

এমনি করেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ নিবিড় হয়ে উঠলো। তিনি শান্তিনিকেতনেও ছিলেন প্রথম যুগে। সতীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবের কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

প্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে এনে ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শেখানোর এই প্রচেষ্টা করার পিছনে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল "কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত।" দেশের অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদও রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টাকে কবিকল্পনা বলে উপহাস করেছিলেন. স্বয়ং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একে কবিজনোচিত বলে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

তারপরে প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে মহর্ষির ধ্যানগত সম্পর্কের সুবিস্তৃত কাহিনী বলেছেন। প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজের বালককাল যার কেটেছে তার পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হলোনা। ঐ আশ্রমেই আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি পাওয়া গেল মহর্ষির কাছ থেকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ কোন স্থির আদর্শকে শান্তিনিকেতনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি জানতেন যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বদলাবে রূপ বদলাবে যেমন সংস্কার চলতে থাকবে তেমনি নতুন নতুন বিকারও দেখা দিবে। "গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়।"

এমনি করে নানা লোকের, নানা মতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আশ্রম। কবির ধারণা "এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।"

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আ লো চ না

সংবাদপত্রের স্বাধিকার

"We the peoples of the United Nations determined to reaffirm faith in fundamentel human rights,....and for those ends to practice tolarance......"
(charter of the U. N.).

মানব সভ্যতার আদিযুগে কবির ভাষায় দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয়। 'সে পুরুষ সে বর্বর সে মূঢ়।' গদাহাতে মুষল হাতে লণ্ডভণ্ড করেছে সে সমুদ্র পর্বত; কারণ জড় রাজত্বে সে ছিল একাধিপতি। সে যুগে ব্যক্তি মানুষের বিকাশের কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সম্রাট বা এক নায়কের কোন কর্মের সমালোচনা করলে তার একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু স্বাধীনতালিপ্সু মানব মনের জয়যাত্রা কখনও থেমে থাকেনি। সে যাত্রার বিজয় কেতনের কাছে একদিন জড়ের ঔদ্ধত্য হল অভিভূত। নম্র হল শিকলে বাঁধা দানব। সভ্যতার সেই সুপরিণত যুগের ফসল সংবাদপত্র।

তারপর যুগ যত পরিবর্তিত হয়েছে, সংবাদপত্র মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে সংবাদ পত্র। আজ তাই গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সমস্ত সরকার সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। যে দেশেই সংবিধান আছে, সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে, সংবাদ পত্রকে সাধারণের ভাগ্য জয় করার দিতে হবে অধিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনে বলা হয়েছে : 'বাকস্বাধীনতা ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য কংগ্রেস কখনই কোন আইন প্রণয়ন করবে না।' সুইজারল্যাণ্ডের গঠনতন্ত্রের ৫৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সরকার।

ইতালি প্রজাতন্ত্রে ১৯৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, তার ১১নং অনুচ্ছেদে একথা স্পষ্টই লেখা আছে যে, সংবাদ পত্রকে কখনই নিয়ন্ত্রিত করা হবে না। আর্জেন্টাইন গণতন্ত্রের সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ সম্পর্কে কোন আইন কখনই পার্লামেন্ট প্রণয়ন করতে পারবে না।

কিন্তু এর মধ্যে 'তবু' আছে। তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে থাকে পুরাতন ইতিহাস। ব্যবস্থার মধ্যে সে আনে বিশৃঙ্খলতা। পুরাতন স্বভাবের কালো গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে আসে এঁকে বেঁকে।

তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সরকার যেখানেই দেখেছে, তার কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তখনই আইনের কারচুপিতে সে সংবাদ পত্রের স্বাধিকার হরণ করতে ইতস্ততঃ করেনি। দেশে এক কল্পিত 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করে নিরাপত্তার অজুহাতে সরকার এমন করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে। 'তাই দেখি আসামের দাঙ্গার অজুহাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বাংলাদেশের সংবাদপত্রের উপর হুমকি দেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর

বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের উপর আজ আঘাত এসে পড়েছে নানা অজুহাতে। সাধারণতঃ এই নিয়ন্ত্রণ এসেছে দুদিক থেকে—গণতন্ত্র বিরোধী নানা কালাকানুনের দিক দিয়ে ও অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে।

দেশ-বিদেশের কালাকানুন

পূর্বেই বলেছি, কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য যখনই সরকার স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ করার মনস্থ করেন, তখনই তাঁরা এক কল্পিত 'জরুরী অবস্থার' ঘোষণা করেন। এই জরুরী অবস্থায়' নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়।

১৯৫৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এমন একটি আইন প্রণয়ন করে রেখেছেন। এই আইন বলে কখনও কোথাও বর্ণবিদ্বেষ সংক্রান্ত গোলমাল বাঁধলেই সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং সরকার সংবাদপত্র বন্ধ করে দিতে পারবেন, যদি কোন সাংবাদিক সরকারী নীতির সমালোচনা করেন, তাহলে তাঁর ৩৯০০ টাকা জরিমানা, তিন বছর জেল হবে অথবা এই দুটি শাস্তির যে কোন একটি, ও সেইসংগে দশ ঘা বেত মারা হবে। দরকার হলে এই জরিমানার পরিমাণ হতে পারে ৬৫০০ টাকা। কারাদণ্ড হতে পারে পাঁচ বছরের। এবং বেতের পরিমাণ হবে ১৫ ঘা।

আর একটি আইনের বলে, কোন সংবাদপত্র সরকারী আইন ব্যতিরেকে কোন দাঙ্গার খবর প্রকাশ করতে পারবে না। এমনকি কোন মন্তব্য ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র দাঙ্গা হয়েছে এই সংবাদটিও প্রকাশ করার অধিকার থাকবে না। এই আইন অমান্য করলে সম্পাদকের গুরুতর অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড হবে। ১৯৫০ সালে ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কম্যুনিষ্ট দমন' আইন পাশ হয়েছিল। এই আইন বলে, সরকার যদি দেখেন, কোন সংবাদপত্রে এমন কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যাতে কম্যুনিষ্টদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আছে, তাহলে ঐ সংবাদপত্রটি বাজেয়াপ্ত হবে। ঐ সংশিলষ্ট সাংবাদিককে সরকার জোর করে তার পেশা পরিত্যাগ করাতে বাধ্য করাতে পারবেন, তাকে দেশ থেকে নির্বাসিতও করতে পারবেন। ১৯৫২ সালে ট্রান্সভালের এক দৈনিক সংবাদপত্র এই আইনের প্রথম বলি হয়। এই সংবাদপত্রটিতে 'ষ্ট্যালিনের একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টা আর একটি দেশে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে—সেটি হল পাকিস্তান। ১৯৫২ সালের জননিরাপত্তা আইনটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এই আইন বলে:
(ক) সরকার যে কোন সংবাদপত্রের কোন সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন, সাময়িক ভাবে কোন সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করতে পারবেন। কোন সংবাদের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।
(খ) প্রয়োজন হলে সম্পাদক সংবাদের সূত্র সরকারের কাছে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন।
(গ) অভিযুক্ত সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হবে ও কখনই জামিন দেওয়া হবে না।
এই আইন বলে একাধিক সংবাদপত্রের স্বাধিকার হরণ হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাক প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর ফলে জন নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী ঐ পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রক ও মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার জামিন দিতে না-মঞ্জুর করেন, দু বছর তাদের সকলকে জেল হাজতে কাটাতে হয়। দু' বছর পরে আদালতে মামলাটি উঠলে তা খারিজ হয়ে যায়। এর ফলে ১৫০ জনকে চাকুরি হারাতে হয় আর প্রকাশকের আর্থিক ক্ষতি হয় ৩ লক্ষ টাকা।

১৯৫২ সালে জাপানে বিধ্বংসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন পাশ হয়. এই আইন বলে ঠিক হয় প্রয়োজন হলে জন্মনিরাপত্তা হানিকর সংগঠনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সংবাদপত্রগুলি

এই 'সংগঠনগুলি'র আওতায় পড়ে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই আইন বলে ৫৬ টি সংবাদপত্রকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ১৫ টি ক্ষেত্রে সাজা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে বর্মায় 'পাব্লিক অর্ডার প্রিজারভেসান্ এ্যাক্ট' প্রচলিত হয়। এই আইন বলে কোন 'আপত্তিকর' মন্তব্য প্রকাশের জন্য কোন পুলিশ অফিসার বিনা পরোয়ানায় কোন সন্দেহভাজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করতে পারেন। অতি সামান্য কারণের জন্য বার্মার বহু সংবাদপত্র সম্পাদককে নিগৃহীত হতে হয়েছে। এমনি একজন হতভাগ্য সাংবাদিক রেঙ্গুনের 'দি নেশন' কাগজের সম্পাদক ই. এম. ল-য়োন। এই ভদ্রলোক তাঁর কাগজে বার্মা সরকারের কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীর সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে এই জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁর গুরুতর অর্থদণ্ড ও একমাসের কারাবাস হয়।

ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেন্টাইনের ১৯৫০ সালের নিরাপত্তা আইনটি লক্ষ্য করবার মত। এই আইন বলে যদি কোন সংবাদপত্র রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তথ্যাদি যা জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গোপনীয় রাখা প্রয়োজন তা প্রকাশ করে, তাহলে সম্পাদকের এক বছর থেকে দশ বছর কারাদণ্ড হবে। এমনকি এসব তথ্যগুলি যদি গোপনীয় নাও হয়, তবু সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে এগুলি প্রকাশ করলে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হবে।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৪ সালে কিউবাতে আর একটি কালাকানুন প্রচলিত ছিল। এই আইন বলে সরকার যে কোন প্রবন্ধের লেখককে (সরকারী মতে 'আপত্তিকর' হলে) কারারুদ্ধ করতে পারতেন। ঐ পত্রিকার সম্পাদকের ভাগ্যেও এই ধরণের কারাবাস জুটত। যদি সরকার কৌঁসুলি আবেদন না জানাত, তবে কখনও জামিন দেওয়া হত না। ১৯৪৯ সালে পেরুতে এক আইন প্রচলিত হয়েছে, এই আইন বলে প্রয়োজন হলে সরকার সমস্ত সংবাদ সেন্সার করতে পারবেন। ১৯৩৮ সালে ব্রাজিলের নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী সে দেশের পুলিশ সংবাদপত্রের যে কোন সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করতে পারে। বিচারমন্ত্রী যে কোন কাগজ বন্ধ করে দিতে পারেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ট্রিবুনা দা ইমপ্রেনসা কাগজের সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ছিলেন বলে।

ইওরোপের ইতালিতেও সংবাদপত্রের কন্ঠরোধের জন্য সুকৌশলে ফ্যাসিস্ত আমলের নিরাপত্তা আইনটি চালু রাখা হয়েছে। সংবিধানের ১১২, ১১৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, পুলিশ ইচ্ছা করলে কোন জনস্বার্থ হানিকর যে কোন মুদ্রিত পত্র বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

সংবাদপত্রও এই নিষিদ্ধ আওতায় পড়ে এবং সরকার বিরোধী কোন মন্তব্য প্রকাশ করাকে 'জনস্বার্থের' দোহাই দিয়ে অপরাধ বলে গণ্য করাটা এখানে খুবই স্বাভাবিক।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স মা লো চ না

ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা ॥ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। দাম ২.৫০ ন পঃ।

বাংলা দেশের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁদের বাঙ্গালী যত সহজে ভোলে আর কোন কিছুকে বোধহয় এত সহজে ভোলে না। সেদিক থেকে দেখলে ব্রহ্মবান্ধবের বেলায় কিছু ব্যাতিক্রম ঘটেছে বলা যেতে পারে। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু ১৯০৭ সালে-অর্ধশতাব্দীর কিছু বেশী বলা যেতে পারে। এতদিনে তিনি যদি দূরে স্বপ্নজগতের নামমাত্রে পরিণত হতেন তবে সেটা খুব অস্বাভাবিক হতোনা কারণ আরও অনেক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আজ আমাদের কাছে শুধু মাত্র নামেই পরিণত হয়েছেন। ইতিহাসের কোন অজ্ঞান রসিকতায় এ সৌভাগ্যটুকু আমাদের ঘটেছে জানিনা—ব্রহ্মবান্ধব আজও অনেকের মনেই শুধু নামমাত্র নন তিনি একটি বিশুদ্ধ পবিত্র—জীবনের প্রতীক, দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের অন্যতম মন্ত্র উদ্গাতা।

ব্রহ্মবান্ধবের জন্মকালও রবীন্দ্রনাথের মতই ১৮৬১ সাল। ১৯৬১ সাল তাঁরও শতবার্ষিকীর বছর। সেই উপলক্ষে প্রকাশক ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী ব্রহ্মবান্ধবের তিনটি মূল রচনাকে একত্র গ্রথিত করে ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা প্রকাশ করেছেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তীব্র রচনার অগ্নিস্রোতে দেশকে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। সন্ধ্যা পত্রিকার বহু রচনা সেদিন দেশের লোকের মনে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তারই জন্যে দেশ তাঁকে নেতার আসন দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সেই লেখাগুলি আজ আর পুনরুদ্ধার করবার উপায় নেই। তারা বোধহয় নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। অন্ততঃ কলকাতা সহরে বড় বড় লাইব্রেরীগুলিতে সন্ধ্যা পত্রিকার কোন কপি তো চোখে পড়েনি। তবু যতটুকু লেখা ব্রহ্মবান্ধবের ত্রিকথা নামে প্রকাশিত হয়েছে ততটুকুই হাতে হাতে লাভ। এতে উৎসাহিত হয়ে যদি ব্রহ্মবান্ধবের আরও কিছু লেখা কেউ প্রকাশ করেন তবে দেশ উপকৃত হবে।

ত্রিকথা হলো, বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, বাংলার পাল পার্বণ, আমার ভারত উদ্ধার।

বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠিগুলির অধিকাংশই বর্ণনায় বোঝাই। সে বর্ণনার মধ্যে চলতি বাংলা ভাষার ঝোঁক থাকায় বেশ জীবন্ত বর্ণনা হয়েছে। নানারকম বিসদৃশ ঘটনা তাঁর চোখে পড়তো কিন্তু কোন অবস্থাতেই ঝিমিয়ে পড়ার লোক ছিলেন না ব্রহ্মবান্ধব। সব জিনিষই খোলা চোখে দেখতেন—তার রস গ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। তখনকার ইংলণ্ডের পন্ডিতমন্ডলীর কাছে সে সমাদর পেয়েছিলেন তার উল্লেখও এই পত্রগুলিতে আছে। স্ত্রীপুরুষের অবাধ প্রণয় সম্পর্কে ব্রহ্মবান্ধবের মতামত একটু উদ্ধৃত করে দিলুম, তাতে তাঁর বাংলা ভাষার স্বরূপটাও জানা যাবে।

"দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলেছে—কেহ দৌড়িতেছে কেহ হাসিতেছে ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী স্ত্রী হাত ধরাধরি কোরে চলেছে। যুগল মূর্তি দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু

যুগল মূর্তির বিশেষ খেলা প্রণয় সূত্রে চলে-পরিণয়-সূত্রে নহে। প্রায়ই দেখা যায়—কিংবা আড়ালে আবডালে দাঁড়িয়ে বা বোসে রয়েছে।......ইহা ভাল কি মন্দ তার বিচার আবশ্যক নাই। তবে আমাদের দেশে এই প্রণয়ের করপীড়ন বা উৎপীড়ন যাতে না রপ্তানী হয়—সেই দিকে দৃষ্টি থাকিলেই ভাল।"

কিন্তু এই প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে একদা রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব যখন ইংলণ্ড গেছেন তখন তিনি হিন্দু। শুধু হিন্দু নন, হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রমের জয়গান করছেন আবার বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সে প্রচারও করছেন। একটা উগ্র স্বাদেশিকতা এই সময় তাঁর বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে। পাশ্চাত্য জীবনের বহিরঙ্গের ত্রুটি থেকেই তিনি ধরে নিয়েছেন যে এদেশের কোন কিছুই আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়া চলেনা। সুতরাং তিনি বলছেন ঃ—

"পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার হাবভাব যত বুঝিতেছি তত আমাদের দেশে সংস্কারকদের উপর আমার রাগ বাড়িতেছে। সভ্যতার যে ভাল দিক আছে তাহা ঢের বুঝান হইয়াছে। তবে আমরা গুণই জেনেছি গুণাগুণ বুঝিনি। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে এখানে শতকরা চল্লিশ জন বিবাহ করিতে পারে না। গরীব ভদ্রগৃহস্থের বিবাহ করা দায়। যদি তাহারা সমান ঘরে বিবাহ করে তাহলে সমাজের গৃহিণীর মর্যাদা রাখিতে গিয়া গাউনের খরচাতেই প্রাণ অন্ত—একেবারে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন। আর যদি নীচু ঘরে বিবাহ করে তাহলে একঘরে হতে হয়—নিজের সমাজে নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হয়। এই সভ্যতার তত্ত্বটি আমি অতি অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছি, বাহির থেকে বড় একটা জানা যায় না। অর্থাভাবে প্রজাপতির নির্বন্ধ রহিত হয়ে প্রবৃত্তির যদৃচ্ছাচারিতা ক্রমশই বাড়িতেছে।"

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যে অন্তরের শক্তি যা তাকে এত বড় ও প্রবল করেছে তার যথার্থ মর্ম ব্রহ্মবান্ধব বোঝবার চেষ্টা করেছেন একথা তাঁর লেখা পড়ে বলা শক্ত।

বাংলার পাল পার্বণ অংশে আছে—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, জামাই-ষষ্ঠী, স্নান যাত্রা, রথ যাত্রা, কোজাগর লক্ষ্মীপূজো, শিব-চতুর্দশী, দোল-লীলা, উদ্বোধন। এই পালপার্বণ গুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিশ্লেষণই ব্রহ্মবান্ধবের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এগুলি দেশবাসীকে একত্র করবে, দেশবাসীর দৃষ্টিকে স্বদেশাভিমুখী করে তুলবে এই আশায় তিনি বলছেন ঃ—

"উঠ ভাই বাঙালী—তোমার চিরকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও—উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী তোমার শ্মশান শয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলিধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার উঠিয়া দাঁড়াও।......আয় বাঙালী—ভাই ভগ্নী পুত্র কন্যা পিতা মাতা—বৃদ্ধা যুবা বালক বালিকা আয় সবে আজ সকলে সম্মিলিত হইয়া সেই অপূর্ব স্পর্শ-সুখ অনুভব করি, যাহাতে আর আমাদের পাষাণ হইয়া থাকিতে হইবে না। আমরা সজীব হইলে, পাষাণী, ঈশানী মা আমাদের শক্তিধারিণী হইবেন, আমাদের দুঃখ দূর হইবে—সকল জ্বালা জুড়াইবে।"

আমার ভারত উদ্ধার অংশটি নিতান্ত খণ্ডিত। তবে উৎসাহী পাঠক ব্রহ্মবান্ধবের দেশ-প্রেমের প্রথম স্ফুরণের ইতিহাসটুকু পাবেন।

প্রকাশককে ধন্যবাদ এমন একটি পুস্তিকা অত্যন্ত পরিচ্ছন্নরূপে অল্প মূল্যে পাঠক-সমাজের হাতে পেঁাছে দিয়েছেন। এ পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

মঞ্জুলা বসু

সমাজ দর্শন ॥ রণজিতকুমার সেন। প্রকাশক ॥ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। মূল্য—তিনটাকা।

মোট বারটি প্রবন্ধের সমাবেশে এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ সমাজ ও তার অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুচিন্তায় পুষ্ট। প্রবন্ধগুলি কোনও একটি সমস্যার সমাধান কল্পে রচিত নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমস্যাগুলিকে কখনো বা রাজনৈতিক কখনো বা অর্থনৈতিক কখনো বা কেবল মাত্র "মরালিটির" দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। নামকরণ প্রসঙ্গে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। "সমাজ দর্শনের" দর্শন কথাটি দ্ব্যর্থ বাচক,—বলছেন দর্শন অর্থে ফিলজফি ও অবসারভেশন। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কেবল মাত্র ফিলজফির সূত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই নয় তার নিজস্ব উপলব্ধিও তাকে এই লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইংরাজী সাহিত্যে "পপুলার সায়ান্স" গোছের জিনিষ যাঁরা লেখেন তাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে না লিখলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলিত মতামতগুলির বাইরে অল্পই যান। সমাজ দর্শন এই ধরণের উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হয়েছে যদিও সবসময় যুক্তিগুলি পরীক্ষিত অনুশীলকের বক্তব্যের মত যুক্তিসহ নয়। অবশ্য প্রবন্ধগুলির পরিসরও সেই অনুপাতে স্বল্প। যদি প্রবন্ধগুলির যে কোনও একটির পটভূমিকার প্রতি যথার্থ সুবিচার করবার ইচ্ছা লেখকের থাকতো তাহলে প্রথমতঃ কয়েকটি প্রবন্ধকে একত্রিত করে নিতে হত দ্বিতীয়তঃ পুস্তকটির কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত।

বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মহলে আজ অনেকেই সমাজ চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত। নানান সমস্যার ভিতর দিয়ে অনেকেই একটা আগামী সমাজ বিবর্ত্তনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করছেন। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত সেন সেই আগামী সম্ভাবনার প্রতি হতাশার কটাক্ষ করেছেন অনেক জায়গায়। সাম্প্রতিক শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক অনুশাসন গুলি যে ক্রমান্বয়ে কি ভাবে আলগা হয়ে যাচ্ছে মানুষ যে কি ভাবে অসাধু, হীনমন্য, সংখ্যালঘু সামাজিক কীটগুলির দাসত্ব করে যাচ্ছেন এ সম্বন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ উক্তি প্রশংসনীয়।

সমাজে যখন ভাঙ্গন ধরে তখন তার সবকটি অঙ্গই ক্রমাগত অকেজো হতে থাকে। শ্রীযুক্ত সেন দেখাচ্ছেন কি করে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করছি। ভেজাল ও দুর্নীতি জাতীয় জীবনকে করে তুলছে পঙ্গু। গুণ্ডাবৃত্তি চলেছে মনের মধ্যে, ঘরের সিন্দুকে ও পারিবারিক জীবনে অথচ পুলিশী অনুশাসন অক্টোপাসের আলিঙ্গনে আমাদের সাধারণ সামাজিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছাকেও মাথা তুলতে দিচ্ছে না।

বইখানির মধ্যে নূতন কথা কিছু নেই তবু চিন্তার খোরাক আছে। আমরা চিন্তা করতে শিখেছি অথচ কাজ করতে শিখিনি। অন্যায় বুঝতে শিখেছি অথচ ন্যায়ের পথ ধরতে শিখিনি। তর্ক করতে শিখেছি ঘরের মধ্যে অথচ বাইরে বেরিয়ে ঠিক পথে চলিনি। শ্রীযুক্ত সেনের বইখানি আমাদের এই ক্ষতচিহ্নগুলিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে মাত্র ঔষধের প্রলেপের বন্দোবস্ত করবার ভার ছেড়ে দিয়েছেন শিল্পী, সাহিত্যিক ও জনসংস্থাগুলির উপর।

বইখানির বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

A
R
U
N
A

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন**, সমাজ-**বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য:

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

শিয়ালদহ হয়ে শিলাইদহ

শিয়ালদহ ষ্টেশন ১৮৬১

শান্তিনিকেতনের বন্ধুর খোয়াই থেকে শিলাইদহের প্রমত্তা পদ্মা অনেক দূর। 'উর্মিল লাল কাঁকরের নিঃস্তব্ধ তোলপাড়' থেকে 'শ্রান্ত রূপসীর মতো প্রসারিত তনু পদ্মার উচ্চ-তটতল'—কবি মনের এই ক্রমঃ পরিবর্তনের বিচিত্র-পথ হয়ত শান্তিনিকেতন থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত প্রসারিত। বারংবার কবির এই পথ-পরিক্রমার সহস্র স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে শতাব্দী-প্রাচীন শিয়ালদহ।

পূর্ব রেলওয়ে

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

উল্লেখযোগ্য বই ও পত্রপত্রিকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তসার) দাম : এক টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তবিবরণী) দাম : ছয় আনা

॥ ছোটদের জন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা

মনোজিৎ বসু

দাম : এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গুঞ্জন

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ছুটির দিনের কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেল-নুন-কড়ি

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

চলার পথে—বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জয় যাত্রা—নীলিমা সেন

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

দামোদর

বিশ্ব বিশ্বাস

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

হাতের কাজ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)

প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

আমাদের পতাকা

দাম—পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েস্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১·৫০ টাকা;

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাব্‌লিকেশন্‌ সেল্‌স-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) প্রচার অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা ১

মেট্রিক ওজন এখন চালু
হয়েছে। মেট্রিক একক অনুযায়ী
দাম বলা হয়। কিন্তু তবুও লেনদেনের
সময় বিরক্তিকর সূক্ষ্ম হিসাব করতে হচ্ছে।
—এর কারণ কি ?

কারণ হ'ল মেট্রিক ওজনের সুবিধেগুলি কাজে
লাগানো হচ্ছে না। পুরাণো ওজন অনুযায়ী
জিনিসপত্র চাওয়া হচ্ছে।

যেমন :

এক পোয়া — ২৩৩ গ্রাম

এক পাউণ্ড — ৪৫৪ গ্রাম

পুরাণো ওজন অনুযায়ী জিনিস চাওয়া হলে ওজন
সংস্কারের সুবিধেগুলি কাজে লাগানো যায় না।

কাজেই কেনার সময়, জিনিসপত্র পূর্ণসংখ্যায় চাওয়াই
হ'ল সঠিক পদ্ধতি।

যেমন :

২০০ বা ৩০০ গ্রাম

৪০০ বা ৫০০ গ্রাম

১০০ বা ২০০ গ্রাম

এই রকম পূর্ণসংখ্যার মাপে জিনিসপত্র চাইলে ওজন সংস্কারের
সম্পূর্ণ সুবিধেগুলি কাজে লাগানো যায়। দশমিক মুদ্রায়, মেট্রিক
ওজনে লেনদেন করা অনেক সহজ, হিসেব করাও সোজা।

আপনার জিনিসপত্র নিন

পূর্ণ মেট্রিক এককে

এতে আপনার ও ব্যবসায়ীর উভয়েরই সুবিধে

ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

DA 61/108

The best substitute
for natural coolness is a
TROPICAL FAN
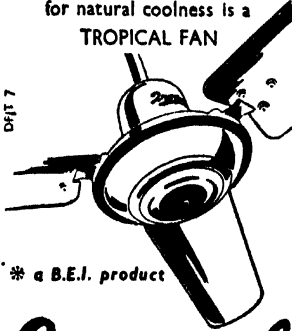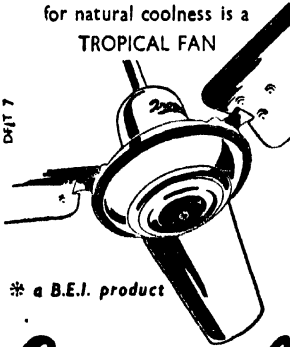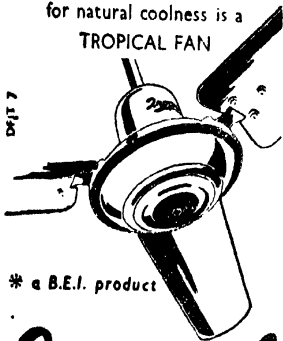
Tropical

DE LUXE

Agents:
THE ORIENTAL MERCANTILE CO., LTD.
CALCUTTA • BOMBAY • KANPUR • DELHI • MADRAS

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে

বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী

মোহিনী মিলস্

লিমিটেড্

(স্থাপিত—১৯০৮)

১নং মিল কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)

২নং মিল বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)

ম্যানেজিং এজেন্টস:

চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং

২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা

আষাঢ়। তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আউগুস্ট্ উইলহেলম্ শ্লেগেল্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভার নামক স্থানে আউগুস্ট উইল হেলেম শ্লেগেল্ জন্মগ্রহণ করেন। আউগুস্টের পিতা এডলফ্ শ্লেগেল্ একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মযাজক ছিলেন। হ্যানোভরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া আউগুস্ট্ উইলহেলম্ গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর শ্লেগেল কিছুদিন আমষ্টার ডামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে গৃহশিক্ষকতা করেন। আমাষ্টারডাম হইতে কিছুকাল পর শ্লেগেল জার্মানীর অন্তর্গত জেনা নগরে আগমন করেন এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তথায় ক্যারোলিন নাম্নী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্সপীয়রের সমগ্র রচনাবলী জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। অচিরকালের মধ্যেই এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। শ্লেগেল অনূদিত এই সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী আজিও জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। জার্মানীতে সেক্সপীয়রের যে বিপুল জনপ্রিয়তা আছে-তাহা ইংল্যাণ্ডের তুলনাতেও অল্প নহে। শ্লেগেলের সার্থক অনুবাদের মাধ্যমেই জার্মানীতে সেক্সপীয়রের রচনা-বলী এই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিল। জেনায় অবস্থান কালে শ্লেগেল প্রসিদ্ধ জার্মান লেখক শীলার সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতেন ও স্বয়ং কনিষ্ঠভ্রাতা ফন ফ্রীডরিখ্ শ্লেগেলের সহযোগিতায়—"এথেনিয়ম" নামে একটি পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এথেনিয়ম ছিল জার্মানীতে নব ভাবধারা বা 'রোমান্টিক' আন্দোলনের প্রচারক। শ্লেগেল্ ভ্রাতৃদ্বয় এই রোমান্টিক আন্দোলনের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শীলার, ফিক্টে, শিলিং প্রভৃতি জার্মান সুধীগণ "রোমান্টিক" আন্দোলন প্রবর্তনায় শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগী ছিলেন। গেটে, হার্ডার প্রভৃতি চিন্তানায়কেরাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল্ বার্লিন গমন করেন এবং সাহিত্য শিল্প বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন। পর বৎসর শ্লেগেল্ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের অনুকরণে একটি নাটক ও বিভিন্ন দেশের কয়েকটি নাটক ও গীতি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে

১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভিয়েনায় আমন্ত্রিত হইয়া নাট্যকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্লেগেল্ যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইউরোপের সমাজে সবিশেষ আদৃত হয় ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

সাহিত্য সমালোচক ও সৃজনধর্মী লেখক ও কবি রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পথে শ্লেগেল্ যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সহসা ভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া পায়। প্রৌঢ় শ্লেগেল তাঁহার অনুজ ও সমধর্মী ফন্ ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেলের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিণত জীবনে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন।

১৭৯১ **খৃষ্টাব্দে** জর্জ ফরষ্টার (১৭৫৪-১৭৯৪) প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" এর জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া মহাকবি গেটে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ভারতীয় সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে জার্মান চিন্তানায়ক হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) ও ভারত সভ্যতার সাতিশয় অনুরাগী হইয়া পড়েন। গেটে ও হার্ডারের এই ভারতবিদ্যানুরাগ জার্মানীর যে সব তরুণ সাহিত্যিকদের প্রভাবান্বিত করে তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আউগুস্ট্ উইল-হেলম্ শ্লেগেলের কনিষ্ঠভ্রাতা ফন্ ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)। ফ্রীডরিখ্ শ্লেগেলের সহিত প্যারিস্ নগরীতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক ভাবে আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্-টন্ (১৭৬২-১৮২৪) নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতের পরিচয় স্থাপিত হয়। হ্যামিল্-টন্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নৌ বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ায় ইংরাজ নাগরিক হিসাবে তাঁহাকে ফ্রান্সেই আটক রাখা হয়। এই কারণে হ্যামিল্‌টন্ কয়েক বৎসর প্যারিস্ নগরীতে বাস করিতে বাধ্য হন। ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল এই সুযোগে দুই বৎসর কাল হ্যামিল্‌টনের নিকট অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখিয়া লন। হ্যামিল্-টন্ মুক্তি পাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলে ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল প্যারিসের পুস্তকাগারে রক্ষিত প্রায় দুইশত সংস্কৃত পুঁথি পড়িয়া ফেলেন। এই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল কৃত ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার নামে জার্মান ভাষায় একটি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়(১)। তুলনামূলক ভাষা চর্চার সংগে এই পুস্তকটিতে রামায়ণ, মহাভারত, ভগবতগীতা শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখযোগ্য অংশগুলির মূল সংস্কৃত হইতে জার্মান অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি প্রকাশের সংগে সংগে জার্মান সুধীসমাজে সংস্কৃতের সমাদর সাতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনুজ ফ্রীড্‌রিখের সংস্কৃত নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রজ আওগুস্ট্ উইলহেলম শ্লেগেল্ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অধ্যাপক এ. এল. চেজির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। হ্যামিল্‌টন্ ফ্রান্স ত্যাগ করার পর ইতিমধ্যে চেজি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন ও প্যারিসে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ সৃষ্ট হইলে ঐ পদে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভাধর মেধাবী আওগুস্ট্ উইলহেলম্ অচিরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বন বিশ্ব বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ সৃষ্ট হইলে উইলহেল্‌ম শ্লেগেল ঐ পদ অধিকার করেন। এই সময় হইতে জীবনান্ত কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠনই তাঁহার জীবনের ব্রত রূপে পর্যবসিত হয়। তাঁহার অধ্যাপনার কৃতিত্বে ইউরোপের মধ্যে বন বিশ্ব বিদ্যালয় সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র—"ইউরোপের বারানসী" বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। আজিও বন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই খ্যাতি অক্ষুন্ন আছে। বন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্তমান ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত একটি তথ্যবহুল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় (২)।

বনে অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির কিছুদিন পর আওগস্ট্ উইলহেল্ম শ্লেগেল ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন (৩)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারত বিদ্যাচর্চার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে শ্লেগেল একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন(৪)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত এই পত্রিকায় অধিকাংশ অংশই ছিল উইলহেল্ম শ্লেগেলের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিবন্ধ। এই পত্রিকার একটি নিবন্ধে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের ভাষা ও সভ্যতা ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকার ভুক্ত নহে। ইংরাজেরা লবঙ্গ ও দারুচিনির ব্যবসা এইভাবে ভোগ করিতে থাকুক ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু ভারতের সাহিত্য ও সভ্যতার উত্তরাধিকার সমগ্র সভ্যজগতের মানুষেরই প্রাপ্য। শ্লেগেলের কালে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত মূল মুদ্রণ দুঃসাধ্য ছিল, ভারতবর্ষেও এই সময়ে দেবনাগরী মুদ্রণ বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে শ্লেগেল বন নগরীতে একটি সংস্কৃত মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। প্যারিসে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির হরফ হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি ছাঁচ হইতে অক্ষর ঢালাইএর ব্যবস্থাও করনে। নিজের মুদ্রাণালয়ে স্বলিখিত পুস্তকের হরফ তিনি নিজেই সাজাইতেন। নির্ভুল ভাবে সংস্কৃত শব্দ অথবা বাক্যাবলী মুদ্রণের আগ্রহেই তিনি নিজেকে এইরূপ তথাকথিত ছোটকাজে (কম্পোজ) লিপ্ত করিতেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজের মুদ্রণালয় হইতে জার্মান ভাষায় ল্যাটিন অনুবাদ সহ তাঁহার "ভগবদগীতা" প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে ইউরোপে শুধু মাত্র স্যর চার্লস উইল্‌কিন্স কৃত ইংরাজী গীতার অনুবাদই প্রচারিত হইয়াছিল (১৭৮৫)। মূল সংস্কৃত সহ গীতার শ্লেগেল্ কৃত ল্যাটিন ও জার্মান অনুবাদ ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক সবিশেষ সমাদৃত হয়। প্রসিদ্ধ জার্মান সুধী হামবোল্ট (১৭৬৭-১৮৩৫) শ্লেগেল্ কৃত এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মন্তব্য করেন যে ভগবানকে ধন্যবাদ যে গীতার এই অনুবাদ পাঠ করার সুযোগ পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে জগতে গীতা অপেক্ষা গূঢ় তাৎপর্য ও উচ্চচিন্তা সমৃদ্ধ গ্রন্থ আর কিছুই হইতে পারেনা। প্রসিদ্ধ জার্মান কবি হেনরিখ্ হাইনের রচনায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বনে অবস্থান কালে হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) শ্লেগেলের সংস্পর্শে আসেন। হাইনে বিশেজ্ঞদের মতে হাইনের ভারতানুরক্তি কবির উপর শ্লেগেলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল জার্মান ভাষায় অনুবাদ সহ রামায়ণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। মনীষী গেটে এই রামারণ অনুবাদ কার্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নানাকারণে রামায়ণের অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালেই ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে শ্লেগেলের জীবনান্ত হয়। শ্লেগেল বন নগরীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা চর্চার যে আলোক প্রজ্বলিত করেন তাহা ক্রমশঃ সমগ্র জার্মানীতে পরিব্যাপ্ত হয়। সার্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর প্রায় প্রতিটি বিশ্ব বিদ্যালয়ে বর্তমানে সংস্কৃত পঠন পাঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে।

শ্লেগেলের অগণিত কৃতী শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক ক্রিষ্টিয়ান লাসেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(1) Uber die Sprache and Weiheit die Inder. (2) "Bonner Orientalistische Studien". (Oriental Studies, Born). (3) Uber die Sparche and Kultur der Inder (on the language and culture or Indians). (4) Indische Bibliothek (18 23-30).

নৃত্তের বস্তু তত্ত্ব

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট বস্তু তত্ত্ব প্রাচীন ও অত্যাধুনিক যুগের উৎকৃষ্ট নৃত্তপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রসর্পমান যোগ সেতু হয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত কথক-নৃত্তের ছদ্মনামে সেই প্রাচীন করণ-অঙ্গহার-রেচক নৃত্ত স্বকীয় ও উন্নততম নৃত্তসংস্কৃতির ধারক পোষক হয়ে আছে*। প্রাচীনের সঙ্গে যোগ আছে মাত্র এই সামান্য হেতুতে কথক-নৃত্তের যশোগান করতে বসিনি। অন্য সঙ্গত ও যথেষ্ট হেতু আছে। অন্যতম ও উৎকৃষ্ট একটি হেতু এই যে উভয় পক্ষেই বস্তু-তত্ত্ব এক ও সমান, বৈজ্ঞানিক মনোভাব-প্রসূত, এবং উভয়েরই শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির পরিচায়ক। ভারতীয় অপর সমস্ত নৃত্তের মধ্যে সংস্কার মাত্র আছে। কিন্তু-সেই সংস্কার সুমার্জিত সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেনি।

একক নৃত্তই বস্তু-তত্ত্বের ভিত্তি। প্রাচীতম আখ্যান মতে শিব ও পার্বতী একক নৃত্ত করেছিলেন। লোকস্বভাবজ লোকনৃত্ত বা উৎসব নৃত্ত যুগপৎ বহুব্যক্তি দ্বারা প্রচেষ্টিত হয়। তাণ্ডব-নৃত্ত স্বরূপে সূক্ষ্মতর, কঠিনতর সমৃদ্ধতর। সুতরাং, পাইকারি নৃত্ত সম্ভব নয়, নৃত্ত শিক্ষাদান ও সম্ভব নয়।

নৃত্ত বস্তুর মধ্যে অলৌকিকতা বা আধ্যাত্মিকতা কিছুই নেই। নৃত্তের কর্ম আদ্যোপান্ত দৈহিক কর্ম। 'নৃতি' ধাতুর অর্থ গাত্রবিক্ষেপ। গাত্রবিক্ষেপ ব্যতীত নৃত্ত হয় না। ইচ্ছা-প্রযত্ন সহকৃত গাত্রবিক্ষেপই নৃত্তবস্তুর রূপ সৃষ্টি করে। নৃত্তের মূলে কোনও ভাব (ফীলিং, সেন্টিমেন্ট) স্বীকৃত হয় নি; কারণ, সে রকম ভাব নেই। কিন্তু "নৃত্য" নামে অপর বিশিষ্ট প্রযত্নের সঙ্গে কিয়ৎ কিঞ্চিদ্ ভাবের সম্বন্ধ আছে; যা পরে আলোচ্য। **এবং নৃত্ত ব্যতীত অথবা নৃত্ত নিরপেক্ষ নৃত্যকর্ম অসম্ভব।** অতএব, নৃত্তই মূল বস্তু ও কর্মরূপে উপদিষ্ট হয়েছে।

গাত্রবিক্ষেপ দু'রকমে অভিব্যক্ত হ'তে পারে। প্রথম, স্থানান্তর না করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন; দ্বিতীয়, গমন বা চারণ দ্বারা স্থানান্তর করণের যোগ্য গাত্রবিক্ষেপ। শেষোক্ত অভিব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে **"চারী"** এবং বিশেষ ভাবে, **"গতি-চারী"** বলা হয়েছে। কথক-নৃত্তের পরিভাষা হ'ল **'গৎ'** ও **'চারী'**। সমগ্র অভিব্যক্তির মধ্যে উক্ত দু'রকমের অভিব্যক্তি থাকে; কখনও বিশিষ্ট ভাবে, কখনও বা মিশ্রিত ভাবে। কোনও মুহূর্তে একটির প্রাধান্য; অপর মুহূর্তে অন্যটি প্রধান হয়। যখন বা যে অভিব্যক্তির মধ্যে প্রথম রূপটি বিশিষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই প্রযত্ন বা কর্মকে **'অঙ্গহার' বলে।** কথক নৃত্তের পরিভাষাতেও একে অঙ্গহার বলা হয়।

স্থান (অবস্থান বিশেষ) স্বীকার না করলে স্থানান্তর বলতে কিছু থাকে না। অতএব, 'স্থান' (কথক্ পরিভাষায় 'ঠাট্') স্বীকৃত হয়েছে। চরণদ্বয়ের অধিকৃত দেশই স্থান; লাক্ষণিক অর্থে সেই দেশে কিয়ৎকালের জন্য নিবন্ধ থাকাকে **'স্থান'** বলে। মাত্র স্থানান্তর সাধনের নিমিত্ত ও গাত্রবিক্ষেপ প্রয়োজন। এবং মাত্র পাদ বিক্ষেপ প্রচেষ্টা দ্বারা স্থানান্তর সাধন হয় না*। বলা হয়েছে পাদ, জঙ্ঘা, ঊরু ও কটি প্রত্যেক যুগলাঙ্গের সমান (সপ্রমাণ, স্বতঃ প্রমাণ) কর্মই **'চারী'** (১১ অঃ ১ শ্লোক) **'চারী'** হ'ল বহুপ্রকার স্থানান্তর সাধক কর্মের মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রামাণিক কর্ম।

স্থানে স্থিত হওয়া অবশ্য অঙ্গসাধ্য কর্ম। কিন্তু, অঙ্গসাধ্য কর্মমাত্রই নৃত্ত নয়; অঙ্গ

বা গাত্রের বিক্ষেপ বা চালন না হওয়া পর্যন্ত নৃত্ত সিদ্ধি নেই।

অতএব, মূলগত ও আঙ্গিক নৃত্তাভিব্যক্তির মধ্যে **গাত্রবিক্ষেপ ও স্থানলাভ**, ইতি ন্যূন-কল্প সাধারণ কর্ম।

স্থিতি বা বিক্ষেপ যাই হ'ক, ইচ্ছাপূর্বক অঙ্গকর্মই যখন নৃত্তকে রূপাভিব্যক্তি দান করে, তখন 'অঙ্গ' সম্বন্ধে ও কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা উচিত। ট্যারান্টুলা নামে মাকড়সা, এক রকমের ফড়িং, কোনও কোনও পাখি, ছাগল, বানর, এবং আদিম মানব ও লোকনৃত্তের নির্বাহক-বৃন্দও অঙ্গকর্ম দ্বারা নৃত্ত করে। কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রে এ প্রকার নৃত্ত বিষয়ে বস্তু তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় নি। **মাত্র, তাণ্ডব নামে সুমার্জিত সমৃদ্ধ নৃত্তের বস্তু** তত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে। অতএব তাণ্ডবো-চিত অঙ্গই উপদেশাধীন হয়েছে। নাট্যের মধ্যে লোকনৃত্ত অবশ্যই নিদর্শিত হ'তে পারে। কিন্তু, সেই নৃত্ত শিক্ষার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক বস্তু তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। প্রমাণ শ্লোক

এবং নাট্যপ্রযোগে বহু বহু বিহিতং কর্ম শাস্ত্রপ্রণীতং।
ন প্রোক্তং যচ্চ লোকাদনুকৃতি করণং তচ্চ কার্যং বিধিজ্ঞৈঃ ॥
নাট্যশাস্ত্রের সর্বশেষ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

অর্থাৎ লোক ব্যবহার সিদ্ধ প্রযোগের আবশ্যকতা আছে; কিন্তু, এ পক্ষে শাস্ত্রোপদেশ প্রণয়নের আবশ্যকতা নেই, মাত্র অনুকৃতিকরণ দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হয়।

অঙ্গ, অঙ্গকর্ম

নাট্যশাস্ত্রীয় বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে **অঙ্গ** ছয়টি। যথা শিরঃ (গ্রীবা-স্কন্ধ সমেত মস্তক) হস্ত, কটী, বক্ষ, পার্শ্ব ও পাদ (চরণ যুগল)। নৃত্তে প্রয়োজনীয় দেহকর্মের মূল বা

*[স্মরণ করি, ইং ১৯১৫ সালে কলিকাতায় চৌধুরান বাইজী নামে প্রৌঢ়া নৃত্ত শিল্পীর কথক-নৃত্ত দেখেছিলাম। তিনি কাল্‌কা-বিন্দা ঘরানার শিক্ষিত অনন্য সাধারণ নৃত্তপটীয়সী রূপে সমাদৃত ছিলেন। মদীয় গুরুদেবের বৈঠকে এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম "আপনারা এই নৃত্তকে কি মুদ্রানৃত্ত বলেন?" তখন পর্যন্ত আমি মুদ্রানৃত্ত ইতি শব্দ মাত্রই জানতাম। তিনি বললেন "না'ত! একে আমরা অঙ্গহার-নৃত্ত বলি"। কিছুই বুঝলাম না, তবে আমার অজ্ঞতা চেপে গেলাম। আবার জিজ্ঞাসা করলাম "ও রকম নামের মৎলব্‌ (তাৎপর্য) কি?" তিনি বললেন "একশ' আট করণ দিয়ে বত্রিশ অঙ্গহার হয়। অঙ্গহারই হ'ল নাচের জান্‌ (প্রাণ বস্তু)। তাইতে, আমাদের ঘরানায় একে অঙ্গহার-নৃত্ত বলি"। আমি তখন পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থ চোখেই দেখিনি। আবার প্রশ্ন করলাম "আপনারা কোনও শাস্ত্র মতে নৃত্ত করেন? নাকি ঘরনা মতে নৃত্ত করেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন "ঘরানা ত' কাল্‌কা-বিন্দাজীর। বাকি, মত্‌ হ'ল ভরতজীর"। জিজ্ঞাসা করলাম-"ভরত লোকটি কে?" তিনি বললেন তা'ত জানিনে। একজন মুসলমানী স্ত্রীলোকের মুখে প্রথম এই 'ভরত' নাম শুনেছিলাম।]

*[সাধারণত আমরা যখন বলি 'প্যাভ্যাং গমনম্‌' অথবা পা-দিয়ে চলি, তখন আমরা লোকসিদ্ধ ধারণাই ব্যক্ত করি; যথা তিমি-মাছ, চিংড়ি-মাছ। গমন ব্যাপারটি স্থানান্তর-করণ সাপেক্ষ। স্থানান্তর-করণের পক্ষে দেহকে সম্মুখে ঈষৎ অবনমিত করতে হয়। ঈষদ্‌ অবনমনের পক্ষে পাদদ্বয়ের অতিরিক্ত অন্য অঙ্গবিক্ষেপও নিতান্ত প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বস্তু তত্ত্ব ও অবৈজ্ঞানিক বা এম্পিরিক্যাল' ধারণার মধ্যে এই হল পার্থক্য।]

প্রধান দেহবিভাগই অঙ্গ*। অঙ্গই রূপকে সুবিবিক্ত ভাবে প্রকাশ করে, অঙ্গ দ্বারা নৃত্য ও অভিনয় সম্ভব হয় (৮অঃ ১২, ১৩, ১৪, ১৫ শ্লোক) বলা হয়েছে "নাট্যসংগ্রহঃ ষড়ঙ্গঃ" অর্থাৎ যাবতীয় নাট্যপ্রয়োগ তত্ত্ব পক্ষে সম্যক্ রূপে এই ষড়ঙ্গ গ্রহণীয়। উক্ত ষড়ঙ্গ পক্ষে প্রত্যঙ্গও আছে। পুনরায়, **নৃত্ত প্রযোগ পক্ষে উক্ত ষড়ঙ্গ** (শিরোহস্তাদি) **গ্রাহ্য; এবং বিশেষ ভাবে, উপাঙ্গ সকল ও গ্রাহ্য।**

অর্থাৎ, নাট্যাভিনয়যোগ্য আঙ্গিক কর্ম পক্ষে উক্ত ষড়ঙ্গ ও প্রত্যঙ্গাদি বিকল্পনীয়। এবং নৃত্তযোগ্য আঙ্গিক পক্ষে উক্ত ষড়ঙ্গ ও বিশিষ্ট কতিপয় উপাঙ্গ বিকল্পনীয়। এই হল বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আঙ্গিক-অভিনয় ও আঙ্গিক-নৃত্তের পার্থক্য (ইং ডিস্টিংশন্)

প্রশ্ন হতে পারে, অভিনয়ের আঙ্গিক ও নৃত্তের আঙ্গিক উভয়ই যদি গাত্রবিক্ষেপ ব্যাপার হয়, তা হলে ঐ দুই এর পার্থক্য সাধনে হেতু কি? উত্তরে বুঝতে হবে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য হল আঙ্গিক দ্বারা দর্শকের চিত্তে ভাবরস উদ্বোধন। এক্ষেত্রে আঙ্গিক হল উপায় মাত্র; এর স্বকীয় সার্থকতা একেবারেই নেই। কিন্তু, নৃত্ত বা নর্তনের ব্যপদেশে যে আঙ্গিক অভিব্যক্ত হয়, সেই আঙ্গিক স্বয়ং পূর্ণ ও স্বয়ং সার্থক। নৃত্তের আঙ্গিক দ্বারা অপর বিজাতীয় কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

এই হেতুটি বুঝলে নটন ও নর্তন, তথা নাট্য ও নৃত্ত একার্থ বোধক হয় না। ভরতোত্তর কালের কাব্য সাহিত্যকার তথা কোষকারগণ নাট্য ও নৃত্তের বস্তুগত পার্থক্য বুঝতে পারেননি বলেই নর্তন, নটন, নাট্য, নৃত্য সমস্তই একার্থ বোধক রূপে ব্যবহার করেছেন; এবং অন্যের বুঝবার পথে বাধাই সৃষ্টি করে রেখেছেন। ভরতোত্তর কালের সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা পুনরায় যথাযোগ্য সুললিত ছন্দের বাহনে ঐ সকল বাধাকে পুঞ্জীভূত পুষ্পস্তবকের মতো পাঠক-অনুশীলকবর্গকে উপহার করে গিয়েছেন! ফলে, সংশয়-তর্কের শ্বাসরোধই ঘটেছে। একমাত্র নাট্যশাস্ত্রের পঠন-পাঠন অনুশীলন ব্যতীত সেই নিরুদ্ধ তর্ক-সংশয়ের মুক্তি নেই,- নিরসনও নেই।

নাট্যকর্মের আঙ্গিক পক্ষে বহু **প্রত্যঙ্গ** কর্ম আবশ্যক। এগুলি লোকসিদ্ধ রূপেই গ্রাহ্য। কিন্তু, তাণ্ডব-নৃত্ত প্রয়োগ লোকসুলভ কর্ম নয়। এই হেতুতে এপক্ষে ষড়ঙ্গের বিশিষ্ট উপবিভাগ রূপে **'উপাঙ্গ'** সকল উদ্দিষ্ট ও উপদিষ্ট হয়েছে। নাট্যযোগ্য প্রত্যঙ্গের নামনির্দেশ আবশ্যক নয়। কিন্তু, নৃত্তযোগ্য উপাঙ্গের নামনির্দেশ একান্ত আবশ্যক।

বলা হয়েছে, শিরঃ নামক অঙ্গ পক্ষে নেত্র, অধর, নাসা, ভ্রূ, কপোল ও চিবুক, এই ছয়টি উপাঙ্গ। অর্থাৎ—শিরঃ স্থির অবস্থাতেও এই ছয়টি উপাঙ্গে বিক্ষেপ সম্ভব। এবং শিরোবিক্ষেপের অবস্থাতেও এই ছয়টি অচঞ্চল থাকতে পারে। কিন্তু, গ্রীবা ও স্কন্ধের পক্ষে অনুরূপ উক্তি করা যায় না। অতএব, গ্রীবা ও স্কন্ধের উপাঙ্গত্ব গ্রাহ্য হয়নি। প্রসঙ্গত, যে কোনও দুই অঙ্গের সন্ধিস্থান 'প্রত্যঙ্গ' নামে গ্রাহ্য। গ্রীবা, স্কন্ধ, মণিবন্ধ, কফোণি (কনুই), প্রভৃতি বহু প্রত্যঙ্গ কল্পনা করা যায়।

*[অন্‌গ্ ধাতুর গমনার্থে অঙ্গ ইতি ব্যুৎপত্তির সার্থকতা বুঝতে পারিনি। গর্ভস্থ ভ্রূণেরও অঙ্গ আছে, কিন্তু গমন কোথায়! বরং 'অন্‌জ্' ধাতুর প্রকাশার্থে বা বিবিক্তি অর্থে যাহা দ্বারা রূপের প্রকাশ বা বিবিক্তি (ইং ডিফারেন্সিয়েসন্) ঘটে তাহাই অঙ্গ সমীচীনতর ব্যুৎপত্তি। ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞেরা এই রূপে 'অঙ্গ' শব্দ ব্যুৎপন্ন করতে অক্ষম হলেও ক্ষতি নেই। প্রচুর অব্যুৎপন্ন অথচ সিদ্ধ শব্দ এবং নিঘন্টু আছে।]

৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোক থেকে ২৪৫ শ্লোক পর্যন্ত বৃহৎ স্তরে বর্ণিত ১০৮টি নৃত্ত-করণ, ও ৩২টি অঙ্গহারের লক্ষণ সকল অনুশীলন করলে উক্ত ষড়ঙ্গ ও অধিকন্তু উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের ভেদনির্দেশ করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন; কিন্তু, সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে অসম্ভব নয়। অস্পষ্ট ধারণার কারণ হল (১) শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ের অভাব ও (২) কোষগ্রন্থে উপাঙ্গসূচক শব্দের প্রতি-শব্দ রূপে প্রত্যঙ্গসূচক শব্দের পাঠ। জাজ্বল্যমান উদাহরণ হল, কর, বাহু, হস্ত ও ভুজ। নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষায় হস্ত=কর=২৪ অঙ্গুল প্রমাণ। বাহু =স্কন্দপ্রান্ত থেকে অঙ্গুল্যাগ্র পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গোপাঙ্গ বিস্তার। ভুজ= বাহু। আজানুলম্বিত বাহু, অষ্টভুজা ইতি প্রমাণ।

যাই হক, শিরঃ ইতি অঙ্গের উপাঙ্গ-কর্ম সাধন সকল অন্যান্য অঙ্গ-উপাঙ্গ কর্মের অপেক্ষা অধিকতর ও সূক্ষ্মতর অধ্যবসায় সাপেক্ষ হেতুতে ভরত মুনি শিরঃ অঙ্গের উপাঙ্গ সকলের নামোল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাণ্ডব নৃত্তের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উল্লিখিত উপাঙ্গ-কর্ম সকলের প্রতি বিশেষ অবহিত হবেন ইতি অভিপ্রায়। হস্তপাদাদি অন্যান্য অঙ্গের উপাঙ্গ কর্ম অপেক্ষাকৃত স্থূলতর ও সহজ সাধ্য।

অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সকলের নাম নির্দেশ বিষয়ে পরবর্তীকালের যাবতীয় নৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে অদ্ভুত পরিচয় ও মতভেদ পাওয়া যায়।* এবং প্রমাণ-লক্ষণমূলক বর্ণনা ও মতসমর্থনে হেতুযুক্তি বলতে কোনও পদার্থ নেই। **কাব্য সাহিত্যকারদের ব্যবহৃত শব্দের প্রমাণে কোষ-রচনা, এবং কোষ-রচনা অবলম্বনে নৃত্ত শাস্ত্র ও সঙ্গীত-শাস্ত্র রচনা, পরিশেষে, শেষোক্ত রচনার সাহিত্যিক টীকা-ব্যাখ্যা অবলম্বন করে পুনরায় কাব্যসাহিত্য রচনা; ইতি ভ্রান্তি চক্রগুলি** কালে পরিভ্রাম্যমান হয়ে দুর্বোধ্য অর্থের ক্ষুদ্র বৃহৎ সম্ভার সকল সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী ও কুতূহলী বিদ্যার্থীর দ্বারে দ্বারে সমর্পণ করে গিয়েছে। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে একটিতেও সমসাময়িক ব্যবহার-সিদ্ধ নৃত্তকার, বা গীতকার, বা বাদ্যকারের উল্লেখ নেই। উক্ত গ্রন্থ সকলের রচয়িতাগণ কোনও ব্যবহার-সিদ্ধ শিল্পীর নিকটে সাক্ষাতে কিছু জ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এইটেই আশ্চার্য কথা।*

এসকল গ্রন্থের নামও উল্লেখযোগ্য মনে করিনে। কিন্তু, শার্ঙ্গদেবের অপূর্ব গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নাকর' এ সকল গ্রন্থ থেকে বহু উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত কারণ, শার্ঙ্গদেব প্রাচীনতর

* [সত্য সত্যই হাস্যকর দৃষ্টান্ত যথা হস্ত (হস্ হাস্য করা+তন্–ক)! এবং "মণিবন্ধ থেকে অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত।......২৪ অঙ্গুল পরিমাণ"। মণিবন্ধ থেকে অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত ত' ২৪ অঙ্গুল হয় না। তাহলে, কোষকার ঐরূপ জ্ঞান সংকলন করলেন কোথা থেকে? অবশ্য বিভিন্ন ও শিষ্টবাক্ কাব্যসাহিত্য কারের রচনা থেকে! হস্তের সঙ্গে হাসির সম্বন্ধই বা কিরূপে সিদ্ধ হল? সিদ্ধ হয়েছে বৈয়াকরণিক মানস-গড্ডলিকা থেকে! হস্ত হল গ্রহণেন্দ্রিয়। ইতি সুচিরসম্মত তত্ত্ব। শব্দটির হাস্যোদ্ভাবক ব্যুৎপত্তি না করে নিঘন্টু রূপে স্বীকার করলেই ত মিটে যায়। কিন্তু, কিছুতেই হবে না!]

*[এ থেকেও আশ্চর্য কথা এই যে আধুনিক শিক্ষিত ও সংস্কৃতভাষাজ্ঞ কতিপয় সম্পাদক ব্যক্তি সঙ্গীতের উপপত্তিক পরিভাষা, প্রমাণ, লক্ষণ ও বস্তু পরিচয় না জেনেই সরাসরি ঐ সকল মূল্যহীন গ্রন্থের সটীক সম্পাদনা করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে, ভ্রান্তি-শকটচক্রের ঘর্ঘর শব্দ ইংরাজি ভাষার বাতবাহনে সমগ্র ভারতে শ্রবণযোগ্যতা লাভ করছে।]

সঙ্গীতরত্নাবলী উদ্ধার করেও স্বকীয় দার্শনিক মতবাদের উৎকৃষ্ট একটি রূপে হারাবলী রচনা করে গিয়েছেন।

কিন্তু, নর্তনাধ্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনিও বিভ্রান্ত হয়েছেন। যথা, শিরঃ অঙ্গের উপাঙ্গ হল শার্ঙ্গদেবের মতে বারটি। দৃষ্টি, ভ্রূ, অক্ষিপুট, তারা, কপোল, নাসিকা, অনিল (শ্বাস-প্রশ্বাস), অধর, দশন, জিহ্বা, চিবুক ও বদন। এরূপ বিবৃতির দোষ আছে। **দৃষ্টি বা দর্শন হল কর্মজাতীয়** (ঈং ফাংশন্যাল্) **পদার্থ**; একে কোনও বস্তুবিজ্ঞান অনুযায়ী জ্ঞানে 'অঙ্গ' বা 'উপাঙ্গ' বা "প্রত্যঙ্গ" বলা যায় না। অঙ্গ ও তার কোনও অংশ সর্বথা বস্তু জাতীয় পদার্থ: কর্মজাতীয় পদার্থ নয়। বস্তু ও কর্ম ত অভিন্ন পদার্থ নয়; যথা জিহ্বা ও লেহন। পুনরায়, নেত্রকে উপাঙ্গা স্বীকার করলে অক্ষিপুট ও তারাকে উপাঙ্গ বলা যায় না। কারণ অক্ষিপুট ও তারা হল 'নেত্র' নামে উপাঙ্গেরই উপবিভাগ। তৃতীয়, অনিল =বায়ু=শ্বাস-প্রশ্বাস কর্ম। একে অঙ্গ উপাঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কিছুই বলা যায় না। অনিল বা শ্বাস-প্রশ্বাস হল কর্ম; এই কর্ম আবার নাসা নামে এবং উরঃ (বক্ষ) নামে দুটি উপাঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা। চতুর্থ, দশন (দন্ত) স্বয়ং কদাপি স্বতন্ত্র অঙ্গ বা উপাঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ হতে পারে না। এই হেতু যে, কপোল (গণ্ড) এবং অধর এই দুটি উপাঙ্গের বিশিষ্ট মিলিত কর্ম না হলে মুখব্যাদান হয় না, তথা দশন প্রত্যক্ষ হয় না। উক্ত হেতুতেই ভরত মুনি দশনকে উপাঙ্গের মধ্যে স্থান দেননি। ফল কথা, দেহের যে অংশ অন্য অঙ্গ-উপাঙ্গ কর্মের নিরপেক্ষ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না, সেই অংশকে অঙ্গ বা উপাঙ্গ মনে করা হয়নি। এবং, যে অংশের অন্যান্য অঙ্গোপাঙ্গ কর্মের অনপেক্ষিত স্বতন্ত্র বা স্বকীয় বিক্ষেপ বা কর্ম নেই সেই অংশ প্রত্যক্ষ হলেও অঙ্গ বা উপাঙ্গ শ্রেণীতে গণ্য হয়নি: যোগ্যতার অভাবে। যথা কেশ। কেশকলাপ, কবরী, জটা ও শিখার অঙ্গত্বাদি কিছুই নেই: যদিও বিন্যাস-সাপেক্ষ ভাবে এগুলির সূচকতা বা শোভাজনকতা আছে। পঞ্চম, অনুরূপ হেতুতে জিহ্বা কদাপি অঙ্গ বা উপাঙ্গ হতে পারে না। ষষ্ঠ 'বদন' নামে বস্তুটি নাট্যশাস্ত্রীয় ছয়টি উপাঙ্গের পরস্পর মিলনোদ্ভূত বস্তুরূপ: এর স্বাতন্ত্র্য নেই। সুতরাং—অঙ্গত্ব বা উপাঙ্গত্বও নেই।

অতএব, শার্ঙ্গদেব বর্ণিত "বারো-উপাঙ্গ" তত্ত্ব হেতু যুক্তি বর্জিত ও অগ্রাহ্য। নাট্যশাস্ত্রীয় বস্তুতত্ত্বই গ্রাহ্য। যথা, ছয়টি অঙ্গ, এবং শিরঃ নামে অঙ্গ পক্ষে বারোটি উপাঙ্গ।

প্রশ্ন হতে পারে, **পার্শ্ব ও কটির** অঙ্গত্ব স্বীকার পক্ষেই বা হেতু কি? উত্তর, পার্শ্ব= কক্ষদেশের ঊর্ধ্ব-অধঃ পেশীবিন্যাস ব্যবস্থা। স্কন্ধের ও বাহুমূলের সন্ধির নিম্নসীমা থেকে এর আরম্ভ। কটি দেশের ঊর্ধ্বসীমায় এর শেষ। পার্শ্ব স্বতন্ত্র রূপে প্রত্যক্ষ, এবং কর্মনির্বাহক: যথা দেহের অবশিষ্ট অংশ নিষ্ক্রিয় থাকলেও পার্শ্ব-প্রযত্ন দ্বারা পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটে। অতএব, পার্শ্ব অঙ্গশ্রেণীতে গণ্য। কটী হল দেহের সম্মুখ ভাগে এবং দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী ঊর্ধ্ব-অধঃ পেশী বিন্যাস ব্যবস্থা (ইং রেক্টাস অ্যাব্ডোমিনিস্ পেশীযুগল)। এর মধ্যে উদর অর্থাৎ নাভির ঊর্ধ্বাংশ হল কটির প্রত্যক্ষ (৪অঃ ৫৮ শ্লোক)। নিতম্ব হল কটির পশ্চাদ্ দেশস্থ প্রত্যঙ্গ। প্রথমটি বক্ষ ও কটির সন্ধি: দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠ নামে বক্ষোপাঙ্গ ও কটির সন্ধিস্থান। অপর সর্বসহায়ের অনপেক্ষিত ভাবে কটি-প্রযত্ন দ্বারা দেহের সঙ্কোচন সাধিত হয় (যথা হঠযোগীয় 'পশ্চিমোত্তান' নামে আসন)।

নৃত্ত অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকার ব্যাপারে শিরঃ কর্মের তথা হস্তকর্ম ও পাদকর্মের মুখ্যত্বের কারণে শিরঃ, হস্ত, ও পাদ পক্ষে উপাঙ্গ ভেদ পূর্বোক্ত রূপে হেতুযুক্তি সিদ্ধির অনুযায়ী গ্রাহ্য। অপরাপর অঙ্গ কর্মসকল উক্ত তিনটি প্রধান অঙ্গকর্মের সংশ্লিষ্ট হয়ে সাধ্য। এই হেতুতে

অপরাপর অঙ্গের উপাঙ্গভেদ বস্তুতত্ত্বত উল্লিখিত হয় নি।

এবং অপর বহু অংশ, যথা কর্ণ, গ্রীবা, স্কন্ধ, বাহু মণিবন্ধ করতল, অঙ্গুল, নখ, দন্ত, পৃষ্ঠ, নিতম্ব, উরু, জঘন, জঙ্ঘা, জানু, গুল্‌ফ, চরণ, পাদাঙ্গলি ও পাদতল প্রভৃতি **বস্তু তত্ত্বতঃ উল্লিখিত হয়নি।** উৎকৃষ্ট নৃত্ত-করণ, অঙ্গহার-রচনা, ও রেচক সমাপ্তির উদ্দেশ্যে পৃষ্ঠ, জানু, গণ্ড, নিতম্ব, উরু, উদর, বাহু পল্লব (করপল্লব) নাভী, হৃদয়, গ্রীবা, অঙ্গুল, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, তল (হস্ততল), মুষ্ঠি, জঙ্ঘা, চরণ ইতি দেহাংশগুলি অর্থোদ্ধারের প্রয়োজনে উদ্ধৃত হয়েছে মাত্র (২ অঃ ৩৪ শ্লোক থেকে ২৪৫ শ্লোক পর্যন্ত বৃহৎ স্তর)। জঙ্ঘার সঙ্গে জঘনের সংযোগই নেই। জানু থেকে গুল্‌ফ পর্যন্ত অংশ=জঙ্ঘা। কটির ও নিতম্বের নিম্নসীমা ও উরুর উচ্চ সীমার সন্ধিস্থান=জঘন (ইং পেল্‌ভিস্‌)।

তাণ্ডব নৃত্তে প্রধানত শৃঙ্গারনিষ্ঠ সুকুমার প্রয়োগ, এবং রৌদ্রনিষ্ঠ উদ্ধত প্রয়োগই বিহিত হয়েছে। উদ্ধত প্রয়োগবশে 'জানু' প্রত্যক্ষ হতে পারে। কিন্তু শৃঙ্গারনৃত্তে উজ্জ্বল-বেশাত্মকতা, শুচিতা ও মেধ্যতার কারণে কোনও ক্রমেই নগ্নতা, উলঙ্গতা বা নির্লজ্জতার প্রশ্রয় নেই। **অন্ততঃ, নাট্যশাস্ত্রীয় শৃঙ্গারনৃত্ত ও কত্থক-নৃত্তে নগ্নতাদির প্রশ্রয় নেই।** এই কথাটি মনে রাখলে নৃত্তোপযোগী দেহের বস্তুতাত্ত্বিক অঙ্গোপাঙ্গ-বিভাগ ব্যাপারের মৌলিক দৃষ্টি বুঝিতে পারা যায়। অপর পক্ষে—সমাজবাসীদিগের সমক্ষে দর্শনীয় নৃত্তের মধ্যে যদি কাম-নৃত্ত (এরোটিক্‌ ডান্‌স্‌, ক্যান ক্যান, জাজ্‌) ও বীভৎস নৃত্তকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত বিবেচিত হয়, তাহলে—নৃত্তের অঙ্গতত্ত্বকে সব-ব্যবচ্ছেদ পর্যায় নামিয়ে ঢেলে সাজতে হয়। অথবা, শ্রম-লাঘব পক্ষে, বিশ্ব-সংস্কৃতির অনুশীলন অজুহাতে জাহাজে করে, বা প্লেনে করে বোর্ণিও দেশের 'ডাইআক', বা আফ্রিকা, বা হনোলুলু দেশের নৃত্তগুরুদের নিকটে নাড়া বেঁধে নাচ শিখে এসে ভারতের প্রগতিশীল যুবক-যুবতীবৃন্দকে সেরকম নৃত্ত শিক্ষায় প্ররোচিত করতে হয়। কিন্তু 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি' ইতি বুলিটি প্রয়োগ করতেই হবে। নচেৎ, ভারতীয় ভি, আই, পি বৃন্দ কার্যের ব্যয়ভার মনজুর করবেন না।

প্রসঙ্গত, বীর-নৃত্ত ভয়ানক নৃত্তও সম্ভব। কিন্তু বিশুদ্ধ বীররসোচিত উৎসাহ এবং "বিপদি ধৈর্যম্‌" পরিবেশ পক্ষে তাণ্ডব-বিধি প্রযোজ্য নয়। অনুরূপ কারণে, ভয়ানক-নৃত্ত ও হতে পারে। কিন্তু, তাণ্ডব-পদ্ধতি যোজনীয় নয়।

সর্বপ্রকার নৃত্তের মূলে অঙ্গ-উপাঙ্গ কর্মই বস্তু-তত্ত্ব রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। তাণ্ডব নৃত্তবিধির সংশ্লিষ্ট ভাবে বস্তুর পরীক্ষা ও বিচার দ্বারা শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভরত মুনি এই বস্তুতত্ত্ব ও পদ্ধতির অনুবাদক মাত্র।

নৃত্য প্রসঙ্গ

নৃত্য, অভিনেয় নৃত্ত, নৃত্তাভিনয়, নাট্যনৃত্ত, নৃত্ত-নাট্য ইতি শব্দগুলি একার্থবাচক। নৃত্য অর্থাৎ ভাব-বিভাব প্রভৃতি অভিনয় লক্ষ্য করে নৃত্ত প্রচেষ্টা। যথা—নাট্যস্থ উর্বশী ভূমিকাধারিণী পাত্রী যদি শৃঙ্গার-তাণ্ডব নৃত্ত করেন, তাহ'লে তিনি অবশ্যই বিশিষ্ট উদ্দীপক পরিবেশের অঙ্কদৃশ্যের অধীন হয়ে উর্বশীর ব্যক্তিত্ববোধক অভিনয়ের সাহায্যেই নৃত্ত করেন। সেই পাত্রীর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে উর্বশীব্যক্তিত্বের মধ্যে অবলুপ্ত হলে, সেই নৃত্ত চেষ্টাকে 'নৃত্য' বলা হয়েছে। তাৎকালিক সমালোচনাকারী বিশিষ্ট প্রেক্ষক ব্যক্তিরা ঐ রূপ নৃত্ত প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যক্তিগত পাত্রীকে দেখেন না। তাঁরা মাত্র উর্বশীর ভূমিকা যোগ্য নৃত্যই দেখেন ও

সমালোচনা করেন।*

বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল—পাত্রই রসের আধার। কিন্তু নাট্যে রসই চরম প্রাপ্তি অর্থাৎ সেবনীয়, স্বাদনীয়। পাত্র বা পাত্রী এস্থলে সেবনীয় স্বাদনীয় নয়। রসসেবন ও স্বাদন পক্ষে ভাবাভিনয় প্রয়োজন। **অতএব—নৃত্যশিল্পী অধিকন্তু ভাবাভিনয় ব্যাপারেও দক্ষ হবেন।** বিশুদ্ধ তাণ্ডব নৃত্তের শিক্ষা-শিক্ষণের পক্ষে এই অধিকন্তুর প্রয়োজনই নেই।

ভাবাভিনয় ব্যাপার শিক্ষাও শিক্ষণের প্রসঙ্গ হয়েছে ৮ম অধ্যায়ে। তাণ্ডব-নৃত্ত ব্যাপার শিক্ষা-শিক্ষণের প্রসঙ্গ হয়েছে ৪র্থ অধ্যায়ে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, নাট্যশাস্ত্রীয় উৎকৃষ্ট নাট্যের মধ্যে তথাকথিত (মকরধ্বজবর্ধন) লাস্য-নৃত্য, মুখোস-নৃত্য, মুদ্রা-নৃত্য, এবং অন্যান্য লোক-নৃত্যের স্থান আছে কি না। উত্তর, অবশ্যই আছে, কিন্তু নাট্যসংশ্লিষ্ট ইতিবৃত্তের (ইং থীম্) সম্পূর্ণ অনুগত ভাবে। যথা, বিধিপ্রমাণ,

এবং নাট্যপ্রয়োগে বহু বহু বিহিতং কর্ম শাস্ত্রপ্রণীতম্।

ন প্রোক্তং যচ্চ লোকাদনুকৃতিকরণং তচ্চ কার্যং বিধিজ্ঞৈঃ ॥

মনে করা যাক কোনও নাট্যের ঘটনায় বেদে-বাজিকর ও বানরের নাচ আছে। অবশ্যই লৌকিক বেদে-বাজিকর-বানর নৃত্ত প্রয়োগ করতে হবে! এ বিষয়ে সন্দেহই নেই। কিন্তু—ঐ বিষয়কে কখনও নৃত্ত-নৃত্যের শিক্ষা-শিক্ষণ বিদ্যার অঙ্গীভূত করা যায় না। মাত্র অনুকৃতি ও অনুকরণ সম্বল করে প্রযোগ করা যেতে পারে। এর নিমিত্ত শাস্ত্র বা আকাদামির প্রয়োজন নেই। কথাটি এই যে, উৎকৃষ্ট নাট্যে নাট্যকার বা কবি বেদে-বানর নৃত্ত করাবেন, অথবা, রুদ্র-রম্ভাদির নৃত্য করাবেন। এবং চরম কথা এই যে রুদ্ররম্ভাকে বেদে বানরসুলভ নৃত্য করাবেন কিনা। এই দুটি ব্যাপার কাব্যকারের ও নাট্যকারের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে নাট্য-দর্শকের কোনও কথা গ্রাহ্য হতে পারে না। কারণ, সমাজবাসী ব্যক্তি যখন ভেজাল তেল ভেজাল ঘী প্রভৃতি খেতে বাধ্য হয় ও পরে অভ্যস্তও হয়, তখন মানস ভোজের পক্ষে তাদের বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলে।

---

* নৃত্ত-নাট্য-নৃত্যের আধুনিক সমালোচনার মধ্যে সর্বাগ্রে, সর্বপ্রধান ভাবে, পাত্রপাত্রীর নামটিই কেন্দ্র করে সমালোচনার জাল প্রস্তুত হয়। ফলে, দর্শকবৃন্দ বা পাঠকবৃন্দ নাট্য দর্শনের পূর্ব থেকেই ভূমিকার নৃত্য বা অভিনয়ের প্রত্যাশা ত্যাগ করে, কোন্ পাত্র বা পাত্রী রঙ্গপীঠে কখন অবতীর্ণ হবেন সেই প্রত্যাশাই বহন করতে থাকেন। ভূমিকা লোলুপতার থেকে পাত্রপাত্রী-লোলুপতা এতই তীব্রতর হয়েছে, যে—ভূমিকাগুলি উঠিয়ে দিয়ে সেরা সেরা পাত্রপাত্রীদের অবতারণ ঘটিয়ে দিলেও বোধহয় টিকিট-কেনা-বেচা সার্থক হয়!

নবজাগরণের পটভূমিকা

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

রেনেশাঁসের সংজ্ঞা নবজাগরণ। ইতিহাসের পথে মানুষের অমিতবীর্য, বৈপ্লবিক চেতনা স্ফুলিংগ তমসাচ্ছন্ন সমাজের বুকে যে আলোজ্জ্বল গৌরবময় অধ্যায়ের সূত্রপাত করে মানুষের সেই নব অভ্যুদয় ও মৃতসমাজের পুনর্জীবনকে আমরা সাধারণতঃ রেনেশাঁসের যুগ বলে অভিহিত করি। ইতিহাস অথবা মানুষের জীবন একটানা একতালে প্রতিনিয়ত বয়ে চলেনা। চড়াই উৎরাই, সর্পিল বন্ধুর পথে নানা উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের রথচক্র সর্বদা এগিয়ে চলেছে। এই গতিপথে মাঝে মাঝে সুর কেটে যায়, তাল হয় ভংগ। চলতে চলতে সারা অংগে ক্লান্তি নেমে আসে, অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে, রুদ্ধ হয় দুর্বার তরংগ। ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথে মাঝেমাঝে নেমে আসে অমারাত্রি। ভবিষ্যতের দিগন্ত চিররহস্যাবৃত, অতীত বিস্মরণের অতলগর্ভে নিমজ্জিত, এই আত্মবিস্মরণের যুগে আমরা অন্ধ যাযাবরের মতো নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাড়ি দিয়ে চলি। এই যুগে অলস মন বিনাআয়াসে সংস্কার বন্ধ চোরাকুঠরীতে নির্ভাবনায় অতীতকে রোমন্থন করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মরচে পড়া জীর্ণ সংস্কারের প্রতি অচলাভক্তি, বিচারহীন অন্ধবিশ্বাসের সোজাপথ ধরে চলা, যুক্তি নিষ্ঠাকে সযতনে পরিহার করে মোহাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট ভাবালুতার চোখে জগতকে দেখা 'ডেকাডেন্স্' অথবা পড়তি অর্ধমৃত সমাজের লক্ষণাবলী। এই জড় বন্ধ্যাযুগ চিরস্থায়ী নয়, সমাজের বুকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সদাপ্রবাহমান পরিবর্তনের ধারা এক প্রাণচাঞ্চল্য ও বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আঁধার ঘেরা কুসংস্কার আবদ্ধ বন্দীজীবনের সকল শৃংখল উন্মোচন করে পুনরায় উন্মুক্ত হয় নতুন দিগন্ত। মানুষের তন্দ্রাঘোর কেটে যায়, নবজাগরণের পালা সুরু হয়। অতীতের গর্ভে যে রত্নসম্ভার আজও ভস্মাবৃত রয়েছে তাকে পুনরুদ্ধার করবার দুর্ণিবার আকাংখা, ভবিষ্যতের দুয়ারে প্রতিনিয়ত হানা দেবার দুরন্ত অভিযান, অদম্য প্রাণস্ফূর্তি এই যুগের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প-কলা মানসিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সর্বপ্রান্তরে প্রবাহিত। সকল সংস্কার, অন্ধমোহাভরণ থেকে বুদ্ধির মুক্তি সাধন নবজাগরণের প্রধান স্তম্ভ।

রেনেশাঁসের মূল প্রত্যয় হোল নবজন্ম। মোহ তমসাচ্ছন্ন জীবনে চৈতন্যের উন্মেষকে আমরা এদেশের লোকরা নবজন্ম বলে থাকি। পাশ্চাত্যজগতে নবজন্মের অর্থ 'রেজারেক্‌শ্যান্' ও এর তাৎপর্য্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক 'পরিপ্রেক্ষিত' থেকে বিচার করা হয়। ইতিহাসের অগ্রগতির পথে পুরাতন অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের মানসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নব রূপান্তর ঘটে। পুরাতন ঐতিহ্যের অন্ধ অনুগামী ধারাবাহিক জীবনের ছেদ পড়ে। নবচেতনার আলো মানুষের চিরাচরিত দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন করে। যে জীবন জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বান্বেষণী দৃষ্টিভংগী মানুষের চোখকে জরাজীর্ণ ঐতিহ্যের অন্ধকারময় কক্ষ থেকে ভবিষ্যতের সুবিস্তৃত দিগন্তের সন্ধান দেয়, সেই অদম্য মুক্তিস্পৃহা ও নতুন করে বাঁচার আনন্দকে ইউরোপীয়গণ বলে থাকেন রেনেসাঁস অথবা নব অভ্যুদয়ের যুগ।

এই বিচিত্র পৃথিবীতে একদল লোক বরাবর থাকেন যাদের সম্মুখের চোখ সবসময় বাঁধা পিছন পানে তাকিয়ে তাঁরা নুয়ে নুয়ে চলে। অজানা ভবিষ্যতের দুয়ারে হানা দেবার দুঃসাহস এদের নেই। বর্তমানের দৈনন্দিন সংঘর্ষের সংগে মুখোমুখি লড়াই করে চলবার শক্তি ও ধৈর্য্য

এরা হারিয়েছে। পুরানো দিনের হারানো স্মৃতিগহ্বরে গিয়ে এরা ফিরে পায় তাদের অলস আত্মতৃপ্তি। তাঁদের ক্ষুব্ধগর্ব, পরাভূত বিদ্রোহ, ব্যর্থজীবনের শেষ সান্ত্বনা তাঁরা ফিরে পায় অতীতের জীবনকে রোমন্থন করে। বিংশশতাব্দীর মধ্যাহ্ন সূর্যের নীচে বাস করেও তাদের মনপ্রাণ সব বাঁধা রয়েছে মধ্যযুগের কোন এক অন্ধকারময় সংকীর্ণ পথ গহ্বরে। এঁরা চোখকান বুজে তথাকথিত সনাতনী আখড়ায় কোন এক ভাঙগাখুটি ধরে সকাল সন্ধ্যে মালা জপে চলেছেন। যা কিছু পুরানো, অতীত তাকে অতি সহজে মৃত অথবা অপ্রয়োজনীয় বলে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা আমাদের অজ্ঞানতার পরিচয়ক। অপরদিকে অতীতকে অনুবিশ্লেষণ না করে সেই অচলায়তনের জরাজীর্ণ ঐতিহ্যের কাছে সারাক্ষণ মাথা নত করে থাকা মনের অশেষ দৈন্য ও ক্লীবতার পরিচায়ক। অতীতের প্রতি এই অচলাভক্তি ভবিষ্যতের সমস্ত পথকে অবরোধ করে। এদের মতে কুসংস্কার অথবা দারিদ্র্য যদি সনাতন হয় তবে তারই পদযুগলে বরাবর ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে আসতে হবে। অতীতের ঐতিহ্য অথবা সংস্কার যা ধর্ম নীতি, বিজ্ঞান অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় তাকে বিনা পরীক্ষা ও বিনাআয়াসে গ্রহণ করা অচল রক্ষণশীল মনের ধর্ম।

সমাজের এই রক্ষণশীল লোকেরা অতীতের তপঃ প্রভা, বহ্নিকণাকে ধারণ করতে পারেনি। এরা শুধু আঁচলভরে বেঁধে রেখেছেন যজ্ঞের পরিত্যক্ত ভস্ম। সেই ভস্ম সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রক্তচন্দন কপালে এঁকে এরা পুরানো যুগের তথাকথিত সংস্কৃতিকে পুজো করছেন। এদের কাছে সেই ভস্মকণা একমাত্র পবিত্র, এ ছাড়া দুনিয়ার বাদবাকি সব কিছু অচ্ছুৎ বা ভুয়োদর্শন। এই মৃত লোকেরা প্রাচীন বলতে ভাবে তার শ্মশানভূমি ও গলিতশবকে পুজো করাই এদের কাছে একমাত্র ব্রত। সমাজের কিছুলোক আছেন, তাঁরা হলেন প্রাণের পুজারী। সংসারের নানা ঘূর্ণায়মান স্রোতের পাঁকে পড়েও এরা থাকেন অবিচল ও দৃঢ়। একমুহূর্ত এরা হাল ছাড়েন না, মানুষের চিরন্তন ধ্যান ও স্বপ্নকে নতুনদিনের নতুন কাঠামো দিয়ে তাকে রূপায়িত করবার জন্য এরা অবিরাম ছুটে চলেছেন। এই পথিকবৃন্দ হন নবযুগের অগ্রদূত, মানুষের সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান ধারক ও সভ্যতার শক্তিমান বাহক। অতীতের গর্ভে মানবতা অথবা মনুষ্যত্বের যে বীজ আজও সংরক্ষিত এবং কালস্রোতে ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলেছে সেই লুপ্ত রত্নকে পুনরায় আবিষ্কার করে ম্রিয়মান সমাজের দেহে নবরক্ত সঞ্চার ও নবজাগরণের পথকে সুগম করেছিলেন এই যুগের বার্তাবহ ও অগ্রদূতরা। এই যুগের অতীতের সেই অনাদৃত, অবহেলিত প্রায় অবলুপ্ত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলাকে পুনরুদ্ধার করে প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল যুগের জ্ঞানবত্তাকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার ব্রত নিয়েছিল নবযুগের সাধকবৃন্দ।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ করে ইতালীর ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি প্রখ্যাত সহরের সাংস্কৃতিক জীবনে মহাসম্ভাবনার বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হোল। ইতালী থেকে নবজাগরণ আন্দোলনের স্রোত জার্মানীতে প্রবেশ কোরল, তারপর সেই তরঙ্গমালা ক্রমশঃ ফ্রান্স, স্পেন সর্বশেষে ইংলন্ডের দুইকূল কোরল প্লাবিত। একই সময়ে একভাবে ও তালে সবদেশে রেনেশাঁসের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়নি। সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো বিশেষ ঐতিহাসিক শক্তিপুঞ্জের সমাবেশ, প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ইত্যাদি কার্যকারণের যোগসূত্র, অন্যদিকে পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের প্রভেদ ও তারতম্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

রেনেসাঁস নবজাগরণের উষার ক্ল্যাসিক্যাল যুগের মানসলোক তার সৌন্দর্যবোধ, প্রগাঢ় জ্ঞানবত্তা, চিন্তার গভীরতা, ধ্রুপদী রাগসম্ভার দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর বিদ্যাজিজ্ঞাসুর চোখ

পুনঃ আকৃষ্ট কোরল। অতীতের এই লুপ্তরত্নকে পুনরাবিষ্কারের ফলে চিন্তা জগতে বিশেষ সাড়া পড়েছিল। সাধারণ মন চায় পুরানো ঐতিহ্যের উপরে দাঁড়িয়ে চলতে। ঐতিহ্য যত প্রাচীনতার দাবী করবে তত তার প্রতি আমাদের আবেদন ও আকর্ষণের অবধি নেই। মধ্যযুগ থেকে বৈদিক অথবা ইউরোপের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অধিকতর।

আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে সংস্কৃতি ও মানসলোককে নতুনসুরে বেঁধে তোলবার জন্য অগ্রযায়ী চিন্তানায়করা সেদিন জীর্ণভগ্নাবশেষের ভিতর যুগোপযোগী জীবনাদর্শ ও রসসৃষ্টির মানদণ্ডের সন্ধান ফিরে পেল।

"Men found that in Classical as well as Biblical antiquity existed an ideal of human life, both moral and intellectual, by which they might profit in the present." (J. A. Symonds : As short history of the the Renaissance in Italy.)

পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অতীতের গহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার করে তাদের সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা আলোচনা শুরু হয়। যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথি, ভগ্ন মূর্ত্তি এতোদিন অন্ধকারে আত্মগোপন করেছিল, তাদের সহসা আত্মপ্রকাশ চিন্তা-জগতে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি কোরল। ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের মুখপাত্ররা সেদিন প্রাচীন গ্রীক্ দর্শন ও কাব্যের ভিতর মানবতন্ত্রের অপূর্ব্ববাণী ও সাধনার মর্মকথা উপলব্ধি করলেন। ভারতবর্ষে একইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নবজাগরণের পুরোহিতরা বৈদিক সভ্যতা ও উপনিষদের চিরন্তন শাশ্বত বাণীর অমূল্য ভাণ্ডার থেকে লাভ করলেন প্রেরণা ও চলবার মন্ত্র। আধুনিক যুগের পথ প্রদর্শক রামমোহন, পরের যুগে জাতীয় সংস্কৃতির উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃতি বিশেষকরে উপনিষদের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত ও অনুপ্রাণিত। গ্রীক্ ও রোমান সংস্কৃতির ভিতর যে মানবতন্ত্রী দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী আমরা দেখতে পেয়েছি তার প্রভাব তার সুরের রেশ রেনেশাঁস আন্দোলনের অধিনায়কদের চিন্তাজগতে বিশেষ ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য যার নিদর্শন প্রাচীন ভাস্কর্যে স্থাপত্যে ও কাব্যে আপনাকে তুলে ধরেছে তার আলোকধারা রেনেশাঁস যুগের শিল্পীদের চিত্তকে বিকশিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

"The 'revival' of interest in the thought and art of ancient Greece was so powerful a factor in the intellectual life of those times only because ancient forms provided convenient vessels for new needs and meanings."
(Schumpeter : History of Economic Analysis p. 79).

প্লেটোর বিজ্ঞানবাদ, এ্যারিষ্টোটেলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রোটগারাসের মানবতন্ত্রী দর্শন ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীসের নানা ভাবধারা রেনেসাঁস আন্দোলনের চিন্তাধারাকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করেছে। কাব্য দর্শন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, রাজনীতি ও রুচিবোধ সমগ্র জীবন দর্শন ক্ল্যাসিক্যাল যুগের ভাবগম্ভীর অন্তরের দৃঢ়তা, শুচিতা ও গভীরতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পিকো একদিকে প্লেটোর ভাবধারার সঙ্গে সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হওয়ার তাগিদে গ্রীক্‌ভাষা, অপরদিকে মোসেস্‌কে জানবার জন্য হিব্রুভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। একই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম জাগরণ প্রত্যুষে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট গভীর ভাবে আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য হিব্রুভাষা শিক্ষা করেন।

রেনেসাঁস আন্দোলনের অগ্রযায়ী চিন্তানায়করা অতীতকে অন্ধ অনুসরণ করেন নি। বর্তমান সমাজে অতীতের সমস্ত সংস্কার ব্যবস্থাবিধি, আচার বিচার ভ্রান্তধারণা চিরাচরিত ধারাকে সর্বতোভাবে পুনপ্রবর্তনের মন নিয়ে তাঁরা অতীতের দিকে ফিরে তাকান নি। অতীতকে বিস্ময়াভিভূত নেত্রে দর্শন না করে তীক্ষ্ন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও জিজ্ঞাসুর চোখ নিয়ে তাঁরা অতীতের রহস্যাগারে প্রবেশ করলেন। তাঁরা সেদিন অতীতের বদ্ধ সংস্কারের পায়ে ভেট দেন নি। জ্ঞানের অকম্পিত মশাল জেবলে নিত্য চড়াই উৎরাই পথ কেটে চলা, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগতকে দেখবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সহজ বিশ্বাসের সোজা পথ না ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষণের ভিতর দিয়ে সদাসর্বদা বিচার বুদ্ধিকে প্রখর ও চিরজাগ্রত করে রাখা রেনেসাঁস আন্দোলনের উত্তর সাধকদের ছিল মর্মসাধনা। একদিকে কল্পনার অবাধ স্ফূর্তি অপরদিকে বিচার বুদ্ধির তীক্ষ্ন গবেষণা ও সংযমের কঠোর বাঁধুনি এই দুই এর সমন্বয়ের উপরে গড়ে উঠেছে নবযুগের পুরোহিতবর্গের স্বতন্ত্র চিন্তাধারা। শিল্পকলার ভিতর তীক্ষ্নতা এল, রোমাণ্টিক মতবাদের প্রসাদে মধ্যযুগীয় নগ্ন শক্তির বিকার ক্রমশঃ রমণীয় মধুরতায় রূপান্তরিত হোল। মধুরতার আস্বাদন সেদিন মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে ক্রমশঃ সেই অমৃতের উৎস ক্ল্যাসিক্যাল যুগের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট ও নিয়োজিত কোরল। অতীতের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মধ্যযুগে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল আধুনিক যুগের প্রভাতে অতীতের সঙ্গে পুনঃ যোগসূত্র স্থাপনার ফলে সেই আঁধাররাশির ধীরে ধীরে অপসরণ হোল, নবজাগরণের ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়ল দিগাঙ্গনে।

রবীন্দ্র অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আকাশপ্রদীপ — ১৩৪৫ সালের ভাদ্রমাসে সেঁজুতি কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের মধ্যেও বিশেষ ভাবে যে সুর বাজল তা হলো পিছনে ফেলে আসা জীবনের প্রতি নিবিড় ভালবাসার সুর, কিন্তু একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে কবি বহির্জগতের প্রতি উদাসীন, শুধু নিজের মনেই স্মৃতি চর্বণে দিন কাটাচ্ছেন, আশ্রম বিদ্যালয়ের কাজে ক্লান্তি নেই, লোক-শিক্ষা সংসদের উপযোগী বই লেখানোর চেষ্টাও চলেছে, জাপানের বিশিষ্ট কবি নোগুচির সঙ্গে পত্রালাপে তীব্র মতবিরোধ চলছে, শ্রীনিকেতনে বৃক্ষ রোপণ উৎসব চলছে- এরই মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনার একটি ধারা চলেছে। বাইরের জগতের কর্ম-কোলাহলের পাশে পাশে অন্তর্জগতের স্রোত চলেছে উজান বেয়ে পিছনের অতীতে, সেই স্রোতের কবিতা-গুচ্ছই আকাশ-প্রদীপে স্থান পেয়েছে, একটি মাত্র কবিতা এই গুচ্ছের বাইরে-সেটি হলো যাত্রা পথ (১৩৪৪ আলমোড়া), এছাড়া আর সব কবিতাই ১৩৪৫ সালের ভাদ্র মাসের শেষ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে লেখা, শান্তিনিকেতনেই কবি তখন আছেন, আকাশ প্রদীপ কাব্যের প্রথম প্রকাশ ১৩৪৬ বৈশাখ, ভুল ক্রমে প্রথম সংস্করণে ১৩৪৫ ছাপা হয়েছিল, কাব্যটি উৎসর্গ করেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ। আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতে তিনি একজন প্রধান পুরুষ। কবির সঙ্গে তিনি একবার আমেরিকাও গিয়েছিলেন, আধুনিক যে সব সাহিত্যিকদের কবি বিশেষ স্নেহ করতেন সুধীন্দ্র-নাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন (প্রবাসী জৈষ্ঠ ১৩৪৬) ঃ—আজ তোমাকে লেখবার উপলক্ষ্য হলো সুধীন্দ্র দত্তর স্বগত বইখানি পড়ে। পড়তে-কিছুকাল ইতস্তত করছিলুম, ভয় ছিল আমার দেহের বর্তমান অবস্থায় ওটা উপযুক্ত লঘুপথ্য হবেনা। কিন্তু জনশ্রুতি ক্রমশই অত্যুক্তির দিকে চলে, সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এবাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে, তাহলেও সংস্কারটার একেবারে মূল নেই এও বলতে পারি নে।....

"সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে কেননা মননশীল তাঁর মন। সাহিত্য রচনায় কারো বা চিত্ত-বৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব কারো বা খননের।.... সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে হয় তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে, মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই....

"আমি বলতে যাচ্ছিলুম যোগ্য লেখকের প্রধান নির্ভর দণ্ড তার সাহস। তার লক্ষ লেখার দিকে পাঠকের দিকে নয়। সুধীন্দ্রের ঐ গুণটি দেখেছি, তিনি পাঠকের কাছে পাওনা হিসাব করে দমে যান নি, তাঁর লেখা পড়ে অল্প লোক। রস সাহিত্যে লোকের ভিড় অসহ্য; কাউকে কোন টিকিট দেখাতে হয় না।....

"সুধীন্দ্র দেশবিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন—মনের অভিজ্ঞতা কেবলি বাড়িয়ে চলা তাঁর শখ,—সে শখ নিছক আরাম মেটাবার নয় বলেই আমাদের দেশে মননভূমির ভবঘুরে এত অল্প।....

"সুধীন্দ্র নানা বিষয়েই পড়াশুনো করেছেন কিন্তু কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁর মন জমাট বেঁধে যায় নি। জ্ঞানের ও ভাবের রাজ্যে উনি যাযাবর। ও'র সংগে আমার তহবিলের তুলনা হয় না কিন্তু একটা জায়গায় মেলে সে ও'র পথ চলতি মন নিয়ে।"

সব শুদ্ধ বাইশটি কবিতার স্থান হয়েছে আকাশ প্রদীপে, এগুলির মধ্যে চারটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসীতে—

জানা অজানা ১৩৪৫ কার্ত্তিক
পাখির ভোজ ১৩৪৫ ফাল্গুন
সময় হারা ১৩৪৫ মাঘ
'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' ১৩৪৬ বৈশাখ

আকাশ প্রদীপের কবিতাগুলির নাম ও রচনা তারিখ দেওয়া হলোঃ—

আকাশ প্রদীপ—২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
ভূমিকা—১৬ই মার্চ ১৯৩৯
যাত্রাপথ—৯ই জুন ১৯৩৭
স্কুল পালানো—১৪ই অক্টোবর ১৯৩৮
ধ্বনি—২১শে অক্টোবর ১৯৩৮
বধূ—২৫শে অক্টোবর ১৯৩৮
জল—২৬শে অক্টোবর ১৯৩৮
শ্যামা—৩১শে অক্টোবর ১৯৩৮
পঞ্চমী—২৯শে নভেম্বর ১৯৩৮
জানা-অজানা—১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮
প্রশ্ন—৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮
বঞ্চিত—৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮
আমগাছ—৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৮
পাখীর ভোজ—৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৮
বেজি—৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৮
যাত্রা—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯
সময় হারা—১লা জানুয়ারী ১৯৩৯
ম করণ—চৈত্র পূর্ণিমা ২১শে চৈত্র ১৩৪৫
ঢাকিরা ঢাক বাজায়—২৮শে মার্চ ১৯৩৯
তর্ক—এপ্রিল ১৯৩৯
ময়ূরের দৃষ্টি—এপ্রিল ১৯৩৯
কাঁচা আম—৮ই এপ্রিল ১৯৩৯

আকাশ প্রদীপের প্রায় সকল কবিতাই পুরোনো দিনের স্মৃতির কেন্দ্রে আবর্তিত হচ্ছে। বালক কালের, শৈশবের নানা ছোট ছোট কথা নানা উপলক্ষ্যে মনে ভীড় করে এসেছে। অতীতের প্রতি এই আকর্ষণ কবিতাগুলিকে একটি নিজস্ব মাধুর্য দিয়েছে, তাই কবির শৈশবকালের সংগে যাঁদের পরিচয় নিবিড় নয় তাঁদের পক্ষে এই কবিতাগুলির পূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব নয়। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সেই বিচিত্র জীবনধারায় যে শিশুটি তার বন্ধন দশার মধ্যেও দু চোখে সুদূরের অঞ্জন মেখে বেড়ে উঠছিলো আকাশ প্রদীপের বহু কবিতায় সেই শিশুরই পুনরাগমন

প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখা গেল, কোন কোন চিঠিতে বৌঠান কাদম্বরী দেবীর অস্পষ্ট স্পর্শ পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর আশপাশের প্রকৃতির দু-একটি চিত্র যা বহুদিনের ব্যবধানেও বিবর্ণ হয়নি. যাত্রাপথ কবিতায় দিদিমার বালিশ চাপা, দিদিমারই বলি পড়া ললাটের মতো কৃত্তিবাসী রামায়ণের কথা আছে, আর সে রামায়ণ পড়ার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে
দিন ফুরালো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি এক মনে।

স্কুল পালানো কবিতায় আছে—

মাস্টারি-শাসনদুর্গে সিঁধকাটা ছেলে
ক্লাসের কর্তব্য ফেলে
জানি না কী টানে
ছুটতাম অন্দরের উপেক্ষিত নির্জন বাগানে।

সেই নির্জন বাগানে সেই বিপুল প্রাণের প্রবাহ নিজের মধ্যে অনুভব করতেন 'যে প্রাণ মানব শিরায় আর তরুর তন্তুতে' একই বেগ জাগিয়েছে। আর মনে পড়ে দক্ষিণে কুয়োর ধারে কুলগাছ, পূর্বে সারি সারি নারিকেল ভাঙ্গা চাতালের পরে চড়ুই আর কাকের কোলাহল। সবই পূর্বস্মৃতির জাগরণ। জীবনস্মৃতির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে ধ্বনি কবিতার এই বর্ণনাটুকু—

বালকের মনের অতলে দিত আনি
পাণ্ডুনীল আকাশের বাণী
চিলের সুতীক্ষ্ন সুরে
নির্জন দুপুরে

বধূ, শ্যামা, কাঁচা আম প্রভৃতি সম্ভবতঃ কাদম্বরী বৌঠানের স্মৃতি বিজড়িত, জন্ম কবিতাতেও সেই পুকুরের কথা আছে যার পূর্বতীরে ছিল অসংখ্য শাখা শিকড় বিস্তারিত বট, এখানেও মনে পড়ছে

সেই পুকুরের
ছিনু আমি দোসর দূরের
বাতায়নে বসি নিরালায়
বন্দী মোরা উভয়েই জগতের ভিন্ন কিনারায়।

পঞ্চমী কবিতাটি অপেক্ষাকৃত লঘু চপল সুরে লেখা। গত জীবনের ব্যর্থতা, হতাশাকে আজ হাসির দ্বারা সহজ করে নেবার একটা চেষ্টা।

আজ খুলিয়াছি পুরোনো স্মৃতির ঝুলি
দেখি নেড়েচেড়ে ভুলের দুঃখগুলি
হায় হায় একী যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস।

পুরোনো দিনগুলি আসতে আসতে বিবর্ণ হয়ে আসে, স্মৃতির ঘরে তারা ঝাপসা হয়ে যায়। ছোট বেলার ছবির যেমন ছাপ ফিকে হয়ে আসে তেমনি মানুষেরও জানা অংশ অজানার প্রলেপ তার স্পষ্ট রূপ আস্তে আস্তে হারাতে থাকে।—

ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি

মুছে ফেলে অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তার
নূতনের মাঝে পথ হারা।
কাঁচা আম কবিতাটিও সেই অতীতের দীর্ঘশ্বাসে শিহরিত।

আকাশ প্রদীপ কাব্য সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেনঃ—"আকাশ-প্রদীপেও সার্থক কবিতাগুলি সব এই স্মৃতি-কাহিনী লইয়া। ছেলেবেলার স্মৃতিভাণ্ডার হইতে টুকরা টুকরা কাহিনী তিনি আস্বাদন করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে 'যাত্রাপথ', "স্কুল পালানো", 'ধ্বনি', "বধূ", "সময়হারা' 'শ্যামা', 'কাঁচা আম' প্রভৃতি কবিতায়। এই ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে ছড়া ও রূপকথার আকাশ সুবিস্তৃত; তাহাদের ধ্বনি ও সুর তাহাদের পরিমণ্ডল জীবন-সায়াহ্নে চিত্তের মধ্যে আবার বিস্তার লাভ করিতেছে: সে পরিচয় পাওয়া যাইবে "বধূ" 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' প্রভৃতি কবিতায়....'বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে' সেই শৈশব ভাবমণ্ডলে এই জাতীয় কবিতা ও গ্রন্থগুলির সৃষ্টি। কিন্তু শিশু-চিন্তাশ্রয়ী গ্রন্থগুলিতে যাহাই হউক, 'আকাশ প্রদীপ' কিংবা 'সেজুঁতির' কবিতাগুলিতে কবির পরিণত মননশীলতা এবং গভীর রহস্যময় অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। সেগুলি ছেলে বেলায় খেয়াল খুশি কল্পনার সৃষ্টি নয়, বার্ধক্যের পরিণত মানসের সৃষ্টি।"

বিদায় বেদনার প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলছেন—"আকাশ প্রদীপ কাব্যে (বৈশাখ ১৩৪৬) কবিচিত্ত পুরানো দিনের স্মৃতির দেওয়ালি সাজাইয়া আছে....দীর্ঘজীবনের "পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন" পশ্চিম দিগন্তে লীন হইয়া গিয়াছে, এখন বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসি-তেছে চোখে চলমান রূপ এবং মনে সঞ্চিত রস ততই পিছুটান দিতেছে।"

'সময় হারা' কবিতায় তাঁর সমালোচকদের বিরুদ্ধতা স্বীকারচ্ছলে তাদেরই ব্যর্থতাকে ফিরে আঘাত করেছেন। কলকাতার শান্ত দুপুরের নানা শব্দে শিশুচিত্তের মধ্যে যে বিচিত্র ভাবনা জেগে ওঠে তারই কবিতা ধ্বনি।

কবিতাগুলি তাদের নামেই আলোচিত হবে।

আকাশ প্রদীপ কাব্য যখন প্রকাশিত হলো তখন সমালোচকদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী পড়লো সময় হারা কবিতাটির প্রতি। কালের বিচারে এই কবিতাটিই তখনকার দিনে সব চেয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকার পুস্তক পরিচয়ে এই সম্পর্কে যে উল্লেখটুকু আছে তা উদ্ধৃত করা হলো,—"কিছুদিন থেকে মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে দেখি, রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং অন্য কোন কোন কবি তাঁহার প্রভাব অনুভবই করেন নাই, কিম্বা তাহা অতিক্রম করিয়া নূতন অনুপ্রাণনায় নূতন পথে চলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সমকালীক বা তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে তাঁহারই ধরণের কবিতা লিখিতেই হইবে কিম্বা সেরূপ না লিখিলে কবিতা ভাল হইবে না প্রকৃতির এরূপ কোন নির্দেশ নাই। সুতরাং কেহ যদি অন্য রকমের ভাল কবিতা লিখিয়া থাকেন বা এখন লিখিতেছেন, তাহা খুব সুসংবাদ। কিন্তু কেহ যদি মনে করে, রবীন্দ্রনাথ সেকেলে হইয়া গিয়াছেন, বর্তমানের সঙ্গে তিনি যোগ রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না. তাহা হইলে সেটা ভ্রম, কবির মন যে শিশুদের, কিশোরদের তরুণদের মনের স্বজাতীয় এই বহিটির অনেক কবিতায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।"

বেদের অপৌরুষেয়ত্ববাদ

মনোনীত সেন

প্রাচীনপন্থী পন্ডিতগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ সর্বাধার পরমেশ্বর ভিন্ন, অন্য কোন দেব বা মনুষ্য বেদ কর্তা নহেন। সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অথর্ববেদ তাঁহার মুখ-স্বরূপ, সামবেদ তাঁহার লোমবৎ, যজুর্বেদ তাঁহার হৃদয়স্বরূপ ও ঋগ্বেদ তাঁহার প্রাণস্বরূপ, ইহাও কথিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা স্ব-স্ব মতের সমর্থনের উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "যে পরমাত্মা আকাশ হইতেও বৃহৎ, তাঁহা হইতেই ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব, এই বেদচতুষ্টয় নিশ্বাসের ন্যায় সহজভাবে নিঃসৃত হইয়াছে। যেরূপ শরীর হইতে শ্বাস সহজে নির্গত হইয়া, পুনঃ সেই শরীরেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর বেদ-শাস্ত্রকে উৎপন্ন বা (প্রাদুর্ভূত) করিয়া, সংসারে উহাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন; পুনঃ প্রলয়কালে তিনি বেদশাস্ত্রকে অপসারিত করিয়া, নিজ (অনন্ত) জ্ঞানের মধ্যে সদা স্থিত রাখেন। এইরূপে বীজাঙ্কুরবৎ পরমাত্মা কর্তৃক বেদশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেরূপ বীজ মধ্যে প্রথম হইতেই অঙ্কুর বর্তমান থাকে, এবং তাহাই বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয়, ও বৃক্ষ আবার বীজরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্র সদা ঈশ্বরের জ্ঞানে বিরাজমান থাকে, তাঁহার কদাপি নাশ হয় না, কারণ বেদ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বিদ্যা বা জ্ঞান, এজন্য ইহাকে নিত্য বলিয়া জানিবে"।

এই বদ্ধমূল ধারণাকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশবরেণ্য স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই, মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। তিনি বলিয়াছেন,—"বেদ, ভিন্ন কালের ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র। অনেক ঋষিপ্রণীত সূক্ত বেদে গ্রন্থিত আছে। প্যাল্-গ্রেভ্স্ গোল্ডেন্ ট্রেজারি অফ ইংলিশ লিরিক্স্ হইতে, (Palgrave's Golden Treasury of English Lyrics) যাহা ভিন্ন ভিন্ন মহাকবি প্রণীত ইংরাজি কবিতা ও গান সংগ্রহ মাত্র, অথবা স্কান্দিনেভিয় সাগা সংগ্রহ হইতে বেদের কোন প্রভেদ নাই"।

"বেদের প্রাচীনত্বই হইতেছে বেদের মাহাত্ম্য। পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। যে কালে বেদ রচনা হয়, সেই কালের কথা জানিতে হইলে, আমাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় নাই। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া পড়া আবশ্যক। ইতি-হাসলেখক ও প্রত্নতত্ত্ব ব্যবসায়িগণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য মাত্র দেখিবেন। কিন্তু যিনি কবি, তিনি দেখিবেন, বেদের তুল্য কাব্য জগতে আর নেই, বেদের এক একটি সূত্র এক একখানি মহাকাব্য।

একজন কবি ও অপর জন অকবি, এই দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ। যিনি কবি, তিনি কল্পনাবলে জগৎসংসার কত সুন্দর দেখেন, আর যিনি অকবি, তিনি মাটীকে মাটীই দেখেন—আকাশকে আকাশই দেখেন। ইহার কারণ হইল দুইজনের মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা মাত্র। লোকেরা দেখিল, আমরা যাহা পারি না, যে জন কবি সে পারে কেন, অবশ্য এ দেবতাসহায়

পাইয়াছে। সেরূপ, বেদে যাঁহরা গান লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা কোন স্বর্গীয় দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহাদের সমসাময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে, লেখকেরা ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ। পরে কবির নাম লোপ হইতে লাগিল, কবি যে দেবতার সাহায্য পাইয়াছেন, সেই দেবতাই বেদরচক বলিয়া পরিণত হইলেন। দেবতাই রচক, কবি কেবল দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবাচার্য্য লিখিলেন, যিনি মন্ত্র দেখিলেন, তিনিই ঋষি। ঋষ্‌ধাতুর অর্থ দর্শন। ঋষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘুচিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান মত দাঁড়াইল, দেবতার বেদপ্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল। ঈশ্বর নিত্য, বেদ ও নিত্য হইয়া দাঁড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাক্য, উহাতে মিথ্যা নাই; উহা সত্যময়, ধর্মময়, জ্ঞানময়; এইরূপে কতকগুলি গান ধর্মপুস্তক-রূপে পরিণত হইল"।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন যে,—"ঈশ্বর হইতেই বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তবে বেদশাস্ত্রকে পুস্তকাকারে লিখিয়া, সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর প্রকাশ করেন নাই। পরমেশ্বর বেদের প্রকাশার্থে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারিজন ঋষিকে নিমিত্ত মাত্র করিয়াছিলেন। উক্ত চারিজন ঋষির এরূপ পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্য ছিল যে, তাহাদিগের হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করা ঈশ্বর উচিত বিবেচনা করিয়াই, উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ঋষিদিগের নিজ জ্ঞান দ্বারা বেদের উৎপত্তি বা প্রকাশ হয় নাই। পরন্তু পরমেশ্বর এই চারি ঋষিগণের জ্ঞানমধ্যে বেদ প্রেরণা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ পরমেশ্বর মনুষ্যদেহধারী অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চারি ঋষিগণের হৃদয়ে বেদের প্রকাশ করিয়াছেন। পরে ঐ চারি ঋষি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের মধ্যে চারি বেদ প্রচার করিয়াছিলেন। এবিষয়ে ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন যে, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরার নিকট হইতে ব্রহ্মা ঋষিও বেদ পাঠ করিয়াছিলেন" পরমেশ্বরের প্রেরণায় মনুষ্যদ্বারা বেদ হইয়াছিল, এই নিমিত্তই বেদচতুষ্টয় অপৌরুষেয়, যদি স্বামীজীর এ অর্থ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সারা বিশ্বে যে সকল নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে সে সমস্তই অপৌরুষেয় পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে, এবং বোধ করি কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এই অর্থে বেদকে অপৌরুষেয় বলিতে আপত্তি করিবেন না। কিন্তু তাহা ত নয়, সনাতন-বাদিগণ আরও কহিয়া থাকেন যে, ঋষিগণ বেদমন্ত্র জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি কিন্তু যোগবলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি,—গড়িয়াছি, সৃষ্টি করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি"। এই সকল বিবেচনা করিয়াই, বোধ করি, স্বামী দয়ানন্দ বলিয়াছেন, বেদশাস্ত্র যে ঈশ্বরের রচিত, ইহা স্বীকার করাই কল্যাণদায়ক, অন্যথা নহে।

এই প্রসঙ্গে অপর একটি অভিমত প্রদর্শিত হইল,—

"A sastra is considered Apauruseya when it cannot be attributed to any author by tradition, and Pauruseya when it can be traditionally attributed to a particular author. This kind of Aparuseyabhava has been predicted with reference to the Vedas by the author's of the Purvamimanisa but the Naiyaikas do not consider the Vedas to be Apauruseya. The authorship of the Vedas is attributed by them to Isvara who represents a Purusa. (Kavyamimamsa Rajsekhara, Gaekwad's oriental series.)

এই সম্পর্কে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ'

গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। "সমগ্র বেদ একসময়ের রচিত নহে এবং সমুদায় বৈদিক ক্রিয়াও এক কালে প্রচলিত হয় নাই। সমুদায়ে চারি বেদ, পাঁচ বেদ বলিলেও অসঙ্গত হয় না, যথা,—ঋক্, সাম, কৃষ্ণ-যজুঃ, শুক্ল যজুঃ, ও অথর্ব (পঞ্চদশী, ১৪ পরিচ্ছেদ, ৮ শ্লোক)। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের অপেক্ষায় অধিকতর প্রাচীন। সাম ও ঋগ্বেদ-সংহিতার সমুদায়ই পদ্যময়। অথর্ব ও যজুর্বেদ—সংহিতার কিয়দংশ গদ্যময়, অবশিষ্ট সমস্ত ভাগই পদ্য।

"বহুতর শাস্ত্রে ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন মন্ত্র বেদ ত্রয়ী বা ত্রয়ী বিদ্যা বলিয়া লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হইতে পারে প্রথমে এই তিনটি মাত্র বেদ বিদ্যমান ছিল। অথর্ববেদ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। শুক্ল-যজুঃও সমাধিক পুরাতন নহে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ঐ সংহিতাটি প্রচার করেন।"

"সাম-বেদীয় সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ি সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক এবং অথর্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে।"

"সমগ্র ঋগ্বেদই যে এক সময়ের ধর্ম প্রকটন করিতেছে তাহাও নয়। উহার কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা অপ্রাচীন। বেদপ্রণেতা ঋষিরা স্বয়ংই তাহা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন ঋষি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ঋষিদিগের প্রসঙ্গ করিয়াছেন এবং পুরাতন ও নূতন শ্লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (ঋঃ ১।১।২, ১।২৭।৪)।"

"ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রায় সমুদায় সূক্তই গৃৎসমদ (শৌনক) ঋষির প্রণীত, এবং পাণিনি ঋষি এইগুলিকে অপ্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পাণিনি বৈদিক শাস্ত্রসমুদায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 'দৃষ্ট' ও 'প্রোক্ত'। তিনি সামবেদাদি যে সমস্ত শাস্ত্রকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত সুতরাং অতীব প্রাচীন বলিয়া জানিতেন, তাহার নাম দৃষ্ট, আর ব্রাহ্মণ কল্প সূত্রাদি যে সমস্ত শাস্ত্র সেরূপ বিশ্বাস করিতেন না, তাহাই 'প্রোক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

"ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের ভাষা ও তাৎপর্য্য বিচার করিয়া ঐ মণ্ডল এমন আধুনিক অবধারিত হইয়াছে যে, উহা উত্তরকালের লিখিত একটি পরিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়া অক্লেশেই লিখিতে পারা যায়।"

"ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ভাগই, হিন্দুদিগকে কাবুল নদীর তীরস্থ ও পঞ্চনদের (পাঞ্জাব) অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দান করিতেছে।"

"দেবতা-বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্য-বিশেষের নাম 'নিবিদ্'। অনেকানেক নিবিদ্ ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনতর সূক্ত সমুদায় অপেক্ষাও সমাধিক প্রাচীন। বহুতর ঋকের মধ্যে সেই সমস্ত নিবিদ্ সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে (১।৮৯।৩।।১।৯৬।২।।২।৩৬।৬), তন্মধ্যেও স্থানে স্থানে তাহা পূর্ব অর্থাৎ পুরাতন এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে।"

বায়ুপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ঋচো যজুংষি সামানি মন্ত্রশ্চাথর্ব্বণানি চ।
সপ্তর্ষিভিস্তু তে প্রোক্তাঃ স্মার্ত্তং ধর্মং মনুর্জগৌ।।৪৬

ঋক্ যজু, সাম, আথর্ব্বণ মন্ত্র,—এই সমস্ত সপ্তর্ষিগণ প্রচারিত। আর স্মার্তধর্ম মনু কীর্তন করিয়াছেন।" মূল সংস্কৃত শ্লোকে 'প্রোক্ত' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। পাণিনি ঋষির পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা অনুসারে বলিতে হয় যে, বায়ুপুরাণ—রচয়িতা সামাদি বেদচতুষ্টয়কে সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। উক্ত গ্রন্থের ৯৯ অধ্যায়ে পুনরায় লিখিত আছে যে, "রাজা সনতির পুত্র 'কৃত' কৌথুমশাখী মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন। ইনিই চতুর্বিংশতি প্রকার সামসংহিতার বক্তা। তৎপ্রবর্তিত সংহিতাগুলি প্রাচ্য নামে অভিহিত। ইনিই সামসংহিতার প্রণেতা, তাই ইহাঁর বংশীয়েরা সামগায়ী।" মূল শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সুমতেরপি ধর্ম্মাত্মা রাজা সম্মতিমান্ প্রভুঃ।
তস্যাসীৎ সনতির্নাথ কৃতস্তস্য সুতোহভবৎ।।১৮৯।।
শিষ্যো হিরণ্যনাভেস্তু কৌথুমস্য মহাত্মনঃ।
চতুর্বিংশতিধা তেন প্রোক্তাস্তাঃ সামসংহিতাঃ।।১৯০।।
স্মৃতাস্তে প্রাচ্যনামানঃ কার্তা সাম্নাংতু সামগাঃ।"

গতানুগতিক চিন্তাধারার ও আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানের বিপরীত বলিয়া আর একটি বিবরণ প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইল। ইতিহাসে বেদচতুষ্টরের মধ্যে ঋগ্বেদকেই প্রাচীনতম বলা হয়। পরন্তু বায়ুপুরাণের ৬০ অধ্যায়ে নিম্নপ্রকার বর্ণিত আছে,—

"এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞম কল্পয়ৎ।।১৭।।
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্ত ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
উদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বং চাপ্যথর্বভিঃ।
ব্রহ্মত্বমকরোদ্‌যজ্ঞে বেদেনাথর্বণেন তু।।১৮।।
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং সমকল্পয়ৎ।
হোতৃকং কল্প্যতে তেন যজ্ঞবাহং জগদ্ধিতম্।।১৯।।
সামভিঃ সামবেদঞ্চ তেনোদ্গাত্রম রোচয়ৎ।
রাজ্ঞস্ত্বথর্ববেদেন সর্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ"।।২০।।

"যজুর্বেদ এক ছিল, তাহাকে তিনি (দ্বৈপায়ন) চারিভাগে বিভক্ত করেন। উহাতে চতুর্হোত্র হইলে, তাহাতে যজ্ঞ কল্পিত হইল। যজুদ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋক্ দ্বারা হোত্র, সাম দ্বারা উদ্গাত্র এবং অথবর্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যজ্ঞে যে ব্রহ্মকার্য্য করিতে হয়, তাহা অথবর্ববেদানুমত। তারপর সেই দ্বৈপায়ন, ঋক্‌সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ রচনা করেন। তদ্বারা হোতৃক্ ও জগতের হিতকর যজ্ঞবাহ সিদ্ধ হয়। সাম সংগ্রহ পূর্ব্বক সামবেদরচনা করিয়া তদ্বারা উদ্গাত্র সাধন কল্পনা করেন। আর অথবর্ববেদ দ্বারা রাজগণের আবশ্যকীয় সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করেন।"

(যজ্ঞক্রিয়ার জন্য চারিবেদকে চারি নাম প্রদান করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ—হোতৃবেদ যজুর্বেদ অধ্বর্য্যুবেদ, সামবেদ—উদ্গাতৃবেদ এবং অথবর্ববেদ—ব্রহ্মবেদ। যিনি দেবতাদের গুণ সম্বন্ধে যিনি বিশেষ রূপে গান করেন তিনি উদ্গাতা। যজ্ঞের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য যিনি করেন তিনি অধ্বর্য্যু। যজ্ঞে সকলকে যথোচিত কার্য্যের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, অর্থাৎ যজ্ঞের নেতা। ব্রহ্মার তিন সহকারী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নিধ্র, পোতা। হোতার তিন সহকারী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। অধ্বর্য্যুর তিন সহকারী—প্রতি-প্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা। উদ্গাতার তিন সহকারী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য।)

অগ্নিপুরাণের ১১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিল। দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভগবান্ হরি বেদব্যাসরূপে অবতরণ করিয়া তাহাকেই চারিভাগে বিভাগ করেন।

পুনরায় 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থ হইতে আনুষঙ্গিক বিবরণ উদ্ধৃত হইল। "বৈদিক সংহিতায় হিন্দু জাতির মনোবৃত্তি যতদূর বিকাশিত ও বহু-বিষয় ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত প্রথমাবস্থার লক্ষণ নয়। তাঁহারা গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিয়া অধিবাস করিতেন, ভূমি কর্ষণ করিয়া যবাদি শস্যসমূহ উৎপাদন করিতেন, রাজত্বপদ ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, অস্ত্র, বর্ম্ম ও স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া

ব্যবহার করিতেন, এবং রথারোহণ, বস্ত্রবয়ন ও সূচীকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আপনাদের অবস্থোন্নতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিতেন। ধন ও ধনাঢ্য, সুবর্ণ ও সুবর্ণকোষ, ঋণ ও অধমর্ণ, বৃদ্ধি ও বার্দ্ধুষিক, সমুদ্র যান ও সামুদ্রিক বণিক, পান্থ ও পান্থনিবাস, ঔষধ ও চিকিৎসাবৃত্তি, গগন পর্য্যবেক্ষণ ও মাস ও মলমাসাদি কালাংশ নির্দ্ধারণ এই সমস্ত মহত্তর বিষয়ের পৌনঃপুন উল্লেখ সংহিতাকালীন হিন্দুসমাজের সমধিক উৎকর্ষ-সাধন-পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। চোর ও চৌর্য্য, ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী, রহস্য-প্রসব ও ভ্রূণ-হত্যা, দ্যূত ও দ্যূতকারক এই সমস্তও জনসমাজের আদিম অবস্থায় তাদৃশ সম্ভাবিত নহে, প্রত্যুত সভ্যতা-সত্তারই বিষময় লক্ষণ বলিয়া লক্ষিত হইতে পারে। (ঋগ্বেদ)

বায়ুপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ত্রেতাযুগে মনুনন্দন প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ সর্বপ্রথমে মহীপতি হয়েন। সেই হইতে দণ্ডধারী রাজগণ উৎপন্ন হয়েন।

অব্যবহিত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যখন বেদ সৃষ্টি হয়, তখন সভ্যতা—সত্তার প্রায় সমুদায় বিষময় লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী "সত্যযুগে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা; দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত" (শান্তি, ৫৯ অঃ) "ঐ যুগে ধর্ম সনাতন, লোকসকল কৃতকৃত্য হইত। এই যুগে ধর্ম অবসন্ন বা প্রজাক্ষয় (যুদ্ধ বিগ্রহ) হইত না। তৎকালে দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা পরস্পর উপদ্রবরহিত ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ হইত না। কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়া সকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। লোকের সংকল্পানুসারে সমস্ত ফল সম্পন্ন হইত ও সন্ন্যাসই (nomad) পরমধর্ম ছিল। যুগপ্রভাবে ব্যাধি ও ইন্দ্রিয়ক্ষয় হইত না। অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুন্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য (সভ্যতার বিষময় অবদান) ইহার নামগন্ধ ও ছিল না। সমান কর্ম বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাঁরাই প্রজা ছিলেন। (বর্ণাশ্রম কি ছিল না? রামায়ণের উত্তরকাণ্ড, ৮৭ সর্গে লিখিত আছে যে, ত্রেতাযুগে মনু প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তকগণ সর্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করিলেন)। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রাণরূপ মন্ত্র, এক বেদান্ত শ্রবণাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদিস্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ধর্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও একপ্রকার কর্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কামফল বিবর্জিত হইয়া আশ্রমচতুষ্টয় সমুচিত দশাদি কর্মদ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মযোগসমাযুক্ত কর্মই সত্যযুগের লক্ষণ।" (বনপর্ব, ১৪৯ অঃ)। "ত্রেতাযুগে সত্রানুষ্টানের (গৃহাদি-নির্মাণের) বিধি আছে। মনুষ্য ক্রিয়া ও ধর্মপরায়ণ এবং সত্যব্রত সত্যপ্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লোকে সংকল্প করিয়া দানাদিক্রিয়া (আনুষ্ঠানিক কর্মাদি) করিলে ফল হইয়া থাকে। তপোদানপরায়ণ মনুষ্যগণ ধর্মপথ হইতে কদাচ পরিভ্রষ্ট হয়েন না। প্রত্যুত তাঁহারা স্বধর্ম নিরত ও ক্রিয়াবান হইয়া থাকেন" (বনপর্ব, ১৪৯ অঃ)। "মানবগণ এইরূপে কিছু দিন কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কণ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল" (শান্তিপর্ব, ৫৯ অধ্যায়)।

চকর-সংহিতায় লিখিত আছে,—"আদিকালে অর্থাৎ সত্যকালে মনুষ্যগণ ইন্দ্রাদিদেবগণসদৃশ ওজস্বী ছিলেন, তাঁহাদের অতিবিমল বিপুল প্রভাব ছিল, সাক্ষাৎ দেবদেবর্ষির ন্যায় তাঁহারা ধর্ম ও যজ্ঞবিধি (যে কর্ম করিলে স্বর্গে যাইবার পথ সুগম হয়) সকল প্রতিপালন করিতেন, তাঁহাদের শরীর পর্বতবৎ সংহত ও দৃঢ় ছিল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন ছিল, পবনের ন্যায় তাঁহাদের বল, গতি ও পরাক্রম ছিল, স্ফিক্ (পাছা) অতি সুন্দর ছিল, তাঁহাদের দেহের পরিমাণ আকৃতি প্রসাদ ও স্থৌল্য যথোপযুক্ত ছিল, এবং তাঁহারা সত্য—অনৃশংসতা-সরলতা-দান-দম-নিয়মন্তপ-উপবাস-ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রতপরায়ণ (পুণ্যজনক কর্মপরায়ণ) ছিলেন, তাঁহাদের ভয়-রাগ-দ্বেষ-মোহ-লোভ-ক্রোধ -শোক-অভিমান-রোগ-নিদ্রা-তন্দ্রাশ্রান্তি--ক্লান্তি-আলস্য এবং প্রতিগ্রহদোষ ছিল না, এই সকল গুণে সত্যযুগে মানবগণ অপরিমিতায়ু ছিলেন। সত্যযুগ গত হইবার সময়ে কোন কোন ব্যক্তি অত্যাদান (ধনাদির অতিগ্রহণ) হেতু সাম্পন্নিক হওয়ায় তাঁহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল, শরীরের গুরুত্ব হইতে শ্রান্তিবোধ, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনের সঞ্চয় ইচ্ছা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তদনন্তর ত্রেতাযুগ প্রবৃত্ত হইলে (ত্রেতার আরম্ভ সময়ে), সেই লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যাকথন, মিথ্যাকথন হইতে কাম-ক্রোধ-মান-দ্বেষ-পারুষ্য-অভিঘাত-ভয়-তাপ-শোক-চিন্তা ও উদ্বেগাদি উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে প্রজাগণের শরীর জ্বরাদি ব্যাধিকর্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং তৎপরে তাহাদের ক্রমশঃ আয়ুর হ্রাস হইতে থাকে" (চরকসংহিতা, বিমানস্থান, ৩য় অধ্যায়)।

উল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের বিবরণ সমূহ অভিনিবেশ-সহকারে বিশ্লেষণ ও বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইয়া উঠিতেছে যে, বেদচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয় ত্রেতাযুগে, তাহার পূর্বে কখনই সম্ভবপর হয় না। বায়ুপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"ত্রেতাদৌ সংহিতা বেদাঃ কেবল ধর্মশেষতঃ। সংরোধাদায়ুষশ্চৈব ব্যস্যন্তে দ্বাপরেষুতো॥৪৭॥ ত্রেতাদিকালে বেদ, অতি সংক্ষিপ্তভাবে সার ধর্মময় ছিল; দ্বাপরাদিকালে জনগণের আয়ুর অল্পতা ঘটিলে সেই বেদকে বিভক্ত করা হয়"। আমরা সকলেই আবহমান-কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, জীবের অল্পবুদ্ধি দর্শনে তাহাদের স্বতঃ বেদস্ফূর্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই পরমাত্মা ঈশ্বর রচনা-প্রযত্ন না করিয়া জীবকৃত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় বেদবাক্য প্রয়োগ করেন, এবং এইজন্য বেদবাক্যকেই 'পূর্বে অনালোচিত' বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারের শাস্ত্রকাব্য-সমূহ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এবং সত্যের সহিত তাহাদের কোনরূপ যোগাযোগ আছে কি না, সুধী পাঠকগণ পূর্বপর পর্য্যালোচনা করিয়া এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবেন।

বেদবাক্য অভ্রান্ত শাস্ত্রে ইহাও কথিত হইয়া থাকে। সনাতন পন্থিগণও প্রচার করিয়া থাকেন যে, বেদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণটি অভ্রান্ত সত্য এবং তাহার কোনরূপ অন্যথা হইতে পারে না। পরন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহামতি ভীষ্ম উভয়েই উক্তপ্রকার শাস্ত্রবাক্যগুলিকে প্রামাণ্য বলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন,—

"শ্রুতেধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবোজনাঃ।
তত্তে ন প্রত্য সূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে।
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্"।। (মহাভারত কর্ণপর্ব, ৭০ অধ্যায়)

অর্থ,—অনেকে শ্রুতিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্মতত্ত্ব নির্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেকস্থলে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে হয়।

ভীষ্মও কহিয়াছেন,—

"শ্রুতিধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ।

ন চ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে।। (মহাভারত; শান্তিপর্ব্ব, ১০৯ অধ্যায়)

অর্থ,—কেহ কেহ শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কারণ শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

বর্ত্তমান-যুগে হিন্দু ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় মূল বেদের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিজদিগের ব্যবহারের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় একখানি নূতন বেদ সংকলন করাইয়াছেন। এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

দাক্ষিণাত্যের রামানুজ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কালক্রমে দুইটি শাখা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়, 'বেদাগালাই' বা উত্তর-দেশীয় এবং 'তেঙ্গালাই'। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্ষণে ঘোর মত-বিরোধ। 'বেদাগলাই' শাখা সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু 'তেঙ্গালাই' শাখা আপনাদের জন্য তামিল-ভাষায় চারি সহস্র কবিতাযুক্ত একখানি বেদ সঙ্কলন করিয়া লন। শেষোক্ত সম্প্রদায় প্রচার করিতে থাকেন তাঁহাদের তামিল-ভাষার বেদই আদি বেদ। সুতরাং সেই সেই বেদের কবিতাই তাঁহাদের মন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ঐ বেদ 'নালায়ির' নামে পরিচিত এবং উপনিষদের অংশবিশেষের মর্ম্মাবলম্বনে উহা সংগ্রথিত। (পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী)।

জার্মান গীতিকাব্যে রিল্‌কে

অমলেশ ভট্টাচার্য

সৃষ্টি-প্রবাহে নিজেকে প্রবাহিত করে দেবার জন্য শিল্পীর ভাব সমুদ্র দুলে উঠল। সেই দোদুল্য লাস্যের বৃহৎ অংশই থাকে অব্যক্তের অতলে। সেই গহন অতল সমাহিতির মধ্যেই লিরিকের জন্ম। যেখানে ভাষা মূক, বুদ্ধি এক পরম বিস্ময়ে নির্বাক। তাই শব্দের বদলে ধ্বনি, অর্থের বদলে ব্যঞ্জনা, চিত্র না দিয়ে চিত্রকল্প। রূপ না ফুটিয়ে প্রতীকের আশ্রয় অনিবার্য। সব নিয়ে শিল্পী তাই মিস্টিক। অতি পরিচিত যে সব দৃশ্যবস্তু, ঘটনা, মানুষ—শিল্পের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে যেন মনে হয় তারা অনেকখানি অচেনা। দেখা জিনিষকে শিল্পের মধ্য দিয়ে নতুন করে দেখি। অত্যন্ত পরিচিত রূপকে মনে হয় অপরূপ। শিল্প সুষমার এই অপরূত্ব স্থূল বাস্তব থেকে কিছুটা দূরত্ব এনে দেয়। গোঁড়া বস্তুনিষ্ঠ মনের কাছে শিল্পের এই দূরত্ব অশ্রদ্ধেয় হলেও অস্বীকৃত নয়।

জার্মান লিরিক বিশ্বসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রথম উদ্গাতা ষ্টিফান জর্জ। নিট্‌শের জীবন বেদে দীক্ষিত এক অভিজাত তেজে তিনি প্রচলিত ভাব বিলাসিতার মোহ থেকে তাঁর কাব্যকে মুক্তি দিলেন। সেই সঙ্গেই জার্মান গীতিকাব্যের সূচনা। জর্জ তাঁর প্রেরণা পেয়েছেন ফরাসী কবি বোদলেয়ার, ভারলেন ও মালার্মের কাছে। তাঁর অভিজাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করা যেত কিন্তু শেষ দিকে তাঁর উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতা অনুরাগী উত্তরসূরীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ক্ষীয়মান করেছিল। ব্যষ্টি জীবনের আদর্শের মধ্যে সার্থকতা খুজতে গিয়ে তিনি খন্ড অস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাব্য সৌন্দর্য্যের আর প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতির মিলন মাধুরী। এই গুণ বৈশিষ্ট্য যতটা জার্মান সংস্কৃতির তার চেয়ে অনেক বেশী ল্যাটিন। 'charon' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯০৪ সাল থেকে জার্মান কবিতায় এক বলিষ্ঠ কবিগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ম্যাক্স, মর্গেনষ্টার্ণ, মমবার্ট এবং বিশেষ করে হুগো হফ্‌মানস্তল (১৮৭৪-১৯২৯ খৃঃ)। জর্জের আত্মকেন্দ্রিকতা স্বভাবতই এদের একটু পুরাতন পন্থী করে তোলে। তবে নিছক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বদলে আত্মচিন্তার এক রোমান্টিক সুর তোলেন তাঁরা। জর্জের মধ্যে যে সংযম ছিল তাঁরা স্বইচ্ছায় তার কিছুটা শিথিল করেন। তখন কবিতায় একটু যেন বেশী করে যৌবন যন্ত্রণার উষ্ণস্পর্শ লাগল।

এমনি এক আবহাওয়ার মধ্যে এলেন রিল্‌কে। এক সূক্ষ্ম অনুভূতির মায়া কাজল তাঁর চোখে। সৌন্দর্য্য চেতনার চেয়েও তাঁর মধ্যে আত্মা সচেতনা বেশী ছিল। আত্মার গভীর শান্তির মধ্যে, এক অতীন্দ্রিয় ভাব লোকের মধ্যে, তিনি এক দিব্য সংগীতের সুর যেন শুনতে পেলেন। মৃত্যুর মহাসিন্ধু মন্থন করে যে প্রতীতি তিনি লাভ করলেন তার পূর্ণ অভিব্যক্তি কিন্তু 'আলসেসটিস' দিতে পারল না দিতে পারল না "ইউরিদিস'ও। ব্যঞ্জনায়, চিত্রকল্পে আর অজস্র প্রতীকের মধ্যে দিলেন তাঁর ইঙ্গিত।

জন্ম-মৃত্যু আত্মা তাঁর কাব্যের এই ত্রিপুটিতে কবি দৃষ্টি সিদ্ধ হল। ফলে কবিতা আর দর্শন এক হয়ে গেল। দার্শনিক সিম্‌মেল তাঁর তত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আবৃত্তি করেন রিল্‌কের

কবিতা। অথচ রিল্‌কে একবার তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন যে সোফেন হাওয়ার-এর মাত্র কয়েক পাতা ছাড়া তিনি কোনদিন দর্শন পড়েন নি। বস্তুত কবিকে ত দর্শন পড়তে হয় না তাঁকে দার্শনিক হতে হয়। যদিও কালিদাস কোন এক প্রসঙ্গে কাব্যলক্ষ্মীকে দার্শনিকের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং দার্শনিক না হয়ে কি পেরেছিলেন? রিল্‌কে সত্যকার কবি তাই সত্যকার দার্শনিক। তাঁর কাছে বুদ্ধিজ্ঞানের চেয়ে বোধ-জ্ঞান বড়। কারণ ইতিমধ্যে জার্মানিতে তাসো এবং এবং উইলহেলেম এর মধ্য দিয়ে ন্যাচারালিজমএর বুদ্ধি চর্চা চালিয়ে গ্যেটের ফাউস্ট এর মধ্যে তার সমাপ্তি ঘোষণা হয়ে গেছে। কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ঊর্ণনাভের মত যত জাল বিস্তারই করুক নিজে তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। বুদ্ধির স্ফিতিতে আত্মার আকাশ মুক্তি ঘটেনা। স্তুপীকৃত তথ্য ভার হয়ে ওঠে মাত্র। 'mole ruat sua'—নিজের ভারে নিজেই ভেঙ্গে পড়ে।

রিল্‌কে তাই একান্তভাবেই অতীন্দ্রিয়বাদী। প্রথম জীবনে যে দুজন মনীষীর কাছে দৃষ্টি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের একজন জেকবসেন আর একজন মেটারলিঙ্ক। জেকবসেনের কাছ থেকে পরিদৃশ্যমান বস্তু ও জগৎ থেকে কবিতার ভাববস্তু আহরণের প্রেরণা পেয়েছিলেন। আর মেটারলিঙ্কের প্রথমদিকের রচনা (Le tresor des Humbles) থেকে তিনি দেখতে শিখলেন প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিক্ষণেই একটা গভীর ট্র্যাজেডী ঘনিয়ে রয়েছে। এই দ্বিদল অনুভূতির ছাপ তাঁর সারা জীবনের বহু কবিতায় ও ছোটগল্পে রয়ে গেছে। বাহ্যত ঘটনা বৈচিত্র্যহীন তাঁর জীবন যেন এক গভীর রাত্রির আত্মস্থ সমাহিতিতে মগ্ন। জন্মক্ষণটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। নিস্তব্ধ শীতের এক মধ্য রাত্রে প্রেগ শহরের এক কোণে দরিদ্র এক ঘরে তাঁর জন্ম। তখন নিঃসীম অন্ধকার আকাশে একটি নক্ষত্র শুধু জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। খৃষ্টের জন্মলগ্ন বলে নাম রাখা হয় "মারিয়া" এবং "রেণে"। দুর্বল নিরীহ একটি শিশু পুষ্টিহীন অপরিণতি নিয়ে ভূমিষ্ট হল। শৈশবে পাঁচ বছর পর্যন্ত ছোট্ট বালিকার মত লালিত। মাথায় চুলের বেণী—সার্টিনের ফ্রক পরে পুতুল খেলার মধ্য দিয়ে রেনে যেন একটি ছোট্ট মেয়ে। এই ছোট্ট নিরীহ মেয়েটিকে আমরা পরে Das Christkind গল্পে পাই। দেখি সে হাঁসপাতালের রোগীর বিছানায় শুয়ে আছে। চোখে মুখে মৃত্যুর কুহেলীময় আলো আঁধারী ঝিল্‌মিল্‌ করছে। হিমঝরা শীতের রাত্রে শিলাময়ী এক কুমারী দেবী মূর্তির পায়ের কাছে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। এই গল্পে—রিলকে তাঁর শৈশব জীবনকে মৃত্যুর আলোতে প্রতিফলিত করে দেখছেন। কুমারী দেবী মূর্তি-তার আত্মার প্রতীক। নারী কৌমার্যকে রিলকে সর্বত্র আত্মার প্রতীক হিসাবেই ব্যবহার করেছেন।

বায়রণ ও সোফেন হাওয়ারের মত রিল্‌কের জীবনেও মাতৃ অবজ্ঞা একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। রাজ অমাত্যের অভিজাত কন্যা ছিলেন তাঁর মা। তাঁর শৈশব জীবন মাতৃ স্নেহের পরিবর্তে এক রুক্ষ, কঠিন তিক্ততায় উষর হয়ে যায়। ভাবপ্রবণ শিশু হৃদয় দীর্ণ হয় একদিন মাতার বিবাহ বিচ্ছেদে। Eining ও Die Letzten গল্পে দেখি তার বেদনাঘন রূপ। এমনকি 'সোফিয়া' তাঁর মায়ের নামটি পর্য্যন্ত ব্যবহার করেছেন এর একটি গল্পে।

রিল্‌কে মুখ্যত কবি হলেও তাঁর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সর্বপ্রথম খুলে যায় ছোটগল্পে। এই সময়ে তিনি মেটারলিঙ্ক দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত এবং তখন থেকেই তিনি ন্যাচারলিজম্‌ ছেড়ে পুরোপুরি প্রতীক হয়ে উঠলেন। জীবন চক্রের উপর দিয়ে চলল অজস্র চরিত্রের মিছিল। রুগ্ন, অসমর্থ প্রকৃতিত্যক্ত তাঁর এ্যাম্‌ লেবেন হিন্‌-এর প্রায় প্রতিটি গল্পের নায়ক। জীবন বঞ্চিত তারা। মানসিক ক্ষয় ও মৃত্যুকে সামনে রেখে জেকবসেনের মত মনস্তত্ব বিশ্লেষণের মধ্য

দিয়ে গল্পগুলি লেখা। গল্প লেখা যদি না ছাড়তেন তাহলে রিলকে হয়ত মনস্বীতায় একদিন ডিকেন্সকেও ছাড়িয়ে যেতেন। যদিও তাঁর জীবন বাহ্যত ঘটনা বৈচিত্র্যহীন কিন্তু তীব্র অনুভূতিতে যেন আমাদের জীবনানন্দ দাশের মতই স্নায়ুতন্ত্রীগুলি উচ্চ টঙ্কারে বাঁধা। এবং প্রতিটি মুহূর্তের নিষ্ক্রান্তির কম্পনে স্পন্দিত। রিলকের কাব্য এক অনলস ভগবৎ অন্বেষা। দুঃখ দীর্ণ জীবনেই তাঁর ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন। পথ দিয়ে কুষ্ঠরোগী কেঁদে কুঁকিয়ে ভিক্ষে করছে, তিনি দেখছেন ঈশ্বরের এক করুণ রূপ।—মানুষের দিব্যসত্তায় প্রেম আকৃষ্ট হচ্ছে। রিলকের মতে এই ক্ষেমঙ্করী প্রেমই মৃত্যুকে শোধন করে। এবং সেই শাশ্বতী প্রেমেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ঈশ্বরকে তিনি দুই ভাবে দেখেছেন। তাঁর 'Geschichlen Vom lieben Goft' গ্রন্থে রিলকের ভগবান যেন পথভোলা বাউলের মত বস্তুর চঞ্চল রূপের আড়ালে নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন। ঈশ্বর যেন মানুষকে খুঁজছেন অথবা মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকে খুঁজছেন। আবার তাঁর 'Das Studentbuch' কাব্যে যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মানুষ দুর্ধর্ষ ভাবে অন্বেষণ করছে। জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে তাঁকে জয় করতে চাইছে। মানুষ তার আপন জীবনে নব নব রূপে দেবত্বকে রূপ দিতে চাইছে।

জীবনের পর্বে পর্বে তিনি এই ধ্যানসিদ্ধ বোধি লাভ করেছেন। এক আকুল অন্বেষা তাকে অস্থিরভাবে ঘুরিয়েছে নানা দেশে। ফ্লোরেন্সের নির্জন বেলাতটে প্রকৃতির অবাধ মুক্তির মধ্যে তিনি আত্মার ব্যাপ্তি অনুভব করেছেন। শিল্পী ভগলীর ও তাঁর আদর্শানুরাগী বন্ধুদের কাছে এসে জীবনকে দেখলেন চৈতন্যের লীলারূপে। লিখলেন তাঁর বিখ্যাত বই "দি বুক অফ দি মনাষ্টিক্ লাইফ্"। এরপর দুইবার রাশিয়া ঘুরে এলেন। worpswede-এ এসে এক স্থপতি-শিল্পী ক্লারার প্রেমে মুগ্ধ হলেন। দরিদ্র কবি বাঁধা পড়লেন মানবীর প্রেমে। সম্বলহীন কবির জীবনে এই প্রেম ও বিবাহ বৎসরাধিক কালও স্থায়ী হল না। দারিদ্রকে ভয় পেয়ে ক্লারা স্বামীকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। দেহে মনে এক দুঃসহ ভার নিয়ে তিনি এলেন প্যারিসে। অর্থের জন্য প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। শহরের প্রচণ্ড কোলাহলে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় জীবনের এক লাস্যময়ীরূপ দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে যান। "দি বুক অব্ প্রভারটি এ্যাণ্ড ডেথ্" এই সময়ে লেখা। তিনি অনুভব করলেন দারিদ্রের আরক্ত যন্ত্রণার মধ্যেই ভগবানের আসন পাতা।

জীবন এক সমাহিত প্রজ্ঞার বোধিদ্রুম। বৃক্ষ রিলকের কাছে জীবনের এক অন্তরঙ্গ প্রতীক। যার প্রাণরস বাস্তব মাটির বুকে অথচ পত্রপুষ্পের প্রাচুর্য্য নিয়ে রাজকীয় মহিমায় সে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

জীবন ও মৃত্যুকে একাসনে বসিয়ে এক পূর্ণত্বের উপলব্ধিকে বার বার ব্যক্ত করেছেন তিনি বৃক্ষের প্রতীকের সাহায্যে।

মৃত্যু তাই লয় নয়, পরিশুদ্ধ আত্মার "রেজাকেক্স্যান্"। রিলকের কবিতার মৃত্যু রহস্য অতি সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন সাধক পণ্ডিত শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। তিনি বলেছেন, "মৃত্যুর অপরূপত্ব রিলকে কাব্যের মূল সুর। মৃত্যু একটা অপশক্তি নয় যা ঘটায় দেহের অবসান শুধু। দেহের অবসান একটা নিবিড় উদার মহা মুক্তির লক্ষণ। মৃত্যুকে বার বার বলা হয়েছে মহামৃত্যু। মৃত্যুর স্পর্শ ঘুচায় পার্থিব ব্যক্তিত্বের বন্ধন,.... নাম রূপের সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে নিয়ে আসে বিশ্বের সকলের আধারের সঙ্গে সাম্য ও সমপ্রাণতা।"

ভারতে জাতীয় আন্দোলন

প্রথম প্রকাশের (১৯২৫) পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এর * দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে কয়েকমাস পূর্বে। এরকম একখানি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এত বিলম্বের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যতটা দড়, রাজনৈতিক আন্দোলনের আলোচনায় ঠিক ততটা তৎপর নই। এর কারণ দুরধিগম্য নয়। পরাধীন দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা আদর্শ আছে: দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য হৃদয়বান দেশবাসীর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তার জন্য যে কোন দুর্মূল্য দিতেও সঙ্কোচ হয় না। "পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি।" একথা তো আমাদের স্বাদেশিক আন্দোলনের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে, —তা সে গান্ধীবাদের অহিংস সত্যাগ্রহই হোক, আর বিপ্লববাদের অগ্নিমন্ত্রই হোক। লেখক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় গ্রন্থশেষে গ্রন্থপঞ্জীর তালিকায় প্রায় সাড়ে তিন শত লেখকের রাজনৈতিক বা ঐ জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যেখান থেকে তিনি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং এদেশে রাজনৈতিক সাহিত্যের যে খুব একটা অভাব আছে তা মনে হয় না।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে রচিত রাজনৈতিক গ্রন্থসমূহকে ঠিক পুরোপুরি রাজনৈতিক সাহিত্য বলা যায় না। কারণ তাতে স্বাদেশিক উত্তেজনারই প্রাচুর্য রয়েছে, সাহিত্যগুণ বা মৌলিক তত্ত্বনির্ধারণের চেষ্টা ততটা লক্ষ্যগোচর হয় না। অবশ্য এ-ও স্বীকার্য যে, তদানীন্তন দেশকালের পটভূমিকায় এর চেয়ে বেশি তথ্যবহ এবং নিষ্কাম দৃষ্টিতে লেখা জাতীয় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত রচিত হওয়াও এক দুষ্কর ব্যাপার। তখন ঘরের দ্বারপ্রান্তে আগুন ব্যাপ্তি লাভ করেছে; সেই মৃত্যুমারীর ছায়াপটে কি নিঃস্পৃহ ঐতিহাসিক চেতনার যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ স্বাভাবিক? তবু ইতিপূর্বে ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থ, প্রচার-পুস্তিকা, বিভিন্ন দল-উপদলের ঘোষণাপত্র, সরকারের নথিভুক্ত মামলা মোকদ্দমার বিবরণ, সাময়িক পত্রের উত্তেজনা, নানা সরকারী ও বেসরকারী কমিটীর প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে; এর ফলে ইদানীং খানিকটা কালের দূরত্বে যাঁরা বসে রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত রচনা করছেন, তাঁদের কর্তব্য অনেকটা সহজ হয়েছে। এখন বিদেশী শাসকের রাজদ্রোহ অভিযোগের কাঁচিটি অনুপস্থিত। আর তা ছাড়া সময়ের ব্যবধানে অনেক ক্ষতচিহ্ন ঢাকা পড়ে গেছে অনেক নীচতা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, অনেক উত্তেজনার রক্তিমা হ্রাস পেয়েছে। এখনই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত লেখার মাহেন্দ্রক্ষণ। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করে। এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল দীর্ঘকাল পরে স্বাধীন ভারতে। চিন্তা ও বাক্যের বাধা দেশী শাসনে নিশ্চয় মুক্ত হয়েছে এবং হওয়াটাই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ আজ যাঁরা ভারত শাসনের কর্ণধার, তাঁরাইতো একদা ব্রিটিশ শাসনের অর্ণবযানটিকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য তাঁদের বহু প্রকার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, প্রাণ দিতে

হয়েছে, মনুষ্যত্ব হারাতে হয়েছে। আজকে তাই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লেখার যথার্থ সময় এসেছে।

কিন্তু সময় এলেও তা ক্লক ওয়াইজ, না কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ, তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। সম্প্রতি এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যত ইতিহাস লেখা হচ্ছে, তার অধিকাংশই একদেশদর্শী, প্রাদেশিক, সংকীর্ণ, অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ; স্বাধীনতা লাভের পর ভারত-ঐক্যের দার্শনিক ভিত্তিকে শাসক সম্প্রদায় জখম করে দিয়েছেন। বিশেষ ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভারতের ঐক্যকে বিনাশ করার দিকে আজ এঁরা ঝুঁকে পড়েছেন। সরকারী উদ্যোগে স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে একখণ্ড মস্তবড় কেতাব শোভন আকারে ঘটা করে প্রকাশিত হয়েছে। ভুল তথ্য, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং বুদ্ধিহীন মূঢ়তার এমন নিপুণ সমাবেশ একখানি গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে ভারতসরকার একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সে যাই হোক, অধুনা সংকীর্ণ গণ্ডী আমাদের সমগ্র ভারতচেতনাকে যে বেশ কাবু করে ফেলেছে তা দিল্লীর "আবুহোসেন" সম্প্রদায় ছাড়া আর সকলেই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করবেন। সে অপকর্মটি ঘটেছে তাঁদেরই হাত দিয়ে, যাঁরা একদা ভারত ঐক্য রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। বিধাতার মার এমনি করেই শুরু হয়। নানা স্বার্থের খাতিরে যখন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখন তখন মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এ জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে চিরদিন শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন। কারণ এই অনতিবৃহৎ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাতে একদেশদর্শী সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিক বাহ্বাস্ফোট ঐতিহাসিক সত্যকে আচ্ছন্ন করেনি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলতঃ আধুনিক কালের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস। মোটামুটি ইংরেজ আমল থেকে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ধরণের জাতীয়তাবাদমূলক যে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমে ক্রমে প্রবল হতে থাকে, লেখক তারই মানচিত্র অংকন করেছেন। একটা দেশের রাজনৈতিক চেতনা, জাতীয়তাবোধ, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বাইরের কথা বিশ্লেষণ করতে গেলে তার মনের কথাও জানা দরকার। লেখক তাই রাজনীতি প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জীবন, মন ও প্রাণের গূঢ় এষণা, জীবনের ধ্যান ও আদর্শের পটভূমিকায় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশ আলোচনা করেছেন। কাজেই এই গ্রন্থ শুধু রাজনৈতিক দলিল হয়নি, ভারতবর্ষের মনোধর্মের নিপুণ বিশ্লেষণ এর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের পাঠশালায় আমরা প্রথম রাজনীতি ও জাতীয়তাবোধের পাঠ নিয়েছিলাম তা অস্বীকার করে লাভ নেই। প্রথম যুগে বণিক ইংরেজ রেশমকুঠির বিকিকিনি চালাবার জন্য নিতান্ত দায়ে পড়ে যখন দেশীয় লোকদের অল্পবিস্তর ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে শুরু করল, তখন সকলের অলক্ষ্যে একটা অদ্ভুত বিপ্লব সাধিত হল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ বা ফরাসী বিপ্লবের মতো তা সোচ্চারে নিজেকে ঘোষণা করেনি বটে, কিন্তু তার ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী, সুগভীর। একটা প্রাচীন প্রবীণ শ্লথবুদ্ধি বিরাট জাতির সমগ্র সত্তার আশ্চর্য জাগরণের জন্য ইংরেজী শাসন-শোষণ ও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ আসবার আগে মাটির প্রতি মায়া রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতিকে রাজনৈতিক সংহতি দান করেছিল, যার খানিকটা মধ্যযুগীয় "ক্ল্যানিশ" ও ধর্মৈষণাজাত। ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, ঠিক পাশ্চাত্ত্য ধরণের জাতী-

---

* ভারতে জাতীয় আন্দোলন ।। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ গ্রন্থম্ ॥ কলিকাতা-৬ ॥ ১০·৭৫ নঃ পঃ

য়তা বা বৈদেশিকতা পূর্বতম যুগে বিশেষ ছিলনা। অবশ্য মহাভারতে ভীষ্ম রাজনীতি সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলেছেন যা ইদানীন্তন যুগেও প্রণিধানযোগ্য। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের অন্তরালেও যে বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছিল, তা আজকাল অনেকে প্রমাণের চেষ্টা করছেন।

ভূমি নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং সমাজ-জনপদ-মানবমনে প্রভাব বিস্তারের আকাঙ্খা—এসমস্ত সব দেশেরই সাধারণ ব্যাপার এবং জাতীয়, স্বাদেশিকতা—এসমস্তই এই পথ দিয়ে আসে। প্রাচীন ভারতে আধুনিক ধরণের 'ন্যাশনালিজ্‌ম্' না থাকলেও একটা সমগ্র ভারত-বোধ প্রায় সকলেরই জানা ছিল। তাই প্রাচীন যুগে যাঁরা কোন নতুন কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই সারা ভারতের শ্রবণোপযোগী করে বলেছেন। সংস্কৃত সে যুগে সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা এবং সংস্কৃতির বাহক ছিল; তাই ধর্ম, আচার, নতুন মত—সবই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে প্রকাশ করা হ'ত। বুদ্ধদেব গণমানসে প্রবেশাধিকার চাইতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ ক'রে প্রাকৃতভাষার সাহায্য নিলেন, যার নাম পালি। কিন্তু পালিভাষা বিশেষ কোন আঞ্চলিক ভাষা নয়; যাতে সব অঞ্চলই এই ভাষা বুঝতে পারে, বুদ্ধদেব সেই ভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে যুগে শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল উত্তর-ভারতের শিষ্ট জনের পোষাকী ভাষা। বুদ্ধদেবের পালি এই শৌরসেনীর ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। বুদ্ধ-উপদেশ সকলের বোধগম্য হবার জন্যই তিনি এই সাহিত্যক কৃত্রিম ভাষার (Literary Dialect) সাহায্য নিয়েছিলেন। মহাবীর প্রভৃতি জৈন ধর্মগুরুরাও নিজ নিজ অঞ্চল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁরাও ভারতের দূর দূর অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন, সারা ভারতকে তাঁদের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন। মহাবীর তো বাঙলাদেশেও এসেছিলেন। সে যুগের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়-ধর্মগুরুদের প্রভাব এবং সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি সাহিত্য সর্বভারতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করেছিল। শংকরাচার্য যখন বৌদ্ধধর্মের কবল থেকে সনাতন আর্যধর্মকে আবার বাঁচাতে চাইলেন। তখনও তিনি শুধু মালাবার অঞ্চলে (তাঁর জন্মভূমি) থাকতে পারলেন না। কেন তিনি উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমা করলেন, কেনই-বা ভারতের চতুঃসীমায় চারটি মঠ স্থাপন করলেন? এই জন্য আমরা বলতে চাই যে, শাস্ত্রে, সংহিতায়, আচারে, ধর্মবিশ্বাসে—সর্বত্রই একটা ভারতবোধ ও ঐক্যচেতনা ছিল। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় প্রভাত বাবু যা বলেছেন, তা খুবই যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতে ধর্মনৈতিক ঐক্যবোধ থাকলেও, যাকে আধুনিক কালে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলা হয়, তা আধুনিক কালেরই সামগ্রী। একথা অযৌক্তিক নয়। তবে এ-ও ঠিক, প্রাচীনভারতের ধর্মনৈতিক ঐক্য আধুনিক কালের রাজনৈতিক ঐক্যের মতোই ক্রিয়াশীল, প্রাণবান ও সমাজ জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। য়ুরোপে মধ্যযুগে এবং তার পরেও যেমন রাষ্ট্রের সংগে চার্চের ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব থেকে রাষ্ট্রবোধ ও জাতীয়তার উদার চেতনা সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ে, ভারতবর্ষে ঠিক তার অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি। কারণ এদেশে ব্রাহ্মণের সংগে ক্ষত্রিয়সমাজ ও রাজতন্ত্রের ক্ষমতা নিয়ে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব প্রায় কোন সময়েই উগ্র হয়ে ওঠেনি।

পট পরিবর্তন হল ইংরাজ আমলে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। পাঠান ও মুঘল যুগে বিজয়ী রাজগণ এক-শাসনের আওতায় এনে গোটা ভারতবর্ষকে একটা শাসন-সংক্রান্ত ঐক্যে বেঁধেছিলেন। শেরশাহ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাঁচবছরের রাজত্বে কতটুকুই বা করা সম্ভব? সম্রাট আকবরই সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে এক ধরণের শাসন, রাজস্ব ও মুদ্রামানের সাহায্যে একসূত্রে গ্রন্থনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাও হয়েছিল শাসন-

কার্যের সুবিধার জন্য। মুঘলশাসনের অন্তিম পর্বে গোটা ভারত-চেতনাটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ল, আঞ্চলিক স্বার্থ উগ্র হয়ে ওঠার ফলে "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে"।

লেখক যদিও এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ কংগ্রেসের ইতিহাস ও বিবর্তন আলোচনা করেছেন, তবু গোড়ার দিকে কংগ্রেস-আবির্ভাবের পটভূমিকা অর্থাৎ উনিশ শতকের তিনচতুর্থাংশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে যে সমস্ত অবাঙালী লেখক কংগ্রেসের ইতিহাস বা জাতীয়তাবাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনকে হয় এড়িয়ে গেছেন, আর না হয় সুকৌশলে মিতভাষিতা অবলম্বন করেছেন। কারণ উনিশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার—এর সবটাই প্রায় বাঙালীর দান, অতএব অস্পৃশ্য। আমাদের লেখক "জাতীয় আন্দোলনের পটভূমি" অধ্যায়ে সে অভাব দূর করেছেন, প্রাদেশিকতার মর্যাদা রাখতে গিয়ে ইতিহাসকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করেননি।

রামমোহন থেকেই যথার্থ রাজনৈতিক আলোচনার শুরু। লেখক এ বিষয়ে ঠিকই বলেছেন, "রামমোহন যেমন জাতীয় আত্মচেতনা উদ্‌বোধিত করিবার গুরু, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনের জনক।" আমরা রামমোহনকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারক রূপেই প্রধানতঃ জানি। এ জানা অর্ধেক জানা। রামমোহন কঠোর বাস্তববাদী এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারী আধুনিক মানুষ ছিলেন। বস্তুতঃ প্রাচ্যভূমির প্রথম আধুনিক মানুষ হলেন রামমোহন। একেশ্বরবাদ, বেদ ও বেদান্তের কথা বললেও তাঁর মনোভাব আদৌ দেবেন্দ্রনাথের মতো নয়। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্ত ভক্ত, রামমোহন তীক্ষ্ম বুদ্ধিবাদী। রামমোহন যে একেশ্বরবাদ প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তার মূলে ততটা ধর্মৈষণা ছিল না, যতটা ছিল ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজের একীকরণের চেষ্টা। ১৮২৮ সালে তিনি ডাঃ টুকারম্যানকে লিখেছিলেন ঃ

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well calculated to promote their political interest. This distinction of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise." তাঁর এই উক্তিতে নবযুগের আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রামমোহনের সমকালে এবং পরে হিন্দুকলেজের ছাত্র ও ডিরোজিও-শিষ্যসম্প্রদায়—যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে ব্যঙ্গের পাত্র হয়েছিলেন, তাঁরাই যথার্থ পাশ্চাত্ত্য ধরণের রাজনীতির চর্চা করেছিলেন। এঁদের নেতা রামগোপাল ঘোষ এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম পরিকল্পনা করেন। আমাদের লেখক এবিষয়ে আর একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করলে ভাল হত, তা হলে, উনিশ শতকের রাজনীতি চর্চার ধারাটি আর একটু পরিস্ফুট হ'তে পারত। ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন দিক দিয়ে পুরাতনপন্থী হলেও তাঁর মধ্যেও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা-উত্তেজনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সাপ্তাহিক ও দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকরে' তিনি কঠোর ভাষায় ইংরেজশাসনের সমালোচনা করতেন। গুপ্তকবি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। তিনি আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা লাভ করতে না পারলেও যুগজিজ্ঞাসার দ্বারা যে পীড়িত হয়েছিলেন, তা তাঁর পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভ পাঠ করলেই বোঝা যাবে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। তাঁকেও আমরা পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জানি। তিনি রামমোহনের ধর্মসংস্কার ও বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং 'ধর্মসভা' নামক প্রাচীনপন্থী দলের নেতা ছিলেন। লেখকও তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "এই স্যার রাধাকান্ত দেব রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় পর্যন্ত সনাতনী হিন্দুদের উগ্র পৃষ্ঠপোষক ও হিন্দুসমাজের সকল প্রকার সংস্কারের বাধা স্বরূপ ছিলেন।" লেখকের এ মন্তব্য একটু নির্মম এবং ইতিহাস হিসেবে পুরোপুরি সমর্থনযোগ্যও নয়। রাধাকান্ত রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষীয় ছিলেন, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহও সমর্থন করতে পারেন নি, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ও জীর্ণসংস্কারকে সনাতন ব'লে মালাচন্দন দিয়েছেন। তাই ব'লে তাঁকে লেখকের ভাষায় পুরোপুরি 'পিছু চাওয়া', "পিছু হটা'র দলপতি বলে ছোট করা যায়না। হিন্দুকলেজের সংগঠন, ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, সিঁদুরিয়াপটীর হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের অধিনায়কত্ব, বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় উৎসাহদান, স্কুল সোসাইটীর পরিচালনা, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার, সংস্কৃত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে রাধাকান্ত যে কর্মোদ্যম, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, গঠনশক্তি ও আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন—একমাত্র রামমোহন-বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কারও মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর সব কর্মকে সহানুভূতির সঙ্গে লেখক বিচার করেননি, এটি তাঁর ঐতিহাসিক আলোচনার একটা ত্রুটি বলেই গণ্য করি। ঐতিহাসিককে নিঃস্পৃহ হতে হয়, ব্যক্তিগত প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে ইতিহাসের বস্তুগত বক্তব্যে ব্যক্তিগত রঙ ছড়িয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা সঙ্কোচের সঙ্গে নিবেদন করি। একথা ঠিক যে, এদেশে রামগোপাল ঘোষ সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অনেক পত্র-পত্রিকাদিতে ('জ্ঞানান্বেষণ', 'বঙ্গদূত', "সংবাদ প্রভাকর", "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর', "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ইত্যাদি) রাজনৈতিক আলোচনা চলছিল বটে, কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'দের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ সেই সমস্ত আলোচনাকে ইংরেজশাসনের সুকঠোর সমালোচনায় সংহত করলেন। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য সুচিন্তিতঃ "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।" 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক হরিশ মুখুজ্জের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা রূপে আবির্ভাব হয় রামগোপালের সামান্য কিছু পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নীল-আন্দোলনকে উপলক্ষ ক'রে।

কিন্তু রামগোপাল ঘোষ যাঁর থেকে যথার্থ আন্দোলনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন ইংরেজ—নাম জর্জ টমসন। বিলেতে এঁর সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব হয়। টমসন ছিলেন ইংলন্ডের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটীর একজন উৎসাহী সদস্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজে দাসত্বপ্রথার বিলোপ সাধনে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ইংলন্ডের নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন জর্জ টমসন। সুতরাং ইংলন্ডে তাঁর সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতা হতে বিলম্ব হয়নি। ১৮৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বারকানাথ টমসনকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। তখন কলকাতায় রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তরুণের দল টমাস পেইন আর এ্যাডাম স্মিথের গ্রন্থ পাঠ করে, ফরাসী বিপ্লবের আগুনে পুইয়ে এবং সাময়িক পত্রে উত্তেজনার পাল তুলে

দিয়ে মনে করছিলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বজপতাকাটা তাঁদের হাতেই এসে গেছে। টমসন এদেশে এসে এই তরুণদলের সঙ্গে মিলিত হলেন, এ'দের চোখ থেকে রোমান্টিক রাজনীতির মায়াঞ্জন কেড়ে নিয়ে বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম দীক্ষা দিলেন। তিনি তরুণসম্প্রদায়কে রাজনৈতিক দল বা সমিতি গড়ে তুলতে উপদেশ দিলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় ১৮৪৩ সালে ২০শে এপ্রিল 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দিন গৃহীত এর তৃতীয় প্রস্তাবটিতে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ

"That a Society be now formed, and denominated the Bengal British India Society, the object of which shall be the collection and dissemination of informa-ation, relating to the actual condition of the people of British India, and the laws and institutions, and resources of the country, and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure welfare, extend the just rights, and advance the interests of all classes of our fellow-subjects." এই প্রস্তাবে টমসনের হস্তক্ষেপ থাকাই সম্ভব। ১৯শ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলন আলোচনা করতে হলে জর্জ টমসনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। শ্রদ্ধাস্পদ লেখক টমসনের উল্লেখ করেননি।

১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি নানা মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কেউ একে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রথম শুভসূচনা বলে গ্রহণ করেছেন, কেউ-বা একে গৌরবের পুষ্পদলে অভিনন্দিত করতে কিছু নারাজ। লেখক খুব সংক্ষেপে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করেছেনঃ "বিদ্রোহের মূলে বিদ্বেষ ছিল, পরিণামের কোনো ধারণা কাহারও ছিল না।" তাঁর আর একটা উক্তি ঐতিহাসিকের চিন্তা উদ্রেক করবে ঃ "ভারতের শিক্ষিত সমাজ কি হিন্দু কি মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান তো করেই নাই, বরং ইহার বিরোধিতাই করিয়াছিল।" যাঁরা সিপাহিবিদ্রোহকে সুলভ ভাবালুতার হাওয়ায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে চান, তাঁরা লেখকের মন্তব্যের পুনর্বিচার করে দেখতে পারেন।

কেমন করে হিন্দুকলেজের সদ্য পাশ করা তরুণদের বায়বীয় রাজনীতি চর্চা ধীরে ধীরে আন্দোলনে পরিণত হ'ল, কেমন করেই-বা সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল-আন্দোলন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এদেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের ব্যবধান ঘুচে গেল, লেখক খুব সংক্ষেপে তার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) থেকেই যে যথার্থ রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম, সে সম্বন্ধেও লেখক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঠাকুর বাড়ীর তরুণ দল, যুবক নবগোপাল মিত্র ও প্রবীণ রাজনারায়ণ বসুর চেষ্টায় এই মেলার বার্ষিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। হিন্দুকলেজের তরুণেরা যখন চাকুরী পাবার জন্য আন্দোলন করছেন, তখন এই মেলার উদ্যোগীরা সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, মনুষ্যত্ব—সমস্ত কিছুকে এই মেলার মারফতে এক সঙ্গে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নিছক পাশ্চাত্ত্য ঘেঁষা রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল সুরেন্দ্রনাথ আই. সি. এস. কর্ম থেকে বরখাস্ত হবার পর। তাঁর নেতৃত্বে এবং রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬) "হিন্দুমেলা'র ঠিক নয় বৎসর পরে। এইবার রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হ'ল। আর শুধু বাঙলা দেশ নয়, গোটাভারতে নতুন চেতনার উদ্দীপনা সূচিত হ'ল। গ্যারিবল্ডি, মাৎজিনি, কাভুর বিসমার্ক—এ'রাই হলেন নতুন আন্দোলনের আদর্শ।

এর কয়েকবছর পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)। লেখকের বর্ণনার পটভূমিকা এর পর বিস্তার লাভ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনা, আন্দোলন—এ সমস্তই প্রায় বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হবার পর থেকে গোটা ভারতবর্ষ হ'ল জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকা। রাজনৈতিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লেখক বাঙলা ও মহারাষ্ট্রের সমাজনৈতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণের পরিচয়ও দিয়েছেন। বাঙলা দেশে ১৯শ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে এবং মহারাষ্ট্র নবম দশক থেকে পুরাণাশ্রয়ী হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র ক'রে গোটা সমাজে একটা বড় রকমের জাগরণ সূচিত হয়। বাঙলায় ব্রাহ্মমত ও সম্প্রদায় ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেলে হিন্দুর পুরাণপ্রধান স্মার্ত মতবাদ আবার দৃঢ়মূল হ'ল বঙ্কিমগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায়—যার স্বাভাবিক পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। মহারাষ্ট্রেও গণপতি উৎসব ও ভবানীপূজাকে কেন্দ্র করে তিলক, চাপেকর দুভাই ইত্যাদি দেশনেতারা নানা-উপসম্প্রদায়ে-বিভক্ত হিন্দুসমাজে ঐক্য ও সংহতি আনতে চেয়েছিলেন। ফলে হিন্দুসমাজের যে-অংশটুকু সনাতন মত ও আদর্শে আস্থাবান ছিল, তাদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিল। ভারতের প্রাচীন আদর্শ-যাকে সায়েবরা ঘৃণা করত, তা যে ঘৃণার যোগ্য নয়, তিলক তার প্রমাণ ছিলেন; প্রমাণ করলেন বাঙলার বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় মনীষী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ ('শ্রী অরবিন্দ') ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ ক'রে পুরোপুরি পুরাণবিশ্বাসী হিন্দু হলেন এবং মহারাষ্ট্রের ভবানীপূজোর আদর্শে নিজেও ভবানী আরাধনা ক'রে শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হলেন। যেহেতু ঐ যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রায় সবটাতেই হিন্দু সমাজ হাত লাগিয়েছে এবং যেহেতু স্যর সৈয়দ আহমদের সুচতুর বিষক্রিয়া মুসলমান সমাজকে হিন্দু প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে, সেই হেতু কেউ কেউ এই 'হিন্দু রিভাইভাল'—কে বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখেন না। আমাদের লেখকও ১৯শ শতকের হিন্দুসমাজের পুনর্জাগরণকে নিছক 'হিঁদুয়ানি' বলে মনে করেন। তিনি এই ব্যাপারের প্রতি মোটেই প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারেননি। কাজি আবদুল ওদুদও তাঁর 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে অনুরূপ দৃষ্টিক্ষীণতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রসঙ্গেও আমাদের লেখক কিছু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন ব্রহ্মবান্ধবের প্রতিভা ও চরিত্রকে দুকথায় বিশ্লেষণ করা যায় না। তাঁর মধ্যে ঈষৎ উৎকেন্দ্রিকতা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম ওঅম্লান বীর্য রবীন্দ্রনাথেরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, একথাও পূজ্যপাদ লেখকের স্মরণ রাখা উচিত ছিল।

উনিশ শতকের শেষ দুই দশকের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে একথা না মেনে উপায় নেই যে, অনুরূপ দেশ ও কালের স্বাদেশিক আন্দোলনে হিন্দুভাবধারার কিছু অতিরেক ঘটাই স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সমাজ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুতর ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। প্রায় তাঁদের চেষ্টাতেই ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ পারস্পরিক কলহের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ল, ত্রিধা বিভক্ত হয়ে গেল। উপরন্তু এঁরা যে সংস্কার ও সংগঠন পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে গোটা জাতির অনেক সময় মানসিক যোগাযোগ ঘটতে পারত না। ব্রাহ্ম সমাজ যেন ক্রমে ক্রমে প্রভাব হারিয়ে ফেলল, সে সম্বন্ধে লেখক মনে করেন ঃ "যুক্তিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উগ্রতা ও এমন-কি নাস্তিকতার জন্ম। ইহার ফলে ব্রাহ্ম সমাজীবনে সঙ্ঘশক্তির অবনতির সূত্রপাত।" যুক্তিবাদ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্ঘশক্তি বিনষ্ট করেছে—একথা যুক্তিশাস্ত্রবিরোধী। বরং যুক্তিবাদের প্রতি আনুগত্য ছিল বলেই ব্রাহ্মসমাজ তরুণ শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পেয়েছিল। আসল কথা,

ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ তারালোক থেকে সংস্কারের ধারা ঢেলেছিলেন, পঙ্ককুণ্ডে নেমে জাতির মন ও চেতনাকে রাঙিয়ে দিতে পারেন নি। কাজেই বঙ্কিম প্রমুখ জ্ঞানবাদী হিন্দু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভৃতি আবেগবাদী হিন্দুদের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ক্রমেই খর্ব হতে আরম্ভ করে।

এর পরে এই গ্রন্থে কংগ্রেসের নেতৃত্বে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত পন্থা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগদান, কংগ্রেসের মধ্যে রুদ্রপন্থী ও নরমপন্থীদের মতভেদ, সুরাট কংগ্রেসে কুৎসিত দলাদলি ইত্যাদির বর্ণনা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নিঃস্পৃহ দৃষ্টি সম্বন্ধে লেখক প্রায় সব সময়ে সতর্ক বলে বিতর্কমূলক অংশেও তিনি আশ্চর্য নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছেন।

কংগ্রেসের যথার্থ যুগান্তর উপস্থিত হল মহাত্মা গান্ধীর পর (১৯১৮)। গান্ধীজি জাতীয় আন্দোলনকে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন, জনসাধারণকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করলেন। ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গ, কংগ্রেস বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন—এ সমস্তই ছিল অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যাপার। মহাত্মাজি ভারতের মূক জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের সৈনিকরূপে গঠন করলেন। চিত্তশুদ্ধি, সত্যাশ্রয়, অহিংসা—এর সাহায্যে ভারত স্বাধীনতা ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করুক, এই ছিল মহাত্মার পথ। যথার্থ গণবিপ্লবের পরিকল্পনা এবং তাকে কার্যে প্রয়োগ করার জন্য নতুন আদর্শ ও নীতি নির্ধারণ মহাত্মার বড় দান। কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে শাসক সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ভীত হয়ে পড়েছিল, এবং তার প্রতিবিধানকল্পে তারা কি কি চণ্ডনীতি প্রয়োগ করেছিল, তার ইতিহাস এখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি। 'রাজনীতি দুর্বৃত্তদের শেষ আস্তানা'—এই পশ্চিমী প্রবচনকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্যই মহাত্মাজির জীবন পণ। একটা মহৎ জীবনাদর্শ ও চরিত্রনীতিকে আশ্রয় করলে তবেই সমস্ত আন্দোলন সার্থক হয়; সত্য অহিংসা শুধু উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নয়; জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয় ও অহিংসাব্রত একমাত্র শরণ্য। আধুনিক পার্টি-কলুষিত রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মার এটাই সব চেয়ে বড় দান।

অবশ্য একথাও ঠিক যে, মহাত্মাজি রাজনীতিতে যে সৎজীবন ও নীতি আদর্শ আনতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা' আর অটুট থাকেনি। সামান্য কারণে অহিংস জনতা হিংস্র হয়ে মহাত্মার আন্দোলনকে অনেক সময় শুরুতেই নষ্ট করে দিত। ফলে অনেক সঙ্কট মুহূর্তে আন্দোলনের প্রচণ্ড জোয়ারকে মহাত্মা নিজেই নষ্ট করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তার ওপরে সারা দেশে হিন্দু মুসলমানের আড়াআড়ি তো ছিলই। হিন্দুসমাজের দ্বারা অন্যশ্রেণীর প্রতি স্বতই সঙ্কীর্ণ; মুসলমান দীর্ঘদিন ধ'রে হিন্দুর পাশে বাস করলেও সাধারণ হিন্দু মুসলমানকে অন্তর থেকে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমানও "দার্-উল্-হার্ব্-"কে নিজ মাতৃভূমি বলে কদাচিৎ স্বীকার করেছে। ফলে দীর্ঘকাল থেকে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জমে উঠেছিল। নেতৃবৃন্দ বুঝিয়েছেন যে, ভারতমাতার দুই সন্তান হিন্দু আর মুসলমানকে ইংরেজই পরস্পরের শত্রু বানিয়েছে। কথাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে অবিশ্বাসের ধারা বহমান না থাকলে ইংরেজ এত সহজে প্রবলবিরোধের ঢেউ তুলতে পারত না। তাই গান্ধীজি হিন্দুমুসলমানকে খোলামনে মেলাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এবং সেই চেষ্টাতেই প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু এর

প্রারম্ভেই কয়েকটা ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুমুসলমানের বিরোধটা আসলে কোথায়, তা তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন নি, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মধ্যযুগীয় খিলাফত আন্দোলনকে হিন্দুরও আন্দোলন বলে চালিয়ে দেন এবং এইভাবে হিন্দুমুসলমানের মিলনের পরিকল্পনা করেন। রাজনীতিতে এইভাবে মধ্যযুগের ধর্মোম্মদনা এনে তিনি ভারত-বিভাগের পথ খুলে দেন। আমাদের লেখক অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে বলেছেন, "এখন মুসলমানদের দলে পাইবেন এই ভরসায় খিলাফত আন্দোলনের একটা অলীক, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রবহির্গত ব্যাপারে হিন্দুদের লিপ্ত করিলেন।..তুর্কীর সমস্যাটাকে রাজনীতির দিক হইতে না দেখিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গোঁড়ামির দিক হইতে বিচার করিলেন; সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিয়া গান্ধীজি ভারতের রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে আনিয়া ফেলিলেন। ...... খিলাফত আন্দোলনকে 'ন্যাশনাল' বা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত মিশাইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে জটিল করিয়া তুলিবার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গান্ধীজির। আশু ফললাভের আশায় মধ্যযুগীয় ধর্মমূঢ়তার ইন্ধন দিলে যাহা অতি অবশ্য-ম্ভাবী পরিণাম তাহাই হইল ভারতের ভাগ্যে।" লেখকের এ মন্তব্য যে কত নির্ম্মমভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে তা আধুনিক ভারতবর্ষকে দেখলে বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ খিলাফত প্রভৃতি ধর্মীয়ব্যাপারের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন, তিনি এই সমস্ত অশুভ পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক বার নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগের বিষময় পরিণাম কবিগুরু কোন দিন সুদৃষ্টিতে দেখেননি। গান্ধীজি তাঁকে 'গুরুদেব' বলতেন, কবিও মহাত্মাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তবু তিনি গান্ধীজির সব কর্ম-পন্থা অনুমোদন করতেন না। খিলাফত আন্দোলন এবং ধর্মীয় অন্ধতাকে রাজনৈতিক সুবিধা-অর্জন ও উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সত্য, অহিংসা—এগুলি ভারতের চিরকালের জীবনধর্ম। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকগুরুগণ তাঁদের মহৎ চরিত্র ও পবিত্র কর্মপন্থার দ্বারা সাধারণ মানুষকে মহত্তর জীবনাদর্শের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত মহৎ মানবধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর পবিত্র চারিত্রনীতি তাঁর সব অনুচর বর্গের ছিলনা, কাজেই সত্যাগ্রহ, অহিংসা, অসহযোগ শেষ পর্যন্ত জবরদস্তি ও মানসিক পীড়নে পর্যবসিত হত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন সংশয় না রেখে স্পষ্ট ভাবেই গান্ধীজির নীতির ত্রুটি দেখিয়েছেনঃ

"No doubt through a strong compul sion of desire for some external result, men are capable of repressing their habi tual inclinations for a limited time, but when it concerns an immense multide of men different traditions and stages of culture, and when the object for which such repression is exercised needs a prolonged period of struggle, complex in ch aracter, I cannot think it possible of attainment."

রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও অহিংসার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের কাছে ভয়াবহ মনে হয়েছিল। চরখা সম্বন্ধেও তিনি যুক্তিপূর্ণ সংশয় তুলেছিলেন। যাই হোক লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে স্বরাজ্যদল, আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী বিশৃংখলা, গোলটেবিল বৈঠক, হিন্দু-মুসলমান-অনুন্নত হিন্দুসমাজের টানা পোড়েন থেকে শুরু ক'রে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। প্রয়োজন স্থলে তিনি স্পষ্ট কথা বলেছেন, সত্য গোপনের বা রূপান্তরের চেষ্টা করেন নি—আজকালকার দিনে এ একটা দুর্লভ গুণ। শেষাংশে তিনি

দুটি পৃথক অধ্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টি ও ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। আগামী কাল যাঁরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস লিখবেন এই গ্রন্থ তাঁদের কাছে দিগ্‌দর্শনী হয়ে থাকবে।

অবশ্য এরকম বিচিত্র ও জটিল বিষয় সম্পর্কিত রচনায় লেখকের সঙ্গে পাঠকের কোন কোন স্থলে মতভেদের অবকাশ আছে। যেমন অনেকেই বলবেন, এই গ্রন্থ মূলতঃ কংগ্রেসের ইতিহাস হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন বলতে তো শুধু কংগ্রেস বা কংগ্রেস-ঘেঁষা আন্দোলনকেই বোঝায় না। কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের যে চূড়ান্ত গৃহভেদ হয়ে যায়, কালক্রমে সে বিভেদ মিটলেও নীতি ও মতবাদগত আদর্শ সব সময়েই কংগ্রেসের মধ্যে ছিল—যার থেকে কংগ্রেসের মধ্যেই বামপন্থী মতের আবির্ভাব হয়। কংগ্রেসী লেখকগণ বামপন্থী মতের উত্থানকে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যান, যেহেতু বামপন্থীরা গান্ধীবাদে ততটা আস্থাশীল নন। এইজন্য তাঁরা একদা সুভাষচন্দ্রের প্রতি নির্ম্মম ও নীচ ব্যবহার করে-ছিলেন—যার তুলনা অন্যত্র বিরল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই যে বামপন্থী পন্থা প্রাধান্য পাবার চেষ্টা করছিল, আমাদের লেখক তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার তাৎপর্য ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনায় অগ্রসর হননি। কিন্তু একথা ঠিক বামপন্থী আন্দোলন সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা না থাকলে দেশের জাতীয়তার ধারাও বোঝা যাবে না। উপরন্ত লেখক বিপ্লববাদের প্রতিও প্রসন্ন হতে পারেন নি। খুঁটিয়ে দেখলে এই রকম দুচারটি প্রতি-বাদযোগ্য ব্যাপার চোখে পড়তে পারে। যাই হোক এ সব কথা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার। তাঁর এই গ্রন্থটি পাঠকের অনেক ভুল ধারণা দূর করতে সাহায্য করবে। বাঙালী পাঠক এটি পড়ে উপকৃত হবেন। বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয়, যাঁদের দাক্ষিণ্যের দ্বার সম্প্রতি বাঙালীর মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা এই বই পড়বার বা জানবার সুযোগ পেলে হয়তো বন্ধ দুয়ার ঈষৎ মুক্ত করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থটিতে লেখক দেখিয়েছেন, নানা বাদপ্রতিবাদ, বিরোধিতা, অত্যাচার সত্ত্বেও কংগ্রেস একদা সারা ভারতকে ঐক্যসূত্রে সার্থকভাবে মিলিত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের যে হানিকর রূপান্তর হচ্ছে, সমস্ত দেশটা দাবার ছকের মতো বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, তার বিষময় ফল সম্বন্ধে লেখক মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ উক্তি করেছেন। ভাষাকে ভিত্তি ক'রে একভাষী কর্তৃক অপর ভাষীর স্বার্থে হস্তক্ষেপ, সংখ্যাধিক্যের চাপে সংখ্যাল্পের সংস্কৃতির বিনাশ (যেমন মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্য)—এর ফল কখনও শুভ হবেনা। দীর্ঘ-কালের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, সারা ভারত বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যেও নিজ ঐক্যবোধটি বজায় রেখেছিল, স্বাধীনভারতে ক্ষুদ্র স্বার্থের নীচতা সেই ঐক্যকে বিচূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে অধুনাতন রাজনীতির স্বার্থপরিকীর্ণ নীচতা এবং ভাবী ভারতের বিষণ্ণ চিত্রটি থাকলে ভাল হত। সে যাই হোক, প্রবীণ লেখক আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্যই সমগ্র জাতি তাকে অন্তর থেকে সাধুবাদ দেবে। আমাদের তো মনে হয় অবিলম্বে 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন'—এর হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ হওয়া উচিত। সরকারী তনখার বিনিময়ে যাঁরা মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে ভারত ঐক্যকে বিনষ্ট ও ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ যাতে জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে ভুল ধারণা না করে, এই জন্যই এই গ্রন্থের ভাষান্তর হওয়া উচিত।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রের স্বাধিকার

"ফ্রিডোম অফ দি প্রেস ইজ এসেন্সিয়াল টু পলিটিক্যাল লিবার্টি, হোয়ার মেন ক্যাননট ফ্রিলি কনভে দেয়ার থটস্ টু ওয়ান এ্যানাদার, নো ফ্রিডোম ইজ্ সিকিওর। হোয়ার ফ্রিডোম অফ এক্স-প্রেসন এক্সিটস, দি বিগিনিংস অফ এ ফ্রি সোসাইটি এ্যান্ড এ মিন্স ফর এভরি রিটেনসন অফ লিবার্টি আর অলরেডি প্রেজেন্ট। ফ্রি এক্সপ্রেসন ইজ দেয়ারফোর ইউনিক এ্যামং লিবার্টিস।" (ফ্রেম দি রিপোর্ট অফ দি আমেরিকান কমিশন অন দি প্রেস)

অতন্দ্র প্রহরাই যেমন স্বাধীনতার প্রাণকেন্দ্র--তেমনি তীব্র, কঠোর ও গঠনমূলক সমালোচনাই সংবাদপত্রের প্রাণকেন্দ্র। সাধারণতঃ এই সমালোচনা এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আচরণ বা কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, যেখানে জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটি জড়িত, অথচ ঐ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি।

কিন্তু কাগজে কলমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শ রক্ষিত হলেও, বাস্তবে সে আদর্শ বহুদূর। সরকারী কালাকানুনের খড়্গ সেখানে সাংবাদিকের কলমকে সর্বদা সন্ত্রস্থ করে রাখে।

এই আইনের নাম ডিফামেশন বা মানহানি সংক্রান্ত আইন। সরকারী আমলাতন্ত্রকে সমালোচনার ঊর্দ্ধে রাখবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার আর অন্ত নেই।

১৯৫৪ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে পাশ হয়েছে এই ধরণের একটি আইন। এই আইন বলে কোন সাংবাদিক যদি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করে, তাহলে ইচ্ছা করলেই সরকারী পক্ষের কৌঁসুলি ঐ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবেন। প্রেস কমিশন এই আইনের বিরোধিতা করেছিল।

১৯৫১ সালে ফিলিপাইনের সুপ্রীম কোর্ট এই ফতোয়া জারি করে যে, সরকারের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা যে কোন রকম কঠোর আক্রমণ চালালেই, তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা হবে। ঐ বছর আর একটি সরকারী আদেশে বলা হয় যে, কোন বিদেশী সাংবাদিক এই দেশের শাসক বা পার্লামেন্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কিছু লিখলেই তাকে কোনরকম অভিযোগ খন্ডনের অবকাশ না দিয়েই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য পরে এই প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার দুজন সংবাদপত্র সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরাধ তাঁরা স্থানীয় প্রশাসক কর্তৃপক্ষদের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে "তেকাদ" নামে একটি দৈনিকের সম্পাদক মুসাকে বিনা বিচারে কয়েকদিন হাজতে রেখে দেওয়া হয়। টুগাস কাগজের সম্পাদকের ভাগ্য আরও করুণ ছিল, তাঁকে সাধারণ চোর ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ল্যাটিন আমেরিকার চিলির 'দেসাকোটো' আইনটির কথা এখানে উল্লেখ্য। দেসাকাটো শব্দটির অর্থ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যদি কোন সাংবাদিক কিছু মন্তব্য করেন, তাহলেই তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে বলা হয়। এখানে ঐ সাংবাদিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হবে না। পেরুর পুলিশ আইনের ২৯৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পেরুর সঙ্গে যে সকল দেশের সম্পর্ক খুব ভাল, ঐ সকল দেশের সমালোচনা করলে, তাকে অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। আর্জেন্টিনার সমালোচনা করার জন্য ১৯৫২ সালে পেরুর 'লা প্রেনসা' কাগজের সম্পাদক অভিযুক্ত হন।

দেশের নিরাপত্তা বিঘ্ন হবে, এই অজুহাতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার দৃষ্টান্তও খুব

বিরল নয়। ভারতীয় পুলিশ আইনের ১২৪ (এ) ধারায় বলা হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণের ঘৃণা জন্মাতে পারে এই ধরণের কোন খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৯৫৩ সালে শিখ আন্দোলনে পাঞ্জাব সরকার কয়েকজন সংবাদিককে এই আইন বলে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৫৪ সালে ভারতীয় প্রেস কমিশন এই আইনের পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। এই ধরণের আইন বলে পাকিস্তানেও সাংবাদিকদের ওপর সরকারী খড়্গাঘাত নেমে এসেছে। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচী ইভনিং টাইমসের সম্পাদক জে. এ. সুলেরি কে কারারুদ্ধ করা হয়। শুধু সম্পাদক নন, ঐ কাগজের প্রকাশক ও কার্টুনিস্টের ভাগ্যেও এই কারাবাস জোটে। ১৯৫২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এই কাগজে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। এই অপরাধে ৮৩ দিন কারাবাস হয় তাঁদের। পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন ও কমন-ওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

গোপন সরকারী তথ্য উদ্ঘাটিত করবার অপরাধেও সাংবাদিকের কণ্ঠরোধ করবার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। পশ্চিম জার্মানীর পুলিশ আইনের ৩৫৩ নং ধারায় আছে (নাজি আমলে এই ধারা যুক্ত হয়েছিল, আজও তা সংশোধিত হয়নি) কোন সরকারী গোপন তথ্য কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তা অপরাধ জনক বলে বিবেচিত হবে এবং আদালত ঐ অভিযুক্ত সাংবাদিককে কোন সূত্র থেকে সে সংবাদটি পেয়েছে তা জানাতে বাধ্য করতে পারবে। * ১৯৫১ সালে হামবুর্গের সাংবাদিক রবার্ট প্লাটাও'র ওপর এই আইন প্রয়োগ করা হয়।

প্লাটাওর ছিলেন অর্থনৈতিক সংবাদদাতা। ১৯৫১ সালে তিনি সরকারী দপ্তরের একটি গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। খবরটি তিনি বে-আইনী ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন, এই অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন আগে বনের সাংবাদিক এ্যালবার্ট স্কুলজিকেও গ্রেপ্তার করা হয়, এই অপরাধে।

এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে জার্মানীর সংবাদপত্রগুলি তখন থেকে মুখর হয়ে ওঠে। পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্যও এর প্রতিবাদ জানাল। অবশেষে এই আইনটির কঠোরতা কিছু হ্রাস করা হয়।

ফ্রান্সের পুলিশ আইনের ৮১ ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন গোপন সামরিক তথ্য প্রকাশ করলে তা শ্যাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, ঐ ৮৬ নং ধারায় বলা হয়েছে কোন রকমের সামরিক তথ্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করা চলবে না, ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্স অবজার ভার নামে একটি সপ্তাহিক পত্রের সম্পাদককে এই অপরাধে কারারুদ্ধ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তিনি একটি প্রবন্ধে ইন্দোচীনের যুদ্ধের ব্যাপারে ফরাসী সরকারকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর এই কারাদণ্ডের ব্যাপার নিয়ে তাঁর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। সাংবাদিককে সংবাদের সূত্র প্রকাশে বাধ্য করা নীতিগত দিক থেকেও যে ঘৃণ্য সে কথা আগেই বলেছি। কতগুলো দেশে যেমন—সুইডেন, অস্ট্রিয়া ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের ১২টি স্টেটের আইনে লিপিবদ্ধ আছে যে, সাংবাদিককে আদালত বা পুলিশ তার সূত্র প্রকাশে বাধ্য করতে পারবে না। চিলি ও ইন্দো-নেশিয়ায়ও এই ধরণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এখনও পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক দেশে* আদালত সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত ভাবে সাংবাদিকের মৌলিক অধিকার হরণ করে চলছে। ১৯৫০ সালে পশ্চিম জার্মানীর হ্যানোভারে হের ক্যালেনবাক নামে একজন সাংবাদিককে তাঁর লেখা এক সংবাদের সূত্র প্রকাশে অস্বীকৃত হওয়ায় কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ক্যালেনবাক এক পুলিশ কনেস্টবলের কাজ থেকে এক রহস্যজনক দুর্ঘটনা গোপন বিবরণ সংগ্রহ করেন। আদালত কনেস্টেবলটির নাম

জানাবার জন্য ক্যালনবাককে বলে। তা না জানাতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালে আর একজন জার্মান সাংবাদিকের ভাগ্যেও এই রকম কারাবাস জোটে। ১৯৫২ সালে হমারসন নামে এক ডাচ সাংবাদিককে নেদারল্যাণ্ডে এই একই অপরাধে কারারুদ্ধ করা হয়। ঐ বছরই নরওয়ের হারস্টাড ফোকাভিলজেন নামে সাংবাদিক একই অপরাধে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫০ সালে জাপানের আসাই অঞ্চলের এক রিপোর্টারের ভাগ্যে এই ভাবে কারাবাস জোটে। ফিলিপাইনে ১৯৪৯ সালে ও ১৯৫৪ সালে দুজন সাংবাদিককে কারারুদ্ধ করা হয়। অভিযোগ সেই একই। ১৯৫৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার আর একজন সাংবাদিকের ভাগ্যে এই অবস্থা হয়। অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলসে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে একটি আইন পাশ হয়। আইনে বলা হয় যে, শহরের যে কোন সংবাদপত্র প্রয়োজন হলে সরকারের কাছে সূত্র প্রকাশ করতে বাধ্য থাকতে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করবার জন্য কায়েমীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রচেষ্টার আর দুটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমান পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটাব।

ইতালিতে কোন সাংবাদিক সামরিক বিভাগের কাজের সমালোচনা করলে, তাকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। ১৯৫৩ সালে একটি ইতালিয়ান ম্যাগাজিনে গ্রীসে ইতালিয়ান সৈন্যের কার্যকলাপের সমালোচনা করার দরুণ দুইজন সাংবাদিককে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সালে দুজন ইতালিয়ান সাংবাদিককে কোন একটি সামরিক অভিযানের সমালোচনা করার অপরাধে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এদিক থেকে সবচেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৫৩ সালে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁরা সাংবাদিকদের লাঠিপেটা করে ছেড়ে দেন। সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী জুলুমের এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাংবাদিককে তার সংবাদের সূত্র প্রকাশ করতে বাধ্য করা সংবাদপত্র জগতের নিয়ম অনুসারে অত্যন্ত নীতি বিগর্হিত কার্য।

* আমি সংবাদপত্রের স্বাধিকার বলতে গণতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্র বুঝি। কমিউনিস্ট দেশগুলি আমার আলোচনার আওতার বাইরে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ।। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। ৫.০০ টাকা

যিনি যথার্থ কবি, তিনি দেশের জলবাতাসমাটিকে কখনো অস্বীকার করতে পারেন না—তাকে স্বীকরণ করতেই হবে। কবি যতো বড়োই হোন না কেন, প্রতিবেশকে তিনি পেরিয়ে যেতে পারেন—কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারেন না; অতিক্রম করতে পারেন—অস্বীকার করতে পারেন না। বরং কবি যতো বড়ো হবেন ততোই এই স্বীকরণ তাঁর মর্মমূল পর্যন্ত প্রসারিত হবে। যেমন সাতটি ভিন্ন বর্ণ আত্মসাৎ করেই সূর্যদেব শুভ্র জ্যোতির আকর, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মহান প্রতিভাও দেশকালের বিভিন্ন বর্ণ আত্মসাৎ ক'রেই এতো শুভ্রোজ্জ্বল। এই বিচিত্র প্রতিভা প্রাচীন ভারতের দর্শন কাব্যকে যেমন আত্মসাৎ করেছে, তেমনি করেছে প্রাচীন বাংলার অন্তর সম্পদগুলিকে। একদিকে উপনিষদের কাব্যময় মননশীলতা আর কালিদাসের মননসমৃদ্ধ কাব্যময়তা অপরদিকে বৈষ্ণব কবির সমাজবন্ধনছেদী আবেদন যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধারাকে পুষ্ট করেছে এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন—'এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি।' বাঙালীর মানসমুক্তির সহজ পথের কথা বলতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথও অনুরূপ কথাই বলেছেন—

> কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
> মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতোগুলি,

বাঙালীর মানসগঠনে কীর্তনগানের তথা পদাবলীর প্রভাব অপরিমেয়।

রবীন্দ্রনাথও এ-প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নাই। এখানে অবশ্য একটি কথা স্মরণযোগ্য। কবি বলেই বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যরূপটি রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে উদ্বোধিত করেছে কিন্তু বৈষ্ণবধর্মসাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নাই। ভাবোদ্বেল বৈষ্ণবের প্রগল্‌ভ প্রমত্ততাকে ঔপনিষদিক প্রভাবপুষ্ট শান্তরসের সাধক রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই শ্রদ্ধার আসন দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথও এ-কথা নানাস্থানে স্বীকার করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন—'পদাবলী কেবল সাহিত্য নয়, তার রসের সীমানায় মধ্যে আমার মন স্বাভাবিক স্বাধীনতার সংগে বিচরণ করতে পারেনা। বৈষ্ণবকাব্য সম্বন্ধে তাঁর সেই বিখ্যাত প্রশ্ন কে না জানে—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?' কিন্তু যথার্থ কবিধর্মের অমোঘ আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর মণিমন্দিরে প্রবেশ ক'রে আহরণ করে এনেছেন পদরত্নাবলী। এই পদরত্নের বিভায় তাঁর সমগ্র সৃষ্টি কীভাবে কোথায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, তারই সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার রচিত 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' নামক সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে। নাম করণের মধ্যেই গ্রন্থপরিচয় পরিস্ফুট। ভূমিকায় লেখক বলেছেন ১২৭২ সাল হইতে

আরম্ভ করিয়া ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদাবলীর রস আস্বাদনের কীরূপ পরিচয় আছে, তাহা ঐতিহাসিক কালানুক্রম অনুসারে আটটি অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে' সেই আটটি অধ্যায় যথাক্রমেঃ—পদাবলীর পুনরুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথঃ পদকর্তা রবীন্দ্রনাথঃ পদাবলীর মাধুর্যবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথঃ পদাবলীর সংকলয়িতা রবীন্দ্রনাথঃ পদ-উদ্ধৃতিপ্রয়োগে রবীন্দ্রনাথঃ প্রাক্-গীতাঞ্জলিযুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাবঃ গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাবঃ পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব। এর থেকেই গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়-পরিধি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

বিশেষ এই উদ্দেশ্যটি সম্মুখে রেখে লেখক সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য পরিক্রমা করেছেন। নিষ্ঠাবান্ গবেষকের দৃষ্টি ও মন নিয়ে কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক ও প্রবন্ধে ব্যাপ্ত সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য হ'তে চুনে চুনে রবীন্দ্রনাথের ওপর বৈষ্ণবপদাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবটি তুলে ধরায় প্রয়াস পেয়েছেন। আনন্দের কথা, তাঁর সেই প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক্ সম্পর্কে লেখক বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে সুস্পষ্ট আলোক-পাত করেছেন। নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলিকে লেখক অজস্র উদ্ধৃতিসহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবশ্য যে-সকল উদ্ধৃতি সংকলন করা হয়েছে তার বাইরেও কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যায়—তাতে লেখকের সিদ্ধান্তই জোরালো হয়। কিন্তু এই গ্রন্থে লেখক যে অসংখ্য উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার ফলে একখানি গ্রন্থের অনতিপ্রসর আয়তনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবকাব্য-রসানুরঞ্জিত চিত্তলোকটি বড়ো সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় বৈষ্ণব-কাব্যসৌন্দর্যের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ পড়তে পড়তে এক অনুপম আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায়। এই সুযোগটুকু করে দেওয়ার জন্যে তার সুযোগ্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ।

আপন রোমান্টিক ভাবাকুলতার সংগে বৈষ্ণবপদাবলীর রোমান্টিক আকুতির সাদৃশ্য-বশেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম কৈশোরেই বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ভানুসিংহের ভণিতায় পদরচনা সেই আকর্ষণের পরিচয় বহন করছে। 'পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে ভানুসিংহের পদাবলীর বিস্তৃত আলোচনাকালে বৈষ্ণবভাবসাধনার সংগে কোথায় তার প্রভেদ কোথায়ই বা তার বিশিষ্টতা তার নিপুণ আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবেই ভারতসংস্কৃতির কবি-ব্যাখ্যাতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রাচীন স্যাহিত্যের অভিনব ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনার সোনার কাঠির স্পর্শে বৈষ্ণবপদাবলীর রসভাণ্ডার উন্মোচিত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 'পদাবলীর পুন-রুজ্জীবনে রবীন্দ্রনাথ' 'পদাবলীর মাধুর্য বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায় দুটিতে ডক্টর মজুমদার তার সুন্দর পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থপাঠে দেখা যায়, প্রথম জীবনেই পদাবলীর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে অত্যন্ত প্রকট। তারপর বয়োবৃদ্ধি ও শক্তির পরিপক্কতার ফলে ধীরে ধীরে সেই প্রভাবের প্রত্যক্ষতা ম্লান হয়ে এসেছে। এটাই স্বাভাবিক। স্বধর্মে প্রতি-ষ্ঠিত হওয়ার আগেই পরানুকরণ প্রবল থাকে —তারপর সেই অনুকরণ স্বীকরণের ফলে স্বধর্মের অংগীভূত হয়ে যায়। তখন 'ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা'··জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। লেখক নিপুণভাবে 'গীতাঞ্জলি-গীতালিতে পদাবলীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব' অধ্যায়ে জীবনের মূল পর্যন্ত প্রসারিত সেই প্রভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশিষ্টে সংযোজিত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সংকলিত পদসংগ্রহগ্রন্থ 'পদরত্না-

বলী'র পুনঃসম্পাদিত সংস্করণ এই গ্রন্থের এক মূল্যবান্ সম্পদ। বিদ্যাপতি পদাবলীর সুবিখ্যাত সম্পাদক যে এই কার্যের যোগ্যতম অধিকারী সে-কথা বলাই বাহুল্য। জহুরির হাতেই এই রত্ন-বিচারের ভার পড়েছে।

এই গ্রন্থ পড়ার সময় একটি কথা মনে হয়েছে। সেটি হলো এর ভাষার দুর্বলতা। ভাষায় আরো সরসতা থাকলে এর আস্বাদন স্বাদুতর হতো। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমৃদ্ধ উদ্ধৃতির পরেই লেখকের স্বপক্ষে এ-কথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি সহযোগে আলোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ লেখককেই কম-বেশি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর একটা কথা।

'কালের রাখাল তুমি,
সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে'—

'তপোভংগ' কবিতার এই পংক্তি দুটি ডঃ মজুমদার কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার প্রভাবজাত মনে করেছেন। আমাদের মনে হয়, বাহ্যত এর সংগে গোষ্ঠলীলার সাদৃশ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রিয় চিত্রকল্পটি গ্রহণ করেছেন কোনো উপনিষদ্ থেকে। হাতের কাছে প্রমাণ না থাকায় যথার্থ শ্লোকটি উদ্ধার করতে পারলাম না।

সত্তা শব্দটি ভ্রমক্রমে সর্বক্ষেত্রেই 'সত্ত্বা' বানান লেখা হয়েছে। আরো দু একটি বানান ভুল চোখে পড়েছে। এই সব ত্রুটির দ্বারা অবশ্য গ্রন্থখানির মূল্য বা মর্যাদা আচ্ছন্ন হয় নাই। রবীন্দ্র-নাথের ওপর কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত রবীন্দ্রসাহিত্যের নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হলো। রবীন্দ্রনাথের ওপর উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থের এখন অপেক্ষা।

শচীনন্দন সিংহ

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ॥ শংকরীপ্রসাদ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ. কলিকাতা। ১২·৫০

দুটি ভিন্ন নাম; কিন্তু অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। একজনের নাম উচ্চারণের সংগে সংগে অপরজনের নাম স্বতই আসিয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর আস্বাদের মহিমায় 'মহাজন' পদবীতে উন্নীত এই দুই কবিকুলপতিকে ভক্ত রসিকবৃন্দ পরম শ্রদ্ধায় আর নিবিড় অনুরাগে স্মরণমন্দিরে সপ্রেম পূজার আসনে বসাইয়াছেন।

এই দুই মহাকবিকে লইয়া বাংলা সাহিত্যে আলোচনা কম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র হইতে শুরু করিয়া কতো সহৃদয় রসজ্ঞই না ইঁহাদের সৃষ্টি সৌন্দর্য প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়াছেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত সুবিখ্যাত বিদ্যাপতি সংস্করণ এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে বাংলা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার স্থায়ী কীর্তির মহিমা অর্জন করিয়াছে। তবু যেন সকল কথা বলা হয় নাই। ভাবতন্ময়তা ও রূপ মুগ্ধতার অনুভূতিকে এই দুই কবিই বোধ হয় প্রথম 'ভাষায়' রূপ দিয়াছেন—তাই বুঝি ইঁহাদের আরতি করিতে বাঙালী রসিক সমাজ কোনোদিন ক্লান্তিবোধ করে নাই।

'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' নামক স্থূলায়তন গ্রন্থে সাড়ে পাঁচ শত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু নূতন করিয়া এই আগ্রহবিদ্ধ ক্লান্তিহীনতারই পরিচয় দিয়াছেন। লেখক তাঁহার রসবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছড়াইয়া দিয়াছেন গ্রন্থটির পত্রে পত্রে। একাধারে

রসজ্ঞতা ও মনস্বিতার মনোজ্ঞ সমাবেশ হইয়াছে এই সুদীর্ঘ নিবন্ধ গ্রন্থে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সুবিপুল পদসাহিত্যের সহৃদয় নিবেদিত পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি অতিপরিচিত কবিদ্বয়ের সহিত বাঙালী পাঠকগোষ্ঠীর নবপরিচয় সাধনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পূর্বসূরীদের বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত ও রসোজ্জ্বল আলোচনার কথা স্মরণে অম্লান রাখিয়াও এ-কথা দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করা যায় যে, এই গ্রন্থটির সহিত পরিচয় না থাকিলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতির—কাব্যসৌন্দর্য-আস্বাদন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বহু আলোচিত বিষয়ের নির্বিচার চর্বিত-চর্বণের মসৃণ পন্থা গ্রন্থকার সাহসের সহিত পরিহার করিয়াছেন। স্বকীয় অনুভবের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে লেখক পরকীয়া প্রেমের আবেশময় রূপ-স্রষ্টাদ্বয়ের সৃষ্টির মর্মরূপটি উদ্ভাসিত করিয়াছেন। লেখকের রসনিবেদনের এই কৃতিত্ব অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য।

লেখকের আলোচনার পরিধি কতো গভীর ও ব্যাপক তাহা দীর্ঘ বিষয়-সূচীর উপর একবার চোখ বুলালেই বোঝা যায়। অধ্যায়গুলির নামকরণেও সুনির্বাচিত শব্দচয়ন লক্ষণীয়। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লেখক আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। লেখক বলিতেছেন—'চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য,—তিনি সর্বাংগীণভাবে আধ্যাত্মিক কবি। আর বিদ্যাপতি হইলেন লৌকিক প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। আধ্যাত্মিক চণ্ডীদাসের কাব্যের রূপমূল্যে অধিকন্তু উপস্থাপিত করিয়াছি, এবং ইন্দ্রিয়প্রেমের কবি বিদ্যাপতি কোথায় আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।' এই সংগে লেখকের অপর একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বিদ্যাপতি কেবল বাংলাদেশে সমাদৃত বৈষ্ণব কবি—এই পরিচয়ের সহিত বিদ্যাপতি ভারতবর্ষের কবি এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করাও লেখকের অন্যতর মূল বক্তব্য। এবং এই বক্তব্যগুলিকে যুক্তিসহ রূপ দিতে গিয়া লেখক কবিদ্বয়ের মূল রচনায় অসংখ্য উদ্ধৃতি সহকারে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ফলে ব্যাখ্যার সংগে সংগে মূল কাব্যেরও রসাস্বাদ ঘটে এবং এইরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা সমন্বিত হওয়ার জন্য আস্বাদ অধিকতর হৃদ্য ও মনোরম হইয়াছে।

গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ চণ্ডীদাস সম্পর্কিত।। শত পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনায় চণ্ডীদাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য সুপ্রচুর উদ্ধৃতি সহকারে আলোচিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস-অংকিত রাধাপ্রেমের বিচিত্র পর্যায় আলোচনান্তে লেখকের সিদ্ধান্ত—'চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস।' সেই আক্ষেপানুরাগের শেষে পাই 'আত্মনিবেদনের ভক্তিস্তোত্র'। লেখকের মন্তব্য—'চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাসের রাধিকা বহু সময়েই একাত্ম, রাধার নিবেদন তাই চণ্ডীদাসেরও নিবেদন।' কী সুন্দর ভাষায় লেখক তাঁহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন—'রাধার পাশে রাধা কবি। বেদনার কালীদহে সিত পদ্মের মতো এই কবি। চণ্ডীদাস তাপস। এত অনাবরণ অনির্বাণ আত্মবান কবি আর কে! প্রেম যে দ্রবীভূত হৃদয়, কান্না যে বিগলিত নয়ন, এবং হাসি যে ছলো-ছলো আত্মা— চণ্ডীদাসই তাহা জানাইয়াছেন।'

এই প্রসংগে একটি কথা বলা উচিত। লেখক সরস সমালোচনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, কিন্তু গবেষকের নীরস ভূমিকা গ্রহণ করিতে চান নাই। সংশয়াচ্ছন্ন-পরিচয় চণ্ডীদাসের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতা একাধিক চণ্ডীদাসের সমস্যাবিকার—এই সকল বিতর্ক-কণ্টকিত বিষয় গুলিকে লেখক সচেতনভাবে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। অথচ এই সমস্যাগুলির সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত চণ্ডীদাস নামক কবির স্রষ্টাগৌরব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য। আলোচনাকালে গ্রন্থকার চণ্ডীদাসকে 'বাঙ্‌লা কবি ভাষার জনক' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন এবং অসংখ্য উদ্ধৃতি সহযোগে স্বীয় অভিমতকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের—বিশেষত যদি সেই

সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে অতি প্রচলিত হইয়া পড়ে—তবে সেই রচনার উপর কোনো বিশেষ কবির অসপত্ন অধিকার স্বীকার করিতে কুণ্ঠা জাগে—একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এই সংশয়টুকু চাপা দিতে পারিলে অভিযোগের আর কিছু থাকে না। তখন গ্রন্থকারের কবিজনসুলভ দৃষ্টিপ্রদীপের আলোকে ও প্রসাদগুণে পুষ্ট ভাষায় বিশ্লেষিত চণ্ডীদাসের কাব্যবিচার মনোহর লাগে। চণ্ডীদাসের বাণী 'চণ্ডীদাস চৈতন্যের' দ্বারা আবিষ্ট সমালোচকের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে এবং লেখক তাঁহার মর্মের বেদনা মনোরম কাব্যসমৃদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—গ্রন্থপাঠে এই কথাই বারবার মনে হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় নিবন্ধ বিদ্যাপতি বিষয়ক। এই নিবন্ধটি আয়তনে চণ্ডীদাস অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠা জুড়িয়া লেখক বিদ্যাপতি সম্পর্কে অতিবিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় লেখকের নির্ভর ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় কৃত অমূল্য সংস্করণ। 'শৈব কবি বিদ্যাপতি' এবং "প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি'—দুটি পৃথক নামাংকিত বিভাগে বিদ্যাপতির সর্বাংগীণ কবি পরিচিতি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি রচিত 'শিববিষয়ক পদাবলী' সম্পর্কিত আলোচনাটিকে পাঠকগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ও মূল্যবান উপহার বলিয়া গণ্য করিবেন। এই প্রসংগে 'ভারতবর্ষের শিব—কালিদাস-বিদ্যাপতি-রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক অধ্যায়টি সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। লেখকের মতে ধর্মবিশ্বাসে বিদ্যাপতি আজীবন শৈব—নানান তথ্যসহায়ে তিনি এই মতকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাহিয়াছেন। অবশ্য এই অভিমত গ্রহণ করিতে, লেখকের যুক্তিসমৃদ্ধ আলোচনা অনুধাবনের পরেও, অনেকেরই দ্বিধা ঘুচিবে না। তবু একথা স্বীকার করা উচিত যে, লেখকের যুক্তিজাল পুরাপুরি অগ্রাহ্য করাও সহজ নয়।

প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতির অন্তরলোকের বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য লেখক একটি মূল্যবান অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—'প্রেম কবিতার ঐতিহ্য এবং বিদ্যাপতির আদর্শ কবিগণ'। এই অধ্যায়ে লেখক প্রাচীন ভারতের প্রেমকাব্যের আদর্শ ও তাহার দ্বারা বিদ্যাপতি কতোখানি প্রভাবিত হইয়াছেন, কোথায়ই বা বিদ্যাপতির মৌলিকতা সে সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে লেখকের বিশ্লেষণ শক্তি মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ। রাধা কৃষ্ণের যুগল প্রেমকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি যে সুবিপুল পদসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কী ব্যাপ্তগভীর আলোচনা! এই প্রেমকাব্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পড়িতে পড়িতে মনে হয় লেখক যেন বিদ্যাপতির মনোজগতের মূল সুরটি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। তাই এমন দৃঢ় প্রত্যয় বলে অবলীলাক্রমে এই প্রেমলীলার রসভাষ্য নিবেদনে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। বিদ্যাপতি পদাবলীতে বর্ণিত প্রেমের লৌকিক রূপ, নাগরিক প্রেম, বয়ঃসন্ধি, অভিসারের বহুমুখী রূপ, পূর্বরাগ হইতে মিলন, মান—প্রেমের জটিল ও কুটিল রূপ, সৃষ্টির আগুনজ্বালা বিরহ শীর্ষক অধ্যায়গুলি অতিক্রম করিয়া অবশেষে ভাবসম্মিলন—কেন্দ্রীয় অগ্নির আলিংগন' পর্যন্ত স্তরে স্তরে ক্রম-বিন্যস্ত রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বিশ্লেষণে লেখক অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র কাব্যপাঠে বিদ্যাপতি সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত—'বিদ্যাপতি একই সংগে ভোগমুখী ও ভোগোত্তর চেতনায় অধিকৃত ছিলেন।' এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনে লেখকের প্রয়াস বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় উজ্জ্বল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের নিকট সর্বাধিক ঋণ স্বীকার করিয়াও লেখক সাহসের সংগে অথচ সবিনয়ে নিজস্ব

মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। ভোগরাগে বর্ণাঢ্য বিদ্যাপতির মনোজগতের রূপান্তর সম্পর্কে ডঃ মজুমদারের সংগে গ্রন্থকার একমত হইতে পারেন নাই—এবং এই বিষয়ে আমরা লেখকের পক্ষ সমর্থন করাই অধিকতর সংগত মনে করি।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-উভয় কবির কাব্যমূল্য বিচার করিতে বসিয়া লেখক অলংকার প্রয়োগের যে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অসীম ধৈর্য ও নিপুণতার সংগে লেখক এই বিষয়ে যে ব্যাপক আলোচনা করিয়াছেন তাহার জন্য লেখক উচ্চ প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। সমগ্র কাব্যরত্নাকর মন্থন করিয়া অলংকার আহরণের এই উদ্যম লেখকের গভীর পাণ্ডিত্য ও উজ্জ্বল রসবোধের পরিচয় দেয়। এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির মূল্যায়নে ইহার ভাষা তথা বর্ণনাভংগী সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করা দরকার। বিপুল আয়তন সত্ত্বেও এই গ্রন্থখানি বর্ণনামাধুর্যে কোথাও ক্লান্তিকর মনে হয় না। দীর্ঘ নিবন্ধ—পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ তথাপি কোথাও নিষ্প্রাণ নীরস নয়। আলোচনার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ কোথাও রুদ্ধ গতি হয় নাই। পাণ্ডিত্য আছে—অথচ কোথাও তাহা লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনাত্মীয়তার অবাঞ্ছিত ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বিষয়বর্ণনার উপযোগী প্রসাদগুণ সমৃদ্ধ কাব্যরসমণ্ডিত ভাষাপ্রয়োগে লেখক যথেষ্ট যত্নবান। বর্ণনার ভিতরে স্বকীয় চিন্তা ও উপলব্ধির ভংগীটি রীতিমতো পরিস্ফুট। এই গ্রন্থে লেখক একটি নিজস্ব ষ্টাইল বা রচনারীতি দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস যে বহুলাংশে সিদ্ধ হইয়াছে এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। তবে কোথাও কোথাও ভাষার প্রসাধন প্রয়াসটুকু অতি স্পষ্ট হওয়ায় কিছুটা দোষের সঞ্চার হইয়াছে।

শচীনন্দন সিংহ

কালীঘাটের পট।। শান্তি লাহিড়ী। ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। কলকাতা-১। দু'টাকা।

নিঃসন্দেহে সুখের কথা, বাংলা কাব্যের মিলিত সংসারে প্রতিশ্রুতিবান আগন্তুকের সংখ্যা বাড়ছে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে তরুণ কবিরাই এই অতিরিক্ত সম্পন্ন-ফসলের জন্য দায়ী। শুভ লক্ষণ আরো এই কারণে যে এর ভেতরে নবাগতের সংখ্যা অপ্রচুর নয় এবং তাঁদের অনেকেই যথেষ্ট সম্ভাবনাময়-ও। এবং এই মুহূর্তে, তাঁদের এই কাব্য প্রকাশনার পেছনে অবশ্য একটা শুভ উপলক্ষ্য বর্তমান; সেটি হলো রবীন্দ্র জন্মশত বর্ষ।

'কালীঘাটের পট' তরুণ কবি শান্তি লাহিড়ীর দ্বিতীয় কাব্য সংকলন। শান্তি লাহিড়ী মূলতঃ রোমান্টিক চেতনার কবি; প্রেম ও নিসর্গের সৌন্দর্যময় রূপালেখ্য রচনায় তাঁর কবিমানস আশ্চর্য আন্তরিক। পরিবেশ এবং প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ব্যবধান নয়, উভয়ের সমন্বয় সাধনেই বর্তমান কবি যত্নশীল। নিবিড় নিসর্গের সাহজিক সৌন্দর্যকে কবি তাঁর অন্যতর চোখের আলোয় আবিস্কার করেছেন :

'পাহাড়ী পথের বাঁক, গোত্রহীন উজ্জ্বল ফুলেরা,
স্পর্ধিত ভঙ্গীতে খাড়া কিছু গুল্ম, কিছু তরুলতা।

তারি একপাশ দিয়ে উচ্ছলিতা—নারীর শরীরে
কি অপূর্ব পদক্ষেপে হেঁটে চলে শৃঙ্খলিতা নদী।
(শিলঙের উপত্যকায়)

এবং,

'যখন বিপন্ন রৌদ্রে আমি স্নাত আপন বিস্ময়ে,
অনুরাধাপুর, তুমি তখনো কি সহজ সজল
একটি মেয়ের মত আমাকে আপন করে নিতে
পেরেছিলে?' (অনুরাধাপুরের দুপুরে)

কবি জানেন, পথ সে তো বিনম্র ইচ্ছায় সামনে এগিয়ে চলে, স্মৃতিদের পিছে ফেলে যায়। এবং হয়তো সেই কারণেই কবি মনের পিছুটান কার্যকরী, স্মৃতি কবিকে কি এক মায়ায় টানে, 'কেবলি পিছনে টানে একটি দুপুর—/উজ্জ্বল স্মৃতির আলো—/কপালে সিঁদুর পরো তুমি মুগ্ধা অনুরাধাপুর।'

'কালীঘাটের পট' পাঠ করে মনে হলো যে বর্তমান কবির মধ্যে বিপুল বেদনা বোধ জাগ্রত রয়েছে। এবং স্মৃতিচারী বিষণ্ণ আবেগও তাঁর....কাব্যভাবনায় অনুপস্থিত নয়। তবে আশ্বস্ত হবার স্বপক্ষে বলা যায় যে সে যুগযন্ত্রণা শুধুমাত্র তথাকথিত বিষাদ, হাহাকারেই পর্যবসিত হয় নি; ক্ষেত্র বিশেষ, প্রেম বিরহ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবি মানসের শান্তশীল অভিব্যক্তি একটি সৌন্দর্যময় পরিবেশ রচনা করতে সহায়ক হয়েছে: 'মুকুল-যন্ত্রণা কন্যা, নাগপাশে বুঝি বাহুপাশে;/দক্ষিণ নায়ক আমি, তুমি রাধা সোনালী সকাল।' (পৃথিবীর জন্য)। আবার বিস্মৃতির সুখও কবি অনুভব করেছে; তিনি জানেন:..

'একটা চাঁপা একটা বেলী অথবা কিংশুকে
যাকেই খুঁজে ফিরি বুঝি তাকেই খুঁজে পাব।' (বিস্মৃতির সুখ)

পতঙ্গের গল্প, অঘ্রাণের আগে, হারুশেখর আয়না, পোর্টেট্র, বিস্মৃতির সুখ, স্মৃতিঃঅশ্রু, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাথুর, সিম্ফনি' প্রভৃতি বর্তমান সংকলনের উল্লেখ্য কবিতা। 'একটি দৃশ্য' কাব্যনাটিকা রচনায় কবির পরিশ্রমী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে যে প্রতীকগুলি তিনি ব্যবহার করতে প্রয়াস পেয়েছেন তা সর্বত্র সুপ্রযুক্ত নয় ফলে ক্ষেত্রবিশেষে তা কিছুটা আরোপিত বলে মনে হতে পারে। এ ছাড়া কাব্যপ্রকরণে দু' একটি ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ শিথিলতা লক্ষ্য করা গেল। 'কালীঘাটের পট'-এর অঙ্গসজ্জা মনোরম।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

নবম বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৬৮

শ ত ত ম সং খ্যা

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন্‌. এন্‌. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা-

X-100
MOTOR OIL
X100
2T
SHELL
ROTELLA
OIL
FOR DIESELS
a winner every time...
you can be sure of SHELL

"আমি পথিক,
পথ আমারি সাথি—"
কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ সকলের অলক্ষ্যে
একটা পুরানো পরিত্যক্ত পাল্‌কির ভিতরে
ঢুকে চোখ দু'টি বুজে বসতেন
আর কল্পনার অলস পাথায় ভর দিয়ে চলে
যেতেন মায়ায় ঘেরা কোন অচিন
দেশে। উত্তরকালে 'সুদূরের পিয়াসী'
রবীন্দ্রনাথ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ
করেছেন—ঘরছাড়া বাতাসের মতো
'উদ্দাম-উধাও' হওয়ার কথা
ভেবেছেন। 'পথের প্রেমে' মেতে
উঠে কবিগুরু লিখেছেন:
"আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।
... ...
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।...”*
D
ডানলপ কর্তৃক প্রচারিত
'পথিক কবি' পর্যায়ের অন্যতম
(*বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)
DC-561 BEN

চিত্রতারকার বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্য-সাবান

LTS.84-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

অন্য ফিল্টার সিগারেটের চেয়ে সিমলাই বেশী লোক খাচ্ছেন

SUNLIGHT
SOAP

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

আজকাল ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট (তা ছাড়া ব্রিটানিয়ার অন্ত সমস্ত বিস্কুটও) স্বাদে, গন্ধে ও গুণে আরো ভালো, আরো চমৎকার, কেননা ব্রিটানিয়া বিস্কুট এখন অভূতপূর্ব টার্বো-রেডিয়্যান্ট প্ল্যান্টে তৈরী হয়—বিস্কুট তৈরীর এ ধরণের প্ল্যান্ট সারা ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। এই প্ল্যান্টে আরো নিখুঁতভাবে পুরোপুরি সেঁকা হয় ব'লে ব্রিটানিয়া বিস্কুট মাত্রেই আশ্চর্য কুড়মুড়ে, স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব এবং বিশেষ ক'রে পুষ্টিতে ভরপুর থাকে।

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুটই বাজারে উৎকৃষ্ট। পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, অথচ এত সহজে হজম হয় যে ডাক্তাররা পুষ্টিদায়ক হালকা খাবার হিসেবে সব সময়ই এই বিস্কুট খেতে বলেন। আপনার বাড়ীর জন্যে চাই স্বাদে, গন্ধে ও উপকারিতায় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বিস্কুট ব্রিটানিয়া।

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

IS:1011 ISI

দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড

THE RALEIGH
ASANSOL
INDIA

লিপটনের
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
কম দামে
সেরা চা
LLC-2 BEN
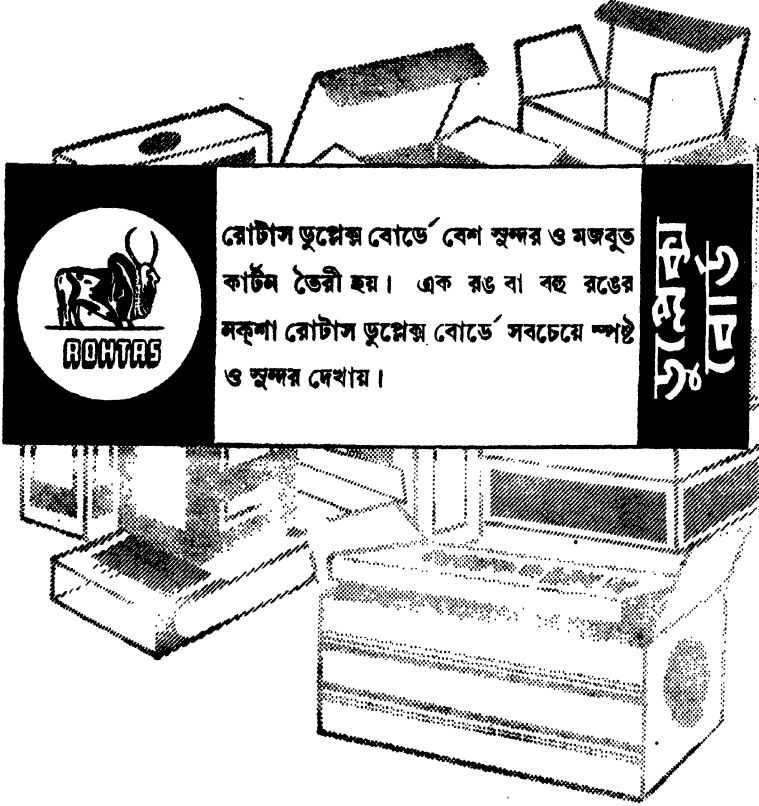
BETTER FANS ARE BUILT THROUGH BETTER ENGINEERING

that is the Orient way

FANS

Years ahead in looks and performance
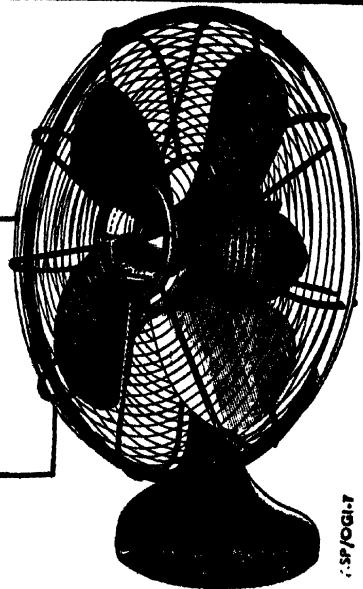
ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD. CALCUTTA-11

SP/OGI-7

৯ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ। তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

For fifty years a man of simplicity lived in a small room atop the University College of Science, Calcutta. He was many things, scientist, teacher, industrialist and nationalist. But above all a man with a sense of profound humanism and philanthropy.
A century after his birth the nation remembers with reverence that simple man —
Acharya Prafulla Chandra Ray.
INDIAN
OXYGEN
LIMITED

৯ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ। তেরশ' আটষট্টি

শ ত ত ম স ং খ্যা

ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

গোতমের ধর্মসূত্র থেকে তুলনায় অনেক অর্বাচীন যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্র পর্যন্ত নানা পুঁথিতে 'বাকোবাক্য' নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে। টিকাকারেরা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর রূপবিদ্যা। সহজেই অনুমান হয় বিদ্যাটি গ্রীকেরা যাকে বলেছে "দিয়ালেগ"। প্লেটোর দার্শনিক রচনার কাঠামো 'সক্রেটিক ডায়লগ' যার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ। আমাদের দেশে "মিলিন্দ-প্রশ্ন" যার সুপরিচিত নমুনা। এই প্রশ্নোত্তর বা দিয়ালেগের মূল থেকেই আমাদের দেশে ও গ্রীক তর্কশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। বিতর্কে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ ভেদের স্পষ্ট নাম করণে তর্কশাস্ত্রের এই আদি ইতিহাস আমাদের দেশে বেঁচে আছে।

গ্রীক 'দিয়ালেগ' শব্দ থেকে "ডায়লেক্‌টিক্‌" কথাটি তৈরী হয়েছে। দার্শনিক হেগেল বিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের এক চাবি আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বের এবং বিশ্বের সবকিছুর বিকাশ ও প্রকাশ হয় ত্রিকের ছকে ছকে। যে কোন বস্তু, ব্যাপার ও প্রতিজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে একটা স্ববিরোধ। এই স্ববিরোধের চালনায় বস্তু, ব্যাপার বা প্রতিজ্ঞা তার বিপরীতে পরিণত হয়। কিন্তু 'রীত' ও "বিপরীতের" সহাবস্থানের অসংগতির তাড়নায় দু-এর মধ্যে আসে একটা সমন্বয়। এক ত্রিক সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সমন্বয়ের মধ্যেও আবার সেই স্ববিরোধ। ফলে সমন্বয় পরিণত হয় তার বিপরীতে। এবং আবার আসে এক নূতন সমন্বয়। এইরকমে প্রতিজ্ঞা ,বিরোধ ও সমন্বয়ের ত্রিকের পর ত্রিক চলতে থাকে, যতক্ষণ না পরাব্রহ্ম বা 'এ্যাব্‌সোলিউট্‌'-এর পূর্ণ বিকাশ হয়। যে 'এ্যাব্‌সোলিউট্‌'—থেকে গতি আরম্ভ হয়েছিল, তাতেই সব পরিণত হয়। জন্মাদ্যস্য যতঃ।

হেগেল যখন তাঁর বিশ্বসৃষ্টির এই ডায়লেক্‌টিক্‌ তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেছিলেন তখন ইউরোপের অনেক দার্শনিক মহলে জয়ধ্বনি উঠেছিল। যাক, সব বোঝা গেল ;রহস্য কিছু থাক্‌লো না। দার্শনিক জ্ঞান চরমে পৌঁচেছে। দার্শনিক তত্ত্বের ধ্রুব কাঠামো চিরকালের জন্য খাড়া হয়েছে। এরপর আর সব দার্শনিক চিন্তা ঐ কাঠামোর মধ্যেই খুটখাট। পরে অবশ্য 'এক চাবি-তে সব তালা খোলার' দর্শনের যা ঘটে হেগেলের দর্শনেরও তা-ই ঘটলো। অভিনবত্বের আকস্মিক চমক

কাটলে সমালোচনা প্রশ্ন জাগলো এ তত্ত্বের কতটুকু তথ্য, কতটা কল্পনা। দু-একটা তালা খুলতেই সাফল্যের অত্যুন্মাদনায় চাবিকে 'মাষ্টার কি' মনে করা অবিদ্যার বিভ্রম কিনা। তর্কের শেষ থাকলো না। আক্রমণে ও সমর্থনে পুঁথিরচনা হলো বিস্তর। ছোট খাটো নানা দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি হ'লো যেমন সৃষ্টি হয়েছে অন্যসব বড় দার্শনিকদের দার্শনিক তত্ত্ব থেকে। প্লেটোর আইডিয়া, কান্টের জ্ঞানের বিশ্লেষণ, সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষভেদ, শংকরের অদ্বৈতবাদ থেকে। হেগেলের দর্শনও এইসব দর্শনের মত দর্শনশাস্ত্রীদের বিচারের বিষয় থেকে যেতো। কিন্তু হেগেলের ডায়-লেক্‌টিক্‌স তত্ত্ব হঠাৎ দর্শনের ক্লাস থেকে পলিটিক্সের ক্লাসে প্রমোশন পেলো। যা ছিল চিন্তার বস্তু, তা হ'লো কর্মের তূর্যধ্বনি। বিচিত্র ইতিহাস।

মার্কস্‌ আবিস্কার করলেন মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্ব। আদিতে মানুষের সমাজে শ্রেণী ভেদ ছিল না। একের পরিশ্রমে উৎপন্ন জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ অপরে ভোগ করতো না। উৎপন্নের পরিমাণ ছিল এমন স্বল্প যে উৎপাদককে বাঁচিয়ে রাখতেই সমস্তটা নিঃশেষ হতো, ভোগের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকতো না। যখন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লো, বিশেষ কৃষির আবিষ্কারে, তখন একের পরিশ্রমের ফলের একটা অংশ অপরের ভোগে লাগানো সম্ভব হলো, এবং মানুষের সমাজে শ্রেণী ভেদের সৃষ্টি হলো। সাধারণের চেয়ে বুদ্ধিমান কি বলবান তারা উৎপাদনের উপায়গুলি, বিশেষভূমি, নিজেরা দখল করলো। তখন পরের দখলি এই উপায়-গুলি দিয়ে যা উৎপন্ন হয়, প্রাণরাখার তাই উপায়। সুতরাং সমাজের সাধারণ লোকেরা বাধ্য হলো উপায়গুলির মালিকদের কাছে থেকে নানা সর্তে উপায়গুলিকে নিয়ে নিজেদের পরিশ্রমে ধন উৎপন্ন করতে, অর্থাৎ জীবনধারণ ও জীবনযাত্রার উপকরণ তৈরী করতে। এই উৎপন্ন ধনের যে অংশ ব্যয় হয় উৎপাদকদের বাঁচিয়ে ও মোটের উপর কর্মঠ রাখতে তা বাদে অবশিষ্ট ধন উৎ-পাদনের উপায়গুলির মালিকেরা আত্মসাৎ করতে থাকলো। মানুষের সমাজে দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। একশ্রেণী পরের হস্তগত উৎপাদনের উপায়গুলি দিয়ে পরিশ্রমে পেটভাতায় ধন উৎপন্ন করে সংখ্যায় এরা বেশী; অন্যশ্রেণী উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে অপরের পরিশ্রমের সৃষ্টি ধনের বড় অংশ ভোগ করে,—সংখ্যায় এরা অল্প। মেহনতী শ্রেণী ও মেহনতের ফলভোগী কৌশলীশ্রেণী। এই শ্রেণীভেদের ফলে, উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন ধনের বাঁটোয়ারার বিশেষত্বের ভিত্তিতে এক বিশেষ আকারের সমাজ গড়ে ওঠে। কিন্তু এরকম সমাজের সকলরকম গড়নই অচিরস্থায়ী। কারণ যে উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্নের বন্টনের ব্যবস্থা এর ভিত্তি, সে ভিত্তি স্থির নয়। তার মধ্যে থাকে একটা স্ববিরোধ। এর চালনায় উৎপাদনের চলতি উপায়গুলি বাতিল করে সমাজের একদল লোকের হাতে আবিষ্কার হয় বেশী উৎপাদনের নূতন উপায়। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকত্ব চলে যায় সেই দলের হাতে; পূর্বের পরভুজ শ্রেণীর জায়গায় নূতন পরভুজ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। উৎপাদনের নূতন উপায়গুলির মালিকত্বের জোরে সেই শ্রেণীর লোকেরা অন্য সবাইকে পরিশ্রম করিয়ে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে ও সমাজের কর্তৃত্ব করে। সমাজ এক নূতন গড়ন পায়। বন্টনের ব্যবস্থায় কিছু অদলবদল হয়। কিন্তু সংখ্যায় বেশী মেহনতী শ্রেণী ও সংখ্যায় অল্প মেহনতের ফলভোগী কৌশলী শ্রেণী—এ শ্রেণীভেদ বহাল থাকে। এই নূতন সমাজের ভিত্তিতেও সেই স্ববিরোধ। তার ফলে সমাজের এ নূতনগড়নও ফিরে যায়। প্রাচীন কৌশলীশ্রেণীকে ধ্বংস করে নূতন পরভুজ শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। যারা, নূতনতর উৎপাদনের উপায়গুলিকে আয়ত্বে এনে অন্য সকলের পরিশ্রমের ফলভোগ করে ও সমাজে কর্তৃত্ব করে। সমাজ আবার নূতন গড়ন পায়।

এমনি করে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষের তাড়নায় সমাজ গড়নের পরিবর্তন ঘটতে

থাকে। সংঘর্ষে যে শ্রেণীর জয় হয় তাদের অস্ত্র পূর্বের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনের উপায়ের প্রয়োগ, এবং সেই উপায়গুলির মালিকত্ব লাভ। সুতরাং শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমে বাড়তে থাকে। যাতে মেহনতী শ্রেণীকে পেটভাতার উপরে অল্প স্বল্প উপরি দিয়েও অনেক অবশিষ্ট থাকে। এবং শ্রেণীসংঘর্ষে জয়ী শ্রেণীর পর জয়ী শ্রেণী অধিকতর ধনী হয়। এ সমাজ ব্যবস্থা প্রচুরতম উৎপাদনের এক বড় কৌশল অতি অল্প লোকের হাতে উৎপাদনের উপায়গুলি কেন্দ্রীভূত হওয়া। যাতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ না হয়। সকলে সমানমনা ও সমানগতি হয়ে উৎপাদনের উপায়গুলিকে যদৃচ্ছা উন্নত থেকে উন্নততর করতে পারে। বহু ফলপ্রসূ উপায়ের স্থানে বহুতর ফলপ্রসূ উপায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিবর্তন চলতে চলতে এমন এক জায়গায় পেঁছে যখন একদিকে আছে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক অতি ছোট এক শ্রেণী, যারা সে উপায়গুলিকে প্রচন্ড শক্তিশালী করে অমিত ধনউৎপাদনের উপযোগী করেছে, অন্যদিকে আছে সমাজের বাকী অগুন্তি মেহনতি জনতা, যারা সেই উপায়গুলি দিয়ে অফুরন্ত ধন উৎপন্ন করছে। তখন শ্রেণীর সংঘর্ষ চরমে পেঁছে। অতি ছোট মালিক শ্রেণীর সঙ্গে অতি প্রকান্ড মেহনতী শ্রেণীর সংঘর্ষ। উপযুক্ত নেতৃত্বের চালনায় মেহনতী জনতা ছোট মালিক শ্রেণীকে ধ্বংস করে উৎপাদনের শক্তিশালী উপায়গুলিকে দখল করে নেয়। কৌশলী মালিকশ্রেণী নিজেদের কৌশলেই উৎখাত হয়। মানুষের সমাজে শ্রেণীভেদ লোপ হয়ে সাম্য ফিরে আসে। আরম্ভের দৈন্যের সাম্য নয়, পরিণতির প্রাচুর্যের সাম্য। অদ্বয় নির্গুণ সমাজব্রহ্ম পরম ঐশ্বর্যশালী পূর্ণব্রহ্মে পরিণতিলাভ করে। এ তত্ত্বের কতক মার্কসের সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতির বিশ্লেষণ। বাকীটা তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী।

হেগেলের বিশ্বসৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনী ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসের মনুষ্যসমাজের ক্রমপরিণতি ও চরমপরিণতি তত্ত্বের মিল আছে। সমাজের সকল অবস্থার মধ্যে স্ববিরোধ, তার ফলে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষের তাড়নে ক্রমে উন্নততর উৎপাদন-ধর্মী সমাজব্যবস্থার দিকে গতি, এবং সে গতির শেষ পর্য্যায়ে চরমসংঘর্ষে শ্রেণীসংঘর্ষের লোপ, এবং অসীম ঐশ্বর্য্যশালী সমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠায় মনুষ্যসমাজের চরম পরিণতি। চোখ চাইলেই এসব মিল চোখে পড়ে। কিন্তু মার্কস্‌ হেগেলের সঙ্গে এসব মিলকে বিশেষ আমল দেন নাই। তিনি বলেছেন দার্শনিকেরা চায় সৃষ্টিকে বুঝতে, কিন্তু কাজের মত কাজ হচ্ছে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানোতে। অবশ্য মানুষের কোন চেষ্টাতেই সব সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এই পৃথিবীতেই যায় না। পৃথিবীর বাইরে সৌর জগৎ। তার বাইরে নক্ষত্র জগৎ। তার বাইরে নীহারিকার জগৎ। তারও বাইরে অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত খন্ড খন্ড বিশ্ব। মানুষ তবুও এদের কথা জানতে চায়। কেবল দার্শনিক নয়, বিজ্ঞানীরাও চায়। জ্ঞানের এই ঔৎসুক্যকে মার্কস ছেলেমানুষী ভাবতেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে এরকম জ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে তিনি মানুষের সমাজের ক্রমপরিণতির তত্ত্বকে এক পর্য্যায়ের তত্ত্ব মনে করতেন না। যে তত্ত্ব সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার কৌশল বলে না সে তত্ত্ব দিয়ে তিনি কি করবেন। মার্কস ছিলেন কর্মবাদী ঋষি। হেগেলের সৃষ্টি রহস্যের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল গরমিলের কথা তাঁর কাছে অবান্তর। ভগবান বুদ্ধ মানুষকে দুঃখনিবৃত্তির উপায়ের উপদেশ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর আত্মা কি অবস্থায় থাকে সেই অবান্তর প্রশ্নকে আমল দেন নাই।

কিন্তু গুরুর উপদেশে চললে শিষ্যদের চলে না। তথাগত শিষ্যদের উপদেশ করেছিলেন নিজের মনের আলোতে পথ চিনতে, ধার করা আলোতে নয়; নিজের তপস্যায় নির্বাণ

পেতে, পরের শরণ নিয়ে নয়। শিষ্যেরা ভরসা পেলে না। কল্পনায় কর্ণামময় বোধিসত্ত্বদের স্ৃষ্টি করে তাদের শরণাপন্ন হলো।

মার্কসের সহগামী ও অন্ুগামীরা হেগেলের দর্শনের বিশ্বস্ৃষ্টি তত্ত্বের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সঙ্গে মার্কসের আবিষ্কৃত সমাজের ক্রমপরিবর্তন ও পরিণতির ডায়লেক্‌টিক্‌সের মিল মার্কসের মত অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। বিশ্বস্ৃষ্টির ম্ূলে যে ডায়লেক্‌টিকস্‌ সমাজের ক্রমপরিণতির ম্ূলেও সেই ডায়লেক্‌টিকস্‌ এ কল্পনায় তারা মনে ভরসা পেলেন। তবে সমাজের চরম পরিণতির মার্কসের যে ভবিষ্যৎ বাণী তা সফল—'নিশিদিন ভরসা রাখিস হবেই হবে, ওরে মন হবেই হবে'। কারণ স্ৃষ্টিরহস্যের কৌশলেই তা সফল হতে বাধ্য। তব্ুও হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ থেকে মার্কসের ডায়ালেক্‌টিকসের প্রভেদ কল্পনা না করলে চলে না।

"হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের সংগে মার্কসের ডায়লেক্‌টিকসের বাহ্যিক মিল থাকলেও বাস্তবে তা পরস্পর বিরোধী। হেগেলের মতে, চিন্তার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিই হল বাস্তবের স্রষ্টা। হেগেল এই চিন্তাপদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'পরমভাব।' হেগেলের মতে বাস্তব জগৎ সেই 'পরমভাবেরই' বহিঃপ্রকাশ। মার্কসের মতে বাস্তব জগৎই মানবমনে প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় র্ূপান্তরিত হয়। এই চিন্তাই ভাব, তা অন্য কিছ্ু নয়। মার্কসের ভাষায় 'ভাব বাস্তবের স্রষ্টা নয়, বাস্তবই ভাবের স্রষ্টা।"

কথার ঘোর প্যাঁচে মনকে প্রবোধ দেওয়া। কল্পিত বস্তুবাদকে হেগেলের 'ভাববাদের' গ্রাস থেকে রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা। হেগেলের চিন্তায় মান্ুষের মনের মননের যে ধারা, বিশ্বস্ৃষ্টি বিকাশের তাই পদ্ধতি। স্ুতরাং 'র্যাশানাল ইজ রিয়েল" মার্কসীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের ব্যাপারে মনের বেশী জারিজ্ুরি স্বীকার করতে পারেন না। তাতে, তাদের বস্তুবাদ না কি ঘা খায়। স্ুতরাং মনকে তাঁরা কল্পনা করেন দর্শনের মত। বাইরে যা ঘটে মনে তা ঠিক তেমনি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনই মনের চিন্তা বা মনন। স্ুতরাং 'রিয়েল ইজ র্যাশানাল।"

এ দ্ুএর প্রভেদ এক ব্যাপারকে সামনে থেকে ও পেছন থেকে দেখায় প্রভেদ। বাস্তবের ভেদ নয়। হেগেলের দর্শনে বিশ্বস্ৃষ্টির ডায়লেকটিক্‌সের যে পদ্ধতি, মার্কসীয় দর্শনেও স্ৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের সেই পদ্ধতি। দৌড় আরম্ভের ও দৌড় শেষের স্থানের অদলবদল, কিন্তু মধ্যেকার দৌড়ের পথটি এক। এবং এই পথেই ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলা অর্থাৎ ডায়লেক্‌টিক্‌সের লীলাই পথ। হেগেলীয় ও মার্কসীয় ডায়লেক্‌টিকসের বিরোধ বাহ্যিক ভাষার বিরোধ। বাস্তবের আন্তরিক মিলে তারা একবস্তু। স্ৃষ্টির রহস্যের ম্ূলেই রয়েছে সমাজের পরিণতির মার্কসীয় ভবিষ্যৎ বাণীর সাফল্যের গ্যারান্টি। সেই ভরসার তাগিদেই মার্কসের আবিষ্কৃত সামাজিক ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌কে বিশ্বস্ৃষ্টির ডায়লেক্‌টিক্‌সের একাত্ম দেখার আকাংখা। যদি হেগেলের স্ৃষ্টি রহস্যের ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি মার্কসীয় ডায়লেকটিকসের পদ্ধতির সঙ্গে এক না হয় তবে মার্কসীয় দার্শনিকদের চিন্তার ম্ূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের বিখ্যাত প্রথম ত্রিকটি পরীক্ষা করলে কিছ্ু আলো পাওয়া যাবে। প্রতিজ্ঞা— 'বিয়িং', বিরোধী প্রতিজ্ঞা "নন্‌ বিয়িং" সমন্বয় "বিকামিং"। কোনও বস্তু কি ব্যাপারকে নামর্ূপের সীমায় বেঁধে নিশ্চিন্ত হতে না হতেই দেখা যায় যে সেই সীমার মধ্যে এক-র্ূপে অবস্থিত পরমার্থের মত তা স্থির থাকছেনা। অর্থাৎ যা ছিল তা থেকে সে ভিন্নর্ূপ নিচ্ছে। যা ছিল তা যদি হয় 'বিয়িং' তবে তার ভিন্নর্ূপকে বলতে হয় "নন্‌ বিয়িং"। কিন্তু এই "বিয়িং" ও 'নন্‌ বিয়িং' র্ূপ ও ভিন্নর্ূপ, দ্ু-এর কোনটাই নামর্ূপের অচ্ছিদ্র সীমানার মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন স্বপ্রতিষ্ঠ বস্তু নয়। র্ূপেরই পরিবর্তন হচ্ছে ভিন্নর্ূপে। স্ুতরাং র্ূপ ও ভিন্নর্ূপের সম-

ন্বয় হচ্ছে এই পরিবর্তমানতা। থিসিস বা প্রতিজ্ঞা 'বিয়িং' এ্যান্টি থিসিস বা বিরোধী প্রতিজ্ঞা—'নন্‌ বিয়িং', এদের সমন্বয় বা সিন্‌থেসিস্‌ হচ্ছে পরিবর্তনমানতা—'বিকামিং'। কিন্তু এ সমন্বয়ও অ-স্থির। এই রকমে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সমন্বয়ের ধারা চলেছে যে পর্যন্ত না বিশ্ব-ইতিহাসে এ্যাব্‌সোলিউট্‌ বা ব্রহ্মের পূর্ণ প্রকাশে "একরূপেণ অবস্থিতো যোঽর্থঃ সঃ" পরমার্থে—ডায়লেক্‌টিক্‌সের গতির অবসান হয়।

দার্শনিক মায়ায় দৃষ্টিবিভ্রম না ঘটলে দেখা কঠিন নয় যে 'বিকামিং—"বিয়িং' ও "নন-বিয়িং' এর সমন্বয় নয়, 'বিকামিং'কে বিশ্লেষণ করেই, মানুষের বুদ্ধি "বিয়িং" ও "নন বিয়িং' পেয়েছে। বাস্তবে 'বিকামিং', "বিয়িং" ও "নন বিয়িং" এর সমন্বিত রূপ নয়। বাস্তবে আছে 'বিকামিং', পরিবর্তমান ঘটনা। সেই 'বিকামিং'-কে নিজের আয়ত্তে আনার জন্যই, মানুষ বুদ্ধির কাঠামোয় তাকে দুভাগ করে দেখে। বক্র রেখার দৈর্ঘ মাপতে তাকে বহু ছোট সরল রেখার সমষ্টি ধরে নিলে মাপার সুবিধে হয়। কিন্তু বাস্তবে বক্ররেখা বক্ররেখাই, সরল রেখার সমষ্টি নয়। নিজের প্রয়োজনে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে মানুষের বুদ্ধি প্রয়োজনের অনুকূল যে সব উপাদান তাকে ভাগবিভাগ করে দেখে বাস্তবের সেই কল্পিত মূর্তি প্রয়োজনের সীমার মধ্যে সত্য মনে করলে প্রয়োজন-সিদ্ধি সুসাধ্য হয়। কিন্তু তার বাইরে বাস্তবে তাকে সত্য মনে করলে কেবল বুদ্ধির 'রিডিল্‌স্‌' বা ধাঁধার সৃষ্টি হয়। অতি মন্দগতি শামুক দুহাত এগিয়ে থাকলে তড়িৎগতি একিলিস্‌ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কি করে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, দেশ ও কালের বিভাজ্যতা যখন অনন্ত? পরমাণুর অণুবিভাজ্যতা, স্বীকার করতেই হবে, নইলে পর্বত ও সরষে-কণার সমপরিমাণত্ব এড়ান যায় না। এসব কৌতুকরহস্যের সৃষ্টি হয়, যা ব্যবহারিক ও আপেক্ষিক তাকে পারমার্থিক চরম-সত্য জ্ঞানে বিচারে প্রবৃত্ত হলে। এক বস্তুর উপর ভিন্ন বস্তুর অধ্যাস মায়া ও মিথ্যা জ্ঞানের মূল।

ডায়লেক্‌টিকসের পদ্ধতি সৃষ্টির পদ্ধতি নয়। সৃষ্টিকে বুদ্ধির আয়ত্তে আনার প্রয়োজনে মানুষের মনের পদ্ধতি। অখণ্ডের এককে খণ্ডত্বের বহুত্বে পরিণত না করলে মানুষের কাজ চলে না, কি বুদ্ধির কাজ কি সাংসারিক কাজ। তাই বলে বাস্তবে এক-অখণ্ড বহু খণ্ডের সমষ্টি নয়। কিন্তু হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌ এ বিতর্কে টলে না। তার দর্শনের 'ক্রেডো' হল যা মননের পদ্ধতি তারই বহিঃপ্রকাশ সৃষ্টি ও সৃষ্টির পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুবাদী মার্কসীয় দার্শনিকেরা হেগেলের এই ভাববাদস্বীকার করতে পারেন না। তাঁদের কি উপায়? উপায় খুব সোজা। হেগেলের দর্শনের 'ক্রেডো'কে উল্টে নিয়ে মার্কসীয় দর্শনের "ক্রেডো" করলেই হলো। বাইরের সৃষ্টি মানুষের মনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত ছবিই মানুষের মনন, চিন্তা বা ভাব। সুতরাং মননের পদ্ধতি যদি হয় ডায়লেক্‌টিক্‌ তবে প্রকৃতির সৃষ্টির পদ্ধতিও হবে ডায়-লেক্‌টিক্‌। নইলে মনে সে ডায়লেক্‌টিক্‌ আসে কেমন করে?

মার্কসিস্ট দর্শনের স্বরূপ থেকে এই উৎপত্তির অনুমান সহজ। কিন্তু অনুমান নিষ্প্রয়োজন। মার্কসিস্ট দর্শনের আদি দার্শনিক এঙ্গেলস্‌-এর কথা একটু তুলে দিচ্ছি।—

"ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের সমাজ এ দু-এর ইতিহাস থেকে নিষ্কাশিত। কারণ এ নিয়মগুলি এই দুই ঐতিহাসিক ও চিন্তার বিবর্তনের সব চেয়ে সাধারণ নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়। এসব নিয়মই হেগেল তাঁর ভাববাদী কায়দায় চিন্তা বা মননের নিয়মরূপে উদ্ঘাটন করেছেন।..তাঁর ভুল এই যে তিনি এ নিয়মগুলি প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস থেকে অনুমিত নিয়ম মনে না করে চিন্তার পদ্ধতিরূপে সেই ইতিহাসেরই ঘাড়ে চাপিয়েছেন। এই নিয়মগুলির আলোচনায় হেগেলের কষ্টকল্পনা ও টানা হেঁচড়ার মূল এইখানে। বিশ্বসৃষ্টিকে গায়ের জোরে একটা চিন্তা পদ্ধতির অনুরূপ দেখাবার চেষ্টা যা মানুষী চিন্তার

বিবর্তনের ইতিহাস তার একটা বিশেষ ধাপে সৃষ্টি করেছে। জিনিষটিকে যদি আমরা উল্টে নেই তবে সবই সরল ও সহজ নয়। যে ডায়লেক্‌টিক্‌সের নিয়মগুলি ভাববাদী দর্শনে গুহাহিত রহস্যের মত দেখায়, তা তৎক্ষণাৎ মধ্যাহ্ন দিনের মত সহজ ও সুস্পষ্ট দর্শন হয়।" *

জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মন যে ফটোগ্রাফিক প্লেট নয়; নানা তাগিদে, বিশেষ জৈব প্রয়োজনের তাগিদে, মানুষের মন যে বহিঃপ্রকৃতির অনুভূতিকে তার কার্যসিদ্ধির অনুকূল নানা আকার দিয়ে গড়ে তোলে, এবং সেই মনগড়া জ্ঞানকে মন-নিরপেক্ষ প্রকৃতিতে আরোপ করে— সাম্প্রতিক কালে ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ তার বিশদ আলোচনা করেছেন। কিন্তু বের্গসোঁ বুর্জোয়া সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক। মার্কসপন্থীদের হারাম। তাঁর কোন চিন্তা সত্যের বিকৃতি না হয়ে পারে না, কারণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে চিন্তা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সমর্থক হবেই হবে।

মানুষের মনকে ইস্পাতের জালে ঘিরে একদিকে ছাড়া অন্য সবদিকে তার গতি রুদ্ধ করার প্রকৃষ্ট সর্বনাশা উপায়। পদ্মকে সুদৃশ্য সুগন্ধ স্বীকার করা চলবে না, কারণ মূল তার কাদায়। ডায়লেক্‌টিক্‌সের পদ্ধতি যদি সৃষ্টির পদ্ধতি হতো, তবে সে ইলেকট্রিক টর্চের আলোতে বিজ্ঞানীরা এতদিন অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে ফেলতেন। কিন্তু কোনও বিজ্ঞানী এরকম কাজ করেছেন বলে শোনা যায় নাই। এঙ্গেলস্‌ একটা উদাহরণ দিয়েছেন। রুশ রসায়নাচার্য্য মেন্ডেলিয়েফ্‌ নাকি তাঁর 'পিরিওডিক্‌ল' আবিষ্কার করেছিলেন নিজের অজান্তে হেগেলের ডায়লেক্‌টিক্‌সের এই সূত্রটি মেনে, যে বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন বাড়তে বাড়তে হঠাৎ তার গুণগত পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানে কাকে বলে বস্তু, কাকে বলে পরিমাণ, কাকে বলে গুণ তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'অজানতে' করেছিলেন কথার নির্গলিতার্থ এই যে মেন্ডেলিয়েফ এ আলোতে আবিষ্কার করেন নাই। করেছিলেন অন্যরকম চিন্তায় চালিত হয়ে। এঙ্গেলস কল্পিত টর্চটি রুশ রাসায়নিকের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। সৌভাগ্যের কথা যে হালের মার্কস-পন্থী রাষ্ট্রগুলির বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় ডায়ালেকটিক্‌সের বাঁধা সড়কে চলছেন না। বুর্জোয়া দেশের বিজ্ঞানীদের মতই বিজ্ঞানের ঋজু, কুটিল, বাঁধা, মেঠো বিশেষ বিশেষ পথেই চলেছেন। যে সব পথ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে নিজেদেরই তৈরী করতে হয়; পূর্বে থেকে বিশ্বসৃষ্টি রহস্যজ্ঞ ঋষিরা তৈরী করে রাখেন নাই। তার এক কারণ অবশ্য যে অনেক বিজ্ঞান-ই দৃষ্টফল। ফল যদি না পাওয়া যায় তবে পরম পবিত্র পথকেও নমস্কার করে বিজ্ঞানীদের অন্য পথে চলতে হয়। মার্কসিষ্ট রাষ্ট্রনেতাদের বাধা দেবার উপায় নাই। কারণ ফলের লোভ তাঁদেরই সবচেয়ে বেশী।

মার্কস মানব-সমাজের ক্রমপরিবর্তনের যে নিয়ম দেখেছিলেন, এবং যার উপর তিনি তাঁর 'বৃহুজনহিতায়' সমাজবিপ্লবের কর্মপদ্ধতির খসড়া করেছিলেন, তা জড় প্রকৃতির সৃষ্টি পদ্ধতির ডায়লেক্‌টিক্যাল অডায়লেক্‌টিক্যাল রূপের ওপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। তার মূল নিপীড়িত মানুষের প্রতি মার্কসের মনে মৈত্রী ও করুণা। সে মৈত্রী ও করুণার ডায়লেক্‌টিক্যাল ব্যাখ্যা কোনও মার্কসিষ্ট দার্শনিক করেছেন কিনা জানিনা। এঙ্গেলস্‌ সত্য কথাই বলেছিলেন যে মার্কস প্রতিভাবান। তাঁর সহগামী ও অনুগামীরা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্র। প্রতিভার এক পরিচয় কার্যসিদ্ধির জন্য যা অবান্তর তার উপর ঝোঁক না দেওয়া। বুদ্ধিমান চেলারাই গুরুর বাক্যকে বিশ্বগ্রাসী করার লোভে তাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবাস্তবের সীমায় নিয়ে যায়।

* শ্রীমনোরঞ্জন রায় প্রণীত "দর্শনের ইতিবৃত্ত" দ্বিতীয় পর্ব, ১৫২ পৃঃ

* এঙ্গেলসের 'ডায়লেক্‌টিক্‌স অফ নেচার'। ১৯৪০ সালে ইংরাজী অনুবাদ—১৬-২৭ পৃঃ

বির্জিতলাও

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

"সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,—
সাগরসীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত তপন।"

পড়তে পড়তে মনে হয় যেন দেখতে পাচ্ছি ছন্দের ধাপে ধাপে সূর্য নেমে যাচ্ছে। স্বপ্ন-প্রয়াণের ঐ অনবদ্য দ্বিতীয় পংক্তির সূর্যের মত আমার স্মৃতিও যখন বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জমান-প্রায়, তখনই আমার স্মৃতি-সাগর মন্থন করে' রত্নোদ্ধার করবার জন্য দেবাসুরে মিলে পত্রিকাদন্ড নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁদের পক্ষে এই তাগিদ স্বাভাবিক, কারণ প্রত্যেকের স্মৃতির তথাকথিত রত্ন সে নিজে ছাড়া আর কেউ টেনে তুল্‌তে পারবে না। আমারও সময় সংক্ষেপ। তবে আমার পক্ষে তাঁদের আশা পূর্ণ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়েছে। তার একমাত্র কারণ স্মৃতির কালোচিত আবিলতা নয়, কেন না ভগবৎ কৃপায় আমার এ বয়সেও একেবারে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি; আর একটি কারণ হচ্ছে বহুদিন ধরে নানা সম্পাদকের আবেদন-নিবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে নিজের ঝুলি ঝাড়া হবার উপক্রম। তবে রবীন্দ্রস্মৃতি সম্বন্ধে একথা যতটা খাটে, অন্যান্য স্মৃতি সম্বন্ধে ততটা নয়। তার উপর এ স্থলে সম্পাদক মহাশয় আমার বিশেষ সুবিধে করে' দিয়েছেন স্মৃতির একটা চৌহদ্দি ছকে দিয়ে, অর্থাৎ একটা বিশেষ বাড়ীর গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে বলে'। যেমন একটি পেটিকার মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলে সেগুলি প্রয়োজন মত হাতের কাছে পাওয়া যায়, হাত্‌ড়ে বেড়াতে হয় না। কিম্বা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উত্তরের বিষয়গুলি দফাওয়ারি টুকে দিলে যেমন রচনা লেখা সহজ হয়। আমিও সেই মেক্‌দারের লেখিকা মাত্র, সুতরাং বেশী নম্বর পাবার আশা রাখিনে। তবে ভাগ্যে কোনো সময়ের বাঁধাবাঁধি নেই, নইলে এই অবান্তর ভূমিকায় সময় নষ্টের দরুণ নিশ্চয়ই ফেল মারতুম।

এক একটা বিশেষ বাড়ী যেন প্রকান্ড কৌটার মত জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা-বলী চার দেওয়ালের মধ্যে ধরে রাখে। কথায় বলে দেওয়ালের কান আছে। শুধু কান কেন, সেই উপমা টেনে বাড়িয়ে বলা যেতে পারে দেওয়ালের চোখ কান সবই আছে—কেবল কথা বলতে পারে না, নইলে কত লোকের, কত কালের কাহিনী শোনা যেত। কবি ও ঔপন্যাসিক অবশ্য এই সহজ কল্পনার সুযোগ গ্রহণ করে' মূক দেওয়ালকেও বাচাল করতে ছাড়েন নি। তবে তাঁদের সরস উদ্দাম কল্পনার কাছে আমার এই বাস্তব কাহিনী নিতান্ত শুষ্ক নীরস ঠেক্‌বে বলেই আশঙ্কা হয়। আমার কাছে আমার মাথাধরা টুকুর যা' মূল্য, পরের তা'তে মাথাব্যথা হতে যাবে কি জন্য?

বাড়ীর মনে হয় জন্মজন্মান্তরও আছে। আমাদের সেই নড়বড়ে তিনকাল গত পুরণো বির্জিতলাওর বাড়ীর ইঁটকাঠ কিছুই আর এখন অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সেই ভিত্তির উপর আপাতত মহামহিমান্বিত ক্যাল্‌কাটা ক্লাব বিরাজ করছে, যতদূর জানি। কিসে আর কিসে? সাধে কবি বলেছেন "নিলাজ কুলটা ভূমি, যখন যাহার তখন তাহার"!

কিন্তু আমরা আমাদের সেই গতাসু জীর্ণ বাড়ীর গল্পই করব। বাড়ীর সঙ্গে আবার ক্লাবের তুলনা? ক্লাব ঘর ভাড়া দেয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রম রচনা করে না, সেখানে খানাসামা

খানাপিনা দেয় কিন্তু মা মুখে অন্ন তুলে দেন না; মান্যবর 'গেষ্ট'-কে লোকদেখানো সম্মান দেওয়া হয় কিন্তু অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সসম্ভ্রম সৎকার করা হয় না; অতি ব্যয়ে উত্তেজক আমোদ-প্রমোদের ধুমধাড়াক্কা করা হয়, কিন্তু আত্মীয় বন্ধু নিয়ে গৃহকোণে অনাবিল আনন্দের শান্ত কুলু কুলু স্রোতটুকু বহাতে পারে না।

বির্জিতলাওয়ের বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমরা সেই সুখশান্তিপূর্ণ গৃহস্থালী পেতে বসেছিলুম। সামনের বড় গির্জার তলায় একটা পুকুর ছিল, তার নাম বির্জি-তলাও,—তাই থেকে বাড়ীর ঐ নাম চলতি হয়েছিল। পুকুরটা এখনো আছে, নামটা আছে কি না জানি নে; কিন্তু অমন যে আকাশচুম্বী গির্জার চূড়া, সেটার কয় বৎসর হল (ভূমিকম্প?) স্বর্গ হতে রসাতলে দারুণ পতন, আবার নবকলেবর ধারণও হয়েছে। বাড়ীটা ছিলো আসামের বিজনী এষ্টেটের হাতে, এবং অবস্থা কাহিল তা আগেই বলেছি। কিন্তু তাতেই আমরা বেশ সুখে ছিলাম। সময়টা বোধহয় ১৮৮৮-৯০র মধ্যে—ঠিক মনে নেই। সুরেনের ৭ ও আমার আই, এ, বি, এ, পরীক্ষার মাঝামাঝি কাল হবে। আমাদের নগণ্য পড়াশুনার আর কি বর্ণনা করবো। যে ঘরে বসে পড়তুম তার লাগাও একটা বস্তি ছিল, তা'তে খুব তারস্বরে মেয়েলী ঝগড়াঝাঁটি হত, আবার আজকের ঝগড়াটা ধামা-চাপা দিয়ে রেখে কাল সেখান থেকেই ক্রমপ্রকাশ্য ভাবে চলতে থাকত মনে আছে। কিন্তু এত চেঁচামেচিতেও আমাদের পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত হত বলে মনে পড়ে না। একজন মাষ্টার আসতেন যাঁর বয়স বা মুদ্রাদোষ বশত অনবরত ঘাড় কাঁপতো, যেমন কাগজের তৈরী বুড়োমানুষ পুতুলের হয়। তিনি বলবেনই যে tiny শব্দের উচ্চারণ teeny, যদিও আমরা তাতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করতুম। মাষ্টার তাড়াবার দরকার হলেই জ্যোস্নাদাদার ৯ ডাক পড়ত; তিনি সংগে সংগে সিঁড়ি নেবে গিয়ে অবলীলাক্রমে বলে' দিতেন—কাল থেকে আর আপনার আসতে হবে না। আমাদের চক্ষুলজ্জাও রক্ষা হত। স্বনামধন্য পারিবারিক বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী ৫ আমাদের ভাইবোনকে সখ করে শেক্ষপীয়র পড়াতেন। 'ওথেলো' পড়াতে গিয়ে নিজেই চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিতেন ত আর পড়াবেন কি? গানের সংগে যে কোন বড় বই হাতের কাছে পেতেন তাই টেনে নিয়ে তাঁর উপর টোকা মেরে তবলার ঠেকা দিতেন,—দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, চোখ বুজে। সবই করতেন, কেবল নিজের পেশা অ্যাটর্নিগিরি যে কখন করতেন, তা' এখন পর্যন্ত বুঝতে পারি নে।

"বিসর্জন" নাটক রবিকাকা ৪ সুরেনকে উৎসর্গ করেছেন, সেটা এই বাড়ীতেই পড়ে' শোনানো হয় এবং "কেদারায় বসি ঠাকুরাণী" যে লিখেছেন, সে আমার মাতাঠাকুরাণীর কথা। নাটকের কথা যদি উঠ্‌লই ত এই বাড়ীতে কত যে নাটক অভিনয় হয়েছে তা' বলে' শেষ করা যায় না। কখন যে আমরা 'পড়াশুনা করতুম তা' কে জানে। কারণ প্রতি নাটকের পিছনে যে কতদিন ধরে মহড়াহাংগাম চলে তাত জানতে কারো বাকি নেই। রূপসজ্জা, অভিনয় সব আপনার লোকের দ্বারাই করা হত। 'রাজারাণী' প্রথম যেবার হল, মনে আছে তার পরদিনই 'বংগবাসী' কাগজে "ঠাকুরবাড়ীর নতুনঠাট" নামে এক লেখা বেরল, তাতে প্রত্যেক ভূমিকায় অবতীর্ণ পাত্রের নাম পাশে পাশে দেওয়া আছে। তার অর্থ এই যে কোন কোন নিষিদ্ধ সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী সেজেছিলেন, সেইটে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—যথা ভাসুর ভ্রাতৃবধু। স্বীকার করি যে সেটা আমাদের সমাজে একটু দৃষ্টিকটু লাগতে পারে,—বিশেষত সেকালে—কিন্তু বাবা ওঁদের ত অত হ্যাঁত-ক্যাঁত ছিল না।

এই বাড়ীর একতলায় ঢুকতেই একটা লম্বা চওড়া বারান্দা ছিল, তারই একধারে ষ্টেজ খাটিয়ে নাটক অভিনয়ের বেশ সুবিধে হত। এইখানেই 'মায়ার খেলা'র সম্ভব দ্বিতীয় অভিনয়

হয়। তার একটা নতুনত্ব এই ছিল যে, মায়াকুমারীর পাট তুলে দিয়ে তার বদলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [৫] ও রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে মদন ও বসন্ত সেজে তাঁদের গান গেয়েছিলেন: যা আগেপরে আর কখনো হয় নি।

পাছে সাধারণ পাঠক মনে করেন নাট্যরসই আমাদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল, তাঁদের সেই ভুল ভাঙগাবার জন্য সংক্ষেপে বলি যে, এই বাড়ীর হাতায় টেনিস ব্যাড্‌মিন্টনও খেলা হত, এবং আত্মীয়স্বজনের হামেশা আনাগোনা গল্পগুজব চলত। একটা ইংরিজি কাগজে পড়েছিলুম the quality of centrality—সেই গুণটি আমার মায়ের ছিল; অর্থাৎ সকলকে নিজের চারদিকে টেনে আনার ক্ষমতা।

আর একটা অভিনব দৃশ্যের উল্লেখ করেই এই বাড়ীর বিনোদনপর্ব শেষ করব। সেটি হচ্ছে সীমান্ত প্রদেশের গিলগিট্ প্রদেশবাসী বিশালবপু Hunza জাতির একটা বীরনৃত্য। কি সূত্রে যে আমাদের এই দুর্লভ নৃত্য দর্শনের সৌভাগ্য হল তা ঠিক বলতে পারি নে। হয়ত সিমলা পাহাড়ে বাসকালীন ঐ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ সাহেবসুবার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে থাকবে, তারা সেই সময় কলকাতার ভিতর দিয়ে কোন কারণে যাচ্ছিল। এইটুকু বেশ মনে আছে যে তাদের স্বদেশোচিত সাজ-সজ্জা এবং বীরোচিত গঠন, সু-চেহারা অঙ্গভঙ্গি ও উদ্দাম নৃত্যে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এমন কি, আমাদের কোন বৌঠাকুরাণীকে এই পক্ষপাত নিয়ে একটু ঠাট্টাঠুট্টিও না করেছিলুম তা' নয়! কোথায় গেলেন সেই মুগ্ধা বৌঠাকুরাণী, কোথায় গেল সেই মনোমুগ্ধকর দৃপ্ত তান্ডব-নৃত্যকারী বীরপুরুষগণ!—নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী।

এখনো 'মায়ার খেলা' হয়, রকমারী নৃত্যনাট্য হয়, আমোদপ্রমোদের রেশন্ বেড়েছে বই কমে নি। কিন্তু সেই হাল্কা নিশ্চিন্ত প্রফুল্ল মনোভাব, সেই বেপরোয়া খামখেয়ালী খোসমেজাজ, সেই আন্তরিক আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গ বন্ধুতা, অহৈতুক অনুষ্ঠান কৈ?

"ওগো সুখ দিন হায় যবে চলে যায়, আর ফিরে আর আসে না।"

বাড়ীর মত মনেরও কি জন্মজন্মান্তর হয় না?

(১) সুরেন ঠাকুর (২) স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র—জোৎস্না ঘোষাল

(৩) অক্ষয় চৌধুরী—আন্দুলের চৌধুরী পরিবারের অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। খুব রসিক লোক ছিলেন, কবিত্ব শক্তিও ছিলো যথেষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় বসতেন—একদিকে অক্ষয় চৌধুরী অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গৎ বাজাতেন আর এ'রা দুজন সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করতেন। তাড়াতাড়ি গান রচনা করার শক্তিতে অক্ষয় চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকেও মাঝে মাঝে হারাতেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মিকী-প্রতিভার "রাঙাপদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা" গানটি অক্ষয় চৌধুরীর রচনা। "উদাসিনী" ও অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি। বিখ্যাত লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী হচ্ছেন তাঁর সহধর্মিণী।

(৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঙালীর বাণিজ্যবৃত্তি

বিনয় ঘোষ

আজকের বাণিজ্য আর সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাণিজ্য নেই, যখন বণিকেরা দেশেবিদেশে জিনিসপত্তর বেচাকেনা করে, বস্তাভর্তি মোহর নিয়ে এসে ঘরে তুলতেন, ব্যবসা চালাতে বা হিসেব মেলাতে যখন হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন হত না। এমন কি, ধনতান্ত্রিক যুগের আদিপর্বের 'বাণিজ্যও' আজ নেই, যখন পুঁজিপতিরা ছিলেন কর্মোদ্‌যোগী entrepreneur. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী—এবং যখন পণ্য ও বাজার দুয়েরই সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। কিন্তু আজকের প্রতিযোগী সমাজে বাণিজ্য বলতে যা বোঝায়, তা এত ব্যাপক ও জটিল ব্যাপার, এবং তার কলাকৌশল দুরস্ত করা এত দুরূহ যে তার জন্য স্বতন্ত্র সব শাস্ত্রগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। এমন কি বেচা-বিদ্যা বা 'সেলস্‌ম্যান-শিপ্‌' এবং বিজ্ঞাপনবিদ্যা পর্যন্ত। একদিকে যেমন মজুর, টেকনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা-বৈচিত্র্য বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে বেড়েছে বাণিজ্য-পরিচালকদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য। এতদিন আমরা জানতাম, পুঁজিপতির পরে—পণ্য যাঁরা হাতে-নাতে উৎপাদন করেন, সেই মজুররাই বুঝি প্রধান। কিন্তু আজ উপরের পুঁজিপতি ও তলার মজুর, উভয়েরই আপেক্ষিক প্রাধান্য কমেছে। মধ্যিখানে ক্রমবর্ধমান এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে ও হচ্ছে, যাঁরা কারখানা আর বাজারের মাঝখানে বিরাট বিরাট আপিসের অট্টালিকায় বসে, উৎপন্ন পণ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেন—ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, অডিটর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্টেনো, সেলসম্যান, ক্লার্ক প্রভৃতি—তাঁরাও আজ কম প্রধান নন। সমাজের এই বিবর্তনকে কেউ কেউ 'ম্যানেজেরিয়াল রেভ্যুলুশ্যন' বলেছেন এবং এই বিপুলায়তন মধ্যশ্রেণীকে বলেছেন 'হোয়াইট কলার' বা "বাবু মজুর"। উনিশ-শতকী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব দুয়েরই বিকাশ আজ এই সামাজিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এযুগের এই মধ্যশ্রেণী নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন, এরকম একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রাইট মিলস্‌ .(সি) তাঁর হোয়াইট্‌ কলার বইতে বলেছেনঃ

"The nineteenth century farmer and businessman were generally thought to be stalward individuals—their own men who could quickly grow to be almost as big as anyone else. The twentieth-century white-colour man has never been independent . . He is always somebody's man, the Corporation's, the governments', the army's, and he is seen as the man who does not rise. The decline of the free entrepreneur and the rise of the dependent employee . . has parallelled the decline of the independent in dividual and the rise of the little man."

'লিটল্‌ ম্যান' কথার মধ্যে যদিও মিডিয়োক্রিটি বা মাঝারিত্বের ভাব নিহিত আছে, তাহলেও 'লিটল্‌ ম্যান' কথার বদলে মিডিওকার ম্যান বললে বোধ হয় আরও যুক্তিযুক্ত হয়। বড়দের যুগ এবং তার সঙ্গে ছোটদের যুগ, দুইই আজ নিশ্চিত অস্তাচলে। বর্তমান যুগ সবদিক দিয়েই মাঝারিদের যুগ। সমাজের সর্বক্ষেত্রে মাঝারিদের প্রভাবই দোর্দণ্ড। আমাদের ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তার যাবতীয় লক্ষণ আজ সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট। 'হোয়াইট্‌ কলার' বলতে

যা বোঝায়, সারা ভারতের মধ্যে বোধহয় বাংলাদেশেই তার সংখ্যা বেশী। কেন বেশী, সেই কথাই বলব।

তা বলতে হলে প্রথমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের কথা, তারপর বিদ্যার কথা বলব। অনেকেই জানেন যে সমুদ্রকূলের নদনদীবহুল দেশ বলে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে বাণিজ্যের বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল যথেষ্ট। তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর এবং 'সিটি অব্ গংগে' বা গঙ্গা-নগর সেই সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে কোথাও প্রাচীন গঙ্গা-নগরের বিকাশ হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলের কাছে কোথাও ছিল বড় বন্দর এবং গঙ্গানগরের পত্তন হয়েছিল 'পোর্ট টাউন' বা বন্দরনগর-রূপে। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে মধ্যযুগে এলেও, বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীর বিকাশের বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশে। বর্ধমান জেলার গলসী থানার মধ্যে মল্লসারুল নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের, অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের, একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাতে এই অঞ্চলে তখন যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। যেমন 'বক্কতক' বা বাক্তার হিম দত্ত, বটবল্লকের ষষ্ঠী দত্ত, শ্রীদত্ত, গোধগ্রামের মহি দত্তও রাজ্যদত্ত। এই হিম দত্ত, ষষ্ঠীদত্ত, শ্রীদত্ত, রাজ্যদত্ত, এঁরা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে দত্তরা অন্যতম। এঁরা মনে হয় এই বণিক দত্তদেরই পূর্বপুরুষ। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এঁরা এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির জন্যে। বাংলাদেশের এই সব বণিকসম্প্রদায়, বংশপরম্পরায় বাণিজ্য করে, প্রচুর বিত্ত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। হাজার-বার-শ' বছর পরেও এঁদের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে।

ধনপতি সদাগর আমি বসি হে উজানী
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী

বিখ্যাত ধনপতি সদাগর এই বলে খুল্লনার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। "বিদিত অবনী" বলতে 'ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড' বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়, এবং তাতে আশ্চর্য হবার, বা নিছক কবিকল্পনা বলে তাকে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই। বাঙালী বণিকেরা তখনও নানা-গড়নের বাণিজ্যতরী নিয়ে দূর বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। উজানি-নগরে ছিল ধনপতির বাস। অজয় নদের তীরে, বর্ধমানের উজানি-কোগ্রাম এই উজানি-নগর। কেবল নামের সাদৃশ্য থেকে এই ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা বলছি না। সাহিত্যের সমস্ত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গের এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রদক্ষিণ করলে বর্ণে বর্ণে মিলে যায়। কেবল ধনপতি সদাগরের উজানিনগর নয়, চাঁদ সদাগরের চম্পকনগরও এই অঞ্চলে। খুল্লনার পাত্র-নির্বাচন প্রসঙ্গে বণিকদের যেসব নাম ও বসতির উল্লেখ আছে, তা এই-ঃ চম্পকনগরের চাঁদ সদাগর, বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের রাম দাঁ, বড়শূলের হরি দত্ত, ফতেপুরের রাম কুণ্ডু, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লুকির সোম চন্দ্র। ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের নামধামের তালিকা আরও বিস্তৃত—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তালিকাটি এই ঃ বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাই-নগরের চাঁদ সদাগর, লক্ষ্মী সদাগর, কর্জনার নীলাম্বর বণিক ও তাঁর সাত ভাই, গনেশপুরের সনাতন চন্দ, তাঁর ভাই গোপাল ও গোবিন্দ চন্দ, দশঘরার বাসুলা, সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা ও রাম দাঁ, সাঁকোর শঙ্খ দত্ত, বিষ্ণু দত্ত ও তাঁর সাত ভাই, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, জাড়গ্রামের

রঘু দত্ত, তেঘরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায় ও তাঁর দশ ভাই, লাউগাঁর রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, খণ্ড ঘোষের বাসু দত্ত, গোতানের রাম দত্ত, ইত্যাদি—

একে একে বণিকের কত কব নাম
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি ধাম॥

সাত শত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে-সব গ্রাম থেকে তাঁরা এসেছিলেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি আজও স্বনামে বর্তমান রয়েছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-হুগলী-হাওড়ায় গ্রামগুলি ছড়ানো। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এলোমেলো-ভাবে ছড়ানো নয়, একটা ধারা অনুযায়ী যেন গ্রামগুলি বিন্যস্ত। অর্থাৎ দমোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর, সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার গ্রামীণ সমাজে আজও বণিক-সম্প্রদায়েরই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক। গ্রামে পা দিলেই সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, বড় বড় অট্টালিকাবহুল যেসব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক সুবর্ণবণিক তন্তুবণিক প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের পাড়া। এগুলি সবই হল, মধ্যযুগের একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আধুনিক যুগের মতো মধ্যযুগে 'ফ্রি ট্রেড্' বা 'অবাধ বাণিজ্য' বলে কিছু ছিল না। সামন্তরাজাদের বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট এবং সেই সব নিষেধের দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করে, বণিকশ্রেণীর পক্ষে তখন সমৃদ্ধ হওয়া খুবই কঠিন ছিল। সামন্ত-বণিকের এই দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে কোথাও বিরল নয়। আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমী সমাজে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল, বণিকরা জাতিবর্ণগতভাবে চিরদিন উপেক্ষিত। সমাজের অবহেলা ও রাজার বিদ্বেষ, দুইই উপেক্ষা করে বণিকেরা নিজেরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গঠন করেছেন এবং 'কোর্ট টাউন' বা রাজনগরের উপকণ্ঠে, অথবা দূরে দূরে নদীতীরের বন্দরে বন্দরে, তাঁরা স্বতন্ত্র বসতি, পত্তন ও নগর তুলেছেন। এত বাধা, এত অনাদর ও উপেক্ষা সত্ত্বেও, বাংলার বাণিজ্যের অবনতি হয়নি কখনও। তবে এই বাধার ফলে এদেশের সমাজে একটা বড় রকমের বিপত্তি ঘটেছিল মনে হয়। সেই বিপত্তির হাত থেকে, পরবর্তীকালে, অর্থাৎ আজও আমরা মুক্তি পেয়েছি বলে মনে হয় না। সেই বিপত্তি হল—বণিকেরা বাণিজ্য থেকে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছেন, তা হয় মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন, না হয় উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতায় ব্যয় করেছেন, মূলধন হিসেবে তা পণ্য-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেননি। তার জন্য এদেশের বাণিজ্যের এত উন্নতি সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং ইয়োরোপের মতো শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ মনে হয়, এদেশের বণিকেরা নির্মম সামাজিক উপেক্ষার জন্য, নিজেরাও ক্রমে সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে ডানাগুটিয়ে ফেলেছেন এবং সর্বসাধারণের বা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতির কথা চিন্তা করবার মতো তেমন কোন প্রেরণা পাননি। দ্বিতীয় কারণ হল, এদেশের সমাজের কর্ণধাররা ও শাস্ত্রকারেরা সাধারণ মানুষের সামনে—"নেংটি পরে, দুবেলা দুমুঠো শাকান্ন খেয়ে" কাটানোর সরল জীবনযাত্রার নীতি-মাহাত্ম্য এত জোর গলায় প্রচার করে এসেছেন যে, সমাজে পণ্যবোধ বলেই কিছুই জাগেনি কোনদিন এবং যুগ যুগ ধরে বৃহত্তম মানুষের 'কন্‌জামশান প্যাট্যার্ন' বা পণ্যদ্রব্য ভোগের রীতি বদলায়নি—তার ফলে নতুন নতুন চাহিদা ও অভাবের সৃষ্টি হয়নি। দারিদ্র ও প্রকৃতিনির্ভর সারল্যকে এই নীতির দোহাই দিয়ে আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী করা হয়েছে। শিল্পের প্রেরণা জাগেনি, যন্ত্র-উদ্ভাবন বা শিল্পবিপ্লব কিছুই ঘটা সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগের ব্রিটিশ রাজত্বকালে যখন আধুনিক যুগের সূচনা হল এদেশে, তখন

ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশই হল তার প্রাণকেন্দ্র। স্বভাবতঃই তা নবযুগের অর্থনৈতিক মনোভাব নতুন নতুন বাণিজ্যিক উদ্যম-উদ্‌যোগের মধ্যে, সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেল বাংলাদেশে। কিন্তু প্রকাশ পেল কি ভাবে? বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিদের বিকাশ হল, সত্যিকার পুঁজিপতিদের দেখা গেল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী বেনিয়ানরা ছিলেন interpreter, head book-keeper, head-secretary, head broker, the supplier of cash and cash-keeper' আর যা ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের যে চরিত্র গড়ে উঠেছিল, তারও আভাস পাওয়া যায় তখনকার ঐতিহাসিক দলিলপত্র থেকে— "They knew all the ways, all the little frauds, all the defensive armour, all the articles and contrivances, by which abject slavery secures itself against the violence of power." অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বেনিয়ানি করে অনেক বাঙালী প্রচুর বিত্ত ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্রুর দত্ত, হিদারাম ব্যানার্জি, বারানসী ঘোষ, গোকুল ঘোষাল, দুর্গাচরণ মিত্র, দয়ারাম দত্ত, মনোহর মুখার্জি, মদন দত্ত প্রভৃতি অন্যতম। কলকাতা শহরের অনেক রাস্তা ও অলিগলি আজও এঁদের সেকালের সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্মৃতি বহন করছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উনিশ শতকে অনেক বাঙালী আশ্চর্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্‌যোগী বাঙালী ব্যবসায়ী সেযুগে আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, এঁরা বিশ্বব্যাপী এক সুবিস্তৃত বাণিজ্যের জাল বিস্তার করেছিলেন। এরকম প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সারা ভারতবর্ষে সেদিন আর কেউ পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। এমনকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রদূত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে নবযুগের এই নতুন অর্থনৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রামমোহন রায় বেশ কিছুদিন তেজারতী কারবার ও বেনিয়ানি করেছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে ছাপাখানা, বিশেষ করে বইয়ের ব্যবসার আদি-প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের স্বনামধন্য মুখপাত্রদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা কোন অংশে তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের তুলনায় কম গৌরবের নয়। এই সব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় যে পশ্চিম থেকে অন্যান্য আদর্শগত ভাবধারার সঙ্গে 'ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' এর অর্থনৈতিক ভাবধারারও এদেশে আমদানি হয়েছিল এবং তা একশ্রেণীর বাঙালীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু—এবং খুব বড় "কিন্তু" হল—এই সব অনুপ্রেরণা ও উদ্যম-উদ্‌যোগের মধ্যে একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত ছিল প্রায় গোড়া থেকেই। সেই ট্র্যাজিডি হল 'ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' কোনদিনই প্রকৃত 'ফ্রিডম্' বা স্বাধীনতা পায়নি—এমননি পাবার আকাঙ্ক্ষাও তেমনভাবে বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রকাশ পায়নি—যদিও তার সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হয়েছিলেন। তখনকার উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্রগুলি, বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গলদলের পত্রিকাগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পণ্যের লেনদেন বা 'কমার্স'-এর বদলে তাঁরা বাঙালী ব্যবসায়ীদের পণ্য-উৎপাদনের দিকে বেশী করে মনোযোগ দেবার অনুরোধ করছেন। কিন্তু সে-সব আবেদন অরণ্যে রোদনের মতো ব্যর্থ হয়েছে। কেন এই ট্র্যাজিডি বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ঘটেছে, আজ তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

ইয়োরোপের রেনেসাঁসের যুগের মতো, আমাদের দেশেও নবযুগের দুটি সক্রিয় গতিশীল শক্তির আধার হল **বিত্ত** ও **বিদ্যা**। এই দুই শক্তির জোরে নতুন সমাজের গড়ন আরম্ভ হল।

সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি হল এই দুটি। এর মধ্যে যে কোন একটির জোরেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। আর এই দুটিরই অর্থাৎ বিত্ত ও বিদ্যার মণিকাঞ্চন-যোগ কারও জীবনে ঘটলে তো কথাই নেই—তিনি মধ্যযুগের দেবতার মতো সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেন। বাঙালীরা বিত্ত অর্জন ও সঞ্চয় করলেন বটে, কিন্তু তার অধিকাংশ উবে দিলেন বিলাসিতায় ও উচ্ছৃংখলতায়, পারিবারিক আত্মকলহের মামলা-মোকদ্দমায়, এবং বাকিটুকু মাটিতে পুঁতে ফেলে, অর্থাৎ জমিদারী কিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দিলেন। বাঙালীর সঞ্চিত বিত্ত সক্রিয় মূলধন হল না, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হল না তেমন। বাকি রইল **বিদ্যা**। বিত্তের মূলধন ছেড়ে আমরা বিদ্যার মূলধনটি আঁকড়ে ধরলাম। ইংরেজরা সেইদিকেই আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন। নবযুগের এই বিদ্যাও মূলতঃ হল বণিক মনোভাবাপন্ন। অর্থাৎ বিদ্যা যাই হোক তাতে ক্ষতি নেই, কেবল স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেটে নানারকমের সব বাহারে 'লেবেল' মারা থাকলেই হল। প্রথম যুগে আমরা বিদ্যার পুঁজিপতি হয়ে, আশপাশের বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রদেশে তো বটেই, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে গেলাম। তারপর প্যাকেট-লেবেল আঁটা বিদ্বানের সংখ্যা এত বেড়ে যেতে লাগল যে প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের যদিও 'ক্যাপিটালিষ্ট অব এডুকেশন' বলা যায়, পরবর্তী যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের নিঃসন্দেহে বলা যায় 'এডুকেটেড প্রোলেতারিয়েত'। এদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তই বলুন, অথবা বিদ্বান বিত্তহীনই বলুন, গোড়াতে যে সমাজের 'মাঝারি' শ্রেণীর কথা বলেছি, বিদ্যার ক্ষেত্রেও আজ বাংলাদেশে সেই মাঝারিদের সংখ্যা বন্যাস্রোতে বেড়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্য বর্তমান সমাজেরই একটা বিকৃত উপসর্গ, কেবল বাংলাদেশের নয়। এই উপসর্গ সম্বন্ধে একজন স্বনামধন্য সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "Education is one of the major areas in which the spirit of inquiry is on the decline . . . The retailing of knowledge in standard packages paralyses the impulse to question and to inquire. Knowledge acquired without the searching effort becomes quickly obsolescent, and a civil service or a profession which depends on a personnel whose critical impulse is benumbed, becomes rapidly inert and incapable of remaining attuned to changing circumstances (Sociology of Culture, P 1673.

'রিসার্চ' বা গবেষণার মধ্যেও আজকাল যতটা আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা বা "স্পিরিট অব্ এনকোয়ারি" না থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে 'লেবেল' পাওয়ার আগ্রহ ও ব্যস্ততা। সারা ভারতবর্ষে এক সময় বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এবং এখনও অনেকটা আছে বলেই, সংকট বাংলাদেশে তাই খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। বিত্তের মূলধন ছেড়ে কেবল বিদ্যার মূলধন নিয়ে আমরা একশ-দেড়শ বছর আগে যে-পথে যাত্রা করেছিলাম, সে-পথ তখন যেমন সহজগম্য ছিল, এখন আর তা নেই। সে-পথ এখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর কলরবে মুখর। তার জন্য আমাদের নৈরাশ্যচেতনা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে এবং আমাদের অসহায় আক্রোশ কখন সংকীর্ণ 'চৌভিনিজম্'-এর চোরাগলিতে, কখনও বা আত্মঘাতী কলহে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু নৈরাশ্য বা আক্রোশ কোনটাই আমাদের পথ দেখাবে না। স্থিরভাবে আমাদের এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কাজ করা। সমস্যা বা সংকট যখন প্রকট হয় তখন পরোক্ষভাবে তা মঙ্গলের জন্যই হয়। সমাজের ইতিহাস অন্ততঃ সেই কথা বলে। কারণ সংকটের মধ্যেই সমাজ-মানসে উত্তরণের চেতনা জাগে, সেই চেতনা নতুন নতুন কাজকর্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সেই চেতনা ও প্রেরণারও আজ প্রকাশ হচ্ছে বাংলাদেশে। সেইটাই আশার কথা।

সুরের সন্ধানে

অমিয়নাথ সান্যাল

ইতিহাস-পূর্ব কালের মানুষ চোখে-দেখা জগতের সৌন্দর্য অনুভব করেছিল, সন্ধানও করেছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন পাথরের গায়ে খোদাই করা ছবির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তরযুগের অরিগ্‌নেশিয়ান মানব-গোষ্ঠী সামান্য অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে সেই পাথরের গায়ে বিচিত্র ছবি এঁকেছিলেন। এরকম বর্ণশিল্প আর ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। সুন্দর সুন্দর রেখা গতি-ভঙ্গিমা আর পারস্পরিক সাম্য-ভাবগুলি এতই চমৎকার ও রমণীয় যে আধুনিকযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ও চিত্র-সমালোচকবর্গ একযোগে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেননি। চিত্র-ভাস্কর-কলা শিল্পের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রোজারফ্রাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন। তিনি সমালোচনা করে বলেছেন,—'বিশেষ ক'রে এই অরিগ্‌নেশিয়ান রেখা-চিত্রগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি উত্তম গুণ আর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যা আজকের যুগের চিত্র-নির্শনের পক্ষেও বিরল।' ফ্রাই সাহেবের বক্তব্য পড়ে আমার কেবলই মনে হয়, পুঁথি-পাতি থেকে ইট-পাথর সুচিরকাল স্থায়ী বলেই ইতিহাস-পূর্ব মানুষের কিছু মনের কথা আর হাতের কাজের প্রমাণ রহস্য এখনও গোচর হতে পারল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এরকম অকাট্য প্রমাণকে বলতেন "পাথুরে প্রমাণ।" নিরেট সাল-তারিখঠাসা চৈতন্য কল্পনা-বুদ্ধিকে সহজেই অবহেলা করে। তবে পাথরে আর মাথায় ঠেকাঠুকি হ'লে অন্য রকমের পৌরাণিক চৈতন্যের দরজা খুলে যেতে পারে, এই ছিল শাস্ত্রী মহোদয়ের ইঙ্গিত।

কিন্তু—ইতিহাস-পূর্ব কালের মানুষ শব্দের বা সুরের অক্ষর লিপিও উদ্‌ভাবন করতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে পাথুরে প্রমাণও পাওয়া গেল না! তবে কি বুঝব, তখনকার মানুষ কথাই বলত না? তাদের কণ্ঠে কি গানের সুর ছিল না! তখনকার জননী কি ঘুম-পাড়ানি সুর দিয়ে অশান্ত শিশুর চোখে তন্দ্রা সঞ্চার করেন নি! তখন কি একটাও সুরেলা পাখি ছিল না? অথবা, থাকলেও সেকালের মানুষ পাখির সুর শুনে বিস্মিত পুলকিত হয়নি?—যেহেতু পাথরে খোদাই করা স্বর-লিপি পাওয়া যাচ্ছে না!

এ রকম এক তরফা রায় স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে চিন্তার কথা আছে।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা বলেন, মানব শিশুর সম্বিদ্ সর্বপ্রথমে শব্দই সন্ধান করে; শব্দ-প্রত্যয়ই হল প্রাথমিক প্রত্যয়। চাক্ষুষ প্রত্যয় ও রূপ-সন্ধান কিছুকাল পরে ঘটে। সুতরাং শিশুর পক্ষে শব্দ-জগতের সৌন্দর্য বোধ করার বৃত্তি সর্বপ্রথমেই উন্মেষিত হওয়ার কথা। বস্তুত, এ রকম ঘটতে দেখা যায় না; সাধারণত। এর কারণ আছে। রূপ-সন্ধানী বৃত্তি পরে দেখা দিলেও, বাহ্য প্রকৃতির দৃশ্য পদার্থের রূপ, সংখ্যা ও বৈচিত্র্য শব্দ-জগতের শ্রব্য বস্তু থেকে অনেক গুণে বেশী হওয়ার কারণে রূপ-সন্ধানী বৃত্তির অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক আলোড়ন ঘটতে থাকে। এর ফলে, চক্ষুগ্রাহ্য ব্যাপার বা বস্তুর সৌন্দর্যবোধ শীঘ্রই ঘটে। অন্য দিকে, শব্দ-জগতে সুরেলা পাখি নিতান্ত বিরল; কাক, চিল, চড়ুই পাখিরাই দলে ভারি। আঁতুড় ঘর থেকে বার হয়ে এলেই যে প্রত্যেক শিশুর কান বীণা বা পিয়ানো বা বাঁশীর সুর শুনতে পাবে, এমন সম্ভাবনা এখনও নিতান্ত অল্প। সুতরাং, আদিম মানবের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্ভব-অসম্ভব সুন্দর-অসুন্দর অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারি, তখনকার দেশ-কাল অনুযায়ী মানব

বা মানবশিশুর পক্ষে দৃশ্য জগতের কিছু কিছু সৌন্দর্য অনুভব করাই সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু শব্দ জগতের সৌন্দর্য বলতে কিছুই ছিল না। এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম হল মাতা-ধাত্রীবর্গের মুখের সোহাগের সুর, এবং ঘুমপাড়ানি গান। শিশুর শব্দ-সন্ধানী বৃত্তি দিয়ে আনন্দ বা চমৎকৃতি আহরণ করার প্রাথমিক সম্ভাবনা বলতে ঐ সোহাগের সুর আর ঘুমপাড়ানি সুর। তাও, বিচার করে দেখা যায়, সোহাগ-মধুর সুর বা ঘুম-পাড়ানি সুর যতই মধুর হক—সংখ্যায় বড় বেশী ত' তিনটি বা চারটি সুর। অথচ—চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত আলোকের বাহনে সাদা, কালো, লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কমলা রংএর ছড়াছড়ি ঠেলাঠেলি! মানব-শিশু ও আদিম মানব সৌন্দর্যসন্ধানে যে সর্বপ্রথমে দৃশ্যমান জগতের দিকে ছুটে যাবে, এ আর এমন আশ্চর্য কি!

মনোবিজ্ঞানের অন্য একটা কথাও চিন্তা করা উচিত। শিশুরও বাল্যাবস্থাতেই সর্বপ্রথম বিস্ময়, পুলক, হর্ষ ও প্রীতির ভাবগুলি জেগে ওঠে। কষ্ট বা খেদ ত' আছেই; কিন্তু—এগুলি সৌন্দর্যসন্ধানী বৃত্তির উন্মেষ করে না বলেই সাম্প্রতিক আলোচনার বাইরে। যাই হক, বিস্ময়, পুলক প্রভৃতি ভাবের উন্মেষের অনেক পরে নীতি ও সম্বন্ধের জ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও হিতাহিত বোধ দেখা দেয়। এ সমস্ত নৈতিকজ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি শিক্ষার প্রভাবেই সংস্কারের রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু এগুলি যথার্থত মানব-মনের স্বভাব-লক্ষণ কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ও মতভেদ আছে। যাই হ'ক সৌন্দর্যসন্ধানী বৃত্তিটি যে স্বভাবগত এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ নেই।

সকলেই লক্ষ্য করতে পারি যে নিতান্ত সহজ এবং অবশ্যই কিছু রমণীয় অনুভবের বশেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপনা থেকে কিছু গানের সুর গুন্‌গুন্‌ করতে চেষ্টা করে, তালে তালে তাই দিতে চেষ্টা করে বা গাত্রভঙ্গি করতে চেষ্টা করে। এবং আপনা থেকেই হয়ত কিছু ছবি বা রেখা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এরকমের অদ্ভুত প্রয়াস ও জীবন-সংগ্রামের মধ্যে কিছু মাত্র বাধ্যতামূলক সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় না। যে সব ছেলেমেয়েরা গুন্‌গুন্‌ করে না, তালে তাল দেয় না, বা আপনা থেকেই ছবি আঁকেনা, তারা যে ভবিষ্যৎ জীবনে পরাজিত হতে বাধ্য এমন কিছুতেই বলা যায় না। আবার যারা বাল্যকাল থেকেই গুন্‌গুন্‌ করে বা ছবির আঁচড় টানে, মাত্র তারাই যে ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করবে, এমনও কিছু নিশ্চয়তা নেই। বরং অনায়াসে মনে করা যায়, এগুলি হ'ল যেন ঐচ্ছিক প্রেরণা (অপশন্যাল ক্রেভিং) এবং এদের মূলে সৌন্দর্যসন্ধানীবৃত্তি মোটের উপর অপ্রয়োজনীয় এক রকম ব্যবস্থা। জীবনের সমস্ত কিছু গুণ ধর্ম বা কর্ম যে প্রয়োজনীয় হতে বাধ্য, এমন ধারণা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে। দেহবিজ্ঞানবিশারদ জ্ঞানীরা এ কথা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে পারেন।

যাই হ'ক, শব্দ-প্রতীতি ও চাক্ষুষ-প্রতীতি এই দুটির সম্মিলিত ছোট্ট জগতের অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র রমণীয় অনুভবগুলি মিলেমিশে বালক-বালিকাদের মনে সৌন্দর্যবোধ উন্মেষিত করে, এবং নূতন করে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় যখন আমরা তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদেরকে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি কৃত্রিম অক্ষর-লিপি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি, তখন তাদের মনে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আলোড়ন বা বিপর্যয় ঘটে। কারণ, 'কমলালেবু' নামের আদিতে 'ক' শব্দটি নেহাৎ মন্দ শোনায় না। কিন্তু—'কমলা' এবং অন্য সহস্র সহস্র ক-কারাদি শব্দ থেকে মাত্র "ক" নামে একটা শব্দ বেছে নিয়ে, সেই শব্দটি কাগজের উপরে যখন লেখা হয়, তখন সেই লেখার মধ্যে না থাকে সৌন্দর্য, না থাকে কোনও ধ্বনি বা বস্তু-সম্বন্ধের মাধুর্য! ক-কার শব্দটি কানে শোনা জগতের প্রতীতি; অধিকন্তু—"কাক ডাকে কা কা" অভিজ্ঞতার কারণে

এই প্রতীতি অসুন্দরের কোঠায় পড়ে থাকারই কথা; ভাগ্য 'কমলা লেবু' কাঁদিয়ে আরম্ভ, তাই রক্ষা। যাই হক,—কানে-শোনা শব্দগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, চোখে-দেখা বলতে জগতের গুদামের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে, স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত এবং গুণান্তরিত করে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনা করতেই হবে। কারণ, দুর্লভ মানব জন্মের ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে এরাই হবে প্রধান সম্বল। বালক-বালিকারা এই ভবিষ্যৎ ফলের কথা চিন্তা করেনা। তারা অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ করে; পরে, সহ্য করতে শেখে; শেষে সহ্য করাটাই সংস্কারে পরিণত হয়। ব্যাপারটি আগাগোড়াই অদ্ভূত। অন্নসংস্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে বলেই শিক্ষাভিমানী মানব একে মেনে নিয়েছে। ফল কথা, অক্ষর-লিপির মধ্যে শব্দ-জগতের সৌন্দর্য ত' নেই'ই, এমন কি চাক্ষুষ জগতের সৌন্দর্যও নেই। ছেলেমেয়েরা আপনা থেকে ফুল, বা বিড়ালের ছবি আঁকার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু—মেঘদূত কাব্যের লিপির অনুকরণ করতে চেষ্টা করে না।

তাই যদি হয়,—তাহ'লে আদিম মানবের পক্ষে সোহাগের সুরের, বা ঘুম-পাড়ানি গানের সুরের স্বরলিপি রচনা কী করে আশা করব! সুপ্রাচীন কোন কোনও মানব-গোষ্ঠী সহজাত সংস্কার দিয়ে কানে-শোনা জগতের সুর বা বিরল সৌন্দর্য অনুভব করেছিল। হয়ত' গুনগুনও করত। কিন্তু—সেই সুরের বা সৌন্দর্যের পরিচায়ক প্রতীক অর্থাৎ অক্ষর-লিপি বা স্বরলিপি উদ্‌ভাবন করেনি। রূপ দেখে চিত্রে প্রতিরূপ করা, অথবা, গান শুনে সুরের অনুকরণ করা—এ দু'টি কার্য নিতান্ত স্বাভাবিক অনুকরণধর্ম। এ রকম ব্যাপার উদ্‌ভাবন শক্তির অপেক্ষা করে না। ইতিহাস-পূর্বকালের সুরেলা মানুষ সুরের অনুকরণ করতে পারলেও সুরকে ধরে বেঁধে রাখতে পারেনি,—যেমন করে একালের গ্রামোফোন রেকর্ডে বা টেপ্‌-রেকর্ডে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনেই কি পৃথিবীর সমস্ত গান-সুরের স্বরলিপি করা হচ্ছে! তা যখন হচ্ছে না, তখন ইতিহাসপূর্ব-কালের মানবের কণ্ঠে সুর ছিল না, বা সম্বিদে সুর-স্মৃতি ছিল না, এ কথাই বা কি করে বলি।

সুর-স্মৃতির প্রসঙ্গে সুর-প্রতীতি নামে বিশেষ এক রকমের দেহ-সংবিদ যুগ্ম ব্যবস্থার কথা এসে পড়ে। এ বিষয়ে দেহ-বৈজ্ঞানিক ও শব্দ-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের পরীক্ষা-মূলক সিদ্ধান্ত অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হেলম্‌হেলেজের বক্তব্যই অনুধাবন করা যায়।

মানুষের দু'কানের অন্দর-মহলে প্রত্যেকটিতে একটি করে আড়াই-পেঁচি সুড়ঙ্গ বা নালিকা আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, সুড়ঙ্গের চারিধারে অসংখ্য অনু-পরিমাণ তন্তু কোষ সাজান আছে; যেমন পিয়ানো যন্ত্রের তারগুলি। প্রত্যেকটি তন্তুকোষ এক একটি সুর বা ধ্বনির শক্তিতে বর্ণিত বা অনুরণিত হ'তে পারে। এই অনুধ্বনির তরঙ্গ-কম্পনগুলি শব্দানুভবিক স্নায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে সংবিদের মধ্যে সুরের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাইরের আকাশ বয়ে কান পর্যন্ত যেটা আসে সেটা হ'ল মাত্র শব্দ-তরঙ্গ; সুর নয়। কানের অন্দর মহলে ভাল-মন্দের যেন একটা বাছাই হয়। ভাল জিনিষটাই স্নায়ুগত কম্পন বা উত্তেজনার রূপ যখন সংবিদে ঘা দেয়, তখন সেটা হয় সুর। এই সুর বস্তুত একটি প্রতীতি মাত্র। সংবিদ্‌ বা চেতনা বারে বারে একই রূপে উত্তেজিত হ'লে, এবং সুর-প্রতীতি সুষ্ঠু ও স্থায়ী হ'লে সংবিদের মধ্যে 'সুর-স্মৃতি' নামে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গান-বাজনা করা বা শোনার পক্ষে এই সুর-স্মৃতির ব্যবস্থা একেবারেই ন্যূনতম অপরিহার্য। কারণ, সুরের পর সুর উত্তেজিত হচ্ছে; পূর্ববর্তী সুর স্মৃতিতে না জমলে সমস্তই বিফল। যাই হক, ঐ আড়াই পেঁচি সুড়ঙ্গ, তন্তুকোষ, স্নায়বিক উত্তেজনা এবং সুরপ্রতীতি এই চারটি মিলে ব্যবস্থাটি

সম্পূর্ণই বাস্তব ও দৈহিক। এই ব্যবস্থার ফলে সুর-প্রতীতির অধিকন্তু অন্য এক রকমের সংস্কার গড়ে ওঠে। যথা,—নিতান্ত সাধারণ মানুষ, যে একবার মাত্র বেহালার সুর শুনেছে আর কণ্ঠের সুর শুনেছে, সেও না দেখে মাত্র সুর শুনেই বলতে পারে, এটা বেহালার আওয়াজ, না কি কণ্ঠধ্বনি। আরও আশ্চর্য এই যে, সাধারণ মানুষ আর উঁচু দরের শিল্পী এঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেই। কথাটি হ'ল যেমন—মানুষের হাতে আঙুলের পেশী বিন্যাস একই রকম; কেউ হয়ত, বীণা বাজান, কেউ বা সেলাই করেন। বীণাবাদন পক্ষে বা সেলাইএর কাজ পক্ষে পৃথক ব্যবস্থা করতে হলে, দেহপ্রকৃতি তার চাকরি ছেড়েই দিত।

মানব ইতিহাসের অতি-প্রাচীন যুগেই এই বিচিত্র ব্যবস্থা ঘটে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। অন্তত, অসম্ভব নয়। কারণ সুরবোলা পাখিরাও স্বভাবজন্য কাকলির অতিরিক্ত সাঙগীতিক সুর অনুকরণ করতে পারে, এ কথা সত্য। পাখি মানুষ থেকেও আদিমতর জীব। তার কানের মধ্যে যদি ওরকম জৈব-প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা থাকতে পারে তাহ'লে আদিম গোষ্ঠীর মানবের মধ্যে কোন কোনও মানব-গোষ্ঠীর পক্ষে ওরকম ব্যবস্থা পূর্বসিন্ধ রূপে থাকায় এমন আশ্চর্য কি!

অবশ্য, আদিম মানব বজ্রধ্বনি শুনে কানে হাত-চাপা দিয়েছে, হিংস্র বন্য জন্তুর নানা রকমে উচ্চারিত শব্দ শুনে ত্রস্ত ও সতর্ক হয়েছে; গাধার মুখের উল্লাস-ধ্বনি আদিম মানবের কানেও উদ্‌ভট বোধ হয়ে থাকবে। আদিম মানব যে শব্দ বাছাই করতে পেরেছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, এ বিষয়ে অক্ষম হলে হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়ে কোনও মানুষও হয়ত বেঁচে থাকতে পারত না। এবং—শব্দ-বাছাই করার শক্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে সুর বাছাই করার শক্তি ও প্রবণতা উদ্‌ভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই; কারণ সুর যতই মধুর হক, সমস্ত সুরই মূলে শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এক কথায়, শব্দ-মাধুর্য বোধ করার শক্তি যে পরে এবং ক্রমশ দেখা দিয়েছে, এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি।

শব্দ-মাধুর্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় দেখা দিতে হয়ত যুগের পর যুগ কেটে গিয়েছে। জগতের সর্বস্থানের আদিম মানবই যে সমান ভাবে মাধুর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল এমন মনে করা যায় না। যে দেশের মানব-গোষ্ঠী সহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্তিময় জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছিল, বিশেষ করে, নাতিশীতোষ্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে যে সকল দেশে বা যে দেশে বসন্তাদি করে ছয় ঋতুর সম্যক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই দেশের লোকই জৈবোত্তর ও অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্য-সন্ধানের কার্যে অগ্রণী ছিল—এরকম সিদ্ধান্ত করা অযুক্ত নয়। কারণ সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্য বলতে গুণ ও ভাবগুলি সর্বথা দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর অবাধ ক্রিয়া, এবং বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সুকুমার বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। উৎসব-উত্তেজনার **হুড়োহুড়ি, চিৎকার-কোলাহল, আসবাদি পানের সহযোগে ব্যসন প্রমত্ততা এবং অনুক্ষণ শত্রু প্রত্যাশায় সাজসাজ মনোভাবের মধ্যে দিয়ে** ইতিহাস-পূর্বকালের মানব গোষ্ঠী যে শব্দ-মাধুর্যের সন্ধান পায়নি একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ—শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দু'রকম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। একটি মোটা, অন্যটি চিকন। চট শেলাই করার ছুঁচ হল মোটা; সেই-টেই আগে দেখা দিয়েছে। আর কাশ্মিরী শালের উপরে লতা-পাতার নক্‌সা তোলার ছুঁচ হল চিকন্‌। নক্সা তোলার কারণে শালটি যে বেশী গরম হয়, তা নয়। তবুও —অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্য বোধ উন্মেষিত হয়েছিল বলেই ত শালের উপরে নক্সার সাধ হয়েছিল, আর, সাধ হয়েছিল বলেই ত' কামারকে সাধ্য-সাধনা করে নক্সা-তোলার ছুঁচ যোগাড় করতে হয়েছিল! এবং —প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নানা রংএর ফুল আর নানা রং-এর লতা পাতার রমণীয়তা বোধ

না হলে—কাশ্মিরী ওস্তাদ্‌বর্গ ওরকম আয়াসসাধ্য কাজে হাতই লাগত না। মানুষের সংবিদে **সুকুমার বৃত্তির** অভ্যুদয়ের পক্ষে এই হল সাধারণ ইতিহাস। সমস্ত চারুশিল্পকলা সুকুমার বৃত্তির অপেক্ষিত। মাটির ঘরের উঠানে গোবর-জল ছড়া দেওয়া হয়, জৈব প্রয়োজনে সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্পনা শিল্পটি আগাগোড়াই অপ্রয়োজনীয় সুকুমার বৃত্তি থেকে উদ্‌ভূত। অনুরূপভাবে আমরা দেখছি, শিক্ষা-সভ্যতার অভিমান বড়াই করেও মানুষ আদিম উন্মত্তভাবগুলি আঁকড়ে ধরছে, এবং এরকম আচরণের পক্ষে দার্শনিক ওকালতিও আরম্ভ করেছে। আবার এও দেখছি যে,—যাকে আমরা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বলি, সেই কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বোঝা ঘাড়ে করে, দুটি নিরক্ষর মানুষ একটু বিরলে বসে মৃদু স্বরে রহস্যালাপ করছে। তাদের মাঝখানে একটি আল্‌গা বীণা রয়েছে। বীণার জোয়ারী সাফ্ হচ্ছে! জোয়ারী সাফ না হলে যে সর্বনাশ! আওয়াজে রেশ বা শাস্ বলতে কিছুই যে থাকবে না; আর, তা না থাকলে মীড়ের মজাই বা কিরকমে হবে! মীড়ই যদি মনের মত না হল, তাহলে এই যন্ত্রটি তৈরী করার কণ্টত একেবারেই পন্ডশ্রম। তবে কি, ভেঁপু আর ট্রম্‌বোন্, বাজিয়ে রাগালাপ করতে হবে! জান্ কবুল,—সে আমরা পারব না: এই কারিগর আর বীন্‌কারকে দেখে মনে হল—এরা যতই মূর্খ হক, এদের জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির শাস্ (শ্বাস) ও রেশ্ (অনুরণন) টেনে চলেছে, মাত্র একটি সুকুমার বৃত্তির প্রেরণায়! এদের মধ্যেও আদিমতা আছে, কিন্তু এরা এতই অশিক্ষিত যে তার বড়াই করে না, তাকে পালিশ করে শ্লোগান-প্রোসেশন করে না বা পোস্টার চিত্রে প্রচার করে না।

মানুষের দেহ-সংবিদে সুর-অধিষ্ঠান ব্যবস্থা অন্য এরকম দৃষ্টিতে বিস্ময়জনক। নিতান্ত সাধারণ মানুষের কানের মধ্যেও কমপক্ষে দশ-বারো সপ্তকের ব্যাপ্তিগত প্রায় আড়াই-শত রকমের শ্রুতিভেদের ব্যবস্থা রয়েছে। ইউরোপে আট সপ্তকের পিয়ানো তৈরী হয়েছে। অথচ—জগতে এপর্যন্ত কালে গীত-রচয়িতা ব্যক্তিবর্গ যতো কিছু গান বেঁধেছেন, বা স্বরলিপি তৈরী করেছেন, তার মধ্যে এমন একটি গানও নেই, যার সুর পরিকল্পনা দু সপ্তকের চেয়েও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। **সুরপ্রতীতির সম্ভাবনার জগৎ হল সপ্তকের। কিন্তু গড় পড়তায়** কণ্ঠের শক্তি হল মাত্র দু-সপ্তকের! দেহ প্রকৃতি কণ্ঠের প্রতি এত কৃপণ কেন? বস্তুত, কৃপণ নয়। **কথা বলতে শিখে অবধি আজ পর্যন্ত কালে মানুষ এত বেশী কথা বলেছে, এত বেশী চিৎকার করেছে,** যে কণ্ঠ নামে সুরের যন্ত্রটি তার সৌকুমার্যের উচ্চ সীমায় উঠতে পারল না! **কণ্ঠটি বাগযন্ত্র নয়; বাগযন্ত্র হল আস্য বা মুখ-গহ্বর,** যার আদি আর উপান্ত থেকে ককারাদি মকার পর্যন্ত বর্ণ-শব্দগুলি উদ্‌ভূত হয়। **কণ্ঠ হল মূলে সুর-যন্ত্র বা স্বর-যন্ত্র।** এই সুকুমার যন্ত্রটি দুদিকে দু'রকমের বিড়ম্বনার চাপে বিমর্ষ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। গানের মধ্যে কণ্ঠের স্ফূর্তি পরিস্ফুট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, আবেগের সময়ে প্রায় আর্তনাদ শুনি; রুদ্ধ আক্রোশ দেখা দেয় নিষ্ফল নিরর্থক চিৎকারের রূপ ধারণ করে। একদিকে ক-কারাদির চিৎকার-চাহিদা, অন্য দিকে ফুস্‌ফুস্ নামে হাপর যন্ত্রের ভাবাবেগ জনিত অস্বাভাবিক উত্তেজনা; এই দুএর মধ্যে পড়ে কণ্ঠ কতই বা উন্নতি লাভ করবে! এই কারণেই, কণ্ঠ যন্ত্র তার পূর্ণ কমনীয়তা ও বিশদতা এখনও লাভ করেনি; মধ্য পথে, মুদারা স্থানটি পরিক্রম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমে এসে বিশ্রাম ভোগ করতে চায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-বিচার দিয়ে কণ্ঠ ও বাগযন্ত্র সম্বন্ধে যেসকল সত্য উদ্‌-ঘাটিত হয়েছে, ভারতের প্রাচীন যুগের সংগীতপ্রজ্ঞ মুনি-ঋষিরা কি সেরকম সত্য নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন?

এরকম প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলব,—এই বিশেষ ব্যাপারে বেদ-উপনিষদের মুনি-ঋষিরা যদি সত্য দৃষ্টি সম্পন্ন না হয়ে থাকেন তাহলেই বা ক্ষতি কি! সে সকল মুনি-ঋষিরা আইস-ক্রিম বা বিরিয়ানী পোলাও তৈরী করতে জানতেন না; শাল-জামেয়ারের ভেদাভেদ বুঝতেন না; বিজলী বাতি, এমন কি টর্চ-লাইটও কল্পনায় আনতে পারেন নি। তাতে কি জগতের ক্ষতি হয়েছে নাকি, ভারতীয় সংস্কৃতির অমর্যদা ঘটেছে!

দ্বিতীয় কথা এই যে—সুপ্রাচীনকালের সঙ্গীত-প্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দু'চারজন মুনি যে বাগ্‌যন্ত্র ও কণ্ঠযন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য জানতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলেই যে জানতেন এমন কথা মনে করা উচিত নয়। এর প্রমাণ হল,—বাগ্‌দেবী ভারতীর ধ্যান, আর বীণাধরা সরস্বতীর ধ্যান। বাক্ অর্থাৎ বৈদিক বাগ্‌দেবী হলেন বর্ণ শব্দ-মন্ত্র-বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরী বিশেষ। ইনি ক-কারাদি শব্দের সুষ্ঠু সফল উচ্চারণ দিয়ে যজ্ঞকারী সাধককে অনুগৃহীত করেন। কিন্তু—ইনি কথাধিষ্ঠাত্রী রূপে গণ্য হননি, বীণাদির অধিষ্ঠাত্রী রূপেও এ'কে পাইনে। অন্য দিকে, সরস্বতী বা সারদা বা বীণাপাণি হলেন **সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা**। এবং—যে আঙ্গুলে বীণা বাজান সম্ভব হয়, যে আঙ্গুলে লেখনী ধারণ করে মনের ভাব প্রতিফলিত করা যায়, সরস্বতী সেই বীণা-লেখনী বিদ্যার দেবতা।

অনুমান করা যায় বীণাযন্ত্র ও লেখনীর উদ্‌ভাবনের সময়েই সরস্বতী দেবীর ধ্যান মূর্তি কল্পিত হয়েছিল। অন্য কথা এই যে, বৈদিক অর্চনাকারী সম্প্রদায় কণ্ঠের সুর অর্থাৎ স্বর-গুলিকে বিশেষ আমল দেননি, এবং আস্য প্রযত্ন সম্ভূত বর্ণোচ্চারণকে তাঁরা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রসূ মনে করেছিলেন। বস্তুত, আস্য অর্থাৎ মুখ, এবং কণ্ঠের বাস্তব ভেদ হয়ত এ'রা জানতেন না। সরল কথা এই যে মুখ ও মুখগহ্বর (টন্‌সিল পর্যন্ত) চোখে দেখা যায়, কিন্তু কণ্ঠ (ল্যারিংস্) চোখে দেখা যায় না। ফলে সাধারণ ধারণা এই হয় যে—কথা ও সুর একই যন্ত্রের কৃতিত্ব। কথা কাজে লাগান যায়, সদা সর্বদার জন্য, এমন কি গালাগালির জন্যও। কিন্তু সুর সর্বদা কাজে লাগেনা; এমন অনেক কাজ ও কথা আছে, যাতে সুর প্রক্ষেপ দিলে কথা ও কাজ দুইই পণ্ডশ্রম হয়। সুতরাং—ব্যবহারের দিক চিন্তা করলে, **সুরের চেয়ে কথাই** বড়। খুব সম্ভবত, এই ধারণার বশেই "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বকঃ।

বনসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ ॥ ২ ॥ (১ম স্বরাধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক)

এর অর্থ ঃ—নাদ দ্বারা ককারাদি বর্ণ ব্যক্ত হয়; বর্ণ থেকে পদের সৃষ্টি; পদ থেকে বাক্যের উদ্‌ভব; বাক্য দিয়েই ত' ব্যবহার সিদ্ধ হয়েছে। অতএব—সমস্ত জগৎ নাদেরই অধীন।

বক্তব্যটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ পর্যন্ত ব্যবহারজীব জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এসেছেন, মাত্র কথা বলে আর সার্থক বক্তৃতা করে, কোনও গীত-বাদ্য শিল্পী তার একচতুর্থাংশও গান-বাজনা করে উপার্জন করতে সক্ষম হননি।

সুরের কথায় ফিরে আসা যাক্। সুরের জগৎ, অর্থাৎ কথা-বর্জিত বিশুদ্ধ সুরের জগৎ বেশীর ভাগই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জগৎ। আমরা পত্র-মর্মরের মধ্যে, নির্ঝরের শব্দের মধ্যে, বিহগ-কাকলির মধ্যে, সুর খুঁজি। কিন্তু—বস্তুত, সেখানে সুর নেই, আছে শুধু মর্মর ধ্বনি, কুলকুল শব্দ, কিচির মিচির কোলাহল। শব্দের জগতে সুরের চেয়ে অ-সুরের প্রাধান্যই চিরন্তন সংবাদ। নেহাৎ—দেহসংবিদের মধ্যে সুর-বোধের ব্যবস্থা ছিল বলেই আমাদের অনামিক পূর্ব পুরুষ গোষ্ঠী অসুর কোলাহলের মধ্যে জীবন যাপন করতে থেকেই কিছু সুর ও স্বর-সৌন্দর্য অনুভব করতে পেরেছিলেন।

বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার সাহিত্য প্রসঙ্গে

কাজী মোতাহার হোসেন

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, যে অন্যান্য মানবীয় প্রচেষ্টার মত সাহিত্যের একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে; কিন্তু সে উদ্দেশ্য এমন সরস আর প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করবে যে লক্ষ্যটা যেন অতি-মাত্রায় লক্ষণীয় হয়ে পাঠক বা শ্রোতার রস ভোগের বিঘ্ন না জন্মায়। এটা যে বিশেষ বাহাদুরী কাজ তা না বল্লেও চলে; কিন্তু এরও সদুপায় আছে! মানুষের একটা সহজাত অহংকার রয়েছে যার ফলে সে একান্ত আপনজন ছাড়া অন্যের উপদেশ বা নির্দেশ (ভাল হলেও) সহজে গ্রহণ করতে চায় না। কাজে কাজেই লেখককে পাঠকের 'আপনজন" হতে হবে। 'আপনজন' হওয়ার কৌশল হচ্ছে ভালবাসা,—যার প্রকাশ হয় সহানুভূতি আর সমাক্ পরিচয়ে। সহানুভূতি থাকলে রুক্ষ-ভাষা কলমে বা মুখে আসেনা; সম্যক্ পরিচয় থাকলে কোথায় কিরকম বা কত ওজনের অলংকার (স্তুতি, ব্যাজ, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি) সহনীয় হবে তার আন্দাজ পাওয়া যাবে। কাজে কাজেই একটা সুপরিমিত ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে ওঠে। এই স্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে ফাঁকি চলেনা। একজন যে ভাষা অনায়াসে ব্যবহার করেন অন্যে অনেক চেষ্টাতেও তা অনুকরণ করতে পারে না। এইখানেই হ'ল সাহিত্যিক ওস্তাদের মার। আসল কথা লেখকের অভিজ্ঞতা আর ব্যক্তিত্বের রসে রসায়িত হয়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বই বিশিষ্ট প্রকারের। তাই কোনও সত্যিকার সাহিত্যিকের রচনা আর একজনের অনুরূপ হয় না। নকল সাহিত্যিকের মেকি কোনও একটা বেফাঁশ বিশেষণ, ক্রিয়া, ভাব-বিরোধী পদ বা অনাবশ্যক আড়ম্বরের শিথিলতা দ্বারা অনায়াসেই সাহিত্য রসিকের কাছে ধরা পড়ে যায়। সমালোচকের স্কেল কম্পাসের মাপ-জোখের চাইতে হয়ত শেষ পর্যন্ত রসিকজনের সহজাত বুদ্ধিই অধিক সূক্ষ্ম নির্ভরযোগ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কেবল সাহিত্যিকের নিজস্ব গুণপনা থাকলে চলেনা—সেই সংগে চাই উপযুক্ত সাহিত্যিক পরিবেশ। পরিবেশ বলতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা চাই-ই, এ ছাড়া আরও চাই একটি সমঝদার পাঠক-গোষ্ঠী যারা সামাজিক, ব্যক্তিগত বা অন্যাবিধ পূর্ব-সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য-মিথ্যা বা ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা রাখে। যে অন্ধ অহমিকার ফলে মধ্যযুগের সত্যদ্রষ্টা সাধকগণকে ইংকুইজিশনের অশেষ প্রকার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, পয়গম্বরগণকে প্রবল বিরোধিতা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—সেই মূঢ় অন্ধতা যে বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য-সমাজেও অবর্ত্তমান এমন কথা জোর করে বলা যায় না। যুগে যুগে সাহিত্যিকেরা নতুন পরিবেশে নতুন চিন্তা যুগিয়েছেন, কিন্তু অনেক পুঞ্জীভূত অনুপলব্ধ সত্যের বাহকের সংগে যুদ্ধ করে করে তাঁদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের অনাচ্ছন্ন মন নিয়ে সত্য অনুধাবন করে সুন্দরভাবে তা প্রকাশ করতে হবে। এরজন্য প্রচুর সৎসাহস আর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হবে। যে-কোনও একটা নতুন পথ ধরতে গেলেই সাহিত্যিক রক্ষণশীলেরা বা পেশাদার সমালোচকেরা মারমুখো হয়ে উঠবেন। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রতিরোধের সার্থকতা আছে—সংগ্রামের দ্বারা প্রত্যয় এবং ঐকান্তিকতার যাচাই হয়। বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়ে কষ্ট করে যা পাওয়া যায় তাই সত্যিকারের প্রাপ্তি—এইভাবে জয় করেই সত্য এবং সুন্দরকে অর্জন করতে হয়। এ না হলে প্রতিভার সম্পূর্ণ স্ফূরণ হ'তে পারে না।

চিন্তানায়ক হিসাবে সাহিত্যিকেরাই দেশবাসীর স্বাভাবিক নেতা। অতএব তাঁদের দায়িত্বও সমধিক! তাঁরা দেশের চিন্তা-ধারা আত্মস্থ করে দেশবাসীর কাছে ঐ সব চিন্তার সাহিত্যিক রসরূপ প্রকটিত করেন। পারিপার্শ্বিক অস্ফুট চিন্তাকে স্ফুটতর ক'রে আদর্শকে আর একটু উন্নত বা মার্জ্জিত ক'রে ক্রমাগত দেশের রুচি চিন্তা ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রসর ক'রে দেন। দেশবিভাগের পর আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি এখনও দানা বেঁধেছে বলে মনে হয় না। কোনও বিশেষ সমস্যার নামোল্লেখ না ক'রে সাধারণভাবে বলতে চাই, আমাদের মনোনীত নেতৃবৃন্দ যাতে নির্লিপ্ত সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেন সে জন্য বর্ত্তমান সমস্যাদির আলোচনা-মূলক সাহিত্যও সৃষ্টি করতে হবে। এগুলো গতানুগতিক সংবাদ-সাহিত্যের চেয়ে কিঞ্চিৎ অনাবিল ও উচ্চাঙ্গের হওয়া চাই; তাহ'লে হয়ত দেশে সত্বর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার উদয় হতে পারে। আশাকরি, নবীন-প্রবীণ সকল সাহিত্যিকই নির্ভয়ে দেশের গঠনমূলক সৎসাহিত্য সৃষ্টি করে দেশের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা এবং মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

প্রায়ই দেখা যায়, সহজ হাততালির মোহে অনেক প্রতিভাশালী লেখকও সৃষ্টির উৎকর্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট যত্ন দেওয়া ছেড়ে দেন; ফলে অচিরেই তাঁরা সাধারণ পর্য্যায়ে নেমে আসেন, অথচ প্রতিষ্ঠার গুমর ত্যাগ করেন না। জনসাধারণের সাহিত্যিক ভাল-মন্দ বিচার করবার একটা চলন-সই মত থাকলে এ-ভাবে প্রতিভার অপমৃত্যু হ'তে পারত না। অনেক বাজে বইয়ের বেশ কাটতি হয়, অথচ উচ্চ সাহিত্যিক মর্য্যাদা সম্পন্ন বই বিকোয় না। কাজে কাজেই অনেক সময় এই পাঠকদের মন-মর্জ্জি মত সাহিত্য সৃষ্টি করবার লোভ প্রবল হয়। আদর্শের বাহক হিসাবে তরুণ সাহিত্যিকদের এ সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে। বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে প্রচুর সাধনার সংযোগ না হ'লে সুসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। মনের ভাবকে সাহিত্যিক বেশে ভূষিত ক'রে, তবে ত লোকের সামনে হাজির করতে হবে। তাই মার্জ্জিত ভাষা—উপযুক্ত শব্দ-চয়ন, সঙ্গত শব্দালঙ্কার ও প্রচলিত বাগ্‌বিধির সুষ্ঠু প্রয়োগ—এইগুলো হচ্ছে সাহিত্যিকের কাঁচা মাল। কাঁচা মাল বা সাজসরঞ্জাম ভাল হ'লে অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হ'য়ে গেল, মনে করা যায়। কাজেই এ-দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি বেশ চলন-সই রকমের গল্প, কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধের মূল্য সামান্য একটু ত্রুটিতেই প্রায় অর্ধেক কমে যায়। বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য কয়েক রকম সাধারণ ত্রুটির একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিঃ—

প্রথম—দ্বিত্ব দোষ। যেমন—আধিক্যতা, দারিদ্র্যতা; মতদ্বৈধতা; প্রসারতা; সৌজন্যতা ঐক্যতা, শুধু মাত্র; হৃদয়ের অন্তর্দ্দাহ; বিবিধ সমস্যাগুলি; কতিপয় সাহিত্যসেবিগণ; করুণা-মিশ্রিত কৃপার পাত্র; ইত্যাদি।

দ্বিতীয়—শব্দের অপপ্রয়োগ। যেমন—ভীষণভাল; যুগপৎভাবে; সুবেশ পরিহিত; গোলাপ-তরু; প্রমুখদের; উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র আমাদের 'প্রতীক্'; ছেলেটির 'আত্মবিশ্বাস' ছিল যে, আকুল কণ্ঠে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ, সে ডাক শুনবেনই; "ধূমকেতুরা সূর্য্যের রাজ্যের আনাচে কানাচে থাকিয়া সূর্যকে 'ঘুরিয়া বেড়ায়"; তিনিও মানুষ, মানুষেরই তিনি 'মহত্তম' 'পরিণাম' "আনন্দকর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান', ধূপদান', ভূমিদান কর".; "কিন্তু সেই শুভ বা অশুভক্ষণে মুসলিম জাতির 'অস্তিত্ব' কোথায় দাঁড়াইবে?; ভয়ে ভয়ে কেউ হালের গরুটা বেচে ফেলে দেয় সিকিদামে 'ঝুটা'ঃ "জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাই কায়েদে আজমকে 'একক করিয়া রাখিয়াছিল।" "আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল;" "অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত করিলেন," ইত্যাদি

তৃতীয়—যুক্তি বিরুদ্ধতা যথা,—সকলকে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া দিয়া একাংশ নিজে গ্রহণ করতেন।" "ভারতে পাঠান সুলতানদের সীমানা আমার চেয়ে আর কেউ বাড়াতে পারে নি" "একদিন হঠাৎ বাতির আলো পড়ে সেই সমস্ত কাগজ পুড়ে গেল।" "তিনি রৌপ্য দ্বারা আকাশ ও ভূমন্ডলের এক সমতল গোলক নির্মাণ করেন।" "এই সামরিক বিমান-শিক্ষার ঘাঁটিটি আফগানিস্থান থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে হবে", ইত্যাদি।

চতুর্থ—রূপকের অসঙ্গতি। যথা—"তাহার জীবন মঞ্জুষা হইতে আলোক সংগ্রহ করিয়া এই নব-প্রবুদ্ধ জাতি সভ্যতার দীপালি উৎসব সাজাইয়া তুলিতে পারিবে।"

পঞ্চম—কৃত্রিমতা, যথা—তাঁহার বিজ্ঞান উৎসাহ আফগানিস্তান হইতে তাহাকে ভারতে লইয়া আসে"; "সতত হে নদ, তুমি মোর মনে।" ইত্যাদি।

ষষ্ঠ—প্রচলিত বাগ্‌বিধির খেলাপ। যথা—"মন্ত্রের সাধন কিংবা আত্মবিসর্জন"।

সপ্তম—ব্যাকরণ দুষ্টি, যথা—"চরিত্রবানরাই সম্মানী, 'সে'-ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র" মৃত্যুমুখ কিংবা অর্ধমৃত জাতি" "কি ইতর, কি ধনী", "বর্ষাতে তার রূপ ভয়ঙ্করী" ইত্যাদি খুটিয়ে খুটিয়ে আরও অনেক উদাহরণ বের করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নাই।

আশা করি, উল্লিখিত উদাহরণগুলোর দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করে বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য যে-সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ একান্ত উপযোগী, কিছুদিন ধরে তা-ই ব্যবহার করবার সজ্ঞান চেষ্টা করলে ভাষাগত ত্রুটি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে হালী, দাগ, গালিব প্রভৃতি উর্দু কবিগুরু নিয়মিত ভাবে শাগ্‌রেদদের কবিতার 'ইসলাহ' বা সংশোধন ক'রে দিতেন। একথা বাঙালী লেখকদের কাছে যতই অদ্ভুত মনে হোক, বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে আমার মনে হয় কি গদ্যে, কি পদ্যে, এর সত্যিই প্রয়োজন আছে। বিভাগ পূর্ব বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন প্রধানতঃ হিন্দু সাহিত্যিকেরাই। তাই এর নিয়ন্ত্রণের ভারও ছিল, স্বভাবতঃ এঁদের উপরেই। কাজেই মুসলিম মানসের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীসমন্বিত সুসাহিত্যের যথেষ্ট অভাব ছিল। মুসলিম সাহিত্যিকেরাও সে সময় বাধ্য হ'য়ে বাংলা ভাষার প্রচলিত হিন্দু-ছাঁদেই সাহিত্য রচনা করতেন। বিভাগোত্তর যুগে পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বাংলা সাহিত্য গড়ে তুলবার অবাধ সুযোগ পেয়েছেন। এখন এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু কোন পাল্‌টা ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থাৎ—ইতিপূর্বে হিন্দু সাহিত্যিকেরা প্রচলিত আরব-ফারসী শব্দ বাদ দিয়ে অধিকমাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়েছেন, এই অজুহাতে বর্ত্তমানে আমাদেরও যে সংস্কৃত-মূলক প্রচলিত শব্দ বাদ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আরবী ফার্সী শব্দ আমদানী করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। কিছুদিন আগে এই রকম একটা মনোবৃত্তি দেখা গিয়েছিল বটে; তবে বর্ত্তমানে স্বাধীনতার প্রথম উল্লাস প্রশমিত হ'য়ে আবহাওয়া একটু প্রশান্ত হ'য়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাই বলে আমরা যে প্রয়োজনীয় আরবি-ফার্সী শরীয়তি শব্দ, অথবা যে কোনও

বিদেশী ভাষার থেকে সহজবোধ্য বা প্রচলিত ভাবানুগত শব্দ গ্রহণ করবনা, তা নয়। মোট কথা, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ইসলামী আদর্শ সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। তা' করতে গিয়ে যে সব আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজী, তুর্কী, পর্ত্তুগীজ ইত্যাদি ভাষার শব্দ ব্যবহার করবার আবশ্যক হবে, সে গুলোকেও আমরা বাংলা শব্দ বলেই গণ্য করব। এগুলোর উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে হ'য়েছে সেটা বড় কথা নয়; বরং শব্দগুলো যে বাংলা ভাষার মধ্যে বেমালুম খাপ খেয়ে গেছে, সেইটেই বড় কথা। বলা বাহুল্য, এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় খাপ খাইয়ে নিতে হ'লে প্রতিভার দরকার। নিকট অতীতে কবি নজরুল এ ব্যাপারে যে সহজ সৌকুমার্য বোধের পরীক্ষা দিয়েছেন তা' আমরা অনায়াসে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ ক'রে তাঁর আরব্ধ ধারাকে আরও কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ সুলক্ষণ এই দেখা যাচ্ছে যে, পারিপার্শ্বিক জীবন বা সমাজের প্রতি নজর রেখে নানা বিষয়ে ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখা হচ্ছে। এখন মধ্যবিত্ত বাবু-সাহিত্য বা সখের-সাহিত্য সৃষ্টি না ক'রে সাধারণ লোকের জীবন কথা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য, সাহিত্যের এই গণ-মুখিতা বিভাগপূর্ব যুগেই কিছুটা আরম্ভ হ'য়েছিল; বর্ত্তমানে পূর্ববাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের চেষ্টায় বেশ দ্রুত গতিতে বাংলা সাহিত্যের এই ফাঁকটা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটি বলতে গেলে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে হতাশার বিশেষ কারণ নাই—তবে লেখার পেছনে আর একটু যত্ন এবং সাধনা থাকলে সাহিত্যিক আবর্জনার ভাগ কিছু কম হত। তবে প্রাণের যে দুর্বার জোয়ার এসেছে, তার খর-স্রোতে নিশ্চয়ই সকল আবর্জনা ভেসে গিয়ে খাঁটি সাহিত্য আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

নবজাগরণের তাৎপর্য ও দর্শন

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

বিস্মৃত অতীতকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে পুনরাবিষ্কারকে ঐতিহাসিকরা রেঁনেসাঁস আখ্যা দিয়েছেন। রেনেসাঁস অথবা নবজাগরণ আন্দোলনকে ঐতিহাসিক সঙ্কীর্ণ অর্থে সীমিত করা যায়না। রেঁনেসাঁস প্রকৃতপক্ষে ছিল জীবনের সর্বপ্রান্তরে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাণসঞ্চালন, সৃষ্টির উৎসকে উন্মোচন করবার বিপুল প্রচেষ্টা। আমাদের জীবনের একটি দিক দেশ ও কালের নিয়মের বেড়াজালে সীমাবদ্ধ, অপর দিক দেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান ভৌগোলিক অথবা স্থানীয় আবেষ্টনীর দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। এই দিক হোল মানুষের চিরন্তন মনুষ্যত্ব বোধ, সর্বকালের ও দেশ দেশান্তরের সমস্ত মানব সমাজ যে মানবিক মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইতিহাসের জয়যাত্রাতে আমরা মননশীলতা, ধ্যানধারণা, বুদ্ধি চর্চা, বিচার যুক্তি প্রয়োগ করে মানুষের সংস্কৃতির ভান্ডারকে নানারত্নে ভূষিত করেছি। মানবসংস্কৃতির অক্ষয়ভান্ডার থেকে যে সমস্ত রত্নরাজি সর্বজনীন ও চিরন্তনের কোঠায় ঠাঁই পেয়েছে এই যুগের মহাপথিকরা সেই মানবিক মূল্যকে পুনরুদ্ধার করে আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত ও তার সোনার কাটির স্পর্শে সমকালীন জীবনযাত্রার সর্বপ্রান্তরকে বলিষ্ঠ ও সুন্দর করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

সমকালীন যুগের চাহিদা ও অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে এই যুগের যুগনায়করা অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। অতীতের অন্ধগুহা থেকে মানবতার সর্বজনীন আদর্শকে উদ্ধার করে সমকালীন যুগের সংঘাত ও কণ্টকাকীর্ণ জীবনের ভিতরে সেই আদর্শকে রূপায়িত ও সুরকে সংযোজন করবার সাধনা করেছেন রেনেসাঁস যুগের উত্তর সাধকরা। নবজাগরণের আলো আজ জীবনের বিপুল ক্ষেত্রে অথবা ব্যক্তিজীবনের ছোট আঙিনায় সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই যুগের তীর্থ পর্যটকরা ধর্ম, নীতি শাসনকে শুধুমাত্র অচলাভক্তি নৈবেদ্য দিয়ে তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা কোষমুক্ত করলেন বুদ্ধিশাণিত তলোয়ারকে, সজোরে ঘোষণা করলেন মানবতন্দ্রের প্রদীপ্তবাণীকে। অন্ধভাবাবেগে ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তিবাদের জয়যাত্রা সুরু হোল। মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সাহিত্য দর্শন, কলা সৃজনীধর্মী জীবনের বিচিত্র লীলা। 'ম্যান দি মেজর অব্ অল্ থিংস্' যে উক্তি একদিন প্রাচীন গ্রীক্‌দেশে প্রোটাগোরাস ঘোষণা করেছিলেন সেই মানবতন্দ্রী বাণী ধ্বনিত হোল ইউরোপে আধুনিক যুগের উষাকালে। বাংলার সাধক কবি চন্ডীদাসের কণ্ঠে বেজে উঠল মনুষ্যত্বের জয়গৌরব "সবার উপরে মানুষ সত্য তার উপরে নাই।" নবজাগরণ আন্দোলনের মন্ত্র হোল গভীর আত্মবিশ্বাসের উপর গড়ে উঠবে মানুষের স্থির ভবিষ্যত যাত্রা। মানুষ কোন দৈবী শক্তি অথবা রহস্যময়ী প্রকৃতির ক্রীড়নক নয়। সে যন্ত্র নয়, যন্ত্রী; অনন্ত সম্ভাবনা পূর্ণ শক্তিমান পুরুষ। সে স্বয়ং তার ভাগ্য বিধাতা অন্য কোন দৈবী অথবা অলৌকিক শক্তি তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারেনা। ইতিহাস মানুষের নিরন্তর অফুরন্ত সৃষ্টি প্রচেষ্টা, উদ্ভাবনার নিত্য স্রোত ধারার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। স্বকীয় সাধনা দ্বারা মানুষ নিজের ভবিষ্যত ও বিরাট সম্ভাবনাকে সার্থক ও রূপায়িত করতে সক্ষম। সেদিন মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি কোরল সে বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী, বিরাট শক্তির আধার, অসীম সম্ভাবনার

আকর ও বীজ স্বরূপ। বিস্ময় পূর্ণ জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটন করে সেদিন মানুষ চাইল যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর নতুন করে পৃথিবীকে গড়ে তুলতে। মনের অবাধ স্ফূর্তি ও বিচিত্র লীলাকে রূপায়িত করবার অবিরাম সাধনা অন্ধ জড়তার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণের আনন্দোল্লাস সেদিন স্ফুরিত হয়েছিল নবজাগরণ আন্দোলনে। যৌবনের জয়যাত্রা, চিত্তের স্বাধীনতা, আশাহীন ব্যর্থ পরাভূত মানবাত্মার ভিতরে নবজীবনের আশ্বাস, রিক্ত মরু হৃদয়ে নব-বসন্তের হিল্লোলে রসের উচ্ছ্বাস, সুস্থ সবল জীবনের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ হোল নবজাগরণ আন্দোলনের মূল ধর্ম। সাহিত্যজগতে ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে রেঁনেসাঁসের প্রাণধর্মের উদ্দীপ্ত বাণী, সৃষ্টির মাদকতা, 'বিদ্রোহীর নবচেতনার স্ফুলিঙ্গ, নবনব ছন্দে ও বর্ণে ঝঙ্কৃত ও সুষমিত করেছিল।

আত্মপ্রকাশের পথে মানুষের বুদ্ধি বিকাশ ও চেতনার উন্মেষ তাকে ইন্দ্রিয়সুলভ স্থূল পাশবিক বৃত্তি ও জড়ত্ব থেকে মুক্ত করে সূক্ষ্ম বিচার ও যুক্তিবাদের উপর জীবন দর্শনকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। বুদ্ধি বিশ্বচরাচর ও প্রকৃতির জীবনের গূঢ় অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সূত্রের আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের ও জ্ঞানবিকাশের পথ সুগম করে। এখানে অদৃষ্টবাদের উপর আস্থা নেই। বন্ধনহীন মানবাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সদর্প পদক্ষেপ নবজাগরণ আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ও প্রাণবান করেছিল। রেঁনেসাঁস আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মন্ত্র ছিল সামাজিক অসংখ্য বন্ধন, সংকীর্ণ দাস মনোভাব ও তামসিকতা থেকে মানুষের চেতনাকে মুক্ত, নির্ভীক ও উজ্জ্বল করতে হবে।

অকস্মাৎ হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ইতিহাসের এক সুপ্রভাতে মানুষ তার গভীর অচেতন ঘুমথেকে জেগে ওঠেনি। রেঁনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ বলতে ইতিহাসের যাত্রাপথে বিশেষ দিন ক্ষেত্র বিচার করলে তার অন্তর্নিহিত spirit অথবা প্রাণস্পন্দন ধরতে পারবোনা। অর্থনৈতিক জীবনে উৎপাদন যন্ত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন, সামাজিক জীবনে নবচেতনার উন্মেষ, রাজনৈতিক জীবনে মানবিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার সংগ্রামের সূচনা, কাব্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান সবক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা, ক্ল্যাসিক্যাল জ্ঞানবত্তার পুনরসাস্বাদন, বুদ্ধি-দীপ্ত প্রতিভাশালী বিরাট মনীষীবৃন্দের আবির্ভাব, অন্ধ তামসিকতা ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অভিযান—এই সমস্ত শক্তির সমাবেশে একটি নবযুগের সম্ভাবনা সার্থক ও ফলবান হয়েছিল। একটি মানুষের আবির্ভাব অথবা কাব্য, শিল্পের নতুন দৃষ্টি, দর্শনের নতুন ধারার প্রবর্তন, সামাজিক জীবনের বিপুল আলোড়ন বিশেষ একটি ধারা রেঁনেসাঁস অথবা নবজাগরণের আন্দোলনকে প্রবর্তন করেনি। জীবনকে যেমন খণ্ড খণ্ড করে বিচার করলে তার সমগ্ররূপ আমাদের দৃষ্টিপথে অগোচর থেকে যায়। ইতিহাসের নিরন্তর যাত্রাপথে সমগ্র মানবজীবনকে এক নতুন অধ্যায় অথবা নবজন্ম বলে আমরা যে যুগকে উল্লেখ করি সেই যুগ বিশেষ কোন শিল্পকলা, সাহিত্যের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী একক সাধনার উপর সম্পূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে নেই তার পিছনে রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানুষের মানসলোকের বিপুল আলোড়ন ও তাদের সম্মিলিত শক্তির প্রচেষ্টা। নবজাগরণের পূর্বাভাসে একদিকে আমাদের চোখে পড়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর ভাঙ্গন, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিরোধের বহিঃপ্রকাশ, অদম্যমুক্তিস্পৃহা, সামাজিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন ও রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গমালা, অপরদিকে আমরা দেখতে পাই নতুন জীবনদর্শন ও সামাজিক মূল্যায়ন, নতুন চেতনাউন্মেষ, সাহিত্য ও দর্শনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা। রেঁনেসাঁস আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে সামাজিক জীবনের রুচির পরিবর্তন হয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে শাণিত বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ, বাধাবন্ধন-

হীন জীবনকে সর্বাঙ্গীণ, সুচারু ও সুঠাম ভাবে গড়ে তোলবার অক্লান্ত সাধনা স্পষ্ট ও মূর্ত হয়। বিস্মৃতির গভীরতলদেশ থেকে মৌনসুপ্ত অতীতকে পুনর্জাগরিত করে তার অন্তরে যে অক্ষয়রস ভান্ডার আজও সঞ্চিত ও সমুজ্জ্বল রয়েছে সেই রসধারায় স্নাত হয়ে নবীন কান্তি লাভ করা ছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য।

অপরদিকে অতীতের মৃত সংস্কার, অন্ধআচার, অচল বিধিব্যবস্থা পুঞ্জীভূত জড়তা ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে যৌবন ও চিরনতুনকে জীবনের সর্বপ্রান্তরে বরণ করবার মানসিক প্রস্তুতি, ধ্যান, সাধনা এবং সামাজিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই সাধনাকে রূপায়িত করবার কর্মপ্রচেষ্টা নবযুগের উদ্বোধন করেছে। এক কথায় নবজাগরণ শুধুমাত্র মানুষের সামাজিক অথবা অধ্যাত্ম জীবনের কোন বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; এই নবজন্মে মানুষের সামগ্রিক জীবনের পুনর্জাগরণ। এই জাগরণের ভিতরে মানুষ খুঁজে পেল আপন মানবিক সত্তাকে। মানুষ জড়পদার্থের সমষ্টি নয়, তার ধমনীতে বয়ে চলেছে প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ের দুর্দাম আবেগ, মনের বিচিত্র কল্পনার প্রস্রবণ। আমাদের সবার ভিতরে যে বিরাট সম্ভাবনার বীজ রয়েছে তাকে ফলবান করবার প্রয়োজনে দেহ মনকে প্রসার, মনকে সুনিপুণ ও সূক্ষ্ম, বুদ্ধিকে মার্জিত, জীবনকে নানারসে পরিপূর্ণ ও সুন্দর করতে হবে। অন্ধকারে চোরাবালিতে পা না সিঁধিয়ে মানুষ সেদিন ধীরে ধীরে সহজ বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে বুদ্ধিকে বন্ধন মুক্ত কোরল, 'ইম্যান্সিপেশ্যান্ অব্ দি ইন্টেলেক্' অথবা বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি নবযুগের বিশেষ সাধনা। আপন চেতনা আলোকে মানুষ সেদিন আত্মসচেতন হয়ে স্বাধীনতার স্বরূপকে উপলব্ধি কোরল। বলিষ্ঠ প্রাণের আহ্বান, বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপ্রেরণা, পরীক্ষা নিরীক্ষণের অবিচল নিষ্ঠা। মানসিক ও ব্যবহারিক জীবনকে রূপান্তরিত করবার অদ্ভুত উদ্দীপনা নানা ভাবে ফুটে উঠেছে নবজাগরণের বিভিন্ন রাগ রাগিনীর মাধ্যমে, নানাবিধ যাগযজ্ঞ সম্ভারে।

The history of the Renaissance is not the history of arts, or of sciences, or of Literature, or even of nations. It is the history of the attainment of self-conscious freedom to the human spirit manifested in the European races. It is no mere political mutation, no new fashion in art, no restoration of classical standards of taste. The arts and inventions, the knowledge and the books, which suddenly became vital at the time of the Renaissance, had long lain neglected on the shores of the Dead Sea which we call the Middle Ages. It was not their discovery which caused the Renaissance; but it was the intellectual energy, the spontaneous outburst of intelligence, which enabled mankind at that moment to make use of them. [J. A. Symonds. A short History of the Renaissance in Italy (London 1893), pp. 2-3].

ইতিপূর্বে বলেছি ইতিহাসের ধারা একটানা বয়ে চলেনা, ইতিহাস পতন অভ্যুত্থান, মোহাচ্ছন্ন ও মোহমুক্ত, তন্দ্রাকাতর ও নবজাগরণের ভিতর পথ কেটে চলেছে। বিস্মৃত প্রায় প্রাচীন ইতিহাসে নবজাগরণের আলোকচ্ছটা একবার জ্বলে উঠেছিল। মধ্যযুগ বলতে সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে নানা সংস্কারে আবদ্ধ, স্বেচ্ছাতন্ত্রের তীর্থভূমি, ধর্মের গোঁড়ামি, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের আধিপত্য, বিচারবুদ্ধিকে নিষ্প্রভ করে সরল বিশ্বাসের উপর জীবনদর্শনকে স্থাপনা করার অপচেষ্টা এক তথাকথিত অন্ধযুগ। এই যুগেও গাঢ় অন্ধ-

কার ভেদ করে নবজাগরণের মুক্তির আলো জ্বলে উঠেছে, বিরাট সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুর পাখা মেলেছে, মানবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ সেদিন প্রাণহীন আচার সর্বস্য নীতি ও পুরোহিত ধর্মযাজকের উৎপীড়ন থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই যুগে মানুষ অসীম রহস্যভরা পৃথিবীর কেহ দেব দেবী ও তাদের অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির মোহমুক্ত কল্পনা থেকে মনকে নির্মুক্ত করে অদ্বৈতবাদ অথবা একেশ্বরের উপাসনায় তাকে নিয়োজিত করেছে। সমগ্র মধ্য-যুগকে এই কারণে অন্ধযুগ অথবা নিস্তরঙ্গ মৃত সাগর বলে উপেক্ষা করা সমীচীন হবেনা। তবে একথা সত্য ক্ল্যাসিক্যাল যুগের মতন এই যুগে গভীর জীবন জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনুশীলন, মানবতন্ত্রী দর্শনের বিকাশ; প্রগাঢ় বিদ্যাচর্চ্চা অথবা আধুনিকযুগের মতন বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, অনুসন্ধানী চিত্তবৃত্তি, বিচার বুদ্ধিকে বাহন করে জগতকে পরি-দর্শন করবার মনোবৃত্তি তীব্র ও সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়নি। এই যুগে সামাজিক জীবনের সমস্ত উন্নতির পথ প্রায় রুদ্ধ ছিল; পারলৌকিক ও পারত্রিক চিন্তা জীবনের বেশীর ভাগ ক্ষেত্র অধিকার করে বসেছিল, এর ফলে ঐহিক এবং বুদ্ধি চেতনা উদ্দীপ্ত জীবনের সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। এই মহাসংকট ও দুর্দ্দিনে আধুনিক যুগের ঊষাকালে নবজাগরণের আলো তন্দ্রাকাতর মানুষের মনে এক অপরূপ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ কোরল। দীর্ঘ-অমানিশির পর প্রথম সূর্য্যোদয় যে আলোর শিহরণ ও রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে রেনেসাঁসের নব অভ্যুদয় ইতিহাসের বুকে সেই শিহরণ ও বিপুল আলোড়ন এনেছিল। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। নবজাগরণের লক্ষণগুলি যথা মানুষের অদম্য মুক্তি পিপাসা, সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের সমস্ত বন্ধন ও জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির তীব্র অভিযান, অবনমিত মানুষের অভ্যুত্থান ও সুপ্ত মনুষ্যত্ববোধের পূর্ণজাগরণ, জ্ঞানচর্চ্চা ও বুদ্ধি বিকাশের পথ ধরে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবার প্রচেষ্টা কোন বিশেষ কালে অথবা যুগসন্ধিক্ষণে পরি-পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়নি। মানুষের অন্তরাত্মার বিদ্রোহ, প্রাণের গভীর আকুতি, জীবনকে সর্বাঙ্গীণভাবে সুঠাম সুচারুভাবে গঠন করা সর্বযুগে সর্বদেশে অল্পবিস্তর হয়েছে। রেনে-সাঁসের চিত্তবৃত্তি, চেতনার দীপ্তি ইতিহাসের নিরন্তর চলার পথে ক্ষণিকের জন্য প্রায় সর্বযুগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, শুধু তার তীব্রতা ও স্থায়িত্ব বিচার করে ইতিহাসের একটি খণ্ডকাল, বিশেষ যুগকে রেনেসাঁসের যুগ বলে নির্দ্ধারিত করে থাকি। প্রতিযুগে পথ চলতে চলতে মানুষের চিরন্তর মুক্তিস্পৃহা সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বপ্রান্তরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, অন্ধ কুসংস্কার, প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান থেকে মনকে নির্মুক্ত করে অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের শুভ উদ্বোধন করেছে, আপন মহিমা গৌরবান্বিত হয়ে মানবতার জয়গান করেছে। ক্ল্যাসিক্যাল অথবা আধুনিক যুগে যে নবজাগরণের দীপ্তি দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছিল সেই আলোক উৎস মধ্যযুগে সম্পূর্ণভাবে নিভে যায়নি, বিচারহীন অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্মিত সংস্কার বদ্ধ জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে এই তথাকথিত মধ্যযুগে জড়তা ও অন্ধপ্রাচীর লঙ্ঘন করে জ্বলে উঠেছে চেতনার বহ্নি, প্রাণের দুর্বিষহ জ্বালা। নবঅভ্যুদয়ের অদ্ভুত শিহরণ, দারুণ দীপ্তি, অধীর আবেগ ও তীব্রগতি সঞ্চার দেশকাল ভেদে এর বৈচিত্র্য থাকলেও অধিকাংশ দেশে সর্বকালে কতিপয় লোকের চিত্তে নব জীবনের আশ্বাস ও নবজাগরণের চেতনাকে উদ্বোধিত করেছে, এই দিক থেকে বিচার করলে নবজাগরণ মানুষের অগ্রগতির পথে বারবার ঘটেছে, এই উজ্জীবন মানুষের চিরন্তন মুক্তি স্পৃহা, বিদ্রোহী চিত্তের, প্রাণের দুর্জ্জয় স্ফূর্ত্তির মূর্ত্ত প্রতীক, ইতি-হাসের দুঃসাহসিক অভিযান ও জয়যাত্রার গৌরব পতাকা, মনুষ্যত্বের নির্ভীক সদর্প ঘোষণা।

বাউল সাধনা

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

বাউল সাধনা একটা অধ্যাত্ম সাধনা। এর ইতিহাস আমি জানিনে। আর এর ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য ও অনার্য অধ্যাত্ম সাধনার কথা জানা দরকার। আমার সে ক্ষমতা নেই। প্রাচীন আর্য ভাষা অনার্য ভাষা কোনটাতেই আমার দখল নেই। বাউল সাধনা একটি ধর্ম্ম সাধনা।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমার মনে হয়। ইসলাম ধর্ম্মের অঙ্গ থেকে জন্ম নিয়েছে সুফী সাধনা। ইসলাম-বৃক্ষের কান্ড শরিয়তী বা আচারনিষ্ঠ ইসলাম। এর পুষ্প সম্ভার সুফী সাধনা। এই সুফী সাধনার মূল কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ Ignaz Goldzihce বলেন যে মুসলমান খলিফাদের বিলাস ও জগৎপ্রিয়তা একদল চিন্তাশীল লোকের মনকে সংসার ত্যাগের ও অধ্যাত্ম সাধনায় দীক্ষা গ্রহণে ব্রতী করে। এঁরা রাষ্ট্রশক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নির্জন সাধনায় রুক্ষতর বস্ত্র এবং আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ বলেন এই বস্ত্র হ'তে তাঁদের নাম সুফী। সুফ শব্দ বলতে মোটা বস্ত্র বুঝায়। এই সম্পর্কে বাউলদের শততালিযুক্ত আলখাল্লাও যে এক প্রকার বিলাসের বিরুদ্ধে জয়-ধ্বজা উড়ায়,—তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাউলদের পোষাক এবং সুফীদের পোষাক উভয়ই এক শ্রেণীর পোষাক। আমার মনে হয় এই পোষাক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পোষাক থেকে গৃহীত। এই দীর্ঘ পোষাক বোধহয় সে যুগের ভদ্র পোষাক ছিল। ভারত, চীন, জাপান, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, ইরাণ প্রভৃতি দেশে এই দীর্ঘ আলখাল্লা সাধুদের দরবেশদের পোষাকরূপে গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের পোষাক হরিদ্রাবর্ণের ছিল। মুসলমান দরবেশদের পোষাক সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাউলদের একটী বৈশিষ্ট্য, এরা নরসুন্দরের আদৌ ধার ধারে না। ক্ষৌর কার্য এরা করে না। সহজভাবে এরা জীবন যাত্রার পক্ষপাতী বলেই কেশ গুম্ফ এবং শ্মশ্রুর সংস্কারের পক্ষপাতী নয়।

আর এদের প্রধান ধর্ম্ম হচ্ছে উদাসীনতা। এদিক দিয়ে সকল দেশের মরমীয়াবাদীদের মত বাউলও উদাসীন। সুফীরাও উদাসীন। সুফীরা নিজ্জর্নতাপ্রিয়। বৌদ্ধ শ্রমণদের মত বাউলেরাও নিরন্তন ভ্রমণশীল, সুফীরাও ভ্রমণশীল। বাউলেরা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক এবং প্রধানতঃ মনের মানুষরূপেই ঈশ্বরকে জানবার সাধনা। "ঈশ্বরের আসন বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়" মুসলমান ধর্ম্মগুরুর এই উক্তি লক্ষ্যণীয়।

বাউলেরা সহজ জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। এই জীবন ধারণ আমার মনে হয় বৌদ্ধ ধর্ম প্রসূত। বাউলদের জীবনের বড় আশ্রয় বৌদ্ধ সহজ যান, বৈদিক ব্রাত্য এবং বাঙ্গালার বাউল উভয়ই একধর্ম্মী অর্থাৎ আচারের মরা বালুরাশি এদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে প্যারেনি। মগধের ব্রাত্য এবং বঙ্গের বাউল একই বিদ্রোহধর্ম্মী।

তন্ত্র এবং নাথ পন্থা বাউলদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের অধ্যাত্ম সাধনা বাঙ্গালী অনার্য অধ্যাত্ম সাধনাকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় এই সকল বঙ্গদেশজাত অধ্যাত্ম সাধনার একটী বিশিষ্টরূপ বাউল সাধনা।

বাউলেরা যে সকল গান রচনা করেছে তার সঙ্গে বৌদ্ধগান ও দোঁহার যেন সাক্ষাৎ সম্পর্ক

রয়েছে। আমার মনে হয় বৌদ্ধগানের মধ্যেই বাউল সাধনার বীজ-মন্ত্র নিহিত রয়েছে। বৌদ্ধগান ও দোঁহার সকল অর্থভেদ করতে পারলে তবে বাউল সাধনার রহস্যভেদ সম্ভবপর হবে।

সবচেয়ে অসুবিধার কথা বাউলগান সামগ্রিকভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা থেকে সংগৃহীত হয়নি। এই সংগ্রহের জন্য বিরাট অর্থভান্ডারের দরকার। কে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে?

বৌদ্ধগান ও দোঁহা যেমন বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট একটী অপূর্ব "আত্মিকলোক," বাউল গান ও অন্যান্য পর্যায়ের পল্লী গানও তেমনি। বাউলেরা এই আত্মিকলোকের অধিবাসী। রবীন্দ্রনাথের কথায় "অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্ত লোক। বাউলেরা এই চিত্ত লোকের সাধনায় মত্ত।"

জাতকে আমরা পাই যে শ্মশানঘাট হ'তে পরিত্যক্ত বস্তু সংগ্রহ করে চীবর তৈরী করবার কথা। বাউলদের সুফীদের এবং শ্রমণদের চীবরের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বিলাসিতা ও সংসারমুখীতাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে মানুষে মানুষে মিলনের সাধনা বাউলদের। সংসারী এবং আবদ্ধ মানুষ নানা খন্ড এবং কোঠায় বিভক্ত এবং আবদ্ধ। সর্ব মানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত তা বাউলের জীবনে স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। এইজন্য বাউলেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করেন। একে অন্যের শিষ্য হন। ধর্ম্ম এবং জাতিভেদ উপেক্ষা করে।

বাউলদের দেবতার কোন প্রতীক নেই। দেবতাকে তাঁরা মনের মানুষ বলে সাধনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের এই ধর্ম-সাধনা সম্পর্কে বলেছেন, "মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনকেই পর করে দিয়ে। আপনকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরে বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারীর মুখেঃ

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ে লোকের মুখেই শুনেছিলেমঃ তোর ভিতর অতল সাগর
সেই পাগলই গেয়েছিলঃ মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ। —
সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা আছেঃ আবিরাবীর্ম এধি

পরম মানবের বিরাট রূপে যার স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

(পৃঃ ৮৩—৩৯ঃ মানুষের ধর্ম)

রবীন্দ্রনাথের নামই এই বাউল গান সংগ্রহ ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রবাসীতে লালন ফকীরের গান সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গানগুলো দেখেই আমি সর্বপ্রথম বাউলগান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। এবং আমার সে সংগ্রহ সম্ভবতঃ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের প্রবাসীতে ছাপা হয়। তারপর ভারতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক মোহাম্মদী, বিচিত্রা, বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় বাউল ও অন্যান্য ধরণের নানা গান প্রকাশ করি।

বাউল ফকীরদের মধ্যে আমি প্রধানতঃ লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করেছি। বাউল সাধনা

সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে প্রধানতঃ লালন ফকীরের গানই আমার প্রধান অবলম্বন।

লালন ফকীর সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের সাহিত্যিকরা পোষণ করেন না। লালন ফকীর ও হরিনাথ মজুমদার ওরফে ফিকির চাঁদ এবং মীর মোশারফ হোসেন সমসাময়িক এবং একই অঞ্চলের অধিবাসী।

শুনতে পাওয়া যায় লালনের জন্ম হয় হিন্দুকুলে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। কুষ্ঠিয়া থেকে মাইল তিনেক দূরে দেঁওড়িয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন প্রায় সোয়া শত বছর পূর্বে এবং ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে তিনি পরলোকে গমন করেন। লালনের শিষ্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে দেখতে পাওয়া যায়। গোরাই নদীর তীরে কুষ্ঠিয়ার সন্নিকটস্থ একটি গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দৌলতে এই সমাধি পাকাপোক্ত হয়েছে।

লালনকে প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য লালন সম্পর্কে 'বাঙ্গালীর গান' এবং 'শরৎবাবু ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে' লালন ফকিরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গৌরচন্দ্র ও লালনচন্দ্রের বাড়ী নদীয়ায়। নদীয়া সুপ্রসিদ্ধ স্থান।

লালন ফকীরের গান আমি আমার হারামণি প্রথম খণ্ডে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করি প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর পরে বছর পাঁচেক আগে হারামণি তৃতীয় খণ্ডে লালন ফকীরের আরও শতাধিক গান ছেপে দিই। সম্প্রতি আমার ভ্রাতার সাহায্যে ফরিদপুর জেল হাসপাতাল হতে লালনের প্রায় পঞ্চাশটী গান সংগৃহীত হয়। এই গানগুলো ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে কিছুকাল আগে। লালন ফকীরের গান যশোহরের শ্রীমতিলাল দাস সংগ্রহ করে-ছিলেন বলে শ্রীঅন্নদাশঙ্করের মুখ থেকে শুনেছিলাম। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, মোহম্মদী, নওরোজ প্রভৃতি নানা পত্রিকায় লালনের গান প্রকাশ করেছেন নানাজনে নানা সময়ে। এই সকল গান পুস্তকাকারে প্রকাশ করা দরকার।

লালনের নামই সকল শ্রেণীর লোকের নিকট কতকটা পরিচিত। লালনের মতই মদনের নাম। লালন ও মদন উভয়েই মুসলমান। গগন হরকরাও সম্ভবতঃ মুসলমান ছিলেন। মদনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। মদনের অবিষ্কর্ত্তা শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। মদনের গান তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই গান জগতে প্রচার করেন। মদনের পরিচয় স্পষ্ট করে তিনি দেন নি কোথাও। মদনের একটি গান মাত্র আমার হারামণি প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে।

বাউলদের সন্ধানে শ্রীক্ষিতিমোহন বলেন, "বাউলদের মধ্যেতো হিন্দু মুসলমান কোন ভেদই নাই। লালন, হাসান, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান। মদনের লেখা যেমন গভীর তেমন সুন্দর। তাঁহারই গান ঃ

১ প্রেমের মোল প্রেমই যে বান্দা নারে দুখ নারে সুখ ২ ভবের হাটে আলিরে বান্দা দাম দিবি তুই কিসে ৩ রসের সাগরে ডুব দিতে যে বড়ই ডর লাগে ৪ নিঠুর গরজী তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে ৫ আমার আজব অতিথি ৬ মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ দিবে কিসে ধরা।

তাঁহার বিখ্যাত গান ঃ

যদি করিস মানা ওগো বন্ধু মানি এমন সাধ্য নাই।
　কোন ফুলের নামাজ রংবাহারে
　কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

(পৃঃ ৩১—৩২ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা)

শ্রীক্ষিতিমোহন অন্যান্য সুবিখ্যাত বাউলদের যে নামোল্লেখ করেছেন তা আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি।

"বাউল গঙ্গারাম জাতিতে নমঃশূদ্র। বাউল মনাই শেখ শিষ্য কালাচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিষ্য হারাই নমঃশূদ্র, তাঁর শিষ্য দিনু জাতিতে নট, তাঁর শিষ্য ঈশান যুগী, তাঁর শিষ্য মদন। নিত্যলালের শিষ্য বলা কৈবর্ত্ত, তাঁর শিষ্য বৈশা ভূঁইমালী, তাঁর শিষ্য জগা কৈবর্ত্ত, তাঁর শিষ্য পটিয়াল বা কাপালী, তাঁর শিষ্য গঙ্গারাম। গঙ্গারাম ও মদন দুই বন্ধু ছিলেন। গঙ্গারামের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন। গঙ্গারামের গানও অপূর্ব।" (ঐ—পৃঃ ৩২)

উপরিউক্ত বাউলদের গানের সংগ্রাহক মাত্র শ্রীক্ষিতিমোহন। রবীন্দ্রনাথের মারফত এই সকল বাউলদের গান জগতে সুপরিচিত। আমি মদন, ঈশানের দুইটি গান সংগ্রহ করতে পেরেছি। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন এই সকল বাউলের কোন পরিচয় দেননি কিংবা কোথা থেকে এই সকল গান সংগ্রহ করেছেন তিনি বলেন নি। সে যা হোক যদি এই গানগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ হয় তাহলে সাহিত্যের বিশেষ উপকার হবে।

পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা জনচিত্ত বাউলগানের রসে সিক্ত ও উজ্জীবিত। মরমীয়া জনচিত্তের খোরাক এই বাউল গানগুলো। তাই এই সকল বাউলকবি এবং তাঁদের কর্ম্মসাধনার ক্ষেত্রে ভালভাবে আজ আমাদিগকে জানতেই হবে। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের দায়িত্ব এ সম্পর্কে সীমাহীন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লোকসঙ্গীত ও গাথা সম্পর্কে যে কাজ করেছেন তা অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। এক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরণের সংগঠনমূলক কার্য আদৌ হয়নি। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিরাট কার্যসূচী পল্লী গান ও গাথার ব্যাপারে উভয় জাতির সম্মুখে রয়েছে। বিশ্বভারতীও মনে হয় বিশেষ কাজ এ সম্পর্কে করবেন বলে আশা করা যায়।

বাউলদের প্রধান কথাই হল জানা। আপনাকে চেন। তার কারণ মনের মানুষ মানুষের মনে বাসা বেঁধে রয়েছে। বাউল কবি গেয়েছেন ঃ

এই মানুষে আছে রে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়।

এই সোনার মানুষের সাধনাই হল বাউলের। সুতরাং এই সাধনা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সকল অধ্যাত্ম সাধনাই ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাউলদের সাধনার বড় একটা অংশ হচ্ছে দেহের জ্ঞান, দেহ জরীপ। বাউলের গানেই পাই—মণিপুরের খবর জান। কিংবা বাহান্ন গলি তেরপন্ন বাজার। কিংবা আব আতশ থাক বাদ চারচিজে হয় দেহ গঠন। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে বাউল সাধনার এই জায়গায় বড় মিল দেখতে পাওয়া যায়। নাথপন্থীদের কথাও একই?—কায়া সাধ।

চর্যাপদ বা বাউল গানে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য জ্ঞানই কাম্য। রাইস্ ডেভিডস বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা চর্যা বা বাউল গানের সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। তিনি বলেন

"And it is not by chance, not unadvisedly that the foundation of the higher life, the gate to the heaven that is to be reached on earth is placed not emotion, not in feeling but in knowledge in victory over delusions. The moral progress of mankind depends on the progress of knowledge, the moral progress of the individual

depends according to Buddhism upon his knowledge. Sin is folly. It is delusion that leads to crime. But to make any advance beyond the average stand point, he must get rid of delusions; he must see things as they are, in a way ordinary people do not, he must grasp ideas beyond grasp of the average mind" (p208—209)

জ্ঞানই একমাত্র সেতু ঃ

ভব নই গহীন গম্ভীর বেগে বাহী ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই
দু আন্তে চিখিল মাঝে না থাহী পারগামি লো অ নিভর তরই।

দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিবেচনা করে চর্যা বাউল ও অন্যান্য ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনাগামী জ্ঞানরাজ্যে যাত্রা করেছেন।

চর্যাপদে ষটচক্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। চর্যাপদে পাই ঃ

এক সে পদুমা চৌষট্টি পাদুরী।

এই চৌষট্টি দলভুক্ত পদ্ম হচ্ছে সহস্রার, উর্ধ্বরেতা সাধকদের মক্কাধাম।

শ্বাস-প্রশ্বাস আপন আয়ত্ত্বে আনতে পারলে সাধকের কালের জ্ঞান তিরোহিত হয়—'ধমন, রমণ' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ রয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে গঙ্গা যমুনা নানা শব্দে বুঝান হয়েছে। বাউল সাধকদের গানেও অনুরূপ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মোটকথা বাউলদের কথা বুঝতে গেলে বৌদ্ধ গানগুলোর গুহ্য অর্থ ভেদ করতে হবে। কুম্ভক, রেচক প্রভৃতি শব্দ বাউল গানে নিত্য ব্যবহৃত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দে ও সাধন পন্থার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, মুসলমান তাসাউফ বা সুফী সাধনার পারিভাষিক শব্দ ও সাধনপন্থা।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতের মরমীয়া সাধনায় ষটচক্রের বা ষড় লতিফার স্থান রয়েছে। ষটচক্রের ধারণা কত সুপ্রাচীন তা আমি জানিনে তবে এ ষটচক্র বোধ হয় বাঙ্গলা আর্যপূর্ব অনার্যসাধনার একটা বিশিষ্ট ফল। আজকে আশ্চর্য বোধহয় একথা জেনে যে, It must be remembered that sufi fraternities (*e.g.* Nagsha bandi) derived or rather favoured from the Indian Vedantats other means to bring about this realisation. They taught initiating the Hindu doctrine of kundalini that these are six great centres of light of various colours in the body of man. (pp. 110—111 The Development of Metaphysics Persia by Sheikh Md. Iqbal) .

তবে হিন্দু ষটচক্র ও সুফী ষড় লতিফার বিভিন্ন চক্রের স্থান সম্পর্কে কিছু-কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বটে। আবার সুফী সাধনার তরীকা ভেদে লতিফার স্থান ভেদ কল্পিত হয়েছে। লালন ফকীর বলেন ঃ

মেরুদণ্ডের পূর্ব ভাগে সর্পের আকার কুলকুণ্ডলিনী
ধায় চন্দ্র দ্রুতবেগে আছে সেই আসনের পরে।

ষটচক্রের বিবরণীতে পাই "তিনি সর্পের ন্যায় সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনে পরিবেষ্টন করে স্বয়ম্ভুর মাথার উপর প্রসুপ্তা রয়েছেন।" লালনের অন্য একটী গানে পাই ঃ

একটা সাপের দুইটি মুখ দুইমুখে কামড়ালেন তিনি।

যাহোক, দেহ জরীপ করা হয়েছে এবং সে জ্ঞান বাউলদের প্রবল ঃ

দেহে আট কুঠরী রিপু ছয় জনা।

আবার পাইঃ

আঠ কুঠুরী নয় দরজা কাজল কোঠার সিদ কাটিয়া

তার ভিতরে মণিকোঠা চোরে নিবে ধন।

আর একটি দরজা রয়েছে তার নাম দশমী দুয়ার অর্থাৎ সহস্রার এবং আবার পাই ঃ

তিনশত ষাইট জোড়াতে এ ঘর বেন্ধেছে

ঘরের কে কোথায় আছে দেখনারে।

আঠার খুটীতে খাড়া, বান্ধেছে ঘর জগৎ জোড়া

ঘরের ছয় দিয়ে ভাগ দশ কোড়ার তার

আজসারে চবিবশ বন্ধে ঐ দেখ ঘর রয়েছে।

বিভিন্ন চক্রের সম্পর্কেও পাওয়া যায়ঃ

দুই দলে বিরাজ করে, সহজ মানুষ চিনলেনা

মনের মানুষ হচ্ছে যে জনা।

ও তার দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে

স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

অন্যত্র পাইঃ

আউয়ালে হয় দুই দল শুনি

ষোলদল দুই দলের পরে, অষ্টদল মন সরোবরে

তারপর সাঁই বিরাজ করে, শতদল পদ্মেতে সুরধনী।

অধঃ ওদ্ধর্বঃ মেঘের পোড়া, তিনশত ষাইট সেই পদ্ম জোড়া।

হিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে যোগ হয়েছে মুসলমান অধ্যাত্ম সাধনার। গঙ্গা-যমুনার মত রামরহিমের মরমীয়া সাধনা এক সঙ্গে বয়ে চলেছে এবং সেই সাধনার মিলন-ক্ষেত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, "যে সব উদার চিত্তে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেচে, সেই সব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস-তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বন্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু রবিদাস, নানক প্রভৃতি চরিত্রে এই সব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এ'দের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্ত্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেচে।"

(হারামণির ভূমিকা)

মুসলমান অধ্যাত্ম সাধনার কথা পাই নীচের একটি গানে ঃ

তুমি লায়লাহা ইল্লাল্লা বল ও তোমার ফানা ফাল্লা যখন হবি

এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল নুহ অল এছবতি নফুয়ল নবি,

অই ভবের হাটে ভুলনারে মুহম্মদ রসুল। মেছের শা কয় তবে হবি আল্লার মকবুল।

অন্যত্র পাই ঃ'

ও মন মালকুতের মোকামি পানি জবরুতের মোকামে পানি

লাহুতের মোকামে অগ্নি হাওয়া চালাচ্ছেন নাছুতের মোকামে।

প্রফেসর আর. এ. নিকলসন্ প্রণীত 'মিষ্টিক্স অব্ ইস্লাম অথবা ডারু, ক্লার্ক প্রণীত 'ওয়ারিফুল মারিফ্' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ ভেদ করা হয়েছে। বাউল সাধনা সুফী সাধনার মতই একটি সার্থক অধ্যাত্ম সাধনা।

বাংলার লোকসংগীত

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকসংগীত সম্বন্ধে চলতি ধারণা হচ্ছে এই যে লোকসংগীত শুধু আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্ম সম্বন্ধীয় ভিত্তিতে রচিত হয়, আটপৌরে জীবনের কথা এতে কিছু নেই—শুধু দেহতত্ত্বই এর অংগ। লোকসংগীতের মূল কথাটা আমরা জানিনা বলেই এমন ভুল ধারণা করে থাকি। লোকসংগীত বুদ্ধিজাত গান নয়, জীবনের সব কিছু আটপৌরে ব্যাপার এতে জড়িয়ে আছে। যা কিছু সাধারণ মানুষের মনকে নাড়া দেয়, জীবনের মুখোমুখি হয়ে সে যা কিছু দেখেছে, অনুভব করেছে, সে-সবকেই মানুষ সুরের বাঁধুনি দিয়ে গানের রূপ দিয়েছে। সুরের দিক থেকে লোকসংগীত রাগ-রাগিণীর বাঁধন-মুক্ত। অনেক দিন থেকে চলে-আসা গান গাইবার বিশেষ ভংগীটি লোকসংগীতের বিশেষত্ব। তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে লোকসংগীত তালপ্রধান নয়, ছন্দপ্রধান। আর সে ছন্দটা কথার ভাবকে অনুকরণ করে বয়ে চলে।

বাংলা দেশে অনেক রকমের, বিভিন্ন ধরণের লোকসংগীত বর্তমান; যেমন, ঘাটুগান—রাধাকৃষ্ণের গান, সারি—মাঝির গান, জারি—চাষীর গান, ভাটিয়ালি, ব্রতের গান, বাদ্যানির গান, পার্বণের গান, জোটগান, বান্ধাগান—বিয়ের সময়ে গাওয়া হয়, লালন বা ঘুমপাড়ানি গান; এইরকম বহু ধরণের লোকসংগীত আমরা বাংলার অতি সাধারণ মানুষের মুখে শুনে থাকি।

ইউরোপেও কয়েক রকমের লোকসংগীতের অস্তিত্ব আমরা পাই; যেমন, রাতের পাহারা-দারের গান, সৈনিকের গান, চাষীর গান, কারিগরদের গান।

এদের এই গানগুলি আর বাংলা দেশের গানগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি যে সর্বদেশের সাধারণ মানুষের অন্তরে একই ধরণের সুর বাজে। দেশ, জাতি ধর্ম, সমাজ সবকিছু এদের আলাদা হলেও সহজ অনুভূতির ক্ষেত্রে সব দেশের সাধারণ মানুষের অন্তরের যন্ত্র একই সুরে বাধা।

ইউরোপীয় লোকসংগীতের চরিত্র হলো এই যে এটা নিছক মেলডিমূলক, হার্মনির কোন আভাষ এতে নেই।—সুরের ঐশ্বর্য নেই, সাধাসিধে, শুধু মেলডির ওপর এটা বেঁচে রয়েছে। হার্মনি অনেক পরে সুর-স্রষ্টা হ্যাণ্ডেল-এর সময় থেকে সুরু হয়েছে। ইউরোপীয় লোকসংগীতে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয় গানের পদগুলিকে। আর শুধু নাচবার আর গাইবার জন্য ইউরোপীয় লোকসংগীত গাওয়া হয়, যন্ত্রসংগীতের জন্য নয়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আমরা প্লেন সঙ্স্ এর প্রচলন দেখতে পাই। এর উৎপত্তি হয় ইহুদী সিনেগগ্ আর গ্রীক-গীর্জে থেকে। খৃষ্টীয় একাদশ শতক থেকে ব্যালাডের প্রচলন সুরু হোল।

জার্মাণীতে লোকসংগীতের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। বিখ্যাত লোকসংগীত-রচয়িতা ডেপেজ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তবে বর্তমানে খাঁটি লোকসংগীত বলতে যা বোঝায় ইউরোপে তা মেলা ভার হয়ে পড়েছে। আগাগোড়া একই ধাঁচের একটি সম্পূর্ণ লোকসংগীত প্রায় পাওয়াই যায় না। এখান থেকে ওখান থেকে লোকসংগীতের সুরের টুকরোগুলো নিয়ে গুচ্ছ করে করে 'হারমোনাইজেশন্' করা হয়েছে। বর্তমান হার্মনি বাদ দিয়ে লোকসংগীতের আসল মেলডিটুকু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেটোফেনের সিম্ফনিতে পর্যন্ত

নানারকম লোকসংগীতের সুর মিশে গেছে। সর্বদেশেই এখন হয়েছে এই নকলনবিশী যুগের ফরমাসী লোকসংগীত। তার আসল প্রাণশক্তি হারিয়ে গেছে এই নকল যুগের নকল আবহাওয়ায়—এখন নকল লোকসংগীত ড্রইংরুমের অবসর-বিনোদনের খোরাক জোটাচ্ছে। সে-গানে না আছে মাটির সুরভি, না আছে আকাশের ছোঁওয়া, না আছে নদীর বুকের ঢেউএর কম্পন। ড্রইংরুমের নকল গলায় নকল সুরের মধ্যে ক্রমশঃ এ নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। আগে বাংলা দেশে শহুরে শিক্ষিতদের মধ্যে কিন্তু লোকসংগীতের প্রতি এতটা অনুরাগ দেখা যায়নি। গেঁয়ো গানের কথা ভদ্র সাহিত্যে গণ্য করার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। এদিক দিয়ে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী—তিনিই প্রথম সাহিত্যে লোকসংগীতের সাদর আসন দেন। লোকসংগীতের ঐশ্বর্য ও ভাবের গভীরতা যা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল তিনিই সর্বপ্রথম তা তুলে ধরে দেন আমাদের কাছে। তাঁর রচিত বহু সংগীতে লোকসংগীতের সুর ও ঢঙ বর্তমান। যাহোক সেই থেকে লোকসংগীত আর হরিজন হয়ে রইল না—একেবারে ভদ্র পঙক্তিতে সসম্মানে উঠে এল। আর আজকাল তো এটা ফ্যাসানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এখন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কয়েকপ্রকার লোকসংগীত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

প্রথম হচ্ছে **বাউলের গান**। বাউলগানের ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাঙলা ভাষার আউল বাউলের গানে····ঝরণার জলে নুড়ির মতো হসন্ত শব্দগুলো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুনঠুন্ শব্দ করিতেছে। ভদ্র-সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীর্ঘিকার স্থির জলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নেই। আর সেই জন্যই সাধুভাষায় ছন্দটা যেন মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসা বুনুনি।"

ভাবের দিক থেকে বাউলগান মোটেই ধর্মসংগীত নয়। বাউল চায় মনের মানুষকে, ব্রহ্মকে নয়। প্রাণ তার কাঁদছে 'মনের মানুষে'র জন্যে, পরব্রহ্মের জন্যে নয়। বাউল গান আধ্যাত্মিক কিন্তু ধার্মিক নয়—একেবারে ধর্ম-নিরপেক্ষ গান—বরং তাকে মানবধর্মের গানও বলা চলতে পারে। এতে রয়েছে দরদীয়া মনের মানুষের সাধনা। এই সহজ সাধনে, ধর্মের সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে হিন্দু মুসলমান সবাই এসে মিলছে। তাই বাউল গেয়েছে—

"তোমার পথ চাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই—চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।"

বাউল গানের এই বিশ্বজনীনতা আর কোন দেশের লোকসংগীতে নেই। সুরের দিক থেকে বাউল রাগরাগিণীর বন্ধনমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বৈঠকী গানের গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না।" এখন দেহতত্ত্বের ওপর রচিত বাউল গানের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। গানটি শরৎদাসের রচনা, ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত।

"সে দ্যাশের কথারে মন ভুলে গিয়েছে।
ঊর্ধ্বপদে হেঁট মুণ্ড সে দেশে মন বাস কইর‍্যাছে
সে দ্যাশের কথা রে····
বিন্দুরূপে মস্তকে ছিলে, ফলভাবে গর্ভবাসে প্রবেশ করিলে
শুক্রে শোনিতে মিশে তাইতে আকার ধরেছ
সে দ্যাশের কথা রে····
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
পঞ্চমাসে পঞ্চ আত্মা বৈদিক দেহেতে

সপ্তমাসে গুরুর কাছে মহামন্ত্র লাভ কইরেছ
সে দ্যাশের কথা রে····
ও দীন শরৎ বলে, সাধনার বলে
অন্ধকার কারাগার হতে কেমন করে এলে
তুমি মিছে মায়ায় রয়েছ ভুলে
যাওয়ার উপায় কি করেছ?
সে দ্যাশের কথা রে····

রাজসাহীতে প্রচলিত একটি বাউলগান ঃ

প্রেম করে সুখ হল না প্রেমের প্রেমিক না হলে।
আখ বলে চাবালাম বাঁশ, বাঁশের নাইকো কোন রস
কেবল শুধু গালের সর্ব্বনাশ,
রসগোল্লার স্বাদ কি পাবি চিটাগুড় খেলে।
কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায় হাত বোলালি বল্লাচাকেতে
শুধু বোল্লায় কামড়াইবার আশে।
ও তুই যাইবানা শুধু পাইবা না মধু
মধু বোল্লায় কামড়াবে,
গঙ্গাশানের ফল কি পাবি খালে ডুব দিলে।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সাথে নাইরে লেনা-দেনা
কুমড়েরে কাটে মাটি, ছেলে করে পরিপাটি
কাঁচাসোনা রং ধরে না পুড়লে হবে পাকা সোনা
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।

জারি গান ঃ মুসলমানদের কারবালা সংক্রান্ত হাসান-হোসেনের ব্যাপার নিয়ে এই গান সৃষ্টি হয়। জারি গানের সুর টানা আর সেই টানা সুরেতে ব্যথা-বেদনার ছায়া। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা নিয়ে হিন্দুরাও জারি ঢঙে বহু গান তৈরী করেছে, তবে সেখানে বেদনার ছায়া নেই। স্থানীয় ঘটনা নিয়ে, সাময়িক ঘটনা নিয়ে সেই গানগুলি বাঁধা। হিন্দুদের তৈরী জারির সুরের কোন বিশেষ কাঠামো নেই, মুসলমানদের তৈরী জারির কাঠামো আছে। মুসলমানদের জারি গানে মূল গায়েন গান আর একদল ধুয়ো ধরে। জারি গান গায় যারা তাদের 'বয়াতি' বলে।

বগুড়ায় প্রচলিত একটি জারি গান ঃ

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচেনা ভাই
ও মোর ছাবেরুদ্দিন বলিছে তাই
কোথায় যায়ে গানের জোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো গায়ান গায়ে সাদ মিটাই
দুই হাতে দুই খঞ্জুরী বাজাই।
ওস্তাদ আমার আক্‌বার্‌ আলী ভাই
তিনি তো ভাঙ্গে বলে নাই—আ, আ-হা-হা
একটা জাগার পুরুষ জলে নামিল
সে যে ডুব দিয়ে কন্যা হোল

সদাগর এসে তাকে ধরে নিল।
ওরে বারো বছরের মধ্যে নারীর, তিনটে সন্তান তার হোল
ফিরে নারী সেই ঘাটে এলো
সেই ঘাটে না এসে নারীরে আবার পুরুষ হইল।
সে যে পুরুষ হয়ে দ্যাশে চলে যায়,
তাহার মনে বলে হায় রে হায়
কি না করতে আর বা কী না হয়।
ওরে আমি পুরুষ হয়ে নামলাম জলে
কন্যা হয়ে উঠলাম নায়,
বারো বছর করলাম বাণিজ্য সদাই,
সেও তো বয়াতি সৎসমন্দ নয় বয়াতি বলো চাঁদ সভায়॥

এখন রাজসাহীর একটি **সারী গানের** দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক; মজিদ মিঞা তার দিদিকে বলছে—তার বৌ বাপের বাড়ী যেতে চায়, বৌ ভাত রাঁধতে জানে না, কেবল পড়ে ঘুমোয় ইত্যাদি।

বউদি আমরার নাইওর যাইতো চায়—
রঙ্গিলা দিদি গো—বউদু আমরার নাইওর যাইতো চায়
(দিদি গো) ভাত রান্‌তে জানে না বৌ ভাত যে পাকায়
আফুটা ভাত খাইয়া গুষ্টির প্যাট বুড়বুড়ায়।
(দিদি গো) আমার বৌয়ের নায় ভালো না, বৌ কি সরমায়
আলগা মানুষ দ্যাখলে বৌয়ে উঁকি মার্য়া চায়।
(দিদি গো) আর একটা দোষ আছে বৌয়ের, বউ ক্যাবল ঘুমায়,
ঘুম দিয়া বৌ স্বপ্নের পরে নাওরের গীত গায়।
(দিদি গো) এ বৌ দিয়া কাজ চলবে না, কয় মজিদ মিঞায়,
নাক চুল কাট্যা কইর্যা দেই বিদায়।

এবার হচ্ছে **ভাটিয়ালি গানের** কথাঃ ভাটিয়াল মুলুকের গান বলে নাম হোলো ভাটিয়ালি। গানের কথাগুলি বেশীর ভ.। উদাস-করা। বিরহ, ব্যথা, দুঃখ নিয়েই গানগুলি তৈরী। গানের সুর হোল খুব টানা, বাঁধা তাল নেই, ভাবের ছন্দ নিয়ে গানের বুনুনি। যেখানে কথা আছে সেখানেও কথা সেরে ফেলে সুরের টানই বেশী। ভাটিয়ালির সুরে ঝিঁঝিঁট রাগের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সুজন নাইয়্যারে········
ক্যাম্‌নে যাবি তুই ভবরে নদী বাইয়া।
(আরে) এত সাধের তরীরে বাইয়া
(ও তুই) নষ্ট করলি তুই বাইচ খেলাইয়া,
(ও তোর) কাম নদীর ঐ নোনা জলে
(নায়ের) তক্তা যাবে খইয়া।
(আরে) অনুরাগের গুণ টানিয়া
বাইনটি দেয় লাগাইয়া,
(ও তুই) ভক্তিভাবের গাব্‌ লাগাওরে
(নাওয়ে) জল উঠবে না বাইয়া।

এই তো গেল পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত গান, এখন উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ভাওয়াইয়া, গাড়োয়াল, চটকা, মইশাল প্রভৃতি গান নিয়ে আলোচনা করা যাক্।

ভাওয়াইয়াঃ ভাবের থেকে ভাওয়াইয়া কথাটি এসেছে। মেচ, কোচ, পলিয়া এই উপজাতিদের জংলা সুর আর পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি এই দুই সুরের দুধারা মিশে ভাওয়াইয়া হয়েছে বলে মনে হয়। ভাওয়াইয়ার সুর টানা সুর, তবে গাওয়ার পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে গলাটাকে ভেঙে নিয়ে একটানা সুরের মাঝে যেন একটু একটু থমকা দেওয়া হয়। ভাওয়াইয়া গানের বেশীর ভাগ হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও দেহতত্ত্বের গান। প্রধানতঃ কুচবিহার অঞ্চলের কোচ, পোলিয়া উপজাতিদের মধ্যে এ গানের চলন। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও রঙপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া গান কিছু কিছু শোনা যায়।

কুচবিহারের **ভাওয়াইয়া** গানঃ

ওরে জীবন, ছাড়িয়ে না যাস মোরে।
ওরে জীবন ছাড়িয়া গেলে আদর করবে কে মনটারে।
ও জীবন রে....
ভাইবল ভাতিজা বল রে সম্পত্তির ভাগী
আগে করবে ধনের আশা পিছে করবে গতি
ও জীবন রে....
ও জীবন রে কাঁচা বাঁশে খাট পালঙ্করে
শুকনা পাটার দড়ি
দুজনাতে কান্ধে করে নিয়ে শ্মশান ঘাটে বাড়ি
চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়া রে, ওহো জীবন বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।
পরমায়ু শ্যাষ হইলে হস্তে দিবে দড়ি
ওরে জীবন দুইজনাতে যুক্তি করে
(ওহো জীবন) আসলাম ভবের হাটে।
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি নিধুয়া পাথারে।
ওরে জীবনরে ছোট হইতে পুষলাম তোরে দই ও দুগ্ধ দিয়া
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলি বুকেতে শ্যাল দিয়া ॥

ও জীবন, তুই আমাকে ছেড়ে যাসনে, তুই গেলে কে আমাকে আদর করবে? ও জীবনরে, ভাই ভাতিজা সবাই সম্পত্তির ভাগী, আগে ধনের আশা করবে, তার পরে যা করবার তা করবে। চিত্রগুপ্ত তার খাতা নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে, পরমায়ু ফুরোলে হাতে দড়ি দিয়ে সে টেনে নিয়ে যাবে। ওরে জীবন, তোতে আমাতে পরামর্শ করে তবে তো এই ভবের হাটে এসেছিলুম, তুই জীবন আমাকে ছেড়ে চলে গেলি অকূল পাথারে। ও জীবন, কতো ছোট থেকে তোকে পুষলুম দই দুধ খাইয়ে, আর তুই আমার বুকে শেল হেনে ছেড়ে চলে গেলি।

রঙপুর অঞ্চলে গীত ভাওয়াইয়া—বারাইস্যা (তাল—কাহারবা)ঃ

আরে ও ভাবের দোতারা
নবীন বয়সে মোরে করলি বাউদিয়া।
যখন দোতরা নিলাম হাতে,
নিষদ করে মোর পাড়ার লোকে,
নিষদ করে মোর দয়াল বাপভাই।

(দোতরা) তোর জন্য মোর গিরাম বাদী
থানায় দেয় এজাহারী
দারোগাবাবু হাতে দেয় দড়ি।
তুই দোতরা রাখিস মান
রূপা দিয়ে মুই বান্দবো রে কান
নয়া গাছের মাণিকরে কলা—

ও আমার দোতারা, আমার এই অল্পবয়সেই তুই আমাকে পাগল করলি। যখন তোকে হাতে তুলে নিলাম, পাড়ার লোক কতো মানা করলো, বাপভাই সবাই নিষেধ করলো। দোতারা, তোর জন্যে গ্রামের লোক আমার বিপক্ষে গেলো, দারোগাবাবুকে জানিয়ে আমার হাতে দড়ি পর্যন্ত দিলো। ও আমার দোতারা, তুই আমার মান রাখিস, তোর কান আমি বাঁধিয়ে দেবো রূপো দিয়ে।

গাড়োয়াল ঃ গরু চরাতে চরাতে রাখালের গান। এগুলোও ভাওয়াইয়া জাতের টানা সুরের গান। কুচবিহারের গাড়োয়াল গানের নমুনা ঃ

(উকি) কাজল ভোমরা গরুর রাখোয়াল রে
মুই নারী কোলে বাছা ছাওয়া।
যে মোরে করিতো রে পার দান করিতাম গলার হার,
পার হইয়া জেবন করতাম দানো।
ও পারে বন্ধুর বাড়ী ই পারে মুই নারী
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।
বালুতে রান্ধিনু বালুতে বাড়িনু
জলেতে ভাসাইয়া দিলাম হাঁড়ি
বিয়ার সোয়ামি মইলে রে পরে খাবো মাছ আর ভাত রে
প্রাণ-বন্ধুয়া মইলে পরে হবো আঁড়ি।
না জানি সাঁতারো, না জানি পাহারো
না জানি ভুরা বাহিবারে অকুল দরিয়ায় কেমনে হবো পার
মুই নারী কোলে বাছা ছাওয়া॥

জয়জয়ন্তীর আভাস এতে আছে। তাল কাহরবা, কাওয়ালী। গানটিতে পরকীয়া রসেরও নমুনা পাওয়া গেল।

ভ্রমরের মতো কাজল গরুর রাখাল, আমি নারী, কোলে আমার ছোট বাচ্ছা; আমাকে যে পার করে দেবে, তাকে গলার হার দিতুম, পার হয়ে দিতুম আমার যৌবন। ওপারে আমার বন্ধুর বাড়ী, এপারে আমি নারী, মধ্যে বইছে নদীর ক্ষিপ্র জলধারা। আমি নদীর তীরে রাঁধলুম, তীরেই বেড়ে খেলুম, তারপরে হাঁড়ি ভাসিয়ে দিলুম নদীর জলে। বিয়ে করা স্বামী মরলে পরে খাব মাছ আর ভাত, যখন প্রাণের বন্ধু মরবে তখন বিধবা হবো। (কি রকম সাহস গ্রাম্যনারীর, কি বেপরোয়া কবুলতি প্রেমের!) সাঁতার জানিনা, সময়ের দিশাও হারিয়েছি, কলার ভেলাও বাইতে জানিনা। এই অকূল দরিয়া কেমন করে পার হবো, আমি যে নারী, কোলে যে আমার শিশু।

জলপাইগুড়ির একটি **মইশাল গান**—মোষ চরাতে রাখাল ছেলের গান।

মইশাল মইশাল কর বন্ধুরে
(ওরে) শুকনা নদীর কূলে হে

মুখখানি শুকায়ে গেছে চৈত মাইস্যা ঝামেলা।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
আমার বাড়ীতে যাইও বন্ধুরে এই না বরাবর,
খাজুর গাইছা বাড়ী আমার পূব দুয়ার্যা ঘর।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
আমার বাড়ীতে যাইও বন্ধুরে বসবার দিব মোড়া
জলপান করিতে দিব ও শাল ধানের চিড়া।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
শালধানের চিড়া দিবরে বিন্দুধানের খৈও
(আজি) মোটা মোটা সফ্রী কলা গামছা পাতা দৈ ওরে
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।

মইশাল বন্ধুর প্রতি মেয়ের উক্তিঃ শুক্নো নদীর কূলে মুখখানি শুকিয়ে গেছে চৈত্রমাসের গরমে। ও মইশাল বন্ধু, তোমার জন্য প্রাণ আমার কাঁদছে। বন্ধু, তুমি এই সোজা পথ ধরে আমার বাড়ী যেও বাড়ীতে আমার খেজুর গাছ আছে আর ঘর আমার পূবদুয়ারী। বন্ধু, যেও আমার বাড়ী, বসবার জন্য মোড়া দেবো, আর শাল ধানের চিড়ে দেবো জলপান করতে। শুধু যে শালিধানের চিড়ে দেবো তা নয়, বিন্দু ধানের খই দেবো, তার সঙ্গে দেবো মোটা মোটা সফরী কলা আর ঘন দৈ। মইশাল বন্ধু আমার প্রাণ কাঁদছে তোমার জন্য।

চট্কা গান ঃ 'চুটকি' কথার থেকে চটকা কথাটি এসেছে বলে মনে হয়। সব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে এই গানগুলি তৈরী। সাধারণতঃ দেহতত্ত্ব ইত্যাদি চট্কা গানে নেই। সুর ও ছন্দের দিক থেকে চট্কা গানের সুর নাচুনে, তার গতি দ্রুত। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রঙপুর আর বিশেষ করে কুচবিহারে এই গান শোনা যায়।

কুচবিহারের চট্কা গানের নমুনা তুলে দিই (তাল—গড়খেমটা) ঃ

(আজি) প্রেম জানে না রসিক কালাচাঁদ
আমার ঘুরি-ই পরে মনে
কতো দিনে বন্ধুর সনে হবি দরশন বন্ধুরে।
একলা ঘরে শুই-ই থাকি পালঙ্কেরই পরে
মন মোর উড়াং বাইরাং করে (ছট্ফট্ করে)
পালং হইতে মরার পালং
ক্যারৎ কি কুরুৎ কি কারাম কারাম করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে।
আজ তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
যাতি আসতে এতো দেরী
যাবো কি রবো আজ শুধাই করো মানা
হাটিয়ে যাতে নদীর জল
খাক্লু কি খুকলুং কি খলাল্ খলাল্ করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে।
(ও বন্ধুরে) আমি তোমার আশায়
বোসয়্যা থাকি বটবৃক্ষের তলে

মন মোর উড়াং বাইরাং করে,
ফাল্গুন ম্যাসে ম্যাঘের দিনে
টববর কি টুববুর কি ঝপ্ঝপায়া পড়ে
হায় হায় পরাণের বন্ধু রে॥

'ঘুরি-ই পরে মনে'—এই অংশটিতে মূলতঃ ঝিঁঝিঁট, সুরট বা মল্লারের একটু আভাষ আছে। 'কতোদিনে বন্ধুর সনে হোবি দরশন বন্ধুরে'—গৌড়সারাং, ছায়ানট, বিলাওলএর অবরোহী আভাষ আছে।

রসিক কালাচাঁদ প্রেম জানে না, তবু ঘুরে ফিরে বরাবর তাকে মনে পড়ছে। কতো দিনে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে, হায়রে বন্ধু। আমি একলা ঘরে পালংকের উপর শুয়ে থাকি, মন আমার ছট্ফটিয়ে মরে। পালঙ্ক আমার শব্দ করছে মড়ার খাটিয়ার মত, হায়রে বন্ধু আমার। তোমার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী এতো দূরের পথ। আজ যাবো, না যাবো না, তোমাকে শুধাই। তুমি মানা করছ। নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় নহীর ঢেউ গর্জন করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। হায়রে বন্ধু আমার। ও বন্ধু, তোমার আশায় আমি বসে থাকি বট গাছের তলায়, ছট্ফটিয়ে মরে আমার মন। ফাল্গুন মাসে মেঘলা দিনে যখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ে কিম্বা খুব জোরে পশলা হয় তখন ফাল্গুনের সেই মেঘলা বেলায় তোমাকে মনে পড়ে। হায়রে বন্ধু আমার।

রঙপুরের চট্কা গানঃ

বাড়ী ছাড়িয়ে কোথাও যাও,
দোহাই আল্লাটা মোর মাথা খাও,
কালা মোরগটা অসুন বৈসাছে।
কন্যা যখন তোর বাড়ীতে যাই
কতো মানুষ মুই দেখতে পাই
দৌড়া পলাই মুই পাটা বাড়ী মধ্যে (ও ও মোরি হায়রে)
কন্যা আশা দিলি ফরসাইয়া দিলি
কলার মোথাত্ মোর বসায়া থুলি
সারা রাত মোর মশারে কামড়াইছে। (ও ও মোরি হায়রে হায়)
আগুন নিগুনটা না বুঝিয়া
ভাতের উতালটা দিলু ঢালিয়া
সোনার গায়ে মোর ফোসা পইর‍্যাছে (ও ও মোরি হায়রে হায়)
বিশ্বাস যদি না হয় তোর
জামা তুলিয়া দেখেক্ মোর
দ্যাড়টাকা স্যার ফেনাল্ ত্যাল দিসে। (ও ও মোরি হায়রে হায়)

প্রেমিক বলছে প্রিয়াকেঃ বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছো? আল্লার দোহাই, আমার মাথা খাও, যেও না। দেখছো না কালো মুরগীটা ডিমে তা দিতে বসেছে। ও কন্যে, যখন তোমার বাড়ী যাই কত লোক দেখি আমি দৌড়ে পালাই আমি বাড়ীর অন্য মহলে। হায়রে হায়। আমাকে কতো আশা দিলে, দিয়ে সব আশা ভেঙ্গে দিলে। তোমাকে দেখার জন্য সারারাত কলাগাছ চড়ে কাটালুম। সারা রাত আমাকে মশা কামড়েছে। হায়রে হায়। একেবারে না ভেবে চিন্তে তুমি ভাতের ফেন ঢেলে দিলে, তাতে আমার সোনার গায়ে ফোস্কা পড়েছে। হায়রে হায়। যদি বিশ্বাস না হয় তোমার, তাহলে জামাটা তুলে দেখো, দেড়টাকা সের ফেনাইল মেখেছি গায়ে। হায়রে হায়।

দিনাজপুরের চট্‌কা গান ঃ

ডাল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া
গুরুর কাছে নেওগা মন্তর নিরালে বসিয়া
ডাল পাক কর রে।
ছোট বৌ চড়ায় ডাল মাঝলা বৌ ঝাড়ে
(হারে) বড় বৌ আসিয়া কাঠি দিয়া নাড়ে।
ডাল পাক কর রে।
(আমার) শ্বশুর করে ঘুসুর মুসুর
ভাসুর করে গোসা
(আজি)নিদয়া এলো স্বামী এসে ধরল চুলের খোসা,
ডাল পাক কর রে।
(আমার) শাশুড়ী আছে, ননদ আছে
আছে ভাগনা বৌ,
এমন করে মার মারিলো আইগ্যালো না কেউ,
ডাল পাক কর রে।—

বৌ-এর উক্তি ঃ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধো আর নিরালায় বসে গুরুর কাছে মন্তর নাও ছোট বৌ ডাল চড়ায়, মেজ বৌ ডাল ঝেড়েছে আর বড় বৌ এসে কাঠি দিয়ে ডাল নেড়ে দেখে। আমার শ্বশুর আমার নামে লাগলো, ভাসুর রাগ করলো আর আমার নিষ্ঠুর স্বামী এসে চুলের গোছা ধরে আমাকে মারলো। আমার শাশুড়ী আছে ননদ আছে, ভাগনে বৌও আছে কিন্তু এমন করে যখন মারলো আমায়, কেউ এগিয়ে এলো না আমাকে বাঁচাতে। কাঁচালঙ্কা দিয়ে ডাল রাঁধো।

এমনি করে লোকজীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে বাংলার লোকসংগীতের বহুমুখী ধারা বয়ে গেছে যুগযুগান্তর ধরে। জীবনের এমন কোন প্রকাশ নেই যাকে গানের সুরের ফ্রেমে বেঁধে ধরেন নি বাংলার লোকসংগীত-রচয়িতারা। প্রতিদিনের আটপৌরে জীবন, সামাজিক জীবন, ধর্মের জীবন, ধর্ম-নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন, সব কিছুর ছবি ধরা পড়েছে লোকসংগীতে। সাধারণ মানুষের জীবনের সামাজিক ইতিহাস অনাগত কালের জন্যে ধরা রয়ে গেছে লোকসংগীতের অনেক গানে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবের সূক্ষ্মতায় ও পেলবতায়, এবং অনুভূতির গভীরতায় বাংলার লোকসংগীত রসোপলব্ধির যে অমরাবতীতে আমাদের নিয়ে যায় পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোকসঙ্গীত তার প্রত্যন্ত সীমার কাছাকাছিও আমাদের পৌছে দেয় না। তাই শুধু বাংলার মানুষের সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের খনি হিসাবেই বাংলার লোকসংগীত মূল্যবান নয়, এই গানগুলি বাংলার রস-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রবীন্দ্র অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আত্মশক্তি— ১৯০৩ সালে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব ইংরাজ সরকার এনেছিল। লর্ড কার্জন এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য হিন্দু মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলেন। বাঙালী এই দেশবিচ্ছেদের চক্রান্ত বানচাল করার জন্য সংঘবদ্ধ হলো। এই সময় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের একবিচিত্র আবির্ভাব দেখলুম। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে বঙ্গদর্শন, ভান্ডার প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি মৌলিক প্রবন্ধ লিখিতে লাগলেন। সেই প্রবন্ধগুলি নিছক উত্তেজনাপ্রসূত রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়, তার মধ্যে বাঙালীর জাতিগত চরিত্র, তার ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। তিনি বরাবরই বলেছেন যে আত্মনির্ভরতা ছাড়া সফলতা লাভের অন্য কোন উপায় নেই। তাই নানা প্রবন্ধে ঐ একটি পথই বার বার তিনি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি গানে তিনি লিখেছিলেন—

> মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনীর পালা
> চোখে নাই কারো নীর
> আবেদন আর নিবেদনের থালা
> বহে বহে নত শির।
> কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি একি লাজ
> জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ
> আপনি করিনে আপনার কাজ
> পরের পরে অভিমান

ইংরেজের সংগে বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় আমরা আত্মসচেতন হবো, আপনাকে লাভ করবো এ কথাও তিনি বলেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়—"বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতে থাকিতাম।" (ব্রতধারণ)

এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকেই রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তুলে ধরেন। ১৩০৮ থেকে ১৩১২ পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত দশটি প্রবন্ধ আত্মশক্তি নামে ১৩১২ সালে গ্রন্থভুক্ত হয়। গ্রন্থের নামেই প্রকাশ যে আত্মশক্তির উদ্বোধনই তাঁর মনের কথা ছিল। আত্মশক্তির প্রবন্ধগুলির প্রকাশ কাল এই রকম ঃ—

নেশন কী—	
ভারতীয় সমাজ — (হিন্দুত্ব নামে প্রকাশিত)	শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গদর্শন
স্বদেশী সমাজ —	ভাদ্র ১৩১১ বঙ্গদর্শন
স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট —	আশ্বিন ১৩১১ বঙ্গদর্শন
সফলতার সদুপায় —	চৈত্র ১৩১১ বঙ্গদর্শন

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ —	বৈশাখ ১৩১১ বঙ্গদর্শন
য়ুনিভার্সিটি বিল —	আষাঢ় ১৩১১ বঙ্গদর্শন
অবস্থা ও ব্যবস্থা —	আশ্বিন ১৩১২ বঙ্গদর্শন
ব্রতধারণ —	ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গদর্শন
দেশীয় রাজ্য —	শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন

স্বদেশী সমাজ মিনার্ভা থিয়েটারে চৈতন্য লাইব্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ৭ই শ্রাবণ ১৩১১ (২২শে জুলাই ১৯০৪) পড়া হয়। সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। ১৬ই শ্রাবণ প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত আকারে পঠিত হয় কর্জন রঙ্গমঞ্চে।

স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের কতকগুলি মন্তব্যের প্রশ্ন তোলেন তখনকার বঙ্গবাসী পত্রিকায় বলাইচাঁদ গোস্বামী। তারই উত্তরে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট।

সফলতার সদুপায় ২৭শে ফাল্গুণ ১৩১১ সালে প্রদত্ত কবির ভাষণ তৎকালীন শিক্ষানীতি সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সভাপতিত্বে এই সভা হয় জেনারেল এসেম্বলী (বর্তমানের স্কটিশচার্চ কলেজ) হলে।

ছাত্রগণের প্রতি সম্ভাষণ ১৩১১, ১৭ই চৈত্র, ক্লাসিক থিয়েটারের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্যপরিষৎ। অবস্থা ও ব্যবস্থা ৯ই ভাদ্র টাউন হলের ভাষণ। ১৯০৫ সালের ২৫শে আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়—সেখানে কবি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। দেশীয় রাজ্য ১৭ই আষাঢ় ১৩১২ ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আগরতলায় পঠিত। সভাপতি ছিলেন মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য।

ব্রতধারণ প্রবন্ধটি কবি নিজে পড়েন নি। বঙ্গদর্শনের পাদটীকায় আছে "কোন 'স্ত্রী সমাজে' জনৈক-মহিলা-কর্তৃক পঠিত।"।

এই সময়ের—১৩০৮—১৩১২ সালের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় ১৩১২ সালে তবে আত্মশক্তি প্রকাশিত হবার পরে।

আধুনিক সাহিত্য —১৩১৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলি ১২৮৮ থেকে ১৩১৩ সালের মধ্যে সাধনা, ভারতী বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। মাসিকপত্রে যে আকারে এগুলি প্রকাশিত হয় তার সবগুলিই যে ঠিক সেই আকারে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে তা নয়— কোন কোনটির অংশবিশেষ বর্জিত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের প্রবন্ধ সংখ্যা ১৬ কোন্ পত্রিকার কোন সালে প্রকাশিত হয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো

ডি প্রোফান্ডিস	ভারতী	আশ্বিন	১২৮৮
বিদ্যাপতির রাধিকা	সাধনা	চৈত্র	১২৯৮
রাজসিংহ	সাধনা	চৈত্র	১৩০০
বঙ্কিমচন্দ্র	সাধনা	বৈশাখ	১৩০১
বিহারীলাল	সাধনা	আষাঢ়	১৩০১
ফুলজানি	সাধনা	অগ্রহায়ণ	১৩০১
আর্যগাথা	সাধনা	অগ্রহায়ণ	১৩০১
সঞ্জীবচন্দ্র	সাধনা	পৌষ	১৩০১

কৃষ্ণচরিত্র	সাধনা মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১
যুগান্তর	সাধনা চৈত্র ১৩০১
মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস	ভারতী শ্রাবণ ১৩০৫
সাকার ও নিরাকার	ভারতী আশ্বিন ১৩০৫
আষাঢ়ে	ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩০৫
জুবেয়ার	বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১৩০৮
মন্ত্র	বঙ্গদর্শন কার্তিক ১৩০৯
শুভবিবাহ	বঙ্গদর্শন আষাঢ় ২৩১৩

রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খণ্ডে সিরাজদ্দৌলা ও ঐতিহাসিক চিত্র প্রবন্ধ দুটি সংযোজিত হয়। সিরাজদ্দৌলা (১) প্রকাশিত হয় ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতীতে। সিরাজদ্দৌলা (২) ও ঐতিহাসিক চিত্র প্রবন্ধটি ১৩০৫ শ্রাবণ ভারতীতে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী সংস্করণে পরিশিষ্টে শোকসভা এবং নিরাকার উপাসনা প্রবন্ধ দুটি সংযোজিত হয়। সিরাজদ্দৌলা এবং ঐতিহাসিক চিত্র অক্ষয় মৈত্রেয়ের দুটি রচনা সম্বন্ধে লেখা।

আধুনিক সাহিত্যের বারোটি প্রবন্ধ গ্রন্থসমালোচনা কৃষ্ণচরিত্র, রাজসিংহ, ফুলজানি, যুগান্তর, আর্যগাথা, আষাঢ়, মন্ত্র, শুভবিবাহ, মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস সাকার ও নিরাকার ডি প্রোফন্ডিস ও সঞ্জীবচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ গ্রন্থ আলোচনা উপলক্ষ্যে লেখা—তবে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার সমগ্র পরিচয় প্রদানের চেষ্টা তাতে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বিহারীলাল বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি প্রবন্ধ রবীন্দ্র সমালোচনা পদ্ধতির গভীরতার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তখন যা বলেছিলেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ সাহিত্য) তা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শিল্পের ঔৎকর্ষ ও সৌন্দর্যে তাঁর প্রতিপক্ষীয়েরাও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—"বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিলনা। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বাংলাসাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।"

বিহারীলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাও বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কম সাহায্য করেনি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এও স্বীকার করেছেন যে বাল্মীকি প্রতিভার "মূল ভাবটি এমনকি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।"

সাহিত্য সমালোচনার একটি নতুন ভঙ্গী ও একটি বিশেষ মান আধুনিক সাহিত্যের প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হলো। সাহিত্যের সাধারণ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব ও সূত্র আলোচনা করে তারই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা করতেন। লেখক বিশেষের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করে তার সঙ্গে সাহিত্যবিচারের যোগাযোগ স্থাপন করতেন। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্যণীয় যে সাহিত্য আলোচনার প্রবন্ধের ভাষাও যে কত কবিত্বপূর্ণ হতে পারে তার আদর্শও এখানে পাওয়া গেল।

শিক্ষা সংহার

প্রাচীনতম কাল থেকে যেখানেই ইঁট কাঠ পাথরে ইমারত গড়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে, সভ্যতা সেখানে বাঁচেনি। কারণ ওই সব জড় উপাদানের কোন সঞ্জীবনী শক্তি নেই। বরং তা অসার দম্ভের সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ; আর তার ফলে জাতির মধ্যে আসে শ্লথতা—দেহে, কর্মে ও চরিত্রে। তাছাড়া যে সভ্যতা মানুষকে সম্মান দেয়নি, মর্যাদা দেয়নি মানবতাবোধকে, মানবিক মূল্যকে স্বীকার করেনি, সে সভ্যতা লোপ পেয়ে গেছে; প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তু হয়েই আজ তাদের সার্থকতা। মিশর, উর, নিনেভ ব্যাবিলন কোথায় মিলিয়ে গেছে; বেঁচে আছে আজ দীন দরিদ্র নিঃস্বনির্যাতিত ইহুদী সভ্যতা, খৃষ্ট ধর্মের ভিতর দিয়ে তার মানবিক মূল্যবোধ আজ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত।

আর বেঁচে আছে ভারত, ভারতের বাণী ও জীবনবোধ। সারা দুনিয়া জুড়ে ভারতের স্বীকৃতি তার কোন বাস্তব ঐশ্বর্যের নিদর্শনে নয়। যে সব প্রাচীন মন্দির ভারতীয় মহিমা আজও ঘোষণা করছে, সেগুলির সার্থকতা তাদের গাত্রস্থ শিল্পকর্মের মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর জীবনবোধের রূপায়নে। ভারত বেঁচে আছে তার যে অবাস্তব সম্পদের জোরে, তা উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে উদ্গীত হয়ে ও বুদ্ধ চৈতন্যের বাণীতে সঞ্চারিত হয়ে মর মানুষকে দিয়েছে অমরতা। শক হূন দল পাঠান মোগল, ভেদিমরুপথ গিরি পর্বত কত জাতিই না ভারতের জীবনে এসে আঘাত করেছে। এসেছে রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে। যে কলরব শান্ত হয়েছে, জয়গান মৈত্রীর গানে রূপান্তরিত হয়েছে ভারতীয় জীবনবোধের জাদুমন্ত্রে, তৈমুর নাদিরের হত্যাকান্ড মারতে পারেনি ভারতের প্রাণকে। তার পর যখন এসেছে ইংরেজ, বিকীর্ণ করেছে তার তেজ, অনুপ্রবেশ করেছে দেশের অভ্যন্তরে, তারাও পারেনি সে প্রাণ ধ্বংস করতে। বরং ইংরেজদের ব্যাপক ইতিহাসবোধ ভারতীয় জীবনদর্শন ও মানবতা-বোধের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতে জাগিয়ে তুলেছিল আর এক নবীন প্রাণ। সেই প্রাণের প্রকাশ-কে বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁ, যার চূড়ান্ত পরিণতি রবীন্দ্রনাথে।

নতুন ভারতের নতুন কর্ণধারেরা জানে ভারতীয় জীবনবোধ ও জীবনদর্শন রপ্তানির সওদা হিসেবে প্রচুর লাভজনক। তার বিনিময়ে পাওয়া যায় বিদেশী ঋণ, বিদেশী সাহায্য ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ। আর ভারতের বাণী যেখানে রপ্তানির সওদা, সেখানে বাণীর বাহকরা হামেশাই নানা ডেলিগেশানে নিমন্ত্রিত হয়ে দেশে বিদেশে সফরে যেতে পারেন। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে তাও ব্যক্তিগত লাভের কারবার।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের বাণী নিয়ে যতই সওদাগরি করুন ওঁরা নতুন ভারতের নতুন নাগরিকদের কন্ঠে নতুন যুগের বাণী যাতে না ফোটে সেদিকে তাঁদের সতর্কদৃষ্টি।

একটার পর একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা ইঁট পাথর কংক্রীট দিয়ে বাঁধ আর অট্টালিকা নির্মাণের যে আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতাসম্পন্ন ও সবল মেরুদণ্ড সমন্বিত মানুষ তৈরির আগ্রহ সে তুলনায় একাংশও চোখে পড়ছেনা। যে সরকারে

শিক্ষামন্ত্রীকে কেবিনেটে বসবার মর্যাদা দেওয়া হয়না, সে সরকার শিক্ষাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয় তা সহজেই অনুমেয়, সামগ্রিক দেশ গঠন ও দেশ কল্যাণের পরামর্শ বৈঠকে অর্থাৎ কেবিনেট মিটিং-এ শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভূত হয় না। তার অর্থ কি এই নয় যে, দেশ-গঠন ও দেশকল্যাণের সামগ্রিক আলোচনায় শিক্ষার স্থান স্বীকার করেন না আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ? একথা ঠিক যে বছরে বছরে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কিন্তু সে বরাদ্দের অধিকাংশই যাচ্ছে ইঁট পাথর কংক্রীটে বিদ্যালয়ের প্রাসাদ গড়তে। আজ দেশেব সর্বত্র শুধু কনস্ট্রাকশানের হিড়িক। শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব হতেই বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ সুরু হয়ে যায়; জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ উঠতেই জাঁকজমক সম্পন্ন রঙ্গভবন প্রস্তুত হতে থাকে। এক কথায় যা কিছুই করা হোক, সরকারি ব্যয়ের অগ্রভাগ নিবেদন করা হয় বিল্ডিং কন্ট্রাক্টারকে। রাজাজী একবার বলেছিলেন, গুড্‌লাক্ টু দি বিল্ডিং কন্ট্রাক্টার্‌স্ অব ইণ্ডিয়া। মনে হয়, কথাটি নেহাৎ মিথ্যে নয়—ভারতের বর্তমান সরকার হল গভর্ণমেন্ট অব্ দি কন্ট্রাক্টারস্ বাই দি কন্ট্রাক্টার্‌স্, ফর দি কন্ট্রাক্টারস্।

কলকাতা তথা যে কোন বড় সহর থেকে বাস পথে বিশত্রিশ মাইল যদি যান, তাহলেই দেখবেন জঙ্গল কিংবা ভাঙ্গাবাড়ি ও কুঁড়েঘরের সমষ্টির ভিতর থেকে হঠাৎ মাথা উঁচিয়ে উঠেছে ঝকমকে চকমেলানো বিরাট বাড়ি; কিনা অমুক বিদ্যায়তন। পুরীর সমুদ্রতীরে নতুন একটি বাড়িকে নবপ্রতিষ্ঠিত লাক্সারি হোটেল বলে মনে করেছিলাম। পরে জানলাম ওটি স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্রদের জন্য নির্মিত হস্টেল। দরিদ্র পল্লীঅঞ্চলের দীনতম কুটিরগুলি থেকে আসা ছাত্ররা ওই লাক্সারি হস্টেলে বাস করার পর বাড়ি ফিরে গেলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সে কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েই বলবো ঃ কেন এই অপচয়?

তত্ত্বের দিক থেকে আমরা বলতে কসুর করি না ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত আশ্রম বিদ্যা-লয়ের মত মুক্ত অঙ্গনে অধ্যায়নই প্রকৃষ্ট। অথচ বড় বড় বিল্ডিং না হলে স্কুল কলেজ আজ আমরা ভাবতে পারি না। মালটিপারপাস স্কুলের রূপান্তর উপলক্ষ্যে অজস্র নতুন বিল্ডিং কন্‌স্ট্রাকশান হচ্ছে, আর বিদ্যালয়ের বিল্ডিং এক্‌স্টেন্‌শানের চাপে শিক্ষার এক্সটেন্‌শান আটকে যাচ্ছে। এমন কি বোলপুরে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যায়তনেও বর্তমানে সরকারী অর্থে অট্টালিকা বিস্তা-রই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বাইরেও যেমন জড় অট্টালিকার প্রাধান্য, অন্তরেও তাই। শিক্ষা বলে যা আজ সরকারি প্রচেষ্টায় প্রসারিত হচ্ছে, তা হচ্ছে জড়বিদ্যা প্রসার করে স্বাধীন বিচারশক্তির জড়ত্বপ্রাপ্তির ব্যবস্থা।

আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদ্বর্তী বলে আমাদের অনেক টেকনিক্যাল ম্যান চাই; অতএব টেকনলজি শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য। তার অর্থ এই নয়, যে কেউ টেকনলজি পড়বে না, সেই হবে ওদের মনুসংহিতার শূদ্র। অথচ বাস্তবে ঘটেছে তাই। স্কুলে ভালো ভালো ছেলেদের ধরে, হেডমাষ্টার তাকে টেক্‌নলজি শিক্ষার প্রাথমিক হিসেবে বিজ্ঞান বিভাগে নাম লেখাতে প্রায় বাধ্যই করছেন। তাদের মধ্যে সকলের হয়তো বিজ্ঞানমুখী মস্তিষ্ক নয়, ফলে কারো কারো পক্ষে সম্ভাবনা মত মেধাবিকাশ একেবারেই হয় না। কিন্তু যদি সম্ভাবনা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সার্থক হয়ে ওঠেই, তারও তো অর্থ এই যে, তেত্রিশশো টাকা মাইনের টেকনিশিয়ান হয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিতে অধিষ্ঠিত হওয়া যে তেত্রিশশো টাকা ব্ল্যাকমানিও মাস মাইনের মত নিয়মিত হস্তগত হবে। হ্যাঁ তাদের টেকনলজিক্যাল দক্ষতায় দেশের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অগ্রসর হতে পারে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হতে পারে তাদের শিক্ষা ও ট্যালেন্ট। কিন্তু প্রকৃত মেধাবী ছেলের সংখ্যা যেখানে প্রকৃতির নিয়মেই সীমিত, সেখানে মেধাবী ছাত্র সবাই যদি

টেকনিশিয়ানই বনে যায়, তাহলে জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে অর্থাৎ লিবারাল এডুকেশনের মাধ্যমে জাতির বুদ্ধি ও চৈতন্যের বিকাশে নেতৃত্ব করবে কারা?

হেডমাষ্টারেরা যা করেন তাতো সামগ্রিক শিক্ষানিধন যজ্ঞের এক ক্ষুদ্র অংশ। ভেবে দেখুন, বর্তমান বাঙলার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ছাত্রেরা যাতে বিজ্ঞান পাঠে আকৃষ্ট হয়, তারই আনুষাঙ্গিক হিসাবে ব্যবস্থা হয়েছে, হিউম্যানিটিজ বা ব্যাপক সাধারণ শিক্ষায় ভালো ছাত্ররা যেন না যায়, তার জন্য নানাভাবে ডাণ্ডা উঁচিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে।

একথা সহজবোধ্য যে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে যে হাবে নম্বর উঠতে পারে, হিউম্যানিটিজ—এর বিষয়গুলিতে তা সম্ভব নয়। অথচ স্কলারশিপ দেওয়ার সময় বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ-এর ছাত্রদের একই সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে, যার ফলে সব কটি স্কলারশিপ বিজ্ঞানের ছাত্ররা গ্রাস করছে, হিউম্যানিটিজ পড়ার অপরাধে অনেক সোনার টুকরো ছেলেকে ফাঁকি পড়তে হচ্ছে। স্কলারশিপের অর্থ হচ্ছে গুণের পুরস্কার, পাঠে উৎসাহ ও সাহায্য দান। হিউম্যানিটিজ-এর ছাত্ররা এই সব কিছুতেই বঞ্চিত হচ্ছে। এমন অবস্থা দুচার বছর চলতে থাকলে দেখা যাবে হেডমাস্টারের পরামর্শ উপেক্ষা করে মেধাবী ছাত্র দুচারজন যাও বা হিউম্যানিটিজ পড়তে আসছিল, তাও আসবে না, সবাই চলে যাবে বিজ্ঞানে। দেশে চিন্তানায়ক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবহারজীবী, লেখক, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শনের পণ্ডিত কিছুই থাকবে না। সে সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর লোক, যে অবস্থা ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর প্রকৃত মনীষা, এমন কি মেধাবী বা ট্যালেন্টেড্ যারা, তারা সবাই কলকারখানায় গ্লোরিফায়েড হেডমিস্ত্রি হয়ে দেশের যন্ত্রসভ্যতা প্রসারে ব্যাপৃত থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা। আমার জনৈক বন্ধু টেকনলজির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্মূল্য করে তোলার বিশেষ বিজ্ঞান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে বছরের পর বছর প্রোডাকশান টেকনলজির ক্রমোন্নতি ও র‍্যাশনালাইজেশন সত্বেও সব কিছুর দাম ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। অতএব দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পন্ন যুবকদের টেনে নিয়ে যাও সেই মূল্যবৃদ্ধির কারসাজিতে সহায়তা করতে, জিওমেট্রিক্যাল প্রোগ্রেশানে (১-২-৪-৮ ইত্যাদি হারে) ক্যাপিটালিস্টের সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে। অবশ্য তারসঙ্গে বেকার সমস্যা সমাধানেও সহায়তা করবেন তাঁরা। তবে সেটা হবে অ্যারিথমেটিক্যাল প্রোগ্রেশানে (১-২-৩-৪ ইত্যাদি হারে)। ক্যাপিটালিস্ট, তা ব্যক্তি, সংঘ বা সরকার যাই হোক না কেন, সেই সব টেকনলজিস্টদের উচ্চহার বেতনে পুরস্কৃত করবেই বা না কেন? সরকার যেখানে ক্যাপিটালের মালিক তাকে মুখে জাতীয় সংস্থা বা ন্যাশনাল কনসার্ণ বললেও সেখানেও ইন্টার্ণাল কোটারিই ক্যাপিটালিষ্টদের অংশটুকু করায়ত্ত করে। আমাদের ন্যাশনালাইজড্ সেক্টারে আজ পাবলিক ওয়েলথ হলো ফর দি প্রাইভেট ইউজ অফ্ দি ফিউ প্রিফিলেজড্, বাট্ উইদাউট এনি লায়বিলিটি।

শুধু যে নেতৃস্থানীয় মনীষার বিলোপ ঘটবে তাই নয়, স্কুলের সাধারণ শিক্ষকও পাওয়া যাবেনা দশবছর বাদে। এবার যেখানে বিজ্ঞানে পাশ করানো হয়েছে শতকরা ৭২·৯ জন হিউম্যানিটিজ-এ করেছে ৪৭·১৩ জন। কোন ভরসায় ছেলে মেয়েরা হিউম্যানিটিজ পড়তে আসবে বিজ্ঞান ছেড়ে!

ফল কি ঘটবে এখনই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে যুগের বিরাট পণ্ডিতদের ছায়াটুকুও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একেই তো মৌলিক চিন্তাসম্পন্ন

মনীষা এদেশে এমনিতেই দুর্লভ, তা একেবারেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। সে যুগে মৌলিক চিন্তায় নিরুৎসাহ করা হত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অথরিটিকে নির্বিচারে স্বীকার করবার অতিশয় প্রবণতা বশতঃ; আর আজ মৌলিক চিন্তার অনভ্যাসের সঙ্গে চিন্তাশক্তি বিলোপ সাধিত হচ্ছে।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসের অনার্সে স্পেশাল পেপার হিসেবে পাঠ্যবিষয়ের অনেকগুলিই পড়ানোর ব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছে অধ্যাপকের অভাবে, বিশেষকরে রেফর্মেশান পেপার। প্রেসিডেন্সী কলেজ যা পড়াতে পারছে না তা আর কটি কলেজই বা পড়াতে পারবে? ফলে ভবিষ্যতে রেফর্মেশান পেপার অধ্যাপকের অভাবে একেবারেই বাতিল করতে হবে। এমনি করে আগামী দশ বছরের মধ্যে অনেক বিষয়েরই পঠন পাঠন অবলুপ্ত প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পাঠ্যব্যবস্থা বলে মিউজিয়ামের ফসিলরূমে কাচের আধারে জমা হবে। দেশ ভরে থাকবে অজস্র টেকনিশিয়ানে। আর মাঠ ঘাট-বন-মরু লোপও ভেদ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে পেরু-ভিয়ানদের কিংবা অবলুপ্ত মায়া সভ্যতার অবশেষের মত অজস্র অট্টালিকা। সেখানে সমালোচনা থাকবে না, থাকবে না বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা; রসঘন বাক্যালাপ বা কাব্য সাহিত্য পাঠ কিংবা শিল্পচর্চা কিছুই থাকবেনা। টেকনলজির প্রসাদে দৈহিক সব প্রয়োজন মিটিয়ে চূড়ান্ত আরামে এয়ারকণ্ডিশান্ড্ ঘরে ইলেকট্রিক্যালি পরিচালিত জীবন যাপন করবে কতকগুলি বুদ্ধিহীন, প্রাণহীন চেতনাহীন মানুষ—'রোবট্'। তারা বোতাম টিপে কাজ করবে ও করাবে, কোন কথা বলবেনা। তাদের বোতাম টিপে ভোট দেওয়ানো চলবে কর্তৃপক্ষের মর্জিমত।

রেফর্মেশানের প্রসঙ্গে ইতিহাসের পরিক্রমের কথা স্বতই এসে পড়ে। বর্তমানের পরিবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যসূচীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে মহাপণ্ডিত হওয়া যাবে, গ্রীস রোমের ইতিহাস ও রেণেসাঁ এক বর্ণও না পড়ে। যদিচ নতুন অনার্স কোর্সে গ্রীসের অথবা রোমের ইতিহাসের একটা টুকরো পড়াবার ব্যবস্থা আছে, রেণেসাঁ এক বারে বাদ। বাস্তবিক রেণেসাঁ-ই এ যুগের মানুষকে শিখিয়েছে অথরিটি না মেনে স্বাধীন চিন্তাশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে, সেই বিপ্লবাত্মক সর্বনাশা আন্দোলনের সন্ধান কি করে দেওয়া যায় নবীন ভারতের নাগরিককে যার সম্পর্কে একমাত্র ভরসা যে নেহরু উবাচ-কে ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করবে? ইতিহাসের অংশবিশেষের বিশেষ পাণ্ডিত্য নিয়ে বিশেষজ্ঞ নামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব সৃষ্টি হতে পারে, কিংবা প্রোথিত পোড়ামাটির ইঁট নিয়ে গবেষণার ফলে সভ্যতার শ্মশানচারী ডোম সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ ও গতিপ্রগতি উপলব্ধি করতে হলে ইতিহাসের যে সামগ্রিক জ্ঞান প্রয়োজন, মুখ্যধারাগুলি সম্বন্ধে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য, তার জন্য গ্রীস-রোমের ইতিহাস, রেণেসাঁ ও ব্রিটিশ কন্স্টিটিউশানাল হিস্ট্রি যদি না পড়া হল তা হলে সে জ্ঞান মূর্খতার চেয়েও ভয়াবহ। বিশেষ করে ভারতের বর্তমান জগাখিচুড়ি কনস্টি-টিউশানেও ব্রিটিশ প্রোসিজিওর অঢেল এবং তা বুঝতে হলে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশান পাঠ অপরিহার্য। অথচ এম এ পড়ার আগে ব্রিটিশ কনস্টিটিউনাল হিস্ট্রির কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া হচ্ছেনা ইতিহাসের ছাত্রদের। শুনেছি সিলেবাস তৈরির সময় আই, এ, এস পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল; যারা কলেজে ইতিহাস পড়বে তাদের সবারই যেন যেন আই, এ, এস পরীক্ষার প্রস্তুতিই একমাত্র লক্ষ্য।

যেভাবে শিক্ষা পরিচালিত হচ্ছে তাতে এই সংশয় স্বতই মনে জাগে, ইংরেজরা এদেশের শিক্ষানীতিতে যে ভুল করেছিল, শাসক হিসাবে ভারতে যে বিশেষ একটি জাতি (রাজনৈতিক দল বা কোটারি বলাই যথেষ্ট নয়) ইংরেজের উত্তরাধিকার লাভ করেছে ইংরেজেরই উইল (বা ইচ্ছা) অনুসারে, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে রাজি নয় তারা।

যুগের দাবিতে যে জীবনবোধ আজ গড়ে উঠতে পারে প্রাচীন ভারতীয় জীবনবোধের ভিত্তির উপর, সে সম্পর্কে রাষ্ট্রকর্ণধারদের মনে রয়েছে প্রবল ত্রাস।

ইতিহাস ও বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাপক ও যুক্তিসিদ্ধ অধ্যয়নের ফলে জনগণের মগজে জাগে বিচারশক্তি, মনে জাগে বিচারশুদ্ধ কর্মের প্রেরণা। নতুন নতুন পরিবেশের সংঘাতে তারা জন্ম দেয় নতুন নতুন আইডিয়ার, আইডিয়াই দেশে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে আন্দোলন, এনেছে স্বাধীনতা, ইংরেজ আমাদের টেকনলজি শেখায়নি তাদের ইনডাস্ট্রির বাজার অব্যাহত রাখবার প্রচেষ্টায়। তবু এমন সযত্ন রক্ষিত জমিদারী এবং বাজারও যে হাতছাড়া হয়ে গেল, তা শুধু আইডিয়ার তরঙ্গসংঘাতে। সবচেয়ে আইডিয়া বিলাসী অতএব বিদ্রোহী বিপ্লবী এবং আন্দোলনপ্রিয় জাত হল বাঙ্গালী, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, উনিশ শতকী বাঙলা রেণেসাঁসের মাধ্যমে যাদের মাথায় ঢুকেছে ফরাসী বিপ্লবের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার পোকা, গিজগিজ করছে সেই পোকা তাদের মাথায়। বাঙলায় কেউ আইডিয়ার ঠিকাদারি ও সোল কন্ট্রাক্টারি একজন নেতার হাতে তুলে দেয় না, সবাই চায় নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীন বিচারশক্তি দিয়ে নিজে চলতে এবং স্বীয় বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করতে। তাই বাঙলাদেশেই আজ শিক্ষাসংকোচ সবচেয়ে বেশি।

সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার ওজুহাতে গণদাবি ত্রস্ত রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ আজ স্বাধীন চিন্তা ও আইডিয়ার বিকাশ রোধ করতে বদ্ধপরিকর। তাই শিক্ষাবিস্তার পরিকল্পনার নামে চলছে সুপরিকল্পিত শিক্ষাসংহার ব্যবস্থা, আইডিয়ার ক্ষেত্রকে একেবারে বন্ধ্যা করে দেবার কূট-কৌশলী প্রয়াস। বৃত্তির লোভ দেখিয়ে যুবসমাজকে শুধু বিজ্ঞান ও টেকনলজিতে টানা হচ্ছে, আর প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি যদি পড় সরকারি পোষকতার প্রত্যাশা কোরোনা।

কোন চিন্তানায়কদের মুখ থেকে আজ পর্যন্ত এই শিক্ষা সংহার ব্যবস্থার প্রতিবাদ শোনা যায়নি। যে ভাবে সরকার মাথাওয়ালাদের কিনে রেখেছে—নানান পরীক্ষার·পরীক্ষকপদে অর্থ-করী নিয়োগ দিয়ে, এম, পি মনোনীত করে, নানা কমিশনে বসিয়ে ও বিভিন্ন ফরেন ডেলিগেশানে পাঠিয়ে—তাতে সব প্রতিবাদ মূক হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ শাসনে যে বাছাবাছা ছেলেদের আই, সি, এস যন্ত্রে ধরে রেখে নিরাপদ তথা সহায়ক করার ব্যবস্থা ছিল, তার চেয়ে হেয় ও সূক্ষ্মতর কৌশল চলেছে বর্তমানে।

তবে ভরসা এই যে, আইডিয়া অমর। বহুদিন মৃতকল্প অথবা অদৃশ্য থেকে যখন জেগে ওঠে তখন প্রলয় সৃষ্টি করে, অসত্যের দেউল মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দেয়।

রাখাল ভট্টাচার্য

এখনকার নৃত্যকলা

একদা আনন্দ-বিলাসী ধনীদের অবসর যাপনের খেলা হলেও গত তিরিশবছরে নৃত্য আমাদের দেশে ললিতকলার মর্যাদালাভ করেছে আর আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাসিকাল আর লোকনৃত্যকলার মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে আবার অনেকটা ফিরিয়ে আনা গেছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লোকনৃত্যনাট্যগুলি, বেশ খানিকটা জায়গা দখল করেছে তারা সহরের রঙ্গালয়ে। ভারতীয় নৃত্য-অ্যাকাডামী আর নৃত্য-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। সৌখীন বা পেশাদারী শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীগুলি সারাবছর ধরে নানা নৃত্যঅনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছেন। এই সমস্ত আয়োজন বিচার করে দেখলে মনে হয় আমাদের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। কিন্তু ললিতকলাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা হলে মাঝে মাঝে তার মূল্যগুলি যাচিয়ে নেওয়া প্রয়োজন এবং তাকে নূতন রূপ দেওয়া দরকার। আমাদের নৃত্যের জগতে আজ এমন একটা সময় এসেছে যখন নতুন ধারণার বৃহত্তর পরিধিতে নৃত্যকে বিকশিত করে তুলতে হবে।

এখনকার নৃত্যকলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নৃত্যনাট্যগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা। মঞ্চ-সাজানোর অভিনবত্ব, অপূর্ব দৃশ্যপটসৃষ্টি, আলোকসম্পাতের নূতন নূতন কৌশল এবং আধুনিক বেশ ও রূপসজ্জার প্রবর্তনার ফলে প্রাচীন রীতির অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। অধিকাংশ নৃত্যানুষ্ঠানেই নানাধরণের ঢাকঢোল আর কণ্ঠসঙ্গীতের বদলে অর্কেষ্ট্রাই প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দৈন্য পদে পদে প্রমাণ করছে আমরা নূতন কল্পনার জগতে কেমন যেন দেউলে হয়ে পড়েছি। মনে হয় সেই পুরানো আমলের শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ কিম্বা মহাকাব্য পুরাণের গল্প ছাড়া আমাদের যেন আর কোন সম্বল নেই। কদাচিৎ কোন নতুন ভাবধারা একটা নবীনত্ব আনে কিম্বা আশার সঞ্চার করে। তা ছাড়া আধুনিক কালের প্রযোজকেরা নৃত্যের আঙ্গিকগত দুর্বলতাকে প্রদর্শনকলা (স্যোম্যানশিপ্) দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন। কোন অনুষ্ঠান করাতে গেলে শিল্পীদের যে নৃত্যের সমস্ত কৌশল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করানো দরকার এ ব্যাপারে কারুরই যথেষ্ট মনোযোগ নেই। এই জন্যেই বেশীরভাগ নৃত্যঅনুষ্ঠানই শখের নৃত্যের (এ্যামেচার) স্তর পেরোতে পারেনা। একথা যদিও ঠিক যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ক্লাসিকাল রীতির ধারক আছেন যাঁরা বিষয়বস্তু আর আবেগকে অপূর্ব কৌশলে বিচিত্র ছন্দ আর অঙ্গভঙ্গীতে রূপায়িত করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্লাসিকাল শিল্পী 'খাঁটি রীতির' ধারণায় এমনি বাঁধা পড়ে আছেন—তাঁরা এতই গতানুগতিকতার ভক্ত যে রূপ আর বস্তুর যথাযথ প্রয়োগের ব্যতিক্রম—তা ছন্দেরই হোক বা পোষাকেরই হোক—তাঁরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেন। নৃত্যের আঙ্গিক ঠিকমতো আয়ত্ত না করে মঞ্চসজ্জা আর কায়দা-দেখানোর চেষ্টা যেমন ভারতীয় নৃত্যকলাকে প্রাণহীন ও পঙ্গু করে দিচ্ছে ঠিক তেমনি 'খাঁটি রীতির' নাম করে পুরানো পদ্ধতির বাঁধন দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণাকে হত্যা করে আমাদের নৃত্যকলাকে স্থবির করে রাখা হয়েছে। জীবনের অন্তর্নিহিত

আগ্রহকে প্রকাশ করে নৃত্যকলা আর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার নব নব প্রকাশ। জনসাধারণের প্রাণের মধ্যে থেকেই তা বারবার নতুন রূপে আপনাকে বাইরে প্রকাশ করে। নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে জীবনের যে বিভিন্ন গতি নৃত্যে তারই প্রকাশ। শুধু দেহের ললিত-ভঙ্গিমা ও তার গতির ছন্দ নৃত্যের শেষ কথা নয়। অঙ্গভঙ্গীতে ভাবকে রূপায়িত করার ক্ষমতা আছে মানব দেহের—সেই মানবদেহই নৃত্যের মাধ্যম।

আধুনিককালের নৃত্যকলাকে অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার করে, তাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে হলে, সমস্ত সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকটি শিল্পের বিষয়বস্তু আর আঙ্গিক, দুই-ই আছে। যে শিল্পীর অন্তরে সৃষ্টির প্রেরণা কাজ করছে, তাঁর নূতন ধারণা যদি গতানুগতিক শিল্পরীতির মধ্যে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না পায় তাহলে সে শিল্পী সৃষ্টির তাগিদেই নূতন মুদ্রা নূতন ভঙ্গী তৈরী করে নেন। ক্লাসিকাল রীতিতে শিক্ষিত শিল্পী নিয়মের বাঁধন থেকে নড়বার স্বাধীনতা পান না বলেই; কল্পনার অবাধ প্রকাশ তাঁর মধ্যে কেবলি বাধা পায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়বস্তু গৌণ হয়ে যায়, এবং তার প্রকাশ রঙহীন ফিকে হয়ে পড়ে।

দেহ সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ধারণা নৃত্যশিল্পীর প্রথম থেকেই থাকা চাই। ক্লাসিকাল রীতির বিপুল ঐশ্বর্য বাতিল করা এর উদ্দেশ্য নয়, বরং নতুন পদ্ধতির সাহায্যে তাকে আরো ব্যাপক আরো সমৃদ্ধতর করে তোলাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় ব্যালের ক্ষেত্রে ইসাডোরা ডানকানের আগে পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন নি। "যে পদ্ধতিতে নৃত্য শিক্ষা চলেছে তা কি শিল্পীর দেহের সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে।"—এই প্রশ্নও তাঁর আগে আর কেউ করেনি। সৌভাগ্য আমাদের, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা, শিল্পীদেহের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ-সচেতন ছিলেন, আর তাঁদের সুবিপুল অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য একটি বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, দেহের প্রতিটি অংশ কতবার সঞ্চালন করা যেতে পারে তার সংখ্যা আর তার বিশেষ প্রকৃতির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন, দেহভঙ্গী আর ছন্দের সম্বন্ধ এবং তাদের বিচিত্র মিশ্রণ ও সংযোগের কথা সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। নৃত্যের বিষয়বস্তু "রস"-এরও ব্যাপক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন। মঞ্চ, পোষাক, শিল্পীর দেহ, সঙ্গীত-নৃত্যঅনুষ্ঠানের সব প্রয়োজনীয় অংশই তাঁদের কাছে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল। তবু সদাশিব, নন্দিন, কোহানা প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রমাণ করছে প্রাচীনকালে নৃত্যকলা কত প্রাণবন্ত ছিল। শিল্পগুরুরা পথনির্দেশ দিতেন কিন্তু স্রষ্টার অবাধ স্বাধীনতা ছিল নিজের মনের মত নূতন পদ্ধতি অনুসন্ধান করার—শুধু রসবিকারের অপরাধটুকু বাঁচিয়ে চলতে হতো। দৃষ্টির প্রসারতা হারিয়ে আজ আমরা বদ্ধ জলায় তলিয়ে গেছি। দাসি আট্টম, মোহিনী আট্টম, কথক কথাকলি, রাসলীলা ও অন্যান্য বিবিধ রীতির নৃত্য-প্রদর্শকরা প্রত্যেকেই নিজস্ব রীতিকে ভরত-নাট্যশাস্ত্র অনুমোদিত বলে প্রচার করতে ব্যস্ত। মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি প্রাচীন রীতিই একটি বিশেষ মূলগত সূত্রকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশেষ স্থান আর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে তারই থেকে একটি বিশেষ নৃত্যধারার উদ্ভব হয়েছে। এমনি করেই শিল্প সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ একটা ছাপ মেরে দিলে ব্যবসাগত লাভ হতে পারে কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তার কোন মূল্য নেই। "কেমন করে হলো" এটা খুব বড়ো কথা নয়, কিন্তু "কি হলো" আর "আদৌ তা হলো কিনা" শিল্পের ক্ষেত্রে এইটেই হোলো আসল কথা।

ছন্দিত আন্দোলনে নৃত্যশিল্পী ভাবনাকে প্রকাশ করেন—মানুষের প্রাণবন্ত দেহ তার প্রকাশের মাধ্যম। ক্লাসিকাল শিল্পীদের দেহ কতকগুলি বিশেষ অঙ্গসঞ্চালনের রীতির অনুগত হওয়ায় নানাধরণের ভাবকে রূপ দিতে অসমর্থ। সেই বিধিবন্ধ দেহ-সঞ্চালন তাই, ভাবের ওঠা-নামা, সঙ্গতি-সংঘাত, বিরোধ-বিস্ময়কে পরিণত নৃত্যরূপ দিতে পারে না। ক্লাসিকাল নৃত্যশিক্ষা নৃত্যশিল্পীর দেহকে কতকগুলি অভ্যাসের বশীভূত করে, কয়েকটি পেশী অন্য কতকগুলি পেশীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। তাই নৃত্যশিল্পীর দেহের এমন নমনীয়তা থাকা চাই যাতে শিল্পী সমস্ত দেহটি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারেন। সৃষ্টি করতে করতে স্রষ্টা যে শুধু প্রাচীন সূত্রগুলিকেই বাতিল করেন তা নয়, নিজের তৈরী পুরানো নৃত্যরূপও বাতিল করে দেন সময়ে সময়ে—শুধু নজর রাখেন যাতে তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতার মধ্যে অসঙ্গতি না এসে যায়। কবির সৃষ্টি কালে আর ভাস্করের সৃষ্টি স্থানে, কিন্তু নৃত্যশিল্পী স্থান কাল দুয়েই তাঁর সৃষ্টি প্রদর্শন করেন। ছন্দোময় দেহভঙ্গী নৃত্যশিল্পীর ভাষা; তাঁর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ ও সতেজ প্রকাশের জন্য নৃত্যশিল্পীকে এই ভাষা আয়ত্ত করতে হবে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নূতন দৃষ্টির অনুসন্ধানী হতে হবে। নৃত্যকৌশলের নিখুঁত গতিতে শিল্পী নূতন রীতি উদ্ভাবন করতে পারেন। গতানুগতিক রীতির বন্ধনকে অতিক্রম করে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়। এরই ফলে নৃত্যকৌশল ও ভাবধারার মিল হয়ে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে এক অপূর্ব শিল্প-কলার সৃষ্টি হয়। শিল্পসাহিত্যের প্রত্যেক স্রষ্টাই এই সত্যটি জানতেন। রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার কথাই ভেবে দেখা যাক। ক্লাসিকাল আর লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করলেন; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা সমস্ত বন্ধন ভেঙ্গে কল্পনার অবাধ আনন্দে পুঁথিগত সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অভূতপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে।

অতীতের মিথ্যা মোহে আর আধুনিক সস্তা চমক-লাগানো ঢঙে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সৃষ্টিশীল ললিতকলার প্রশস্ত দিগন্ত আমাদের ধারণা কিম্বা কল্পনা কোনটাই স্পর্শ করতে পারছে না। সব বাধা দূর করে নৃত্যকলাকে আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি প্রধান অঙ্গ করে তুলতে হবে।

শ্রীমতী ঠাকুর

স মা লো চ না

দক্ষিণের বারান্দা ।। শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা। দাম চার টাকা।

বেশীদিন আগেকার কথা নয়, প্রায় দশ বৎসর হল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। তারও প্রায় দশ বৎসর আগে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ সমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের প্রিয় দক্ষিণের বারান্দা পরিত্যাগ করেন। তারও তিন বছর আগে গগনেন্দ্রনাথও ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। সত্যিকথা বলতে কি গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্রের জীবদ্দশায় এই দক্ষিণের বারান্দাটি ছিল ভারতীয় শিল্প অভ্যুত্থানের পীঠস্থান। অথচ সেই দক্ষিণের বারান্দা সহ একশত বৎসরের পুরাতন ৫নং বাড়িটি আজ ধূলিসাৎ হয়েছে। তারই স্মৃতি বুকে করে ঠাকুর পরিবারের যে সমস্ত উত্তর পুরুষেরা আজ বেঁচে আছেন মোহনলাল বাবু তাঁদেরই একজন। মোহনলাল বাবু আশৈশব গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র অবনীন্দ্রের সঙ্গে এই বাড়ীতে কাটিয়েছেন। আজ সেই বাড়ীর অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার ফলে মোহনলাল বাবুর অনেক পুরোনো কথা মনে এসেছে। দক্ষিণের বারান্দার পটভূমিকায় যে ছবি শৈশবে কৈশোরে এবং যৌবনে তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল তারই কাহিনী বেরিয়ে এসেছে তাঁর দরদী লেখনীর মুখ দিয়ে। বড়দামশাই গগনেন্দ্র, মেজদামশাই সমরেন্দ্র ও দাদামশাই অবনীন্দ্রের বিশেষ করে অবনীন্দ্রের নিত্য সহচর রূপে মোহনলালের শৈশবাবস্থার বর্ণনা একদিকে যেমন আত্মকথার সামিল অন্যদিকে দিগ্‌-গজ শিল্পীদের বালকের চোখে দেখা জীবনীও "দক্ষিণের বারান্দার" মর্মকথা।

দক্ষিণের বারান্দায় জীবনের স্পন্দনের একটা বৈশিষ্ট ছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে এর গতি ছিল মন্থর। চোখ ধাঁধানো আবেগপূর্ণ আলোড়ন সেখানে কদাচ দেখা দিয়েছে। ছোট ছোট অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলী দিয়ে গঠিত দক্ষিণের বারান্দার দিনগুলি মোহনলালের লেখনীতে কখনো বা ধীর শান্ত, কখনো বা আবেগ চঞ্চল আবার কখনোও বা স্থির অচঞ্চল হয়েও মূর্ত্ত হয়ে উঠছে। মানবজীবনের সবটাই গতিশীল প্রয়োজনীয় মুহূর্ত নয় বা জীবনের সবটুকু সময়ই যে প্রয়োজনের তাগিদে ব্যয়িত হবে তারও কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। "দক্ষিণের বারান্দা" এই ধরণের একটা জীবনাদর্শের পটভূমিকা। সেখানে মোহনলাল বাবুর কলমের আঁচড়ে ধরা পড়েছেন ঠাকুর পরিবারের অনেক স্বনামধন্য পুরুষ ও স্বনামধন্যা মহিলারা দেশী বিদেশী চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পীরা। কত সাহিত্যিক কতনা রাজপুরুষ পদার্পণ করেছেন বাংলার এই শিল্পপীঠে।

মোহনলাল বাবু শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। ছোটদের জন্য লেখা বই অথচ প্রাপ্তবয়স্কেরা অম্লান বদনে পড়েছেন এতদিন। দক্ষিণের বারান্দা এমনই একখানি বই যেটি কাদের জন্যে লেখা তা বোঝবার যো নেই। বোধকরি বড়দের জন্যেই লেখা অথচ ছোটদের পড়বার বিশেষ উপযোগী। হীরে খোঁজার কাহিনী, "দেয়ালা" মাসিক পত্রিকার প্রকাশ, যাত্রা বানানোর গল্প, রান্না করার কাহিনী ও ভূতের গল্প,—এগুলির প্রাথমিক উপাদান শিশুদের পরিবেশনের পক্ষে সুযোগ্য অথচ তলায় তলায় যে রস চুঁইয়ে জমে উঠেছে সেইটাই হল সমস্ত বইখানার বক্তব্য।

অবনীন্দ্রনাথ যে স্বপ্ন দেখেছেন সেটা চিত্রশিল্পীর স্বর্গ পরিকল্পনা। রান্নাকরার প্রসঙ্গে বলেছেন "রান্না যেই করুক সে নিজের মত রাঁধবে····যতই শিখুক না গুরুর কাছে নিজের ঢং ফুটে বেরুবেই।" এই উক্তি যথার্থ শিল্পগুরুর উক্তি।

শিশুমন এমনই একটি বিচিত্র পদার্থ যে অনেক সময় উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলিও মনে ঠাঁই পায় না অথচ ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর কোনও এক অকিঞ্চিৎকর মুহূর্ত গভীর রেখাপাত করে। সবুজ কাঁচা মনের কাছে এই অকিঞ্চিৎকর ঘটনাবলী যথার্থই যে তুচ্ছ নয়, "দক্ষিণের বারান্দার" দিনলিপি থেকে তার প্রমাণ মিলবে। শিশু ও কিশোর চিত্ত এই বইখানিতে অবনীন্দ্রনাথকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছে। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে অনেক শিল্পরসিক অনেক ভঙ্গীতে আমাদের দেখিয়েছেন কিন্তু "বুড়ো আংলা", "একে তিন তিনে এক" বা "ব্যাকরণ শিং" এর লেখক, "কাটুম কুটুম" শিল্পী আপন ভোলা দাদামশায়ের পরিচয় বোধকরি এই আমরা প্রথম পেলুম।

পুস্তকখানির সবশুদ্ধ চব্বিশটি পরিচ্ছেদ। প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ গড়ে উঠেছে এক একটি ঘটনা এবং দাদামশায় নাতির প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। এর ভেতর কোথাও আছে হাসির হুল্লোড়, কোথাও বা নিছক ছেলেমানুষী, কোথাও বা হয়েছে সৌন্দর্য সৃষ্টি আর কোথাও বা করুণ রস সিক্ত কান্নার জোয়ার নেমে এসেছে। ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের প্রতিটি ইঁট, প্রতিটি গাছপালার উপর লেখকের নিবিড় মমতা। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর দাদামশায়ের স্মৃতি "জড়িত ছিল সেই বাড়ীর প্রতিটি কোন, প্রতিটি কণা, দক্ষিণের বারান্দার প্রতিটি দিন······আমরা যারা জন্মেছিলুম এই বাড়িতে এখনও চোখ বুঁজলে দেখতে পাই সেই বাড়ির দেউড়ি, চওড়া কাঠের সিঁড়ি, লাইব্রেরী ঘর, দক্ষিণের বারান্দা আর নারকেল গাছ ঘেরা বাগান।" জন্মস্থানের স্মৃতি বিজড়িত এই "দক্ষিণের বারান্দায়" তাই বাগানের আর তার মালীদের বর্ণনায় ভরে গেছে। কোথায় জাপানী শিল্পীর নির্দেশ মত কাটা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চন্দ্রোদয় দেখার বর্ণনা, কোথায় বকুল তলায় সন্ধ্যের পর যাওয়ার ফলে গা ছম্ ছম্ করার কাহিনী কোথায় বা যোগী মালীর গল্প আর কোথাও বা হিমসাগর আম খেয়ে তিন দাদামশায়ের হাস্যকর কাহিনী যার মধ্যে আন্তরিকতার সুরটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

শৈশব ও কৈশোরের জীবনচর্যার মধ্যে একটা সার্বজনীন উপলব্ধির সুযোগ আছে। তার আবেদনটি। গভীর ও সুবিস্তৃত। এই উপলব্ধির বাণী মোহনলাল বাবুর অন্যান্য লেখার মত আলোচ্য পুস্তকেও ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তিনটি শিল্পী হৃদয়কে মোহনলালবাবু, তাঁর নিজের ভাষায়, "কথামালার হট্টমালার" দেশ থেকে এনে আমাদের মাঝখানে বেশ কিছুকাল আসর জমিয়ে রেখেছেন। বইখানি একাধারে হয়ে উঠেছে সাহিত্য, ইতিহাস ও দিনপঞ্জীর সংমিশ্রণে অপূর্ব রসের ফোয়ারা।

কিন্তু প্রচ্ছদপটের প্রশংসা করতে পারিনা। শিল্পীর চোখ অত্যন্ত কমার্শিয়াল বলে মনে হল। চোখ বাঁধানো রঙে বারান্দার জফ্‌রী আর প্রজাপতি দেখিয়ে পারসী ঢঙের লেখা "দক্ষিণের বারন্দার" তাৎপর্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো নয়, জল বার করে দেওয়ার সামিল হয়েছে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

রবীন্দ্র অভিধান (প্রথম খণ্ড)॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু ॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। ছ' টাকা।

ঘরে নিষ্কাম তামসিকতা, আর বাইরে নিজ সংস্কৃতি নিয়ে আস্ফালনের চেষ্টা সম্প্রতি বাঙালী-চরিত্রে প্রকট হয়ে পড়েছে। আমাদের রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিতপ্রায়; পুরনো আমলের গয়নাগুলোর হাল আমলে হাঁড়ির হাল হয়েছে। কেউ কেউ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জাগরণকে ইতি-মধ্যেই 'হিন্দুয়ানী' বলে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছেন। আমাদের বহু ভাগ্য, রবীন্দ্রশতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নেড়েচেড়ে দেখছি। অবশ্য কিছুকাল আগে থেকে এদেশে সাহিত্যিক মহলে একটা নতুন ধুয়ো উঠেছে : রবীন্দ্রনাথের জীবনপ্রত্যয় গ্যয়টের মতো সর্বব্যাপক নয়, র‍্যাঁবো রিলকের মতো তন্ময়ীভূত চৈতন্যও নাকি তাঁর ছিল না! এমন কথাও কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন যে, রবীন্দ্র প্রতিভা খুব কিছু একটা মৌলিক ব্যাপার নয়। উপনিষদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকতা ও প্রতীকবাদের নিবিড় অনুষঙ্গ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের আর কী-ই বা থাকে? দুঃখের বিষয় পশ্চিমের মানুষগুলোর কাণ্ডজ্ঞান এখনও লুপ্ত হয়নি, কিংবা আমাদের মতো তাঁদের রসবোধে এখনও পাকা রং ধরেনি। তাই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করে নতুন দিগন্ত আবিষ্কারে প্রস্তুত হচ্ছেন। আর আমরা? আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথ বড় জোর একজন গীতিকবি, তাও সার্থক গীতিকবি নন। মৃত্যুর দশ বছর আগে তিনি যে কবিতাগুলোতে সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, সেগুলোই নাকি ধোপে টিকবে। আত্মনিন্দা বাঙালীর যে আত্মতৃপ্তির কারণ, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে র‍্যাঁবো-রিলকের দেশের সুধীজনের সপ্রশংস কৌতূহল এত সজাগ যে, আমাদের দেশের 'দাদা'-রা ('ফাল্গুনী' স্মরণীয়) রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে রূঢ়কথা প্রয়োগে ততটা সাহস পাচ্ছেন না। অনেক তরুণ রুচিবান বাঙালী পাঠকের কাছে জনান্তিকে আমরা শুনেছি যে, রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁদের মনে প্রাণে আর তৃপ্তি দিতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য!

শতবার্ষিকী উপলক্ষে টন ওজনে 'রবীন্দ্রসংখ্যা' ও 'রবীন্দ্রস্মারক গ্রন্থ' প্রকাশের কমতি নেই। বাজারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এত পত্র-পত্রিকা আলোচনা সমালোচনা ব্যাখ্যাটীকা স্তুতিবাদ এবং তস্য টীকা প্রকাশিত হচ্ছে যে, ছাব্বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনাবলী তবু কয়েক বছরের মধ্যে পড়ে ফেলা যায়, কিন্তু এই সমস্ত পুস্তকপুস্তিকার সামান্যতম গলাধঃকরণ করা দুঃসাধ্য। এর মধ্যে দুটি একটি আনন্দপ্রদ সংবাদ আছে। সম্প্রতি বুকল্যাণ্ড প্রকাশন থেকে অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু 'রবীন্দ্র অভিধান' (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা বাঙলার সুধীসমাজ এবং বাঙলার বাইরের রবীন্দ্রনুরাগী ভারতীয় সজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যাঁরা প্রীতির বশে অথবা প্রয়োজনের তাড়নায় রবীন্দ্রসাহিত্য অনুশীলন করেন, তাঁরা অনেক দিন ধরে এই ধরনের একখানি রেফারেন্স গ্রন্থের বিশেষ অভাব বোধ করছিলেন। অনেক কাল আগে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি' দুইখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্য গ্রন্থের সটীক পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। নানা কারণে বিপুল-পরিশ্রমে-লেখা তাঁর গ্রন্থ আমাদের ততটা প্রয়োজন মেটাতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রবিশেষ। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গলীলা উপভোগ করা নিরাপদ, কিন্তু যাঁরা সেই তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করে রত্নাকর-গর্ভ থেকে নানা মণি-মাণিক্য তুলে আনেন, তাঁরা আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ বসু সেই দুরূহ কর্মের দিক্‌রেখা নির্দেশ করলেন। ইংরেজীতে 'Browning Encyclopaedia' আছে। রবীন্দ্র-

নাথ সম্বন্ধে এই রকম একখানি গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব ছিল।

'রবীন্দ্র অভিধান'-এর বিরাট পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বসু বর্ণানু-ক্রমিক রীতিতে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় কবিতা, গান, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, গল্প-উপন্যাস, নাটক, তাতে বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতি ব্যাপারের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কয়েকখণ্ডে 'রবীন্দ্র অভিধান' সংকলনের সংকল্প করেছেন। ২৫এ বৈশাখ এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে জানা যাচ্ছে, আগামী দু বছরের মধ্যে এর অন্যখণ্ড গুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডটি শুধু 'অ' অক্ষর সংক্রান্ত—তাতেই এর পৃষ্ঠাসংখ্যা হয়েছে প্রায় দু'শ। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসুর গোটা অভিধানটা যখন প্রকাশিত হবে, তখন এ কিরকম বিপুল কলেবর ধারণ করবে, তা আমরা অনুমান করতে পারি। বিশেষতঃ তাঁর একার চেষ্টায় এত বড় বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হতে যাচ্ছে, এ কম প্রশংসার কাজ নয়।

অধ্যাপক বসু এই অভিধানে রবীন্দ্রনাথের যে কোন রচনা সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। কবিতাটির রচনাকাল, প্রকাশকাল, পাঠান্তর বা রূপান্তর, কোন্ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, মূল বক্তব্য, কবির নিজস্ব মত-অভিমত, নানা সমালোচকের মন্তব্য, পরিশেষে সংকলকের নিজের বিচার-বিশ্লেষণ—এইভাবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। যাঁরা মূলগ্রন্থে থৈ পাবেন না, তাঁরা পূর্বাহ্ণে এর সাহায্য নিলে উপকৃত হবেন। ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক, রবীন্দ্রানুরাগী—সকলেই যে এই অভিধান থেকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারবেন তা বলাই বাহুল্য। শ্রীযুক্ত বসু এর নাম দিয়েছেন 'অভিধান'। আমাদের কিন্তু মনে হয় রবীন্দ্র-বিশ্বকোষ' ধরনের কোন একটি নাম হলেই এর যথার্থ গৌরব রক্ষিত হত। কারণ এই গ্রন্থ কোষগ্রন্থের মতই যাবতীয় তথ্যে পরিপূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এটি সম্পূর্ণ হলে সংকলকের প্রতিভা ও পরিশ্রম যথোচিত মূল্য পাবে বলে বিশ্বাস করি।

এই প্রসংগে একটা আশংকার কথা নিবেদন করি। সকলেই জানেন বাঙালী বহু দিক থেকে সহজ হবার সাধনা করে, অর্থাৎ দুরূহ দুঃসাধ্যের প্রতি তার সীমাহীন ঔদাসীন্য। যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের কষ্ট স্বীকারে পরাঙ্‌মুখ হবেন, অথচ বিদগ্ধ মণ্ডলীর কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যে নিষ্ণাত ব'লে বাহবা পেতে চাইবেন, তাঁরা মূল গ্রন্থকে স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে এই অভিধানের সাহায্যে বাজিমাতের চেষ্টা দেখবেন। তাঁদের এই 'মহাবিদ্যা' যে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়বে, তা মনে হয় না। এই গ্রন্থ হাতে পেলে ছাত্রেরাও মূল গ্রন্থ পাঠে কতটা উৎসাহী হবেন, তাও ভেবে দেখা দরকার—যেহেতু আধুনিক ডিগ্রীকামী ছাত্রের দৌড় নোটবই পর্যন্ত। এখন তো রিভিউ রিডারদেরই যুগ। সে যাই হোক লেখক তরুণবয়স্ক বলে আশা হচ্ছে, এই বিরাট গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে। তা নইলে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অভিধান সংকলনের পরিণামের কথা চিন্তা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতাম।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
২৪ চৌরঙ্গী রোড। কলিকাতা : ১৩

বেঙ্গল
ইমিউনিটি
কোং, লিঃ

উ ল্লে খ যো গ্য ব ই ও প ত্র প ত্রি কা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তসার) দাম ঃ এক টাকা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(সংক্ষিপ্তবিবরণী) দাম ঃ ছয় আনা

॥ ছো ট দে র জ ন্য ॥

দেশ-বিদেশের উপকথা

মনোজিৎ বসু

দাম ঃ এক টাকা

যারা দেখাল নতুন আলো

হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গুঞ্জন

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ছুটির দিনের কবিতা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেল-নুন-কড়ি

শ্যামাপ্রসাদ আচার্য

চলার পথে—বাদলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

জয় যাত্রা—নীলিমা সেন

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

দামোদর

বিশ্ব বিশ্বাস

প্রতিটি বই সচিত্র এবং দাম চার আনা

হাতের কাজ (১ম, ২য় ও ৩য় **খণ্ড**)

প্রতি খণ্ড পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

আমাদের পতাকা

দাম—পঞ্চাশ নয়া-পয়সা

কথাবার্তা

সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্য-বিষয়ক বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাম্মাসিক ১·৫০ টাকা।

উইক্‌লি ওয়েস্ট বেঙ্গল

সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত ইংরেজি সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৬, টাকা; ষাম্মাসিক ৩, টাকা।

বসুন্ধরা

গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বিষয়ক বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২, টাকা।

শ্রমিক-বার্তা

শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক ১·৫০ টাকা;

পশ্চিম বংগাল

নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাম্মাসিক ১·৫০ টাকা।

মগ্‌রেবী বংগাল

উর্দু ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাম্মাসিক ১·৫০ টাকা।

অনুসন্ধান করুন

(বইয়ের জন্য) পাব্‌লিকেশন্‌ সেল্‌স-অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা ১

(পত্র-পত্রিকার জন্য) **প্রচার-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,** রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা ১

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Aug. '61 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

এ এক সমস্যার শ্রেণী !

এই শ্রেণীর যাত্রীদের 'ডবল্ টি' অর্থাৎ বিনা টিকিটের যাত্রী বলা হয় ; ট্রেণের সব কামরাতেই এঁরা থাকেন। বেশভূষা আর মুখের ভাব দেখে এঁদের এই বিশেষ শ্রেণীর যাত্রী বলে চেনা একেবারেই অসম্ভব। সময়ে অসময়ে সেইজন্যই টিকিট পরীক্ষা করতে হয়, যাত্রীদের বার বার হয়ত টিকিটও দেখাতে হয়। ফলে যথার্থ যাত্রীরা হয়ত বিরক্তই হন। কিন্তু তাঁরা রেল প্রতিষ্ঠানের এই অসুবিধা উপলব্ধি করে এই সমস্যার শ্রেণীকে শায়েস্তা করার কাজে টিকিট পরীক্ষকদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন — এটুকু কি আমরা আশা করতে পারি না ?

বিনা টিকিটে ভ্রমণ
বন্ধ করতে
সাহায্য করুন

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

কত গ্রামে এক সের হয়?

মেট্রিক ওজন এখন চালু হয়েছে। মেট্রিক ওজন অনুযায়ী দাম বলা হয়। কিন্তু তবু লেনদেনের সময় এখন পর্য্যন্ত বিরক্তিকর হিসেব করতে হচ্ছে।

কেন?

কারণ মেট্রিক ওজনের মূল সুবিধেটা কাজে লাগানো হয় না। পুরাণো ওজনে অথবা পুরাণো মাপের ভিত্তিতে মেট্রিক ওজনে জিনিষপত্র চাওয়া হয়।

১ সেরের জন্য ৯৩০ গ্রাম
১ পাউণ্ডের জন্য ৪৫৪ গ্রাম

জিনিষপত্র চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি হ'ল:

১ কিলোগ্রাম (১,০০০ গ্রাম)
৫০০ গ্রাম

এই রকমভাবে জিনিষ চাইলে লেনদেন যেমন সহজ হয় তেমনি হিসেবেও কোন গোলমাল হয় না।

আপনার জিনিষপত্র নিন

পূর্ণ সংখ্যা

অর্থাৎ দাশের গুণিতক মেট্রিক একাকে

এতে আপনার ও ব্যবসায়ীর উভয়েরই সুবিধে

DA 61/268

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
সবুজ
নীল
LUX
LUX
গোলাপী
হলুদ
LUX
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
মোড়কে—সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
রক্ষার যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন।
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান

৯ম বর্ষ। ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র। তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

৯ম বর্ষ। ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র। তেরশ' আটষট্টি

অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী

নবমবর্ষ জ্যৈষ্ঠমাসের সমকালীনে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লেখা রবীন্দ্র গ্রন্থালোচনায় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী হইতে উদ্ধৃত *অজিতকুমার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা প্রসূত লেখাংশ পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। প্রভাতকুমারের ধারণা যে কত ভুল তাহা জানানো দরকার মনে করি।

দশবছর কাজ করার পর অজিতকুমার আশ্রম ছেড়ে চলে আসেন। এই ছেড়ে আসার কারণ সম্বন্ধে জীবনীকার প্রভাতকুমারের উদ্ধৃতি পড়িলে এই ধারণাই হয় যে অজিতকুমারের রবীন্দ্রনাথের প্রতি আর সে মনোভাব ছিলনা, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেও পেছপা হন নাই—যথা "কবি সম্বন্ধে বেশ একটু critical হইতেছিলেন" এবং শেষে ঐ ধারণাকে বলবৎ করে "এতৎসত্ত্বেও অজিতকুমারের প্রতি কবির স্নেহ কমেনি" এই বাক্যে। দ্বিতীয় বক্তব্য—প্রভাতকুমার লিখিতেছেন "গত একবৎসর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনা ব্যপদেশে অজিতকে কলিকাতায় বেশিরভাগ সময় থাকিতে হয়।" কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তিনি মহর্ষির জীবনচরিত লিখিবার জন্য গিরিডি যান সপরিবারে। তবে তথ্য সংগ্রহের জন্য কলিকাতা আসা ও 'বেশিরভাগ' কলিকাতায় থাকা এক নহে। এবিষয়ে পরে বিস্তারিত লিখিতেছি। প্রভাতকুমার লিখিতেছেন—"কলিকাতায় সাহিত্যিক সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় এইসময়ে, এই সাহিত্যিকদের মধ্যে সকলেই রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন না, অনেকে বিরোধী না হইয়াও ক্রিটিক, আবার কেহ কেহ নিছক নিন্দাকারী।"

শান্তিনিকেতনে যাইবার পূর্ব্ব হইতেই এবং দশবৎসর শান্তিনিকেতনে কাজ করিবার পর কলিকাতায় আসার পূর্বেই বহু সাহিত্যিক বন্ধু অজিতকুমারের ছিল যথা *সুকুমার রায় *মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, *চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় *সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালিদাস নাগ প্রমুখ এবং ইহাছাড়া তাঁহার পিতৃস্থানীয় ও পিতৃবন্ধু প্রবীণ *ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, *শ্রীশচন্দ্র দে ও *রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিগের সহিতও

তাঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিল। বলা বাহুল্য ই'হারা সকলেই বিশেষভাবে রবীন্দ্র-অনুরাগী ছিলেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথের জীবনী রচনা ব্যপদেশে কলিকাতায় বেশির ভাগ সময় থাকাকালীন সাহিত্যিক সমাজের সহিত অজিতকুমারের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, পূর্ব হইতেই ছিল।

আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার যে, অজিতকুমারের যে সাহিত্যিক সমাজে মেলামেশা করিতে-ছিলেন তাহার মধ্যে আবার নিছক নিন্দাকারীও ছিলেন (রবীন্দ্রনাথের প্রতি)।

যে অজিতকুমার রবীন্দ্রনাথের অযথা নিন্দাবাদের কঠোর সমালোচনার দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে নিছক নিন্দাকারীদের সহিতও হাত মিলাইবেন ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। বলিতে গেলে সেই সময়, যখন স্বদেশেও রবীন্দ্রনাথের আসন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ত হয়ই নাই বরং প্রচুর শ্লেষ, কটূক্তি ও নিন্দাবাদ তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল—তখন একমাত্র অজিতকুমারই সব্যসাচীর ন্যায় রবীন্দ্র আক্রমণকারীদের তাঁহার সমালোচনার তীক্ষ্ম শরে পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের সকল যুক্তিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

প্রভাতবাবু যদি অজিতকুমারের কোনো একটি রবীন্দ্র-সমালোচনার যাহা তিনি **বেশ একটু** critically করিয়াছিলেন উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিতেন ত বোঝার সুবিধা হইত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না যে শান্তিনিকেতন হইতে আসিবার পর অজিতকুমার যে সাহিত্যিক সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন তাঁহারা হইতেছেন বিচিত্রা ও মডার্ন ক্লাবের এর সাহিত্যিক গোষ্ঠি। সেই ক্লাবে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা স্বনামধন্য, যথা—*সুকুমার রায়, *সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, *চারুচন্দ্র বন্দো-পাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, হিরণ্ময় সান্যাল, অমল হোম, প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় (জংলীবাবু), *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কবি মন্মোহন ঘোষ, *সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, কালিদাস নাগ, নির্ম্মল সিদ্ধান্ত, *জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণ। ই'হারা সকলেই রবীন্দ্র ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। এই উদ্ধৃতির শেষ লাইনে আছে "মোট কথা অজিতের মন নানা কারণের যোগে রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া আসিতেছিল, কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্যসমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল বলিয়া **আমাদের ধারণা**"।

প্রথমেই বলিতে চাই **আমাদের** বলিয়া লেখক বোধহয় গৌরবে বহুবচন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা প্রভাতবাবুর মত বুদ্ধিমান ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই জানেন যে 'ধারণা' বাক্যটির উপর কোনো ঐতিহাসিক সত্য টি'কিতে পারে না। কাজেই প্রভাতবাবু তাঁহার ধারণার উপর এরকমভাবে এক-জন পরলোকগত লোকের নামে যিনি ইহার কোনো প্রতিবাদই করিয়া সত্য উদ্ঘাটিত করিতে পারিবেন না, লিখিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন।

বাংলা ১৩২৫ ও ইংরাজী ১৯১৮ সনে ৩২ বছর বয়সে অজিতবাবুর মৃত্যু হয়, অথচ আমরা দেখিতে পাই ১৩২৪ সনে মাত্র একবৎসর পূর্ব্বে—মৃত্যুর অল্প আগেও "নারায়ণ" কাগজের রবীন্দ্র নিন্দাকারী সমালোচকদের প্রতি আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন। ১৩২৪ সনের ভারতীতে উহা তিনি "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমালোচক" শিরোনামায় প্রবন্ধ লেখেন নিজের নাম না দিয়া। আবার বৈষ্ণব কবিতার উপর প্রবাসীতে লিখিয়া বিরাগভাজন হন বহুলোকের। তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতার "খোকা মাকে শুধায় ডেকে" কবিতাটি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা এবং বৈষ্ণব উচ্চভাবের কবিতার সমগোত্রীয় বলেন। যেমন চণ্ডীদাসের "রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়" এই ধরণের আধ্যাত্মিক ভাবের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সমপর্যায়ে পড়িতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব কাব্যের অনেক কবিতাই দেহধর্ম্মীয় যেমন "চলে নীল-

শাড়ী নিংগাড়ি নিংগাড়ি পরাণ সহিত মোর" ইত্যাদি। তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অজিতকুমারকে আক্রমণ করিয়া লেখেন যে অজিতকুমার ব্রাহ্ম বলিয়াই বৈষ্ণব কাব্যের উচ্চ-ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তাহা পড়িয়া অজিতকুমার বলিয়াছিলেন যে বৈষ্ণবদর্শন যে অতি-শয় উচ্চাঙ্গের তাহাতে সন্দেহ নাই তাই বলিয়া সব বৈষ্ণব কবির কবিতাই যে উচ্চাঙ্গের তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সহিত তুলনামূলক আলোচনাও অনেকের ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

আবার রবীন্দ্রসাহিত্যে বস্তু তন্ত্রের অভাব উল্লেখ করিয়া বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'নারায়ণ' কাগজে যখন লেখেন অজিতবাবু তাহারও প্রতিবাদ করিয়া তাহা ভুল প্রতিপন্ন করেন।

বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের আসন চিরস্থায়ী ও উচ্চ বলিয়া অজিতবাবু তাঁহার বহু রচনার মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহাকে সমালোচকের অনেক শ্লেষাত্মক আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছে। কোথাও অজিতবাবু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। কোথাও **অজিতের মন রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া** আসিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমৃত্যু তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভাকেই স্বীকার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

শেষকথা—"কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্যসমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল।" এবং প্রভাতবাবু অজিতবাবুর অর্থনৈতিক সংকটকেও আশ্রম-ত্যাগের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এইখানে অজিতকুমারের জীবনের শেষ ঘটনাবলীর খানিকটা ধারাবাহিক উল্লেখ প্রয়োজন।

অজিতকুমার যখন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন তখন অর্থের আশায় যে যান নাই তাহা বলা বাহুল্য, এমন কি আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও তাঁহার ছিল কিনা সন্দেহ।

তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ও তাঁহার কর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই কাজে জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প লইয়াই যান। তখন বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্তই দরিদ্র ছিল। অতি সামান্য বেতন যাহা উল্লেখ করিতেও সংকোচ বোধ হয় তাহাই গ্রহণ করিয়া তিনি সেখানে কাজ করেন। তিনি সংসারে একক হইলে অর্থাৎ মা ও ভাইদের ভার বহন করার দায়িত্ব না থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই বিনা বেতনেই কাজে যোগ দিতেন। মাত্র পনেরো টাকা বেতন লইয়া তিনি কাজে যোগ দেন। এবং দীর্ঘ সময় নামমাত্র বেতনেই সেখানে কাজ করিয়াছেন।

সেই সামান্য বেতন হইতেই তাঁহার পরমবন্ধু °সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাকে সাহায্য করিতেন ৫৲ প্রতিমাসে। বাকি টাকা নিজের মায়ের হাতে তুলিয়া দিতেন সংসারের জন্য।

পূজনীয়া হেমলতা দেবী বলিয়াছিলেন যে গরমের সময়ও তাঁহাকে একটা 'ওভার-কোট' এর মত পরিতে দেখিয়া তিনি অনেক পিড়াপিড়ির পর জানিতে পান যে কেন তিনি উহা ব্যবহার করেন। শতছিন্ন ধুতি গিঁট দিয়া দিয়া পরিতেন ও সেই দারিদ্র্য ঢাকিবার জন্য বড় কোটটি উহার উপরে পরিতেন।

কাজেই অর্থসংকট তাঁহার ছিলই কবে উহা কি পর্যায়ে আসাতে তাঁহাকে শান্তিনিকেতন হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছিল তাহা জানানো দরকার মনে করি। অর্থ সংকটের জন্য তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন নাই ইহা লক্ষ্য রাখিবার। ঘটনা চক্রে উহা পরে উপস্থিত হইয়াছিল। উনি মহর্ষির জীবনী লেখার জন্য আশ্রম হইতে গিয়া আর কেন ফিরিতে পারে নাই সেই কথাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

বিদ্যালয়ে অজিতকুমার যখন কাজ করিতেছেন সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ

পৌত্র ও মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীপেন্দ্রনাথ মহর্ষির একখানি ভাল জীবনী যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগী হন, এবং তিনিই রবীন্দ্রনাথকে ধরেন অজিতকুমারকে দিয়া যাহাতে বইখানি লেখানো যায় তাহার জন্য, এবং মাসে একশত টাকা হিসাবে একবৎসর তিনি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

রবীন্দ্রনাথ অজিতবাবুকে বিদ্যালয়েই থাকিয়া বইখানি লিখিতে বলেন। বিদ্যালয়ে থাকার দরুণ সেখানকার অনেক কাজই তাঁহাকে করিতে হইত যাহার ফলে বইলেখার কাজ একেবারেই অগ্রসর হইতে ছিল না। এদিকে একবৎসরের আর অধিকদিন বাকি নাই। এইসব দেখিয়া অজিতকুমার গিরিডি গিয়া নিরাধারে বইখানি লেখার মনস্থ করেন।

এই সময় তিনি আশ্রম ছাড়িয়া সপরিবারে গিরিডি যান ও বহুকষ্টে বইখানি লেখেন, কারণ উহা শেষ হইবার পূর্বেই একবৎসর পূর্ণ হওয়ায় টাকা বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়া ট্যুইশানির সাহায্যে সংসার প্রতিপালন করিয়া অতিকষ্টের মধ্যে বইখানি শেষ করিতে হয়। গিরিডিতে থাকাকালীন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের লেখা চিঠি, পরে "ভাবীকালে" প্রকাশিত হয়। উহা হইতেও হয়ত ঐসময়কার কথা জানা যাইতে পারে।

মহর্ষির জীবন চরিত শেষ হইতে না হইতে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি এম. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকীপুর কলেজে প্রফেসারিতে ঢোকার পরই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাই অজিতকুমার বাগড়ি বাড়ির জমীদারের ছেলেমেয়ের গার্জ্জেন টিউটার নিযুক্ত হইয়া আসাম যান।

সেইসময় অমল হোম কোনো কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে শ্লেষ পূর্ণ সমালোচনা পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন বোধে অজিতবাবুকে পাঠান। তখন তিনি কার্সিয়াং-এ এবং পূর্ব্বকর্মেই নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে ছিল "আগে গুরু শিষ্যে বিবাদ হইত না কিন্তু এখন হয় সেইজন্য অজিতকুমার আসামের জঙ্গলে কস্তুরী মৃগের সন্ধানে গিয়াছেন ইত্যাদি।" অজিতকুমারের বাগড়িবাড়ীর চাকরীতে থাকাকালীন প্রবীণ সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এই শ্লেষোক্তি। ইহার প্রতিবাদ অজিতবাবু অমল হোম মহাশয়ের নিকট লিখিয়া পাঠান এবং উহা ছাপা হইলে তদুত্তরে পুনরায় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় পরিহাস করিয়া লেখেন "বৎস, তোমার হাতের জল শুদ্ধ হইল ত ?" কিন্তু এই পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়ই আবার অজিতকুমারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া লেখেন অজিতের ন্যায় প্রতিভাবান ও শক্তিশালী লেখকের অকাল বিয়োগে বাংলাসাহিত্যে নিতান্ত ক্ষতি হইল ইত্যাদি। সম্ভবত উহা সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য কাগজে বাহির হয়।*

ভ্রাতার পীড়ার এইরূপ আকস্মিক আক্রমণে বাধ্য হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদরের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনে মন দিতে হইল। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে এই অর্থ উপার্জ্জনে তাঁহার যশ ছিলনা, এমন কি তাঁহার শক্তিরও কতখানি অপব্যয় হইয়াছিল একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহার পর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রেরণায় ও প্ররোচনায় তাঁহাকে 'রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' ইংরাজীতে লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তখন আর কলিকাতা

* হাতের কাছে পুরাণো মাসিক পত্রিকাগুলি না থাকায় ঠিক ঠিক মত তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইলনা। ভাবার্থ ঠিকই আছে।

ছাড়িবার উপায় ছিল না। ঐ বই লেখার জন্যই তাঁহার অন্যত্র যাওয়া বা দূরে কার্য্যভার নেওয়া সম্ভব ছিল না।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় তাঁহাকে বারম্বার বলিয়াছেন যে বাংলার পাঠক সংখ্যা অত্যন্ত কম কাজেই ইংরাজীভাষায় লিখিলে তাহা সমস্ত পৃথিবীর লোক পড়িতে পারিবে অতএব মহর্ষি বাংলাভাষায় লিখিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন এবং 'রামমোহন রায়ের জীবন চরিত' যেন ইংরাজীতেই লেখেন। সেই 'রামমোহন' অজিতকুমার আর ছয় মাস জীবিত থাকিলে প্রকাশিত হইতে পারিত কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাহারও পরিসমাপ্তি ঘটিল। ব্রজেন্দ্র শীলের ইচ্ছা ছিল অজিত-বাবুর বন্ধুরা যাহাতে উহা প্রকাশ করেন কিন্তু সুকুমার রায়ের গৃহ হইতে উহা অবশেষে দুভার্গ্যক্রমে হারাইয়া যায়। কাজেই উহা অপ্রকাশিতই রহিয়া গেল।

এইসময়ে ১৯১৮ সনে ৭ই পৌষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অজিতবাবুকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। প্রথমে নেপাল চন্দ্র রায় আসেন ও পরে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী যখন আসেন তখন তিনি অসুস্থ হইয়া শয্যা লইয়াছেন। সেই অসুখেই সাতদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

তিনি জীবিত থাকিলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে আশ্রমের কাজে তিনি পুনরায় যোগ দিতেন, বিশেষ তখন ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হওয়ায় তাঁহার মত আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী ও নিঃস্বার্থপর কর্মীরই একান্ত প্রয়োজন ছিল।

শান্তিনিকেতন হইতে চলিয়া আসার ও দূরে থাকার কারণ এই ই।

সমকালীনের উক্ত সংখ্যাতেই প্রমথ বিশী মহাশয়ের "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন-গ্রন্থ" হইতে অজিতকুমার সম্বন্ধে উদ্ধৃতিটুকু পড়িলে বোঝা যায় ও প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্র-নাথের প্রচারে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী ব্যক্তি তখন খুব কমই ছিলেন।

তিনি লিখিতেছেন "অজিতবাবু বাংলা দেশে যে শুধু রবীন্দ্রবাণীর দোভাষীর কাজ করিতেন এমন নয়, আশ্রমের অধিবাসীদের কাছেও তিনি রবীন্দ্রবাণীর যেন দোভাষী ছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনায়, তাহার মর্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সাহায্য অপরিহার্য ছিল।"—ইত্যাদি।

কাজেই প্রভাতবাবুর ধারণা একেবারেই ভুল। তাঁহার উচিত রবীন্দ্রজীবনীর পরিশিষ্টে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া ও আগাগোড়া অজিতবাবু সম্বন্ধে তাঁহার ভুল উক্তি সংশোধন করিয়া পুনরায় লেখা।

লেখিকা অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহধর্মিণী—সম্পাদক

আইভ্যান পাব্লোভিচ্ মিনায়েফ্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার তামবোভ্ নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আইভ্যান পাব্লোভিচ্ মিনায়েফ্ জন্মগ্রহণ করেন। মাতার যত্নে স্বগৃহেই মিনায়েফ্ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গেই তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেন। তামবোভস্কি বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিয়া মিনায়েফ্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পিটার্সবার্গ (বর্তমান লেলিনগ্রাড্) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের চীন মাঞ্চুরিয়া শাখার ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন মাঞ্চুরিয়া শাখার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই শাখার "স্নাতক" হন। পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ভি· পি· ভ্যাসিলিয়েফ্ তদানীন্তন কালে চীন ও বৌদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি ভারতবিদ্যা তথা বৌদ্ধসাহিত্যের প্রতি মেধাবী ছাত্র মিনায়েফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশলাভের জন্য অতঃপর মিনায়েফ্ পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি· এ· কাসোভিচ এর নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। সংস্কৃতের সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ও অল্পদিনের মধ্যে তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ জার্মানী গমন করেন। এখানে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ভেবর, বেনফি ও বপের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংস্কৃত ও পালি পুঁথিগুলি অধ্যয়ন করিয়া মিনায়েফ্ প্যারিসের জাতীয় পাঠাগারে ও কিছুকাল পড়াশুনা করেন। এই সময়ে তিনি এই পাঠাগারের পালি পুঁথি গুলির একটা বিস্তৃত তালিকা (ক্যাটালগ) প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটি উত্তরকালে বহু গবেষকের গবেষণার সহায়তা করিয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচবৎসরকাল জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রাচ্যভাষা চর্চার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের ছাত্ররূপে পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ইতি-মধ্যেই ভারত বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার যশ ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবন সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে মঙ্গোলিয়ার ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি একটি সুবর্ণ পদক পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ প্রতিমোক্ষ সূত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক (রীডার) নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা মূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর পালিভাষা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া মিনায়েফ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট্" লাভ করেন(১)। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত মিনায়েফ্ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নিয়মিত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিলে ও মিনায়েফ্ সারাজীবন ভারত বিদ্যার চর্চা করিয়া নিজেকে সমগ্র জগতে একজন প্রমুখ ভারতবিদ্যাবিদ্ বিশেষতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য

বিশারদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে ও রাশিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার একটি কেন্দ্র। মিনায়েফ্‌কে রুশ দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার প্রবর্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ছাত্রাবস্থার পরেও মিনায়েফ্ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বহুবার ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ড গমন করেন। জ্ঞানচর্চার জন্য মিনায়েফ্ তিনবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি ভারত, নেপাল ও সিংহল ভ্রমণ করেন (জুন ১৮৭৪ হইতে ডিসেম্বর ১৮৭৫)। দ্বিতীয়বারে ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই, গোয়ালিয়র, ফতেপুরসিক্রি, দিল্লী, আলোয়ার, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, বরোদা, পুনা, হায়দ্রাবাদ, নাসিক, আওরঙ্গাবাদ, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন (জানুয়ারী হইতে মে ১৮৮০)। তৃতীয়বার ভারত ভ্রমণের সময় তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে যান। ব্রহ্মদেশ হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন। অতঃপর বোম্বাই হইতে জাহাজে ইংলন্ড হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (ডিসেম্বর ১৮৮৫ হইতে এপ্রিল ১৮৮৬)। এই সমস্ত ভ্রমণের সময় মিনায়েফ্ দিনলিপি লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। ভারতের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার উপাদান সংগ্রহ ও ভারতের আধুনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণই ছিল মিনায়েফের তিনবার ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। মিনায়েফের এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের অনুশীলন মিনায়েফের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইলেও তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সমূহ, ভারতের লোক কথা ও নৃতত্ব সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক কালে এই সব বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়েও বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা হইত।

মিনায়েফের স্বদেশ বর্তমানে জগতের একটি অতি প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের প্রগতিশীল ও শোষণ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অতি স্বাভাবিক। মিনায়েফ্ স্বয়ং ছিলেন জারশাসিত রুশ নাগরিক। ভারতের তদানীন্তন শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর ন্যায় তিনিও ছিলেন শ্বেতকায় ইউরোপীয়। মিনায়েফের ভারত ভ্রমণের দিনলিপিগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার উদার মনোভঙ্গির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়, ভারতে শ্বেতকায় ইংরাজ জাতির শাসন শোষণের তীব্র সমালোচনার সুর তাঁহার দিনলিপিগুলিতে পরিস্ফুট হইয়া আছে। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করিতে আসিয়া আশ্চর্য সহানুভূতি, উদারতা ও দূরদৃষ্টির সহিত মিনায়েফ্ তাঁহার কালের ভারত ও ভারতবাসিকে দেখিয়ে গিয়েছেন।

প্রথমবার ভারত ভ্রমণের পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ তাঁহার ভারত ভ্রমণের বিবরণ রশ ভাষায় প্রকাশ করেন (২)। এই পুস্তকটিতে প্রাচীন ভারতের কীর্তি সমূহের বিবরণের সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনাও করা হইয়াছে। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রগতিবাদী ধর্মনেতা ও সংস্কারকদের কথা সশ্রদ্ধ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মিনায়েফের মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ দুইবার ভারত ভ্রমণের দিনলিপিগুলি একটি পুস্তকাকারে কিছুকাল পূর্বে ইউ-এস-এস-আর, সোভিয়েট একাডমি অফ সায়েন্সেস কর্তৃক এ পি, বারানিকফ্ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রুশ ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদও সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৩)।

শেষ দুইবার ভারত ভ্রমণের দিনলিপি গুলিতে ভারতে ইংরাজ শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে মিনায়েফের মতামতগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্ধকূপ হত্যা ও সিপাহী বিদ্রোহকালে সিপাহীগণ

কর্তৃক নৃশংস ভাবে ইংরাজ শিশু ও নারীহত্যা প্রসঙ্গে মিনায়েফের একটি দিনলিপির মন্তব্য এই যে ঘটনা দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় বৃটিশেরা ভারতবাসির কতদূর ঘৃণা উদ্রেক করিতে সক্ষম। মিনায়েফ্ দিনলিপির একস্থানে লিখিয়াছেন যে প্রতীচ্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসী সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়াছে, ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে মিথ্যাভাষণ, কলহ-বিবাদ ও নৈতিক অধঃপতন প্রসার লাভ করিতেছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে চাপা অথচ ব্যাপক অসন্তোষ ও ভারতবাসির স্বরাজ লাভের ক্রমবর্দ্ধমান বাসনা মিনায়েফের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। মিনায়েফের দ্বিতীয়বার ভারতভূমিতে পদার্পণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পুনায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করার অপরাধে বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভারতে আসিয়া মিনায়েফ এই ঘটনা অবগত হইয়া দিনলিপিতে মন্তব্য করেন যে—"ফাড়কের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, এই জন্যই তাহার এই ব্যর্থতা" শেষবার ভারত ভ্রমণের সময় (১৮৮৬) বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের আশায় তিনি ব্রহ্মদেশেও যান। ইহার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বৃটিশ কর্তৃক অভিযানের ফলে ব্রহ্ম দেশ তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ব্রহ্মে বৃটিশের লুণ্ঠন ও ধ্বংস কার্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া মিনায়েফ্ সাতিশয় ব্যথিত হন। এই প্রসঙ্গে দিনলিপিতে তিনি লেখেন "এখানে একটি নির্মম সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে।" ভারতভ্রমণ কালে মিনায়েফ্ সকল শ্রেণীর মানুষের সহিত মেলামেশা করিতেন। প্রথমবার ভারত ভ্রমণের সময় তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তৃতীয়বার ভারতভ্রমণকালে তিনি প্রায় তিনসপ্তাহ কাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। কলিকাতায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিব্বত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। দশবৎসর পূর্বে ভারত ভ্রমণের সময় ইহাঁদের কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সুপণ্ডিত মিনায়েফের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মিনায়েফের মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত কয়েকটি পুস্তক পাওয়া যায়—এই পুস্তকগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত উৎসর্গ পত্র আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উপহৃত মিনায়েফের এই পুস্তকগুলি বর্তমানে লেলিনগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত মিনায়েফের দেখা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় একজন রুশ পণ্ডিতের সহিত দেখা হওয়ার জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। মিনায়েফ্ তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রতি এত সদয় যে তিনি সময়ে সময়ে ইহাতে আশ্চর্য বোধ করেন। মিনায়েফের ধারণা হইয়াছিল যে বাঙ্গালীরা সাধারণভাবে রুশদের অনুরাগী, তাঁহাকে বাঙ্গালীরা যে সমাদর দেখায় তাহা ব্যক্তিগত ভাবে নহে—রুশ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এই সম্মান পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালীদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া মিনায়েফ্ ডায়েরীতে মন্তব্য করেন যে ইংরাজেরা কৃষ্ণকায় বলিয়া তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মিনায়েফের ভারত ভ্রমণকালে ইংরেজ-রুশ সম্পর্ক ভাল ছিল না। রুশদের ভারত আক্রমণের সম্ভাব্যতা লইয়া সংবাদ পত্রে প্রায়ই আলোচনা প্রকাশিত হইত। ইহা বলাই বাহুল্য যে মিনায়েফের ভারত ভ্রমণ কালে ইংরেজ গুপ্তচরদের সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ থাকিত।

পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ গ্রহণের কিছুকাল পরে মিনায়েফ রচিত

পালিভাষায় একটি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। রুশ ভাষায় মাধ্যমে পালিভাষা শিক্ষার কোন পুস্তক ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই (৪)। পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই উহার ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মিনায়েফ্ রচিত পালি ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ ভারত ও ব্রহ্মের পালিভাষা শিক্ষার্থিদের দ্বারা একসময়ে বহুলভাবে পঠিত হইত। পরবর্তী কালে মিনায়েফ্ (১৮৮৯) সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপ ও শব্দরূপ সম্বন্ধে রুশ ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 'লিথোগ্রাফে' ছাপা এই পুস্তকটি বহুদিন যাবৎ রুশ ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিল (৫)। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ রুশ ভাষায় সংস্কৃত ভাষার একটি ইতিহাস প্রকাশ করেন, এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষার প্রধান পুস্তকগুলির বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়, এই কার্যে ইতিপূর্বে রাশিয়ায় কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই (৬)। প্রথমবার ভারত ভ্রমণের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফের ভারতীয় উপকথা ও কাহিনী নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রধানতঃ কুমায়ূন অঞ্চলে প্রচলিত ৭০টি উপকথা ও কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছিল (৮)। জাতকের কাহিনী সংকলন করিয়া তিনি আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মিনায়েফের যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ "বিশ্বকোষ" জাতীয় এই গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের তথ্যগুলির উৎস সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থগুলি ইহাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তনের ধারাও ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে চিত্রিত হয়। মিনায়েফ "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় তথ্য", 'বৌদ্ধ শ্রমণ সঙ্ঘ' 'শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধ' "চন্দ্রগোমী", ভারতের ভূমি ব্যবস্থা, মধ্য এশিয়ার ভূগোল প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন।

খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফানাসি নিকিটিন নামে এক রুশ পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণ করিয়া রুশ ভাষায় "তিন সাগরের ওপারে ভ্রমণ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকটি তদানীন্তন ভারত সম্বন্ধে একটি অতিমূল্যবান রচনা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকটির বিস্তৃত আলোচনা মিনায়েফ কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৯)।

জীবদ্দশাতেই মিনায়েফ্ পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজে একজন ধুরন্ধর ভারত বিদ্যা বিশেষতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটির তিনি একজন প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক তাঁহার সম্পাদিত ছয়খানি পালি-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১০)।

জ্ঞানতপস্বী মিনায়েফ্ অকৃতদার ছিলেন, সংসারের কোন বন্ধন তাঁহার ছিল না। বিদ্যাচর্চার গুরু পরিশ্রমে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন সেণ্ট পিটার্স-বার্গে (লেনিনগ্রাডের) তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ১৩০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—মৃত্যুর পর বহু অপ্রকাশিত রচনাও তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে মিনায়েফের আহরিত পুঁথি সংগ্রহ লেনিনগ্রেডের শাণ্টিকভ শেভিন নামক সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

লেনিনগ্রেড বিশ্ববি[illegible]য়ের প্রাচ্য বিভাগ বর্তমান ভারততত্ত্বচর্চার একটি মুখ্য কেন্দ্র। মিনায়েফের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা বর্তমানেও সেখানে ভারতবিদ্যাচর্চার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন।

(১) Essay on the Phonetics and Morphology of Pali Language—St. Petersburg, 1872.

(২) Sketches of Ceylon and India from the Travel Notes of a Russian—St. Petersburg (Part I and II), 1878.

(৩) I. P. Minayeff—Trakels in and Diaries of India and Burma (Pub. by Eastern Trading Co., Calcutta).

(৪) Pali Grammar—A phonetic and morphological sketch of the pali grammar with an introductory essay on its form and character.

(৫) Declensions and Conjugations of Sanskrit grammar—St. Petersburg, 1889.

(৬) Sketches of important Monuments of Sanskrit Literature—St. Petersburg, 1880.

(৭) Indian Tales and Legends—St. Petersburg 1875.

(৮) Buddhism—Investigations and Materials (Parts I and II)—St. Petersburg, 1887.

(৯) Notes on the Jouney Beyond Three Seas by Affansi Nikities—St. Petersburg, 1881.

(১০) (a) Anagata Vomsa (1886), (b(Chakesa Dhatu, (c) Vamsa—1885, (d) Gandha Vamsa((e) Katha Vathu Commentary—1889, (f) Peta Vathu—1889, (g) Sandesa Katha—Since Vivada—1887,—All published by Pali Text Society, London.

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঙালী সমাজ মন

অলোক রায়

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে, সাংবাদিকতার যে অংশ কালজয়ী তারই নাম সাহিত্য এবং সাহিত্যের যে অংশ অচিরস্থায়ী তারই নাম সাংবাদিকতা। বলাবাহুল্য কালজয়ী শব্দটিকে এখানে শিথিলভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে রামায়ণ-মহাভারতের মত সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়া কোন কিছুই কালকে জয় করতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে স্বকালের খণ্ডতা সত্ত্বেও সাময়িক রচনার কিছু সাহিত্যিক মূল্য থাকা সম্ভব, যাকে আমরা সাময়িক সাহিত্য নাম দিয়ে থাকি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়,—সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে তাঁর যে প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অর্ধেক রচনাকেও স্থান দেওয়া যায়নি। এবং এই রচনাগুলি ছাড়াও অন্যতর বহুক্ষেত্রে তাঁর লেখনী সৃষ্টি কার্যে রত ছিল, তার প্রমাণ পাঁচকড়ির জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের তালিকা; ১। আইন-ই আকবরী ও আকবরের জীবনী (১৯০০) ২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পাদনা (১৯০০) ৩। উমা (গৃহচিত্র) (১৯০১) ৪। রূপ-লহরী বা রূপের রেখা (১৯০২) ৫। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস—প্রথমখণ্ড (১৯০৯) ৬। বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়—প্রথম খণ্ড (১৯১৫) ৭। সাধের বউ (উপন্যাস) (১৯১৯) ৮। দরিয়া (উপন্যাস) (১৯২০) ॥ এই প্রসঙ্গে আমরা পাঁচকড়ির জীবনেরও একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রের পরিচয় নিতে পারি ঃ ভাগলপুরে ২০ ডিসেম্বর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে (অন্যমতে ২৪ ডিসেম্বর ১৮৬৭) জন্ম। সংস্কৃতে অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কাশী থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ। ১৮৯২-৯৫ ভাগলপুরে স্কুলে শিক্ষকতা। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের 'ধর্মপ্রচারকে'র সঙ্গে যোগাযোগ। শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম প্রচার কার্যে সহায়তা। আনুমানিক ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে থেকে সাময়িক পত্র সম্পাদনে লিপ্ত—প্রথমে বঙ্গবাসী, পরে বসুমতী। এবং বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা ও পরিচালন কর্মে রঙ্গালয়, সন্ধ্যা, হিতবাদী, বাঙ্গালী, স্বরাজ, নায়ক, প্রবাহিনী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যু—১৫ নভেম্বর ১৯২৩ ।।

১৮৯০ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত, এই তেত্রিশ বৎসরের রচনাবলীর পরিমাণ এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে পাঁচকড়ির গুরুত্ব সূচিত করে। 'আইন-ই আকবরী' থেকে 'চৈতন্য চরিতামৃত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' থেকে 'রূপ লহরী', বসুমতী-বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে 'সাধের বউ'-উপন্যাস রচনা আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করবে—এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য, পাঁচকড়ির খ্যাতি এবং রচনাকর্ম আজ বিস্মৃত প্রায়, এবং বিশ্ব-বিদ্যালীয় পাঠ্য সূচির বাধ্যবাধকতা ব্যতীত তাঁর পুনর্জীবন লাভ অসম্ভব। এই প্রসঙ্গেই বর্তমান প্রবন্ধের মুখবন্ধটি স্মরণীয়—যদিচ প্রথমেই স্পষ্ট করে বলা ভালো যে পাঁচকড়ি সাহিত্যিক ছিলেন না, এবং তাঁর উপন্যাস বা কথিকাগুলির কালজয়ী হওয়া দূরে থাক, স্বকালেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

তথাপি পাঁচকড়িকে আজ স্মরণ করার কারণ, তাঁর প্রবন্ধাবলীকে আমরা সাময়িক সাহিত্যের মূল্য দিতে ইচ্ছুক, এবং ঐতিহাসিক কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং বিংশ শতাব্দীর

প্রথম পাদের সমাজ মানসের নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যাবে তাঁর রচনায়। বলাবাহুল্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান না পেলেও বাঙালী সমাজের ইতিহাসে পাঁচকড়ির প্রবন্ধগুলি সর্বদাই স্মর্তব্য। বাঙালী সমাজের ইতিহাস এযাবৎ লিখিত হয়নি বলেই তিনি অবহেলিত, অন্যদিকে ভিন্নতর মানদণ্ডে তাঁকে অসাহিত্যিক প্রমাণ করে, বর্তমানে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ অনুচিত॥

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এ যাবৎ যা আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে স্বর্গত মন্মথ নাথ ঘোষ মহাশয়ের দুটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(মানসী ও মর্মবাণী পৌষ ১৩৩০ এবং সচিত্র শিশির ফাল্গুন ১৩৫৬)। এ ছাড়া পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর অমৃতলাল বসু লিখিত মাসিক বসুমতীর (অগ্রহায়ণ ১৩৩০) একটি প্রবন্ধ এবং তৎকালীন কয়েকটি মাসিক এবং দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয়ও স্মরণ করতে পারি। উল্লিখিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধই শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থে রচিত, তথাচ লক্ষ্য করি যে সকলেই পাঁচকড়ির প্রাবন্ধিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা পোষণ করেছেন। প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে পাঁচকড়ির মতামতের স্থিরতা ছিল না—কংগ্রেসের সমর্থন এবং বিরোধিতা, প্রগতিপন্থা এবং রক্ষণশীলতা, ইংরাজ স্তুতি এবং দেশাত্মবোধ ইত্যাদি। বিচিত্র বিরুদ্ধ মতামত একই সময়ে তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে। ফলে পাঁচকড়ির এই স্ববিরোধী উক্তি সমূহের সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করতে হয়েছে—কেউ এর মধ্যে বৈষয়িক বুদ্ধি এবং মানব অসহায়তা লক্ষ্য করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কেউ বলেছেন একই সঙ্গে দুটি বিপরীত মতকে সমর্থন করার মধ্যে পাঁচকড়ির উচ্চতর প্রতিভা এবং সাহিত্যিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। বলাবাহুল্য সকালের দৈনিক পত্রে যে মত প্রচার করেন, সান্ধ্য দৈনিকে তার বিপরী-তাচরণ—আধুনিক পাঠক সমাজে সন্দেহেরই সৃষ্টি করে, এবং সেই সাংবাদিককে সুবিধাবাদী আখ্যা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সময় গত ব্যবধানে মানস পরিণতির ধারানুসরণে যে পরিবর্তন তা সর্বদাই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু একই সঙ্গে দুটি বিপরীত মতাবলম্বী পত্রিকার মনোরঞ্জ-নার্থে বাক্যের 'মায়াজাল' রচনার মধ্যে সাংবাদিকের সততা এবং প্রাবন্ধিকের যুক্তি নিষ্ঠা, রক্ষা করা অসম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে পাঁচকড়ির নিন্দাবাদ আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু আমাদের কৌতূহল জাগে, পাঁচকড়ির সাংবাদিকতা সে যুগের বাঙালী পাঠকের কাছে কেন প্রিয় বলে গণ্য হয়েছিল তা জানতে। নিশ্চয়ই সে যুগের বাঙালী পাঠক এত নির্বোধ ছিলেন না যে সত্য-মিথ্যার ভেদ না বুঝেই বাক্যস্রোতের আবর্তে ভেসে যেতেন। আসলে পাঁচকড়ির রচনায় যে স্ববিরোধিতা আমরা লক্ষ্য করেছি (এই স্ববিরোধ কিন্তু পাঁচকড়ির ব্যক্তি মানস সঞ্জাত নয়) তা তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজেরই আত্মপ্রতিফলন। পাঁচকড়ির রচনায় বাঙ্গালী তার নিজের মনোজগতের নিত্যসংকট প্রত্যক্ষ করেছিল—কংগ্রেসের সমর্থন এবং বিরোধিতা, প্রগতিপন্থা এবং রক্ষণশীলতা, ইংরেজ স্তুতি এবং দেশাত্মবোধ ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এ থেকেই আমরা পাঁচ-কড়ির সমকালীন সহজ জনপ্রিয়তা এবং সাম্প্রতিক সহজতর বিস্মরণের কারণ অনুমান করতে পারি এবং ইতিহাস এই অনুমান সমর্থন করে। (পাঁচকড়িকে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের অন্যতম প্রতিনিধি রূপেই গ্রহণ করবো, যদিচ বর্তমান প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজমনের স্ববিরোধ বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। দ্রঃ 'ঈশ্বরগুপ্ত ও তৎকালীন সমাজ মন' ঃ অলোক রায়। সমকালীন, কার্তিক ১৩৬৫)।।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে একটা চাঞ্চল্যকর সর্বব্যাপী আন্দো-লন লক্ষ্য করা যায়—যাকে ঐতিহাসিকেরা হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান নাম দিয়েছেন। এই ধর্মজাগ-

রণের কারণ নানাভাবে নির্দেশ করা হয়ে থাকে—তবে স্বাজাত্যবোধই যে এর উৎস, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণও ছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালী যুবক অল্প ইংরেজী শিখেই কাজকর্ম সংগ্রহ করতে পারছিল সহজে, ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাংলায় ও বাংলার বাইরে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাঙালীকে প্রতিরোধ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হল। যদিও আজকে একথা ভাবতে আমাদের খুবই খারাপ লাগে যে, বৈষয়িক ক্ষেত্রে আঘাত পেয়েই বাঙালীর মধ্যে স্বাজাত্য চেতনা জাগালো,—তবু এর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, একথা মানতেই হবে। আসল কথা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙালী নিজেকে ইংরেজের সমকক্ষ বলে মনে করেছিল—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, সাহিত্যকর্মে। ইংরেজী ভাববন্যায় আচ্ছন্ন হওয়ার ফলেই নিজের সম্বন্ধে কোনরকম দীনতা জাগেনি। হীনমন্যতা-বোধ জাগতে সুরু করেছে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে। প্রথমার্ধে শুধু দুহাতে গ্রহণ করেছি, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে জাগলো। ফলে দেখা দিল হিন্দুধর্মের পূর্বগরিমা স্মরণ—নতুন করে পুরনো দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু যুগ পালটে গেছে—সময়, সাহিত্য, সংস্কৃতি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় আবার হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যে অনেকটা জোর জবরদস্তি ছিল—অকারণ প্রগল্‌ভতা ছিল—যুক্তিশূন্য অনেক বালভাষণ আবেগ গম্ভীর ভাষায় বলবার চেষ্টা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এঁদের সম্বন্ধেই মন্তব্য করেছেন ঃ

'One of the two branches of this movement, that headed by Pandit Sasadhar Tarkachuramani and Kumar Srikrishna Prasanna Sen, being what may be termed illumination-proof, is devoid of the neo-romantic element of reconstructive tran-figuration which is the child of illumination.' (New Essays in Criticism.)

এইবার পাঁচকড়ি প্রদত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ব্যাখ্যা শুনলেই আমরা রচয়িতা এবং যুগকে বুঝতে পারবো—'ইংরেজের আমলে যখন আমরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি, তখন দেশের অর্থাভাব খুব হইয়াছিল। অথচ, বিলাসের স্পৃহা কম ছিল না। ইংরেজী শিখিলেই তখন অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই অর্থোপার্জন করা যাইত। ইহার ফলে সমাজে কাঞ্চন কৌলীন্যের সৃষ্টি হইল। আর ইউরোপের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতির দুষ্ট আদর্শে মুগ্ধ হইয়া পঙ্কিল বিলাসের স্রোতে আমরা গা ভাসান দিয়াছিলাম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় আমলে আমরা সব ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছি। ধর্ম, সমাজ, মনুষ্যত্ব—সর্বস্বই চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই সর্ববিধ্বংসিনী প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া হইল ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবে। গঙ্গার তরঙ্গে যেমন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল,—সে বেগ সামলাইতে পারে নাই—তেমন ব্রাহ্মসমাজও ইউরোপের বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া গেল।' (ভগবান রামকৃষ্ণ)। আমরা আজকাল সাধারণতঃ যাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বলে থাকি, তার সম্বন্ধে পাঁচকড়ির উল্লিখিত বিশ্লেষণটি আমাদের মনে শুধু কৌতুকই সৃষ্টি করে না, স্পষ্টই বুঝি, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের বাঙালী মনীষীরা মুখ্যতঃ এই ধারাতেই চিন্তা করতেন; চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এমনকি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (চরিত কথা) রচনাতে পর্যন্ত আমরা অনুরূপ আত্মচিন্তা লক্ষ্য করেছি। পাঁচকড়ি অন্যত্রও ইউরোপের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতিকে "দুষ্টাদর্শ" বলেছেন। (নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান)। এইখানেই আমাদের মনে পড়বে, পাঁচকড়ি ছিলেন একদা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণির সক্রিয় সহায়ক এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের অন্তরঙ্গ শিষ্য। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু

পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে এ'রাই ছিলেন প্রধান নায়ক। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে পাঁচকড়ি যে কথা বলেছেন তা আসলে তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য ঃ 'ইন্দ্রনাথ পুরাতন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন।'....'ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যানে ও হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ উপার্জনশীল ধনী হইলেও ইংরেজী নবীস হইলেও, কাল প্রভাবকে পরাভব করিয়া খাঁটি ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁর পুরুষকার অপূর্ব।'

পাঁচকড়ি সমগ্র জাতি এবং সমাজকে দেখেছেন অতীতের আত্মশ্লাঘাময় দৃষ্টিতে। ফলে সর্বত্রই আশাভঙ্গের বেদনা তাঁকে কাতর করেছে। প্রাচীন ধর্ম-কর্ম-আচার থেকে বাঙ্গালী ভ্রষ্ট হয়েছে বলে তাঁর দুঃখের অন্ত নেই—'ইংরেজী লেখাপড়ার অতিবিস্তারে ধর্মভাব একেবারে লোপ পাইতেছে, লোকে স্বেচ্ছাচারী, দেহ সর্বস্ব হইতেছে।' (হায়রে !) এবং তাঁর সমগ্র রচনা-কর্মই হল বাঙ্গালীত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—হিন্দু ধর্মের জয়গান। 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা', 'বাঙ্গালীর জাতি পরিচয়,' 'বাংলার উপাসক সম্প্রদায়', 'বাঙ্গালীর সমাজ বিন্যাস', 'হিন্দুমণ্ডল', 'বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব', 'মাতৃপূজা' 'উপাসনাতত্ত্ব', 'হিন্দু কে' প্রভৃতি সকল প্রবন্ধেই ভাব-উৎস এক। ফলতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান এবং ধর্মবিধি নিয়ে তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, তা আজ আমাদের কাছে বিস্ময়কর কৌতুকের বলে মনে হয় ঃ ব্রাহ্মণ্যত্বের প্রচণ্ড অহমিকা, জাতিভেদ প্রথার গুণকীর্তন, সেকালের স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সামাজিক নির্দেশাদির উচ্চ মহিমা কথন থেকে সুরু করে রামচন্দ্রের বালী বধের সহজ সমর্থন, অর্জুনের কর্ণবধে উল্লাস প্রভৃতি পাঁচকড়ির প্রবন্ধাবলীকে একদা জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে তুলেছিল। পাঁচকড়ির ভাষায় ঃ 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে এ'ড়ে গরু কিনে। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীবাসে সুখে দিনাতিপাত করিতেছিলাম ; মোটা ভাত, মোটা কাপড়, গাড়ু গামছা খড়ম, খড়ের ঘর বটের ছায়া এবং পুকুর পাড়, কবি, পাঁচালী কীর্তন লইয়া অতি সুখেই দিনাতিপাত করিতেছিলাম। দীর্ঘ জীবন, নীরোগ দেহ, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, পানভোজন, উপবাস, পূজাপাঠ উৎসব লইয়াই আমরা সুখে ছিলাম।' এবং ইংরেজ এসেই যত অনর্থ সৃষ্টি করেছে,—কাজেই, তাঁর একান্ত উপদেশ 'যদি বাঁচিতে চাও, তবে পিতামহীর ক্রোড়ে আবার ফিরিয়া যাও। পিতামহীর আদরে বংশরক্ষা হইবে, জাতির বিশিষ্টতা বজায় থাকিবে। এইটুকু বুঝি বলিয়াই বারে বারে এত কথা কহিতে হয়।' (না এদিক না ও দিক)। বলাবাহুল্য ঘড়ির কাঁটা পিছনের দিকে দেওয়ার চেষ্টা বাঙ্গালী সমাজের ইতিহাসে বিশেষ একটি সময়ে লক্ষ্য করেছি ঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সেই যুগের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি।

এর পেছনে অবশ্যই একটা উচ্চ জীবনাদর্শ এবং স্বধর্ম ও স্বজাতি প্রীতির প্রেরণা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে প্রেরণা থেকে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখেছিলেন, সেই প্রেরণা থেকেই পাঁচকড়ির 'মাটি নিবি গো' রচনার জন্ম ঃ 'আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরা মাটির—আমাদের মাটির ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি।' 'জয় রাধে কৃষ্ণ' প্রবন্ধও সেই একই উৎস-জাত ঃ 'জয় রাধে কৃষ্ণ,— মাগো দুটি ভিক্ষা দাও— এ রব বাঙ্গালার সনাতন রব, খাঁটি বাঙ্গালীত্বের রব।' অধিকাংশ প্রবন্ধই এই 'খাঁটি বাঙ্গালীত্বের উল্লাস এবং ক্রন্দন। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে 'বাঙ্গালীত্ব চেতনা'ও বিশেষ ভাবে যুক্ত।

কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে এইখানেই স্ববিরোধের জন্ম। দেশকে তিনি ভালোবাসতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভালোবাসা ছিল প্রধানতঃ আচারসর্বস্ব। এর সংগে ছিল মধ্যবিত্ত সমাজ সুলভ স্বাভাবিক স্বার্থরক্ষা এবং ইংরেজ-চাটুতা। ফলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে কংগ্রেসের উদ্যোগে যে রাজনৈতিক চেতনা জাগতে সুরু করে, তার প্রতি পাঁচকড়ির আন্তরিক সমর্থন ছিল না। যদিও তিনি কংগ্রেস সমর্থক তৎকালীন 'বসুমতী' পত্রিকার (১৮৯৯-১৯০১) কিছুদিন সম্পাদনা করেন, এবং তাঁর রচনাবলীতে তিলক, গান্ধী, নন-কোঅপারেশন প্রভৃতি বিষয়ে অনুকূল কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, তথাচ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস পাঁচকড়ি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না। দৈনিক পত্রের প্রয়োজনে এবং হুজুগের নেশায় এই ধরনের দুচারটি প্রবন্ধ রচনা করলেও, পাঁচকড়ির মধ্যে সংখ্যাগুরু বাঙালী মধ্যবিত্তের কর্মঠবৃত্তিই প্রকট ; এবং ঈশ্বর গুপ্ত থেকে যে বাঙালী মানসিকতা আমরা লক্ষ্য করেছি, অর্থাৎ যা কিছু ইংরেজীয়ানা তারই নিন্দা, কিন্তু ইংরেজের অজস্র স্তুতিবাদ, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। পাঁচকড়ি তাই লেখেনঃ 'ইংরেজের আমলের গোড়ায় যে সকল বড়লোকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের গোড়ার ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, একদল কপট শয়তানের হাতে পড়িয়া ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শয়তানের পথে হাঁটিতে হইয়াছিল। লর্ড মেকলে কলিকাতায় বসিয়া যেমন বাঙ্গালীর পরিচয় পাইয়াছিলেন, তেমন বাঙ্গালীর চরিত্রের আলেখ্য তিনি অপূর্বভাষায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি তিলমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই।' (গোড়ার কথা)। সাধু ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙালী কি করে শয়তানী শেখালো তা অবশ্য আমাদের অজানা! এবং মেকলের বাঙালী নিন্দার সোচ্ছ্বাস প্রশংসা পাঁচকড়ির রচনায় স্ববিরোধের ইঙ্গিত দেয়।

অথ রাজনীতি সম্বন্ধে পাঁচকড়ির আত্মচিন্তাঃ 'এই একঘেয়ে ভোগের জীবন, এই কেবল নিজের দেহের তুষ্টি পুষ্টির পানসে মানবতা আর ভালোলাগে না। ভালোলাগেনা বলিয়া সর্বাগ্রে রাজনীতির মহাপঙ্কে গিয়া পড়িয়াছিলাম। কংগ্রেস কনফারেন্স, গোটা ভারতবর্ষকে এক করিয়া অটোনমি, স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি রাজনীতির নানা বোলওয়ারি কপচাইয়া দেখিলাম—সবই বিদেশের, কোনটাই আমার নিজের নহে: সাধ মিটিল না, তৃপ্তিবোধ হইল না।' (সাহিত্য সম্মেলন)। এই প্রসঙ্গে 'সম্মেলনের সখ' প্রবন্ধটিও বিশেষ ভাবে আলোচ্য।

আমাদের এতাবৎ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচকড়ির প্রধান পরিচয় বিশেষ একটি যুগের খণ্ড জীবন দৃষ্টির সাহায্য নিয়ে রচনা কর্ম, এবং ফলতঃ বর্তমান যুগের পাঠকদের কাছে তাঁর আবেদন স্বল্পই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, প্রাবন্ধিক হিসেবে অন্ততঃ বিশেষ একধারায় তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদনসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সেই বিশেষকয়েকটি প্রবন্ধকে 'বাঙালী সমাজ এবং ধর্ম' নাম দিয়ে একত্রিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে আমরা নিম্ন লিখিত প্রবন্ধগুলিকে স্থান দিতে চাইঃ বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা, বাঙ্গালীর জাতিপরিচয়, বাঙ্গালীর উপাসক সম্প্রদায়, বাঙ্গালীর সমাজবিন্যাস এবং বাংলার তন্ত্র, তন্ত্রে মূর্তিপূজা, তন্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য, তন্ত্রের দেহতত্ত্ব, তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব, শিব ও শক্তি।

সংখ্যায় অল্পই। তবু এই প্রবন্ধগুলির এই স্বতন্ত্র মূল্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীর

শেষ পাদে উগ্র হিন্দুচেতনার সঙ্গে সঙ্গেই এক মূঢ় 'আর্যামী'ও লক্ষ্য করা গেছে। অর্থাৎ যেহেতু আমরা আর্য সন্তান, কাজেই অতীত অতিশয় মহিমান্বিত এবং য়োরোপীয় জাতিদের থেকে আমরাও কোন অংশে হীন নই। উত্তর ভারতের পক্ষে আর্যত্ব সম্পূর্ণ অসমীচীন না হলেও, বাঙালীর পক্ষে এই নিয়ে আস্ফালন করা অর্থহীন, কারণ বাঙালী জাতির নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান বিশ্লেষণের পর আর্যজাতির সাক্ষাৎ বংশধর বলে নিজেদের কিছুতেই দাবী করা যায় না। অথচ সে যুগের অধিকাংশ মনীষীই বাঙালী সংস্কৃতিকে উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দেখাবার জন্য প্রচুর ভ্রান্ত যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, পাঁচকড়ি এই ভুল করেননি। তিনি প্রচুর পরিশ্রমে বাঙালী সংস্কৃতির তথ্যমূলক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন 'বাঙ্গালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাঙ্গালায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার ব্যবহার, কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি করিয়াও বাঙ্গালায় যাগযজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুক গণকে বাঙ্গালার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল।' (বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা)। এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যে সামাজিক প্রেরণা ছিল তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি,—কিন্তু জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক, পাঁচকড়ির এই প্রবন্ধগুলি বহুলাংশে বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার সমধর্মী, এবং সেদিক দিয়ে প্রবন্ধগুলি আজও অবশ্য পাঠ্য।

হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান অবলম্বন—তন্ত্র বা শক্তি তত্ত্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্ম আলোচনা করতে গেলে তন্ত্রের রহস্যভেদ করতেই হবে। সম্প্রতি কালে পণ্ডিতেরা শক্তিতত্ত্ব এবং তন্ত্র সম্বন্ধে নানাগবেষণা করছেন,—কিন্তু এই ধরণের আলোচনার সূত্রপাত করেন পাঁচকড়ি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পুরুষানুক্রমিক উপলব্ধি এবং প্রচুর অধ্যয়নের সাহায্যে তিনি তন্ত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। যে সময়ে পুরাণের দীর্ঘ উদ্ধৃতি এবং উচ্ছাসবহুল ভক্তি প্রকাশই ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সাধারণ লক্ষণ ছিল সে সময়ে পাঁচকড়ির প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে পাঁচকড়ি ঊনবিংশ শতাব্দীর 'খাঁটি বাঙালী' ছিলেন, এবং বাঙালী জাতি, বাঙালী সমাজ, বাঙালী ধর্ম—সকল কিছুই তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মসংকট তিনি এড়াতে পারেননি, তারজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। যুগের প্রয়োজনেই তাঁর আবির্ভাব, যুগের অন্তেই তাঁর বিস্মরণ—যেটুকু রয়ে গেল তাহল বাঙালী সমাজ ও তন্ত্রধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকটি উন্মুক্ত-দৃষ্টি প্রবন্ধ। খ্যাতিমান সাংবাদিকের তুচ্ছ সাহিত্যকর্ম থাকবে না,—থাকবে শুধু আত্মোপলব্ধির স্বাক্ষরটুকু। ছোট্ট একটি পুস্তিকা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙালী সমাজ এবং ধর্ম'॥

রবীন্দ্র অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আরোগ্য—কবির জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ জন্মদিনে। তার পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ 'আরোগ্য',—প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৪৭। তেত্রিশটি কবিতার সমষ্টি 'আরোগ্য'—উৎসর্গ করেছেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করকে। আরোগ্য নামকরণ এবং সুরেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করার ইতিহাস অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবি কালিম্পঙে তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর কাছে গেলেন। প্রথমে কয়েকদিন তাঁর শরীর বেশ সুস্থ। তাঁর সুস্থ দেহে ও মনে আনন্দ সঞ্চার করছে প্রকৃতি। প্রতিমা দেবী 'নির্বাণ' গ্রন্থে বলছেন—"দিনগুলো ভরেছিল আলো বাতাসের উৎসব। বাবামশায় আকণ্ঠ পুরে পান করছেন তার আনন্দ। ২৫ সেপ্টেম্বর। সকালে উঠে দেখলুম, সমস্ত জানালা দরজা খুলে দিয়ে বসে আছেন, একটু দূরে বনমালী চায়ের আয়োজন করছে, আকাশ প্রান্তিকে উদয়াচলের খোলা দ্বার দিয়ে দেখা যাচ্ছে ধবল শিখরের উদার ঋজু দেহ, সেই অসীম স্তব্ধতার আবরণ ভেদ করে বাতায়নপথে ধ্যাননতলোচন কবির শুভ্র কেশ ও কপালের উপর এসে পড়েছে শংকরের প্রথম আলোক-আশিস, আর গায়ের উপর দিয়ে বইছে নব প্রভাতের বিশ্বব্যাপী মধুর স্পর্শ। নিচের বাগানে লেগেছে নানা রঙে ও গন্ধে মিলে লতাপাতার হুল্লোড়, কবির প্রাণ আর তাদের প্রাণ আজ এক হয়ে গেছে।" ২৫শে সেপ্টেম্বরে এক কবিতায় খুসী মনে লিখছেন

"আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।।"

২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রি থেকেই তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগলো। ডাক্তার সন্দেহ করলে য়ুরিমিয়া। প্রতিমা দেবী ও সচ্চিদানন্দ রায় ছিলেন কাছে—পরে এলেন মংপু থেকে মৈত্রেয়ী দেবী। ২৭শে দার্জিলিঙ থেকে ডাক্তার এসে বল্লেন বারো ঘন্টার মধ্যেই অপারেশন করতে হবে। প্রতিমা দেবী সংকটে পড়লেন—রবীন্দ্রনাথ শরীরকে কাটাছেঁড়ার খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। "এই মুহূর্তে বাবা মশায়ের যদি একটুও চৈতনা থাকত তাহলে তিনি কখনই অপারেশনে মত দিতেন না"—এই কথা মনে করে অপারেশন হতে দিলেন না প্রতিমা দেবী। ২৮শে সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে বহু লোক গেলেন কালিম্পঙে। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ তিন জন ডাক্তারকে নিয়ে হাজির হলেন. এ ছাড়া সুরেন কর, অনিলচন্দ, সুধাকান্ত বাবু এসে পেঁছেচেন। সেইদিনই কবিকে কলকাতায় আনার আয়োজন হলো। পরদিনই কবি এলেন কলকাতায়।

প্রায় দু মাস কবি রইলেন কলকাতায়। প্রতিমা দেবী লিখেছেন আটজন ডাক্তার নিয়ে তাঁর চিকিৎসার কমিটি হয়। "এবং সেই সঙ্গে সেবক সেবিকা সংঘও গঠিত হলো।" সকলের পক্ষে তার সেবক হওয়া সম্ভব হতো না। যে সেবক হবে "সে ব্যক্তির স্পর্শ হবে কোমল, থাকা চাই তার ঈষৎ ইঙ্গিতেই সব বুঝে নেবার মতো প্রখর কল্পনা শক্তি, এবং সে হবে সদাপ্রফুল্ল, হাতের কাজে নিপুণ, উপরন্তু রহস্যালাপের সমজদার।" যাঁরা কবির এই অসুস্থতায় সেবা করলেন তাঁরা হলেন নন্দিতা কৃপালনী, অমিতা ঠাকুর, রাণী মহলানবিশ, মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীমতী ঠাকুর, রাণী চন্দ, সুরেন কর, বিশ্বরূপ বসু, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বীরেন্দ্রমোহন সেন ইত্যাদি।

এই দুমাসে রোগের সঙ্গে লড়াই চললো। যারা সেবা করলো তাদেরও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে প্রথম মাসটা কখনো চেতন কখনো অচেতন কাটবার পর দ্বিতীয় মাসে কবি অনেক সহজ হলেন। এক মাসের মধ্যে কবিতাও লিখতে পারেন নি। ৩০শে অক্টোবর লিখলেন 'জপের মালা' (রোগশয্যা ৩) কালিম্পঙ থেকে ফিরে এই প্রথম কবিতা। দ্বিতীয় মাসে অর্থাৎ নভেম্বরে "মুখে-মুখে ছড়া তৈরী করেন, কবিতা লিখতে থাকেন সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেই সব রচনা।" এই সময়কার কবিতাগুলি স্থান পেলো রোগশয্যায়।

১৮ই নভেম্বর কবি ফিরে গেলেন শান্তিনিকেতনে। কবিতার স্রোত চললো। ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা কবিতাগুলি জায়গা পেলো 'রোগশয্যায়।' ৫ই ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রচিত অধিকাংশ কবিতা স্থান পেলো আরোগ্য কাব্যে। আসন্ন বিদায়ের কথা, অমৃতসত্য উপলব্ধির কথা, সেবক-সেবিকা ও তাদের মাধ্যমে মানুষের প্রতি অজস্র কৃতজ্ঞতা কবি জানিয়েছেন। 'আরোগ্য' গভীরতম অনুভূতির থেকে জন্ম নিয়েছে। ইতিপূর্বে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি লিখেছিলেন 'প্রান্তিক'। অচৈতন্য অবস্থায় যে অভিজ্ঞতা তাকে প্রান্তিকে ধরে দিলেন। সেখানে সুর 'আরোগ্যের' মত ব্যক্তি অনুভূতিকেই সম্বল করে নেই। গভীর দার্শনিক চিন্তার গাম্ভীর্যে তা মহিমাময়।

আরোগ্য কবিতাগুলির রচনার তারিখ ছড়িয়ে আছে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪০ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ পর্যন্ত। তিনি যে আরোগ্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সেবক সেবিকারা যে তাঁকে পরম ভালবাসার সঙ্গে সেবা করেছেন তার স্নেহস্নিগ্ধ স্বীকৃতি আরোগ্যের কবিতায় আছে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রতিমা দেবীকে এই সেবক-সেবিকাদের কথায় বলেছিলেন "মামণি আমার কাছে যাঁরা আসেন তাঁদের সময় ব্যর্থ যাবে না, আমার ক্ষমতা আছে প্রতিদানের। তাঁদের অধ্যাত্মলোকে আমার শেষ স্পর্শ রেখে যেতে পারবো।" রোগশয্যা, আরোগ্যের কবিতাগুলি সকলের অধ্যাত্মলোকেই কবির শেষ স্পর্শ হয়ে থাকলো।

আরোগ্য উৎসর্গ করেছেন রোগশয্যার সেবক সুরেন করকে। বিদায়বেদনায় ক্লান্ত পথিক যাত্রার শেষ সঙ্গীদের সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। জীবনের অনেকপথ পার হবার পর এই শেষ পথটুকু যারা আপন দীপের আলোয় উজ্জ্বল করে দিলে রোগশয্যার সেই সেবক সেবিকাদের কথা ঐ উৎসর্গের কবিতায় বলেছেন —

পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।

শেষ পথের বন্ধুদের তুলনা করেছেন রাত্রির তারার সঙ্গে —

তোমরা পথিক বন্ধু
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্তপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

আরোগ্যর ১৫নং কবিতা সেবক-সেবিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত। নিজের দেহ যেদিন জীর্ণতার দ্বারা আক্রান্ত সেদিন

সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহারা
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,
পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম নাই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।

এমনি করে কবি ঐ শেষ পথিক বন্ধুদের অধ্যাত্মলোকে স্পর্শ দিয়ে গেছেন।

১৯নং কবিতা নন্দিতা কৃপালনীকে লক্ষ্য করে। শ্রীমতী নন্দিতা মীরা দেবীর কন্যা। দাদু-নাতনী সম্পর্ক। নাতনীর হাতের সেবা কবি ধরে রেখেছেন সৃষ্টিতে।

দিদিমণি,
অফুরান সান্ত্বনার খনি
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতখানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইয়া তারে দেখি
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

২০নং কবিতা বিশ্বরূপ বসুর সেবানিষ্ঠার উদ্দেশে রচিত।

বিশুদাদা

*　　*　　*

দীর্ঘবপু দৃঢ়বাহু দুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা,
রোগক্লিষ্ট ক্লান্ত রাত্রিকালে
মূর্তিমান শক্তির জাগ্রতরূপ আনে।'

সরোজরঞ্জনের উদ্দেশে লেখা ২১ নং কবিতা ঃ—

সরোজদাদার দিকে চাই
সবতাতে রাজি দেখি কাজকর্ম যেন কিছু নাই,

*　　*　　*

দ্বিপ্রহর রাত্রিবেলা স্তিমিত আলোকে
সহসা তাহার মূর্তি পড়ে যবে চোখে
মনে ভাবি আশ্বাসের তরী বেয়ে দূত কে পাঠালে,
দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন কাটালে।

২৩নং কবিতা সাধারণভাবে নারীর সেবাস্নিগ্ধ রূপের মহিমাকে প্রকাশ করেছে। যে সেবা তাঁকে আরোগ্যের শান্তি দিয়েছে তার মহৎ পালনী শক্তির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা এইভাবে প্রকাশ পেলো। যে দুর্বল, যে শ্রীহীন যে ভ্রষ্ট, যে ভগ্ন তার প্রতি নারীর মমতার শেষ নেই

যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনামাঝে
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।

পুরানো দিনের স্মৃতি এবং বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বেশ কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। যাবার দিন যত কাছে আসছে ততই মন ভরে এই বিশ্বের সৌন্দর্য অনুভব করার চেষ্টা করেছেন।

১ নং কবিতা

উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' মন্ত্রের বাণী কবি জীবনে অনুভব করেছেন। সেইমন্ত্র সমস্ত ক্ষতি ক্ষয় ও মিথ্যাকে জয় করতে শিখিয়েছে। কবির মনে তাই গভীর বিশ্বাস যে সব দুর্যোগের আড়ালে নিত্যের জ্যোতি আছে। যে পৃথিবীর ধূলিকেও কবি

মধুময় বলে জেনেছেন সেইখানে তাঁর প্রণাম রইলো।

সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ কুলায় রাখিনু প্রণতি ।।

২নং কবিতাও পৃথিবীর আনন্দধারার কথা বলছে। প্রকৃতির আলো, আকাশ, পাখীদের গান জীবনের বিচিত্র প্রকাশকে সুন্দর করে। আলোকধৌত প্রভাতে তাই পরম সুন্দরের দেখা পেলেন। এই সব কিছুর সঙ্গে যদি প্রেম না মেলে তবে তো পূর্ণ হয় না মাধুর্য।

সব কিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির মানবের সিংহাসন।

৩নং কবিতায় পদ্মার বিগত দিনের স্মৃতি ভেসে এসেছে ছায়াকুন্ঠিত পল্লীজীবনের রহস্য কেঁপেছে মনে আর সবশেষে নিঃশব্দ বন্দনা জানিয়েছেন পরমবন্ধু সূর্যকে।

মনে পড়ে কতদিন
ভাঙা পাড়িতলে পদ্মা
কর্মহীন প্রৌঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার উদাস চিন্তা দেয় ভাসাইয়া
ফেনায় ফেনায়।

* *

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভৃত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দনা
সেই সবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মানুষ
মর্ত্যের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ।

সূর্যের জ্যোতিরূপের প্রতি অকুন্ঠ শ্রদ্ধা কবির বার বার প্রকাশ পেয়েছে। তাঁকে সূর্যোপাসক বললে অন্যায় করা হয় না। জীবনের সমাপ্তিকালে সেই আদি প্রাণকেন্দ্র সূর্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ কবি নতুন করে প্রকাশ করে বললেন।

বৈদিক মন্ত্রের বাণী কন্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।

৪নং কবিতা—ঘন্টা বাজে দূরে—একটি গভীর অনুভূতির ছবি। জীবনের আলো যখন একটু একটু করে ফুরিয়ে আসে তখন মনের চোখে ছবি ভেসে ওঠে। প্রাচীন অশত্থতলায় খেয়ার আশায় লোক বসেছে চলেছে সরু গ্রামের পথ—গ্রামীন জীবনের নানা খুঁটিনাটি একে একে মনে ভেসে আসছে। 'কিছুই সে নয়' এমনি তুচ্ছ বস্তুরা আসে ভীড় করে, কবে কোন পশ্চিমী শহরে

ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুরে।

যে সব ছবির কোন গুরুত্ব নেই যা চেতনার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে পড়েছিল সেই সব উপেক্ষিত ছবিগুলি একটি ঘন্টার ধ্বনি কেন্দ্র করে মনে এলো।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যে শুধু কল্পনা নয় তার সঙ্গে মিলেছে স্মৃতি। সেই স্মৃতির বিষণ্ণতার ছোঁওয়াই এই কবিতাগুলিকে মধুর করেছে।

৫নং কবিতা মুক্ত বাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে সমস্ত প্রকৃতি অমৃতের উৎসবে যোগ দিয়েছে কবিচিত্তও তারই সঙ্গী। সেই বিরাট অন্তহীন আনন্দ উৎসবে আনন্দজ্ঞাপনের ভাষা কবিরও নেই। কবি আনন্দে ভাষাহারা হয়ে বলেন যে তাঁর মন

বলে আমি আনন্দিত, ছন্দ যায় থামি,
বলে, ধন্য আমি।

৬নং কবিতা—অতিদূরে আকাশের—একটি ছবি ফুটে উঠেছে আকাশ, অরণ্য ও রৌদ্রকে নিয়ে। সে ছবি এখনি মুছে যাবে —

একথা রাখিনু লিখে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মুছিবার আগে।

যা ক্ষণিকের তাকে অনন্তের করে তোলার যে সাধনা কবির এতো তারই ফল।

৭নং কবিতা—হিংস্র রাত্রি আসে চুপে চুপে

অসুস্থ অবস্থায় রোগশয্যায় শায়িত ক্লান্ত কবি মনের জোর হারিয়ে ফেলেন। দুর্বল শরীরের জীর্ণতার সুযোগে সে অন্তরে প্রবেশ করে, জীবনের গৌরব হরণ করে, 'কালিমার আক্রমণে হার মানে মন।' তার পর যখন প্রভাত হয় 'সহসা দিগন্তে দেখা দেয় দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা আঁকা'

তখন রাত্রির অন্ধকার কাটে, দুঃখবিজয়ী নিজের মূর্তিকে কবি দেখতে পান। এ কবিতা রোগীর মনস্তত্ত্বের কবিতা। রাত্রির অন্ধকার তাকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। কল্পনায় ভেসে ওঠে বিভীষিকার ছবি। তারপর প্রভাত আসে, আলো আসে লোকজনের হাসি আনন্দ আসে—রোগী আবার নিজের আনন্দময় সত্তাকে তারই মধ্যে অনুভব করে।

৮নং কবিতা—একা বসে সংসারের প্রান্ত জানালায়

পথ ফুরিয়ে এসেছে—দিনান্তের পথিক পান্থশালার দ্বারে দাঁড়িয়ে শেষ তীর্থমন্দিরের চূড়া দেখছে এই চিত্রের মধ্যে কবি এই কবিতাটিকে ফুটিয়েছেন। তিনি যেন পথশেষ পথিক—এতদিনের যত চলা তার শেষ পরিণতি যেন নিকটে আসছে। সেই পূর্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার বাসনা তাই মন বলছে 'নহে দূর নহে বহু দূর।'

৯নং কবিতা—বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে

আমাদের জীবন ও এই বিরাট সৃষ্টির সম্পর্ক কবি নাট্যশালার রূপকে আরোপ করেছেন। যিনি নটরাজ তিনি এই বিশ্বের নাট্যশালার মঞ্চপরিচালনা করছেন সেই কবে থেকে। কবি তাঁকে অবিচলিত দেখেছেন—শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে

নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী

আর আমাদের মত যারা মানুষ, এমন কি সূর্য তারার মত প্রকৃতির কোলে যারা বিরাট, আমরা এসেছি ক্ষণিকের খেলায়—যাবার সময় বোঝা গেল জীবনের এই খেলাগুলির স্বরূপ।

প্রস্থানের অঙ্কে আজ এসেছি যেমনি
দীপশিখা ম্লান হয়ে এল
ছায়াতে পড়িল ধরা এ খেলার মায়ার স্বরূপ,
শ্লথ হয়ে এল ধীরে
সুখ দুঃখ নাট্যসজ্জাগুলি।

১০নং কবিতা—অলস সময়ধারা বেয়ে—

এ কবিতাটির সুর আরোগ্যের অন্যান্য কবিতাগুলির সুর থেকে আলাদা। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কথা নেই।

রোগশয্যায় শায়িত কবির চোখে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়েছে ইতিহাসের গতি। রাজনৈতিক শক্তির হানাহানিকে তিনি কখনো ইতিহাস বলে মনে করেন নি। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"ভারতবর্ষের আমরা যে ইতিহাস পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটা-কাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান মোগল পর্তুগীজ ফরাসী ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ..

তখনকার দুর্দিনেও এই কাটাকাটি খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না। সেদিনও সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।" ইতিহাসের এই ধারাকেই কবি এই কবিতায় রূপ দিয়েছেন

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল
এসেছে মোগল ....
প্রবল ইংরেজ বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।

কিন্তু এতো ক্ষণিকের-ইতিহাসে এইটাই তো বড়কথা নয়—কাল একদিন এদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু পল্লীর ঘরে ঘরে সুখদুঃখের জাল বোনা যে জীবন চলেছে তারা চলবে। রাজছত্র ভেঙেগ পড়বে, রণডঙ্কা নীরব হবে, জয়স্তম্ভ অর্থহীন হবে কিন্তু অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের, পঞ্জাব, বোম্বাই গুজরাটের ঘাটে ঘাটে নানা পথে নানা দলে দলে বিপুল জনতা ইতিহাসকে নিয়ে চলেছে - শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে —

ওরা কাজ করে

১১নং কবিতা—পলাশ আনন্দমূর্তি——

জীবনের প্রবাহ থেকে কবি দূরে সরে যাচ্ছিলেন—তার অভিমান পুঞ্জীভূত হয়েছে মনে—নিজের সম্বন্ধে বলছেন —

আমি সাথীহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ বাহিরে
শস্যহীন মরুময় তীরে।

এমন সময় দেখা দিল পলাশ—যে মানুষের অনাদৃত দিন নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে চলেছে তাকেও পলাশের অকৃপণ অভ্যর্থনা তার প্রাণ প্রাচুর্যেরই প্রমাণ। বৃদ্ধ কবি যৌবনের রঙে রঙীন পলাশকে দেখে সুন্দরের আশীর্বাদ আবার অনুভব করছেন।

১২নং কবিতা—দ্বার খোলা ছিল মনে

দুঃখ মানব জীবনকে মহৎ করে, আমাদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে দেয় এ কথা কবির বহু-দিনের কথা। অসাড় চিত্ত যখন দুঃখাঘাতে সাড়া পেয়ে জেগে ওঠে তখন কবি অনুভব করেন

ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান
লুপ্ত হোলো, নিখিলের আসনে দেখিনু নিজ

আনন্দে আনন্দময়
চিত্ত মোর করি নিল জয়।

১৩নং কবিতা—ভালবাসা এসেছিল একদিন—

নিজের জীবনের একটি পরিবর্তনকে অনুভব করে কবি এই কাব্যে তার রূপ ফুটিয়েছেন। তারুণ্যে ভালবাসা ছিল চঞ্চল—নানা রহস্যের সন্ধানে তার সৌন্দর্য যা স্থির যা শান্ত তার মধ্যে নবীন প্রাণের বিদ্রোহধারাকে প্রবাহিত করে তার জয়।

আজ সে ভালবাসা একটুও হারায়নি—আজ তার রূপ গেছে বদলে। আজ নিখিলের শান্তশ্রীতে তার মিলন —

তপস্বিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো
পূজারত অরণ্যের পুষ্পঅর্ঘ্যে তাহার মাধুরী।

১৪নং—প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর

আরোগ্যের এই কবিতাটির ভক্ত কুকুর কবির বিরাট ব্যাপ্ত সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছে। তার জৈবিক স্নেহ 'ভালো মন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে।' মানব স্বরূপে সেই ভক্ত কুকুর কী নিবিড় আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছে। এই কবিতাটিকে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর সংকলিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এটিকে প্রেমের কবিতার মর্যাদা তিনি দিয়েছেন। কারণ স্ত্রীপুরুষের দৈহিক আবেদনই তো শুধু প্রেম নয়। আত্মার নৈকট্য ও আত্মিক ঘনিষ্ঠতায় প্রেমের মূল কথা। সে নৈকট্য পশুতে মানুষেও সম্ভব।

১৫নং কবিতা—খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে—এর আলোচনা আগেই হয়েছে।

১৬নং কবিতা—দিন পরে যায় দিন—

এই কবিতাটিও বিদায়ের সুরেই বাঁধা। জীবনের যা বাকী, যা দেয়, যা প্রাপ্য সেই সবগুলিরই কথা মনে পড়ছে। মানুষের কাছে কবির কিছু অনুরোধ—

যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রবোনা আমি আর।

বিগত দিনের সঙ্গে নানা কল্পনার ও সত্যের সম্পর্কে কবি বাঁধা।

১৭নং কবিতা—যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়—

বার্দ্ধক্যে যখন দেহ মন ক্লান্ত, তার উপর রোগের আক্রমণ তখন মানুষ তার শৈশবে ফিরে যায় কামনা করে তার মার স্নেহ। কবির মনে সেই মাতৃকামনা জেগেছে শিশুর মত। যে মা শিশুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন 'থাকো তুমি'—আজ কবি সেই স্নেহময়ী মাকে পুনর্বার ফিরে পেলেন

এ বিস্ময়ে বারবার
আজি আসে প্রাণে,
প্রাণলক্ষ্মী ধরিত্রীর গভীর আহ্বানে
মা দাঁড়ায় এসে
যে মা চিরপুরাতন নূতনের বেশে।

১৮নং কবিতা—১০ই জানুয়ারী সকালের রচনা—ফসল কাটা সারা হলে—

এই কবিতায় কবির ভাবনার রঙীন দীপ্তি ঝলমল করে উঠছে। নানা মাসের ফসল তুলে তুলে শেষ মাসে এসে পৌঁচেছেন। এখন ফসল কাটা হয়ে মাঠ পড়ে আছে ফাঁকা গরীবের মেয়ে যা পায় তাই নিয়ে যায়, অনাদরের শস্য তুচ্ছ দামের শাক। সেই রকম যদি কবির শেষ জীবনে বুনো

ফলও জোটে তাতেও দুঃখ নেই। কবি বলছেন—

জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি ।।

১৯নং কবিতা ২রা জানুয়ারী রচিত—দিদিমণি অফুরান সান্ত্বনার খনি। এ কবিতার কথা আগেই বলা হয়েছে।

২০নং কবিতা—বিশুদাদা—দীর্ঘবপু—৯ই জানুয়ারী ১৯৪১-এ রচিত। ইতিপূর্বেই এর আলোচনা হয়েছে।

২১নং কবিতা— চিরদিন আছি আমি—৯ই জানুয়ারী ১৯৪১ এর কথাও আগে বলা হয়েছে

২২নং কবিতা—রোগশয্যায় অসুস্থ কবির পথ্য লেবু। তাই দেখে মনে পড়লো নির্ঝরিণী ও অরণ্যবীথির 'স্নিগ্ধ হৃদয়ের দৌত্যখানি'

২৩নং কবিতা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

২৪ নং কবিতা ২৩শে জানুয়ারী ১৯৪১ সালে লেখা ৪ টি লাইনের—যে জীবন অসুস্থ অবস্থাতেও শিল্প সৃজনের আনন্দ লাভে উৎসুক তার বিশেষ মর্যাদা নেই তবু তারই মধ্যে জীবনের কিছু পরিচয় আছে।

২৫নং কবিতা ১৯৪০ সালের ৫ই ডিসেম্বরে লেখা—

মহাশূন্যে ভ্রমণ করে নীহারিকা। তেমনি মানব হৃদয়ের বিরাট আকাশে যুগ যুগ ধরে অকথিত বাণীপুঞ্জ প্রকাশের আবেগে ভাষা খুঁজছে। ভাব আমাদের চিন্তাকাশে অস্পষ্ট ধূম-পুঞ্জের মত। সেই অস্পষ্ট ভাব মানুষের হৃদয়ে ভাষা খোঁজে। কবির মনে সেই ভাব ভাষা পেয়েছে রূপ পেয়েছে। আকার পেয়ে কবির রচনার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে।

ভাব যে সর্বসাধারণের তা যে কোন না কোন ভাবে আছেই এ কথা কবি অন্যত্র বলেছেন আর এও বলেছেন যে ভাব প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে আত্মপ্রকাশের বাণী খুঁজছে। তাঁর নিজের মধ্যেই সেই ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটলো

সে আমার মনঃ সীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা কক্ষপথে।

২৬নং কবিতা—২৩শে জানুয়ারী ১৯৪১ সালে রচিত এ-কথা সে-কথা মনে আসে।

শিল্পতত্বের একটি গূঢ় তত্বর কথা কবি এখানে বলেছেন। বাষ্পের কোন রূপ নেই, রূপ নেই স্বপ্নের; মানবসত্তার একটি আদিম উপাদান স্বপ্নের ও কল্পনার উন্দামতা। দয়াহীন দায়িত্বহীন স্বপ্ন বা কল্পনাও আর্টের বা শিল্পের উপাদান কিন্তু তারাই আর্ট নয়। সেখানে তার শাসন চাই তার বাঁধন চাই।

তাহারে দমনে রাখে ধ্রুব করে সৃষ্টির প্রণালী
কর্তৃত্ব প্রচন্ড বলশালী।
শিল্পের নৈপুণ্য এই উন্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।

২৭ নং কবিতা—বাক্যের যে ছন্দোজাল—রচনা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ বিকাল উদয়নে। ছন্দের বন্ধনে আমাদের অনেক কথা প্রকাশ পেয়েছে যা চেতনার উপরের স্তরে ছিল না। যা মনের গহনে, অবচেতনে অগোচরে ছিল এমন অনেক নাম-না-জানাকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করবার চেষ্টা

করা হলো। কিন্তু আমাদের মনের সৈকতে কিছুকাল বিস্তীর্ণ হয়ে সেই নাম-না-জানা বহুকথা ছড়িয়ে থাকলেও তারা পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত। তাদের রূপ স্পষ্ট করতে কবি বলেছেন

সাহিত্যের ভাষা মহাদ্বীপে
প্রাণহীন প্রবালের মত

তাদের দান স্তরে স্তরে জমা আছে। মনের গহনে অতিতুচ্ছ যে সব কথা ভীড় করে লুকিয়ে থাকে তাদেরও প্রকাশ আছে। তা যতই অনাদৃত হোক তার পরোক্ষ যোগ আছেই বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে।

২৮ নং কবিতাটি—মিলের চুমকি গাঁথি—২৩শে জানুয়ারী ১৯৪১ সালের সকালে উদয়নে লেখা। সৃষ্টির সঙ্গে খেলার যোগ অনেকগুলি ঘটনার ছবির উল্লেখ করে দেখিয়েছেন। নানা রূপ কল্পনা করে ঐ একটি ছোট তত্ত্বকে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

ছন্দের পাড় যদি সৃষ্টি তবে মিলের চুমকী তার খেলা। ছোট ছোট রঙীন ফুল, উচ্ছল ঝরণার সফেন জলধারা সেই খেলার প্রকাশ—তাই কবি বলেছেন

কাজের সঙ্গেই খেলা গাঁথা
ভার তাহে লঘুবয় খুশি হয় সৃষ্টির বিধাতা

২৯ নং কবিতা—আসন্নমৃত্যুর কালো যবনিকার বিভীষিকাকে অস্বীকার করে জীবনের জয় ঘোষণা করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক জীবনের কবি। মানুষের মহত্ত্ব থেকে জীবনের অমৃত সঞ্চয় করেছেন তিনি। যাবার দিনে এই কৃতজ্ঞতা তিনি জানিয়ে যাচ্ছেন।

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে
তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সকৃতজ্ঞ মনে

কবিতাটির রচনা ১৯৪১, ২৮শে জানুয়ারী। এর অল্পদিন পরে আধুনিক সভ্যতার ব্যভিচারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছেন "আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।"

শুধু নিজের মনের প্রচন্ড শক্তিতে, আন্তরিক বিশ্বাসে কবি ঐ সঙ্গেই বলেছেন- "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" আরোগ্যর প্রথম কবিতায় এই বলিষ্ঠ আশাবাদের সুর বেজেছে যেখানে তিনি বলেছেন—'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের আড়ালে।'

৩০ নং কবিতা—ধীরে সন্ধ্যা আসে—সন্ধ্যা যখন আসে দিন তার সম্পদ ঢেলে দেয় 'অন্ধকার আলোকের সাগর সঙ্গমে।' এ যেন কর্মচঞ্চলতার পরে নিজেকে জানবার এবং বোঝবার নিঃশব্দ প্রয়াস।

চক্ষু তার মুদে আসে, এসেছে সময়
গভীর ধ্যানের তলে আপনার বাহ্যপরিচয়
করিতে মগন।

কবি কি নিজেও অনুভব করেন যে জীবনের প্রান্তে সকল চঞ্চলতার অবসানে ধ্যানের সময় হয়েছে, নিজের সত্য পরিচয় জানবার। রচনা—দুপুর ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৪১।

৩১ নং কবিতা—ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়—যাবার লগ্নে কোন প্রগলভতা নয়, স্তব্ধ শান্তির আশীর্বাদ কবির প্রার্থনা। প্রকৃতির অন্তরের মধ্যে যে নিঃশব্দ শোকের আলোড়ন জাগত তার চেয়ে অন্য কোন শোক সভার সমারোহ কবির কাম্য নয়। বলেছেন

বনশ্রেণী প্রস্থানের দ্বারে
ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসম্ভারে।

এই কথাই বলেছিলেন পরিশেষের দিনাবসানে কবিতায়

আমার স্মৃতি থাক না গাঁথা
আমার গীতি মাঝে
যেখানে ঐ ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।

৩২ নং কবিতা-আলোকের অন্তরে- ৩৩ নং কবিতা—এ আজির আবরণ—
রচনা-১১ই মাঘ ১৩৪৭ সন্ধ্যা

৩২ নং কবিতায় কবি আদিম চৈতন্যের কথা বলেছেন যে চৈতন্যকেন্দ্র থেকে সকল প্রাণের জন্ম, যার যোগে আমরা অমৃতের অধিকারী তার আশীর্বাদ পেয়েছি বলেই এ প্রার্থনা আমাদের পক্ষেই সম্ভব

সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি।

চিরন্তনের যোগে আমরা অসীমের সঙ্গে যুক্ত তাই আমরা আমাদের সংকীর্ণ সত্তার আবরণ স্খলিত করে সেই মহৎ কেন্দ্রীয় চৈতন্যের যোগ অনুভব করতে চাই। মনে পড়ে পত্রপুটের ১৫ নং কবিতা—

প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোজয়ী লহরী
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।

রোগের ক্রমবিস্তারেও কবির মনে তার প্রাণের উচ্ছ্বাস এতটুকু স্তিমিত হয়নি। বাইরের জগতের নানা কুটিলতাকে নানা বীভৎস মুখবিকারকে তিনি অস্বীকার করেছেন। যা সহজ, যা সুন্দর তাকে সমস্ত জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকে অস্বীকার করেন নি জয় করার চেষ্টা করেছেন। মহৎ জীবনের মহৎ পরিণতি মৃত্যুকে নির্ভয়ে স্বীকার করা। সুদীর্ঘ জীবনে যা পেয়েছিলেন মত্যুর দিনে হঠাৎ তার সব কিছুই মায়া বলে, ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেবার ভীরুতা তাঁর ছিলনা। জীবনকে ভালবেসে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়ে যাবার সময় বার বার জীবনের জয় ঘোষণা করলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতা

A Song of joys—
O while I live to be the ruler of life, not a slave,
To meet life as a powerful conqueror,
No fumes, no ennui, no more complaints, or scornful criticisms,
To these proud lands of the air, the water and the ground proving my in terior soul impregnable,
And nothing exterior shall ever take command of me.
For not life's joys alone I sing, repeating—the joy of a death.

দ্যোতনাবাদ ও ক্রোচে

দেবব্রত চক্রবর্তী

আধুনিক কালে এক্সপ্রেশন শব্দটির অর্থ হচ্ছে সত্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দান করা কিংবা সাধারণভাবে একটি জিনিসকে অপর একটি দ্বারা ব্যক্ত করা। এই দুটি বিপ্রকৃষ্ট অথচ পরস্পর অবিরোধী বোধের ইঙ্গিত রয়েছে শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে। যা নিষ্পেষিত তা-ই দ্যোতনার বিষয় হ'তে পারে ; ভেনাসের সিক্ত কেশদাম-নিষ্পেষণের কথা বলতে ওভিড এই প্রয়োগ গ্রহণ করলেন। তিনি লিখলেন—ভেনাস "এক্সপ্রেসেস হার হেয়ার"। যখন কোনো ভাবদ্যোতক বিষয় ক্রিয়ার কর্ম হয় তখন ল্যাটিনের ব্যবহারের প্রায়ই একটা গভীর সংকেত থাকে বিষয়কে এই দ্যোতকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার, বিশেষত বিষয়ের একটি অংশকে অবকাশের মাঝে বহির্গত করবার। ক্লাসিক্যাল ল্যাটিনে ভাস্কর্য প্রসঙ্গে শব্দটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রযুক্ত হয়।

প্রজ্ঞাবান হৃদয় দ্যোতনাকে উপলব্ধি করে আপন প্রতিভায়। কিন্তু রসতাত্ত্বিক এর অনুভবের মাঝে পেয়েছেন তিনটি প্রধান উপাদান—(১) একটি ভাব, যাকে দ্যোতিত করতে হবে; (২) একটি শব্দ, যার মাধ্যমে ভাবটি দ্যোতিত হবে; এবং (৩) একজন বক্তা, যিনি এই দ্যোতনার সৃষ্টি করবেন। দ্যোতনা-সম্পাদনে এই সমস্ত উপাদানের নির্দিষ্ট সম্পর্ক ও ক্রিয়া সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। শাব্দার্থিক ইতিহাসের উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতিটি সম্ভবপর বিষয়ে ফুটে উঠেছে আধুনিক তত্ত্বের প্রতি সমর্থন। ভাবের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ককে স্যানটায়ানা ব্যাখ্যা করেছেন শুধু মিলনকামী প্রস্তাব অথবা জ্ঞানসন্বন্ধীয় অনুপ্রসঙ্গ হিসেবে। দ্যোতনা শব্দটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দান করা এবং এর প্রয়োগের বর্তমান স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের অনুগত হওয়া খুবই নিপুণতার পরিচয়। দ্যোতনা বলতে যে তাৎপর্যই প্রকাশিত হোক না কেন, এর অর্থের মাঝেই তা বিধৃত এবং আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি একটি জিনিসকে দ্যোতিত করা মানে তার স্থানে অপর একটি জিনিসের সূচনা করা। গ্রীকেরা উল্লিখিত সম্পর্কের জন্যে ইমিটেশন বা অনুকৃতি শব্দটি ব্যবহার করেছিল। এটি শুধুই অনুপ্রসঙ্গের প্রতি নির্দেশ করে না, বিশেষ ধরণের অনুরূপতাও প্রকাশ করে এবং এর দ্বারা শব্দের ওপর ভাববৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়। কিন্তু এটি সম্ভবত অনুপ্রসঙ্গ ও দ্যোতনার একীকরণের অধিকতর পূর্ণ রূপ। কারণ অনুরূপতার সার্থক সম্পাদনই অনুপ্রসঙ্গের আদর্শ এবং প্রকৃত অনুপ্রসঙ্গ সূচনা করতে চায় নিরূপিত উপাদানের স্বীকার্য প্রাসঙ্গিকতার।

একটি সাধারণ আধুনিক ধারণায় রয়েছে যে, দ্যোতনার বহিরঙ্গীকরণ ভাবের যথার্থ আধিমৌলিক পরিবর্তনকে ভাবদ্যোতক বিষয়ে জড়িত করে। মনে হয়, এই আধুনিক ধারণাটি অসংস্কৃত ও ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ একদিকে এটা খুবই সহজ যে, একটি ফুলকে 'ফুল' শব্দটি দ্বারা দ্যোতিত করা হ'ল এর অস্তিত্ব পাওয়া গেল না। আবার ধ'রে নেওয়াও অসঙ্গত যে, ফুল বলতে আমাদের মনে যে-বোধ বা আবেগের উৎপত্তি তা যদি ভাব হয় তবে তা মন থেকে শব্দে চ'লে যায়। যা ঘটে তা হচ্ছে এই যে, ধ্বনিগুলি শব্দটি তৈরী ক'রে মনের ভাবের প্রতি নির্দেশ করে এবং তার মধ্যে দিয়ে উল্লেখ করে ফুলের প্রতি কিংবা কেবলমাত্র বোধ বা আবেগের প্রতি। ধ্বনির এই অনুপ্রসঙ্গ একটি তাৎপর্য, যে-তাৎপর্য শব্দের মাঝে থাকে গঠনের উপাদন বা অঙ্গ হিসেবে। কিন্তু ফুল অথবা—যাকে আমরা বলেছি ভাব তা সম্পূর্ণ-

রূপে শব্দের বাইরে থাকে এবং শব্দের আধিমৌলিক প্রকৃতিতে এই ভাব তার থেকে সর্বাংশে স্পষ্ট।

আধুনিক তত্ত্বে এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত অপর একটি ধারণায় রয়েছে, মন থেকে ভাবের অপনয়ন দ্বারা দ্যোতনার বহিরঙ্গীকরণ সম্ভব। কিন্তু অন্তর্দর্শনের দ্বারা জানা যায় যে, কোনো একটি চিন্তা বা চিত্রের দ্যোতনার অস্তিত্ব মনের মাঝে সুপ্ত হয় না, বরং স্বাভাবিক বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করবার জন্যে তার চেতনাকে প্রখর ক'রে তুলতে পারে। প্রজ্ঞার দ্যোতনা ও আবেগ বা মননের দ্যোতনার মাঝে আমাদের প্রভেদ নির্ণয় করতে হবে, এ বিষয়টি প্রায়ই এড়িয়ে গিয়েছেন মনস্তাত্ত্বিকেরা। ক্রিয়ার অজ্ঞাত প্রবণতা হিসেবে আবেগ বা মনন দ্যোতনার দ্বারা ক্ষীণ হ'তে পারে, অপব্যয়িত হ'তে পারে। তাহ'লে এটি সম্ভবত অনুপ্রসঙ্গ-সংস্থাপনের দ্যোতনা নয়, বরং এমন একটি সক্রিয়তা যা মন থেকে অপনীত করতে পারে আবেগরঞ্জিত বা মননদীপ্ত ভাবকে। প্রজ্ঞা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল বৈষয়িক অনুপ্রসঙ্গ স্থাপন করা সহজতর আর আবেগ ও মননের ক্ষেত্রে তা বিবেচনার যোগ্য। ভাবের চাতুর্য ও জটিলতা দ্বারা যে-দ্যোতনার সম্পাদন, সার্থকতার পথে তার উত্তরণে আছে বাধা; ভাবের প্রাজ্ঞিক বা ঐষণিক প্রকৃতি দ্বারা যে-দ্যোতনার রূপায়ণ তা পূর্ণরূপে সফল। প্রজ্ঞার আনুষাঙ্গিক আবেগকে প্রজ্ঞা দ্বারা দ্যোতিত করা সত্ত্বেও মনে হয় প্রজ্ঞাকে অবিকৃত রেখে মনের আবেগরঞ্জিত-মননদীপ্ত অবিন্যাসকে বিশীর্ণ করা সম্ভব। সুতরাং পূর্ণ দ্যোতনা তৃপ্ত মনের যথার্থ নির্মলতা হ'তে পারে; তৃপ্ত এজন্যে যে, মনে হয় এখানে ক্ষণিক ও চঞ্চল ঐষণিক গতিবাদ রূপান্তরিত হয় স্থায়ী ও চিরকালীন বৈষয়িক বাস্তবতায়। যদিও বক্তা দ্যোতনার মাঝে নির্মলতার আবেগ-নিহিত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তবু এটা সাধারণ ধারণাকে নির্বিঘ্ন করতে পারেনা যে, যখন অভিজ্ঞতার মাঝে থাকে এই আবেগের কোমল স্পর্শ অর্থাৎ মন থেকে ভাবের সহজ বিযুক্তির জন্যে যখন উত্তেজক কোনো কিছুর উপস্থিতি অনুভূত হয় না, তখনই দ্যোতনা সুসম্পন্নতা লাভ করে।

কিন্তু বহিরঙ্গীকরণ হচ্ছে আপেক্ষিক। ভাবকে বহিরঙ্গীকরণে সক্ষম বাহ্য ভাবদ্যোতক মনের মাঝে সমগ্ররূপে বা প্রাথমিকরূপে অবস্থানকারী হিসেবে কল্পিত হ'তে পারে। এক্সপ্রেস শব্দটি মধ্যযুগীয় প্রয়োগে এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রতি নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হ'ত যার দ্বারা মন তার ধারণা ও চিত্রকে বিকাশ করে। মনের দ্বারা বিকশিত এই সব ধারণাকে ও চিত্রকে বলা হয় 'স্পেসিজ্ এক্সপ্রেসী'। আর বোধের দ্বারা যা উপস্থাপিত হয় তাকে বলে 'স্পেসিজ্ ইম্প্রেসী'। ক্রোচে এক্সপ্রেস শব্দটির মধ্যযুগীয় প্রয়োগকে অনুসরণ করেছেন। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় আত্মাববোধের, ফলে মন তার অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতাকে নিজের মধ্যে দ্যোতিত করতে পারে। ক্রোচের তত্ত্বে রয়েছে, একটি ভাব ও একটি ভাবদ্যোতকের সমাবেশেই গ'ড়ে ওঠে দ্যোতনা এবং ভাবের অস্তিত্ব তার অনুসারী ভাবদ্যোতকের অস্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

দ্যোতনা সকল সময়ে বিবেচিত হয়েছে শিল্পকৃতির দ্যোতকতারূপে। ক্লাসিক্যাল কাব্যতত্ত্বে দ্যোতকতার স্থান গঠনশৈলীর তুলনায় সাধারণত গৌণ; বোধ বা আবেগের দ্যোতনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ও রীতির তাৎপর্য গঠনশৈলী দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব। এই গঠনশৈলীই হচ্ছে ভাবদ্যোতক। যে-অনুপ্রসঙ্গ বিষয়ের অঙ্গবিন্যাসের মাঝে পরিলিখিত নয় তাকে যথার্থ অনুপ্রসঙ্গ ব'লে দাবী করা যায় না। দ্যোতকতা ও গঠনশৈলীর সমস্যা নিঃসন্দেহে আধুনিক নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান সমস্যা। লেসিঙের 'ল্যাওকুনে' অবশ্য এর স্বীকৃতি নেই। লেসিঙের পর য়ুরোপীয় তত্ত্ব, বিশেষ ক'রে জার্মান তত্ত্ব এমন একট পর্যায়ে উপনীত হ'ল যেখানে থেকে সুকুমার শিল্প অবলোকিত হয় বিষয়ের প্রাথমিক নির্মিতিরূপে নয়, বোধের দ্যোতনা-

রূপে; এবং তখনই সে গুরুত্ব আরোপ করল দ্যোতকতার ওপর। উনিশ শতকে সুকুমার শিল্পের এই ধারণা সমগ্র য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ শতকে যদিও এর অনেক সমালোচনা করা হয়েছে তবু আমাদের অবচেতন মনে নন্দনতত্ত্বের এই পূর্ব-সংস্কার এখনও দৃঢ়মূল। এর রীতিসঙ্গত প্রধান সমর্থক হচ্ছেন বেনেদেত্তো ক্রোচে ; তাঁর তত্ত্বের গোড়ার কথা হ'ল দ্যোতনা ও সুকুমার শিল্প সম্পূর্ণরূপে সদৃশ, অর্থাৎ সকল সুকুমার শিল্পই দ্যোতনা এবং সকল দ্যোতনাই সুকুমার শিল্প।

য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সাহিত্য বীক্ষায় ধারণা ছিল, শিল্প হচ্ছে কারুকলানন্দিত অনুকৃতি; পরবর্তী কালে এক নোতুন ধারণায় শিল্প প্রতিভাত হ'ল আঙ্গিক সৃজনরূপে। রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের গতি এই নোতুন ধারণার দিকে। কোলরিজ, শেলী ও আরও অনেক কবির পরিপোষিত সৃজনী কল্পনার ধারণা এবং এক শতাব্দী পরে ক্রোচের সযত্নসম্পাদিত নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা অনন্য। আধুনিক লেখকেরা ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের অংশবিশেষ গ্রহণ ক'রে আপন রচনায় প্রয়োগ করেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ক্রোচে নিষ্পন্ন করেছেন দ্যোতনাবাদী শিল্পতত্ত্বের সংজ্ঞা ও সংশ্লেষণ যাকে দৃষ্টিসীমায় প্রথম নিয়ে এসেছিলেন কোলরিজ ও জার্মানরা এবং যা শোধিত ও উন্নমিত হয়েছে উনিশ শতকের বিবর্তনের মাঝে। বদলেয়ারের তথাকথিত অসুন্দরপ্রীতি, হুইস্‌লারের বহুদর্শিতা এবং ওয়াইল্ডের অতিকথনের মাঝে যে-দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত রয়েছে তার কোনো পরিচয় নেই ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে। তবু তা নিঃসংশয়ে নন্দনতত্ত্ব, 'আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক'-এর পরম সত্যসন্ধান।

উনিশ শতকে নীতিমূলক তত্ত্বের প্রতি অন্তর্নিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিন্তা নিয়ে ক্রোচের তত্ত্ব গ'ড়ে উঠেছে মৌলিক মনন থেকে এবং এই নীতিমূলক তত্ত্ব ও আর্ট ফর আর্ট্‌স সেক-এর মাঝে যে-বিরোধ রয়েছে ক্রোচের তত্ত্ব তারই আংশিক সমাধান। হেগেলের ভাববাদে স্বীকৃত হয়েছিল জগৎ বা নিসর্গ যার সঙ্গে মানসের সংযোগ যুক্তিসিদ্ধ রীতিতে। মার্ক্সীয় দর্শন একে অবনমিত করেছে জড় প্রকৃতির-সম্পূর্ণ একত্ববাদী ক্রিয়ায়। ক্রোচে অধ্যাত্মসীমায় প্রবেশ ক'রে সাহিত্যিক নিরীক্ষায় শিল্পের ভঙ্গিমা ও ক্লাসিক্যাল নীতির বিশ্লেষণ করেছেন এবং উপনীত হয়েছেন পদার্থের একত্ববাদে নয়, মানসের একত্ববাদে। ক্লাসিক্যাল ভঙ্গিমার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রকৃতি হচ্ছে মানবিক মানসের পরিণতি এবং তা শিল্পের যথার্থ আত্মিক জগতের মাঝে অন্তর্নিহিত। শিল্পে প্রকৃতির বাস্তবতারূপে নয়, তন্মন চিন্তার পরিণতিরূপে। ক্রোচের দর্শনে মানসই পরম বাস্তবতা। মানস সৃষ্টি করে অনুভূতির বিষয়। এ কথা সত্যি, অনুভূতির কয়েকটি বিষয় চিন্তাপ্রসূত ভাবের দ্বারা জ্ঞানী মানসের কোনো বহিরঙ্গের বৈশিষ্ট্য কল্পনা করে এবং মানসের অধিকতর ক্রিয়া সম্পাদনের উপায় হিসেবে পরিচিত হয় পরস্পর বহিরঙ্গ আত্মিক কার্যকারক ও অব্যবহিত চেতনার কাছে। তবে এ কথা সহজেই বলা যায়, ক্রোচের নব-ভাববাদ তার আবর্তনের জটিলতার প্রতি অনুরাগী নয়। এই সব জটিলতা হচ্ছে তন্মগত চিন্তাজাত সমস্যা, সুতরাং তারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ, অত্যাবশ্যক ও স্বজ্ঞাত বোধের মাঝে অন্তর্গূঢ়।

মানসের বিভিন্ন সক্রিয়তায় চার রকমের বাস্তবতা আছে, দুটি তত্ত্বগত ও দুটি ব্যবহারিক। (১) স্বজ্ঞা দ্যোতনা, এখানে রয়েছে স্বতন্ত্র গঠনের প্রাথমিক কল্পনাত্মক ক্রিয়া; (২) মনের মাঝে সমগ্র জগতের উপলব্ধি, এখানে স্বতন্ত্র স্বজ্ঞার পারস্পরিক সম্পর্কের প্রাজ্ঞিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিহিত রয়েছে; (৩) প্রধান এষণা, এখানে লাভ করা যায় সতর্ক সক্রিয়তার পরিচয়; এবং (৪) যৌক্তিকতা ও বিশ্বজনীনতার অনুধাবিত পরিসমাপ্তির এষণা, আত্মার

অন্তর-সম্মতি, এখানে আছে নৈতিক সক্রিয়তা, পরম মুক্তি। এই চারটি পরম সত্যের মাঝে রয়েছে গুণগত ও অবরোহগত প্রভেদ। এরা প্লেটোর অতিসংবেদী আদর্শ, অ্যারিস্টটলের বিন্যাসরীতি ও কান্টের অলৌকিক প্রতীতির মতো পরম সত্যের স্থান গ্রহণ করে। শুধু এই চারটি সত্যই বিমূর্ত, পরম, প্রত্যয়িত, যুক্তিসিদ্ধ নিপুণতার অধিকারী। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার সীমাহীন জগতে অন্য সব ধারণাকে পৃথক করা হয় মাত্রিকতা, কাল-স্বল্পতা, ব্যবহার ও রুচির দিক থেকে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দর্শন বা ঐতিহাসিক সত্যই যথার্থ। আত্মার চারটি প্রধান তৎপরতানুসারী চারটি বিজ্ঞান হচ্ছে—নন্দনতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র।

সুতরাং নন্দনতাত্ত্বিক আলোকসম্পাত করেন স্বজ্ঞা-দ্যোতনার ওপর। উন্নত স্তরে এর সংগে তন্ময় ধারণা সংযুক্ত, আর অবনত স্তরে এটি নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মার অজ্ঞাত অংশের দ্বারা, অচেতন অবচেতন বা এমন কিছুর দ্বারা ক্রোচে যাকে বলেছেন বোধ, সংবেদন বা বিষয়। এটি অবস্থায়ী বিষয় নয়, বরং স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়রূপে এর গুরুত্ব বেশি। এটি আত্মিক সক্রিয়তা নয়, বরং অভিনব নিষ্ক্রিয়তা, কোনো কিছু সম্পাদনের অবগতির ও সৃজনের আবেগ। স্বজ্ঞা-দ্যোতনা একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, এটি এমন একটি রূপ যা অন্তর্নিহিত বিষয়ের দিক থেকে সবসময় পৃথক। সুতরাং নন্দনতাত্ত্বিক সত্য হচ্ছে রূপ, এ ছাড়া অন্য কিছু নন। বহিরংগ সৌন্দর্যের অধ্যাস, কলাকুশল উপস্থাপন বা প্রতিকল্প হিসেবে শিল্পের সকল ধারণাই এই রীতি থেকে বিযুক্ত এবং এর মতে বহিরংগ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বা শৈল্পিক সৌন্দর্যের ধারণা হচ্ছে একটি বাচনিক বিরোধাভাস। প্রাকৃতিক জগতের অস্তিত্ব শুধু প্রতীতি ও অতীন্দ্রিয়তার স্তরে। এই রীতির প্রথম ও প্রধান কথা হল স্বজ্ঞা-দ্যোতনায় রয়েছে স্বজ্ঞা ও দ্যোতনা উভয়ই, এবং দ্যোতনা ছাড়া স্বজ্ঞা সার্থক নয়। পরিচিত জিনিসকে সহজেই দ্যোতিত করা যায় কোনো একটি রূপে। আমাদের কাছে যা পরিজ্ঞাত তাকে দ্যোতিত করি ভাষায়, চিত্রে, প্রতিমায়, সংগীতে অথবা অন্য কোনো উপায়ে। এ সবের মাঝেও যার দ্যোতনা সম্ভব নয় তা আমাদের জানার বাইরে।

কিন্তু এই স্বীকৃতির ওপর ক্রোচে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেননি। তিনি বলেছেন, কথা-চিত্র-সংগীত হচ্ছে বহিরংগীকরণের মাধ্যম, নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে এর প্রয়োজন অত্যল্প। বহিরংগীকরণ শুধুমাত্র ব্যবহারিক বা ঈপ্সিত সক্রিয়তা যা স্বজ্ঞা-দ্যোতনার স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তর সক্রিয়তাকে অনুসরণ করতে পারে অথবা নাও করতে পারে। প্রতিমা, চিত্রণ, মৌখিক ধ্বনি প্রভৃতি শিল্পকৃতি হচ্ছে বহিরংগ মনোভাব; এরা গুণান্বিত রস-জ্ঞের জন্যে সেই স্বজ্ঞা দ্যোতনাই সৃষ্টি করবে যার দ্বারা শিল্পী বহিরংগীকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। শৈল্পিক কলাকুশলতা শিল্পীর বহিরংগীকরণের ঐষণিক তৎপরতায় পূর্বজ্ঞানের সংকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্যোতনার নিজস্ব কোনো রীতি নেই। যতক্ষণ এর মাঝে রয়েছে নন্দনতাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা ততক্ষণ এটি সত্যিই নোতুন শিল্পকৃতি। যেমন—নোতুন ধরণের রোমান্স, চিত্রণে আলোছায়ার নোতুন রীতি। এই কলাকুশলতা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিমার অংশ। কাগজে না লিখে বা কারও কাছে না বলে আমরা কোনো কবিতাকে হয়তো মনের মাঝে ধরে রাখতে পারি, নীরব চিন্তায় কবিতার মতো অলক্ষ্য অথচ অনুভবগম্য জিনিসের অবস্থান হয়তো সম্ভব, কিন্তু চিত্রের উপস্থিতি সম্ভব নয়। কারণ পটের ওপর তুলি দিয়ে রঙ রূপ অংকন করা মানেই চিত্র সৃষ্টি করা। যা দৃষ্টি বহির্ভূত তাকে তো চিত্র বলে স্বীকার করা যায় না। ক্রোচে বলছেন, নন্দনরস সঞ্চার করতে হলে কবিতাকেও প্রকাশ করতে হবে পাঠকের বা শ্রোতার সম্মুখে। সুতরাং সে দিক থেকে কবিতা-রচনা ও চিত্রাংকনের মাঝে

কোনো প্রভেদই নেই। উভয়েরই সাধারণ ধর্ম হচ্ছে দ্যোতনা। ক্রোচের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে আমরা বলব, কোনো রকম প্রতীকের মাঝে আমরা যাকে দ্যোতিত করতে পারি না কারও কাছে তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব এবং সে সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা আমাদের চিন্তার কাছেই হয়ে যাবে বিকৃত, অস্পষ্ট ও ব্যর্থ। প্রতীক হচ্ছে দ্যোতনার মহৎ অংশ।

গভীর দৃষ্টিতেও যারা পরস্পর পৃথক বলে প্রতীত হয়েছে তাদের মাঝে নিঃসন্দিগ্ধ অনুরূপতার উদ্ভাবনের দিকে রয়েছে ক্রোচের পদ্ধতির বিশিষ্ট প্রবণতা। ইটালীয় সমালোচক গিওভ্যানি প্যাপনি লিখেছেন, ক্রোচের সমগ্র নন্দনতাত্ত্বিক বিন্যাসে শিল্প শব্দটির বিভিন্ন কল্পিত নাম-সংকলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়; অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যেতে পারে স্বজ্ঞা, দ্যোতনা, প্রকল্পনা, বিকল্পনা, সৌন্দর্য ইত্যাদি সব কিছুকেই তিনি শিল্প বলে গ্রহণ করেছেন এবং সাধারণ ভাষায় বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই সব শব্দের যে অর্থগত ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেছেন। সমতার এই বহুব্যাপক তত্ত্বের প্রতিরূপকে উভয়-বলতার সূক্ষ্ম ও দৃঢ় তত্ত্ব হিসেবে বর্ণনা করা যায়। এদিক থেকে ক্রোচের নন্দনতত্ত্ব শিল্প-সৌন্দর্যের অন্যান্য মৌলিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমগোত্রীয় এবং তা স্পষ্টরূপে আকৃতি ও সত্তার মূল কারণের সঙ্গে সৌন্দর্যের একীকরণের নিও-প্লেটোনিক তত্ত্বেরই অনুরূপ। এরকম রীতিতে যাকে শিল্পের বিশেষ দর্শনরূপে। গ্রহণ করবার চেষ্টা করা যায় তা প্রকাশিত হয় সকল সত্তার বা সকল জ্ঞানের দর্শনরূপে। প্লটিনাসের মতে, একখণ্ড পাথরের আকৃতি আপনার মাঝেই সুন্দর, কিন্তু পাথরের ওপর নিপুণভাবে খোদাই করা একটি প্রতিরূপ আকৃতির বিশেষ ভাবের ওপর আলোকসম্পাত করে। প্লটিনাসের আতীন্দ্রিয়ক তাৎক্ষণিকতার অবমাননা সত্ত্বেও ক্রোচের নব-ভাববাদ ব্যাপক অর্থে প্লটিনাসের বিপর্যস্ত ভাববাদ থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়। সীমাতীত প্রজ্ঞা অন্তরিত হয় এবং এভাবে সব কিছুই প্রতিভাত হয় বিপরীত রূপে। সকল নিপুণতা ও বিশেষ নিপুণতার মৌলিক ক্রিয়া হিসেবে ক্রোচের স্বজ্ঞাদ্যোতনার প্রতীতি সাদৃশ্যের দিক থেকে প্লটিনাসের তত্ত্বের অন্তর্গত পাথরের দুটি আকৃতির ধারণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ঐ বিশেষ নিপুণতাকে বলা যায় শিল্প। ক্রোচের প্রণালীতে ইতিহাস ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সংঘটনা ও সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য। কিন্তু শিল্পের নিজস্ব সাধারণ সীমায় অধিকতর প্রভেদ রয়েছে; ইতিহাসের অর্থে নয়, বিদ্যমানতার অর্থে যা শুধুই শিল্প এবং সর্বোত্তম শিল্পের অর্থে যা শিল্প—উভয়ের মাঝে সে প্রভেদ স্থিতিশীল। প্রতিদিনের পত্রলেখার শিল্প এবং অত্যুৎকৃষ্ট রচনার শিল্পের মাঝে তারই পরিচয় নিহিত; এটি শুধুই মাত্রা-সম্পর্কিত এবং অভিজ্ঞালব্ধ এমন কিছু যার সঙ্গে দর্শনের কোনো বিরোধ নেই। এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের গদ্যও আপন স্বরূপ দ্যোতনার প্রয়াসী। ক্রোচের মতে, শৈল্পিক স্বজ্ঞা সাধারণ স্বজ্ঞা থেকে গভীরতার ভিত্তিতে পৃথক নয়, ব্যাপকতার ভিত্তিতে পৃথক। অনলংকৃত জনপ্রিয় প্রেম-সঙ্গীতের স্বজ্ঞা তার সৌন্দর্যহীন প্রাঞ্জলতায় গভীরভাবে সম্পূর্ণ, কিন্তু তা লিওপার্ডির প্রেমসঙ্গীতের জটিল স্বজ্ঞার চেয়ে অনেক বেশী সীমায়িত। সুতরাং সমগ্র পার্থক্যই মাত্রাসম্পর্কিত, সেজন্য দর্শনের সঙ্গে ঐক্যবিশিষ্ট, কারণ দর্শন হচ্ছে গুণসংসৃষ্ট বিজ্ঞান। যাদের হীনভাবে বলা হয় বিশিল্প তাদের বিপরীতে যাদের শিল্প বলা হয় সেই স্বজ্ঞা-দ্যোতনার সীমা হচ্ছে অভিজ্ঞালব্ধ এবং তার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত উক্তি যদি শিল্প হয়, একটি সরল শব্দ কেন হবে না? গল্পকে যদি শিল্প বলে থাকি, সাংবাদিকের সংবাদ-বিচিত্রাকে কেন সে মর্যাদাভূষণ থেকে দূরে রাখবে? এর উত্তর আমরা আশা করি, ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের কাছে, যা প্রকৃতপক্ষে শিল্পের

দর্শন নয়, বরং সকল স্বজ্ঞাত জ্ঞানের দর্শন। কিন্তু ক্রোচে স্পষ্টভাবে এই সত্যকে কখনো গ্রহণ করেননি, এমন কি এর সম্মুখীনও হন নি। শুধু পদসমষ্টির নিশ্চিত তুলনা দ্বারা এর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'তে পারে। ক্রোচের নন্দনতত্ত্বের স্থির উন্মুখতার ও আলংকারিক উদ্দেশ্যের মাঝে আভাসিত হয় যে, স্বজ্ঞা-দ্যোতনার আধ্যাত্মিক ক্রিয়া হচ্ছে বস্তুত শিল্পতত্ত্বের কেন্দ্রিয় এবং অপেক্ষিত প্রত্যয়। এর লক্ষ্য রয়েছে স্বজ্ঞা-দ্যোতনার সম্পাদনে পূর্ণতা, পরিসমাপ্তি ও সাফল্যের দিকে। সংসিক্ত দ্বারা শিল্পকৃতি সম্ভব। আমাদের স্বজ্ঞাত ক্ষমতায় আমরা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করি নিষ্ক্রিয় সংবেদনের জটিলতাকে, অবিনীত বোধের বিশৃঙ্খলাকে পরিহার ক'রে তাকে বিষয়াকারে পরিণত করতে এবং স্বচ্ছ আত্মিক জ্ঞানে তাকে গ'ড়ে তুলতে। যখন আমরা সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করি কেবলমাত্র তখনই সৌন্দর্য আবির্ভূত হয়। সুতরাং সৌন্দর্য হচ্ছে পরম, রীতি-গত, একক, সুসম্পন্ন, এবং এদিক থেকে স্বাজ্ঞিক রীতির অভাবই সূচনা করে নন্দনরসবিরোধী সত্যের। অসুন্দরের সাধনা শিল্পের সংসক্তিকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। বহিরঙ্গ জগতে অব-স্থায়ী কোনো সৌন্দর্যকেই যেমন শিল্প অনুকরণ করে না, তেমনি যাকে অসুন্দর বলে তাকেও সে আপন নৈপুণ্য চেতনার বাইরে রাখে। সর্বক্ষেত্রে অমঙ্গল ও অসুন্দরকে অন্তর্ভূত করবার দিকে অথবা তার ওপর কেন্দ্র ক'রে আপনাকে প্রসারিত করবার দিকে বিশ শতকের শিল্পকলার যে-তীব্র প্রবণতা রয়েছে তা বহুব্যাপী দ্যোতনাবাদী নন্দনতত্ত্বের অনুবন্ধ। ক্রোচের মতে, অসুন্দর হচ্ছে স্বজ্ঞাত সক্রিয়তার জড়িতাবস্থা; এটি জ্ঞান ও বাস্তবের বাহুল্য এবং ব্যর্থতা। সৌন্দর্যের কোনো উপাদান ছাড়া অসুন্দর যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তবে তার পূর্ণ রূপের জন্যেই তাকে আর অসুন্দর বলা যাবে না, কারণ তখন তার মাঝে কোনো অসঙ্গতি নেই, কোনো বিরোধ নেই। অসফল শিল্পকৃতিতে নৈপুণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য অনুপস্থিত।

সফল স্বজ্ঞার ভাবে দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, আংশিকভাবে উপলব্ধ প্রতীতির বিশৃঙ্খলায় আপনাকে প্রাঞ্জল করবার জন্য কোনো স্বজ্ঞার উদ্যম; আর দ্বিতীয়টি, অনলংকৃত রূপের ঊর্ধ্বে সকল উৎকর্ষে জটিল ও সমৃদ্ধি শিল্পস্বজ্ঞার সম্পাদন। এ দুটি ধারণা সবসময় সম্মেলিত। অবনত স্তরে রয়েছে সংবেদন, যা নিজের মাঝে আত্মাকে সহজ বিষয়রূপে কখনও উপলব্ধি করতে পারে না। আমাদের অস্মিতার মধ্যে দিয়ে যে-প্রবাহ ব'য়ে চলেছে তাকে স্পষ্ট-ভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে আমরা কতবার চেষ্টা করি; তার অংশমাত্র আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণিক আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তা মনের কাছে বিষয়ীকৃত ও মূর্তরূপে প্রকাশিত হয় না। স্বজ্ঞাতভাবে আমরা জগতের সামান্যই জানি, এবং তার অকিঞ্চিৎকর উপকরণ দ্যোত-নার অন্তর্ভূত; কোনো মুহূর্তের উন্নত আত্মিক অভিনিবিষ্টতার সঙ্গে এই দ্যোতনা হয় মহৎ ও ব্যাপক। যখন বলি, নীল আকাশ আমাকে আনন্দ দেয়, তখন বুঝতে হবে এটি বর্ণাবলীর আকস্মিক সমারোহ দ্বারা দ্যোতিত না হ'য়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল না হ'য়ে শুধু আলোক ও বর্ণের সমন্বয়রূপে প্রতিভাত, যার কোনো মহৎ চিত্রগত মূল্য নেই। আমাদের সাধারণ জীবনে এটাই সত্য, আমাদের সাধারণ ক্রিয়ার এটাই ভিত্তিভূমি। বিভিন্ন সময়ে আমরা যেমন প্রবেশ করি সূচীপত্র থেকে গ্রন্থে, শিরোনাম থেকে বিষয়ে, তেমনি উত্তীর্ণ হই লঘু স্বজ্ঞা থেকে গভীর স্বজ্ঞায়, ক্রমান্বয়ে তার অতলান্তে। যাঁরা শিল্পীর মনোবিজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের নিরীক্ষায় ব্যক্ত হয়েছে যে, কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র শিল্পী তার প্রকৃত স্বজ্ঞাকে লাভ করবার চেষ্টা করেন অর্থাৎ তার চিত্রাঙ্কনের প্রয়াসী হন; তখন যে-সাধারণ দৃষ্টিকে এত বেশি নিশ্চিত এবং সজীব ব'লে মনে হয়েছিল তা উদ্ঘাটিত হয় অনতি-অলংকৃত সৌন্দর্যে। এটাও নিরীক্ষিত হয়েছে যে, স্বজ্ঞা-দ্যোতনার যথার্থ ক্রিয়ার নীতিগত পরম গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে স্থানা-

স্তারিত হয় এক বিশেষ রকমের স্বজ্ঞা-দ্যোতনায়, যা মহৎ ও ব্যাপক। গ্রন্থের সূচীপত্র, বিষয়ের শিরোনাম বললে আমাদের মনে যে-ধারণা গ'ড়ে ওঠে, সাধারণ লঘু স্বজ্ঞার ধারণা তারই সমান্তরাল। মহৎ ও ব্যাপক স্বজ্ঞাকে বলা হয় প্রকৃত স্বজ্ঞা, এবং সাধারণ দৃষ্টি থাকে অনতি-অলংকৃত সৌন্দর্যের স্তরে অর্থাৎ সংবেদনের বা ভাবের স্তরে। ক্রোচে অন্যত্র বলেছেন, যে-কোনো প্রকারের স্বজ্ঞারই নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে। অসভ্য জাতির শিল্প যদি তার আপন ধ্যান-ধারণা-ঐতিহ্যে সংলিপ্ত হয় তবু তা শিল্প হিসেবে সভ্য মানুষের শিল্পের তুলনায় কখনোই নিকৃষ্টতর ব'লে বিবেচিত হবে না। স্বতন্ত্র জাতির আত্মিক জীবনের প্রতিটি উদ্দেশ্যেরই স্বকীয় শৈল্পিক জগৎ রয়েছে, শিল্পগত মূল্যের ভিত্তিতে এদের মাঝে তুলনা হ'তে পারে না।

আকৃতির দ্বৈত ভাব ক্রোচের তত্ত্বে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। শিল্পের স্বজ্ঞা-দ্যোতনার বিশদ ব্যাখ্যানের সময় তিনি ব্যবহার করেন এক শ্রেণীর প্রাত্যয়িক ভাষা, যার মাঝে রয়েছে তাঁর আপন চিন্তায় গ'ড়ে তোলা আকৃতি—শৈলী, বিন্যাস-ভঙ্গি ও নোতুন শব্দশৃঙ্খলা। তিনি বলেছেন, এই সব উপকরণ নোতুন কবিতায় রচনারীতি হিসেবে গৃহীত হবে না, কিন্তু তারা কোনো ধারণার স্পষ্ট রূপদান সক্ষম হবে। ট্র্যাজিডি-রচয়িতা বহুবিধ ধারণা সংকলিত করেন; সকল দ্যোতনার মিলনে একটি নোতুন সৌন্দর্য মূর্ত হ'য়ে ওঠে। প্রাচীন দ্যোতনাগুলি একটিমাত্র নোতুন দ্যোতনায় সংশ্লেষিত হবার জন্যে ধারণার স্তরে পুনরায় অবনমিত হয়। দ্বিতীয় আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিমূর্তিতে, আকারহীন ধাতুখণ্ডে যা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। কিন্তু ক্রোচে তাঁর তত্ত্ব-উদ্ঘাটনে বলেছেন, ঐ সব ধাতুখণ্ডেরও একটি আকৃতি আছে, তা হচ্ছে সরলতর স্বজ্ঞা-দ্যোতনা। তাদের সম্বন্ধে জানবার এটাই প্রকৃত রীতি।

ক্রোচের তত্ত্ব এক অর্থে সকল আধুনিক শিল্পতত্ত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগভীর। তিনি আবেগসম্পর্কিত শিল্পতত্ত্বকে অস্বীকার ক'রে জ্ঞান ও মননে আত্মিক সক্রিয়ভাবে প্রাঞ্জলতা ও স্বকীয়তা দ্বারা দুটি মৌলিক বিভাগে বিন্যস্ত করেছেন, একটি আনন্দবাদী, অপরটি সহানু-ভাবী। তবু আবেগসম্পর্কিত উপাদান সবসময় তাঁর চিন্তায় অনুবর্তিত হয়েছে এবং এটি তাঁর নন্দনতত্ত্বের পরবর্তী রচনায় ও আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিল্পকৃতির মাঝে কোনো মর্মগ্রাহী ব্যক্তি যে নন্দনরসনিষিক্ত জ্ঞানলাভের পরিবর্তে অনুভব করেন নন্দনরস-নিবিড়-আনন্দ—এই সত্যটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ক্রোচে তাঁর নন্দনতত্ত্বে বলেছেন, চারটি মূলগত আত্মিক সক্রিয়তার প্রত্যেকটি হচ্ছে জ্ঞানবিমুখ প্রকৃতির বিশেষ সক্রিয়তার অনুষঙ্গী, এর এক প্রান্তে আনন্দ, অপর প্রান্তে বেদনা। নন্দনরসনিবিড় আনন্দ হচ্ছে আমাদের স্বজ্ঞা-দ্যোত-নায় সফল ক্রিয়াবলীর সহগামী আনন্দের অনুভূতি। কিন্তু আমরা পরিস্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, চারটি প্রধান আত্মিক সক্রিয়তার প্রত্যেকটি অনুভূতি-নামক এই বিশেষ ঐষণিক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শুধু জ্ঞানের সক্রিয়তারই নয়, এষণার সক্রিয়তারও ঐষণিক আনন্দ-বেদ-নার সংশ্লেষ রয়েছে। বিজ্ঞানী শুধু তার আবিষ্ক্রিয়ার জন্যেই আনন্দলাভ করেন না, ঐ আবি-ষ্ক্রিয়ার পেছনে তাঁর ইচ্ছার যে-সফলতা রয়েছে তার জন্য অধিকতর আনন্দিত হন। জ্ঞানের স্বচ্ছতা এষণার দুটি নোতুন অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এটি সম্ভবত ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের জ্ঞানোদ্যম ও সাধারণ মূল্যতত্ত্বের দৃঢ় আবেগবাদের পারস্পরিক সংঘাতকে ব্যক্ত করে; মূল্য বিচার ইচ্ছা-বৃত্তির অনুসারী এবং তা অভিজ্ঞাত ইচ্ছার দ্যোতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা নন্দনধর্মের ক্রিয়া থেকে অনুভূতিকে পৃথক করি এই ব'লে যে, যদিও এটি ক্রিয়ার অনুষঙ্গী তবু ক্রিয়ার বিশেষত্বের ওপর এর কোনো প্রভাব নেই। অন্যভাবে বলা যায়, ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে আবেগসম্পর্কিত দ্বিবিধতা হচ্ছে নন্দনবৃত্তির থেকে সতর্ক ও নৈতিক অনুভূতির

মতো ব্যবহারিক সক্রিয়তার স্বতন্ত্রীকরণের নিদর্শন। মনে হয়, এই দুরূহতাকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা কখনও সম্ভব হয়নি। সাহিত্যের পরবর্তী মনোবিজ্ঞান-তত্ত্বের মৌলিক বা কাল্পনিক প্রতিবেদনে কিংবা পূর্বতন অধ্যাত্মবিদ্যার প্রকৃত ধ্যানগম্ভীর আনন্দের অনুরূপ জড়তা থাকতে পারে। তবু ক্রোচের নিবিড় চিন্তার এই দিক নোতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নিপুণভাবে আলোকিত নয়। নন্দনতত্ত্বে তিনি লেখকের বা শ্রোতৃমণ্ডলীর নৈতিক সক্রিয়তার আলোচনা থেকে বিরত হ'য়ে অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। যখন থেকে এরকম ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে, যিনি মহৎ অনুভূতিগুলিকে দ্যোতিত করেন তিনি ব্যক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই মহৎ ও উদারপ্রকৃতি কিংবা যে-নাট্যকারের নাটক হত্যার ঘটনায় পরিপূর্ণ বাস্তব জীবনে নিশ্চয়ই তিনি হত্যা করেছেন, ঠিক তখন থেকেই শিল্পীর জীবনচরিতে এমন অনেক কাহিনী স্থান লাভ করেছে যা জ্ঞান ও ইচ্ছার এই ভ্রান্ত একাত্মতা থেকে উদ্ভূত। অনুভূতির দুটি শ্রেণীবিভাগ—স্পষ্ট বা পরিস্ফুট অনুভূতি, আর বিষয়ীকৃত, স্বজ্ঞাত, দ্যোতিত অনুভূতি। প্রথম শ্রেণীর অনুভূতি স্বাভাবিক এবং প্রকাশের পক্ষে প্রাঞ্জল, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতির কাছে আমরা পাই অনুরাগের যন্ত্রণা; কারণ তারা হচ্ছে বিষয় ও প্রতীতি, আর এরা সুষমা ও সক্রিয়তা, তারা প্রকৃত ও যথার্থ সংবেদন, এরা স্বজ্ঞা ও দ্যোতনা। কবিতায় অনুভূতির অকারণ বিস্তার ও প্রশ্রয় সম্বন্ধে এবং লেখকের অনুভূতি-প্রবণতায় মুগ্ধ সমালোচনরীতি সম্বন্ধে ক্রোচে সবসময় কঠোর মত পোষণ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পের ক্ষেত্রে অনুভূতি কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তার কী অবদান? সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আনুষঙ্গিকরূপে অথবা আমাদের সংযত ও নৈতিকএষণার সার্থকতার আনুষঙ্গিকরূপে আনন্দানুভবের যে-লীলা, শিল্পকলাতেও কি তার সেই একই গৌণ ভূমিকা? কোনো জিজ্ঞাসু পাঠক যদি নাটকে হত্যা এবং অগম্যাসম্ভোগ সম্বন্ধে নাট্যকারের নিজস্ব অনুভূতিকে জানবার সাধনা করেন তা হ'লে নিঃসন্দেহে তিনি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করবেন, তবু অনুভূতি যে কবিতার অংশ এবং প্রধান উপাদান এ সত্যকে তিনি কখনোই পরিহার করবেন না। নন্দনতত্ত্ব লেখার কয়েক বছর পরে ক্রোচে বলেছেন, জিজ্ঞাসার এই সূত্রকে অনুসরণ ক'রে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌছন যেতে প্যারে যেখানে এ কথাই উজ্জ্বলিত হবে যে, *শৈল্পিক স্বজ্ঞাদ্যোতনা হচ্ছে নিশ্চতরূপে অনুভূতিরস স্বজ্ঞা-দ্যোতনা*। এই অনুভব লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের বিশৃংখল অনুভব নয়, কিংবা সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত অনুভব নয়, বরং নিঃসন্দেহে সুজ্ঞাত ও দ্যোতিত অনুভব, শিল্পরচনায় অধ্যাসিত আকারিত অনুভব। শৈল্পিক সুজ্ঞা-দ্যোতনার নোতুন নাম হচ্ছে গীতলতা, এটি অধিকতর সার্থক নামকরণ। তাই ক্রোচের মতে, নৈতিক সচেতনতাই সকল কবিতার ভিত্তিভূমি। কিন্তু অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয় প্রতিরূপে এবং তখন তা ধ্যানগভীর, বিশ্লেষিত এবং উৎকৃষ্ট সুতরাং কবিতাকে অনুভূতি বলা যায় না, প্রতিরূপও বলা যায় না, এমন কি উভয়ের সমষ্টিও নয়, বরং তাকে অভিহিত করা যায় অনুভবের নিদিধ্যাসন বা গীতল স্বজ্ঞা কিংবা প্রকৃত স্বজ্ঞা নামে,—প্রতিরূপের বাস্তবতায় অথবা অবাস্তবতায় ইতিহাসগত ও সমালোচনাগত সকল অনুপ্রসঙ্গের দিক থেকে এবং সৌন্দর্যের আদর্শ-রচনায় সার্থক জীবন-স্পন্দনের উপলব্ধির দিক থেকে তা প্রকৃত। সঙ্গীত কখনও সুর-প্রবাহ নয়, চিৎকার বা বিলাপও নয়, সঙ্গীত হচ্ছে অধ্যাস যার মাঝে অহং তার আপন রূপকে অবলোকন করে, আপনাকে বিবৃত করে এবং নাটকাকারো প্রকাশিত করে; এই গীতল চেতনাই গড়ে মহাকাব্য ও নাট্যকাব্য, শুধু বহিরঙ্গ লক্ষণ এদের পৃথক করেছে সঙ্গীত থেকে

অনুভূতিকে শিল্পের অন্তর্নিহিত উপাদান বা তার প্রধান অংশ ব'লে ঘোষণা ক'রে ক্রোচে তাঁর শিল্পের এবং শিল্পমূল্যের সংজ্ঞার পরিবর্তন করেছেন। তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে স্বজ্ঞা-দ্যোতনার শ্রেণীবিন্যাস বলতে বোঝায় তাদের প্রত্যায়িত ও সংযত করা। রীতি-রূপে স্বজ্ঞা-দ্যোতনার পূর্ণতা ও সফলতার মতো একটি নন্দনতত্ত্বগত উজ্জ্বল সত্যের দৃষ্টি হারিয়ে আমরা যদি তার মৌলিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে নোতুন সংজ্ঞার অনুরূপতাকে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলবেন, অনুভূতি হচ্ছে এক ধরণের স্পন্দন বা গভীরতা, অনুষঙ্গী স্বজ্ঞা-দ্যোতনার জ্ঞানবৈশিষ্ট্য ছাড়া যার কোনো নির্দিষ্ট অনুরঞ্জন নেই। শৈল্পিক স্বজ্ঞার রীতিগত সফলতা, পূর্ণতা এবং প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বতন ধারণাকে মানবীয় নৈতিক চিন্তার বিভিন্ন স্তরে অধিকতর স্পষ্টভাবে উন্নীত ক'রে ক্রোচে আপন দৃষ্টিভঙ্গীকে তাঁর পূর্ববতী রোমান্টিক জার্মানদের, তাঁর সমসাময়িক সকল আবেগবাদীর এবং তাঁর পরবর্তী কালের দ্যোতনাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগী করতে সমর্থ হয়েছেন।

গীতলতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতকেও তিনি এরকম দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পূর্ণ স্বজ্ঞার জীবনের সঙ্গে অসাধারণ স্পন্দিত হয় এবং অসাধারণের জীবনে এই পূর্ণের বিরাজ। প্রতিটি সার্থক শৈল্পিক প্রতিরূপ একই সময়ে স্বমহিমায় এবং বিশ্বজগতের ভাবৈশ্বর্যে উজ্জ্বল; বিশ্বজগৎ এই স্বতন্ত্র রূপের মাঝে বিধৃত এবং এই স্বতন্ত্র রূপ বিশ্বজগতের সমতুল। কবির প্রতিটি শব্দে, তাঁর সৃজনী কল্পনার প্রতিটি ক্রিয়ায় মানবিক অবস্থার আশা-ভ্রান্তি, আনন্দ-বেদনার আবির্ভাব। অন্তর্নিহিত অনুভূতিকে শিল্পরূপ দান করা বলতে বোঝায় তাকে জগৎ সম্বন্ধে অনুপ্রাণিত ক'রে সমগ্রভাবে গড়ে তোলা। শিল্প মূলত ব্যবহারিক জীবনের অনুরাগ থেকে মুক্ত; কারণ শিল্পে কোনো অনুরাগই অবদমিত নয়, বরং তা আমাদের সকল অনুরাগকে একই সময়ে মুক্ত আনন্দে লীলায়িত করে। বিশেষকে অতিক্রম ক'রে এবং পূর্ণতার গৌরব অর্জন ক'রে একক প্রতিরূপ আপন স্বতন্ত্র্যে মূর্ত হ'য়ে ওঠে। জীবনের চিন্তা, ক্রিয়া এবং আবেগ যখন বিষয়বস্তুতে উন্নীত হয় তখন আর বিচারক্ষম চিন্তা নয়, সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ক্রিয়া নয়, ভালো-মন্দের বা আনন্দ-বেদনার আবেগ নয়। তখন তারা শুধু প্রশমিত শান্ত এবং চিত্রকল্পে রূপায়িত অতিরাগ ও অনুভূতি। এটাই কবিতার ইন্দ্রজাল। শান্ত এবং অশান্তের, অতিরাগের উত্তেজনা এবং সংযম মনের মিলনই হচ্ছে কবিতা; এই মন অতিরাগকে নিয়ন্ত্রিত করে ধ্যানগভীরতার দ্বারা। কবিপ্রতিভা এমন একটি সরল পথ অনুসরণ করে সেখানে অতিরাগ শান্ত এবং শান্তভাব অতিরাগরঞ্জিত।

প্রতিরূপের প্রয়োগ হচ্ছে সরলতায় অলংকার সংযোজন এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য বর্ণনাকে শ্রুতিমধুর ও ভাবনিবিড় করা। সাহিত্যভঙ্গির প্রচলিত আদর্শকে লঙ্ঘন করলে জেগে ওঠে বিশৃঙ্খলা, উদ্দীপ্ত হয় সমালোচকের তীক্ষ্ন দৃষ্টি। যে-নোতুন আদর্শে প্রত্যয়গত নিবিষ্ট চিন্তার পরিচয় নিহিত, নন্দনরসসিক্ত দৃঢ়তার সুস্পষ্ট চিহ্ন মুদ্রিত, ক্রোচে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন, কিন্তু যে-আদর্শে এ দুয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা যতই নোতুন হোক যতই চমকপ্রদ হোক, ক্রোচে তার বিপক্ষতা করেন। তিনি বলেছেন, সকল সময়েই সাহিত্য-বিচারকেরা সুচারুভাবে লিপিবদ্ধ নিয়মাবলী স্থাপন করেছেন এবং উত্তরকালীন কবিরা সফলতার সঙ্গে তাকে বিপর্যস্ত করেছেন। যদিও কবির উপকরণ এবং ব্যাকরণ ও ছন্দোবিদ্যার দিক থেকে তাঁর পদ্ধতি সনাতন প্রথানুসারী, তবু এটি তাঁর কলা-বিধি যে, তিনি এমন কিছু রচনা করবেন যা সম্পূর্ণরূপে রীতির অনুকারক নয়। হোরেস অনেক আগেই এ কথা প্রমাণ করেছিলেন। ক্রোচের পূর্ববর্তী কালে সাহিত্যতত্ত্বের সর্বা-

পেক্ষা বিদগ্ধ আলোচক ফার্ডিনান্ড ব্রুনেটিয়ের ক্লাসিক্যাল সাহিত্যভঙ্গিকে ডারুইনের বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিলিত করেছিলেন, সুন্দরভাবে সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ঘাটনের জন্যে অনুপ্রসঙ্গের একটি আদর্শ রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ক্রোচে একে সমর্থন করেছেন বটে, তবু এরকম উদ্ঘাটন তাঁর কাছে অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। দ্যোতনার সকল শ্রেণীবন্ধনের বিপরীতে, শিল্পের পরিমিতি সম্বন্ধে অথবা বিবিধ শিল্পের সম্মিলন সম্বন্ধে সকল ভাববিন্যাসের বিপক্ষে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন। এটি স্থাপিত হয়েছে শৈল্পিক অর্থের প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে—সকল বিশ্লেষণ-শ্রেণীবিভাগ-ব্যাকরণ—রূপকের বিরুদ্ধে, আকৃতি ও বিষয়ের সকল অলংকারগত বিরোধের, একই জিনিষ কথনের সঙ্গত ও অসঙ্গত উপায়ের সকল ধারণার এবং সমশব্দ ও প্রতিশব্দের সকল ভাবের বিরুদ্ধে।

একটি রূপক যদি অযৌক্তিক হয় অর্থাৎ দ্যোতনার প্রকৃত অর্থের বহিরঙ্গ অলংকার হয় তবে দ্যোতনার মাঝে কখনোই তার রূপৈশ্বর্য আভাসিত হবে না। অপরদিকে যদি তা সত্যিই-দ্যোতনার যুক্তিসঙ্গত অংশ হয় তবে কখনোই তাকে বলা যাবে না অযৌক্তিক বা অলংকার। ভাষা হচ্ছে একটি চিরন্তন সৃষ্টি। ভাষার মাধ্যমে যার দ্যোতনা তা পুনরাবৃত্ত নয়, বরং সৃষ্ট ভাবের পুনঃ সর্জন দ্বারা তা শাশ্বত। চির-নোতুন প্রত্যয় গ'ড়ে তোলে ধ্বনি এবং অর্থের বিরামহীন পরিবর্তনকে অর্থাৎ চির-নোতুন দ্যোতনাকে। আদর্শ ভাষার অনুসন্ধা বলতে বোঝায় গতির স্থিরতার অনুসন্ধান। ভাষা উজ্জ্বল তীক্ষ্ম ভাবের আধার নয়, তা অভিধান নয়, চিন্তার সংকলন নয়, অথবা অলংকৃত অপ্রচলিত ভাববোধের সমাধি নয়। নন্দনরসনিবিড় আকৃতি সম্বন্ধে আমরা যে-কথা আগেই বলেছি তর্কের দিক থেকে তা বলতে পারি, কিন্তু যা অপর একটি নন্দনরসনিবিড় আকৃতি থেকে আপন নন্দনরসনিবিড় আকৃতি অধিকার করেছে তাকে আমরা নির্জিত করতে পারি না। সত্যিই, অনুবাদকের ব্যক্তিগত ধারণার সাহায্যে প্রতিটি অনুবাদ পুরোনো দ্যোতনাকে খর্ব করে, বিনিষ্ট করে অথবা সৃষ্টি করে নোতুন একটি দ্যোতনা।

ক্রোচে সমালোচনার সকল ক্লাসিক বর্ণসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং কবিতার শিল্পনৈপুণ্য বিচারপ্রসঙ্গে তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক যে সব শব্দ সর্বজনস্বীকৃত তাদের নোতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক এবং সিম্বলিক ও রিয়্যালিষ্টিক—পরস্পরবিরোধী এই দুটি যুগলের কথা। সাধারণ সমালোচক প্রতিটি শব্দকেই নির্দিষ্ট মূল্যায়নের পরিচায়করূপে ব্যবহার করছেন এবং আমরাও সেই একই উদ্দেশ্যে যেখানে সেখানে এদের প্রয়োগ করছি। ক্রোচে বলছেন, সেই দৃষ্টিকে পরিহাস ক'রে আমরা যদি তাদের নোতুনভাবে দেখি, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করি তখন আর এরা নির্দিষ্ট মূল্যের পরিচায়করূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে না। তাঁর মতে, ক্লাসিকাল বলতে বোঝায় শিল্পগতভাবে সুসম্পন্ন অথবা স্থিরচিত্তে অকৃত্রিম; রোমান্টিক হচ্ছে আগ্রহসহকারে ও যথার্থরূপে ভাবদ্যোতক অথবা আবেগপ্রবণ ও অসংযত। রিয়্যালিষ্টিক বলতে বোঝায় নিপুণভাবে অনুকারী অথবা উজ্জ্বলভাবে জীবনানুরূপ; সিম্বলিক হচ্ছে বাস্তবতানির্ভর অনুপ্রাণিত স্বাধীন সৃজন অথবা দৃঢ়ভাবে রূপকাত্মক। সংক্ষেপে বলা যায়, এদের যে কোনো একটি শব্দই শৈল্পিক বা অশৈল্পিক অর্থ নির্দেশ করতে পারে এবং শিল্পনৈপুণ্যের ভাবের ওপর এদের কিংবা সমালোচনাগত অন্য শব্দের কোনো বিশেষ অধিকার নেই। ছন্দ, ধ্বনিসাদৃশ্য, অন্ত্যমিল, রূপক—এরাও নির্দিষ্ট মূল্যায়নের পরিচায়ক, তবে শুধুই শৈল্পিক রীতির প্রতিশব্দমাত্র। নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের জন্যে আমরা স্বতন্ত্র স্বজ্ঞা থেকে এরকম নিবিড় চিন্তায় যেতে পারি কিন্তু আবার ফিরে আসতে পারি না।

ক্রোচে বলেছেন, সমালোচনার কাজ হচ্ছে কাব্যিক আদর্শকে উপলব্ধি করা এবং তার অব-

স্থিতিকে চিহ্নিত করা। তিনি সবসময়েই একজন অনুরাগী ব্যবহারিক সমালোচক। তিনি আমাদের সামনে রুচির এবং সমালোচনাগত বাকরীতির সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রেসাইনের কবিতার একটি পংক্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, কবিতা যে ধ্বনির দ্বারা আমাদের নন্দিত করে এবং শ্রুতির কাছে এনে দেয় পরমানন্দের মাধুর্য, এ ধারণা ভ্রান্ত। পরমানন্দের মাধুর্য দান করে আমাদের প্রকল্পনা এবং সে সঙ্গে আমাদের আবেগ। রেসাইনের একটি কবিতার ছন্দোলিপি ক'রে সর্বসমক্ষে সুন্দরভাবে পাঠ করেছিলেন থিওফিল গতিয়ের এবং অনেকে সেভাবে আবৃত্তি করতে গিয়ে কবিতাটিকে সম্পূর্ণ অর্থহীন ক'রে ফেলেছিলেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টি ছিল ধ্বনিবৈচিত্র্যের দিকে, অর্থ সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন একেবারে উদাসীন। অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু সেটাই কবিতার একমাত্র ধর্ম নয়। বিচিত্র ধ্বনির অসংখ্য প্রকারের সম্মিলন সম্ভব, কিন্তু তার মাঝে সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করা দুরূহ কাজ। ক্রোচে তাঁর সমালোচনায় বাচনিক শিল্প-দ্যোতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে অথবা সরল সংবেদজ আনন্দ থেকে স্বতন্ত্র সকল শিল্পদ্যোতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি সূক্ষ্ম স্বজ্ঞাকে প্রয়োগ করেছেন কবিতার প্রগাঢ় অর্থ এবং প্রাকল্পনিক সামঞ্জস্য অনুধাবনের জন্যে। এই সত্য এবং অত্যন্ত জটিল সম্পূর্ণতার সঙ্গে জড়িত তাঁর পূর্বোধৃত বিবরণীর মিলনে আমরা ক্রোচকে লাভ করব ব্যবহারিক সাহিত্য-সমালোচনার একজন অনুরাগী তাত্ত্বিকরূপে। ঐ সম্পূর্ণতাকে তিনি সাহিত্যের শিল্পকৃতিতে স্বীকার করেছেন। তবু সমালোচকের ক্রিয়ার সংজ্ঞায় বিসংবাদী ভাবান্তরিত সরলতা সূচিত হয়েছে। বিপরীত ভাব সম্বন্ধে ক্রোচের অবিচলিত কথন সত্ত্বেও এখানে ব্যাক্তিজীবনের মানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের ব্যবহারিক সত্তাকে পরিহার করে তাঁর নাটকগুলিকে গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করে-ছেন তাঁর কবিসত্তাকে। মানস হচ্ছে সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য, এর শ্রেণীবিন্যাসই লেখকের সমগ্র সৃষ্টির মাঝে সঞ্চারিত হয়।

মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ক্রোচে এক পত্রে লিখেছেন, কবি আপনার যে-মানসকে রচনায় শিল্পকলার মাধ্যমে রূপায়িত করেন বিস্তৃত করেন, তার প্রকৃত রূপটিকে জানা এবং জানানোই হচ্ছে সমালোচকের একমাত্র কাজ। ক্রোচের মতে, আত্মা এবং মানস সম্পূর্ণভাবে অবিভাজ্য। তারা সংক্ষিপ্ত গীতিকবিতায় যেমন প্রকাশিত, বিস্তীর্ণ মহাকাব্যেও তেমনি দীপ্তিমান। এ প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের মতবাদকে আমরা স্মরণ করি যাকে অনুসরণ ক'রে অসফল শিল্পকৃতি তাদের সম্পূর্ণতার ভিত্তিতে লাভ করে নৈপুণ্য, সৌন্দর্য নয়; যদিও প্রতিটি নৈপুণ্যই আপন সীমায় সুন্দর। কারুনিক্লে প্রসঙ্গে ক্রোচে লিখেছেন, কবিতার চিত্রপট সম্বন্ধে আমরা কিছুই চিন্তা করি না, আমাদের দৃষ্টি কবিতায় কারুকৃতি ও মণ্ডলকলার দিকে। কারুনিক্লের কবিতাকে পাইঐষ-ণিক অবস্থার গীতিলাবণ্যে, অনুরাগের যাথার্থ্য, ইচ্ছার নিঃসংশয়িত প্রকাশে, কবিসত্তার নিবিড়তায়। নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রগতিতে অথবা স্বতন্ত্র চরিত্রের সার্থক চিত্রণে এ সবের উপস্থিতি আমাদের অনুসন্ধানের বহির্বর্তী। প্রকৃত কথা, ক্রোচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যে-কোনো সাহিত্যকৃতির সাধারণ নির্মিতির ওপর যা প্রতিভাত হয় ক্ষুদ্র মুহূর্তের বিষয়রূপে, আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় নন্দনতাত্ত্বিক অপ্রাসঙ্গিকতার বিষয়রূপে। কবির মানস ও প্রকল্পনা ছাড়া আর একটি জিনিস রয়েছে, তা হ'ল কবির লক্ষ্য—এই তিনের সংযোজনেই গ'ড়ে ওঠে কবিতা। ক্রোচে এই লক্ষ্যের সঙ্গে গঠনকেও মিলিত করেছেন। দান্তের কমেডিয়ার গঠন পারমার্থিক-রাজনৈতিক রোমান্স-সম্পর্কীয় এবং তাকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছে যথার্থ কবিতা। শেক্‌স্‌-পীয়রের নাটকগুলির নন্দনতাত্ত্বিক সংসক্তি বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি শব্দ প্রতিটি স্বরন্যাসের ভিত্তিতে তাদের রচনার সূক্ষ্মতা নির্দেশ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে

পারে, ক্রোচে যখন গীতিকাব্য নাট্যকাব্য ও মহাকাব্যের মিলনের কথা নিঃসংশয়ে বলেছেন তখন তিনি এ কথা বোঝাতে চান নি যে, এরা একই কাব্যিক বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করবার তিনটি পৃথক পদ্ধতি, বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মহাকাব্য ও নাট্যকাব্য প্রধানত কথাবস্তু ও চরিত্রের বিস্তীর্ণ অসংবদ্ধ আদর্শে রচিত গীতিকবিতাবলীর সংকলন। কাব্যিক আনন্দ নিহিত রয়েছে কবিশক্তির ধীর উৎসরণে, আকস্মিক উদ্ভাসনে।

ক্রোচের পদ্ধতি নিরুৎসাহিত করেছে সকল উপদেশাত্মক সমালোচনাকে, একান্তই বাস্তবতামুখী বা সাংবাদিকতা-নির্ভর রচনাকে, এমন কি উদ্দেশ্যগত অনুপ্রেরণাগত সাহিত্যশিল্পকে। এটি আলংকারিকতার বিরুদ্ধে, বিষয় থেকে আকৃতিকে পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ। একই সময়ে এর দ্বারা সমর্থিত হয়েছে অনুভূতির পূর্ণতা, ভাবের গরিমা, স্বজ্ঞার ঐক্য, অনুরাগ ও সমগ্রতার সুরসঙ্গতি। অপর প্রান্তে এই পদ্ধতি ভক্তিনিবিড় শ্রদ্ধা জানিয়েছে লেখকের ব্যবহারিক সত্তার কাছে নয়, তাঁর কবিসত্তার কাছে এবং এর প্রবণতা অন্তরঙ্গ স্বজ্ঞায় দ্যোতনার মর্মস্পর্শিতার দিকে। এর দ্বারা সরলতা স্বতঃস্ফূর্ততা মৌলিকতা সম্বন্ধে বিশ শতকীয় সমালোচনাগত মান যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। এ কথা সত্য যে, ক্রোচের এই রীতি দ্যোতনাবাদ ও ভাববাদের একক রূপ এবং তা বাস্তব মূল্যের ধারণাকে লুপ্ত ক'রে সমগ্র পটভূমিকে স্থাপন করেছে শিল্পমূল্যের ভাববাদী তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। ক্লাসিক্যাল বর্ণসজ্জার অবনমনের জন্যে ক্রোচে সকল সমালোচনিক বিশ্লেষণকে, অখণ্ড বস্তু হিসেবে অথবা অর্থের জটিল সংকলন হিসেবে শিল্পকৃতির সকল অনুচিন্তনকে এবং অর্থের প্রতীক ও আক্ষরিক গঠনের সকল তুলনাকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের স্বজ্ঞার সমালোচনিক সমৃদ্ধির দিকে নিষেধের তর্জনী তুলে ধরেছেন। শিল্পেতিহাস সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের পরিচ্ছেদে তিনি এই সত্য উদ্ঘাটিত করেছেন, যে, আমরা পরিশেষে পূর্ণরূপের উন্নত স্বজ্ঞায় পৌঁছতে পারি তার উপাদানের ধারণাগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি অংশবিশেষের সমালোচনা ছাড়া প্রকৃত সমালোচনার দিকে প্রসারিত করেননি। সংক্ষিপ্ত পরিধির মাঝে তিনি স্বীকার করেছেন সংশ্লেষণের সত্যকে এবং উপকরণের আনুপ্রসঙ্গিক রূপান্তরকে। কিন্তু কথাবস্তু চরিত্র অঙ্ক ও দৃশ্যের ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে এই একই জিনিস তাঁর কাছে এনে দিয়েছে অতীন্দ্রিয়-বিষয়ক ধারণার ভাব এবং তখন তিনি বলেছেন গঠনগত উদ্দেশ্য ও যুক্তিসিদ্ধ অভিপ্রায়ের কথা।

সম্ভবত যে-কোনো আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিকের তুলনায় ক্রোচে অধিকতর নিপুণভাবে শিল্প সম্বন্ধে ভাববাদী ও দ্যোতনাবাদী চিন্তার একটি অধ্যায়কে সংযোজিত এবং পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলেছেন। শিল্পকৃতির দর্শনকে তিনি দুটি প্রান্তে বিন্যস্ত করেছেন, একদিকে অদ্বিতীয়রূপে স্বতন্ত্র রচনা, অপরদিকে মানসের দ্যোতনা। সুতরাং তা নিছক অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। শিল্পের বা শিল্পসমালোচনার চিরন্তনতার পক্ষে এই দর্শন হয়তো যথেষ্ট নয়। তবু এটি চিন্তা এবং বাস্তবতার একটি কেন্দ্র যা তার শক্তিকে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করছে বাহ্যিক অনুপ্রসঙ্গ বা অনুকরণের অতি সরল বা অতি জটিল ভঙ্গির রূপান্তরবিধানের দিকে, অনুরূপ ভাবে ঐ সব ক্লাসিক্যাল ভঙ্গিই আবার নিশ্চিতরূপে আপন শক্তিকে প্রয়োগ করে দ্যোতনাবাদের একক রীতিকে বিপর্যস্তকরবার জন্যে। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি, ক্রোচের তত্ত্বাবিচারকে পরিহার ক'রে আজ সাহিত্যসমালোচক বা সাহিত্যের ইতিহাসরচয়িতার পক্ষে আনুকরণিক শীলতা বা অলংকারিক সক্রিয়তার ক্লাসিক্যাল ধারণাকে ব্যবহার করা একরকম অসম্ভব। ক্রোচের দ্যোতনাবাদের তত্ত্ব বিশ্বসাহিত্যজিজ্ঞাসার পটভূমিকায় এক নোতুন দিক্‌নির্ণয়।

রবীন্দ্র জনপ্রিয়তার উৎস সন্ধানে

কথিত আছে স্বদেশে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা নাকি অপরিসীম; তিনি তাবৎ ভারতবর্ষীয়ের প্রিয় কবি—গর্বের কবি। এমন বালক বৃদ্ধ বণিতা এদেশে নেই যে রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেনি। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত সমাজে তিনিই সর্বাধিক পঠিত ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক। এছাড়া বিদেশে তাঁর সমাদর ও জনপ্রিয়তা নিয়েও জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই।

অথচ এই জাতীয় নানা স্বতঃ ও অস্পষ্ট উক্তির মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে তা আমরা প্রায়শই তলিয়ে দেখি না এবং আশ্চর্যের বিষয় জাতীয় গৌরব প্রচারের উন্মাদনায় বহু ক্ষেত্রে অতি কথনকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা যতই কম জানি না কেন অপরের কাছে তা প্রকাশ করতে আমরা সর্বদাই কুন্ঠিত। বরং তাঁর জীবন, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অহরহ অস্পষ্ট ও ভ্রমাত্মক মতামত জাহির করে থাকি। তাঁকে নির্দ্বিধায় যত্রতত্র মেনে বসি। এই আচরণের মূলে তাঁকে জানবার ও জানাবার চেষ্টা কতখানি আছে বলতে পারি না তবে আত্মপ্রচারের অভিসন্ধি যে এই সমস্ত রচনা ও বক্তৃতার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল তা বুঝি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, তাঁকে সাধ্যমত শ্রদ্ধা করলেও আমরা অনেকেই এই ভক্তির সমর্থনে কোন সদযুক্তি দিতে পারি না। আমাদের এই রবীন্দ্র-প্রীতি, প্রায়ই সন্দেহ হয়, যে চেষ্টিত ও অনান্তরিক। সম্ভবত এই অসংগতির মূলে আছে লোকভয়। এই লোক ভয় জনিত আত্ম প্রবঞ্চনা বর্তমানে এত ব্যাপক হয়েছে যে এ বিষয়ে আমাদের অচিরেই সতর্ক হওয়া দরকার।।

সমাজে শিক্ষিত, রুচিশীল ও সংস্কৃতিজ্ঞ রূপে গণ্য হতে গেলে ওষুধ গেলার মত যে রবীন্দ্র-সাহিত্য গলাধঃকরণ করা প্রয়োজন এই মনোবৃত্তি সম্প্রতি ভয়াবহ রকমের প্রকট। এই প্রবণতা রবীন্দ্র গ্রন্থ সুলভে প্রচারের ব্যবস্থা হওয়ায় সম্প্রতি চরমে উঠেছে। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথের নাম মাত্র সম্বল করেই আসরে অবতীর্ণ। তাঁরা কেউ কবির সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ উক্তি করে রবীন্দ্রানুরাগী হিসাবে প্রতিপন্ন হতে চান—কেউ অনুরাগী হয়ে পারলারের আলমারীতে বন্দী করে রাখেন রবীন্দ্রনাথকে। এঁরা অনেকেই বহুমুখী ও বিপুলায়তন রবীন্দ্র সাহিত্যে কালনেমীর মতই অধিকারী। অথচ এঁদের সংখ্যা এত বেশী এবং সমাজে এঁদের প্রতিপত্তি এত গভীর বিস্তৃত যে এই গোষ্ঠীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকলে কথামালার সেই এক চক্ষু হরিণের দশা হবে আমাদের। রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের শেষ পর্বে তাই তথাকথিত রবীন্দ্র জনপ্রিয়তার প্রকৃতি-নির্ণয় আজ প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি। এই আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও মহত্বকে খর্ব করা নয়, মূলত আত্ম সমীক্ষাই এর বিবেচিতব্য বিষয়। আমার উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ। আমার বিশ্লেষণের বিষয় তাঁর কালোত্তীর্ণ প্রতিভা নয়, বুদ্বুদের মত গড়ে তোলা কয়েকটি ধারণাই এই আলোচনার চাঁদমারী।

স্বদেশে এবং বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ সর্বজনজ্ঞাত এবং পঠিত এই জাতীয় সংবাদ আমরা প্রচার করি; প্রচার করে আত্মতৃপ্তিও লাভ করে থাকি। জাতীয়তা গর্বে ও ঐতিহ্য

উত্তরাধিকারের সূত্রে আমাদের বুকও ফুলে ওঠে। হাজার বছরের পুরানো বাঙলা গীতি-কবিতার এই সমৃদ্ধ পরিণতির কথা ভেবে কে না পুলকিত হয়। অথচ আমরা মুখে যত বলি মনে মনে কি সত্যি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, আদর্শ ও স্মৃতিকে ততখানি শ্রদ্ধা ও মান্য করি? ততখানি জানি? এই জাতীয় আত্ম-সমীক্ষায় রবীন্দ্র-জনপ্রিয়তার স্বরূপ উদ্ঘাটনই এই আলোচনায় প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

যদি লোক গণনা করে রবীন্দ্র রসিকের একটা হিসাব নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সাহিত্যাগ্রহী ভারতীয় ও অ-ভারতীয়ের বাইরে রবীন্দ্রনাথ এখনও কেবল একটি নাম, একটি অস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব, কখনো শুধু মাত্র একটি ছবি! যার সংগে পরিচয় পত্রিকা বা পাঠ্য পুস্তকের পাতায় অথবা ক্যালেণ্ডারের লিথোগ্রাফে। সবজান্তা শিল্পীর বিচিত্র কল্পনায় কখনও তিনি ভারত মাতার পদতলে উপবিষ্ট, এক হাতে বীণা, অন্য হাতে জাতীয় পতাকা। কখনও তাঁর ছবি দেখে মনে হয় বার্ণাড শ থেকে শ্রীঅরবিন্দ-এর মাঝামাঝি বিবর্তিত একটি প্রতি-কৃতি। দেশের অধিকাংশ লোকের রবীন্দ্র-পরিচয়ের পুঁজি এইটুকুই।

একবার আমার কৌতূহল হয়েছিল সাধারণ্যে রবীন্দ্রজনপ্রিয়তা যাচাই করে দেখবার। সেই সূত্রে কিছুদিন দেশের সর্ব স্তরের নর-নারীকে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতাম। ছকে বাঁধা একটি খসড়া প্রশ্নের তালিকাও তৈরী হয়েছিল। পাঠকের কৌতূহল নির-সন করতে তা' উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করি। ক] রবীন্দ্রনাথ কে ছিলেন, খ] তিনি প্রধানত কিসের জন্য বিখ্যাত, গ] তাঁর লেখা কটি ও কি কি বই পড়েছেন ঘ] তাঁর ব্যক্তিগত ও কর্ম জীবন সম্পর্কে কিছু জানেন কি এবং শেষক্ত ঙ] আপনার জীবনের সংগে তাঁর জীবনের কোন সংযোগ আছে কি?

শেষেরটি বাদে সব কটিই অত্যন্ত মামুলী প্রশ্ন, এবং যে কোন সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিই এর মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন। অথচ আমার পরীক্ষার ফল হয়েছিল নৈরাশ্য জনক। তখন রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালনের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হয়নি। তাই চতুর্দিকে (বিশেষত খবরের কাগজ ও সভা-সমিতিতে) এতটা মাতামাতি ছিল না।

আমি প্রথমে ছাত্রদের কাছেই গিয়েছিলাম। রবীন্দ্র প্রতিভার সংগে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংযোগ তাদেরই আছে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু অচিরেই নিরাশ না হয়ে পারিনি। স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর বহু ছাত্র রবীন্দ্রনাথের দশটি বই-এর নাম করতে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। যারা করেছিল তাদের অধিকাংশের তালিকাই সঠিক ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজনের কথা বলতে পারি: একটি ছাত্র গীতাঞ্জলি [নোবেল প্রাইজের কল্যাণে], সঞ্চয়িতা [বিদ্যালয় পাঠাগারে দেখেছে] এবং তারপর কাবুলীওয়ালা [তখনও 'ক্ষুধিত পাষাণ' চলচ্চিত্রে লাঞ্ছিত হয়নি] বলেই থেমেছিল। অপর একজন যোগাযোগ, রক্তকরবী, মুকুট [সে অবশ্য বলেছিল মুটুক!] প্রভৃতি দুতিনটি অ-স্কুল পাঠ্য বই এর নাম করে তারপর বলেছিল সহজ পাঠ। তৃতীয় জন 'ভারত তীর্থ' প্রভৃতি কয়েকটি অতি পরিচিত স্কুল-পাঠ্য কবিতার তালিকা গড় গড় করে বলে গিয়ে-ছিল। কিন্তু আনন্দের কথা এই জাতীয় ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বরং রবীন্দ্র-জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছাত্রের সংখ্যাই ছিল প্রচুর। নোবেল-প্রাইজকে তাদের অনেকেই 'নভেল' প্রাইজ বা মহত্বের জন্যে পুরস্কার—এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছে! যাঁরা কলেজে পড়েন তাঁদের জবাবেও অনুরূপ অসংলগ্নতা ও অজ্ঞতা বারবার দেখেছি। অনেকে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের লেখা ভাল-বাসেন না বলে পড়েন না এই জাতীয় জবাব দিয়েছিলেন! অন্যেরা অধিকাংশই বলেছিলেন রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়ার উৎসাহ আছে কিন্তু অবসর নেই। কেউ কেউ পড়ার বই-এর খান কয়েক

কবিতা, অল্প সংখ্যক গল্প-প্রবন্ধ এবং অর্ধ-পঠিত উপন্যাস সম্বল করেই রবীন্দ্র-চর্চা করবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আর একটি সম্প্রদায় বিদেশী সাহিত্যের ও অন্যান্য দুরূহ বিষয়ের চর্চায় এত নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁদের কাছে এই জাতীয় প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছিল এই জাতীয় স্নবেরা অনেকেই রবীন্দ্রনাথ পড়ে সময় নষ্ট করেন না! অতঃপর আমি গিয়েছিলাম চাকুরে, ব্যবসাদার প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর কাছে। দেখলাম এ'দের অনেকের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ একজন খ্যাতিমান পুরুষ মাত্র। এ'রা হয়ত কেউ রবীন্দ্র-রচনাবলী কিছু কিছু পড়েছেন—কিন্তু কি পড়েছেন তা, অনেকেই বিস্মৃত। অনেকে পড়েন কিন্তু সে সম্পর্কে আলোচনা করতে নারাজ। আর একদল খ্যাতির বার্ত্তা শুনেছেন, ছাত্রাবস্থায় তাঁর দু'একটি কবিতা যে মুখস্ত বলতে পারতেন না তা' নয়, তবে এখন কর্ম বা বাণিজ্য সূত্রে রবীন্দ্র চর্চা বিলাসিতা বলেই জ্ঞান করেন। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এ'দের প্রত্যেকের বাড়িতেই প্রায় দু'চার খানি রবীন্দ্র-গ্রন্থ আছে [প্রায়শই বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া] অথচ সেগুলি বাড়ির কেউ পড়ে না। না না কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ও প্রচার দিয়ে তৈরী করা যে রবীন্দ্রনাথকে এ'রা চেনেন তার সঙ্গে আসল কবির সামান্যই মিল আছে। এ'রা সবাই রবীন্দ্র ভক্ত, তবে তাঁকে কেন ভক্তি করেন তা' জানেন না। জানার চেষ্টাও বিশেষ নেই। সিনেমা, সভা-সমিতি, রেডিও, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে রবীন্দ্র প্রতিভার যেটুকু পরিচয় পান তাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বন্ধু মহলে প্রচার করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্র চর্চা নয়, রবীন্দ্র-রসিক হিসাবে নাম কেনার দিকেই এ'দের ঝোঁক।

অবশেষে যাঁরা বাকী থাকেন সেই কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি নাম। তাঁর নানা ভঙ্গির ঋষিতুল্য প্রতিকৃতি সেখানে শ্রদ্ধাভক্তির একমাত্র অবলম্বন সূত্র। গ্রাম সেবক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাই সেখানে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রচারক।

এতক্ষণ তো গেল রবীন্দ্র সাহিত্যের কথা ; তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম জীবন সম্পর্কেও অধিকাংশ জন অজ্ঞ। যাঁরা একালে জন্মেছেন তাঁরা তো তাকে দেখবার বা উপলব্ধি করবার সুযোগ পাননি, কিন্তু যাঁরা তাঁর সমকালীন তাঁদের অনেকেও তাঁকে বুঝতে পারেন না। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে জনৈক লেখক বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ এমনই তুঙ্গ, অত্যুচ্চপ্রতিভার এবং স্থিতিস্থাপক, বহুমুখী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন যে তাঁর সমকালেও কেউ তাঁর নাগাল পাননি। রবীন্দ্রনাথের এই মানসিক বিবিক্তি ও নিঃসঙ্গতা তাঁর কাছে সদর্থক হলেও বর্তমানে তাঁর এবং আমাদের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সে যুগের প্রচল রবীন্দ্র-বিরোধীতার জোয়ার অপসৃত হওয়া সত্ত্বেও তার কর্দম চিহ্ন নানা স্থানে এখনও বিদ্যমান। বিশেষত কিছু কিছু প্রবীণ ব্যক্তি এখনও রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিপক্ষ। তাঁর প্রতিভা ও কর্মকে স্বীকৃতি দিতে এখনও এ'দের ভয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নানা অশালীন মিথ্যা অনুমানও এর জন্যে দায়ী বলা চলে। অনেকের ধারণায় এখনও রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জ্ঞান রহিত, কল্প লোক চারী, গজদন্ত মিনার আশ্রয়ী কবি। এ'দের কেউ তাঁকে প্রতিপন্ন করতে চান বুর্জোয়া সমাজ পতি হিসাবে, কেউ আবার মাটির কাছাকাছি সর্বহারা জনতার দলে তাঁকে নামিয়ে এনে বাহাদুরী কিনতে চান গবেষক সমাজে। অনেকে তাঁর খৃষ্টের মত দিব্য মুখাবয়ব দেখে আবার ঋষি-জ্ঞানে গদগদ হয়ে পড়েন। এই জাতীয় আতিশয্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ও জীবন অহরহ অপব্যখ্যাত হচ্ছে।

যাঁরা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত ভক্ত তাদের মধ্যেও অনেকে অতি-ভক্তির ফলে তাঁকে সঠিক বুঝতে পারেন না। আবার বাঙলা দেশের বাইরে (মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের কথা বাদ দিলে) রবীন্দ্র চর্চা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পঞ্জাব অথবা বোম্বাই এর বহু শিক্ষিত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নাম টুকুও জানেন না। এই কারণে অভিজ্ঞতা বহু ভ্রমণ-

কারীরই হয়েছে।

স্বীকার করি বহুমুখী রবীন্দ্র প্রতিভার সংগে সর্বাঙ্গীন আত্মীয়তা স্থাপন কারও পক্ষেই প্রায় সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-দর্শন আত্মস্থ করাও প্রজ্ঞা সাপেক্ষ। তবু যে প্রাথমিক জ্ঞান ও প্রবেশ সাধারণ্যে আশা করা যায় তাই বা কতজনের আছে?

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথ আজও শুধু কবি, গল্প লেখক, বড়জোর ঔপন্যাসিক। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর এবং সুখপাঠ্য নাটক, চিঠি পত্র, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ডায়রী ধর্মী রচনাগুলির সংগে এ'দের পরিচয় নেই। তাঁর প্রবন্ধ, যেগুলি একাধারে রম্য এবং যুক্তি নিষ্ঠ সেগুলিও অধিকাংশের কাছে অপরিচিত। অনেকে আলোচনা-গ্রন্থ মারফৎ হয়ত এগুলির খবর রাখেন কিন্তু সরাসরি রসগ্রহণে তাঁরা অনাগ্রহী।

সবচেয়ে শোচনীয় তাঁর কবিতার জনপ্রিয়তা। পাঠ্য পুস্তকের আশ্রয়ে লালিত মুষ্টি-মেয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাবলীর দ্বারাই অধুনা আমরা রবীন্দ্রনাথকে চিনি। এই বহুল প্রচারিত ও বহু প্রশংসিত কতিপয় কবিতা ও কাব্যকে কেন্দ্র করেই চলছে রবীন্দ্র-পরিক্রমা। অথচ তার বাইরে যে সমৃদ্ধ, বিচিত্র কবিতার ঐশ্বর্য তার খবর কজনই বা রাখেন? অবশেষে, ভারতীয় ভাষা সমূহে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকৃত অনুবাদগুলি দেখলেও ব্যথিত না হয়ে পারা যায় না।

পরিশেষে, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত পাঠক এখনো স্পর্শ কাতর। দুরূহ, দার্শ-নিক, প্রতীকী, জটিল ইত্যাদি অভিযোগে তাঁরা তা এড়িয়ে চলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, রাজ-নীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম এবং শিক্ষা বিষয়ক আলোচনাগুলিও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে দীর্ঘকাল অনাদৃত রয়েছে।

অবশ্য রবীন্দ্র জীবন এবং ব্যক্তিত্বের সংগেই আমাদের অপরিচয় সবচেয়ে বেশি। তেমনি অপরিচয় আছে শিক্ষক, সমাজবিদ, রাজনীতি, অভিনেতা, কর্মী এবং চিত্রী রবীন্দ্রনাথের সংগে। তাঁর রসিক সত্তাটিও গম্ভীর কবিতার আড়ালে এমনি ভাবে চাপা পড়ে গেছে। অথচ তিনি যদি কবিতা নাও লিখতেন তবে উপরিউক্ত পরিচয় গুলিতেই বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্র সৃষ্টির জনপ্রিয়তম অংশ বোধ হয় তাঁর গান। তবু তার মধ্যেও কম ফাঁকি নেই। আমরা সেই গান সিনেমায়, অথবা বেতারে জনপ্রিয় গায়কের কণ্ঠে শুনে তবেই সেগুলির তারিফ করি। তাতে কবির সৃষ্টি যতটা না সম্মান পায় তার থেকে ঢের বেশি হাততালি পান গায়ক। আর বিকৃত সুরে পরিবেশন সে তো আছেই।

সবচেয়ে শোচনীয় দশা বোধহয় তাঁর ছবির। দেশের রসিক সমাজ এতদিন এগুলি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। কুৎসাও কম রটেনি। কিন্তু কিছুকাল হল বিদেশী কলা সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে এ'রা মত বদলেছেন। তাই একটি রূঢ় সত্য এই প্রসংগে বল্লে হয়ত অন্যায় হবে না যে আমরা বিদেশীর চোখেই বরাবর রবীন্দ্রনাথকে দেখে আসছি—এমনকি এখনও দেখছি। অর্থাৎ কবির স্বদেশবাসীর প্রতি যে ক্ষোভ ছিল তা যে কতখানি সত্যি সেটি অধুনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার সময় এসেছে। এখন তাই বিদেশে কবির কোথায় সমাদর বাড়লো তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এই আত্ম-প্রতারণা নিরোধ করা। তবেই কবির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হবে। রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করে তোলার পরিবর্তে তাঁকে উপলব্ধি করাই আমাদের মনে হয় যথার্থ রবীন্দ্রচর্চা।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রাতঃ স্মরণীয়া পঞ্চকন্যা ॥ মনোনীত সেন। গ্রন্থজগৎ, কলিকাতা-১২। মূল্য ৫.০০।

শ্রীমনোনীত সেন প্রণীত প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। অধুনা সময়ে সময়ে, ঐ বিষয়ে সংবাদপত্রে নানাবিধ আলোচনা হইতেছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকের আলোচনা ঐ সকল হইতে বহুলাংশে পৃথক। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে ইহার মৌলিক উৎস রামায়ণ, মহাভারতাদি অমূল্য গ্রন্থ সকলের দীর্ঘকাল পর্যালোচনা করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই অসংকোচে পাঠক সমাজে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থপাঠে লেখকের চিন্তাশীলতা, ভূয়োদর্শন ও বিচার বিশ্লেষণের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সমুদয় মতই যে অভ্রান্ত ও বিচার সহ তাহা বলা যায় না। নিম্নে নিদর্শন স্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল। তিনি একশত আটাশ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন পাণ্ডবদিগের ধমনীতে অনার্যশোণিত প্রবাহিত রহিয়াছে; এই কথা সিদ্ধান্ত সহ নহে। কারণ নারায়ণের অবতার ব্যাসদেব হইতে পঞ্চপাণ্ডবের পিতৃ পুরুষ ধৃতরাষ্ট্রাদি এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা যমাদি পঞ্চ দেবতা হইতে সমুৎপন্ন। উঁহাদের পিতামহী সত্যবতী কৈবর্ত্ত পালিতা হইলেও তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন না। তিনি উপরিচার বসুর কন্যা একথা মহাভারতে সুবিস্তৃত ও বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোন পুত্র বা কন্যা অন্যজাতীয় পালক পিতামাতার দ্বারা লালিত, পালিত বর্দ্ধিত হইলেও ঐ সন্তান পালক পিতা মাতার জাতি প্রাপ্ত হয় না। সমাজে অদ্যাবধি এ প্রথার যথেষ্ট প্রচলন আছে। বিখ্যাত যবন হরিদাস যশোহরের নরহরি চক্রবর্তীর পুত্র। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায় যবন গৃহে প্রতিপালিত হইয়া ঐ মহাত্মা যবন হরিদাস নামে পরিচিত হইলেও তিনি জাতিতে যবনত্ব প্রাপ্ত হন নাই। এ কথা মহা বিষ্ণুর অবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের কৃত পিতৃশ্রাদ্ধে প্রদত্ত পাত্র ভোজনে সুপ্রকাশ।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকার, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীরও অযোনি সম্ভব জন্ম রহস্যে বহু বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজে এই রূপ অলৌকিক জন্ম রহস্য চিরদিনই প্রচলিত আছে। দর্শনরাজ বেদান্ত দর্শনে শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য কৃত শারীরিক ভাষ্যে দৃষ্ট হয় দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির জন্ম অযোনি সম্ভব। বকপক্ষীর জন্মে শুক্র শোণিতের সংযোগের প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মার মানস পুত্রগুলিও সর্বথা স্বীকার্য। মহাভারত ও স্কন্দ পুরাণাদিতে ধৃত "অচিন্ত্য" অর্থাৎ অপ্রাকৃত পদার্থগুলির অর্থবোধে কোন তর্কের প্রয়োগ করিবেনা। গুণময়ী প্রকৃতির অতীত পদার্থের নাম "অচিন্ত্য"। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক মহাকবি শেক্সপীয়ার তাঁহার বিখ্যাত নাটক, হ্যামলেটের ১ম অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে তাঁহার হোরিশিয়োকে ঠিক এই কথাই বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রিয় হোরিশিয়ো এই পৃথিবী ও স্বর্গে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা তোমাদের দর্শন অদ্যাবধি স্বপ্নেও টের পায় নাই।" বেদান্ত দর্শনে "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি, ২।১।১১ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় এ তত্ত্ব সুপরিস্ফুট।

এ যাবৎ আলোচ্য শ্লোকস্থিত তারা শব্দে সাধারণে বালির পত্নীকেই বুঝিত। কিন্তু

লেখক এই তারা শব্দে বৃহস্পতির পত্নী প্রমাণ করিতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ঘটনা মুখে তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার মতে আলোচ্য শ্লোকস্থিত কন্যা শব্দে অবিবাহিতা নারীকে বুঝাইয়া থাকে। অমর কোষ অভিধানে কন্যা কুমারী নগ্নিকা ও অনাগতার্ত্তবা এই কয়টি একার্থক শব্দ আছে। স্মৃতি শাস্ত্রে "দশমে কন্যকা প্রোক্তা" এই বচনে ও কন্যকা শব্দে অবিবাহিতা কন্যাই বুঝাইয়া থাকে এই অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত পঞ্চকন্যার বিবাহের পর যে সকল গণ্ডগোল ঘটিয়াছে তাহার অবকাশ হয় না। অবশ্য কুমারী অবস্থায় সূর্য্যের সহযোগিতায় কর্ণের উৎপত্তি এই ঘটনা অসত্য নহে। কিন্তু সূর্য্য দেবতা। কুন্তী একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অর্থাৎ অকামা অবস্থায় সূর্য্যের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় অকামা অবস্থায় কৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। এবং দুর্বল মানব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে একবার কোন পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া যদি আর দ্বিতীয়বার পাপ না করে তাহাতে ঐরূপ কর্মে কোন প্রত্যবায় হয় না ইহা স্পষ্টতই উল্লিখিত আছে। সুতরাং কুন্তীর ঐরূপ একান্ত অনিচ্ছাকৃত দেবতা সংযোগ একেবারে অমার্জনীয় নহে।

এই পুস্তকের ১০১ পৃঃ "আপন আপন জীবন গঠনে যত্নবতী হইবেন। বলাবাহুল্য, যদি এই সকল গুণ কোন একটি নারীতে বিকশিত হয়" ইত্যাদি লিখিত আছে। উহাতে মনে হয় আলোচ্য শ্লোকটি কেবল নারীদিগেরই স্মরণীয়। লেখকের অভিপ্রায় যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে উহা ঠিক হইবেনা। কারণ "পুণ্যে শ্লোকো নলোরাজা।" ইত্যাদি শ্লোকটি যেমন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমস্মরণীয় এ শ্লোকটি ও সেইরূপ উভয়েরই তুল্য স্মরণীয়। এ ব্যাখ্যা শ্লোক-স্থিত "স্মরেৎ এই ক্রিয়ার উহ্য কর্তা জনঃ" পদের দ্বারা সহজ লভ্য।

এই গ্রন্থে অল্প কিছু বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষাগত প্রমাদ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণে এইগুলি সংশোধিত হইবে। উদাহরণ যথা ঃ—১৩০ পৃঃ প্রবৃষ্ট, ১৩৩ পৃঃ প্রযোজন কর্ত্তা ১৬২ পৃঃ জন্মস্থান ইত্যাদি। শাস্ত্রসেবী গ্রন্থকার সমাজে প্রচলিত ভ্রান্তিমূলক দোষ ত্রুটির সংশো-ধনের ইচ্ছায় এই গ্রন্থে যে সকল শাস্ত্রীয় বিবরণ ও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সুন্দর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা পাঠে পাঠকসমাজ পর্যাপ্ত উপকৃত হইবেন।

নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

HAMAM
TOILET SOAP
HAMAM

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Sept. '61 (0.50) Central Regd. No. R.N.2892/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

নবম বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৬৮

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬্ টাকা। ষান্মাসিক ৩্ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩্ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২্ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক .৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩্ টাকা; ষান্মাসিক ১.৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩্ টাকা; ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি. পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা
এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

Supremely Yours
Brooke Bond
SUPREME
Darjeeling Tea
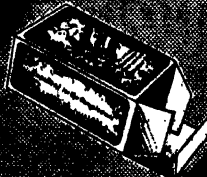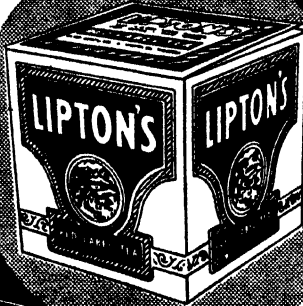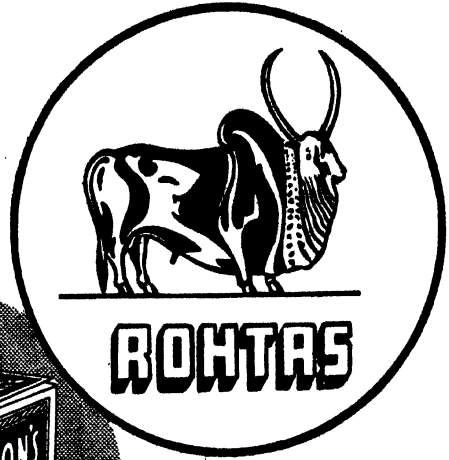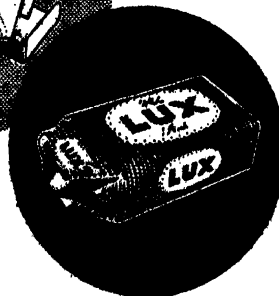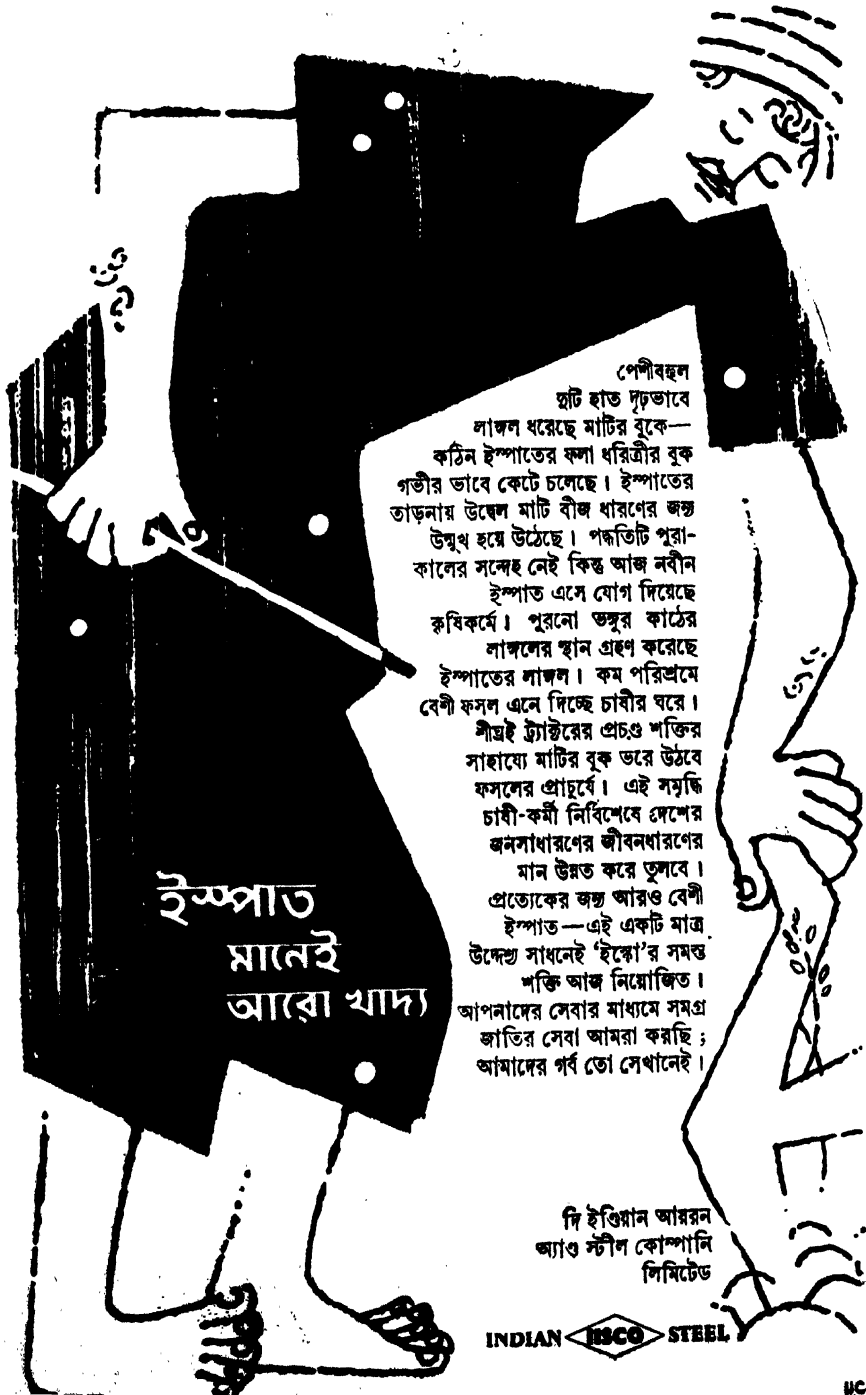
ইস্পাত
মানেই
আরো খাদ্য
পেশীবহুল
দুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্ম
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্ম আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি ;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL
IIC-77 BEN
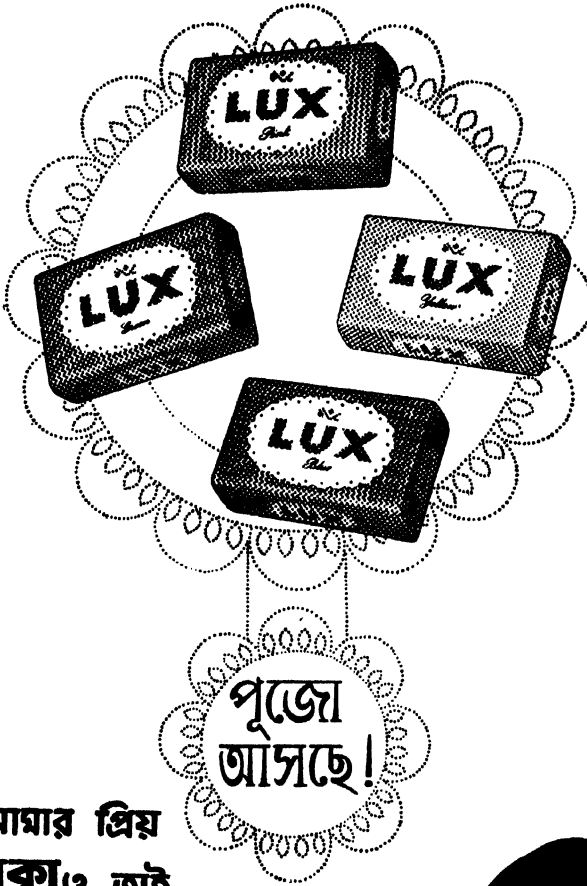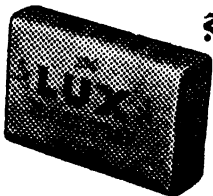
আদিম মানুষের প্রথম শিলালিপির অর্থ আজ স্বচ্ছ। বহুযুগের নিরুদ্দেশ ইতিবৃত্ত আজ আর রূপকথা নয়। কেবল যেটি প্রতিদিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মানুষ আর অন্নের সম্বন্ধ—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কই? ইতিহাসের পুঁথিকার ভুললেও ভোলেননি বেদের উদ্‌গাতা…স্মৃতির ভাষ্যকার…পুরাণের রচনাকার…অর্থশাস্ত্রের জনক।

বৈদিক যুগে আর্যরা বার্লি খেতেন, আশ্চর্য লাগে ভাবতে; কিন্তু সত্যি, বার্লি এবং ধানই ছিল তাঁদের প্রধান খাদ্যশস্য। তারপর এল গম এবং আরও অনেক কিছু। …কিন্তু বার্লি মানুষের খাদ্য হিসেবে থেকে গেল…আজও। ভারতবর্ষে এখনো অসংখ্য মানুষ বার্লির পানীয় দিয়েই জীবনধারণ করে। বার্লিশস্য থেকে উৎপন্ন পার্ল বার্লি ও গুঁড়ো বার্লি সহজে হজম হয় এবং শারীর ক্রিয়ার সহায়ক হয় বলে রুগ্নদের জন্যই এর বহুল ব্যবহার।

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

JWTAEL 8250

ইস্পাত
ভারতের
শিল্পায়ণের
বনিয়াদ
দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।
ইস্কন

X-100
MOTOR OIL
SHELL
X100
MOTOR OIL
a winner every time...
2T
SHELL
ROTELLA
OIL
you can be sure of SHELL

রঞ্জন ফ্যান
নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও আরামপ্রদ
সর্ব্বাধুনিক সুদৃশ্য ডিজাইন ও সুন্দর পরিপাট্যে
প্রস্তুত রঞ্জন ফ্যান দামের তুলনায় অনেক
বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দেয়
ডি, জি এস্ এ্যাণ্ড ডি-এর সহিত মূল্যে চুক্তিবদ্ধ
সিলিং • টেব্‌ল • পেডেষ্টাল • এয়ার সার্কুলেটার • এক্সষ্ট্
প্রস্তুতকারক — জি, টি, আর কোং (প্রাইঃ) লিঃ ৩৭, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ফোন :— ৫৭-২০৭৬ ৫৭-২৫৫৩
সিটি সেলস অফিস : ১২, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ফোন—২২-১৩৯৬

ডানলাপিলো
তোশক বালিশ কুশন
যে কোন
উৎসবের
দিনে
শোভন
উপহার
DPC-127 BEN

ARUNA MILLS
MARINA
more DURABLE
more STYLISH

বাহার ২.১০—২.৬০
জয় ৯.৫০—১৩.৫০
জুপিটার ৭.৫০—১১.৫০
রাজা ১২.৯৫
শরতের শোভাযাত্রা...চলুন মেলামেশার মহোৎসবে
রীণা ৯.৫০
এই মহোৎসব আজ
শরতের পথে অগ্রসর।
সকলের কর্তব্য সপরিবারে যোগদান।
তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে
হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে।
নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা
জুতো পাবেন বাটার দোকানে।
পদশোভার এখানে বিচিত্র আয়োজন।
রুচিরা ১২.৯৫
মনে রাখবেন, দিন যত বাড়ে,
ভিড় তত বাড়ে। সুতরাং আসুন
সকালের দিকে। সকালের বাজার
—আরামের বাজার।
ইজি ২২.৯৫
মেজর ২৪.৯৫
Bata
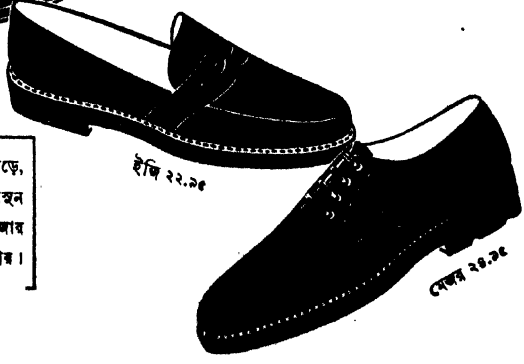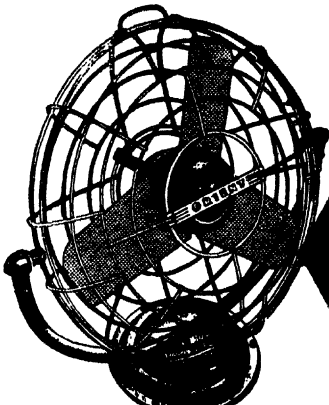
Distributors: M/s. HINDUSTAN DEALERS LTD.,
54, EZRA STREET, CALCUTTA-1.
Tele: 34-1330 & 34-2084 Gram: DEALHIND

এ সাবানটি গুণে অগুণতি
নতুন
নির্ম্মল
বার সাবান
অনেক বেশী কাজ দেয়—
অধিক অর্থ সাশ্রয় করে
Nirmal
KUSUM PRODUCTS LTD.
নতুন নির্ম্মল সাবানে কাপড় পরিষ্কার করবার অতিরিক্ত ক্ষমতা রয়েছে, কারণ এ সাবান প্রেসার এক্সট্রুশনের সঙ্গে সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভ্যাকুয়াম-কুলিং নামক এক অভিনব প্রণালীতে তৈরী হয়। এর প্রচুর কার্য্যকরী ফেনা কাপড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে ময়লা দূর করে আর তা-ও খুবই তাড়াতাড়ি। জোরে রগড়ান বা বহুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার দরকার হয় না ব'লে নির্ম্মল সাবানে কাচা কাপড়ের সৌন্দর্য্য বজায় থাকে এবং টেকেও অনেক বেশীদিন। ময়লা কাটানোর অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকায় প্রতিটি সাবানে অনেক বেশী কাপড় পরিষ্কার করা যায়। এক কথায়, নির্ম্মল সাবানে কাপড় কাচলে খরচায় সত্যিকার সাশ্রয় হয়।
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা

আনন্দমুখর
দিনে

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম. এল. বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

বোরোলীন-
বিম্বিত
লাবণ্য
বৃষ্টির দিন শেষ হোলো। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীল। শরতের রৌদ্র-দীপ্ত উৎসবের দিন এলো উজ্জ্বল পরিবেশ নিয়ে।
আপনার-ও এখন নিজেকে আরো উজ্জ্বল করে তোলবার বাসনা। আপনার এই নব রূপায়ণে মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ক্রীম উজ্জ্বলতম উপকরণ—আপনার প্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ।
কোমল স্নিগ্ধ বোরোলীন ক্রীমের ভেষজগুণযুক্ত স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ধূলা আর রৌদ্রের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে আর আপনার স্বাভাবিক লাবণ্য ফিরিয়ে আনে। বোরোলীন-বিম্বিত সে মাধুরী আপনাকে আকর্ষনীয় ও বিশিষ্ট করে তোলে। নিয়মিত বোরোলীনের প্রযত্নে নিজেকে লাবণ্যমণ্ডিত করুন।
ল্যানোলিন-যুক্ত মৃদু-সুরভিত বোরোলীন ফেস্ ক্রীম আজ প্রসাধনের এক অপরিহার্য্য উপকরণ।
BOROLINE
বোরোলীন
ভেষজগুণসম্পন্ন পরম প্রসাধন
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাইভেট লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

৯ম বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন। তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

টানলেই বোঝা যায়

স্বাদে গন্ধে উপাদেয়···বরাবর সমান
ভালো···সিগারেট বলতে ক্যাপস্টান।
সুতরাং লোকে তো বলবেই
"ক্যাপস্টান যে ধরেছে সে-ই মজেছে"।
আপনি যদি আজও ক্যাপস্টান
না ধরে থাকেন,
একবার পরখ করলেই
ক্যাপস্টানের টানে বাঁধা পড়বেন।

JWTCC 60

রামমোহনের গদ্যরচনা
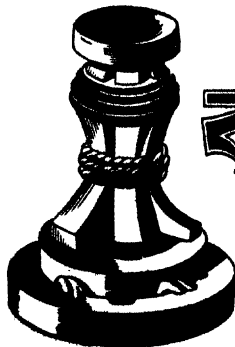
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১. ভারতপথিক রামমোহন

য়ুরোপের সংস্কার আন্দোলনের শুকতারা জন উইক্লিফের (১৩২০-৮৪) সাড়ে চারশ বছর পরে রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) আবির্ভাব হয়েছে। উইক্লিফের যুগে ইংলণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মনৈতিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের হুবহু সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু উইক্লিফের মতো রামমোহনও প্রচলিত সংস্কারকে বাদপ্রতিবাদের সাহায্যে এবং বুদ্ধি ও যৌক্তিকতার নিরিখে তৌল করতে চেয়েছিলেন। উইক্লিফ ধর্মযাজকদের পার্থিব ঐশ্বর্য ও ভোগাসক্তি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন করেছিলেন। যাঁরা খ্রীষ্টসেবক, গির্জার কর্ণধার, তাঁরা ঐশ্বর্যের সিংহাসনে বসে পার্থিব আরাম ভোগ করছেন—এর বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তুললেন জন উইক্লিফ, এবং ১৩৭৪ সালের দিকে লাতিন ভাষায় 'De Dominio' গ্রন্থ লিখে পোপ এবং তাঁর বশংবদ ধর্মযাজকদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করলেন। কিন্তু তিনি এখানেই থামলেন না, খৃষ্টান ধর্মের কতকগুলি আচার ও কৃত্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুললেন। খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে যাকে Eucharist (Trans-substantiation) বলে, তার বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ তীব্র হয়ে উঠল। তাঁর দলবল যারা 'লোলার্ড' নামে পরিচিত, তারা একদা এমন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে 'De Haeritico Comburendo' নামক আইন পাস হয়। এই অপরাধে উইক্লিফ্-পন্থী স্যর জন ওল্ড ক্যাস্‌ল্‌কে পুড়িয়ে মারা হয়। বাঙলাদেশে রামমোহন কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতন ভোগ করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইন পাস হয়নি, বা তাঁর কোন অনুচরকে নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। অথচ তাঁর ক্রিয়াকর্ম তো উইক্লিফের চেয়ে নিরীহ ছিল না।

রামমোহন শাস্ত্রগ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে সুলভে প্রচার আরম্ভ করলেন। এতদিন যা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ীর কুক্ষিগত ছিল, তা অক্ষরপরিচয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেতর

লোকের দৃষ্টিগোচর হল। উইক্লিফ ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে অনুরূপ আন্দোলনের সম্মুখীন হন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বহুকালাশ্রিত সংস্কারে দারুণ আঘাত দিলেন। সর্বোপরি বেদান্তপ্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ প্রচার করে, পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করে, বৈষ্ণব মতবাদের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়ে (কিন্তু শাক্ত মত ও তন্ত্রের প্রতি তাঁর কোনরূপ বিরূপতা ছিল না) তিনি উনিশ শতকের প্রথম পাদে যে কী ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ শতাধিক বৎসর পরে বসে আমরা কল্পনাও করতে পারব না। তাই আমরা রামমোহনকে প্রাচ্যভুবনের উদিত সূর্য বলে গ্রহণ করতে চাই। আপ্তবাক্যের স্থানে বিচারবুদ্ধি, প্রচলিত সংস্কারের স্থানে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যৌক্তিকতা, জীবনের প্রতি কঠোর বাস্তবানুবর্তিতা এবং মানুষের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা—রামমোহনকে আধুনিক মানুষের পুরোধার গৌরব দেয়েছে। এদিক থেকে তাঁর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১] কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাঁর গদ্য নিয়েই আলোচনা করব।

রামমোহন ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন এবং ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রা করেন। মোট পনেরোটি বছর তিনি বাংলা গদ্যে পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ছোটবড় বাংলা পুস্তিকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল অন্ততঃ ত্রিশ, ইংরেজী পুস্তিকার সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। নানাবিধ গুরুতর কর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থেকেও তিনি বাংলা গদ্যে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন, তার কিছু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যান এবং কিছু বিচার-বিতর্কমূলক রচনা। এইপ্রসঙ্গে বক্তব্য যে, যাকে Polemic রচনা বলে, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তিনি তার অগ্রদূত। প্রাচীন যুগে শাস্ত্র ও তত্ত্ব নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছে। গোটা ন্যায়শাস্ত্রটাই তো পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের সওয়ালজবাবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বাঙলাদেশে মধ্যযুগেও তর্কবিতর্কের সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত মিলছে। নব্যন্যায় বাঙালীর সূক্ষ্ম চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের বাইরে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে চৈতন্যদেবকে একজন বিশিষ্ট তার্কিক রূপে আঁকা হয়েছে। এমন কি যখন তিনি ভাবরসে মাতাল, তখনও রামানন্দের সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে মহাপ্রভু সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। সুতরাং রামমোহনের যুক্তি ও তার্কিকতা বাঙালীরই চিত্তসংস্কার থেকে উদ্ভূত। বাঙালীর আচার আচরণ এবং কৃত্যের মধ্যে আবেগের অতিরেক যেমন আছে, তেমনি সূক্ষ্ম চিন্তা ও যুক্তি এ জাতির মনঃপ্রকর্ষকে তীক্ষ্ণতর করেছে। রামমোহনের সমস্ত গদ্যরচনায় সেই বুদ্ধির প্রাধান্য এবং যৌক্তিক পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আবেগের দ্বারা কিছু কিছু আন্দোলিত হয়েছিলেন। আবেগের প্রবলতা না থাকলে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে এতটা তৎপর হতে পারতেন না। পতিবিয়োগবিধুরা বিধবাকে কীভাবে হত্যা করা হয়, সে সম্পর্কে তিনি বলছেনঃ

> "তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর। পরে তাহার উপর এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে। তাহার পর অগ্নি-দেওন কালে দুই বৃহৎ বাঁশ ছুপিয়া রাখ।....অন্য ২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল অবধি আপন আপন প্রাচীন

---

১. তাঁর সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছিলেন, **He was by nature one of those who lead, not one of those who follow, one of those who are in advance of, not of those who are behind their age."**

লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থলোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃদেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে। এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর, কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না।" ২

(সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ)

এখানে তাঁর পুরুষ-হৃদয় কতটা স্নেহার্দ্র ও করুণ হয়ে উঠেছে, তা তাঁর সহজ সরল ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য তাই বলে আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে একই গোষ্ঠীভুক্ত করতে পারি না। রামমোহন মূলতঃ জ্ঞানবাদী, প্রত্যভিজ্ঞামূলক নিরীক্ষাই তাঁর পথপ্রদর্শক। অপর দিকে বিদ্যাসাগর মূলতঃ আবেগবাদী, মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি। সে যাই হোক, রামমোহন বাংলা গদ্যকে তুচ্ছতার অবজ্ঞা থেকে রক্ষা করে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মত-প্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করেছেন এবং এই ভাষাকে গুরুতর ভারবহনক্ষম কর্মে প্রস্তুত করেছেন—এই জন্য তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

২· রামমোহনের পূর্ব্ববর্তী বাংলা গদ্য

১৭৭৮ সালে হলহেড 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং' অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য 'The Grammar of the Bengal Language' লিখেছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে বলেছেন, "I must observe, that Bengal is at present in the same state with Greece before the time of Thucydides; when poetry was the only style to which authors applied themselves and studied prose was utterly unknown."

যাঁরা বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও বিবর্তন সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা হলহেডের এই মত নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত এই মত শিষ্ট-জনের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে। এত দিন ধরে আমরা জেনে এসেছি যে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য ছন্দাত্মক; সে যুগে নাকি কোথাও গদ্যের ব্যবহার ছিল না। সদাশয় মিসনারী সম্প্রদায়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীর দল এবং রামমোহন বাংলা গদ্যের স্রষ্টা ও সংরক্ষক। কিন্তু গত তিন-চার দশকের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বাংলা গদ্য সম্বন্ধে এমন সমস্ত তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, যাতে হলহেডের মতামতের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই পয়ারত্রিপদী ছন্দে রচিত হত। বৈষ্ণবপদকার এবং ভারতচন্দ্র কিছু কিছু ছন্দ বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু পয়ারত্রিপদী ছন্দেই যাবতীয় গদ্যাত্মক বিষয় রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবনগ্রন্থের অনেকটাই বিশুদ্ধ গদ্যধর্মী, কিন্তু তাও পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। মধ্যযুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত না হবার কারণ—পয়ারছন্দ। পয়ারবন্ধ এতটা স্থিতিস্থাপক ও ভারসহিষ্ণু যে, স্বচ্ছন্দেই এতে গদ্যনিবন্ধ রচিত হতে পারে। আমাদের অনুমান পয়ারছন্দে যে-কোন সাহিত্যকর্ম নির্বাহ হতে পারত বলে গদ্যরীতির বিশেষ প্রয়োজন বোধ হত না। কিন্তু তাই বলে কি আমরা মনে করব,

২· এই প্রবন্ধে উনিশ শতকের গদ্য থেকে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে, পাঠকের বোধ-সৌকর্যের জন্য সেখানে আধুনিক বিরামচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দু' দশকের গদ্যে শুধু দাঁড়ি চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন বিরামচিহ্ন প্রায়ই ব্যবহৃত হত না।

বাংলা গদ্য মিসনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা জন্মলাভ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং লালিত হয় রামমোহনের দ্বারা ?

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গদ্যের যে ব্যবহার ছিল না, তা কখনই সত্য নয়। হলহেড অথবা কেরী প্রভৃতি শ্রীরামপুর মিসনের 'ভ্রাতৃগণ' পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখতেন না; তাই তাঁরা গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য তৈরি করতে গিয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পেতেন যে, খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী থেকেই চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ, ক্রয়বিক্রয়পত্র প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে বাংলা গদ্য রীতিমতো ব্যবহৃত হত। ১৫৫৫ সালে কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অহোমরাজ চুকামফা স্বর্গদেবের কাছে সাধুগদ্যেই চিঠি লিখেছিলেন। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে যে, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাগদ্যের ব্যবহারযোগ্য পদবিন্যাসরীতি গড়ে উঠেছিল—"লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" এখানে লক্ষণীয় গদ্যের পদবিন্যাসরীতি ও সুষ্ঠু অন্বয় ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি গড়ে উঠেছিল, চিঠিপত্রে ব্যবহৃত হচ্ছিল। কেরী সাহেবের দল এই রীতির খোঁজ রাখতেন না, বা পুঁথির গদ্য সম্বন্ধে কৌতূহলীও ছিলেন না। তাই তাঁরা ইংরেজী বা সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা গদ্য লেখার ও লেখাবার চেষ্টায় বহু পণ্ডশ্রম করেছেন। খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতেও অহোমরাজ লিখিত কয়েকখানি পত্রে পরিচ্ছন্ন বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইপ্রসঙ্গে স্মরণীয়, মধ্যযুগীয় বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজদরবারে বাংলা গদ্য সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত; চিঠিপত্র, হুকুমনামা, দলিলদস্তাবেজ—সমস্ত ব্যাপারেই বাংলা গদ্যের ডাক পড়ত। ১৭শ শতাব্দীর দিকে মুঘল দরবার ও আদালতের প্রভাবে মামলা ও জমি-জমা সংক্রান্ত লেখায় ফারসী শব্দের কিঞ্চিৎ বাহুল্য থাকত—এখনও আদালতী ভাষা থেকে ইসলামী বাংলার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ধান করেনি। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত বৈষ্ণবীয় স্বকীয়া-পরকীয়া বাদবিসংবাদ সংক্রান্ত যে দলিলটি পাওয়া গেছে, তার ভাষা বেশ স্বচ্ছ এবং পদবিন্যাস রীতিও মোটামুটি প্রশংসনীয়। জয়পুর মহারাজের সভাপণ্ডিত এবং স্বকীয়া-বাদের পরিপোষক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য পরকীয়া মতের পরিপোষক ও বাঙলার বৈষ্ণবসমাজের নেতা রাধামোহন ঠাকুরের কাছে স্বকীয়া পরকীয়াবাদের দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার ক'রে যে 'অজয়পত্র' লিখে দেন তার কিয়দংশঃ

> "মালহাটি মোকামে তোমার নিকট (অর্থাৎ রাধামোহনের কাছে) স্বকীয়াপরকীয়া ধর্ম্ম-বিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ-ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী' গোস্বামী-দিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।"

এ ভাষা তো আধুনিক কালের ভাষা; কেরী সাহেবের 'ধর্মপুস্তক'-এর ভাষা এর চেয়ে অনেক দুর্বল। তিনি গোড়ার দিকে বাইবেল অনুবাদের ভাষায় কিছুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারেননি। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের যে সমস্ত কড়চা জাতীয় পুঁথি পাওয়া গেছে, তার গদ্য বাক্যগুলি সরল ও সংক্ষিপ্ত—পদবিন্যাস রীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। কেরী ও খ্রীষ্টান 'ভ্রাতৃগণ' বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীরা বাংলা গদ্য তৈরি করেননি; বরং তাঁদের অনেকে বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক পদবিন্যাসকে অবহেলা করে একটা কৃত্রিম রীতি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন,—অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এদিক থেকে সার্থক ব্যতিক্রম। অনেকের ধারণা, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীর দল এবং কেরী প্রভৃতি মিসনারীরাই সাধুভাষা

নামক একটি কৃত্রিমাভাষা সৃষ্টি করেছেন। এ মত একেবারে ভুল। সাধুগদ্য বাঙলাদেশের নিজস্ব স্বাভাবিক রীতি। পয়ারছন্দের রূপান্তর হচ্ছে বাংলা গদ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা পয়ারে যে ধরনের বাগ্‌বিন্যাস ও সাধুরীতি অনুসৃত হয়েছে (যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত), বাংলা গদ্যের বাক্যগঠন কতকটা সেই পথই ধরেছে। তাই সাধুভাষা আগন্তুক নয়, বা পণ্ডিতের কৃত্রিম সৃষ্টিও নয়। পুরাতন যুগ থেকে বাঙালী-মনের সঙ্গে পয়ারছন্দ ও সাধু গদ্যরীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রসঙ্গে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পর্তুগীজ মিসনারী-দের গদ্যরচনার চেষ্টাও আলোচনার যোগ্য।

১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে পর্তুগীজ 'হার্মাদা' আর পাদ্রীরা বাঙলাদেশে আনাগোনা শুরু করেছিল। তারা পূর্ববাঙলার অনেক গ্রামে গীর্জা বা 'ধর্ম-ঘর' বানিয়ে হিন্দু ও মুসল-মানকে রোমানক্যাথলিক খৃীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিছুটা সফলও হয়েছিল। তারা কিছু কিছু গদ্য প্রচার পুস্তিকা লেখারও চেষ্টা করেছিল। শোনা যায়, ১৫৯৯ খৃীঃ অব্দের দিকে দোমিনিক-দে-সুজা সোনার গাঁয়ের কাছে শ্রীপুরে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলা গদ্যে দুখানি পর্তুগীজ প্রচার পুস্তিকার অনুবাদও করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দুখানি প্রচারপুস্তিকা পাওয়া গেছে, এই প্রসঙ্গে তার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। দুজন পাদ্রী দোম আন্তোনিও-দে-রোজারিও এবং মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁও দুখানি বিতর্কমূলক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দোম আন্তোনিও বাঙালী হিন্দু, পরে রোমানক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পর্তুগীজ নাম নিয়েছিলেন। তাঁর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ' ১৮শ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রচিত হয়েছিল, কিন্তু লেখা হয়েছিল রোমান হরফে। মানোএল সাহেব খাঁটি পর্তুগীজ পাদ্রী ছিলেন; তিনি ১৭৩৪ থেকে ১৭৫৭ খৃীঃ অব্দ পর্যন্ত ঢাকা জেলার ভাওয়ালে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, গীর্জা বানিয়েছিলেন। তিনি একখানি পর্তু-গীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থও লিখেছিলেন (Vocabulario em Indioma Bengalla e Portuguez') তাঁর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ('Crepar Xaxtrer Orth Bhed') প্রচার-পুস্তিকাটি বাংলা ভাষায় লেখা হলেও রোমান হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল। ১৭৩৩ সালে তিনি ঢাকায় বসে গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তকাটি লেখেন, ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবনে এটি রোমান হরফে ছাপা হয়। দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ' কিন্তু ছাপা হয়নি। এই দুটি গ্রন্থ থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছেঃ

> (১) "বলি বরো ধর্মষ্ঠ ছিলো মহাদাতা ছিলো, যে যাহারে চাহিত, তাহারে তাহা দিতো এ কারোণ পরমেশর বামণ রূপে হইয়া একপদ দিয়া প্রথিবীতে, এক পদ পাতালে, আর পদ সর্গে এইরূপ বলি-রাজারে বলিলেন।" (ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ')
>
> (২) "তোলেদো শুহরে এক গৃহস্থের পুত্র আছিল, সে কুবন্ধুর লগে ফিরিল, কুকার্য্য শিখিয়া কুজন হইল। তাহার পিতা তাহারে শিক্ষা দিত, সে পিতার কথা না মানিত। পিতা একদিন তাহারে শাস্তি দিতে চাহিল; পুত্রে ক্রোধ করিয়া হাত তুলিয়া পিতার মুখেতে চড় মারিল।" ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ')

রোমানক্যাথলিক পাদ্রীদের চেষ্টায় বাংলাগদ্যের যে অনুশীলন হয়েছিল তাতে সাধু গদ্য রীতিই অনুসৃত হয়েছে। দোম আন্তোনিও ও মানোএল সাহেব ঢাকা অঞ্চলে বসে লিখে-ছিলেন, অথচ 'আছিল' 'লগে', "তাহারে" বাদ দিলে আর কোথাও আঞ্চলিক প্রয়োগ নেই, বা মুখের বুলি অনুসৃত হয়নি। বিদেশী ধর্মযাজকও সাধুরীতি অবলম্বন করেছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ নন্দকুমারের পত্রে ফারসী শব্দের বাহুল্য থাকলেও ভাষারীতিতে সাধুছাঁদই ব্যবহৃত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলা শিখে যেসমস্ত আইনগ্রন্থ বাংলায় তর্জমা করেছিলেন, তার ভাষাভঙ্গিমা জড়তাপূর্ণ ও অনভ্যস্ত বটে, কিন্তু সাধুভাষার রীতি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি।

এর পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য রচিত পণ্ডিতমুন্সীদের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। ওয়েলেস্‌লি আহেলা বিলিতি সিভিলিয়ানদের দেশীয় ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতি শেখাবার জন্য ১৮০০ খৃীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের বাংলা, মারাঠী ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরামপুর মিসনের সর্বাধিনায়ক রেভাঃ উইলিয়াম কেরী। কেরী ধর্মপ্রচারণার উদ্দেশ্য নিয়েই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় যে বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, তার মূলেও ছিল অনুদার সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাব। ৩ বাইবেল সম্পর্কে ও খৃীষ্টানধর্ম প্রচারে যাজকসম্প্রদায় সাধারণতঃ যে রকম অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন, কেরী তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ভাষার প্রতি তাঁর যেমন কৌতূহল ছিল, তেমনি ছিল ভাষা শিক্ষা করার স্বাভাবিক প্রবণতা। এই জন্য বাংলা গদ্য তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কাহিনী, ইতিহাস ও গালগল্পকে ভব্যবেশে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুব্যবস্থা করে এই বিদেশী ধর্মযাজক ব্যক্তিটি বাঙালীর চিরদিনের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। তাঁর চেষ্টা, ও উৎসাহ ও সহায়তার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিত ও ফারসী নবীশ মুন্সী বাংলা গদ্য-গ্রন্থ রচনায় প্রস্তুত হলেন, কয়েকখানি পুস্তিকা মুদ্রিতও হল। তার মধ্যে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ বলেই এর খ্যাতি—যদিও বইটি ফারসী শব্দকণ্টকে এবং ত্রুটিযুক্ত অন্বয়ে প্রায় অপাঠ্য হয়ে উঠেছে। কেরী সায়েবের উৎসাহে কলেজের যে সমস্ত বাঙালী অধ্যাপক সাহেব-সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখাবার জন্য লেখনী চালনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশীর চিত্তাকর্ষী হতে পারে অনুমান ক'রে কেরী ইতিহাস, পুরাণের গল্প ও দেশীবিদেশী আখ্যানের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

রামমোহনের পূর্বে কেরীর প্রবর্তনায় প্রকাশিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের গদ্যরীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনেকে বলেন যে রামমোহন নাকি সর্বকর্মক্ষম গদ্যরীতি উদ্ভাবন করেছিলেন। একথা যে যথার্থ নয়, রামমোহনের পূর্বেও বাংলা গদ্যের রূপ ও রীতি মোটামুটি গড়ে উঠেছিল—এটাই প্রমাণিত হবে এই পণ্ডিতমুন্সীদের পুস্তিকার গদ্যরীতি বিচার করলে। অবশ্য এই পণ্ডিতের দল প্রায়শই সংস্কৃত অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন—বোধহয় সংস্কৃতজ্ঞ কেরী সাহেবের অভিপ্রায়ে। বাংলা ভাষায় ইসলামী শব্দের বাহুল্য কেরী পছন্দ করতেন না। ৪ তাঁর পূর্বে হলহেড সাহেবও 'The Grammer of the Bengal Language'-এ বাংলা ভাষায় ফারসী শব্দের ব্যবহারকে নিন্দা করেছিলেন। যাই হোক এই পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ফারসী নবীশ ছিলেন, তাঁরা একটু বেশিমাত্রায় আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

৩. কেরীর জীবনীকার স্মিথ সাহেব স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, "Against Vedas and Upanishadas, Brahmanas and epics he set the Sanskrit Bible."

৪. ১৮১৮-২৭ খৃীঃ অব্দের মধ্যে কেরী যে বিরাট অভিধান মুদ্রিত করেন, তার ভূমিকায় তিনি বাংলাভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারকে মোটেই সুদৃষ্টিতে দেখেন নি।

কারণ তখনও দেশে কাজেকর্মে, আইন আদালতে, সরকারী মহলে ফারসী ভাষার বেশ ব্যবহার ছিল। তা হলেও কেরী ফারসী ভাষাকে বাংলা ভাষায় ব্যবহারের রীতি বোধহয় পরবর্তী কালে একেবারে বর্জন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী তারিণীচরণ মিত্র হিন্দুস্থানী ও উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই কলেজে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁর 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট'-এর (১৮০৩) ভাষায় কিছু কিছু ইংরেজী ধরণের পদ-বিন্যাস থাকলেও (উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক গিলক্রাইস্টের প্রভাবে হয়তো) কোথাও ফারসীর আতিশয্য নেই। মৃত্যুঞ্জয়ের "রাজবলিতে" (১৮০৮) মুসলমানযুগের ইতিহাস বর্ণনায় কিছু কিছু ফারসী শব্দ থাকলেও ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। রামরামের প্রথম গ্রন্থে (রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র) আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য আছে বটে, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'য় (১৮০২) ফারসী শব্দ যথাসম্ভব বর্জিত হয়েছে। বাংলাগদ্য থেকে ফারসী-আরবী শব্দ বিতাড়নে বোধহয় কেরীর প্রভাব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় সংস্কৃতপ্রাধান্য ফারসী শব্দানুকূলতা অথবা চলতি শব্দ কোনটির প্রাধান্য থাকা উচিত, এ নিয়ে কেরী নিশ্চয় চিন্তা করেছিলেন। তাঁর প্রবণতা ছিল সংস্কৃত ও চলতি রীতির প্রতি। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মতো বিরাট পণ্ডিতের গম্ভীর ও ক্লাসিক ছাঁদের বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যেও বলিষ্ঠ চলতি বুলি এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপে-উজ্জ্বল বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যায়। গোলোকনাথ শর্মা অনূদিত 'হিতোপদেশে'-ও গ্রাম্য বাঙলার কিছু কিছু সতেজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বোপরি কেরী সাহেবের নামে প্রচারিত 'কথোপকথন' (১৮০১) উল্লেখযোগ্য। এটি পুরোপুরি কেরীর রচনা নয়। তিনি খুব সম্ভব এটি সঙ্কলন করে-ছিলেন, পণ্ডিত মুন্সীর দলই এর কথিকাগুলি লিখেছিলেন। পুস্তিকাটি লেখা হয়েছিল সাহেব কর্মচারীদের বাংলা কথোপকথন শেখাবার জন্য। তাই এতে কলকাতা ও শহরতলীর ইতরভদ্র, স্ত্রীপুরুষের মুখের ভাষার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—যদিও ভাষার মূল ছাঁদটি সাধু-ভাষাকেই অনুসরণ করেছে। এতে হিন্দুর সমাজ, পারিবারিক জীবন, দৈনন্দিন আচার আচরণ প্রভৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা আছে, তা কেরীর মতো কোন বিদেশীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মনে হয় এর অধিকাংশ রচনাই মৃত্যুঞ্জয়ের। কারণ এরকম চলিত বাংলায় তীব্র তীক্ষ্ম সংলাপ রচনা সে যুগে মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া আর কেউ পারতেন না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সী ও কেরীসাহেবের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিলেই একথা সপ্রমাণ হবে যে, রামমোহনের পূর্বে বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা চলছিল। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> (১) "এই কথা পরামর্শ হইলে অস্ত্রধারি লোক স্থানে স্থানে নিয়োজিত হইল। এ সকল কথা পরম্পর পুরীমধ্যে প্রচার হইলে রাজকন্যা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত, দিবাংশে স্বামীর গোচর করিতে পারেন না। এই রূপ চিন্তাতে দিবাগত হইলে সাঙ্গত্যক্রমে স্বামীকে এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।"
>
> (-১৮০১ সালে ছাপা রামরামের 'রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র')

(২)　　॥ মাইয়া কন্দল ॥

ক ॥ তুমি কোথা গিয়াছিলা পাঁড়া বেড়ানী? সাঁজের কাম কাজ কিছু মনে নাই বটে?

খ ॥ কি কামের দায় তুই ঠেকিয়াছিস যে এত কথা তোর লো?

ক॥ আমি কামে ঠেকি নাই, তুই সকল কামে ঠেকিয়াছিস?

খ॥ চক্ষুখাকী, তোর চক্ষের মাথা খাইয়া দেখিতে পাইস না, এ সকল কাজ কে করিয়াছে?

ক॥ তোর যে বড় ঠেকারা হইয়াছে? একদিন কাম করিয়া এত কইস? আমি তোর সকল জানি।

(-১৮০১ সালে মুদ্রিত কেরীর 'কথোপকথন')

(৩) অবন্তী নামে নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অভিষেক কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন, দুষ্টের দমন—এইরূপে পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন।

(-১৮০২ সালে মুদ্রিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন')

(৪) তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, মাথা হইতে ভার নামা: আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল, ওগো, আমি যাইতে পারিব না—আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল, আয়, এই নে, আজি বড় মজা হইয়াছে—দিব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে।......যা শীঘ্র রাঁধা-বাড়া কর্, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। ......ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল, বটে, পিঠা করা বুঝি বড় সোজা? জান না, পিঠা আঠা; যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না। কখনো তো রাঁধিয়া খাও নাই, আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে, তবে জানিতে।

(মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা,' ১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ রচনার পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক গুলির নানা স্থানে অন্বয় ও সজীবতা লক্ষ্য করা যাবে। রামমোহনের গদ্যরীতিও এত সরস ও সরল নয়। এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে, রামমোহনকে গদ্যের অন্বয়বন্ধন ও বাক্‌রীতি নির্মাণ করতে হয়নি। তিনি সুগম ও সুপরিচ্ছন্ন গদ্যই হাতে পেয়েছিলেন।

'বেদান্ত গ্রন্থের' (১৮১৫) 'অনুষ্ঠান' পত্রে রামমোহন বলেছিলেন, "বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করা উচিত হয়। যে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয়, ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না।" এই উক্তি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহন যখন সকলকে হাত ধরে গদ্য পড়তে শেখাচ্ছেন, তখন তাঁর পূর্বে

বোধহয় গদ্যের পদবিন্যাস পদ্ধতি বলে কিছু ছিল না। একথা কিন্তু ঠিক নয়। রামমোহনের পূর্ববর্তী গদ্যের যে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তাতেই দেখা যাবে যে, ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা গদ্যের পদবিন্যাসরীতি ও অন্বয় গড়ে উঠেছিল। তবে রামমোহন একথা কেন বললেন? সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় বিরামচিহ্নহীন বাংলাগদ্যকে ভাবানুসারে ছেদ দিয়ে পড়তে অসুবিধে বোধ করত। পুরাতন বাংলা গদ্যে শুধু পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর কোন বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হত না। ১৮১৮ সালেই সর্বপ্রথম কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রকাশিত 'নীতিকথা' (২য়) পুস্তিকায় ইংরেজী যতিচিহ্নের পুরোপুরি ব্যবহার লক্ষিত হয়। অবশ্য কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির সঙ্গে ইংরেজী ফুল স্টপও বাংলা বইয়ে নির্বিবাদে ব্যবহৃত হত। রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯) এই রীতিতে ছাপা হয়েছিল। তাই বোধ হয় যতিপাতহীন ছাপা বাংলা গদ্যে অনভ্যস্ত বাঙালী পাঠককে রামমোহন গদ্যছত্র পাঠের রীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আমরা রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ ও গদ্যরীতির পরিচয় নিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব, তাঁর গদ্যরীতির মূলবৈশিষ্ট্যই-বা কি, বাংলা গদ্য বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁর দানই-বা কতটুকু।

৩· রামমোহনের গদ্যগ্রন্থ

প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ক'রে রামমোহন আধুনিক জীবন ও সাধনাকে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তা আমরা সূচনায় বলেছি। কিন্তু বাংলাগদ্যের ইতিহাসে তিনি যে বিশেষভাবে স্মরণীয়, সে কথাটাই বুঝে নেওয়া প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ভাষা শিক্ষায় তাঁর অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল। তিনি অল্প বয়সেই আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন, ডিগ্‌বির কাছে ইংরেজী ভাষাতেও রীতিমতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; এমন কি শ্রীরামপুরের মার্শম্যানের সঙ্গে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান ধর্ম নিয়ে বিতর্কের সময় হিব্রু ভাষায় লেখা মূল বাইবেল পাঠের জন্য পরিণত বয়সে তিনি হিব্রুও শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা ও বলার তাঁর কতদূর নিপুণতা ছিল, তা বোঝা যাবে 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' নামক সংস্কৃত পুস্তিকা থেকে। অনেক সময় তাঁকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চালাতে হয়েছে। তাঁর ইংরেজী ভাষাও অতি পরিচ্ছন্ন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দুখণ্ডে রামমোহনের যে ইংরেজী রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই দেখা যাবে ইংরেজী ভাষার ওপরে তাঁর দক্ষতা কি রকম ব্যাপক ছিল। ইংলণ্ডে থাকার সময়ে জেরিমি বেন্থাম তাঁর লেখা বই পড়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "Your works are made known to me by a book in which I read a style which, but for the name of a Hindu, I should certainly have ascribed to the pen of a superiorly educated and instructed Englishman."

বেন্থামের এই প্রশংসাবাণী আদৌ অতিরঞ্জিত নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, রামমোহনের ইংরেজী রচনা বাংলার চেয়েও স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, পরিমাণেও বাংলার চেয়ে বেশি। আরবী-ফারসী ভাষা ও মুসলমানী কৃত্য তিনি এত ভাল জানতেন যে, নিষ্ঠাবান মুসলমানসম্প্রদায়ও তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলভি' বলে সম্মান করতেন। তিনি প্রথমে আরবী-ফারসী ভাষায় একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রতিপাদক একখানি পুস্তিকা লেখেন—'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' (১৮০৩-৪ সালে প্রকাশিত) এবং ফারসীভাষায় 'মীরৎ-উল-আখবার' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং নানা ভাষায় তাঁর কি রকম অধিকার ছিল তাহা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

রামমোহনের সমস্ত রচনা অনুবাদ, ব্যাখ্যান ও বিতর্কমূলক বলে কোন গ্রন্থেই বিশিষ্ট প্রবন্ধের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি। অনেকটা প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের ভঙ্গিতে তিনি আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন এবং প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই তাঁর বাংলা পুস্তিকাগুলিতে প্রচারধর্মিতার প্রভাব বেশি। তাই 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য পুস্তিকাগুলি প্রায়ই পুরো গ্রন্থের মর্যাদা পায়নি; এগুলির আকারও খুবই ছোট, কয়েকপৃষ্ঠার বেশি নয়। অনুবাদ, ব্যাখ্যা সহ এই রকম আটটি পুস্তকপুস্তিকার নাম উল্লেখ করা যেতে পারেঃ—বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৬), তলবকার উপনিষৎ, কেনোপনিষৎ (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ (১৮১৬), কঠোপনিষৎ (১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (১৮১৭), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), মুণ্ডকোপনিষৎ (১৮১৯)।

কারো কারো মতে রামমোহন আধুনিক কালে নোতুন করে বেদবেদান্ত উপনিষৎ চর্চা শুরু করেন। তাঁর আগে মধ্যযুগে শাস্ত্রের ধারা বলতে শুধু ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি ও দ্বৈতবাদী দর্শন আলোচনাকে বোঝাত। কিন্তু বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ভাষা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয় না। তাই মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে পৌরাণিক স্মার্ত সংস্কারের প্রাধান্য। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা বেদ বেদান্ত উপনিষদ শিক্ষিতমহলে জনপ্রিয় হয়েছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে গীতার তত্ত্বকথা আবার সুপ্রচারিত হয় এবং ১৯শ শতকের সপ্তক দশকের পর ব্রাহ্মসমাজ অন্তর্বিরোধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে স্মার্তসংস্কার হিন্দুর চেতনাকে আবার অধিকার করলো, গীতার সঙ্গে বেদান্তও গৃহীত হল। রামকৃষ্ণসম্প্রদায় ছিলেন এর প্রধান প্রচারক। সেইজন্য রামমোহনকে আধুনিক কালে বাঙলাদেশের বেদান্ত উপনিষদ প্রচারক বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ১৮শ শতকের মধ্যভাগে বলদেব বিদ্যাভূষণ দশখানি উপনিষদের টীকা রচনা করেছিলেন। রামমোহনের সময়েও কলকাতার পণ্ডিতদের টোলে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা অজ্ঞাত ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নিজেই তাঁর চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত ও উপনিষদ পড়াতেন। রামমোহনই তার উল্লেখ করেছেনঃ "ঐ সকল মূল উপনিষদ আচার্যের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের বাড়ীতে এবং কালেজে ও অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেতে আছে।"[৫]

বাঙলাদেশে রামমোহন বেদান্তচর্চার সূত্রপাত করেন, একথাও ঠিক নয়। মধ্যযুগে বাঙলাদেশে বেদান্তসূত্রের অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী—উভয় আলোচনাই সুপ্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব সমাজে বেদান্তের দ্বৈতবাদী আলোচনা জনপ্রিয় হলেও অবৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাচীনযুগেও অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী ১৬শ শতকের কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তাঁরপরে ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতবাদের টীকাকার হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি "অদ্বৈত-সিদ্ধান্তবিদ্যোতন" নামক একখানি অদ্বৈততত্ত্ব সম্পর্কীয় মৌলিক গ্রন্থও লিখেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রামানন্দ বাচস্পতি ঘোরতর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যের ওপর একাধিক গ্রন্থ লিখেছিলেন। রামমোহন সেই ধারার অনুবর্তন করেছেন। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেদান্ত গীতা প্রভৃতির আলোচনা কখনও হ্রাস পায়নি; তবে তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ জ্ঞানানুশীলনে বেদান্তের চর্চা করলেও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে স্মার্ত ও পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারা অধিকতর চালিত হতেন। উদাহরণ স্বরূপ মৃত্যু-

---

৫. 'কবিতাকারের সহিত বিচার'

ঞ্জয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় ইংরেজীনবীশ না হলেও অনেক বিষয়ে আশ্চর্য উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।৬ তিনি বেদান্ত ও উপনিষদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হলেও রামমোহনের 'বেদান্তসারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে "বেদান্তচন্দ্রিকা" (১৮১৭) লেখেন এবং দৃঢ়সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ব্রহ্ম কে সগুণ সোপাধিক ভাবে, বা নানা নামরূপের মধ্য দিয়া উপসনা করলে হানি হয়না। তাঁর উক্তি ঃ "অতএব যে যাহাতে যেকোন বিহিত প্রকারে ও যেকোন জ্ঞানে যাহাকে উপাসনা করে, তাহারা সকলেই ঐ এক ঈশ্বরের উপাসনা করে।"

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থে' (১৮১৫) বেদান্তের সূত্রগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক'রে নিষ্কল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করেন এবং 'বেদান্তসারে' (১৮১৫) উক্ত আলোচনাকে আরও সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ব্রহ্মের সগুণ উপাসনা, বিশেষতঃ পৌরাণিক দেববাদকে আক্রমণ করেন—অবশ্য মার্জিত ভাষায়। এর ফলে তাঁকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল—হওয়াই স্বাভাবিক। তখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হত বটে, কিন্তু দেশাচারে পৌরাণিক দেববাদ স্বীকৃত হয়ে আসছিল। ঐ পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা ঘরের মধ্যে পৌরাণিক বহুদেববাদ মেনে চলতেন। তাঁরা মনে করতেন, বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুদ্ধির ব্যাপার, এবং মুষ্টিমেয় তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যক্তিগত অনুশীলনের বস্তু,—তার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতত্ত্বের কোন বিরোধ নেই। ব্রহ্মই নানা নামরূপের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছেন। এই মত মৃত্যুঞ্জয়ের উক্তিতেই সপ্রমাণিত হবে। "অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দশভুজাদি রূপেতে ধেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন, ও স্বমাত্রপ্রাধান্য-বিবক্ষাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রেন্দ্রাদি নানা পুংদেবরূপেতে উপস্য হন।"-(বেদান্তচন্দ্রিকা)

রামমোহন বেদান্তের একেশ্বরবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করলেও 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা'—ব্রহ্মবাদের এই তত্ত্বটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। জগতের যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সত্তা নেই, অতএব প্রতিভাসিক জগৎচেতনা খপ্নের মতো অলীক—রামমোহনের মতো বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ একথা মানতে পারতেন না। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যে-রামমোহন বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচারে পরমোৎসাহী তিনিই আবার বেদান্তের মায়াবাদকে অস্বীকার করে লর্ড আমাহার্স্টকে লিখেছিলেন,

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta: in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths in fitted to be better members of society by the Vedanta doctrines which teach them to believe that all visible things have no real existance, that as father, brother etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

সাধারণ বৈদান্তিকের সঙ্গে রামমোহনের এইখানে মৌলিক পার্থক্য। তিনি যে বলেছিলেন,

---

৬. মৃত্যুঞ্জয় সেকেলে পণ্ডিতী আদর্শে বাস করলেও সতীদাহ প্রথা আদৌ সমর্থন করেন নি। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলেও বিলেতে গিয়ে রামমোহন সতীদাহ ব্যাপারে মৃত্যুঞ্জয়ের মতকে প্রামাণিক হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন।

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not well calculated to promote their political interest."—এতে তাঁর মত ও আদর্শ স্পষ্ট হয়েছে। সে যাই হোক, তাঁর উপনিষদের অনুবাদের অনেকটাই সহজবোধ্য হয়েছে, তা স্বীকার করতে হবে। রামমোহনের অনুবাদ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, তাঁর ভাষায় সাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয়নি, এতে লালিত্যের অভাব আছে। কথাটা অযৌক্তিক নয়। এর কারণ তিনি ভাষামার্জনের বিশেষ অবকাশ পাননি; অনুবাদকে পুরোপুরি মূলানুগ করবার জন্যই এই ভাষাতে খানিকটা জড়তা এসে গেছে। সেটুকু স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যানে বাংলা গদ্যকে নিয়োগ করেছিলেন, এর জন্যই বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটা বড় দিক খুলে গিয়েছে।

এ ছাড়া রামমোহনের কিছু বিতর্কমূলক রচনা আছে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি পুরাতনপন্থী পণ্ডিতসমাজের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন, দেশাচারের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন বলে সাধারণ লোকেরও পুরোপুরি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি। তাঁর বিতর্কমূলক ও বিচার-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ (১৮১৮), ঐ দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৯২০), সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ (১৮২১), চারিপ্রশ্নের উত্তর (১৮২২), পাদরিশিষ্য সংবাদ (১৮২৩), পথ্যপ্রধান (১৮২৩), কায়স্থের সহিত মদ্যপানবিষয়ক বিচার (১৮২৩), সহমরণ বিষয়ক (১৮২৯), বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব দ্বৈতবাদ ও সহমরণ—রামমোহনকে এই তিন ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তার মধ্যে বেদান্ত ও ভক্তিদর্শন নিয়ে মতবিরোধ প্রধানতঃ পন্ডিতমন্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সহমরণ বিষয়ক বিতর্ক জনসাধারণের মধ্যেও প্রচুর কৌতূহল, কোথাও-বা প্রতিকূলতা সঞ্চার করেছিল। এই পুস্তিকাগুলি প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত হয়েছিল, কাজেই রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণ ও পারিপাট্যের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তবু এই সমস্ত আলোচনায় তিনি যে রকম সংযম ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, তাতে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

রামমোহনের প্রতিপক্ষেরা তাঁকে অনেক সময়ে ইতর ভাষায় কটূকাটব্য করেছেন, কিন্তু তিনি বিতর্কে আক্রমণাত্মক বা ঈর্ষাপ্রণোদিত তীব্র বাক্য ব্যবহার করেন নি। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো পণ্ডিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও বিতর্কে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাক্য ব্যবহার করেছেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁর 'পাষন্ডপীড়নে' তো রুচির মুখ রক্ষা করাও প্রয়োজন বোধ করেননি। মৃত্যুঞ্জয় "বেদান্তচন্দ্রিকায়" রামমোহনকে 'বেদান্তবৃষভ' "অগ্রাহ্য নামা-অমুক" ইত্যাদি অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন, শাস্ত্রবিচারে অনুচিত পরিহাসেরও সাহায্য নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছেন, "পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধুভাষা এবং দুর্বাক্য কথন সর্বথা অযুক্ত হয়।" কাশীনাথ রামমোহনকে আরও তীব্র জ্বালাকর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। রামমোহন এই সমস্ত উত্তেজক বিতর্কের উত্তরে মাত্র দুএক বার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ভক্তিবাদের কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। সেই জন্য প্রতিপক্ষ বৈষ্ণবমতাবলম্বী হলে তিনি ঐ মতের খোঁটা দিয়ে একটু সাম্প্রদায়িক ভাবে আক্রমণ করতেন। কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের বৈষ্ণব মতকে তিনি ব্যঙ্গ করে 'পথ্য প্রদানে' লিখেছিলেন, "গৌরাঙ্গ যাঁহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাঁহারা শব্দব্রহ্ম, তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"

উদ্দেশ্যমূলক বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকা বাদ দিলে রামমোহন বিশুদ্ধ সাহিত্যধর্মী বা প্রবন্ধনিবন্ধ লিখবার অবকাশ পাননি। কলকাতায় আসার পর তাঁকে দিবারাত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সাময়িক পত্র সম্পাদনাও তাঁর অনেকটা সময় নিয়েছে।৭ কাজেই ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গিমাকে পরিশীলিত করবার তাঁর সময়ই ছিল না। তাঁর প্রতিভা ও কর্মোদ্যম শুধু প্রাথমিক কাজে ব্যয়িত হয়ে গেছে; সেই জন্য তাঁর কাছ থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্য যতটা উপকৃত হতে পারত, ততটা পারেনি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা পেষণকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, কিন্তু তাতে শালগ্রামের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়।

তাঁর বিচারবিতর্ক, প্রচারপুস্তিকা, ব্যাকরণ, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি বাদ দিলেও একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে কিছু কিছু সাহিত্যগুণ লক্ষ্য করা যাবে। 'পাদরি ও শিষ্যসম্পদ' (১৮২৩) কথিকাটিতে "এক খ্রীষ্টিয়ান পাদরি ও তাঁহার তিন জন চীন দেশস্থ শিষ্য ইহারদের পরস্পর কথোপকথন"-এর কাল্পনিক সংলাপের মধ্য দিয়ে ত্রিত্ববাদী (Trinitarian) খ্রীষ্টান মতের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। রামমোহন নিজে খ্রীষ্টান ধর্মকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর বন্ধু ও ঊর্ধ্বতন কর্মচারী জন্ ডিগ্‌বিকে একবার লিখেছিলেন, "I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge."
কিন্তু তিনি খ্রীষ্টানধর্মের যুক্তিহীন আপ্তবাক্যকে বিশ্বাস করতেন না, বিশেষতঃ ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানদের তিনি পৌত্তলিক হিন্দুদের সমতুল্য মনে করতেন। এই 'পাদরি ও শিষ্যসম্বাদে' মৃদু পরিহাসের সাহায্যে তিনি খ্রীষ্টান রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এক খ্রীষ্টান পাদরি তাঁর তিনটি চৈনিক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে ভাই, ঈশ্বর এক, কি অনেক?" তাদের একজন বলল, "ঈশ্বর তিন," আর একজন "ঈশ্বর দুই," এবং শেষর জন বলল, "ঈশ্বর নাই।," পাদরি এই উত্তরে বিব্রত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, ঈশ্বর তিনও নন, দুই-ও নন—তিনি এক। তখন প্রথম শিষ্য বলল, "আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর এবং হোলি গোষ্ট অর্থাৎ ধর্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনা মতে এক, এক, এক—অবশ্য তিন হয়।" দ্বিতীয় শিষ্য বলল, তিন ঈশ্বরের মধ্যে "পশ্চিমদেশের কোন এক গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন—ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্তমান আছেন।" তৃতীয় শিষ্য বলেছিল, 'ঈশ্বর নাই'—সে তার যুক্তি বিশ্লেষণ করে বলল, "পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেক অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খ্রীষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন; কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল আরবের সমুদ্রতীরস্থ ইহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?" এখানে রামমোহন অসঙ্গতি ও অযুক্তিকে ব্যঙ্গের দ্বারা হাস্যাস্পদ করেছেন। এই ছোট রচনাটিতে বাস্তবিক সাহিত্যগুণ সঞ্চারিত হয়েছে।

যাকে রসসাহিত্য বলে, অথবা পরম্পরা সমন্বিত চিন্তামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধ বলে, রামমোহন সেরকম বিশেষ কিছু লিখবার সুযোগ পাননি; কাজেই তাঁর গদ্যরচনা খুবই সীমাবদ্ধ ও বৈচিত্র্যহীন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই প্রাচীন নৈয়ায়িকের মতো পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষের বাদানুবাদের ধারাক্রমে বিবৃত। এ ধরনের গদ্যে বিতর্কের কাজ চলতে পারে, এমন কি বিবৃতির কাজও আংশিক

৭. 'মীরৎ-উল-আখবর' ও "সম্বাদকৌমুদী"

ভাবে সমাধা হতে পারে; কিন্তু সৃষ্টিশীল কোন কিছু রচনা সম্ভব নয়। রামমোহন সমাজ, ধর্ম নীতির প্রয়োজনে কলম ধরেছিলেন, কলাসাহিত্য সৃষ্টি, বা নিঃস্পৃহ জ্ঞানপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই জন্য তিনি Polemic লেখকের প্রথম সারিতে বিরাজ করলেও সাহিত্যের খাসদরবারে বিশেষ কোন স্থান দাবি করেন নি। ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর সম্ভাবনাও ছিল না। তখন গদ্যকে যুক্তির শাণপাথরে ঘষে ঘষে ধারালো ক'রে তোলা হচ্ছিল, তখনও তাকে সাহিত্যকর্মে নিয়োগের কথা রামমোহন ততটা ভেবে দেখেননি, বা প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য একথাও ঠিক যে, রামমোহনের সমকালে বর্তমান কোন কোন লেখকের রচনায় সাহিত্যরস সঞ্চারিত হয়েছিল। রামমোহনের প্রতিপক্ষগণ বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের রচনায় অধিকতর সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যা রামমোহনের লেখায় খুব সুলভ নয়।

৪. রামমোহনের গদ্যরীতি

রামমোহনের গদ্যরীতি নিয়ে নানা বিতর্ক ও বিরুদ্ধ মত চলে আসছে। কেউ কেউ তাঁকে সাধু ও পরিচ্ছন্ন গদ্যের জনক বলে সম্মান করেন, কেউ আবার এ মত মানতে চান না। তাঁদের মতে রাম-মোহনের গদ্যরীতি প্রায়শই জড়তাগ্রস্ত; যথার্থ বাংলা গদ্যের সংগে তাঁর গদ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, রামমোহন বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেন নি, মিসনারী সম্প্র-দায় বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীরাও বাংলা গদ্যের জন্মদাতা নন। তাঁদের পূর্বে প্রায় তিনশ' বছর ধরে পুঁথিপত্রে ও দৈনন্দিন ব্যবহারে যে বাংলা গদ্য চলে আসছিল, তার সংগে আধুনিক বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস ও অন্বয়গত খুব একটা বিসদৃশ পার্থক্য নেই। এমন কি রামমোহনের সমসাময়িক অনেক লেখকের রচনা কোন কোন অংশে তাঁর চেয়ে সুখপাঠ্য। স্বচ্ছন্দতা ও বহমানতা তাঁর গদ্যের প্রধান লক্ষণ। ভাষার মধ্যে মার্জিত মনোভাব ও সংযত যুক্তিবিন্যাস তাঁকে শ্রেষ্ঠ Polemic লেখকে পরিণত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের কেউ কেউ (যেমন মৃত্যুঞ্জয়) সাহিত্যিক গদ্য লিখেছেন বটে, কিন্তু বিচার-বিতর্কের জন্য যে সংযত ও ভারসহ গদ্যের প্রয়োজন—রামমোহন সেই গদ্যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই ধরণের সংযত পরিচ্ছন্ন গদ্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছেঃ

> (১) "দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদের মধ্যে, মানুষদের মধ্যে যে-কেহ-ব্রহ্ম জ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন, তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনু-ষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে, সে দেবতার পূজ্য হয়েন—এমন শ্রুতিতে কহিতেছেন।"
>
> —বেদান্তসার, ১৮১৫
>
> (২) "বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীত-কালে, কি বর্ষাতে, স্থানমার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুড় শাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন ২ নিয়মিত কালে করে······ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহাদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ

সকলকেও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে....।"

—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ১৮১৯

উল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটিতে আধুনিক গদ্যের আভাস ফুটে উঠেছে: পদান্বয় বা শব্দযোজনায় বিশেষ কোন উৎকট আতিশয্য দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য তাঁর রচনার অনেক স্থান 'যেঁহ, তেঁহ' "করিবাতে," 'হইবাতে,' 'এহার,' "তাহান্দের; প্রভৃতি পুরাতন ধরনের বাক্‌রীতি লক্ষ্য করা যাবে। রামমোহনের সমসাময়িক লেখক এই প্রয়োগের অনেকটা বর্জন করেছিলেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহনের গদ্য সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। গুপ্তকবি রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "দেওয়ানজী (অর্থাৎ রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিলনা।" রামমোহন নব্যন্যায়ের শেষ উত্তরাধিকারী। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনাতেই ন্যায়ের ভাষার মতো যুক্তিপ্রতিযুক্ত স্থাপনের চেষ্টা দেখা যায়। এ ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র তুলনায় 'জলের ন্যায় সহজ'—তা ঠিক।৮ মৃত্যুঞ্জয় থেকে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাকঃ

"আর শুন, উপাসনাপরম্পরা ব্যাতিরেকে সাক্ষাৎ কখন হয় না। নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক, সামান্য যে লৌকিক রাজাদের উপাসনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া বুঝ। রাজাদির যে উপাসনা, সে কি তদীয় শরীর রূপগুণাদি সেবা স্তবাদি ব্যাতিরেকে হয়? রাজার যে শরীর রূপগুণাদি সেই কি রাজা? কিম্বা তাহা হইতে অতিরিক্ত চেতনারূপী পুরুষ রাজা? যদি বল যে, শরীরাদি সেই রাজা, তবে কি মৃত রাজশরীর দাহতে রাজার দ্রোহ হয়? তাহা নয়।"

—বেদান্তচন্দ্রিকা

রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থে'র তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের এ ভাষা কিছু গুরুভার, দার্শনিক পরিভাষায় কণ্টকিত, এবং অনধিকারীর কাছে এ ভাষা ও বক্তব্য বস্তু যে হস্তামলকবৎ নয়, তা অবশ্য স্বীকার্য। রামমোহন গুহাহিত শাস্ত্রকথাকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছিলেন। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের এই মেদস্ফীত ভাষাকে ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য এই যে, সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন, কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয়। অতএব প্রার্থনা এই যে, দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য (মৃত্যুঞ্জয়) লিখেন, যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।"—ভট্টাচার্যের সহিত বিচার।

---

৮. ঈশ্বর গুপ্তের এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে' বলেছেন যে, তিনি রামমোহনের গদ্যে যথাযোগ্য যতিচিহ্ন দিয়ে দেখেছেন, "সে লেখা জলবত্তরল হয়েছে।" আবার তিনিই ১৩২২ সনে উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনে বলেছিলেন, "এ গদ্য, আমরা যাকে modern prose বলি, তাহা নয়।"

মৃত্যুঞ্জয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। মার্শম্যান তাঁকে ডক্টর জনসনের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয় বিস্ময়কর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসুলভ রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। গুহ্য শাস্ত্রকথাকে তিনি দেশভাষায় প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন; কারণ তা অদীক্ষিত ও অনুপযুক্তের হাতে পড়তে পারে, তাতে শাস্ত্রের অমর্যাদাই হবে। রামমোহন যখন সরল বাংলায় বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করছিলেন, তখন মৃত্যুঞ্জয় এই অনাচারে শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। তিনি বলেছেন, "যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন।" অর্থাৎ ভট্টাচার্য শাস্ত্রাদিকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মাপণ্ডিতের খুঙ্গিপুঁথির মধ্যে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন। রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদগোপ্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করছেন দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নিজেই 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ও প্রবোধচন্দ্রিকা'য় দিব্যি সরল বাংলায় ব্রহ্মতত্ত্ব ও মোক্ষপদ ব্যাখ্যা করেছেন! সে যাই হোক, বোধগম্যতার দিক থেকে বিচার করলে রামমোহনের গদ্য খুবই প্রশংসনীয়; তিনি সংস্কৃতগন্ধী জটিল শব্দবিন্যাস, সমাসসন্ধির সমারোহ অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রভৃতি পণ্ডিতম্মন্যতা যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। তাতে সরসতা না থাকলেও বহমানতা আছে।

কিন্তু আর একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, রামমোহনের গদ্য বোধগম্যতার দিক থেকে প্রশংসনীয় হলেও এর অন্বয়বন্ধন, শব্দযোজনা ও বাগ্‌বিন্যাস কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ও স্খলদ্‌গতি। বরং মৃত্যুঞ্জয়ের বাক্‌রীতি গুরুভার হলেও যথার্থ গদ্য হয়ে উঠেছে। রামমোহনের "বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পুষ্পকে উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয়, যাহা আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমারদের মধ্যে থাকে, এবং কি খিৃষ্টান, কি অখিৃষ্টান ভিন্ন সকলের সমানরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না—যদ্যপিও কিরূপে ও কি নিয়মে বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় না"—৯ এই পংক্তিবিন্যাস কি স্বাভাবিক? এর মধ্য থেকে ন্যায়শাস্ত্রী রামমোহন উঁকি দিচ্ছেন। প্রমথ চৌধুরী এ বিষয়ে যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন নাঃ "কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের রচনাপদ্ধতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।"১০ রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনা, বেদান্ত গ্রন্থাদির টীকাভাষ্য ও অনুবাদের ভাষার মধ্যে এই ধরণের অনভ্যস্ততা ও জড়তা লক্ষ্য করা যাবে। তাঁকে যাঁরা "The pioneer of literary prose" ১১ বলে সম্মান দেন, তাঁরা যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে এই দিকটি ভেবে দেখেন নি।

অবশ্য রামমোহনের যে রচনাগুলি কিঞ্চিৎ বিবৃতিমূলক, তার ভাষায় এই শাস্ত্রঘেঁষা পদবিন্যাসের ত্রুটি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে, যেমন—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বা বিতণ্ডামূলক কিছু কিছু রচনা। 'গোস্বামীর সহিত বিচার', 'প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক সম্বাদ', 'পথ্যপ্রদান'—এগুলির

---

৯. "ব্রাহ্মণসেবধি"

১০' প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ, ১ম

১১. J. C. Ghosh—'Bengali Literature' (Oxford)

ভাষায় দ্বন্দ্বের আভাস, প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করবার এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে বলে রামমোহন শাস্ত্রমার্গের অনভ্যস্ত ভাষা ভঙ্গিমা এই সমস্ত রচনায় সাধ্যমতো বর্জন করেছিলেন। এই রচনাটির স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়:

> "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয়ই করেন?"—'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ—'

এ ভাষাকে কিন্তু modern prose বলতেই হবে। রামমোহনের শাস্ত্র মার্গীয় রীতি বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হয়নি বটে, কিন্তু এ ভাষা প্রচলিত রীতি থেকে কি পৃথক? বাংলাগদ্যের রীতি ১৬শ শতক থেকে চলে আসছিল, রামমোহন এখানে সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন। এই স্বাভাবিক, পরিচ্ছন্ন ও সরল রীতি তাঁর সৃষ্টি নয়, তাঁর আগে থেকেই এর বিশেষ ব্যবহার ছিল, তাঁর সময়েও অনেকে এই রীতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি', রামরাম বসুর 'লিপিমালা', কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন', গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (প্রমথনাথ শর্ম্মা) 'নববাবু বিলাস, নববিবিবিলাস' ইত্যাদি পুস্তকপুস্তিকাগুলি এই সাধুরীতিতে রচিত। এই সাধুগদ্যরীতি তৎকালীন যাবতীয় সাময়িক পত্রে (বেঙ্গল গেজেটি, দিগ্দর্শন, সমাচার দর্পণ, সম্বাদকৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত প্রভৃতি) ব্যবহৃত হ'ত। তথাকথিত 'ইয়ংবেঙ্গল'গণ যে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ করেছিলেন তাতেও এই সাধুরীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমারের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এই রীতিই স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন "বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশ করলেন, তখন তিনিও এই ভাষা অনুসরণ করেছিলেন। এই বিবৃতিমূলক গদ্যকে রসসমন্বিত করে বিদ্যাসাগর যুক্তিতর্কের সঙ্গে সরসতা, লালিত্য ও শ্রুতিসৌকর্য সৃষ্টি করে বাংলা গদ্যের যে রীতি নির্ধারণ করলেন, পরবর্তীকালে এক শতাব্দী ধ'রে বাংলা গদ্য সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেছে।

রামমোহনের যুগে সাধুরীতির সঙ্গে মাঝে মাঝে কেউ কেউ চলিত সংলাপের বাক্‌রীতি ও কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেরীর 'কথোপকথনে' পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত চলতি শব্দের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। মৃত্যুঞ্জয় এই ধরণের ভাষায় আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় চলতি গ্রাম্যশব্দ, একটু অমার্জিত ও রুচিকটু হলেও, অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ও গ্রাম্য রসিকতাকে স্বচ্ছন্দে সাহিত্যের পংক্তিভোজে সম্মানের আসন দিয়েছেন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'র (১৮২২) ভাষাতেও এই ধরণের সহজ সংলাপের (কিন্তু মার্জিত) রীতি অনুসৃত হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রে জনরুচির অনুরোধে রসিকতাপূর্ণ হালকা তরল পরিহাসসংবলিত রীতি ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু রামমোহনের ভাষায় অনুচিত লঘুপরিহাস নেই বললেই চলে। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁকে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ ক'রে লিখেছিলেন 'পাষণ্ডপীড়ন'। এ'র রুচি নিন্দনীয়, কিন্তু ভাষার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝাঁঝ বিশেষভাবে উপভোগ্য। রামমোহন এ'র কদর্য গালির জবাবে লিখেছিলেন 'পথ্যপ্রদান'। এতে কুরুচিপূর্ণ নিন্দা বিদ্রূপের লেশমাত্র নেই, এতে আছে প্রতিপক্ষের কুযুক্তি দেখিয়ে

তাঁকে স্বমতে আনার চেষ্টা। তাই তাঁর ভাষা সংযত স্থির কিন্তু স্বাভাবিক উত্তাপবর্জিত। রামমোহন মদ্যমাংস সেবন সমর্থন করলে কাশীনাথ তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বললেন ঃ

> "এ সকল কথা শুনিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যদি এ সকল গর্হিত কর্ম্ম করিলেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়, তবে হাড়ি-ডোম চাঁড়ালমুচি—ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে? ইহাদিগকে কেন ব্রহ্মজ্ঞানী কহা না যায়? তাহারা ভাক্ত তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সকল (রামমোহন ও তাঁর অনুচরবর্গ) হইতেও এই সকল কর্ম্মে বরং অধিকই হইবেক, ন্যূন কোন মতেই হইবেক না।"—পাষণ্ডপীড়ন

রামমোহন এর প্রত্যুত্তরে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বললেন যে, নীচ যদি দুর্বাক্য বলে, তাহলে সুজন কি তাতে দুঃখ পায়?—বরং তাতে হাসে। কাক-ভেক-গর্দ্দভের চীৎকারে কেউ কি নগর ত্যাগ করে যায়? এ ব্যঙ্গ শালীনতাকে কোথাও লঙ্ঘন করেনি, অথচ ব্যাঙ্গের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তবে কাশীনাথের ব্যঙ্গের অম্লাক্ত তীব্রতা রামমোহনে অনুপস্থিত।

রামমোহনের গদ্যরীতি সংস্কৃত টীকাভাষ্যের খানিকটা ধার ঘেঁষে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং সেইজন্য এ গদ্য স্বচ্ছন্দরীতির বিরোধী। আমাদের মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি'র (১৮০৮) ভাষাতে বাংলা গদ্যের সেই প্রাণবস্তু ও রীতি যথার্থ অনুসৃত হয়েছে, যা দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে অনুশীলিত হয়ে আসছিল এবং যা পরবর্তী কালেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। রামমোহন যেখানে সেই রীতি অনুসরণ করেছেন, সেখানে ভাষা অনেকটা স্বচ্ছন্দচারী হয়েছে। সুতরাং যাঁরা বলে থাকেন যে, রামমোহন সাধু বাংলাগদ্যের স্রষ্টা, তাঁদের এ মন্তব্য যে পুরোপুরি যুক্তিসহ নয়, তা আমরা ইতিপূর্বে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি। রামমোহন গদ্যকে বিতর্কবিচারে প্রয়োগ করে একটা নতুন দিক খুলে দেবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাষা থেকে পুরনো বাক্‌রীতি ও সংস্কৃতানুসারিতা সম্পূর্ণরূপে যায়নি বলে এ রীতি বাংলা গদ্যে গৃহীত হয়নি। পরবর্তী কালে, দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ডাফ্ সাহেবের India and India's Mission গ্রন্থকে আক্রমণ ক'রে ইংরেজীতে 'Vedantic Doctrines vindicated প্রবন্ধ লিখে এবং বাংলায় তার অনুবাদ ক'রে ডাফের বেদান্তবিরোধী কুৎসাকে ছিন্নভিন্ন করেন। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে অক্ষয় কুমার দত্তের দীর্ঘদিন ধ'রে বিতর্ক চলেছিল এই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়'। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে এবং বহুবিবাহের বিপক্ষে যে সমস্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন তাতেও এই বিতর্ক ও বিচারের রীতি অবলম্বিত হয়েছিল; কিন্তু সে ভাষা যথার্থ বাংলা গদ্যরীতিকেই অনুসরণ করেছে, তাতে সংস্কৃত আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ভাষারীতির প্রভাব নেই।

রামমোহন আধুনিক প্রাচ্যের প্রথম জাগ্রত মানুষ। জ্ঞানবাদ, যুক্তি, প্রয়োগবিজ্ঞান, উপযোগবাদ প্রত্যভিজ্ঞামূলক আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি আধুনিক পূর্বহেতুকে অবলম্বন করে তিনি নবজীবনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রাচীন ভারতসংস্কৃতিকে যুগমানসের সঙ্গে অম্বিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বাংলাগদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। সুললিত সাহিত্যিক গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্তে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারের সংযতভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এই জন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিক্‌নির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন।

য়োহান্ গেঅর্গ ব্যুল্যর্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই জার্মানীর হ্যানোভার প্রদেশে বোরষ্টেল নামক গ্রামে য়োহান গেঅর্গ ব্যুল্যর্ জন্মগ্রহণ করেন। ব্যুল্যরের পিতা একজন গ্রাম্য ধর্মযাজক ছিলেন। হ্যানোভারে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যুল্যর্ গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি "ডক্টরেট্" উপাধি লাভ করেন। গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিওডোর বেন্ফি ছিলেন ব্যুল্যরের সংস্কৃত শিক্ষক। বেন্ফির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাঁহার এই মেধাবী ছাত্রকে সংস্কৃত চর্চায় দীক্ষা দান। তিনি ব্যুল্যরকে বলেন যে ভাষাতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে সংস্কৃত পাঠ করিলে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না, সংস্কৃত ভাষা অখন্ড মনোযোগের সহিত চর্চার প্রয়োজন। এইভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলেই বৈদিক সাহিত্যে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। ব্যুল্যরের সহিত বেন্ফির সম্পর্ক ছিল ভারতীয় গুরু শিষ্যের ন্যায়। ব্যুল্যর্ পিতৃতুল্য গুরুর পরামর্শ শিরোধার্য করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে সংস্কৃত অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্যারিস, লন্ডন ও অক্সফোর্ডে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই স্থানগুলির পুঁথি সংগ্রহশালায় তিনি সংস্কৃত পুঁথিগুলি অধ্যয়নের সঙ্গে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিতেন ও একই বিষয়ের পুঁথিগুলির পাঠ ভেদ মিলাইয়া লইতেন। লন্ডনে সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে পন্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমুল্যর্ গোল্ডষ্টুকর প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময়ে তিনি ম্যাক্সমুল্যরের অনুরোধে তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের নির্ঘন্ট প্রস্তুত করিয়া দেন।

ইংল্যান্ডে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্যুল্যর্ উইন্ডসরস্থিত রাজকীয় পুস্তকালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিন বৎসর কাল এই পদে কার্য করার পর তিনি গোটিঙ্গেনে অনুরূপ একটি পদলাভ করিয়া তথায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ব্যুল্যর্ সংস্কৃত তথা ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশ করিতে হইলে ভারতভূমিতে বসিয়া ঋষি বংশধর ভারতীয় পন্ডিতদের নিকট সংস্কৃত পাঠ না করিলে চলিবে না তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ভারত যাত্রা ও বাসের সুবিধালাভের জন্য তিনি কোন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর পদ গ্রহণেও সম্মত ছিলেন। উদারহৃদয় ম্যাক্সমুল্যর্ সমধর্মী বন্ধুর এই মনোভাব অবগত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে ব্যুল্যরের জন্য একটি কর্মের ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে পৌঁছিয়া ব্যুল্যর্ দেখিলেন যে ম্যাক্সমুলরের বন্ধু, বোম্বাই প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মিঃ হাওয়ার্ড ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলর ইহাঁকেই ব্যুল্যরের নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে বোম্বাইএর সরকারী মহাবিদ্যালয় এলফিনষ্টোন কলেজের অধ্যক্ষ সার আলেকজান্ডার গ্রান্ট্ ও ছিলেন ম্যাক্সমুল্যরের বিশেষ পরিচিত। ব্যুল্যরের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া ইনি ব্যুল্যরকে এলফিনষ্টোন কলেজের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। অচিরকালের মধ্যেই ব্যুল্যরের সংস্কৃত অধ্যাপনার ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগ অতঃপর ব্যুল্যরকে শিক্ষাবিস্তারের বৃহত্তর স্বার্থে

উত্তরাঞ্চলের (গুজরাট) শিক্ষা পরিদর্শক, পুনার সংস্কৃত শিক্ষাপর্যদের অধ্যক্ষ, সরকারী পুঁথি সংগ্রহাধিকারিক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত রাখেন। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক রূপে বুল্যার অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। বুল্যারের এই কর্মভার গ্রহণের সময় গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৩০টি, অচিরকালের মধ্যেই এই সংখ্যা ১৭৬৩ তে পরিণত হয়। বুল্যারের অক্লান্ত চেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারও বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই এর শিক্ষা অধিকর্তা সরকারী প্রতিবেদনে প্রদেশে শিক্ষাবিস্তারের মূলে বুল্যারের অসামান্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন।

ভারতে অবস্থান কালে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ বুল্যারের জীবনের এক প্রধান কীর্তি। ভারতবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে যদি বুল্যারের অন্য কোন দানও না থাকিত তথাপি শুধু মাত্র পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। বুল্যারের পূর্বে যাঁহারা পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রাক্স, হজসন, চেম্বার্স, কোলব্রুক, উইলসন ও ড্যানিয়েল রিটস এর নাম উল্লেখ যোগ্য, বুল্যার্ এককভাবে ইহাঁদের সকলের অপেক্ষা অধিক পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বুল্যার তাঁহার নিজের চেষ্টা ও অর্থ দ্বারা ৩০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই পুঁথিগুলি তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসকে দান করেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই গভর্ণমেন্ট হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলও মহীশূরের পূর্বঅঞ্চল হইতে ৪০০ শত সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। এইগুলি এলফিনষ্টোন কলেজে রক্ষিত হয়। ১৮৬৮ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রায় আরও তিনসহস্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন—এইরূপে ভারতে অবস্থান কালে তাঁহার আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচ সহস্র। এই পুঁথিগুলির এক বিরাট অংশ ছিল ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃত।

ভারতবাসিকে বুল্যার অত্যন্ত সম্ভ্রম ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ভারতের অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা-যথা গুজরাটি ও মারাঠি তিনি উত্তম রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বুল্যারের সরল ও সহৃদয় ব্যবহার, ন্যায় পরায়ণতা এবং দেশভাষা জ্ঞান তাঁহার পুঁথি সংগ্রহ কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যজু ও অথর্ব বেদের কাশ্মীরীয় সংস্করণ এবং শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থগুলি পুনরুদ্ধারের গৌরব একান্তভাবে বুল্যারেরই প্রাপ্য। বুল্যার্ কর্তৃক সংগৃহীত ৫০০ জৈন প্রাকৃত পুঁথি বার্লিনে প্রেরিত হয়। এই পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া বার্লিনের অধ্যাপক ভেবর, ক্লাট, লিউম্যান, জ্যাকোবি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জৈনধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বুল্যার্ স্বয়ং জর্মান ভাষায় জৈনধর্ম সম্বন্ধে তথ্যামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন প্রাকৃত অভিধানের শব্দসূচীও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি প্রাকৃত ভাষা চর্চার পথও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। জৈন অভিধান প্রণেতা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে ভিয়েনাসায়েন্স একাডেমির পত্রিকায় তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন(১৮৮৯)। খারবেল ও মথুরা লিপি গুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে জৈন-ধর্ম-সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর, এযাবৎ জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হইত, বুল্যারই সর্বপ্রথম জৈনধর্ম ও প্রাকৃত সাহিত্যকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্যে বুল্যারের আত্মনিয়োগের পূর্বে ভারতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে লিপি বদ্ধ কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বুল্যার্ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। আর ও কিছুকাল পর তিনি রাজপুতানা অঞ্চলে সন্ধান কালে যশল্মীর হইতে একাদশ শতাব্দীতে

লিখিত কিছু পুঁথি আবিষ্কার করেন। বুল্যারের কালে এইগুলিই ছিল আবিষ্কৃত সর্বাধিক প্রাচীন পুঁথি। পরবর্তী কালে অবশ্য প্রাচীনতর কালের লিপিবদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বুল্যার্ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ব্যক্তি বিশেষ ও প্রতিষ্ঠান (মঠাদি) সমূহে রক্ষিত ও নিজের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথি সমূহ সম্বন্ধে অনেকগুলি তালিকা ও প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তুত করেন। ভারত ও ভারতের বাহিরে প্রকাশিত এই সব রচনাগুলি হইতে বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সন্ধান জানা যায় (১) আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কালানুক্রম ও মান নির্ণয় দ্বারা বুল্যার্ ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁহার রচনাবলী সর্বপ্রথম বুল্যার্ কর্তৃকই বিদ্বৎ সমাজের গোচরীভূত হয়। কল্‌হন বিরচিত "রাজতরঙ্গিনীর" প্রাচীনতম পুঁথির সন্ধান তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হয়। বুল্যারের রিপোর্টে এই প্রাচীনতম পুঁথির উল্লেখ লক্ষ্য করিয়া ডাঃ অরেল ষ্টাইন তাহার অনুলিপি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। ডাঃ ষ্টাইন সম্পাদিত "রাজতরঙ্গিনী" এই পুস্তকের সর্বোত্তম সংস্করণ।

বোম্বাই প্রদেশের সরকারী শিক্ষা বিভাগে কর্মরত থাকার সময় বুল্যার্ ছাত্র ও গবেষকদের উপযোগী সটীক, সুসম্পাদিত সংস্কৃত পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সংস্কৃত গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। তাঁহার সহকর্মী অধ্যাপক কীলহর্ণকে তিনি এই কার্যে সহযোগী রূপে প্রাপ্ত হন। এই পাঠমালার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চতন্ত্র (১৮৬৮), দন্ডী রচিত দশকুমার চরিত, প্রথম ভাগ (১৮৭৩), বিহ্লন প্রণীত বিক্রমাঙ্কদেব চরিত (১৮৭৫) বুল্যার্ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিহ্লন রচিত বিক্রমাঙ্কদেব চরিতের পুঁথি বুল্যারই প্রথম আবিষ্কার করিয়া ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বুল্যার্ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি সার রেমন্ড ওয়েষ্টের সহযোগিতায় "ডাইজেষ্ট অফ্ হিন্দু ল" (হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত সার) নামে একটি অমূল্য পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় বুল্যার্ হিন্দু আইনের উৎস ও সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতি সম্বন্ধীয় তাবৎ সাহিত্যের বিশদ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। শতাব্দী কালের ব্যবধানে আজিও বুল্যার্ প্রণীত এই "ডাইজেষ্ট" হিন্দু উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বন্টন সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক পুস্তক। ইহার পর তিনি আপস্তম্ব ধর্মসূত্র নামক সুপ্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের একটি সটিক সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৮৬৮-৭১)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বোম্বাই সংস্কৃত পাঠমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৮৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে ধর্মসূত্রগুলির আলোচনা বুল্যারের পূর্বে আর কেহ করেন নাই, এ যাবৎ মনুও যাজ্ঞবল্ক্যই ছিলেন স্মৃতি-শাস্ত্র গবেষকদের উপজীব্য। প্রাচীন হিন্দু স্মৃতিতে বুলারের অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য ম্যাক্সমুলার সম্পাদিত "সেক্রেড বুকস্ অফ দি ঈষ্ট" গ্রন্থমালার স্মৃতি সম্বন্ধীয় দুইখন্ড (দ্বিতীয় ও চতুর্দশ) পুস্তক "দি সেক্রেড্ ল'স অফ্ দি আরিয়স" এর অনুবাদ ও টীকা প্রস্তুতের দায়িত্ব বুল্যার্‌কে অর্পণ করা হয়। এই দুইখন্ড পুস্তকে বুল্যার্ আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন সূত্রের অনুবাদ ও টীকা সন্নিবিষ্ট করেন। বুল্যার্ প্রণীত এই দুইখন্ড পুস্তক (১৮৭৯-৮২) এই গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধিক আদৃত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বুল্যার্ মনুস্মৃতির ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু উনি উহা বিনয় বশতঃ সার উইলিয়ম জোন্সের নামে প্রচারিত করেন, যে হেতু তিনি জোন্সের অনুবাদ হইতে সাহায্য লইয়া ছিলেন।

ভারতে বাসকালে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য বুল্যার্ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া

গিয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা ব্যুল্যরের জন্য সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বলিতেন—ইহাঁরাই হইতেছেন আর্য ঋষিদের মনীষার যোগ্য উত্তরাধিকারী। জৈন আচার্য শ্রীপূর জিনমুক্তি সূরী, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বহু ভারতীয় জ্ঞান-সাধকের সহিত ব্যুল্যরের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী সম্পর্কে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। স্বয়ং জার্মান ভাষী হইলেও তিনি নিজের ও শিষ্য-সতীর্থদের রচনা সাধারণতঃ ইংরাজীতে প্রকাশ করিতেন। কোন ইংরাজ সতীর্থ ব্যুল্যরের ইংরাজী প্রীতিতে আনন্দ প্রকাশ করায় ব্যুল্যর্ তাঁহাকে বলেন যে ইংরাজ অথবা ইংরাজীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন না, ভারতীয় বন্ধুদের সুবিধার জন্যই তিনি ইংরাজী ব্যবহার করা পছন্দ করেন। ব্যুল্যর্ কলিকাতা ও বোম্বাই এর এশিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই সোসাইটিদ্বয়ের জার্নালে তাঁহার প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত।

সপ্তদশ বর্ষকাল ভারত বাসের পর গুরু-পরিশ্রমে ব্যুল্যরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। বোম্বাই সরকারী শিক্ষা বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যুল্যরের অক্লান্ত সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাঁহার অবসর গ্রহণে খেদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্যুল্যরকে ভারত সরকার সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যুল্যরকে ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারত বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ভিয়েনায় অধ্যাপকের কার্যে যোগদান করিয়া ব্যুল্যর্ ভিয়েনা নগরীকে ভারতবিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার ব্রত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে "ভিয়েনা ওরিয়েন্টেল ইনষ্টিটিউট্" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে "ভিয়েনা ওরিয়েন্টেল জার্ণাল" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় ব্যুল্যর্ ভারতের ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্যুল্যর্ সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের সুবিধার্থে জার্মান ভাষায় একটি সংস্কৃত শিক্ষা পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমেরিকার বোষ্টন শহর হইতে "স্যানসক্রিট্ প্রাইমার" নামে এই পুস্তকের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)।

ভিয়েনায় অবস্থান কালে ব্যুল্যর্ তত্রস্থ রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য মনোনীত হন। একাডেমির সদস্য রূপে ব্যুল্যর্ সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আরও অধিক অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে আদায় করিতে সমর্থ হন।

ব্যুল্যরের ভিয়েনায় অধ্যাপনা কালে আমাদের দেশে সুপরিচিত ডাঃ উইন্টার নিৎজ্ ছিলেন তাঁহার অন্তেবাসী। উইন্টার নিৎজ বলেন যে শিক্ষালয়ের ভিতরে ও বাহিরে ব্যুল্যর্ ছিলেন ছাত্রদের নিকট একাধারে স্নেহময় পিতা ও হিতৈষী গুরু। একজন নিবেদিত প্রাণ ভারত-বিদ্যাব্রতী গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার অধ্যাপনার লক্ষ্য। উইন্টার নিৎজ লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যুল্যর্ ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যম ব্যবহার করিতেন। এই ভাবে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সাধনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে (ইন্টারন্যাশনেল কংগ্রেস অব্ ওরিয়েন্টেলিষ্টস)

ব্যুল্যর নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে এই মহাসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাসম্মেলনের ভারতীয় শাখার তিনি ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা। ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে প্রুশিয়ার গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তিনি নাইটের মর্যাদার অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত হন।

ভারতে আহরিত জ্ঞান-সম্পদ সুশৃংখলভাবে গবেষণার কাজে নিয়োগ করিতে ব্যুল্যর্ ভিয়েনায় কর্মব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেও ব্যুল্যর্ ভারতবিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃ একটি অতি দুরূহ ও পরিশ্রম সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এই কাজটি হইল বিশ্বের ত্রিশজন ভারতবিদ্যা বিশারদের সহায়তায় একটি মহাকোষ সংকলন [২]। ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, আইন, ধর্ম, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিচিত ত্রিশজন ভারত বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ যাবৎ পরিজ্ঞাত তথ্যাবলী সমন্বিত স্বয়ং সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনা করাইয়া খন্ডশঃ এই মহাকোষের অংশ হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হয়। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ব্যুল্যর্ স্বয়ং উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ব্যুল্যরের সম্পাদনায় এই মহাকোষের নয় খন্ড ষ্ট্রাসবুর্গ হইতে জে, ট্রুবনার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীখন্ডগুলির সম্পাদনার কাজ ব্যুল্যর্ বহুদূরে অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ব্যুল্যরের জীবনান্তের পর তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মী অধ্যাপক কীল হর্ণের উপর এই মহাকোষ সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয়। ২১ খণ্ডে এই মহাকোষ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৬-১৯২০) এই মহাকোষের জন্য ব্যুল্যর্ স্বয়ং ভারতীয় লিপিতত্ত্ব (ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি) সম্বন্ধে শতাধিক পৃষ্ঠা সমন্বিত একটি নিবন্ধ রচনা করেন।[৩] জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত এই মহাকোষের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগরূপে এই অমূল্য নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় (১৮৯৬)। ভারতবাসির সুবিধার্থে ব্যুল্যর্ ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রস্তুত করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ "ইন্ডিয়ান্ এন্টি-কোয়েরী" পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে এই অনুবাদটি জে, এফ্, ফ্লীট্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।[৪] ব্যুল্যরের এই অমূল্য রচনাটি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "ইন্ডিয়ান ষ্টাডিজ্" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথমখণ্ড, প্রথম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (অক্টোবর, ১৯৫৯)। ব্যুল্যর্ শুধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতীয় সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রধানতঃ শিলালিপি মালার সাহায্যে ভারতের অতীত ইতিহাসের যথার্থ উপস্থাপনায় তিনি পুরোধা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধীয় এই পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া ব্যুল্যর্ ভারতবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত বহু ভ্রান্ত মতবাদের নিরাকরণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুল্যরের মত এই ছিল যে অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন লিপি প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত "ইন্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি" পুস্তকে ব্যুল্যর্ প্রমাণ করেন যে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে বেদ রচনার কালেও ভারতে লিপির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মী লিপি অশোক অনুশাসন সমূহে যে আকারে প্রচলিত ছিল উহা কয়েক শতাব্দী বিবর্তনের পর ঐ আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধে ব্যুল্যরের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা "দি অরিজিন অফ দি ইন্ডিয়ান ব্রহ্মা য়্যালফাবেট্"।[৫] এই পুস্তকে ব্যুল্যর প্রমাণ করেন যে খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন হয়। ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটি পুস্তকে প্রকাশিত ব্যুল্যরের অভিমত বর্তমানেও সর্বজনগ্রাহ্য। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধীয় গবেষণায় ব্যুল্যরের দান একরূপ অতুলনীয়। অশোকলিপির পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সাধনা জেমস প্রিন্সেপের ন্যায়ই স্মরণীয়। অশোক লিপি ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে

গিয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা ব্যুল্যারের জন্য সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বলিতেন—ইহাঁরাই হইতেছেন আর্য ঋষিদের মনীষার যোগ্য উত্তরাধিকারী। জৈন আচার্য শ্রীপুর জিনমুক্তি সুরী, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বহু ভারতীয় জ্ঞান-সাধকের সহিত ব্যুল্যারের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী সম্পর্কে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। স্বয়ং জার্মান ভাষী হইলেও তিনি নিজের ও শিষ্য-সতীর্থদের রচনা সাধারণতঃ ইংরাজীতে প্রকাশ করিতেন। কোন ইংরাজ সতীর্থ ব্যুল্যারের ইংরাজী প্রীতিতে আনন্দ প্রকাশ করায় ব্যুল্যার্ তাঁহাকে বলেন যে ইংরাজ অথবা ইংরাজীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন না, ভারতীয় বন্ধুদের সুবিধার জন্যই তিনি ইংরাজী ব্যবহার করা পছন্দ করেন। ব্যুল্যার্ কলিকাতা ও বোম্বাই এর এশিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই সোসাইটিদ্বয়ের জার্নালে তাঁহার প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত।

সপ্তদশ বর্ষকাল ভারত বাসের পর গুরু-পরিশ্রমে ব্যুল্যারের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। বোম্বাই সরকারী শিক্ষা বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যুল্যারের অক্লান্ত সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাঁহার অবসর গ্রহণে খেদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্যুল্যারকে ভারত সরকার সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যুল্যারকে ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারত বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ভিয়েনায় অধ্যাপকের কার্যে যোগদান করিয়া ব্যুল্যার্ ভিয়েনা নগরীকে ভারতবিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার ব্রত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে "ভিয়েনা ওরিয়েন্টেল ইনষ্টিটিউট্" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে "ভিয়েনা ওরিয়েন্টেল জার্ণাল" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় ব্যুল্যার্ ভারতের ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্যুল্যার্ সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের সুবিধার্থে জার্মান ভাষায় একটি সংস্কৃত শিক্ষা পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমেরিকার বোষ্টন শহর হইতে "স্যানসক্রিট্ প্রাইমার" নামে এই পুস্তকের একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৮৮৩)।

ভিয়েনায় অবস্থান কালে ব্যুল্যার্ তত্রস্থ রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য মনোনীত হন। একাডেমির সদস্য রূপে ব্যুল্যার্ সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আরও অধিক অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে আদায় করিতে সমর্থ হন।

ব্যুল্যারের ভিয়েনায় অধ্যাপনা কালে আমাদের দেশে সুপরিচিত ডাঃ উইন্টার নিৎজ্ ছিলেন তাঁহার অন্তেবাসী। উইন্টার নিৎজ বলেন যে শিক্ষালয়ের ভিতরে ও বাহিরে ব্যুল্যার্ ছিলেন ছাত্রদের নিকট একাধারে স্নেহময় পিতা ও হিতৈষী গুরু। একজন নিবেদিত প্রাণ ভারত-বিদ্যাব্রতী গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার অধ্যাপনার লক্ষ্য। উইন্টার নিৎজ লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যুল্যার্ ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যম ব্যবহার করিতেন। এই ভাবে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সাধনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে (ইন্টারন্যাশনেল কংগ্রেস অব্ ওরিয়েন্টেলিষ্টস)

ব্যুল্যর নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে এই মহাসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাসম্মেলনের ভারতীয় শাখার তিনি ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা। ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে প্রুশিয়ার গভর্ণমেন্ট কর্তৃক তিনি নাইটের মর্যাদার অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত হন।

ভারতে আহরিত জ্ঞান-সম্পদ সুশৃংখলভাবে গবেষণার কাজে নিয়োগ করিতে ব্যুল্যর্ ভিয়েনায় কর্মব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেও ব্যুল্যর্ ভারতবিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃ একটি অতি দুরূহ ও পরিশ্রম সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এই কাজটি হইল বিশ্বের ত্রিশজন ভারতবিদ্যা বিশারদের সহায়তায় একটি মহাকোষ সংকলন [২]। ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, আইন, ধর্ম, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিচিত ত্রিশজন ভারত বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ যাবৎ পরিজ্ঞাত তথ্যাবলী সমন্বিত স্বয়ং সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনা করাইয়া খণ্ডশঃ এই মহাকোষের অংশ হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হয়। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ব্যুল্যর্ স্বয়ং উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ব্যুল্যরের সম্পাদনায় এই মহাকোষের নয় খণ্ড ষ্ট্রাসবুর্গ হইতে জে, ট্রুবনার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীখণ্ডগুলির সম্পাদনার কাজ ব্যুল্যর্ বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ব্যুল্যরের জীবনান্তের পর তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মী অধ্যাপক কীল হর্ণের উপর এই মহাকোষ সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয়। ২১ খণ্ডে এই মহাকোষ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৬-১৯২০) এই মহাকোষের জন্য ব্যুল্যর্ স্বয়ং ভারতীয় লিপিতত্ত্ব (ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি) সম্বন্ধে শতাধিক পৃষ্ঠা সমন্বিত একটি নিবন্ধ রচনা করেন।[৩] জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত এই মহাকোষের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগরূপে এই অমূল্য নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় (১৮৯৬)। ভারতবাসির সুবিধার্থে ব্যুল্যর্ ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রস্তুত করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টি-কোয়েরী" পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে এই অনুবাদটি জে, এফ্, ফ্লীট্ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।[৪] ব্যুল্যরের এই অমূল্য রচনাটি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ্" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথমখণ্ড, প্রথম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (অক্টোবর, ১৯৫৯)। ব্যুল্যর্ শুধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতীয় সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রধানতঃ শিলালিপি মালার সাহায্যে ভারতের অতীত ইতিহাসের যথার্থ উপস্থাপনায় তিনি পুরোধা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধীয় এই পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া ব্যুল্যর্ ভারতবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত বহু ভ্রান্ত মতবাদের নিরাকরণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুল্যরের মত এই ছিল যে অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন লিপি প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত "ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি" পুস্তকে ব্যুল্যর্ প্রমাণ করেন যে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে বেদ রচনার কালেও ভারতে লিপির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মী লিপি অশোক অনুশাসন সমূহে যে আকারে প্রচলিত ছিল উহা কয়েক শতাব্দী বিবর্তনের পর ঐ আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধে ব্যুল্যরের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা "দি অরিজিন অফ দি ইণ্ডিয়ান ব্রহ্মা য়্যালফাবেট্"।[৫] এই পুস্তকে ব্যুল্যর প্রমাণ করেন যে খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন হয়। ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটি পুস্তকে প্রকাশিত ব্যুল্যরের অভিমত বর্তমানেও সর্বজনগ্রাহ্য। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধীয় গবেষণায় ব্যুল্যরের দান একরূপ অতুলনীয়। অশোকলিপির পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সাধনা জেমস প্রিন্সেপের ন্যায়ই স্মরণীয়। অশোক লিপি ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে

গিরিগুহা প্রভৃতিতে খোদিত লিপিগুলিরও তিনি পাঠোদ্ধার করেন। এই সব লিপিমালা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা পুস্তকগুলি হইতে নানা অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়। ৬

ম্যাক্সমুল্যর্ ও বুল্যর্ উভয়েই পরস্পরের আজীবন সুহৃদ ও সহযোগী ছিলেন, সত্যের অনুরোধে বুল্যর্ মূলরের মতের বিরোধিতা করিলেও ইহাতে তাঁহাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই —দুইজনে সর্বদাই পরস্পরের সহিত মত বিনিময় করিতেন। ম্যাক্সমুলরের অভিমত ছিল যে খৃষ্টজন্মের পূর্বে ভারতে বিশুদ্ধ কাব্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। শিলালেখ ও প্রত্ন সম্পদাদির সাহায্যে বুল্যর্ প্রমাণ করেন যে খৃষ্টজন্মের পূর্বে সংস্কৃতে কাব্য-রচনা হইত। ম্যাক্সমুল্যর্ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ইন্ডিয়া হোয়াট্ ক্যানইট্ টিচ আস" এর দ্বিতীয় সংস্করণে বুল্যরের অভিমত গ্রাহ্য করিয়া নিজের পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। সত্যান্বেষী, যুক্তিবাদী বুল্যরের মতামত খণ্ডন তাঁহার প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা দুঃসাধ্য মনে করিতেন কারণ তাঁহার যুক্তিগুলি ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তির উপর উপস্থিত করা হইত। বোম্বাই এর "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টি কোয়েরী" পত্রিকায় বুল্যর নিজের ৮৫টি নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৮৭২-৯৮)। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ ছিল ভারতের ঐতিহাসিক উপাদানের ব্যাখান। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তিনি তাঁহার কোন সহযোগিকে বলিয়াছিলেন যে প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাস চেতনা ছিলনা এই ধারণা যে ভ্রান্ত ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই আমি প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাসবিমুখতার এই কলঙ্ক ক্ষালন করিব। দুঃখের বিষয় তিনি এই কাজ আকস্মিক মৃত্যু হেতু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। খ্যাতি প্রতিপত্তির শিখরে অধিষ্ঠিত জ্ঞান তপস্বী বুল্যর্ একষট্টি বর্ষ বয়সে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হন। বুল্যর্ সুইজারল্যাণ্ডবাসিনী একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী ও ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ্ শহরে তাঁহাদের এক আত্মীয়ের সহিত বাস করিতে ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ঈষ্টারের ছুটি উপলক্ষ্যে বুল্যর্ তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে দেখিবার জন্য ৫ই এপ্রিল ভিয়েনা হইতে একাকী জুরিখ্ রওনা হইয়া যান। পথে কন্সন্টান্স নামক নয়নাভিরাম হ্রদের তীরে লিণ্ডাউ নামক স্থানে সহসা তিনি যাত্রা ভঙ্গ করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইদিন তিনি এই শহরের হোটেলে বাস করিবেন এবং একটি নৌকা ভাড়া করিয়া হ্রদে জল বিহার করিবেন, হ্রদের জলে নৌকা চালানো তাঁহার প্রিয় ব্যসন ছিল। ৮ই এপ্রিল ভাড়া করা একটি ডিঙ্গি নৌকায় তিনি একাকী দাঁড় টানিয়া জলবিহার করিতেছিলেন, অকস্মাৎ দাঁড়টি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া জলে পড়িয়া যায়। সম্ভবত বুল্যর দাঁড়টি উদ্ধার করিতে যাওয়ার কালে তাঁহার দেহের ভারে নৌকাটি উল্টাইয়া যায়, ফলে তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কেহই নৌকাটি উল্টাইয়া যাইতে বা বুল্যর্কে জলমগ্ন হইতে দেখে নাই। পরদিন যে লোকটি বুলরকে নৌকাটি ভাড়া দিয়াছিল সে সকলকে জানায় যে একটি বৃদ্ধ লোককে সে নৌকাটি ভাড়া দিয়াছিল। বুল্যরের নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া বুল্যরের স্ত্রী উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভিয়েনায় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে বুল্যর ৫ তারিখে জুরিখ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা পরিত্যাগ করেন। এদিকে লিণ্ডাউ এর হোটেলের অধিকারী বুল্যর ফিরিয়া না আসাতে পুলিশের শরণাপন্ন হয়। পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উল্টাইয়া যাওয়া ডিঙ্গিটির চালক ছিলেন—ভিয়েনার অধ্যাপক বুল্যর্, সলিল সমাধির ঘন্টা দুই পূর্বে তাঁহাকে লোকে শেষ বারের মত দেখিয়াছিল। বুল্যরের মৃতদেহ কোনদিনই উদ্ধার করা যায় নাই।

বুল্যরের মত মহান হৃদয়, অজাতশত্রু মহাপণ্ডিতের মৃত্যু এমনিতেই একটি শোকাবহ ঘটনা, তদুপরি শোচনীয় পরিস্থিতিতে বুল্যরের এই মৃত্যু তাঁহার অনুরাগী মাত্রেরই হৃদয়

ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বূ্‌ল্যারের মৃত্যুতে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত ভেবর মন্তব্য করেন—যদি কাহারও মৃত্যুকে অপূরণীয় ক্ষতি বলিতে পারা যায় তবে তাহা বূ্‌ল্যারের মৃত্যু, আমাদের মধ্যে তাঁহাকেই বিশ্ব পণ্ডিত বলা চলিত।"

---

(১) (ক) A catalogue of Sanskrit Mss from Gujrat, Katch, Sind and Khandesh—Bombay 1873.

(খ) In many volumes of the German Oriental Society and Prof Weber's—Indische Studien.

(গ) Detailed report of a tour in search of Sanskrit Mss. in Kashmir, Rajputana and Central India.

(২) Grundriss der Indo—Arischen Philologie und Altertumskunde (Encyclopeedia of Indo-Aryan Research—Published by J. Trubner Strassburg 1896-1920 (21 volumes).

(৩) Indische Palaegraphie—Dr. J. Bwhler, Strassburg 1896.

(৪) G. Bwhler : Indian Paleography (Indian Antiquary) Vol XXXIII, 1904, Appendix.

(৫) On the origin of the Brahmo Alphabet—Strassburg, 1898.

(৬) (ক) Incriptions from the caves in Bombay Presidency—in Dr. Burgess Archalogical Reports on W. India (V & VI) London.

(খ) Asoka Inschriften—Leipzig, 1889.

(গ) Eine neue Inschift des Gurjara Konigs Dodda II, 1887.

(ঘ) Eleven Land Grants of chalukyas of Anhilvad, Bombay, 1887.

(ঙ) Three new edicts of Asoka—Bombay, 1887.

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

ভবতোষ দত্ত

আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে—বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিদ্যাসাগর সেকালের বহু প্রগতিমূলক সমাজসংস্কারের উদ্যম করেছিলেন। অনেকেই মনে করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীলতাবশত সে সব সংস্কারপ্রয়াস সমর্থন করেন নি। বিদ্যাসাগরের এই সব কাজকে বঙ্কিম পছন্দ করতেন না; এমনকি বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিম বিদ্বেষ পোষণ করতেন এমন ইঙ্গিতও কেউ কেউ করেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যশে 'ঈর্ষ্যালু' ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে লিখেছেন,

'বঙ্কিমের মন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোনোদিনই প্রসন্ন ছিল না, এমন কি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি ছিলেন পরম বিরোধী। তাঁহার প্রবন্ধে উপন্যাসে তিনি তাঁহার ব্রাহ্মবিদ্বেষ ও বিদ্যাসাগরের মতের প্রতি অশ্রদ্ধা কারণে অকারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

—এই উক্তির পাদটীকায় লেখক বিষবৃক্ষের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন—

'তারাচরণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নানা ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেও ঐ উপন্যাস মধ্যে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব সুপরিচিত।'

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে আঠারো বৎসরের ছোটো হলেও উভয়ে ছিলেন সমসাময়িক। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিমের মৃত্যু ১৮৯৪তে। দুজনের মধ্যে পরিচয় অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিবরণ তেমন কিছু পাওয়া যায় না, তাও সত্য। ১২৮৯ সালে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে সারস্বত সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাতে সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহযোগী সভাপতিদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় যোগ দিতে আহ্বান করবার জন্য গিয়েছিলেন—

'তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—হোমরা চোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।'—জীবনস্মৃতি

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য—

'হোমরা চোমরা অর্থে বিদ্যাসাগর বোধহয় বঙ্কিম প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন।....পাঁচজনকে লইয়া কাজ করিবার শক্তি ও সময় বঙ্কিমের ছিল না জানিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্বাহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সতর্ক করিয়া দেন।'

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই অনুমানের কারণ কি জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকরী করতেন, তাও কলকাতার বাইরে। তাঁর পক্ষে এ দিকে পুরো মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। উল্লেখযোগ্য এই যে বঙ্কিমচন্দ্র দশটা-পাঁচটা চাকরী করে বিশেষ কোনো সভাসমিতিতে যোগ দিতে পেরেছিলেন

বলে শোনা যায় না। যাই হোক বিদ্যাসাগরকে প্রগতিবাদী এবং বঙ্কিমকে রক্ষণশীল ধরে নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা ঈর্ষা বিদ্বেষের সম্পর্ক একালের ঐতিহাসিকরা কল্পনা করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কলেজের ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর শিক্ষায়, সমাজসংস্কারে, সাহিত্যে বাংলা দেশে অগ্রণী পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত। বিধবাবিবাহ বিধির জন্য বিদ্যাসাগর যখন আবেদন করেন ১৮৫৫-এ বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলি কলেজে সিনিয়র ডিবিশনে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ওই বৎসরেই বহু বিবাহ নিরোধের জন্যও বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আবেদন করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয় এবং প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হয় ৭ই ডিসেম্বর। জুলাই মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। এখান থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাশ করেন। পরের বছর তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। এই পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই তাঁকে পড়তে হয়েছিল; পরীক্ষকও ছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রাবস্থার এক কৌতুকজনক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। ১৮৫২-তে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে সিনিয়র ডিবিশনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তাতে বাংলায় তিনি মোটেই ভালো করতে পারেন নি। বস্তুত সে বছর পরীক্ষার্থীরা বাংলায় কেউই ভালো করে নি। কলেজের অধ্যক্ষ এর কারণস্বরূপ পরীক্ষক বিদ্যাসাগরকেই দোষারোপ করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বলে নাকি সংস্কৃতবহুল বাংলা পছন্দ করতেন। তাঁর মনোমত উত্তর হয় নি বলে তিনি পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। কথাটা অবশ্যই ঠিক নয়, কারণ সংবাদপ্রভাকর থেকে যেটুকু নমুনা পাওয়া যায় তাতে বেশ বুঝতে পারা যায় বঙ্কিম তখন মোটেই সরল গদ্য লিখতেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ করে ১৮৫৮-তে বঙ্কিম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে যশোহর চলে যান। এই সময় থেকে দুর্গেশনন্দিনী রচনা (১৮৬৬) পর্যন্ত বঙ্কিমের বাংলা রচনার কোনো নিদর্শন নেই। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রবর্তিত হওয়ার প্রচন্ড সামাজিক আলোড়নের সময় বঙ্কিমের মনোভাব বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কি ছিল তা জানবার উপায় নেই। এমন কি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে ও বঙ্কিমের তিনখানি উপন্যাসে কিংবা আর কোনো রচনা নেই যাতে এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশিত হতে পারে।

নবপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ ধারাবাহিকভাবে বেরোতে থাকে। বিষবৃক্ষ সকলেরই পড়া। বিধবা কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রনাথের অনুরাগের আভাস পেয়ে সূর্যমুখী উদ্বিগ্ন হয়ে কমলমণিকে চিঠিতে সব কথা জানায়।—

'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?'

অনেকে এটাকে প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু এটা প্রমাণ নয়—ঔপন্যাসিকের চরিত্র-নির্মাণ মাত্র। উদ্ধৃত উক্তির পরের লাইন কয়টিতে এই চরিত্র কল্পনা সম্পূর্ণতা পেয়েছে সুতরাং উক্তিটিকে বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া চলে না—

'এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায় কচকচি ঠাকুর মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্বভৌম ঠাকুর

বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি।'

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বিবাহ করার যুক্তি খুঁজছে বলে বিধবাবিবাহ সমর্থন করছে এবং সূর্যমুখী স্বামীর প্রেম হারিয়েছে বলে এর বিরোধিতা করছে অবশ্য তার সঙ্গে চিরাগত সংস্কার নিশ্চয়ই ছিল। লোকাচারের সংস্কার নারীজাতির মধ্যেই দৃঢ়মূল। বেদনাহত সূর্যমুখী বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছে তাকে কি বঙ্কিমের মনোভাব বলেই ধরতে হবে?

বঙ্কিমের মনোভাব যে কি ছিল তা জানা যাবে কয়েক মাস পরে বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধ থেকে। তাতে তিনি বলছেন—

'সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা আমরা তখনই উত্তর দিব স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।'

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন প্রণয়ন করিয়েছেন বটে, কিন্তু প্রবল লোকাচারের ফলে এখনও সমাজ একে গ্রহণ করে নি। কিন্তু সমাজ তখন গ্রহণ করে নি বলে সমাজ অভ্রান্ত এবং বিদ্যাসাগর ভ্রান্ত একথা কখনোই তিনি বলেন নি। অনুরূপ আর একটি বিষয় বহুবিবাহ। ১৮৭৩ খৃীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করলেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় প্রস্তাব।' বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই বইয়ের সমালোচনা করলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন নি বরং তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ১৮৯২ তে এই প্রবন্ধটি তিনি যখন পুনর্মুদ্রিত করলেন, তখন বিদ্যাসাগর পরলোকে। সেই সময় বঙ্কিম একটি ভূমিকা যুক্ত করেন, তাতে তিনি বলেন—

'এই ভ্রান্তিজনিত ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি এজন্য ইহা পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে দোষ তাঁহার না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।'

বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। আজ তাই কথাটা উঠেছে। বাঙালির চিরশ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগরের চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিই টিকেছিল। আইন পাশ হয় নি বটে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে নীতিশিক্ষার ব্যাপকতার ফলে বহুবিবাহ প্রথা ক্ষয়িষ্ণু। এই বিতর্কে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর হৃদয়বান কর্মব্রতী মহাপুরুষ, বঙ্কিমচন্দ্র কর্মনেতা নন, চিন্তাশীল মনীষী। বিদ্যাসাগর সমাজের বেদনাকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন তাই তিনি অপেক্ষা করতে চান নি। বহুবিবাহ সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিটি বসেছিল ১৮৬৫ খৃীষ্টাব্দে, তাতে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সদস্যরা একমত হলেও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর অন্য সকলের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তখনই আইন করাতে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের অনেক

দিন পর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি লেখেন। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের যুক্তির উপর নির্ভর করেছেন, সমাজতাত্ত্বিক যুক্তির আশ্রয় নেন নি। স্বাধীন হৃদয়াবেগ দ্বারা চালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যত সংবেদনশীল ও আদর্শবাদী তত তত্ত্বনিষ্ঠ নয়। এ কথা সত্য, তত্ত্ব ও চিন্তার নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি অনেক সময়েই জীবনের বেদনাকে আচ্ছন্ন ও লঘু করে। রবীন্দ্রনাথ কঠিন ভাষায় তর্কপ্রবণতাকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন—

'তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।'

বিদ্যাসাগরচরিত (১৩০২)

সেকালে যাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছিলেন, এই নিন্দা তাঁদের সকলকেই স্পর্শ করে। বঙ্কিমও বাদ যান না। কিন্তু বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে সত্য অনেকখানি থাকলেও এর মধ্যেও আবেগ আছে এবং অতিরিক্ত আবেগে যুক্তি লঘু হয়ে পড়ার আশংকা থাকে।

আবার এটাও ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজীবনেও পরিবর্তন এসেছিল। পরবর্তী কালে তিনি যখন ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি লিখেছেন, সেই সময় প্রথম যুগের ধারণার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে 'সাম্য' বইখানা আর তিনি মুদ্রিত করেন নি যদিও এই বইয়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদ তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু বিধবার অধিকার সম্পর্কিত পঞ্চম পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্মুদ্রিত করেন নি। এই অধ্যায়টিতে বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের Subjection of Women গ্রন্থ থেকে যুক্তি সংগ্রহ করেছিলেন। এই সময়কার অনেক যুক্তিকেই পরে তিনি মানতে পারেন নি। কিন্তু বিধবাবিবাহ এবং বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর মতামত কতখানি পরিবর্তিত হয়েছিল, আমরা তা' ঠিক বলতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস লেখবার ইচ্ছা করেছিলেন, তার খসড়াও তাঁর করা ছিল। তাতে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিধবাবিবাহের প্রথা সম্পর্কে একটি অধ্যায়ও পরিকল্পিত হয়েছিল দেখা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (সাহিত্য সাধক চরিত মালা) বইটিতে এই সংবাদটি দেওয়া আছে।

বিদ্যাসাগর যে শুধু বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টাই করেছিলেন তা নয় স্ত্রীজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি প্রচেষ্টায় তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর প্রয়াস স্মরণীয়। এই বিষয়ে বঙ্কিমের মনোভাবও তাঁর অনুরূপ ছিল। তাঁর সূর্যমুখী ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্তা। ধর্মতত্ত্বেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে মন্তব্য করেছেন। আনন্দমঠের শান্তিকে দেখিতে পাই পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণীরূপে। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর শিক্ষা দীক্ষা গতানুগতিক নয়। তাঁর শিক্ষাদর্শ আলোচিত হয়েছে ধর্মতত্ত্বে। একটি নারীকে তিনি যে এই শিক্ষাদর্শের উপযুক্ত প্রতীক করলেন, এটা অর্থহীন নিশ্চয়ই নয়।

বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কখনও কখনও বঙ্কিম একমত হতে পারেন নি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আদর্শবাদী ব্যক্তিদের মধ্যেও মতভেদের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মতভেদ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বিখ্যাত ঘটনা। কেশবচন্দ্রের ধর্মের আদর্শকে বঙ্কিম গ্রহণ করেন নি কিন্তু কেশবকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ কেশব ও বঙ্কিম এক সময়ে সহপাঠী ছিলেন সুতরাং এখানে ঈর্ষা বা আত্মাভিমানের কারণ বেশি ছিল। বিদ্যাসাগর তো বয়ঃজ্যেষ্ঠ। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমস্মৃতিতে লিখেছেন,

'গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটি মাত্র ব্রাহ্মণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কুল-মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।' বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃঃ ৩০৪

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেও। প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যের আলোচনায় তিনি বলেছিলেন—

'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'

কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্য সর্বতোমুখী হল না—বঙ্কিমের এই অভিমত অবশ্যই স্বীকার্য। বিষয়বস্তু তিনি নিয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সেজন্যেও তাঁর হাতে বাংলা সাহিত্যের প্রসার তেমন ঘটতে পারে নি। এ দিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব ছিল। গদ্যরীতির দিক থেকে আলালী ভাষাকেও বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ বলে মনে করেন নি সে কথাও সত্য। দুই বিপরীত প্রান্তের ভাষা বলে যাঁদের নাম করেছিলেন তাঁদের একজন তারাশঙ্কর তর্করত্ন আর একজন প্যারীচাঁদ। এখানে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষার উল্লেখ করেন নি কারণ বিদ্যাসাগরী গদ্য নিজস্ব সাহিত্যশ্রীতে সম্পন্ন। এর আর পরিমার্জনা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গলা ভাষা' প্রবন্ধে সংস্কৃতবাদীদের মুখপাত্র রূপে ধরে ছিলেন রামগতি ন্যায়রত্নকে। বিদ্যাসাগরকে যে তিনি ধরেন নি, তার কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুশীলনের সুফল পেয়েছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন এই সুফলে বঞ্চিত ছিলেন বলে তিনিই খাঁটি সংস্কৃতবাদী। এই সংস্কৃতনির্ভরতাকে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা করেছেন—এর থেকে এমন অনুমান সংগত যে সংস্কৃতাশ্রয়ী হলেও বিদ্যাসাগর সত্যকার রসবোধ সম্পন্ন ভাষাশিল্পী। বিদ্যাসাগরের ভাষা সর্বব্যাপিনী নয়, কিন্তু শিল্পসিদ্ধিতে মহিমান্বিত—পূর্বসূরীর প্রতি এই শ্রদ্ধানিবেদনে বঙ্কিমের কার্পণ্য নেই।

রবীন্দ্র-চিন্তা

সোমেন্দ্রনাথ বসু

যাঁরা কবি, গীতিকার, যাঁরা নাট্যকার তাঁরা চাপা পড়েন তাঁদেরই সৃষ্টির অন্তরালে। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাঁদের রচনাকে অংশবিশেষে সযত্নে গ্রহণ করে কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও পরিচয়কে বিস্মৃতির অতলে নিক্ষেপ করে। রামায়ণ মহাভারতের কবি তাঁদের কাব্যের আড়ালে নিঃশেষে হারিয়ে গেছেন, তাঁদের চরিত্রবত্তা, মহানুভবতা, ঔদার্যের কোন কাহিনী জানা নেই। তেমনি ব্যবহার পেয়েছেন কালিদাস, সহস্রাধিক বছর তাঁর কাব্য ভারতবর্ষের নানা ধরণের রসিকচিত্তকে রস জোগালো কিন্তু কবি কালিদাস কেমন মানুষ ছিলেন তার একটি কথাও আজ জানবার উপায় নেই। পাশ্চাত্যদেশে আজ কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলছেন শেক্সপীয়র আদৌ ছিলেন কিনা—ছত্রিশ খানি নাটকে তাদের রচয়িতার সমস্ত পরিচয় গোপন করে তাঁকে গল্পকথায় পরিণত করেছে।

এইসব কবিদের তুলনায় অনেক আধুনিক কালের লোক হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা যায়। কাব্য নাটক উপন্যাস গানের সুউচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যভাবে লুপ্ত হয়ে গেলেন। আমরা বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গে বলি কি উদার হৃদয়, কি দুর্জয় সাহস; আশুতোষের বাংলা ভাষার প্রতি কি প্রীতি, বাংলার বাঘের কি বিস্তৃত বক্ষপট; দেশবন্ধুর কি অজস্র দান; বিবেকানন্দের কি প্রবল দেশাত্মবোধ, কেবল রবীন্দ্রনাথের বেলায় বলি কি আশ্চর্য তাঁর গীতাঞ্জলি। তখন বলিনে তাঁর নিঃস্বার্থ সাধনার কথা, রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর নির্ভীক বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশের কথা, বলিনে দেশের জন্য তাঁর দুঃখবরণের কাহিনী, বলিনে বিদ্যালয় গঠনে তাঁর ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধনের কথা, বলিনে তাঁর গ্রামমুখী দেশপ্রীতির বাস্তব কর্মবাদী প্রকাশের কথা। বরং এই উপলক্ষে ঠিক উল্টো কথাই রটে তিনি ছিলেন আবাল্য বিলাস-লালিত, রাজনীতির কঠিন মার্গে তাঁর কল্পনাবিলাসী মনের দেবার কিছু ছিলনা, দেশকে তিনি জানতেন না, খেয়াল খুসীতে কেটেছে দিন। মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ সবার দৃষ্টি থেকে দূরে রইলেন, নানা বিচিত্র ঘটনায় তাঁর প্রবল চরিত্রশক্তির যে বহুমুখী প্রকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারতো তার হিসেব চাপা পড়লো।

এ কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন তুলনাহীন তেমনি তুলনাহীন তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্র। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের যথাযথ অনুশীলন এদেশে এখনও হয়নি। লোকোত্তর প্রতিভা শিল্পের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে চমকিত করেছে যে তার অন্তরালের মানুষটিকে সন্ধান করার কথা আজও ভাল করে করে মনে এলো না। তাই নানা ভ্রান্তধারণার, তরল কাহিনী রচনার শেষ নেই আজও। শুধু চরিত্র নয় তাঁর বিপুল বিরাট কর্মপ্রচেষ্টাও চাপা পড়ে গেছে আমাদের চোখে। লোকে জেনেছে তাঁর বিশ্বভারতী রাজামহারাজার অর্থে গড়ে ওঠা নাচগান ছবি আঁকার কেন্দ্র। বিশ্বভারতীর জীবন গঠনের যে বিরাট প্রয়াস তা কেই বা জানছে আর জানলেই বা কে বুঝছে যে এই পরিকল্পনা কোন সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারের নয় একজন জীবনপ্রমত্ত আলোকসন্ধানী কবির।

সাধনার কঠিন ইতিহাসকে ভুলে যখন সাধনার ফসলগুলির হিসেব নিই তখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশেই মনে করি শুধু কল্পনা থেকে ফসল ফলে। যে বিরাট ব্যাপক মন দেশের

প্রত্যেকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রেখে কোন শক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে বুদ্ধি ও বিচারের পথ খননের প্রচেষ্টা করেছে তা আমাদের অগোচরেই রয়ে গেল। তখনই নানা অর্বাচীন ধারণার পঙ্ক-স্রোতে তলিয়ে গিয়ে বলি দেশের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিলনা। আমি তো জানিনা (আর কেউ জানেন কিনা বলতে পারিনা। অন্য এমন কোন সাহিত্যিক বা স্রষ্টাকে যিনি দিনের পর দিন দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজনীতি, ধর্মনীতি নিয়ে ক্রমাগতই রচনা প্রকাশ করে চলেছেন সাময়িক উত্তেজনার পরিপোষণার্থে নয় উত্তেজনার অন্তরালে সমস্যার যথার্থ তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য। জাতির জীবনকে এমন সর্বাঙ্গীণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা রামমোহন ছাড়া ভারতের অন্য কোন মনীষী কি রাজনীতির ক্ষেত্রে, কী সমাজনীতির ক্ষেত্রে—করেননি। জীবন তাঁর কাছে পূর্বার্জিত নীতিবাক্যের ও শাস্ত্রবচনের প্রাণহীন জড়সমষ্টিমাত্র নয়। দিনে দিনে নানা দুঃখে, নানা আঘাতে, ত্যাগে ও কৃচ্ছ্রসাধনে, লাঞ্ছনায় ও অপমানে তিনি জীবনে নিজের বেঁচে থাকার মূল্য অর্জন করেছেন। সে কাহিনী পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন আছে, তাতে দেশ তার প্রেরণার আর একটি অক্ষয় উৎস খুঁজে পাবে।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রধানতঃ যুক্তিমার্গের পথিক ছিলেন একথা আগেই বলেছি। এই অন্ধ মূঢ়তার দেশে তিনি অবিচারে মেনে নেবার সহজ লৌকপ্রিয় পথ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মধ্য দিয়ে এ দেশের বুদ্ধির নবজাগরণ একটা সার্থক পরিণতি পেলো। মনে রাখতে হবে যাঁরা অচলায়তনের দরজা ধরে নাড়া দেন তাঁরা শুধু বুদ্ধির অধিকারী নন, দেশের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই তাঁদের বুদ্ধিকে শক্ত করে, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে যেতে দেয়না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ধরণের দেশপ্রেমিক যাঁরা দেশের চিরন্তন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন, প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তর্কের আসরে নেমেছেন কিন্তু লোকরঞ্জনের কবিয়ালী করার দৈন্য না থাকায় যাঁকে বার বার সরে যেতে হয়েছে কল্পনাবিলাসের অভিযোগ শিরে বহন করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে যুক্তিবাদী মানুষ হলেই হৃদয়হীন হবে এমনি একটা অদ্ভুত ধারণা ভাববাদীরা প্রকাশ করে থাকেন। একটা সস্তা কথা এই প্রসঙ্গে বার বার শোনা যায় যে শুধু বুদ্ধিতে কিই বা হয়, হৃদয়ের ভাবের ঐশ্বর্য যদি না থাকে। একথা কে না জানে যে বোধ আর বুদ্ধির মিলন না ঘটলে আলো জ্বলেনা। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসার অভাব ছিলনা, কিন্তু সে ভালবাসা অন্ধ নয় তাই তীব্র আঘাত তিনি দেশকে করেছেন তাতে মানুষটির দীপ্তি বেড়েছে, তাঁর মহত্ত্ব রবিকরের মত উজ্জ্বল হয়েছে। বার বার দেশের চলতি ধারা থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন। এমন সময় গেছে যখন প্রচণ্ড উন্মত্ততার দিনে তিনি একলা ভেবেছেন এবং তা প্রকাশ করেছেন। জীবনে একলা লড়াই করার, বিশেষ করে চিন্তার ক্ষেত্রে, যে সাহস তার মর্যাদা আমরা দিতে শিখিনি তাই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকার যোগ্য সমাদর এ দেশে হলোনা। খোলা মাঠে রাজনীতির তরোয়াল না ঘোরালে দেশকে কেউ সাহসের সঙ্গে সেবা করেছে এ কথা আমরা ভাবতেও পারিনে। তাই রবীন্দ্রনাথের দেশ-সেবার যে অংশটুকু স্বীকৃতি পেয়েছে তা হলো বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধের তিনি চারণ কবি, তিনি বাংলার জয়গান গেয়েছেন। অর্থাৎ আসল কথা হলো যে যতটুকু তিনি দেশশুদ্ধ লোকের আন্দোলনের সঙ্গে মিলেছেন ততটুকুই আমরা স্বীকার করেছি, যেখানে তিনি একা দাঁড়িয়েছেন, গানের সম্পদ নিয়ে নয়। চিন্তার ঐশ্বর্য নিয়ে যে ঐশ্বর্যের অধিকার আমরা অর্জন করতে পারিনি, সেখানে তাঁকে আমরা ত্যাগ করেছি। তাঁকে তো স্বীকার করিই নি এমন কি তাঁর একলা দাঁড়াবার প্রশান্ত সাহসকেও স্বীকার করার ঔদার্য দেখাই নি, কবির ভাববিলাস বলে ধিক্কার জানিয়েছি।

মনে পড়ছে একটা ঘটনা—১৮৯৮ সাল, ম্যাকেঞ্জী মিউনিসিপ্যাল বিল এনে বাঙ্গালী কমিশনারদের ক্ষমতা অপহরণে উদ্যত হলেন। আন্দোলনের একটা অঙ্কুর দেখা দিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন সেই আন্দোলন থেকে সরে রইলো। গগনেন্দ্র নাথ প্রমুখ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর ছেলেরা চক্ষু লজ্জায় যতীন্দ্রমোহনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন থেকে সরে আসতে পারছেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তাও রাখব অথচ নিজের মতের স্বাধীনতা এবং কর্তব্য রক্ষা করে চলব এ দুটোর মধ্যে কোন অবশ্যবিরোধ নেই।' এই রবীন্দ্রনাথ আমাদের অপরিচিতই রয়ে গেলেন। কত বিভিন্ন বিষয়ে সাহস ঔদার্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি নিজের পথ কেটেছেন তা মনে রাখিনি বলেই শুধু কবির মালা দিয়ে তাঁকে রেখেছি আলমারীতে মোটা রেক্সিনে বা চামড়ায় বাঁধিয়ে। জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে জানতে চাইনি তাই এত বড় প্রতিভার এত বড় দুর্ধর্ষ সংগ্রামীর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেশের জীবনে ও চিন্তায় পড়লোনা।

আজকের দিনে একটা প্রশ্ন উঠেছে সমসাময়িক কালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল শিথিল। তিনি ছিলেন দূরের দিকে চেয়ে নয়তো ভবিষ্যতের অচলায়তনের দ্বার-ভাঙ্গা গুরুর অপেক্ষায়। বর্তমান সেই অতীতের রোমন্থন বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন মাখা কাব্য পেলো দুএকটা। আর কি পেলো? অজ্ঞানতাজাত এই প্রশ্নের উত্তর ছড়ানো আছে ভারতী সাধনা বঙ্গদর্শনের পাতায় পাতায়, শ্রীনিকেতনের পরিকল্পনায়। পূর্ণ যৌবনের দিনে দেশের প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি লিখতেন তার প্রত্যেকটির ছত্রে ছত্রে দেশের জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা যেমন অনুভব করা যায় তেমনি সমস্যা সমাধানের বুদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতও দুর্লভ নয়। আর কোন্ দ্বিতীয় লেখক বাংলায় আছেন যিনি মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি কর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা সমস্যাকে বিচার করেছেন, এবং সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করতে চেষ্টা করেছেন। আজকের দিনে রাজনৈতিক দল, শক্তিশালী সংবাদপত্র গোষ্ঠী, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মনোভাবের কথা মনে রেখে আমাদের সমাজ সচেতন সাহিত্যিকরা দেশ সেবা করেন। রবীন্দ্র-সমালোচনায় যাঁরা উগ্র তাঁরা বিদেশযাত্রার নিমন্ত্রণে চঞ্চল হয়ে ওঠেন, সে যে দেশই হোক। তাঁরা জানেন যে নানা দেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান এসেছে এবং জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্যে ১৯১৬ সালে, প্রবাসী স্বদেশবাসীর অবজ্ঞা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে তিনি ক্যানাডায় যাননি, নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। আজকের দিনে যাঁরা দেশপ্রেমী সাহিত্যিক, যাঁরা সমাজ সম্বন্ধে খুব সচেতন তাঁদের কাছ থেকে এ ব্যবহার পাওয়া দুরাশা।

তেমনি দেখেছি তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে। সেখানে তিনি হিন্দু, আদি ও সাধারণ ব্রাহ্ম কাউকেই ছেড়ে দেননি কোন দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে। এখানেও সেই বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত, বীর্যবান নায়ককে দেখা গেল যিনি ধর্মকে কোন মত, কোন রীতি, কোন শাস্ত্রের সীমায় বাঁধতে পারলেন না। নিজে বহুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরে বলতে পারলেন যে ঐ আদি ব্রাহ্ম সমাজ ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণথলীর সূত্রে বাঁধা। কোন আত্মীয়তার স্নেহাকর্ষণ কোন পুরানো স্মৃতির দুর্বলতা পিছনে টেনে রাখতে পারলো না। যে গন্ডী একদিন নিজে বেঁধেছিলেন, জীবনের দাবীতে তাকে নিজেই ভাঙলেন।

ধর্ম তাঁর জীবনে কোন বহিরাগত শাস্ত্র ও নীতি বচনের প্রতি আনুগত্য হিসাবে আসেনি। এ ধর্ম তাঁর অন্তরের উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে জাত। তার সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগ, আর সে ধর্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে, রূপের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। তাই কোন আচরণই তাঁর জীবনে চরম আচরণ ছিলনা। নিত্যনূতন দিগন্ত দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত

হয়েছে তাঁরও মতামত বদলেছে। সেখানেও তাঁর সঙ্গী নেই। সেখানে হিন্দু সমাজ তাঁকে দূরে ঠেলে, ব্রাহ্ম সমাজ অস্বস্তি বোধ করে। ধর্মের পুঁথিগত গণ্ডীর বাইরে যে বিরাট মানবধর্মের ক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে সেখানেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি নিতান্ত একলা, বন্ধুজনহীন।

এখানেও সেই মানুষটিকে পেয়েছি, নিজের বিশ্বাসের, নিজের বিচারবুদ্ধির রাজপথ থেকে এতটুকু যাকে নড়ানো যায়নি। তার জন্যে কোন আস্ফালনের হুঙ্কার, কোন বিক্রমপ্রকাশের দম্ভ প্রয়োজন হয়নি। স্থির অটল শান্ত ব্যক্তিত্বের প্রবল সাহস রবীন্দ্রনাথের স্বভাবগত ছিল।

বহুবার তাঁকে দেখেছি রুদ্র মূর্তিতে—দেশে বিদেশে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেখানে কারও মুখাপেক্ষা ছিলনা—না কোন শক্তিগোষ্ঠীর, না কোন প্রতাপশালী বন্ধুর। সম্মানের প্রলোভনে আসক্ত হবার বহু ঊর্দ্ধে তিনি, যদিও সম্মান ও সমাদরে আনন্দিত না হবার মত শীতল ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিলনা। তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যখনই সময় হয়েছে তখনই তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ পাশ্চাত্ত্যের প্রতি এত বিপুল শ্রদ্ধা তখনকার দিনে আর কার ছিল? আজকের লাঞ্ছিত আফ্রিকার অপমানিত ধর্ষিত সত্তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সেদিনই ফিরেছিল যেদিন আমাদের সমগ্রদেশ নিজের সমস্যাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামে রত ছিল। আর দেখেছি নানা সময়ে যখন রাজনৈতিক নেতারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগত জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়তেন তখন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে দেশের প্রতিবাদ রূপ পেয়েছে। সেই হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, আন্দামান রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে, প্রকাশ্য প্রান্তরে বক্তৃতারত রবীন্দ্রনাথ, তাঁর আর এক মূর্তি। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ বছর পার হয়ে গেল, নানা লজ্জাজনক দুঃখকর হত্যাকাণ্ড দেশে ঘটলো, কিন্তু প্রতিবাদের ভাষা আজও কোন সাহিত্যসেবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলোনা।

সেই রবীন্দ্রনাথকে কি একেবারেই ভুলে যাব? যিনি সাহসী, যিনি চিন্তাশীল, যিনি সংগ্রামী যিনি অন্যায়ের আপোষ বিরোধী শত্রু। তাঁর কাব্য, সাহিত্য, তাঁর গান, তাঁর প্রবর্তিত নৃত্যকলার আড়ালে যদি তাঁকে ভুলে যাই সে অপরাধ আমাদের সমগ্র জাতির।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

ফণী পাগল

বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ইবসেন্ কল্পনা ও খেয়ালের নক্শা কেটে কত বিচিত্র মানব চরিত্রের অন্তরতম স্তরকে পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন তাঁর রচনায়—যার স্বরূপকে সমাজের কৃত্রিমতার ভিনিয়ারে চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। মানব চরিত্রের এই সত্য সত্বাকে বিবসন করে একেবারে নগ্ন করায় তাঁকে জীবদ্দশায় কত রকমের তীব্র নিন্দা ও বাদ প্রতিবাদ শুনতে হয়েছিল। পীর পয়গম্বর প্রায় আখ্যা পাওয়ার সাথে সাথে তিনি—অশ্লীল ও সস্তার চটকদার লেখক, পিশাচপন্থী, প্রলাপবাদী, নাস্তিক প্রভৃতি অপবাদও পেয়েছিল প্রচুর। আজকে সে সব মূঢ়জনের অতি প্রশংসা বা মিথ্যা অপবাদের জঞ্জাল মুক্ত তাঁর রচনাবলী বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে যথাযোগ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথাকথিত বাস্তব বুদ্ধির বিচার ও কল্পনার খেয়ালের টানাপোড়েন এ কেউ যদি টাল খেয়ে সমাজ-সাধারণ-সম্মত আচার ব্যবহার ও ভাবাভিব্যক্তিকে বজায় না রাখতে পারে, তাহলে তাকে ভব্যতার নীতি ও বিধান রক্ষার কাঠ গড়ায় আসামী হয়ে সাজা পেতে হয়। এই সমাজপীড়িত খাপছাড়াদের পক্ষ নিয়ে মসী ও লেখনীর আয়ুধ দিয়ে লড়াই করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইবসেন্। ব্যক্তিগত ভাবালুতা ও চিন্তার স্বাধীন ও অবাধস্ফুরণকে বহুজন সম্মত নীতি বা আচার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল অতিশয় তীব্র। কল্পনা বিলাসী সাহিত্যিক ও নাট্যকার ইব্সেন নিজ জীবনে ছিলেন অতিশয় একাকী ও সঙ্গীহীন। সমাজের সকল বিচার ও আচার বন্ধনমুক্ত তাঁর স্বীয় সত্বাই তাঁর রচনায় রূপধারণ করেছে পিয়ের গিন্ট-এর চরিত্রে। সমাজ নিরূপিত নীতি বিচারের সংজ্ঞা ও বিধানকে পিয়ের স্বচ্ছন্দভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। কিন্তু বারে বারে তাঁর সর্বাঙ্গীন অনুভূতি দিয়ে প্রেম ও ভালবাসার চেতনা ও বিলাসকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছেন দেশে বিদেশে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। ইবসন্ এর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রায়ই এই মর্ম্ম কথা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে জগতে সবচেয়ে বড় অবিচার, শাস্তি ও বেদনা আসে প্রেম বর্জ্জিত ও বঞ্চিত জীবনে। দরদী মনের বিনিময়ে, মিলন ও স্পর্শের চেয়ে আনন্দময় ও মধুর জগতে আর কিছু নেই আর সেই ভালবাসার চাওয়া পাওয়াকে বিচারবুদ্ধির পথে লাভ করা যায় না। তাই তিনি সর্বজন গ্রাহ্য বিচারবুদ্ধির সত্বাকে উপহাস করেছেন কায়রোর উন্মাদালয়ের তত্বাবধায়ক বেগ্রিনফেলট্ এর ভাষণে। বেগ্রিনফেলট্ পিয়েরকে 'King Exegesis' আখ্যা দিয়ে উন্মাদালয়ের অন্তেবাসীদের কাছে উপস্থিত করালেন এবং উপলব্ধ এক নিদারুণ সত্যের ভারে পীড়িত চিত্ত তিনি তাকে ব্যক্ত করে হাল্কা হবার জন্যে ঘোষণা করলেন যে, জাগতিকভাবে বিচারবুদ্ধি বিগত রাত্রিতে এগারো ঘটিকায় লুপ্ত হয়েছে। ফলে সেই সময় থেকে যাঁরা ছিলেন উন্মাদ তাঁরা পেয়েছেন স্বাভাবিকচিত্ততা ও যাঁরা ছিলেন স্থির-মস্তিষ্ক ও তাঁরা হয়েছেন উন্মাদ। এই প্রসঙ্গে নানা কথার পর পিয়ের মন্তব্য করলেন যে স্থির-মস্তিষ্ক ও মতিচ্ছন্নতার কোনটা ঠিক তা নির্ণয় করতে ছাপার ভুল হওয়ার মত ভ্রমপ্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। পিয়ের এর এই উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করেছিলাম ফণী পাগলের সান্নিধ্যে।

যতদিন পর্য্যন্ত কসবার গ্রাম্য পরিবেশ অক্ষুন্ন ছিল ততকাল ফণী পাগলের চিহ্ন সম্পূর্ণ

অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। ই'ট পাটকেল তৈরী স্লাম শহরতলী হয়ে আজ কসবা তাঁর ভিটে ও আস্তানাকে দৃষ্ট জগত ও অধিবাসীদের মনের স্মৃতি থেকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

ফণী পাগলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এক আকস্মিক ও ভয়ংকর পরিস্থিতিতে।

কসবার এক রাস্তার বেড় খাওয়া বেশ বিস্তৃত খানিকটা জমিতে ছিল তাঁর আস্তানা। এক পাশে একটি বড় বকুল গাছ এবং গুটিকয়েক বেল ও নারিকেল গাছ ছাড়া প্রচুর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখা যেত একটা চালা ঘরের খানিকটা। সেই কাঁটা জঞ্জালময় সবুজের স্তূপের মাঝে চালাঘরটির পটভূমিতে কখন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত জটাজুটধারী ঘনকাল শশ্রু ও গুম্ফ বিশিষ্ট মুখে বিস্ফারিত নেত্রের উজ্জ্বল চাউনী ফেলে মধ্যবয়সী গৌরকান্তি এক অতীব শক্তিসামর্থশালী পুরুষকে। আশে পাশের পরিষ্কার জমি ও লোকালয়ের ব্যবধান খুব বড় না হলেও ঐ জঙগলভরা স্থানটুকু ও তার অধিস্বামীকে মনে হোতো আমাদের জীবনের বাইরের বহু তফাতের আর এক জগত ও তার উদ্ভট বাসিন্দা স্বরূপ। ঐ পরিবেষ্টনী থেকে মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ ভৈরবের মত বজ্রনাদ ও আস্ফালন করতে করতে ফণী পাগল নেমে পড়তেন লোকালয়ের মাঝে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে ছোট বড় সকলেই উধাও হয়ে এসে পাশের বাড়ী বা দোকানে আত্মগোপন করতেন। তাঁর সেই সংহারমূর্ত্তিকে আরো ক্ষিপ্ত করতো কোন শয়তান দর্শকের আড়াল থেকে "ফণী পাগল" সম্বোধন। একমাস কি দুমাস অন্তর তাঁর স্ত্রী বছর দশেকের ছেলেকে সঙ্গে করে আসতেন পাগলের ডেরায় এবং কয়েক ঘন্টা থেকে তাঁর বাসগৃহকে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠ করা যায় তার ব্যবস্থা করে আবার চলে যেতেন। তাঁর স্ত্রীপুত্রের উপস্থিতিকালে ফণী পাগলকে সর্বদাই বেশ স্বাভাবিক চিত্ত ভাল মানুষরূপে দেখা যেত। তৎকালীন কসবার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে আমরা জেনেছিলাম যে, স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে আপন আয়ত্তে রাখবার চেষ্টায় ফণীবাবুকে তাঁর তুকতাকগুণবিশিষ্ট কি একটা পানীয় পান করিয়ে দেবার পরই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ঐ ঘটনার পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ফণীপাগল ছিলেন পেশাদারী উকিল এবং তাঁর নাকি বেশ পশারও ছিল। তাঁর স্ত্রীর প্রতি এই নিদারুণ অভিযোগের কতখানি সত্য ও প্রমাণযোগ্য তা কেউ খোঁজ করেননি বা তা করবার প্রয়োজন বোধ ও করেন নি। কারণ এদেশে কোন কুৎসা প্রচারে মুখরোচক ও শ্রুতি বিনোদনের উপযুক্ত হলে তা সত্য কি মিথ্যা সে অনুসন্ধান বা বিচারের প্রয়োজন হয়না। আমাদের "অধিকন্তু ন দোষায়" প্রথার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে সেই হেতু সমাজে দোষী ও নির্দোষীর তফাৎটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত—প্রায় একটি অতি ক্ষীণ রেখার ব্যবধান বলা যেতে পারে। তাই অপরাধ না থাকলেও পছন্দমতো আরোপিত অপরাধে সাধ্বী বিদুষী রমণীর দুশ্চরিত্রা ও মূঢ়জনের অপবাদ পেয়ে সাজা পাওয়া এবং সহস্র পাপে কলঙ্কিনী ও বুদ্ধিহীনার, সমাজের নেক নজরে আসার, সাবিত্রীসম পবিত্রা ও বিদ্যায় বাগদেবীর পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়—বিশেষ করে যদি এহেন দেবীর সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থের জোর থাকে। যাই হোক ফণীবাবুর পাগল হয়ে যাওয়ার মূলে যে সত্য কারণই থাকুক এ চলতি কিংবদন্তী নিয়ে কেউ বাদ প্রতিবাদ করতে আসেনি।

ফণীপাগলের ধাতব যে কোন জিনিষের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পথে পড়ে থাকা লোহা তামা বা পিতলের পাত, তার বা শলাকা কিংবা রকমারী পেরেক, স্ক্রু, বোল্টস, নাট্ থেকে আরম্ভ করে ভাঙ্গা এনামেল মগ্ বা গামলা তাঁর দৃষ্টিতে পড়লেই তাদের সেই অনাদৃত ও ধূলাবলুণ্ঠিত দশার উদ্ধার হয়ে যেত। একদিন কোন গ্রহ প্রসন্ন থাকায় ফণীপাগল রেললাইনের দু'পাশে সীমানা জ্ঞাপনকারি লোহার খোঁটায় বাঁধা যে তারের বেড়া থাকত তারি একটি খোঁটা কোন উপায়ে হস্তগত করেছিলেন।

প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ এই লৌহ দণ্ডের যে অংশটি মাটিতে পোঁতা থাকত সে অংশের গড়ন ছিল বল্লমের চারশিরা ফলকের মতো। এমনি একটি আয়ুধের অধিকারী হওয়ায় এবং লোকে উত্যক্ত করার ফলে তিনি নিজেকে অর্জ্জুন বা ভীম সেন ধারণা করে প্রায় মহাকালের সংহার মূর্তিতে কসবার রাস্তায় রাস্তায় রুদ্রতাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এক সহপাঠীর বাড়ীতে লুকোচুরী খেলতে মত্ত আমি খেলার উত্তেজনায় দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যেতেই আচমকা একেবারে ঐ কালভৈরবের সামনে পড়ে গেলাম। মুহূর্তে, সকলের বিনাশে উত্থিত সেই লৌহ দণ্ডটি ঠিক আমার মাথার উপরে আঘাতের জন্য প্রস্তুত দেখলাম। অতীতের স্মৃতি আজ কিছুটা ফিঁকে হয়ে এলেও এখনো পরিষ্কার মনে পড়ে যে সে অবস্থায় পড়ে ভীত হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই নি। বিপদের আকস্মিক প্রকোপে ছোটদের বিবেচনা শক্তি বড়দের চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত হয়না বরং সে পরিস্থিতিতে কি করা সমীচিন তা বোধহয় বড়দের চেয়ে তারা ত্বরিৎ নির্ণয় করতে সক্ষম। যে সকল বর্বরেরা পাগলকে উত্যক্ত করে তার প্রতিক্রিয়াকে একটা মজা দেখা হিসাবে নিতো তার বাইরে ছিলেন বহুসংখ্যক অধিবাসী যাঁরা এই উন্মাদকে "ফণীবাবু বা ফণীদা" সম্বোধনে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেন এবং আমরা জানতাম যে তাঁদের সান্নিধ্যে ফণীপাগলের পাগলামীর মাত্রা প্রশমিত হয়ে তিনি প্রায় স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা ফিরে পেতেন। তাই ভরসা করে পরিত্রাণের শেষ সম্বল হিসাবে ডাক দিলাম--"ফণী দা"। চারপাশে যাঁরা এই দৃশ্য দেখছিলেন তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন যে, যেমন হাঁড়িকাঠে চেপে ধরা ছাগশিশুর কণ্ঠ থেকে নির্গত ভয়কাতর শব্দ পূর্ণ উচ্চারিত হবার আগেই খাড়ার ঘা তাকে স্তব্ধ করে দেয় আমার ও তেমনি দশা হবে। কিন্তু উত্থিত দণ্ডটি আর নামল না। সেটা উঁচিয়ে ধরে "আমার সামনে থেকে ভাগ্" বলে বজ্রনাদে ফণীপাগল আমাকে তাঁর সামনে থেকে হাঁকিয়ে দিলেন।

পরদিন বাড়ীর দৈনন্দিন আহারের সামগ্রী সওদা করতে বাজারে যেতে ফণী পাগলের ভিটের পাশ দিশে যাবার সময় দেখি তিনি তাঁর চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জটাজুটধারী শান্তশিবের মত। আমাকে দেখেই তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সেই কাঁটা জঙ্গলের প্রাকার দেওয়া পাগলের ভিটেয় প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখীন হওয়ার মত আমার সাহস ছিল না। কিন্তু এও ভাবলাম যে ঐ একটি মাত্র রাস্তা দিয়ে আমাকে প্রত্যহ বাজারে ও স্কুলে যাতায়াত করতেই হবে এবং কোন না কোন দিন ঐ পাগলের নাগালে পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা খুবই স্বাভাবিক। এই আহ্বানকে উপেক্ষা করে গেলে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার ফল যে খুব শুভ না হতে পারে এবং সে পরিস্থিতি বর্তমানের চেয়ে আরো হয়ত ভয়ংকর হবে ভেবে বুকে সব সাহসকে জড় করে ডেকে উঠলাম "ফণী দা"। তাঁর কাছে উপস্থিত হতে তিনি "আয়" বলে পিঠে হাত রাখলেন। সে হাতের স্পর্শ যে যথেষ্ট স্নেহেভরা ছিল তা সহজেই অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তাঁর ঘর দেখাবেন প্রস্তাব করায় আবার ভয়ের কাঁপন এসে গেল আমার মনে ও সর্বাঙ্গে। কিন্তু ঐ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন উপায় না থাকায় একেবারে শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঢুকলাম তাঁরা চালাঘরের ভিতর। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হল যেন রূপকথার এক যাদুকরের ভোজবাজি বানাবার কারখানায় ঢুকেছি। যতরকমের ফেলে দেওয়া ধাতব জিনিষ কল্পনা করা যেতে পারে তার একত্র সমাবেশ ছিল ঐ ঘরটির সারা দেওয়াল থেকে আরম্ভ করে ছাদ পর্যন্ত ভরা। এক দেওয়ালের মাঝখানে একটি খাঁড়া অটুট অবস্থায় বিরাজ করছে দেখলাম। সেটির প্রতি তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তার প্রমাণ দিচ্ছিল খাঁড়াটির সদা ঘষা মাজায় অত্যুজ্জল ধারাল রূপ। অনিচ্ছাসত্বেও সেই হনন অস্ত্র-

টির ভয়াবহ ধারাল রূপ বারে বারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সাহসের পুঁজি শেষ হয়ে এসেছিল এবং পলায়নের পথ খুঁজতে বললাম, 'ফণীদা বাজার থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে না ফিরলে মার কাছে মার খাব।' নিষ্কৃতি যে সহজে পাব আশা করিনি। কিন্তু "আবার আসিস্" বলে তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন।

যে দু'একজন সহৃদয় ব্যক্তি ফণীপাগলকে আহার্যের দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করতেন তার মধ্যে একজন ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। ফণীপাগলের ক্ষিপ্তবস্থা ও পণ্ডিতমশাই এর ক্রুদ্ধরূপে খানিকটা সাদৃশ্য টানা যেত। কেবল তফাৎ ছিল যে আক্রান্ত জনেরা অনায়াসে পাগলের নাগালের বাইরে পালাতে পারতো কিন্তু পণ্ডিতের শিকারে তাঁর হাত থেকে রেহাই পেত না কোনদিন। অথচ এই শিকারদেরই মারফতে তিনি পেতেন প্রায়ই চাল ডাল ও সব্জীর নানা ভেট যার খানিকটা পণ্ডিতমশাই নিজে হাতে দিয়ে আসতেন ঐ পাগলের ডেরায়। ছোটদের অন্যায় দণ্ড দিতে নির্মম কিন্তু পাগলের ভাগ্যহীনতায় সহানুভূতিপূর্ণ স্বতস্ফূর্ত্ত তাঁর এই করুণা প্রকাশ ছিল এক অতি অস্বাভাবিক ও স্বাভাবিকতার ডাইকোটমী। বাড়ীর দৈনিক বাজার করার ভার আমার উপর ছিল। একদিন ফণী পাগলকে তাঁর ভিটের কিনারায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তাঁকে বাজার থেকে কেনা শাক সবজীর থেকে কিছুটা দিতে খুব ইচ্ছে হল এবং তিনি সেই যৎসামান্যই উপহার সুন্দরভাবে গ্রহণ করলেন। এরপর প্রায়ই আমাদের বাড়ীর দৈনিক বাজারের সামান্য অংশ ফণী পাগলের রসনাগত হবার সম্মান পেত। বাড়ীতে কেনা জিনিষের পরিমাণ কম হওয়ার উচিত কৈয়িফৎ আবিষ্কার করা এক মহা-সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্বন্ধে সত্য কারণকে স্বীকার করা ঘোর উম্মাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানর চেয়ে কঠিন মনে করেছিলাম। বেশ কিছুকাল আলাপের পর প্রাথমিক ভয় ও সংশয় প্রশমিত হলে ফণী পাগলের মত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় নানা স্তরের ক্রমাভিব্যক্তিকে—ছোট বলে ও বিশেষ করে বুঝবার একটা কৌতুহল মনে জেগেছিল। এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে মত্ততার পূর্ণ প্রবণতায় তাঁর বিবেকবুদ্ধি যার ফলে সেই দুর্দান্ত পাগলামীর অবস্থাতেও কে তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় ব্যবহারে তার ভেদাভেদ ধরা পড়ত। কিন্তু প্রিয়জন হলেও তিনি যেন চাইতেন না তাদের সান্নিধ্যে আসায় সকলের চক্ষে তাঁর মত্ততার ভয়ংকর গুরুত্ব ও তার প্রভাব খর্ব হয়ে যায়। তাঁর পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি অবস্থার প্রাধান্য ছিল প্রায় যোগীর সমাধিস্থ হওয়ার মতো। সেই অবস্থায় দু'একবার সাহস করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে মারের হাত থেকে বেঁচে গেলেও প্রচণ্ড গালাগাল ও হাঁক ডাক পেয়েছিলাম তাতে হৃদয় প্রায় পাকস্থলীগত হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই তিনি রুদ্ররূপ ধারণ করলে তাঁর সান্নিধ্যে না আসাই মঙ্গল জেনেছিলাম। ফণী পাগলের সঙ্গে মেলামেশায় সবচেয়ে উপভোগ্য সময় ছিল যখন তিনি শান্তভাবের উন্মা-দনায় মত্ত থাকতেন। সে সময় তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা কি বিশ্ব-কর্মা শিল্পী হয়ে পড়তেন এবং তাঁর কল্পনা জগতের ক্রম বিস্তার জমিতে ফলান ফসল পাগ-লামীর গোলায় পূর্ণ হয়ে উপচে আমাদের ধারণায় ঠিক চেতনার জগতে পড়ে নানান রঙে ও ঢঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত।

তাঁর জমির একপাশে ছিল পুকুর। একদিন দেখি তিনি তার পাড়ে বসে জলে হাত ডুবিয়ে কি যেন টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তিনি পাশের যে নারিকেল গাছ ছিল জলে তারি প্রতিবিম্বের গাছ থেকে ফল পাড়বার ব্যবস্থায় রত। যখন বললাম যে ফল তো রয়েছে গাছের উপর বহু উঁচুতে। তিনি বললেন "মুর্খ আমি কি সে গাছের ফল পাড়তে যাচ্ছি? এই যে জলের নীচে নামলেই নাগাল পাওয়া যায়।" ফল, জলের গাছ

থেকে তিনি চয়ন না করলেও সেটা যে সম্ভব তারি আবিষ্কার আনন্দে বেশ মশগুল হয়ে উঠলেন।

লরীর ধাক্কায় একবাড়ীর গেটের সামনে বসবার ইট সিমেন্ট গাঁথা বেঞ্চ ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফণীদার নজরে পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে বিশ্বকর্মা বানিয়ে তার মেরামত করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। বেঞ্চিটির মাঝখান ভেঙ্গে যে ফাটল হয়েছিল সেখানে প্রচুর লালা ফেলে মুঠো মুঠো ধুলো বর্ষণ করে হাত দিয়ে ঘষতে শুরু করে দিলেন। এসব দেখে 'কি হচ্ছে' প্রশ্ন করতে তাঁর মন্তব্য হ'ল যে, যে হতভাগারা এটিকে ভেঙ্গেছে তারা এর মেরামতের ব্যবস্থা করবে না তাই তিনি সকলের উপকারার্থে ভাঙ্গাটা জুড়ে আবার আস্ত করে দিলেন। তাঁর খেয়ালী মন দেখছিল যে ফাটা তাঁর কারিগরীতে জুড়ে গিয়েছে আর আমি—বাস্তবের সীমানায় ঠেকে ঠুটো হওয়া দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম যে, বেঞ্চের অপরিবর্তনীয় ভাঙ্গন, লালা ও ধুলির জঞ্জাল ও পাগলের পাগলামি। এ যেন চিরন্তন পিয়েরগিন্ট ফণীপাগলের ছদ্মবেশে বাস্তব ও কল্পনাকে এক সাথে তরল নির্য্যাসে পরিণত করে তারি মদিরা বানিয়ে পান করে নেশায় রঙিন দৃষ্টিতে জগতকে আপন হাতে ভেঙ্গে গড়ে সাজাবার রঙ্গে মেতে গেছে। কেবল ফণী পাগলকে বুঝবার মত নেই সলভিগ্ ট্রল্ এরা, বোগ্রিনফেলট্ এবং আরো অনেকে। পিয়ের এর মত তিনি যদি শ্যামবসনা পর্বতবাসিনীর দেখা পেতেন তা হলে নিজের পরিচয় দিতেন হয়ত ফণীন্দ্র মহারাজকুমার বলে এবং সে যুবতী হয়ে পড়তেন কোন রাজকুমারী। তাঁরা পরস্পরকে জানাতেন যে তাঁদের বাস্তবে দৃষ্ট জীর্ণ ও দীন বসন ছিল আসলে সোনা রূপোর সুতায় বোনা কিংখাব। রাজকন্যা বলতেন যে পর্বতবাসীদের রীতি অনুযায়ী তাঁদের দেশে সব কিছুরই দুই প্রকারের রূপ হয়ে থাকে। তাই আসলে যেটা তাঁর পিতার রাজপ্রাসাদ, দৃষ্টির বিকৃতিতে তাকে অপরের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেটা নুড়ি ও পাথরের স্তূপ মাত্র। পিয়ের এর মত তিনিও জবাব দিতেন যে তাঁর রাজ্যেও ঐ একই দশা তাই তাঁর চাপা ঘরে রাখা আসল সোনা মানিককে লোকের চোখে মনে হবে ছাতা পড়া, পচা পাঁশের সামিল। "প্রাসাদের যে জানলা স্ফটিকে মোড়া তাকে দেখাবে চীর বসনের পর্দ্দা কি ছেঁড়া মোজার আচ্ছাদন। যুবতীর যদি উত্তর হোত—"যেমন কালকে দেখায় সাদা অথবা কুরূপা হয় সুরূপা" তাহলে তিনি বলতেন "যেমন বড়কে দেখায় ছোট অথবা অপরিচ্ছন্নকে দেখবে ফিটফাট পরিষ্কার।" তাঁদের দুজনের মতে দুরুক্তি হোত না যে তাঁরা দু'জনে পাজামার সঙ্গে পায়ের মতো পরস্পরের আদর্শ সঙ্গী ও সঙ্গিনী।" কিন্তু পিয়ের গিন্টের স্রষ্টার মতো ফণী পাগল একমাত্র নিজ সঙ্গ ছাড়া 'রয়ে গেলেন চিরকাল একা ও নিঃসঙ্গী।'

ফণী পাগল সুকন্ঠ ছিলেন। একদিন অতি ভোরবেলায় দূর থেকে ভেসে আসছিল তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতের, প্রবাহ

"অয়ি ভূবন মন মোহিনী।
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী।"

পাগলের প্রাণ খোলা আহ্বানে মন্দ্রিত হচ্ছিল নবদিবসের সূচনায় জাগরণের আগমনী। সেই সুরতরঙ্গের কল্লোল প্রবাহিত হয়ে আমাদের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন এক পসলা জোর বৃষ্টির অন্তে প্লাবনে ভাসা জমির জল সরে হঠাৎ শুকনো হয়ে উঠলো। আমার নাম ধরে তিনি ডাক দিতে বড়রা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং কি সূত্রে ফণী পাগল নাম ঠিকানা ঠিক জেনে আমার খোঁজে আসতে পারেন তার রহস্য ভেদ করবার আগেই আগত উন্মাদের

অধৈর্য্য আহ্বানকে স্থগিত করবার জন্য তাঁদের দরজা খুলে পাগলের সম্মুখীন হতে হ'ল। তাঁর আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ফণী পাগল তাঁর জমির গাছ থেকে পাড়া দুটি বড় পাকা বেল আমাকে দিতে এসেছেন বলে সেদুটি বড়দের জিম্মায় রেখে চলে গেলেন। পরে জবাবদিহি করতে আমাকে বলতে হোল ফণী পাগলের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয়ের বিবরণ এবং দৈনিক বাজারের সওদা, ওজনে ও সংখ্যায় কম হয়ে যাওয়ার কারণও স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। আমাদের বাড়ীর কড়ানীতি ও নিয়মবিরুদ্ধ বহু যে সব ক্রিয়াকলাপের জন্য সাজা পেয়েছি তার মধ্যে ফণী পাগলের সঙ্গে মিত্রতা অন্যায়ের পর্য্যায়ে গণ্য হোল না এবং এই দোষ প্রতিষেধক তর্জন বা দণ্ড না পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য হয়েছিলাম।

প্রতিবৎসর বর্ষারম্ভে কসবায় কলেরার মড়ক লাগত এবং এখনও বোধহয় সেই বাৎসরিক মহামারীর প্রকোপের কিছু পরিবর্তন হয়নি। উন্মাদ বলে ফণী পাগলকে সব আইন ও সমাজনীতি লঙ্ঘনে কোন প্রতিফল পেতে হয়নি কিন্তু এই মহামারীর অলিখিত বিধানে তিনি ধরা পড়ে মরণাপন্ন হলেন। কলেরায় আক্রান্ত ফণী পাগলকে বাঁচাতে পাড়ার অনেকে উপস্থিত হলেন তাঁর ডেরায় এবং ডাক্তার এসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন "ভয় নেই ফণীবাবু, আমরা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আপনাকে এখুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।" চালাঘরের সামনে লতাগুল্মহীন ছোট খোলা উঠানে কার দেওয়া একটি মাদুরের উপর লম্বমান ফণী পাগলের চোখদুটি তখন আর উন্মাদনার উত্তেজনায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ছিল না। নিষ্প্রভ সে চোখ উপস্থিত আমাদের সকলকে ডিঙ্গিয়ে যেন দেখছিল বাস্তবের সীমানায় ওপারে বিস্তৃত আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে আর কোন জগতকে। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি ডাক্তারকে অনুনয় করে বল্লেন, "এ্যাম্বুলেন্স আর ডাকবেন না। আমি সেরে উঠলে জানেনই তো বিকৃত চৈতন্যের জগতে আমায় ফিরে যেতে হবে। আর সেখানে যেতে চাই না কাজেই এই শেষবার আমার বোধশক্তি ও ধারণাকে বিলুপ্ত না করে জীবন থেকে চাই মহাবিদায়।"

এ্যাম্বুলেন্স আর ডাকা হয়নি। মতিচ্ছন্নতা ও স্থিরমস্তিষ্কের কোনটা ইহজগতে মূল্যবান তা জীবনের শেষ মুহূর্তে ফণী পাগল উপলব্ধি করেছিলেন কিনা কে জানে। ইহজীবনের অন্তে আমাদের কোন সত্বা এই জগতে কিংবা আর কোন জগতে যদি বজায় থেকে যায় তা হলে অশরীরী ফণীপাগলকে বোধহয় স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি বিশিষ্ট বা মতিচ্ছন্নতার হিসাব নিকাশ দিয়ে আর নিগৃহীত হ'তে হয়নি।

ভারতের বাংলাভাষী

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাকে অনেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি হিসাবে চিহ্নিত করে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষার সঙ্গে যে সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে সে কথা এমনই স্বতঃসিদ্ধ যে তা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যুক্তির অবতারণার প্রয়োজন নেই। তবে ভাষা সমস্যার একটি দিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হবে।

ভাষা সমস্যার দুটি দিক। একটি হল, রাজ্যে কোন ভাষাটি প্রাধান্য লাভ করবে; আর দ্বিতীয়টি হল, এক অঞ্চলের অধিবাসী যখন অন্য অঞ্চলে কর্মোপলক্ষে বসবাস করে তখন তাদের মাতৃভাষা কতটা মর্যাদা পাবে। কর্মোপলক্ষে যাঁরা অন্য অঞ্চলে যান তাঁদের সমস্যা তত গুরুতর নয়। কেননা, তাঁরা অস্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু যাঁরা স্থায়ীভাবে কোনো পৃথক ভাষা-অঞ্চলে বসবাস করেন মাতৃভাষা নিয়ে তাঁদের যে সমস্যা তার সফল সমাধান এখনও হয়নি। আমাদের শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার নেই। অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে না হলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই মাতৃভাষার প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে পড়ে এবং মাতৃভাষার চর্চাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের সূত্র বাংলা ভাষা। এই সূত্রটি যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে বাংলার বাইরে যে-সব বাঙ্গালী আছেন তাঁদের আমরা হারাব। হারালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষতি হবে।

ক্ষতি কতটা হবে সে বিষয়ে ধারণা করতে হলে প্রবাসী বাঙ্গালীর একটা হিসাব নেওয়া প্রয়োজন। হিসাবটা পুরনো,—রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্বেকার। তাই পুরনো রাজ্যগুলির নামই দেওয়া হল।

রাজ্য	বাংলাভাষী		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
আসাম	৯,২৫,৫৩৯	৭,৩৯,৬১৬	১৬,৬৫,১৫৫
আন্দামান	১,৪৩৮	৯২৫	২,৩৬৩
উত্তর প্রদেশ	৩৯,৮৪১	৩৩,২০৪	৭৩,০৪৫
উড়িষ্যা	৪৩,৫৪৪	৪২,৫৩৯	৮৬,০৮৩
ত্রিপুরা	২,০০,৭৫৮	১,৭৪,২৭৭	৩,৭৫,০৩৫
দিল্লী	৯৫৬	৯,৩৫৯	১০,৩১৫
পাঞ্জাব (পূর্ব)	১,৭৮৪	৯,৫৯৩	১১,৩৭৭
পেপসু	৩	৬	৯

রাজ্য	বাংলা ভাষী		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
বিহার	৮,৯৪,১৯২	৮,৬৫,৫২৭	১৭,৫৯,৭১৯
বিন্ধ্য প্রদেশ	৩৪৭	৩৩৪	৬৮১
বোম্বাই (সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ সহ)	১০৬২১	৪,৯৩৩	১৫,৫৫৪
মধ্য প্রদেশ	১৩,৬৮৮	১০,১২৭	২৩,৮১৫
মধ্য ভারত ও ভূপাল			১,৯৪৭
মণিপুর			২,৮৫৯
মহীশূর	১,৯১৪	৪৩৯	২,৩৫৩
মাদ্রাজ	২,৩৩৪	১,১০৪	৩,৪৩৮
রাজস্থান ও আজমীর	১,৬২৭	১,১৪৮	২,৭৭৫
হায়দরাবাদ	৪৮৭	২৯৪	৭৮১
হিমাচল প্রদেশ	১০	৮	১৮
		মোট	৪০,৩৭,৩২২

উপরের হিসাব সম্পূর্ণ নয়। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে (বর্তমান কেরালা) বাংলাভাষীর সংখ্যা পাওয়া যায়নি। সংখ্যা এত কম যে তা পৃথক ভাবে দেখাবার প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষ অনুভব করেননি। দিল্লীতে বাংলাভাষী পুরুষের সংখ্যা মাত্র ৯৫৬, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দিল্লী ও পাঞ্জাবে বাংলাভাষী নারীর সংখ্যাধিক্যটাও কৌতূহল জনক। বাঙ্গালী মেয়েরা কি পাঞ্জাবে বউ হয়ে গেছে? যাই হোক, ত্রুটিপূর্ণ হলেও সেন্সাসের তথ্য থেকে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাবে। আরও একটা কথা। ত্রিপুরা ও আসামের বাঙ্গালীদের ঠিক প্রবাসী বলা চলে না। তবে বৃহত্তর অর্থে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের বাংলাভাষীদের আমরা 'প্রবাসী' বলেছি।

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ছিল ২৪,৭০৪,২৯৩। এদের মধ্যে বাংলা ভাষীর সংখ্যা ২,১০,৩৯,৬০১। বাংলা মাতৃভাষা নয় এমন ভারতীয়ের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৩৬,১৬,২৯৪। অ-ভারতীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ৪৮,৩৯৮। তাহলে ভারতে মোট বাঙ্গালীর সংখ্যা দাঁড়াল ২,৫০,৭৬,৯২৩। মোট বাংলা ভাষীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকেন। পাকিস্থানে বাংলা ভাষীর সংখ্যা ৪,১২,৬০,০০০-এরও বেশী। এছাড়া ব্রহ্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আরও অন্ততঃ হাজার দশেক বাংলাভাষী আছে। তাহলে ১৯৫১ সালে পৃথিবীতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৬৩,৪৭,০০০।

যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় তাঁদেরও অনেকে বাংলা বুঝতে, বলতে এবং (অল্প সংখ্যক) পড়তে পারে। এদের সংখ্যা প্রায় ২০,৫৫,০০০। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা

যায় যে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা জানে তারাই সবচেয়ে বেশী। নীচে প্রধান ভাষা-ভাষীদের ক'জন বাংলা জানে তার একটা হিসাব দেওয়া হল:

মাতৃভাষা	বাংলা জানেন
হিন্দী	৭,৪৭,২৭৩
সাঁওতালী	৫,৪৯,১৪২
আসামী	৩,৮৩,২৩৪
উর্দু	১,০২,৬২০
উড়িয়া	৬২,৫৩৫
নেপালী	১৪,৭৮৮
তেলুগু	৩,৩৯৬
পাঞ্জাবী	২,৬৭৭
তামিল	১,৬৯৮
গুজরাটী	১,৩১৬
মারাঠী	৫৫৯
মালয়ালাম	১৭১
কানাড়ী	২৭৬

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান অ-বাংলা ভাষী লোকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে কত ছিল তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া হল:

মাতৃভাষা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
সাঁওতালী	৩,৩৬,০৬৮	৩,২৭,৪৪৮	৬,৬৩,৫১৬
হিন্দী	১০,৭১,৯৬০	৫,০৮,৭৬৪	১৫,৮০,৭২৪
উড়িয়া	১,৪০,৮৭০	৪১,৭৪৮	১,৮২,৬১৮
উর্দু	২,৯০,০০৭	১,৬৭,৯৭৪	৪,৫৭,৯৮১
তেলুগু	২৭,৩৪৬	২২,১৯৮	৪৯,৫৪৪
পাঞ্জাবী	২২,৯৯০	১০,৩৪১	৩৩,৩৩১
গুজরাটী	৬,৮৬৩	৮,১০৮	১৪,৯৭১
তামিল	৯,৬৭৫	৫,০৩৫	১৪,৭১০
আসামী	৬,৬৮৩	২,৭০৪	৯,৩৮৭
মারাঠী	৪,৩০২	৩,৩৪০	৭,৬৪২
ইংরেজী	২৩,১৯৪	১৫,০৮৯	৩৮,২৮৩
চীনা	৩,৩৮১	২,৩৪৮	৫,৭২৯

অ-বাংলাভাষীদের অধিকাংশই কলকাতায় বাস করে। কলকাতার মোট জনসংখ্যার শত-

করা ৬৬% ভাগ ১৯৫১ সালে ছিল বাংলাভাষী। শতকরা কুড়ি ভাগের মাতৃভাষা ছিল হিন্দী। কলকাতার মিউনিসিপাল অঞ্চলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল :

মাতৃভাষা	পুরুষ	স্ত্রী
বাংলা	৯,৮৩,৩০৩	৬,৮৭,২৯৮
হিন্দী	৩,৯৩,৮৪৬	১,২৩,১০৭
উর্দু	১,১৫,৪০৬	৫৫,৯৩৩
নেপালী	১১,৫৭০	৪,৯৩৮
উড়িয়া	৫০,৯২৬	৬,৯০৯
তেলুগু	৫,৭৪১	২,৫৯৯
পাঞ্জাবী	১৪,৯৯৪	৫,৮৬১
গুজরাটী	৫,৭৪২	৭,৭৯১
তামিল	৫,৩৭৫	২,৪৭৩
আসামী	১,৮১৮	৯৭২
রাজস্থানী	২,১৪৩	৫,৪১৮
মারাঠী	২,১৫৮	২,৬০৯
মালয়ালাম	১,২৩৬	৪৯৬
চীনা	২,৫৫৭	১,৯৪৩
ইংরেজী	১৫,৫৬৭	১১,৭২১

উপরে যে-সব পরিসংখ্যান দেওয়া হল তা থেকে অন্য ভাষা-ভাষীদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা ভাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। যে দু'টি প্রধান তথ্য পাওয়া গেল তা হল এই যে: ১ ভারত রাষ্ট্রের মোট বাঙালীর প্রায় এক ষষ্ঠাংশ থাকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে; ২ পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক সপ্তাংশ বাংলাভাষী নয়।

হিন্দী, উড়িয়া, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাভাষীদের অনেকে নিজ নিজ রাজ্যের বাইরে থাকে। তাদের তুলনায় প্রবাসী বাংলাভাষীদের সমস্যা পৃথক। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাংলা-ভাষীরাই বাংলার বাইরে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যায়। কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গেছে তাদের সংখ্যা খুবই কম। অন্য রাজ্যে পুনর্বাসনের জন্য পূর্ব-বঙ্গের কিছু উদ্বাস্তু পাঠানো হয়েছে। কায়িক পরিশ্রম তারাই করে। কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে এদের সংখ্যা বেশী হবার কথা নয়। অধিকাংশ উদ্বাস্তু এর পরে বাংলার বাইরে গেছে।

প্রবাসী বাংলা-ভাষী ও অ-বাংলাভাষীদের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, বাংলাভাষীরা যে রাজ্যে বাস করে সেখানেই উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে। মধ্যবিত্ত বাংলাভাষীরা যৌথপরিবারের বন্ধন থেকে প্রায় মুক্ত হয়েছে। মজুর শ্রেণীর মতো পুরুষ একা উপার্জনের জন্য বেরিয়ে যায় না; এবং অত্যাবশ্যক ব্যয় ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ যৌথপরিবারের কর্তার নামে মনিঅর্ডার করে পাঠানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক প্রাচীন প্রথার তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। নিজের স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে পারিবারিক জীবন যাপনের স্বাভাবিক আগ্রহ তার মধ্যে প্রবল। কিন্তু মজুরশ্রেণী এখনও যৌথপরিবারের কর্তার সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পৃথক পরিবার প্রতিষ্ঠা করবার মতো ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি।

এই সামাজিক কারণ ছাড়া আর্থিক কারণও বাংলা-ভাষীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জমির পরিমাণ কম। প্রবাসী বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গে জমিজমা নেই; সুতরাং আর্থিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তাদের আকর্ষণ সামান্য। বিশেষ করে পূর্ব-বঙ্গের উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁরা অন্য রাজ্যে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করে নিয়েছে পশ্চিম-বঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার প্রয়োজন তারা যে অনুভব করবে না তাতে আর বিচিত্র কি!

স্ত্রী ও পুরুষের আনুপাতিক হার থেকে প্রমাণিত হয় কোন ভাষাগোষ্ঠীর লোক অন্য রাজ্যে উপার্জন করে নিজের রাজ্যে নিয়মিত টাকা পাঠায়। অর্থাৎ, যে রাজ্যে সে অর্থ উপার্জন করে সেখানে উপার্জিত অর্থের কি পরিমাণ ব্যয় করা হয়। স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী হলে বুঝা যায় যে অন্নদাতা রাজ্যের প্রতি এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের আকর্ষণ নেই। একমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্যই তারা এসেছে; দেশে স্ত্রী-পুত্র আছে; উপার্জিত অর্থ তাদের ভরণ পোষণের জন্য পাঠানোই তাদের লক্ষ্য। সপরিবারে কর্মস্থলে থাকলে উপার্জিত অর্থের বৃহৎ অংশ অথবা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট রাজ্যেই ব্যয় হয়। তার ফলে সেই রাজ্যও কিছুটা লাভবান হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার বিচার করলেই দেখা যাবে এরা প্রধানতঃ উপার্জিত অর্থ নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছে। এ রাজ্যের প্রতি এদের আর কোনো আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দীভাষী পুরুষের সংখ্যা১০, ৭১, ৯৬০; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫, ০৮ ৭৬৪। উড়িয়াভাষী পুরুষের সংখ্যা ১, ৪০, ৮৭০; এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৪১, ৭৪৮। আসামী মাতৃভাষা এমন পুরুষের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৬, ৬৮৩; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২, ৭০৪। স্ত্রীলোকের সংখ্যার আনুপাতিক স্বল্পতা থেকেই উপলব্ধি করা যেতে পারে যে ঐ সব ভাষা-ভাষীদের এই রাজ্যের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই। পক্ষান্তরে আসামে বাংলাভাষী পুরুষের সংখ্যা ৯, ২৫, ৫৩৯ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৭, ৩৯, ৬১৬। উড়িষ্যার বাংলাভাষী স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩, ৫৪৪ ও ৪২, ৫৩৯। বিহারে বাংলাভাষী পুরুষ ছিল ৮, ৯৪, ১৯২ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৮, ৬৫, ৫২৭। বাংলা ভাষীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার পার্থক্য যে কত কম তা উপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে। এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রবাসী বাঙ্গালীদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম।

বাংলাভাষীদের এক বৃহৎ অংশ বাংলার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। অন্য কোনো ভাষাভাষী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাইরে এত বেশী সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গে জমির অভাব; জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্য এবং সর্বোপরি পূর্ববঙ্গ হারাবার ফলে প্রবাসী বাঙ্গালীরা কর্মস্থল যে রাজ্যে সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাংলাভাষীর সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজারেরও বেশী। আসাম, বিহার ও ত্রিপুরায় কিছু বাংলাভাষী কৃষক আছে। এ ছাড়া অন্য সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের প্রায় সকলেই বাংলা বইপত্র পড়তে সক্ষম,—অন্ততঃ সাক্ষর। আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাসী বাঙ্গালীদের উপর যে নির্ভরশীল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্য রাজ্যে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ না পেলে ক্রমশঃ তারা বাংলা ভুলে যাবে কিংবা বাংলার প্রতি আকর্ষণ হারাবে। ।

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। এর মধ্যে অবশ্য

অ-বাংলাভাষীদেরও ধরা হয়েছে। তাদের বাদ দিলে হয়ত বাংলাভাষী সাক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫০/৫৫ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যে-সব বাংলাভাষী আছে খুব কম করে ধরলেও তাদের মধ্যে লাখ পঁচিশ সাক্ষর পাওয়া যাবে। সুতরাং বাংলাভাষী মোট সাক্ষরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ থাকে বাংলার বাইরে। বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি এই এক-তৃতীয়াংশের পৃষ্ঠপোষকতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। কিন্তু বাংলা ভাষা যদি অন্য রাজ্যে যথোচিত মর্যাদা লাভ না করে, বাংলাভাষীরা যদি বাংলা চর্চার সুযোগ না পায়, তাহলে এই পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরদের তুলনায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা সাধারণ ভাবে একটু ভালো। প্রবাসী বাঙ্গালীরা মাতৃভাষা ভুলে যদি অন্য কোনো ভাষা গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই। অথচ ক্ষতিটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কঠিন। বাংলাভাষীরা যেমন অন্যান্য রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। অবাংলাভাষীরাও যদি তেমনি পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে তাহলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের হারাবার ক্ষতি পূরণ হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আকর্ষণ খুবই কম। এখানে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে; সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করবার মতো সুযোগ খুবই সংকীর্ণ। জমির অভাব এবং জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্যই এর প্রধান কারণ। অ-বাংলাভাষীদের মধ্যে যারা স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে বাস করছে তারা অধিকাংশই থাকে কলকাতায়। এত বড় সহরে তারা অনায়াসে নিজেদের পৃথক সত্তা নিয়ে বাস করতে পারে, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো খোঁজ না রাখলে তাদের কিছুই যায় আসে না। ভারতের আর কোনো রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন সমস্যা নেই।

বাংলা বইপত্র যাতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিকট কলকাতার দামে পেঁছে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ থাকতে পারে। আর যে ২০, ৫৫, ০০০ অবাংলাভাষী বাংলা জানে চর্চার সুযোগ সুবিধা করে দিলে তাদের মধ্য থেকেও বাংলা সাহিত্যের অনেক পৃষ্ঠপোষক পাওয়া যাবে।

কিন্তু সুযোগ কোথায়? অবাংলাভাষীদের বাংলা শেখাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান প্রভৃতি পড়াবার জন্য ডিপ্লোমা কোর্স আছে। অবাঙ্গালীদের জন্য বাংলার ডিপ্লোমা কোর্স নেই।

কয়েকদিন আগে শান্তিনিকেতনে দেখা হল এক জাপানী তরুণের সঙ্গে। বাংলা শিখতে এসেছে। তিন বছর এখানে বাংলা পড়ে বাংলায় ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরবে। বাংলা পড়াবে জাপানে। কিন্তু কলকাতা অথবা বিশ্বভারতী কোথাও বাংলা ডিপ্লোমা কোর্স নেই। এত দূর এসে পড়বার সুযোগ না পেয়ে খুবই ভেঙ্গে পড়েছে দেখলাম। প্রশ্ন করলাম, খোঁজ খবর না নিয়েই এত দূর চলে এসেছেন?

বিস্মিত হয়ে উত্তর করলেন ভদ্রলোক, বাংলা দেশে বাংলা পড়তে পারব না একথা কল্পনাও করতে পারিনি। বাংলাদেশেই যদি বাংলা পড়বার সুযোগ না পাই তাহলে কোথায় যাব?

উত্তর জিহ্বাগ্রে ছিল; কেন, লণ্ডনে, বা নিউ ইয়র্কে!

কিন্তু সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারলাম না।

শব্দকথা

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শশ ও শ্বশুর

শশশব্দটী অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বাঙগলায় অবশ্য শব্দটী শশাঙ্ক, শশধর, শশব্যস্ত প্রভৃতি সমস্ত পদের প্রথমাবয়ব রূপেই এক্ষণে ব্যবহৃত হয়, আর খরগোস বুঝাইতে শশক (অর্থাৎ ক্ষুদ্র শশ) শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই শশ সম্বন্ধে চমৎকার একটি শ্লোক আছেঃ— ভঙক্তুং প্রভুর্ব্যাকরণস্য দর্পং পদপ্রয়োগাধ্বনি লোক এষঃ।

শশো যদস্যাস্তি শশী ততোঽয়মেবং মৃগোঽস্যাস্তি মৃগীতিনোক্তঃ॥

অর্থাৎ পদের প্রয়োগ ব্যাপারে লোকে ব্যাকরণের গর্ব খর্ব করিতে সমর্থ। (চন্দ্রে) শশ আছে বলিয়া সে 'শশী,' কিন্তু তাহাতে মৃগ আছে বলিয়া কেহ তাহাকে মৃগী বলেনা।

এই শশ শব্দটী মূলতঃ *শস ছিল পরে 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি' এই নীতি অনুসারে প্রথম তালব্যশকারের সংসর্গবশতঃ দ্বিতীয় দন্ত্যসটী তালব্য হইয়া গিয়াছে। ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রে ইহাকে সমীভবন বা assimilation বলে। এস্থলে পরবর্তী বর্ণটী পূর্ববর্তী বর্ণের প্রভাবে পূর্বের সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে প্রত্যঙমুখ সমীভবন বা Regressive assimilation বলা হয়। এই শশ শব্দটীর জ্ঞাতি ইংরাজী hare. সংস্কৃত তালব্যশ সাধারণতঃ ইংরাজীতে 'h' হয়। যেমন শত—hundred; শর্ম—helmet; শালা—hall; শ্রদ—heart; শ্বন্—hound; শ্বস্—wheeze ইত্যাদি। আর সংস্কৃত স সাধারণতঃ ইংরাজীতে 's' হয়। কখনো কখনো z হয়। আর দুইটি স্বরের মধ্যবর্তী হইলে ঐ স রিফিত হইয়া র (r) হয়। যেমন সংস্কৃত সচ্—সঙ্গে থাকা, অনুগমন করা, সদ্—sit; সপ্ত—seven সম—same; স্নায়ু—sinew; স্মি—smile; স্বসা—sister; স্বাদু—sweet; স্বেদ—sweat ইত্যাদি। সুতরাং ইংরাজী hare শব্দের র মূল সকারের জ্ঞাপক।

প্রাচীন ইংরাজীতে ধূসরবর্ণ অর্থে hasu শব্দ পাওয়া যায়, ইংরাজী hazy কুয়াসাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট, ইহার জ্ঞাতি। লাটিন canus (মূলতঃ caznos) উহার জ্ঞাতি। লাটিন শব্দটীর অর্থ—শ্বেত, ধূসর সুতরাং বুঝা যাইতেছে শশ শব্দটী প্রথমতঃ শস ছিল, আর উহার অর্থ ছিল ধূসর বর্ণ জন্তু। এইভাবে শস শব্দের প্রাথমিক রূপের বিকৃতির ফলে মূল অর্থেরও বিস্মরণ ঘটে, তাহার ফলে শশকের বিশেষগুণ লম্ফ প্রদান অনুসারে একটী শশধাতুর সৃষ্টি হয়। এইজন্য ধাতুপাঠে আমরা পাই "শশ প্লুতগতৌ"। সংস্কৃত শশ শব্দটী অন্তোদাত্ত বলিয়া Verner's Law অনুসারে দ্বিতীয় সটী ইংরাজীতে "র" হইয়া গিয়াছে

শশশব্দে যেমন আমরা প্রত্যঙমুখ সমীভবন দেখিতে পাই, শ্বশুরশব্দে সেইরূপ প্রাঙমুখ সমীভবন দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীক প্রভৃতি ভাষার পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় শ্বশুর শব্দটী প্রথমতঃ স্বশুর ছিল, পরে দ্বিতীয় তালব্য শ সংস্পর্শে প্রথম দন্ত্য সটী তালব্য হইয়া যায়। সংস্কৃত শ্বশুর শব্দটী গ্রীকে hekuros, লাটিনে socer ও জার্মান Schwaher (শোএহের) আপনার দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃতে যে স্থলে তালব্যশ দেখা যায় গ্রীক ও লাটিন ভাষায় সেই স্থলে যথাক্রমে k ও c দেখা যায়। সংস্কৃত শতম্ গ্রীক (he-) katon, লাটিন centum; সংস্কৃত দশ, গ্রীক deka, লাটিন decem, সংস্কৃত শঙ্খ, গ্রীক kogkhos (উচ্চারণ—কোন্‌খোস্,) লাটিন

congius ইত্যাদি। আর সংস্কৃতে পদের আদিস্থিত দন্ত্যস গ্রীকে 'h' হয় ও লাটিনে 's' হয়। সুতরাং গ্রীক hekuros ও লাটিন socer হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় প্রথম ব্যঞ্জনটী দন্ত্যস ও দ্বিতীয়টী তালব্যশ। এইরূপ সংস্কৃত শ্বশ্রূ, গ্রীক hekura, লাটিন socrus। সংস্কৃতে যেমন শ্বশুর ও শ্বশ্রূ বুঝাইতে শ্বশুরশব্দের দ্বিবচন শ্বশুরৌ প্রযুক্ত হয় লাটিনে সেইরূপ দ্বিবচন না থাকায় socer শব্দের বহুবচন socera প্রযুক্ত হয়।

রুক্ষ

রেণু রুষিত প্রভৃতি শব্দে রুষ ধাতু দৃষ্টিগোচর হয়। এই রুষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় করিলে রুক্ষ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ শুষ্ক, কর্কশ, পরুষ। রুক্ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় করিলে রুক্ষ হয়, অর্থ দীপ্যমান। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রুক্ষ শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়, শতপথ ব্রাহ্মণে লুক্ষ শব্দ দেখা যায়। সংস্কৃত রূক্ষ শব্দটী বাঙ্গালায় সর্বত্র রুক্ষ আকারে দৃষ্ট হয়। এমন কি বঙ্গীয় লেখকগণ সংস্কৃত পুস্তকেও রুক্ষ মুদ্রিত করিয়া থাকেন। কখন কখন রুক্ষ শব্দটী "শুরুঃন্ধ" হইয়া রুক্ষ্ম আকারও ধারণ করে, কিন্তু দীর্ঘ হইবার দুরাশা পোষণ করে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালায় দুঃখ ও রুক্ষ শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্য আছে, আর দুঃখ শব্দই সমধিক প্রচলিত; সেইজন্য দুঃখ শব্দে হ্রস্ব উকার আছে বলিয়া রূক্ষ শব্দের ঊকার হ্রস্ব হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। অথবা শুষ্ক ও রুক্ষ শব্দের অর্থগত বিপুল সাদৃশ্য আছে, ফলে শুষ্ক শব্দের দেখাদেখি রূক্ষ শব্দের ঊকার হ্রস্ব হইয়া থাকিতে পারে। প্রাকৃত ভাষায় বৃক্ষবাচক শব্দে রুক্খ শব্দ আছে। কিন্তু এস্থলে তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না। রুষ্ট শব্দের প্রভাব কতকটা থাকিলেও থাকিতে পারে। 'সে রুক্ষস্বরে কহিল আপনি কি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন।' দত্তা পৃঃ ২৪ "তখন তাহার শুষ্ক রুক্ষ মাথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আজ অকস্মাৎ এক নিমেষই কেদারবাবু ব্যাতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।" গৃহদাহ পৃঃ ৩৭

পরিবেষণ

পরিবেষণ শব্দটী স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানকালে সাংবাদিকগণ সম্ভবত আহার্যপ্রিয়তা বশতঃ ইহার পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে ভক্তির আতিশয্যে ইহাকে বিকৃত করিয়া পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন। পরিপূর্বক বিষ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অ ঙ ট্) প্রত্যয় করিয়া পরিবেষণ হইয়াছে। বিষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত করা, পরি শব্দের অর্থ চতুর্দ্দিকে, সুতরাং পরিবেষণ শব্দের অর্থ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে দেওয়া ও সমস্ত ব্যঞ্জন দেওয়া। যে পরিবেষণ করে তাহাকে পরিবেষক বা পরিবেষ্টা বলে। মহিলা পরিবেষককে পরিবিষ্টি বলে। রামায়ণে আছে—বিপ্রাণাং প্রবরাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পরিবেষণম্। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—মরুতঃ পরিবেষ্টারো মরুতস্যাবসন্ গৃহে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আছে—"ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তাং মাঠরকৌণ্ডিণ্যো পরিবেবিষ্টাম্।"

বাঙ্গালায় উপবেশনের প্রভাবে পরিবেষণের মূর্ধন্য ষ তালব্য হইয়া গিয়াছে, ফলে মূর্ধন্য ণও দন্ত্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত প্রথমে নিমন্ত্রিতগণ উপবেশন করেন, পরে তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করা হয়। আর বর্ণমালায় প্রথমে তালব্য শ পরে মূধন্য ষ। সুতরাং উপবেশনের শ যদি তালব্য হয়; তাহা হইলে পরিবেষণের ষ অবশ্যই মূর্ধন্য হওয়া উচিত। আর বিষ্ণু যেমন জগৎকে পালন করেন, পরিবেষকগণও সেইরূপ নিমন্ত্রিত বর্গকে পালন করেন। সুতরাং বিষ্ণুর ষ যখন মূর্ধন্য, পরিবেষণের ষও মূর্ধন্য হইবে। প্রসঙ্গক্রমে পরিবেষণের রীতি সম্বন্ধে যে শ্লোকটি প্রচলিত আছে সেটি হাঁ হাঁ দেয়ং, হুঁ হুঁ দেয়ং, দেয়ঞ্চ করকম্পনে, শির-সিচালনে দেয়ম্, ন দেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে॥

দ্বারকানাথের 'বেলগাছিয়া ভিলা'

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

শ্যামবাজারের পাঁচমাথা থেকে বেলগাছিয়া পুল পার হয়ে দমদমার দিকে যে রাস্তাটা গেছে সেই পথ বরাবর একটু খানি গেলেই রাস্তার ধারে একটা বিলাতী কায়দার দারোয়ানের দাঁড়াবার ঘর আছে। তার টোপরের ছাদটা রীতিমত বাহার করা—দুপাশের চালাবাঁধা দোকানঘরগুলোর সঙ্গে কেমন যেন বেমানান। এককালে ঐ পথ দিয়ে বহু গণ্যমান্য লোক যাওয়া আসা করেছেন—ধনী, বিদ্বান, রাজপুরুষ, সুন্দরী—কোন একটা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারলেই সোয়া শ' বছর আগে ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রণ খেয়ে আসা যেত। এখন ভিতরের জমিটাকে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে, গাছপালা সাফ করে মধ্যবিত্তদের মাথা গোঁজবার মত খুপরি খুপরি ঘর তৈরীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

কয়েকবছর আগেও খানিকটা খোলা জমি ছিল, তার একাংশ লতাগুল্মে ঝোপে পরিণত হয়েছে, অন্য অংশটায় ঘাস পর্যন্ত সব জায়গায় নেই। তারই মধ্যে দিয়ে একটা আধ বোজা নালা এঁকেবেঁকে গেছে—কোথাও একদমই বুজে গেছে, কোথায় খানিকটা জল জমে ডোবার সৃষ্টি করেছে। তার উপরে এককালে সৌখীন পুল ছিল। এখন কাজ করা লোহায় মরচে পড়েছে, কাঠে ঘুণ লেগেছে, উই ধরে নষ্ট হয়ে গেছে—পারাপার করতে সাহস হয় না। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় ছোট পাঁচিল দিয়ে পুলের দুপাশের পথই বন্ধ। কিছুদূরে একটা গোলঘর—ছাতগুলো ভেঙ্গে গেছে—জংলী গাছে ছেয়ে আছে। এই সবেরই মধ্যে একটা বাড়ী নির্জীব অবস্থায় পড়ে আছে, তার সঙ্গী কিছু-দূরে রেল লাইনের কাছে ঐ কায়দারই আরেকটা ছোট বাড়ী। সেটারও বিগতশ্রী, এখানে সেখানে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, দরজা জানালা নেই—অনেক আগেই ভেঙ্গেছে কিম্বা কেউ খুলে নিয়ে সদ্ব্যবহার করেছে। দিনে গরু থাকে আর রাতে চামচিকে। বাড়ীটার পাশে খানিকটা জলা জায়গা—সেখানে এখন ধান বোনা হয়; শিয়ালদহ থেকে বেরিয়ে বড় বড় রেলগাড়ীগুলো যখন এপথ দিয়ে যায়, তখন ঐ চারা গাছের ছায়াগুলো কাঁপতে থাকে, যেমন কাঁপত দ্বারকানাথের সময়ে পদ্ম, শালুক, নানা বিদেশী ফুলের ছায়া। তবে তখন তারা কাঁপত হাওয়ায়—তখন রেললাইনও ছিল না আর রেল কোম্পানীর উঁচু বাঁধও কল্পনা করা হয় নি।

বড় বাড়ীটার গাড়ীবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে এখনও মনে হয় হঠাৎ সওয়া শ' বৎসর আগেকার দিনে পেঁাছে গেছি। বাড়ীর দরজা যদি খোলাতে পারেন ত' বন্ধ ঘরের গন্ধ আর আধা অন্ধকার সয়ে গেলে দেখবেন যেন এক স্বপ্নপুরীতে পেঁাছেছেন। দেওয়ালে গিল্টি করা চওড়া ফ্রেমে বড় বড় তৈলচিত্র—এখানে সেখানে মর্ম্মর মূর্তি, পালিশকরা কাঠের বিলাতী আসবাব, মাঝে মাঝে মানুষ প্রমাণ চীনামাটির ফুলদান। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠলেও ঐ রকমই বহুমূল্য জিনিষের প্রাচুর্য্য। ঘরগুলো যেন অপেক্ষা করছে, আবার কবে সাবেকী চালে রাজা মহারাজারা আসবেন, সম্রাটরা রাত কাটাবেন, লাট বেলাটরা ঘোরা ফেরা করবেন।

শেষ যেদিন সেখানে গিয়েছিলাম কয়েকবছর আগে, সেদিন আসন্ন বৃষ্টির অপেক্ষায় প্রকৃতি চঞ্চল। ঘর থেকে বারান্দায় যাবার সার্সি দেওয়া বড় কাঠের দরজার একটা একটু খুলে যেমন বাইরের দিকে তাকিয়েছি, অমনি পিছনে নানা সুরে বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড়গুলো টুংটাং করে করে দুলতে লাগল, কৌচ ঢাকা কাপড়গুলো নড়ে উঠলো। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম যে এটা

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। মনে হল ঐ একটুকু সময়ের জন্য যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় রয়েছি। হবেও বা তারিখটা ১৮৩৬ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে। গতকাল ভারতের বড় লাট-সাহেব ও প্রায় তিন শ' জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল গোড়ায় গান-বাজনা, তারপর আতসবাজী পোড়ান আর খাওয়া দাওয়া। বাড়ীটায় সবে দোতলা তোলা হয়েছে আর সারা বাড়ীটাকেই নতুন করে সাজানো হয়েছে। তারপর এই প্রথম উৎসব। গেট থেকে গাড়ী-বারান্দা পর্যন্ত সারা পথটা আলোয় আলোময়।

গাড়ী থেকে নেমে অতিথিরা মার্বেলের তৈরী হলঘরে ঢুকলেন। তারপর ডানদিকে ঘুরে একটা সুন্দর চওড়া সিঁড়ি। দোতলার দেওয়াল ছাড়া কোথাও তলা থেকে সিঁড়িটায় ঠেক্না দেওয়া নেই —মনে হয় যেন হাল্কা ভাবে ভেসে আছে। সিঁড়িতে কয়েকটি শ্বেত পাথরের মূর্তি। একটি হল পুত্রদ্বয় সহ কর্নেলিয়া একটী নারী মূর্ত্তি, একটী দাঁড়ান ভিনাস আর কন্দর্পভার্য্যা সাইকি। এ সবের উপর আলো দেবার জন্য ছাদ থেকে একটা সেকালের সূক্ষ্মকারুকার্য্য করা ঝাড় লণ্ঠন —এর জোড়া সারা ভারতে মেলা শক্ত।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মধ্যেকার হলঘর। চারিদিকে দেওয়ালে বহুমূল্য ছবি। হলের দূরপ্রান্তে তিনটি মূর্ত্তি—একটি পাঠরতা অপ্সরী, একটী নগ্ন নারীমূর্ত্তি, মধ্যে ভিনাস শুয়ে আছেন। তার চারিধারে বড়বড় গোলাপ দিয়ে প্রায় কুঞ্জ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইটী নাচঘর হিসাবে ব্যবহার হবে বলে ঘরের আসবাব সব দেওয়ালের কাছে সরানো। বাঁহাতি অর্থাৎ উত্তরে বারান্দা—পাতার দেওয়াল আর ফুলের মালা দিয়ে তাঁবুর মত করে সাজানো। মধ্যে লাল মখমলের উপর জরির কাজকরা মস্‌নদ্—তার পায়াগুলো নিরেট রূপোর উপর সোনার কাজ করা।

ডানদিকে গানের ঘর—অপরূপ সুন্দর জিনিষে ভর্ত্তি—পালিশ করা পাথরের ঘড়ি, নানা দেশের ফুলদানী, মার্বেলের আসবাব, দেওয়ালে ছবি আর এ সবের সংগে মানিয়ে কমলালেবু রংয়ের দুর্মূল্য রেশমের পর্দ্দা। এই ঘরে কাল জড় হয়েছিলেন কলকাতার সেরা গাইয়ে বাজি-য়েরা—সিয়েসনি, মিস্ হার্ভে, মিঃ লিন্টন আর তখন নবাগত ফরাসী অপেরা কোম্পানীর প্রধান অভিনেতারা ফ্লরি, ওয়াল্‌তে, টন, ম্যাডাম লেমেরি। তাছাড়া কাউন্ট অ্যাল্‌মাডিভার মত অপেশা-দারী সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন।

এই ঘরের ডানদিকের ঘরদুটীতে ঐ রকমই হাতির দাঁতের উপর আঁকা ছোট ছবি থেকে বড়বড় অয়েলপেন্টিং এর ছড়াছড়ি। তার মধ্যে বিশেষভাবে নজরে পরে একটী "ভিনাস ও মার্স,” যার এনগ্রেভিং বিলাত থেকে সম্প্রতি এসে পোঁছেছে, তারই আসল ছবি। তা ছাড়া গৃহস্বামীর একটী ছবি, একটী মুসলমানী, একটী হিন্দু সুন্দরী, কলিকাতায় দুর্গাপূজার নাচ আর এমনি আরো কত কি।

দক্ষিণের বারান্দায় লাল আর সাদা মস্‌লিনে সাজানো দামী গালিচা পাতা থামগুলি ফুল দিয়ে মোড়া। এখানে দাঁড়ালে নজরে পড়ে সামনে মস্ত বাগান, তার প্রায় চারিদিক ঘিরে একটা স্রোতস্বিনী—তার উপর চারটা চাররকমের পুল। ঐ পুল দিয়ে পোঁছনো যায় দ্বীপের মত এক খণ্ড জমিতে, তারই মাঝখানে একটা ফোয়ারা, তার পিছনে প্রমাণ আকারের শিকারী মেলিয়েজার ও তার কুকুরের মূর্ত্তি আরও দূরে জল থেকে উঠছেন সৌন্দর্যরাণী ভিনাস্। বারা-ন্দার বাঁদিকে একটী ছোট দ্বীপে একটী জাপানী মন্দির। বাড়ীর উত্তরে মাঝবরাবর গ্রীক কায়-দার মন্দির শ্রীসদন (টেম্পেল অব দি গ্রেসেস) সেখানে ক্যানোভার* তৈরী বিখ্যাত ত্রয়ীর কপি

অ্যানটোনিও কানোভা (১৭৫৭-১৮২২) প্রখ্যাত ইটালীয়ান ভাস্কর

সকলের নজরে পড়ে। আর সব চেয়ে দূরে ঝিলের শেষে নানা রংয়ের আলোয় আলোময় একটী চীনা প্যাগোডা—জলের ধারে বসানো তারার মত বাতিগুলোর আলোয় আরো উজ্জ্বল।

বাগানে বড় বাংলো আর এইসব বাড়ী কয়টি অসংখ্য প্রদীপ দিয়ে সাজানো। ঝিলের ধারের থামগুলির উপর আগুন জেলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে ওদিকে চাঁদ-তারার মত বাহার করে আলো দেওয়া।

সন্ধ্যে আটটা থেকে লোক আসতে সুরু করে। প্রথমে একটু গান বাজনার পর বাজী পোড়ান আরম্ভ হল। আতশ বাজি প্রায় দেড় ঘন্টা চলেছিল। তারপর নীচের তলায় এসে খাবার সাজানো টেবিলে বসা। বরফে ঠান্ডা করা শ্যাম্পেন থেকে কলকাতার সেরা কারিগরদের সেরা মিঠাই কিছুরই অভাব ছিল ন। তারপর বিলাতী নাচ—ওয়াল্টস্, কোয়ড্রিল, গ্যালোপ।

বাজি পোড়াবার সময় যখন নানা রংয়ের আগুন জ্বলছিল—লাল সবুজ, বেগুনী তখন বাগানের গাছ আর তার তলায় জড় হওয়া অসংখ্য লোকজনকে ওই আলোয় দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন পাকা চিত্রকরের অদ্ভুত খেয়াল। ইউরোপের এইসব সদ্য আবিষ্কার সম্বলিত অপূর্ব আতশবাজি তৈরী করেছিলেন একজন সখের কারিগর।

পরের দিন খবরের কাগজে এসবের বর্ণনা ফলাও করে বেরিয়েছিল। বেঙ্গল হরকরা-এর উপর সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করলেন যে "সমস্ত ব্যবস্থায় গৃহস্বামীর সুরুচি ও মুক্তহস্তের ছাপ ছিল। সুমার্জিত কণ্ঠের সংগীত সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে: বিশেষতঃ মঁসিয়ে ওয়ালুতে "করিন্থের অবরোধ" এর দৃশ্যে সকলকে চমৎকৃত করেছেন।

"লাটভবনের লোকেরা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সাহেবদের মধ্যে ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়াল, স্যার জে পি গ্রান্ট, স্যার বি ম্যালকিন, মিস্টার মেকলে* কয়েকজন মিলিটারী অফিসার, দুএকটী সেনাপতি এবং কলকাতার রূপে গুণে নাম করা প্রায় প্রত্যেকটী মেমসাহেব।

সর্বশেষে আমরা আশা করি যে যাঁরা, আমাদের ভারতীয় প্রজাদের সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধনে উৎসুক, তাঁদেরও শালীনতার পক্ষে বেদনাকর অর্থহীন ভীড় ও মেকি ঝকমকি ত্যাগ করে আমাদের অবস্থাপন্ন দেশীয় বন্ধুরা অনুরূপ আদর্শ রুচির পরিচায়ক ও মনোমুগ্ধকর আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করবেন।"

কিন্তু এ ত' ১৮৩৩ সালের কথা। দ্বারকানাথের "বেলগেছিয়া ভিলা"র কথা বলতে গেলে আরম্ভ করতে হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছর ডিসেম্বরে কালকাটা মান্থলি জার্নালে—দেখি "গত বৃহস্পতিবার বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বৃহৎ নূতন বাটীতে বহু সাহেব সাহেবাদের নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। এই সম্মানার্হ দেশীয় ভদ্রলোক অতিথি অভ্যর্থনার চূড়ান্ত করিয়াছিলেন। ভোজ্য ও পানীয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই উপলক্ষে একদল গোরাবাজনা মোতায়েন ছিল এবং ভোজের পর নৃত্য ও ভেল্কি বাজি দেখাইবার ব্যবস্থা ছিল।

সন্ধ্যায় সর্বাধিক আকর্ষণীয় খেলা দেখায় একজন কাচ ও ঘাস খাদক। তাহার পরমানন্দে ঘাস চর্বণ স্বভাবতই নেবুচার্ডনেজারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

সেই অবধি দ্বারকানাথ তার এই বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ীতে প্রায়ই কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের নিমন্ত্রণ করতেন। ভোজের পারিপাট্যে ও নিমন্ত্রিতদের পদমর্য্যাদায় ঐ ভোজের দিন-

* টমাস ব্যারিংটন মেকলে—ইনিই পরে লর্ড মেকলে হন। বিলাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা জ্যাকাবি মেকলের পুত্র। ১৮০০ সালে জন্ম। পাঁচবছর বড়লাটের সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য হিসাবে কলিকাতায় ছিলেন। লেখক ও ঐতিহাসিক হিসাবে স্মরণীয়।

গুলি তৎকালীন কলকাকার ইতিহাসে এক একটি চিহ্নিত দিন হয়ে থাকত।

১৮৩৫ সালে বাড়ীর দোতলা তৈরী আরম্ভ হয়; সঙ্গে সঙ্গে বাগান ও আসবাবেরও বদল্। সেই সময়ের চিঠিতে দেখি দ্বারকানাথ এই বাগান বাড়ীর অভাব বেশ অনুভব করলেন। তাঁর বন্ধুপুত্র লেফ্‌টেনেণ্ট জে ক্যামেরণকে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে খবর ও উপদেশ দিয়ে শেষে লিখছেন—

"এ বছর খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়েছে। খুব একচোট বর্ষণের পর অক্টোবার মাসের প্রায় গোড়া থেকেই আবহাওয়া চমৎকার। আমার বাগান সারানোর কারণে এই সময়ের দিনের বেলার মজলিস আর পরীদের সাথে চলাফেরার আনন্দ থেকে এবার বঞ্চিত। তবে আমার শহরের বাড়ীর তিনতলায় জায়গা কম হলেও, এই অবস্থায় যতটা আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা সম্ভব করেছি।

বাগানবাড়ীর দোতলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে আমিও মুগ্ধ। তুমি এখানে থাকলে বেশ হ'ত—ঐখানে দাঁড়িয়ে সারা বাগানটা দেখতে।"

এই বাগানবাড়ী দ্বারকানাথের বিশেষ জাঁকের কারণ ছিল। এর জন্য অকাতরে টাকা খরচ করতেন আর সকলকে ডেকে দেখাতেন। লর্ড অকল্যান্ড যখন বড়লাট হয়ে এলেন তখন তাঁকেও দ্বারকানাথ বেলগেছিয়া ভিলা দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বড়লাটসাহেবের বেলগাছিয়া ভিলায় এই প্রথমবার যাওয়ার বর্ণনা তাঁর বোন অনবেরল্ মিস্ এমিলি ইডেনের লেখা চিঠি থেকে পাওয়া যায়।

"দ্বারকানাথ ঠাকুর নামে এক অতি ধনী ভারতীয় তাঁর বাড়ী দেখতে যাবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। ভদ্রলোক রামমোহন রায়ের দলের এবং বেশ ইংরেজী বলতে পারেন। তিনি একটা রীতিমত বিলাতী ধরণের বাড়ী করেছেন—বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, ছবি, মূর্ত্তি, ফরাসী চিনা-মাটির জিনিষ ইত্যাদি কিছুই বাদ নাই। আমরা কবে যাব জানতে চাওয়ায় জর্জ খুসীর সঙ্গে বল্লে, সোমবারে। এই ব্যাপারে সারা কলকাতায় হৈ চৈ পড়ে গেল, বড়লাট একজন দেশী লোকের বাড়ী খেতে নিমন্ত্রণ নিয়েছেন। অবশ্য কোন দেশীলোকের বড়লাটের সঙ্গে খাওয়াটা আরো বেশী বিস্ময়ের কথা। দ্বারকানাথ আর দু একজন ছাড়া আমাদের খাবার টেবিলের ধারে পাশেও কেউ ঘেঁসে না। আমরা অবশ্য আসলে খেতে যাই নি, গিয়েছিলাম শুধু দেখতে। আর খুঁতখুঁতে লোকেদের মনস্তুষ্টির জন্য খুব সমারোহ করে সান্ত্রীসিপাই নিয়ে চারঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে। ফ্যানি তার ফিটন গাড়ীতে, আর মেজর—তাঁর পাল্কী গাড়ীতে আর ক্যাপ্টেন—তাঁর গাড়ীতে; এমন কি ডাক্তারসাহেবও তাঁর গাড়ীতে; আর জর্জ আর আমিত' সরকারী গাড়ীতে। আর একগাদা চাকর বেয়ারা সাথে; অর্থাৎ এক কথায়, পৌঁছালাম নিতান্ত অভদ্রের মত এবং রইলাম অত্যন্ত আরামে। দ্বারকানাথ নিজে সুন্দর ইংরাজী বলতে পারেন এবং তিনি মিঃ পার্কার বলে এক অতি বুদ্ধিমান লোককে রেখেছিলেন আমাদের দেখাশুনার জন্য। সন্ধেবেলা অন্যদিনের চেয়ে গরমও কম ছিল আর মাঠে হাতী, ঝিলে নৌকা, বারন্দারীতে বরফ, ঘরের ভিতর সুন্দর সুন্দর ছবি ও বই—কাজেই ব্যাপারটা মন্দ হল না। শেষকালে যতটা সম্ভব হৈ হুল্লোড় করতে করতে সকালে বাড়ী ফিরে এলাম খেতে। শুনেছি ভদ্রলোক লোকজনকে নাকি খাওয়ানও খুব ভালোভাবে।

"এখানে সকলে যে গোল গোল চোখ করে তাকায়, জর্জের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে সেটা সবকিছুতে কেবল আশ্চর্য্য হবার অভ্যাস থেকে, গরমে চোখের পাতা শুকিয়ে ছোট হয়ে যায় বলে নয়। এখানকার লোকের দিনের রুটিন তিলমাত্র বদল হলেই আঁৎকে ওঠে।" ১

৩. Letter from India by Hon'ble Emily Eden. Vol. I (London 1892).

এই সব ভোজে দ্বারকানাথ দেশী-বিদেশীদের তফাৎ করতেন না। সরকারী দরবার, আফিসে, দিশী-বিলাতী লোকের দেখা হত বটে কিন্তু মেলা মেশা হত না। সরকারী কাজের বাইরেও তখনকার যুগে খুব কম জায়গাই ছিল যেখানে সাদা-কালো চামড়ার ভেদাভেদ ছিল না। এই সমান ও বন্ধু ভাবে মেশা তখনকার কলকাতায় বোধহয় সম্ভব ছিল একমাত্র বেলগেছিয়া ভিলায়। দ্বারকানাথ ঐশ্বর্য্যে, বুদ্ধিতে, সৌজন্যে উচ্চত্তম স্তরের রাজকর্ম্মচারী, সওদাগর বিশ্বজ্জন সকলকেই মোহিত করেছিলেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যেও দ্বারকানাথের প্রতিপত্তি এত ছিল যে ঐ বেলগেছিয়া ভিলাতেই নিমন্ত্রিত অনেক সাহেব দ্বারকানাথের কাছে উমেদারী করেছেন, নিজেদের চাকুরীর সুবিধার জন্য।

"এক সময়ে একজন নবীন সিভিলিয়ান সেক্রেটারী মিঃ হ্যালিডের কুদৃষ্টিতে পড়িয়া উৎপীড়িত হইতেছিলেন। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হন। দ্বারকানাথ অনুসন্ধানে জানিলেন, নবীন কর্ম্মচারী বিশেষ দোষী নহেন। তিনি তখন মিঃ হ্যালিডেকে এ বিষয়ে পত্র লেখেন, "Well King Frederick* I am sorry to hear, you have been oppressing some youngster of your service."
——এই সুরের চিঠি পাইয়া হ্যালিডে সাহেব দ্বারকানাথের তুষ্টির কারণ নবীন কর্ম্মচারিকে উৎপীড়ন হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

সাহেবদের সঙ্গে এইসব খানাপিনার ফলে দ্বারকানাথের নানা দুর্নাম রটিল। "ম্লেচ্ছ" ত অনেকদিন আগেই হয়েগিয়েছিলেন। এবার লোকে বল্লে তিনি কলকাতায়—মদের স্রোত বইয়ে দিয়েছেন। বাগবাজারের রূপচাদ পক্ষীর দল ত' গানই বেঁধে ফেল্লেন—

"কি মজা আছেরে লাল জলে ?　　সে মজা জানে কেবল
তা' কে বলে ?　　　　　　মাতালে আর বোতলে।

এই গানের সঙ্গে তাঁরা দ্বারকানাথের নাম জুড়ে দিলেন—
মদের গুণাগুণ আমরা ত' কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানী

বেলগাছিয়া ভিলার আরব্যউপন্যাসের মত মজলিস্ ছাড়াও এধরণের রটনার জন্য কারণও ছিল। কার ঠাকুর কোম্পানী পাইকেরী দরে বিলাত থেকে মদ আনাতেন। দ্বারকানাথ নিজে সোজা কোম্পানী থেকে মদ কিনতেন না। কিনতেন বিশ্বনাথ লাহার দোকান থেকে খুচরো দরে। বিশ্বনাথ লাহা আবার মদটা কিনতেন পাইকেরী দরে ঐ কার ঠাকুর কোম্পানী থেকে। এইরকম মদের ব্যবসার প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে দ্বারকানাথের নাম জড়িত ছিল, এবং দেশী লোকের কাছে খরিদ করায় দেশী মহলে সেটা খুব জানাজানি এবং সংগে সংগেই অতিরঞ্জন হয়। কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বলেছিলেন, "আমি তাঁকে বিলক্ষণ জানতাম। এসকল কথা নিন্দুকের কথা। প্রকৃত কথা এই যে তিনি দেখিলেন যে মদ্যের আমদানি ত' বাড়িয়াই চলিল, তবে তাহার লভ্যাংশ ইউরোপীয়গণ সমস্ত উপভোগ না করিয়া আমাদের দেশের লোকে যতটুকু উপভোগ করেন তাহাই দেশের ভাগ্য। এই কারণে তাঁর এক অনুগত লোক বিশ্বনাথ লাহাকে মদ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।"

দ্বারকানাথের চেষ্টা ও প্রভাব সত্ত্বেও সেকালে হিন্দুদের পক্ষে সাহেবদের সঙ্গে খানা-

* এই হ্যালিডে সাহেব পরে বাংলার প্রথম ছোট লাট হন। একে দ্বারকানাথ নাম ধরে ফ্রেডারিক বলেই ডাকতেন, কখনো বা ঠাট্টা করে কিং ফ্রেডারিক বা ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলতেন।

পিনা খুব সহজ হয় নি। অনেকেই নিজে গোঁড়া না হলেও গোঁড়াদের ঠাট্টা বা জাতিচ্যুতি বা অন্ততঃ পক্ষে ক্রিয়াকলাপে নিকৃষ্ট স্থান পাবার আশঙ্কায় সাহেবদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন। সাহেবেরা এবং মুষ্টিমেয় প্রগতিশীলরা সেই নিয়ে বিদ্রূপ করতেন। আবার যাঁরা সাহসে ভর করে সাহেবদের সঙ্গে আহারাদি করতেন, তাঁদের গোঁড়া হিন্দুর দল কথায়, কবিতায়, কাগজ পত্রে ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। এর বেশ একটা উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারির ব্যাপারে। সেদিনের সকালের ক্যালকাটা কুরিয়ার কাগজে বের হয় যে, সেদিন কলিকাতার প্রধান সেনাপতি ও কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের দ্বারকানাথ নিমন্ত্রণ করেছেন। বেলগাছিয়া ভিলায় খাওয়া, নাচ ও বাজি পোড়ান হবে। খুব একটা ধুমধামের ব্যাপার—পাঁচ শ'য়ের উপর অতিথি। তার পরের দিন সম্পাদকীয়তে একাধিক কাগজ এ বিষয়ে মন্তব্য করলেন। ক্যালকাটা কুরিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখলেন—"মার্বেলের বারান্দা থেকে, সাদা আর গোলাপী পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে বাগান এমন অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল যে নিছক ভারতীয় কায়দায় এত সুন্দর সাজানো আমরা আগে কখন দেখি নি।

ফুল দিয়ে ঢাকা তোরণ, পথের ধার, কেয়ারী, ফোয়ারা সব আলোকময়। অসংখ্য প্রদীপের আলোয় দীপাম্বিতা লম্বা নারিকেল ও তলায় পাতাঘন গাছের ফাঁক দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছিল আলোয় লেখা 'ঈশ্বর রাণী কে রক্ষা করুন'।"

"অনেকেই স্বীকার করলেন যে, বিদগ্ধ জনসমাবেশ এরকম কলকাতায় কখন হয় নি। মধুর সঙ্গীত, চমৎকার আতসবাজি, উইলসনের ব্যবস্থাপনায় উৎকৃষ্ট খাবার আর সবের উপর গৃহস্বামীর স্বাগত সম্ভাষণে প্রত্যেকেই প্রীত। নিখুঁৎ বল্লে নেহাতই প্রশস্তিপত্রের মত শোনায় কিন্তু কালকের পাঁচশ'জন অতিথিই সাক্ষ্য দিবেন যে সেটা অতিরঞ্জন নয়। এমন বোধহয় কোন কিছু কাল হয় নাই যে সম্বন্ধে অতিথিরা বলতে পারেন যে "এটা না হ'লেই ভালো হ'ত।"

বেঙ্গল হরকরা কিন্তু ছেড়ে কথা কইলেন না। দ্বারকানাথের খুঁৎধরতে না পেরে তাঁরা অতিথিদের একচোট বলে নিলেন। তাঁরা ২১এ ফেব্রুয়ারী লিখলেন যে, অনেক দেশীয় ভদ্রলোক ও এসেছিলেন কিন্তু অনেকেই বাজিটুকু দেখেই চলে যান, নিশ্চয়ই খাবারের গন্ধ সইতে না পেরে। আর যাঁরা শেষ পর্য্যন্ত খানাও খেয়ে এলেন তাঁদের লক্ষ্য করে বাংলা কাগজে ঐ রূপ-চাঁদের গানটাকে একটু বদলিয়ে ছড়াকাটা হল—

"বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তা কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।"

তখনকার খবরের কাগজ দেখলে নজরে পড়ে যে দ্বারকানাথের দেওয়া ভোজগুলো ক্রমশঃই যেন আরো জমকালো আর বিরাট হয়ে উঠেছিল। তাই প্রায় প্রত্যেকবারই বর্ণনায় দেখি "এমনটি আগে কখন দেখা যায় নি।"

১৮৪০ সালের ভোজের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর আবার যখন ১৮৪১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মিস্ ইডেনের সম্মানে নাচ ও সান্ধ্যভোজ দিলেন তখনও তাঁরা বল্লেন—"মিস্ ইডেন লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী—বিলাতী সমাজের অধিনেত্রী আর দ্বারকানাথ বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়—এই উভয়ের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত সমারোহের ত্রুটি হয় নাই। ঘরগুলি আলোকে, আর্শিতে, মির্জ্জাপুরী কার্পেটে, লাল জাজিম, সবুজ রেশমে, ফুলে ভরা মার্ব্বেল টেবিলে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।" মিস্ ইডেন গাছগাছড়ার ভক্ত ছিলেন। ইডেন গার্ডেনের রূপায়ন তাঁরাই। তাই বেলগেছিয়ায় সেদিন সিড়িতে বারান্দায়, হলে অজস্র নানা জাতের অর্কিড

পাতাবাহার লতা, সুদৃশ্য গাছ ঝোলানো ছিল। মোতিঝিল সমস্ত বাগানটীর মধ্যে এ'কে বেঁকে গেছে। তাতে নীলপদ্ম, রক্তপদ্ম আর নানারংয়ের ফুল ঝলমল। বৈঠকখানা ঘর (তখনকার পক্ষে) নতুন কায়দায় সাজানো। নব্যতন্ত্রের ইউরোপীয় শিল্পীদের ভালো ভালো ছবিতে দেওয়াল ভরা। বৈঠকখানার পিছনে মার্বেলের ফোয়ারা, মোতিঝিলের মাঝের দ্বীপে ঠাণ্ডাঘর সামার হাউস আর সেখানে পৌঁছাবার জন্য একটা কাঠের ও একটা ঝোলানো লোহার পুল। ঐ পুল আর ঘর ফুল, লতা, দেবদারু পাতার মালায় আর নানাবর্ণের পতাকায় শোভিত। সহস্র সহস্র রঙ্গীন আলোতে জলস্থল উদ্ভাসিত। হলের ভেতর অবিশ্রাম বাজনা—রাত দ্বিপ্রহরের পরও নাচ চলেছিল। বাহিরে ঘন ঘন বিচিত্র জমকালো আতসবাজি। সকলেই বল্লে এমনটা কলকাতায় কখন দেখা যায় নি। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে "অসামান্য সমারোহে গবর্ণর জেনারেলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেব-দিগের এক ভোজ হয়। রূপে গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে, আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরাজদের মহাভোজ দেখিয়া কোন বিখ্যাত বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন যে 'ইঁনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙ্গালীদের ডাকেন না।" এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া বাইনাচ ও গানবাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস্ করিলেন। (এই দ্বিতীয় ভোজের তারিখ সম্ভবতঃ ১৪ই মার্চ রবিবার।) সেদিন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও পরিতাষণ করা আমার একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিন আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন পড়িয়া গিয়াছিল, আমি সেই সভা লইয়া ব্যস্ত ও উৎসাহী—আমরা সেদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। অতএব, এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আর বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না; পিতার শাসনে ও ভয়ে একবার তাড়াতাড়ি করিয়া এই বিলাস ভূমি ঘুরিয়া, চলিয়া আসিলাম।"

দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার বিলাতে যাওয়ার পর বেলগাছিয়ার বাগানে সাহেবের ভোজ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু দ্বারকানাথ বিলাতে বসিয়াও তাঁর এই সখের বাগানবাড়ীর নানারকম পরি-বর্ত্তন ও উন্নতির কথা ভাবিতেন নূতন নূতন জিনিষ খরিদ করিয়া পাঠাইতেন। মৃত্যুর দুই-মাস পূর্ব্বেও দেখি তিনি লণ্ডন হইতে ১৯শে মে ১৮৪৬ লিখিতেছেন—

"আগামীকাল সাদামুটন থেকে ডাক যাইবে তাই এই সঙ্গে ক্যাপ্টেন স্কটের "রবার্ট স্মল" জাহাজে পাঠানো মালের রসিদ পাঠাইতেছি। মালের মধ্যে একটি বড় বাক্সে গিবসনের তৈরী একটা অতিমূল্যবান পাথরের মূর্ত্তি আছে। বাগানবাড়ীতে লম্বাঘর তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত ওটিকে আফিসের গুদামের সবচেয়ে শুকনা জায়গায় রাখিবে। লম্বাঘর তৈরী সম্বন্ধে আলাদা ভাবে লিখিব। বাকী জিনিষগুলি বাগানবাড়ীতে লইয়া গিয়া খুব সাবধানে খুলিবে কারণ এর অধিকাংশই চিনা মাটির জিনিষ বা পাথরের পুতুল। অর্গনের বারেলগুলি বসাইবার আগে বার্কিং ইয়ংকে দিয়া দেখাইয়া দেওয়া ভালো। ওর কয়েকটায় দেশী সুর বসানো, বাকীগুলোয় নতুন অপেরার।"*

কিন্তু এসব জিনিষ দেশে পৌঁছাবার আগেই দ্বারকানাথ বিলাতে দেহত্যাগ করেন এবং বেলগেছিয়া ভিলা হাত বদলাবার পথে চলে।

* ব্যারেল অর্গ্যান। গ্রামোফোনের পূর্বে কলের গান হিসাবে চলন ছিল। এই ব্যারেল অর্গ্যানিটি কিছুকাল আগেও বেলগেছিয়া ভিলাতেই ছিল।

আ লো চ না

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের জীবন দর্শনের মূলে বক্তব্য তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে গড়ে তুলেছে সংস্কৃতির ইমারত। সমধর্মী পুরুষেরই আবির্ভাব ঘটেছে কেবলমাত্র একথা আমরা বলতে পারি নে—বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্ব এসে নানা ধরনের পলিমাটি ফেলেছে ভারতভূমিতে। তাতে লাভ বই ক্ষতি হয়নি। মিশ্রিত সারে উর্বরতা বেড়েছে ছাড়া কমে নি। উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে এমনি একজন চিন্তাশীল আচার্যের জন্ম। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান গত ২রা আগষ্ট নিরাড়ম্বরে নিষ্পন্ন করলো কলকাতা মহানগরী তথা বাংলা দেশ। সরকারী কৃপায় ধন্য নয় এ অনুষ্ঠান। তবুও বিজ্ঞান কলেজের, মহাজাতি সদনের সভায় সরকারী সুবাস ছিল। ব্যক্তি মারফৎ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হুমায়ন কবীর প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। সরকারী দায়িত্ব বেসরকারী ভাবে বোধহয় ঐভাবেই পালন করা হলো।

বাংলা দেশের সাধারণ লোকেরাও বুঝতে পেরেছেন, কি না জানি না এই মনীষীর জন্ম-শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে অর্চনা করা কর্ত্তব্য। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করবার মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করা আরও আশু কর্ত্তব্য। কি করেই বা বুঝবেন? কোন ন্যূনতম উপলক্ষ্য তৈরী করা হয়নি সরকারী দপ্তরখানায় বা সকল বিদ্যায়তনে। সভ্যতার এই অগ্রসৃতির যুগে আমরা যেভাবে সোনার হরিণের পেছনে নিরন্তর ছুটে চলেছি তাতে আমাদের দেশের ঐতিহ্যের ধারকও বাহক রূপে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের বিস্মৃত হওয়াই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। সামাজিক কাঠামোর ক্রমপরিবর্তনের সাথে সাথে পূর্বসূরীদের প্রতি আমাদের ব্যক্তি মানসের সকৃতজ্ঞভাবটির ধারাও যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। তারই জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রের স্মৃতি আজ ধূসর।

একথা স্বীকার্য যে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী জনচিত্তের প্রসাদ লাভ করেন দেশ কালের সীমা ছাড়িয়েও। তাঁরা স্রষ্টার আসনে—তাঁদের কীর্তি কালোত্তর। কিন্তু বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্র-নায়কদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় তাঁদেরই কালের পরিধিতে। পরবর্তী যুগেও গুঞ্জরিত হবার সৌভাগ্য কদাচিৎ কয়েকজনের ভাগ্যে ঘটে। বিজ্ঞানের পরিক্রমণ ক্ষেত্র স্থাবর নয়। একারণে বহু বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রনেতার উজ্জ্বল জ্যোতি পরবর্তী যুগে ম্লান, নিষ্প্রভ। প্রফুল্লচন্দ্রও কালের এই নিয়মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যেতে পারেন নি বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু তিনি তো শুধু বিজ্ঞানী নন, তাঁর কর্মধারা যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকতো, তাহলে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে মেনে নিতাম এই বিস্মরণকে। তাতো নয়, তিনি আচার্য। আচার্য তিনিই যিনি যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হবেন, বরণীয় হবেন।

প্রফুল্লচন্দ্রকে আজ আমরা ভুলে গেছি তার দায় শুধু মহাকালের পরে চাপিয়ে দিলেই চলবে না, এ অপরাধ আমাদের সকলের। একথা বলবার প্রয়োজন হতো না, যদি না কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর বর্ণাঢ্যতা আমাদের আপ্লুত করে দিত। আমরা জানি

যে রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রফুল্লচন্দ্রের তুলনা চলে না। সেহেতু এই শতবার্ষিকীর দৈন্যদশা দেখে দুঃখিত বিস্মিত হই নি। আরো এই ভেবে যে ক'জনার ঋণ-ই বা আমরা স্বীকার করেছি!

উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতার আবর্তের প্রবল তরংগাঘাতে ভারতে হলাহলের সংগে অমৃতও এসেছিল। এই অমৃত হলো পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান। এই নবলব্ধ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ঘটল ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে। রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এমনি আরো অনেক মনীষী সমসাময়িক যুগে জন্ম নিয়ে তাঁদের অপূর্ব কর্মস্রোতে আপ্লুত করেছিলেন এদেশকে। তাঁরা সবাই রচনা করে গেছেন অবিস্মরণীয় কীর্তিস্তম্ভ।

ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও সংস্কারকের এবং কর্মনায়কের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে।

নিরাসক্তভাবে তিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগ ক'রে গেছেন—বিনা দ্বিধায়, বিনা কলরবে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষি দধীচির মতো নিজের যথাসর্বস্ব দেশের জন্য দান ক'রে তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁর নির্লোভ, কর্মময় জীবনই তাঁর বাণী। আজকের মানুষের কাছে প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কীর্তি ও সমাজ সংস্কারের কোন মূল্য হয়তো নেই কিন্তু তাঁর শুচিশুভ্র জীবন তাঁর কীর্তি শিখাকে ক'রে রাখবে সমুজ্জ্বল। দেশের বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত তমসাচ্ছন্ন সমাজগগনে প্রয়োজন প্রফুল্লচন্দ্রের মতো নির্লিপ্ত-প্রশান্ত জ্যোতিষ্কের।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান কতটুকু তার বিচার বিদেশী পণ্ডিতেরা করেছেন। শুনেছি ওদের দেশে খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিক ও রিফর্মারদের সংক্ষিপ্ত কর্মধারা সম্বন্ধে জনসাধারণ কমবেশী ওয়াকেফহাল। আর এখানে সরকারী কর্তাদের কথা ছেড়ে দিলেও শিক্ষাবিদ অধ্যাপকেরাও কতটুকু খোঁজ রাখেন! সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই কলকাতা মহানগরীর মহাবিদ্যায়তন সমূহের বিজ্ঞানের কোন কোন অধ্যাপককে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁদেরই পিতৃপুরুষ প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশবজোড়া খ্যাতির উৎস বস্তুটি কি!—তাঁরা কুণ্ঠিত হয়েছিলেন এই অতর্কিত প্রশ্নে। কলেজে মার্কারি বা পারদের বংশাবলী পড়ানোর সময় ক'জন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করেন জানি নে—আমি নিজে কোনদিন শুনি নি। অথচ তাঁদেরই কণ্ঠে বিদেশী বিজ্ঞানীদের জয়বার্তা ও কুলকোষ্ঠীর কথা বিঘোষিত হয়েছে সোচ্চারে। মারকিউরাস নাইট্রাইট পড়তে গিয়ে আমাদের চোখের সামনে কখনোই ভেসে ওঠে না শীর্ণ দেহ এক তপস্বীর নিষ্করুণ সাধনার ছবি, অথচ এইটে আবিস্কার করাতেই ধন্য ধন্য রব উঠেছিল ভুবনময়। সে গৌরব তিনি নিজের কুক্ষিগত ক'রে রাখেন নি, তা ভাগ করে নিয়েছে সমগ্র দেশ। শুধু তাই নয়, তাঁরই পৌরোহিত্যে বাংলা দেশে গড়ে ওঠে রসায়ণ গবেষণা কেন্দ্র। গবেষণার প্রতি আমাদের তরুণ সমাজের স্পৃহা জাগ্রত হয়ে ওঠে তাঁরই প্রচেষ্টায় ও উৎসাহে। তারপর থেকে এই ধারা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের স্থান থেকে স্থানান্তরে। তাঁরই সুকঠিন অধ্যবসায়ের ফলে রচিত হয়েছিল ভারতবর্ষের লুপ্ত বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাস—"হিন্দুরসায়নী বিদ্যার ইতিহাস", ভারতকে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে বসিয়ে দিয়ে গেছে। একই সংগে স্মরণ করা কর্ত্তব্য বেঙ্গল কেমিক্যালকে। জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত বাংগালী সমাজের শিল্প-বিমুখতার সংগে তিনি সংগ্রাম করেছেন আজীবন। ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন সংগ্রামভীরু বাংগালীর আত্মবিশ্বাস।

প্রফুল্লচন্দ্রের সমাজ-সেবকের ভূমিকা ছিল দীর্ঘ অথচ প্রচারহীন নৈঃশব্দে ভরা। নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার সমস্যায়, অস্পৃশ্যতা ও হরিজন সমস্যায়, পতিত ও জাতিভেদ সমস্যায়, চরকা আন্দোলন ও কুটির-শিল্প সংস্থানে, বিধবা বিবাহ ও তাদের স্বাবলম্বী করণে, পণপ্রথা নিবারণ সমস্যায়, বন্যাত্রাণ ও খাদ্যসমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর জীবন হয়েছে উৎসর্গীকৃত। সমাজের নানা দীনতা ও হীনতার বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক কণ্ঠে নিনাদিত হয়েছে উচ্চরবে বক্তৃতায়, ও অজস্র-রচনায়।

সেনেট হাউসে প্রদত্ত এক সম্বর্ধনার উত্তরে আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, "বন্ধুগণ, যখন আমার দিন ফুরিয়ে যাবে, তখনও আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাইব, তাদেরই নামে যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম ক'রে—যতদিন না আমার নির্যাতিত দেশজননীর ললাট থেকে মুছে যায় এই কলঙ্ক কালিমা।" প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম অসমাপ্ত কিন্তু কেউ তুলে নেয়নি এই মহাদায়িত্বকে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে। বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন, তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টি শক্তি, বিচার শক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়; কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাঁকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক—তিনি বললেন আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবশক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূর কালে প্রসারিত হবে।"

প্রফুল্লচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সংখ্যায় খুবই পরিমিত। সাম্প্রতিক কালের জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মতও বর্ণাঢ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকার এমনকি প্রাদেশিক সরকারেরও বদান্যতায় ধন্য নয়। তাহলেও এই কতিপয় অনুষ্ঠানেও সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের নাম। বোধহয় আমাদের কর্তব্য এখানেই শেষ —যেমন জগদীশচন্দ্রের প্রতি সমাপ্ত হয়েছে আমাদের কর্তব্য। জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর আর উচ্চারিত নন তিনি।

শুধু বক্তৃতাতেই কি প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য সমাপন হলো? এতেই কি পরিশোধিত হলো কতকালের ঋণ? এই দেশ ও দেশবাসীকে ঘিরে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে তাঁর যে নিরলস কর্মসাধনা অসমাপ্ত রয়ে গেল তা কি অপূর্ণই থাকবে? এই কথা সত্য হলেও অপ্রিয়। তাই বলতে দ্বিধা হয়। কিন্তু বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে যে সংকট ঘনিয়ে এসেছে তার চরমলগ্নে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হবার প্রয়োজন আছে।

অমিয়কুমার মজুমদার

বিচিত্র এই দেশ!

কী দেশে কী বিদেশে রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সূত্রে শ্রদ্ধার বন্যা বহে গেল। ভাবের প্লাবনে মগ্ন হলেন অনেকেই। কারো কারো ভুবনে আনন্দধারা প্রবাহিত হলো—যার সুরেশ এখনো মনকে ভরিয়ে তুলেছে, পরিবেশকে আলোকিত করেছে। কোথাও অনাড়ম্বর আন্তরিকতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের নিভৃততম কক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছে আশ্চর্য প্রীতিঘন পরিবেশে; কোথাও আবার অজস্র লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে শুধুমাত্র আলোকমালা আর অবিশ্রান্ত বিবৃতি-বক্তৃতা ইত্যাদি একান্ত নিরীহ শ্রোতাদের ধৈর্যের প্রতি বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত করেছে, সংবাদপত্রের কলমগুলি দিনের পর দিন একই সংবাদে মুখরিত হলো। অবশ্য অনেক বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে ভালো ফসলও লাভ করা গিয়েছে এই উপলক্ষ্যে।

'বিশ্বকবিরও বিস্ময়' যে প্রতিভা সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষের পরম-লগন শুচিশুভ্র শোভন পরিবেশে পালনকরা ভারতবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। আমার পরম দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করবার সুযোগ আমার ঘটেনি; কিন্তু এই কারণে দুর্ভার নয় যেহেতু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শুভ মুহূর্তগুলিকে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী দেশে বিদেশে প্রতিপালিত হয়েছে, এখানে উদ্‌যাপিত হচ্ছে নগরে প্রান্তরে। দেশবাসী তার শতবর্ষের কর্তব্য পালন করেছেন, করছেন এবং করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি কি কেবলমাত্র তথাকথিত শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমেই দেশবাসীর কর্তব্য সমাপ্তি লাভ করবে? জানিনা। জানিনা পরম ও চরমভক্তদের শুধুমাত্র বাগাড়ম্বর, উল্লাস; তথাকথিত সম্পাদক-সাহিত্যিক বক্তাদের অর্থপুস্তকের ভাষায় রবীন্দ্রব্যাখ্যা, আবরণ উন্মোচন এবং লোকমুখে প্রচারিত এক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ধ্বজাধারীদের বিরামহীন রবীন্দ্রানুষ্ঠানের মাধ্যমেই কি শতবার্ষিকী কর্তব্য পরিণতি লাভ করবে? অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কার্যক্ষেত্রে এর বেশী অন্যতর পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গিয়েছে। শ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি প্রকৃতই যেন দিনে দিনে রূপান্তরিত হতে চলেছে। আশ্চর্য জৌলুষ ব্যতিরেক, হাটের কোলাহল ব্যতিরেক, একে উপলক্ষ্য করে ব্যক্তি স্বার্থরক্ষা, ব্যক্তি প্রচার ভিন্ন যেন কোনো মহৎকর্ম নিষ্পন্ন হতে চায় না। অথচ আশ্চর্য, উদ্যোক্তরা প্রারম্ভেই শুভকর্ম বলে সেটিকে উল্লেখও করেছেন। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মহলে এই অশুভছায়া ক্রমশ আপন কুটিল পক্ষ বিস্তার করে চলেছে।

সুখের কথা, রবীন্দ্রশতবর্ষের পরমলগন বহু ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ক্ষেত্র-বিশেষে অনেক উদ্যোগী-কর্তৃপক্ষ তাঁদের আন্তরিকতা, তাঁদের মহৎ প্রচেষ্টার নিদর্শন রেখেছেন। কি সরকারী মহল, বেসরকারী মহল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক মহল, সাংস্কৃতিক কর্তৃপক্ষ, অফিস-কাছারি, ক্লাব-রেস্তোরা, চাউলকল সমিতি—তেলকল সমিতি থেকে শুরু করে আপনার পাড়ার সেই সরু তস্য সরু গলির সেই কি যেন নাম ব্যায়ামাগারটিও পর্যন্ত এই উপলক্ষ্যে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করতে দ্বিধা বোধ করেননি। অবশ্য দুর্জনেরা এই লক্ষণগুলিকে প্রকারান্তরে সংক্রামক বলে অভিহিত করলেও অনেকের বিবেচনায় এগুলি নাকি সংস্কৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ। কথা তা নয়, বক্তব্য হলো শুচিময় অনুষ্ঠানসূচীর, অনুষ্ঠান পালনের ক্ষমতা এবং তার সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু দেবতা নন, মানুষ, পুরুষোত্তম—সেইহেতু শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নামে তাঁকে এক অলৌকিক সিংহাসনে স্থাপন করে তথাকথিত লোকাচার প্রদর্শন কিংবা শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের নামে অনান্তরিক দৃষ্টান্ত স্থাপন অথবা তাঁকে সামনে রেখে, তাঁর আশ্চর্য মহৎ প্রতিভাকে মূলধন করে কেবলমাত্র সংস্কৃতির দোহাই কিংবা দেশে বিদেশে পাররাষ্ট্রিক সন্ধি-

স্থাপনের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে পাপাচার। কিন্তু রাজনীতি এমনই চিরবিস্ময়কর বিচিত্র জটিল বিষয়, সুযোগ এবং উপলক্ষ্যের যোগসাজসে মহৎপবিত্র প্রসংগকেও তার আশ্চর্য নাগপাশে একাত্ম করে নেবার চেষ্টায় তৎপর! কিন্তু মুখ আর মুখোস এক নয়—পার্থক্যটি সেজন্য ক্রমশ স্পষ্টকর হতে বাধ্য। একথা ভাবতে এবং উল্লেখ করতে রীতিমতো বেদনা বোধ হয় যে রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে রেহাই পাননি—রবীন্দ্র শতবর্ষের এই পরমমুহূর্তটিকে বিদেশী অনেক কূটনৈতিকমহল অসম্ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হন নি। এমন কি স্বদেশেও সেই ঘনঘটা রবীন্দ্রানুরাগীগণ লক্ষ্য করে কেবলমাত্র বেদনাই সংগ্রহ করেছেন।

এই কারণে কথাগুলি আরো অনুধাবনযোগ্য যে এই একই বর্ষে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন আরো তিন ভারতশ্রেষ্ঠ মনীষার জন্মশতবার্ষিকী বর্ষ এটি। একজন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। অপর দু'জন হলেন যথা-ক্রমে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই দু'জন বঙ্গতনয়। ভারতীয় সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, সমাজ ও জাতি গঠনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের পৃথক পৃথক কর্মসূচী বিশ্বকে ভারতবর্ষকে, তথা বাংলা দেশকে এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছে। কিন্তু একের ডামাডোলে অপরের প্রতি নীরব থেকেছেন ভারতবাসী তথা বঙ্গদেশবাসী।

রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভাকে কেন্দ্র করে শতবার্ষিক উদ্যাপনের যে সামগ্রিক কর্ম-সূচীগ্রহণ করা হয়েছে সে বৃহৎ, ব্যাপক এবং সর্বতোমুখী কর্মসূচী অবশ্যই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আশা করা যায় না। নানা কারণেই দেশবাসী আজ সে আশা এবং আস্থা স্থাপনে ভরসা পান না! তবু পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে কেন্দ্র করে উত্তরভারতে ব্যাপক কর্মসূচী অনুসৃত হয়েছে; কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের ক্ষেত্রে তার এক চতুর্থাংশ গৃহীত হয় নি! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধুমাত্র বিজ্ঞানী নন এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরিচয়ও কেবলমাত্র সমাজ সংস্কারক হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারতীয় জনমানসে তাঁদের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা, আত্মত্যাগ ও কল্যাণকামী সংগঠন প্রচেষ্টা প্রতিমুহূর্তেই প্রেরণার উৎস-স্থল। অথচ বঙ্গবাসীর কি দুঃসময়, শতবর্ষের পরম মুহূর্তেও ব্রহ্মবান্ধব অপরিচিতই রয়ে গেলেন এবং প্রফুল্লচন্দ্রও এক অনুজ্জ্বল আসরে সীমাবদ্ধ রইলেন। ভাবতেও অবাক লাগে, শিক্ষা দপ্তরের ঔদাসীন্যেই হোক বা অন্যকোনো গোপন হাতের নিখুঁত চেষ্টাতেই হোক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী ভাবে সেদিন বিরতি দিবস বলে ঘোষণা করবার নির্দেশ পেল না; এবং এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজও সেদিন বন্ধ রাখা নাকি হয় নি—যেখানে জাতির আচার্য তাঁর কর্মমুখর দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন! সত্যিই কি বিচিত্র এই দেশ!

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

অশ্লীলতা নিরোধ ও সমাজ

অল্পদিন আগে কাগজে কাগজে অশ্লীলতা নিরোধ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বিবরণ প্রকাশ হয়েছিল একথা নিশ্চয়ই পাঠকদের স্মরণ আছে। মুখ্যত এ আন্দোলন চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা নিরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে শুধু যে চলচ্চিত্রে যৌন উত্তেজনাকর দৃশ্যাদি কঠোর হাতে বাদ দেবার জন্য সেনসারদের ওপর জোর চাপ দেবার চেষ্টাই ছিল তা নয়, চলচ্চিত্রের বিজ্ঞপ্তি-মূলক পোষ্টারে যৌন আবেদন প্রকাশ নিষিদ্ধ করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছিল।

দেশের গণ্যমান্য বহুজন এ আন্দোলনের নেতৃত্ব করায় তা অন্ততঃ আংশিক সাফল্যও অর্জন করেছে। সিনেমা পোষ্টারে এ সাফল্য কি ধরণের কিম্ভূতকিমাকার বস্তু সৃষ্টি করেছে তা নিশ্চয়ই রসিকজনের দৃষ্টি এড়ায়নি! যৌন আবেদন নিরোধের প্রচেষ্টায় নারী-দেহের প্রত্যঙ্গ বিশেষে কাগজ সেঁটে দেওয়া বা আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগলের এক জনের মূর্তিকে মসীলিপ্ত করার ফলে যৌন আবেদন হ্রাস পায় এমনত বোধ হয় না বরং যা দৃষ্টি পথে এলেও মনে কোনো দাগ কাটতনা সেইটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে জোর করে দেখিয়ে দেওয়া হয়। ফলে, উত্তেজনা কমার বদলে বেড়েই যায়। মনস্তাত্বিকরাও বলেন যে, কোনো ঘটনার চেয়ে তার ইঙ্গিতই মনের পরদায় ঘা দেয় বেশী। তাই অশ্লীলতা নিরোধের প্রচেষ্টায় অশ্লীলতা বৃদ্ধির সম্ভবনাকে অবহেলা করা চলে না মোটেই।

চলচ্চিত্রের কাহিনী রূপায়নে সেনসারী কাঁচির কথা আজ আর কারো অবিদিত নয়। এমন পরস্পর বিরোধী যুক্তিতে সেনসার বোর্ড বিচার পদ্ধতি স্থির করেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তার মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে। সেন্সার যখন কোনো চিত্রকে প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য ছাড়পত্র দেন তখন ধরে নিতে পারা যায় যে, সে ছবি যাঁরা দেখ-বেন তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনা নিশ্চয়ই কিছুটা পরিপক্কতা লাভ করেছে। তাহলে সেনসারী কাঁচি তাঁদের পরিচিত বস্তু থেকে দূরে রাখবার যে অপচেষ্টা করেন তা ব্যর্থ ও হাস্যকর চেষ্টা বলে পরিগণিত হতে বাধ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল থেকে আমাদের সমাজের যে নৈতিক ভাঙন সুরু হয়েছে তা এদেশের যুবক-দের কারোরই অজানা নয়। আজকের সমাজে বিশেষতঃ নাগরিক সমাজে যে ধরণের অশ্লীল আচরণ প্রতিনিয়ত ঘটছে তাতে সেনসার প্রথার বর্তমান রূপ সম্পূর্ণ অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়। সহর কলকাতার প্রাপ্তবয়স্ক বাসিন্দাদের মধ্যে এমন বোধ হয় কেউই নেই, যিনি বাসষ্টপেজে অপেক্ষামান পণ্যাদের দেখেন নি; অনেক ট্যাক্সিতে যে প্রয়োজনানুযায়ী ক্ষণসঙ্গিনী জোগাড় করতে পারা যায় এখবরই বা জানেন না কয়জন?

জেনে শুনেও এসব খবরের কথা আমরা বেমালুম ভুলে থাকতে চাই। তাছাড়া আমাদের যে ভেকই সম্বল। তা না হলে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিত্য অশ্লীল আচরণে আমরা কুণ্ঠিত হতাম।

অন্যায় যাঁরা করেন তাঁদের তরফ থেকেই সমাজকে অন্যায় মুক্তকরবার প্রচেষ্টা হয় বেশী। অর্থাৎ নিজেদের গোপন অশ্লীলতাকে চাপা দিতে অন্যদের অশ্লীলতার সম্ভবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার প্রচেষ্টাই বড় হয়ে ওঠে।

এছাড়াও একদল আছেন যাঁদের কাছে স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু সমস্ত কিছুই প্রায় অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত। এ'রাই প্রাচীনত্বের ধ্বজাধারী, তথাকথিত ভারতের ঐতিহ্যের সংরক্ষক। কিন্তু এ'রা আশেপাশে যেমন সাপ দেখে আঁতকে ওঠেন তা রীতিমত হাস্যকর। সমাজের সকুমার-মতি বালক-বালিকাদের মনে পাছে কুপ্রবৃত্তির ছোঁয়াচ লাগে তাই তাঁরা সম্ভাব্য সব দিকে নজর রাখেন। খাজুরাহোর মন্দির শিল্পগতভাবে যত সুন্দরই হোক না কেন তার গায়ে উৎকীর্ণ ফলকে যে সব মিথুন রয়েছে তাদের লোকচক্ষু-অন্তরালে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করে মন্দিরগুলিকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রস্তাব করতে বাধেনা।

এদিকে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলিতে যৌন উত্তেজনাকর বিজ্ঞাপন বা সংবাদের প্রকাশের কমতি নেই। নারী হরণ, বলাৎকার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশে এই সব সমাজপতিদের পক্ষ থেকে কোনরকম আপত্তি ওঠেনা। সংবাদপত্রে বা দেওয়ালে দেওয়ালে গর্ভ-নিরোধক ওষুধের রঙচঙে বিজ্ঞাপন বোধ হয় তাঁদের চক্ষুগোচর হয় না। এনিয়ে ত কই কোনো আন্দোলনের খবর দেখিনা! 'আত্মবৎ মন্যতে জগত'। বিগত-যৌবন সমাজপতিরা হয়ত নিজে-দের যৌবনকালীন অবস্থা চিন্তা করে কিংবা যে চিন্তা আজকে তাঁদের মনকে পীড়া দিচ্ছে তা থেকে ভবিষ্যত বংশধরদের মুক্তি দেবার চেষ্টাতেই এ কাজ সুরু করেছেন, একথা মানতে আপত্তি নেই। কিন্তু 'আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শিখাও'। যীশুখৃষ্টের মত বলতে ইচ্ছা করে, যে কোনো দিন পাপ করেনি প্রথম পাথর সেই ছুঁড়ুক। তবে তাহলে হয়ত পাথর আর কোনোদিনই ছোঁড়া হবেনা।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের রুচির উন্নতি ঘটানো অবশ্য প্রয়োজন এ কথা আমরা অস্বীকার করিনা কিন্তু অশ্লীলতা নিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা হবার সম্ভাবনা দেখিনা। যেখানে হাজারে হাজারে মানুষ পশুর জীবন যাপন করছে, যেখানে পারিপার্শ্বিক থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শেষ চিহ্নটুকুও বিদায় দিতে সরকারী-বেসরকারী ভাবে আমরা বদ্ধ পরিকর, যেখানে প্রতিনিয়ত পশুজীবনের গ্লানিতে প্রতিনিয়ত নারীকে চরম অবমাননা স্বীকার করতে হয়েছে সেখানে সিনেমার দৃশ্যাংশ বা পোষ্টারের কুৎসিত পরিমার্জনে কোন সুরাহা হবে কি ?

দেশের বর্তমান জনসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, সুন্দর ও সুস্থ জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে অশ্লীলতানিরোধ আন্দোলন করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না বলে মনে হয়, অন্যথায় আন্দোলনের নেতাদের কর্তব্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের আমূল সংস্কার সাধন, অশ্লীলতার শিকড় ত সেখানেই।

রবি মিত্র

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতীয়রা ইতিহাস লিখতে জানতো না, ইংরেজদের এই অপবাদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। ওই দুই মনীষীই ইতিহাস শাস্ত্রের বিশিষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় ও তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী সম্মত ইতিহাস ভারতীয়রা লেখেননি, কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তার রচনায় কোন শ্লথতা দেখায় নি তারা।

ইতিমধ্যে ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে মতবাদ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। নতুন মতবাদের বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু দুঃখের কথা আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচয়িতারা আজ পর্যন্ত কোন মৌলিকত্ব দেখাতে পারেননি।

ভারতের ইতিহাসের সেই যে কাঠামো ভিনসেন্ট স্মিথ তৈরী করে দিয়ে গিয়েছেন, তারই এখানে সেখানে জোড়াতালি দিয়েই আমাদের দেশের ইতিহাস পণ্ডিতেরা ইতিহাস পুনর্লিখন করেছেন। প্রাচীন পুঁথি, তাম্র শাসন কিংবা এখানে সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে স্মিথের ইতিহাসে যেখানে যেটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেইটুকুই শুধু ইতিহাস সংশোধিত হয়েছে। অথবা অশোকের শিলালিপি বা ঐ জাতীয় অন্যান্য লিখিত প্রমাণের পাঠান্তর বা ব্যাখ্যান্তর দিয়েও কিছু কিছু নবসংস্করণ করা হয়েছে পুরাণো গ্রন্থের।

কিন্তু কাঠামো সেই প্রাচীন এবং গতানুতিক। জনকয়েক রাজচক্রবর্তী বা দিল্লীর বাদশাহের কীর্তিকলাপ, আর কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে স্থানীয় রাজাদের প্রতাপের প্রকাশ। পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস যে দেশে, সে দেশের সমাজ জীবনের জীবন্ত মিছিল যদি দেখতে চান, আধুনিক ভারতের ইতিহাস পণ্ডিতদের রচনায়, তাহলে নিরাশ হতেই হবে আপনাকে।

যে ভারতীয় সংস্কৃতির বড়াই আমরা করছি, বিদেশে যা রপ্তানি করছি অহরহ, যে মূল্যবোধ আজকের এই ভেঙ্গে পড়া জীবনেও ভিত্তি হয়ে রয়েছে, তার উদ্ভব ও বিবর্তন এবং নবজীবনে তার প্রভাবের ধারাবাহিক ইতিহাস যদি বিবৃত না হয়, তাকে ইতিহাস বলতে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে আপত্তি আমরা করবোই।

প্রাতঃস্মরণীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইতিহাসের অনেক নতুন তথ্য জুগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মুগল যুগের ইতিহাস রচনায় আচার্য যদুনাথ যে বিচার পদ্ধতি প্রবর্তন করে গিয়েছেন, নতুন নতুন আবিস্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেই পথ অনুসরণে নতুন করে সমগ্র ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস কতটুকু চোখে পড়ে।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাসকারের তথ্যনিষ্ঠা ছাড়াও বাঙ্গালীর যে ধারাবাহিক জীবনচিত্র আঁকার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে, সাহিত্যিকের সেই ভাবালুতার সঙ্গে ইতিহাসবিদের তথ্যনিষ্ঠা সংযুক্ত হলে যে জীবন্ত ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হতে পারতো, তার জন্য আজও আমরা বৃথাই হাহুতাশ করে মরছি।

বস্তুত জাতিসত্বায় শ্রদ্ধা না থাকলে কোন জাতির ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। যা কিছু শ্রদ্ধাহীনের চক্ষে কুসংস্কার বা গাঁজাখুরি গল্প বলে মনে হবে, শ্রদ্ধাবান ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু তারই সূত্র ধরে অনেককিছু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় আমাদের আধুনিক ইতিহাস রচয়িতারা ভারতের জাতিসত্বাসম্পর্কে দৃশ্যত ভিনসেন্ট স্মিথেরই মত শ্রদ্ধাহীন। তাই তাদের রচিত ইতিহাস সেই কাঠামোতেই চলেছে, শুষ্ক কাঠামোতে রস-সঞ্চার বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরা করতে পারেন নি।

আসলে কেবলমাত্র সমাবেশেই সার্থক ইতিহাস রচনা করা যায় না। সমাজ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে জাতির চলমান আত্মা ও ভাবসত্বাকে যদি মূর্ত করে তোলা না যায়, তবে তা ইতিহাস নামযোগ্য নয়। বিভিন্ন বিপরীতমুখী ধারার সংঘাতে জাতীয় আত্মার যে নিরন্তর ভাঙ্গা গড়া চলে তার পরিচয়ই ইতিহাসের সারবস্তু।

ভারতের ইতিহাস রচনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করার মস্ত অসুবিধা ধারাবাহিক প্রমাণসিদ্ধ ডক্যুমেন্টের অভাব। সেই অভাব পূরিয়ে নেওয়া সম্ভব বিভিন্ন যুগের সাহিত্য পুঙখানুপুঙখ বিশ্লেষণে, যেমন একটা যুগের রাঢ়দেশীয় অঞ্চলের সমাজ জীবনের ইতিহাস শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস থেকে পাওয়া সম্ভব। ভারতীয়রা সাহিত্য রচনায় কার্পণ্য করেনি। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সন, তারিখ নির্ণয় অনেক স্থলেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া তাতে অতি প্রাকৃতের অস্তিত্ব ইংরেজ ইতিহাসকারদের অনুমোদন লাভ করেনি। আমাদের আধুনিক ইতিহাস লেখকরাও সেই কারণেই প্রাচীন সাহিত্যের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। প্রাচীন জাতির ইতিহাস রচনায় কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির মূল্যও কম নয়। তা থেকে তথ্য না পাওয়া গেলেও তথ্য লাভের যথেষ্ট নির্দেশ মেলে। পুলিশ কুকুর লাকি ও মিতার কার্যকলাপ যেমন আদালতগ্রাহ্য সাক্ষ্য না হলেও, সাক্ষ্য সংগ্রহে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি।

কিন্তু বিপদ হয়েছে ইয়োরোপীয় পন্ডিতেরা ভারতের যে চিত্রায়ণ করে গেছেন, সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি আমাদের ইতিহাস রচয়িতারা। সেই যে হ্যাভেল সাহেব বলে গেলেন বুদ্ধধর্মই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের মুখ্য অধ্যায়, আর অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপনিষদের আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীকে দিলেন প্রাধান্য, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তবনিষ্ঠ বলিষ্ঠ মহাভারত তার তলায় চাপা পড়ে গেল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রাক্ আর্য সভ্যতার হদিশ দিয়ে গেছেন, তার সন্ধানে ইদানীং আমরা অনেক মাটি খুঁড়ছি। বাঙলার দক্ষিণ অঞ্চলে গ্রীকপ্রভাবের হদিশও মিলছে পোড়ামাটির পাত্র ও পুতুলে, পুঁতির মালায় ও ধাতুজাত অলঙ্কারে। কিন্তু প্রাক্ আর্য সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী আর্য সভ্যতার সংঘাতে বা সমন্বয়ে যে নবসভ্যতা গড়ে উঠলো, তার বিশ্লেষণ করে প্রাচীন আদর্শ ও নতুন ভাবধারার অনুপাত সন্ধান প্রচেষ্টা কতখানি হয়েছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বৌদ্ধ শিল্পে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সন্ধান করেননি আমাদের ইতিহাস রচয়িতারা। তার বদলে ব্রাহ্মণ্য শিল্পে বৌদ্ধ প্রভাব খুঁজে বার করার প্রবণতায় প্রাক্ বুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়েছেন। প্রত্নতাত্বিক খনন প্রচেষ্টা যা চলে, তা হয় বৌদ্ধপ্রভাবের নব নিরিখ সন্ধান কল্পে, না হয় প্রাক-আর্য কিংবা গ্রীক প্রভাবের নিদর্শন সন্ধানে। কিন্তু সেই সব প্রভাবে প্রাচীন জীবনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ সামান্যই চোখে পড়ে।

বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনধারার যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তার পরিপূরক খননের দিকে আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও লক্ষ্য কম। কিছুদিন

আগে টয়েনবি যখন ভারতে এসেছিলেন তিনি এবং হুইলার দুজনেই গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীন সভ্যতার সন্ধানে খননের প্রয়োজন ঘোষণা করেছেন। অথচ আমাদের প্রত্নতত্ত্ব গঙ্গাতীরস্থ প্রাচীন আর্য-সভ্যতার নিদর্শন অনুসন্ধানে একেবারেই উদাসীন।

উদাহরণস্বরূপ অযোধ্যার কথা বলা যেতে পারে। রামায়ণ কতখানি বাস্তব ইতিহাস তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, তবে অযোধ্যা রাজ্যের প্রাচীন প্রতাপ ও মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে কি করে? লক্ষ্ণৌর নবাবদেরও যে নিজেদের অযোধ্যার নবাব বলেই ঘোষণা করতে হয়েছিল তাকি অযোধ্যার ঐতিহ্যেরই প্রমাণ নয়? অযোধ্যায় এখানে সেখানে অনেক ঢিপি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সেগুলি খনন করে রামায়ণীয় সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন সন্ধানের কোন গুরুত্ব কেউ উপলব্ধি করেছেন বলে শুনিনি। কুরুক্ষেত্রের ভারত যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা একথা বহু ইতিহাস পণ্ডিত স্বীকার করেছেন। বর্তমান কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের জনহীন আবাসহীন রূপ কেন যে কোন ইতি-হাস পণ্ডিতের কল্পনা উদ্বুদ্ধ করে খননে প্রবৃত্ত করে না, তা বুঝে পাই না। কুরুক্ষেত্রের পাশেই ইতিহাস বিশ্রুত থানেশ্বর, বর্তমানে তা শিবমন্দির কেন্দ্র হিসেবে তীর্থযাত্রীদেরই শুধু আকর্ষণ করে, ইতিহাস রচয়িতারা সেখানে ইতিহাস সন্ধান করেন কতটুকু! বিশ্বের প্রাচীনতম নগরী কাশী তার সভ্যতায় ও জীবনধারায় কোনদিন ছেদ পড়ে নি। রামায়ণ মহাভারতের যুগের উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরস্থ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী যে আজও অর্ধচন্দ্রাকৃতি আর কাশীর গঙ্গা যে আজও উত্তরবাহিনী, এই বিস্ময়কর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ধরে কাশীর প্রাচীনত্ব ও কাশীর জীবনের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ে কেন ইতিহাসকারের আগ্রহ জাগে না, তা ভাবতেই বিস্ময় লাগে।

বাঙলার ইতিহাসরচনায় প্রাচীনতম যুগের যেটুকু নির্দেশ মোনাহান দিয়ে গেছেন, তারপর আর বিশেষ কিছু নতুন আলোকপাত ঘটেনি। পাল সেন যুগের ইতিহাস এবং গৌড় রাজ্যের ইতি-হাস নির্ণয়ে কিছু লক্ষ্যণীয় কাজ হয়েছে ঠিকই, এবং তার প্রধান কৃতিত্ব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বাঙলার বিশিষ্ট জীবনবোধ কিভাবে বিকশিত হয়েছে, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সে বিষয়ে যে অনুমাননির্ভর কতগুলি তথ্যখাড়া করেছেন, তার পরবর্তী প্রচেষ্টা হিসেবে তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য বিশেষ করে মনসামঙ্গলের অনেকগুলি রূপ, অজস্র পল্লীগাথা, এমনকি শনি ও সত্যনারায়ণের পাঁচালি থেকে বাঙলার ইতিহাস রচনায় যেটুকু সহায়তা হতে পারে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার এখনও হয়নি।

প্রাচীন ভারতের চারবর্ণ কিভাবে লোপ পেয়ে গেল, আর হঠাৎ অবলুপ্ত ক্ষত্রিয় শক্তি, ঐতি-হাসিক হিন্দু সাম্রাজ্যের যুগে যার কোথাও দেখা পাওয়া গেল না, মহাভারতের সম্পূর্ণ বাইরেকার এক অঞ্চলে অর্থাৎ রাজস্থানে তাদের যে হঠাৎ পুনরুদ্ধার ঘটলো একেবারে সূর্যবংশ হিসেবে, আর তাদের শৌর্যবীর্যও ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শক্তি তাদের ঘাটিতে ঘা মারার আগে পর্যন্ত ভারতের অন্যত্র অজ্ঞাত থেকে গেল—এসব রহস্য সমাধানের কোন সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা আমাদের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে চোখে পড়ে না। আমি বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অধ্যায় নিয়ে রচিত গবেষণা প্রবন্ধের কথা বলছি না। প্রতিক্ষেত্রেই আমার বক্তব্যর লক্ষ্য ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক রচনা।

যাগযজ্ঞ প্রধান ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি বিরক্তিবশতঃ বুদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান দিয়েই বর্ণাশ্রম লোপের কারণ নির্ণয়ের দায়টুকু সেরে দেওয়া হয়। বৈদিক দেব দেবীর জায়গায় পরবর্তী যুগের শিবদুর্গা কালী কি করে অধিষ্ঠিত হলেন, তারও পূর্ণব্যাখ্যা কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান সম্পর্কে সেই সেই অঞ্চলে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে,

ইতিহাসকারের দৃষ্টির চালুন দিয়ে সেগুলি ছেঁকে নিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বার হতে পারে, সেদিকে বিশেষ প্রবণতার অভাব রয়েছে।

কেন পুণ্যতোয়া গঙ্গা থেকে বহুদূরে রাজস্থানের এক দুর্গম অঞ্চলের পুষ্কর হ্রদ হল তীর্থরাজ, আর কেনই বা সারাভারতে একমাত্র সেখানেই বৈদিকযুগের ব্রহ্মা তাঁর দুই পত্নী গায়ত্রী ও সাবিত্রীকে নিয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, কেন বৈদিকযুগে অজ্ঞাত সেই পুষ্করেরই পাহাড়গুলির মধ্যেকার দীর্ঘগুহাগুলি বৈদিকযুগের ঋষিদের নাম বহন করছে—এইসব প্রশ্নের সমাধানে ইতিহাসকারের প্রচেষ্টা চালিত হলে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিরাট এক অবলুপ্ত অধ্যায় পুনরুদ্ধার হতে পারে।

আধুনিক যুগের অন্যতম দিকপাল গর্ডন চাইল্ড প্রাগৈতিহাসিক পাশ্চাত্য জীবনের মধ্যে পরবর্তী পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলির বীজ সন্ধান ও আবিষ্কার করেছেন। অথচ প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাদের জীবন দর্শন ও জীবনাদর্শের যেটুকু চিহ্ন পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, তাকে আমাদের আধুনিক ইতিহাস রচয়িতারা বহিরাগত প্রভাব বলে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দিতে চাইছেন।

একটা প্রচলিত কথা, বর্তমানই অতীতকে সৃষ্টি করে। কোন একজনের বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার কিংবা কোন জাতি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রমাণ করার জন্য অতীতের খণ্ডিত ইতিহাসই মাত্র সন্ধান করা হয়। ইংরেজরা আমাদের সম্পর্কে যে তত্ব ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করে গেছে, সেই ভাবেই তারা গেঁথে গেছে আমাদের ইতিহাস। আর আমরাও আজ পর্যন্ত নির্বিবাদে তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

যে সব সমাজরীতি, যে সব ধ্যানধারণা, যে মূল্যবোধ আমাদের ঐতিহ্যগত, প্রতিমুহূর্তে যার প্রভাব আমরা মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করছি, তারি ভিত্তিতে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানই ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রকৃষ্ট পথ। কোন কোন অবস্থায়, কোন কোন পরিবেশে বিভিন্ন ধ্যানধারণা বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, সেই তত্ব নির্ধারণ করতে পারলেই আজকের জীবনে তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। ইতিহাস রচনা ও অধ্যয়নের ব্যবহারিক গুরুত্ব ওইখানে।

রাজবংশের ও যুদ্ধবিগ্রহের ধারারক্ষার মত উপাদানের অভাবের ফলে জাতির ইতিহাস রচনায় যেটুকু অসুবিধা ঘটে, সাধারণ মানুষের জীবনধারার উৎস সন্ধানে উর্ধ্বগতি যাত্রা করে সে অসুবিধা মেটানো যায়। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসশেষ পরে যারা কাজ করে, তাদের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় আমাদের ইতিহাসকারদের মনোনিবেশ আজ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

রাখাল ভট্টাচার্য

রামকিংকর

অগাষ্ট মাসের শেষাশেষি শিল্পী রামকিংকরের একক প্রদর্শনী আর্টিষ্ট্রী হাউসে অনুষ্ঠিত হলো। রামকিংকর আধুনিক পন্থী শিল্পী। তাঁর প্রদর্শনীতে ছবি আর ভাস্কর্য্য দু'রকম মাধ্যমেরই পরিচয় ছিল। ভাস্কর রামকিংকর, চিত্রশিল্পী রামকিংকর অপেক্ষা সমধিক পরিচিত। ভাস্কর্য্যের মধ্যে তাঁর যে বিদগ্ধ মনের পরিচয় বর্ত্তমান তা তাঁর প্রদর্শিত ছবির মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রচলিত মত বিরুদ্ধ আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে পরীক্ষার অবতারণা তিনি ভাস্কর্য্যের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। বিভিন্ন মতবাদের আওতায় তাঁর প্রকাশ মাধ্যম গড়ে উঠলেও একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণভাবে তাঁর সমস্ত ভাস্কর্য্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এ্যাব্‌স্ট্রাক্ট' এক্সপ্রেসেনিজমের মতানুযায়ী নন্-অবজেকটিভ ফর্মের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থেকেও সেগুলি একেবারে বঞ্চিত নয়। তিনি দৃশ্যমান জগতের সমস্ত কিছুকে নিছক অলংকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। সেখানে তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের দিকেই মুখ ফিরিয়েছেন। দৃষ্টিগ্রাহ্য সমস্ত কিছুকেই একেবারেই বর্জন করেন নি। তাঁর ভাস্কর্য্যের কাজগুলির মধ্যে একটি অদ্ভুত বলিষ্ঠতা আছে। প্রতিকৃতিগুলির গঠন সৌষ্ঠব সুষম এবং লাবণ্যময়। ভাস্কর্য্যের মধ্যে তিনি অনেক মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার সংস্কার মুক্ত ভাব প্রকাশ করেছেন। ভাস্কর্য্য গঠনের মূলসূত্র আধুনিক কালের বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও, সেগুলি শুধুমাত্র বুদ্ধির তলোয়ার খেলার আসর হয়ে দাঁড়ায় নি, গঠন মাধুর্য্যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলেই বিশ্বাস করি।

শিল্পী রামকিংকর ছবির জগতে অনেক আধুনিক মতকে প্রয়োগ করেছেন, চিত্রের জগতে একদিকে তিনি যেমন ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, অন্যদিকে সুপ্রেম্যাটিজম্ নন অবজেকটিভ্ দৃষ্টিকোণে নিছক রং আর রেখার গঠন পদ্ধতির দিকেও লক্ষ্য দিয়েছেন। এক একটি ছবিতে তিনি এক একটি মতবাদকে প্রকাশ করেছেন—যেখানে কানডিনেসকি, পিকাশো, ম্যালভিচ্, পলক্লি সকলকেই অনুসরণ করেছেন। একদিকে তিনি প্রকৃতির দৃষ্টি গ্রাহ্য বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে পিওর ফর্মের নিছক অলংকরণের নন্ অবজেকটিভের দিকে ফিরেছেন। ছবির পরীক্ষার মধ্যে একটি অনুভূতিপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার এই বিশ্বাস যে ভাস্কর রামকিংকর, শিল্পী রামকিংকর অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী,—অনেক বেশী আত্মস্থ। তবে একথা নিঃসন্দহে স্বীকার করব যে যদিও তিনি ছবিতে বিভিন্ন আধুনিক মতবাদের সূত্র অবলম্বন করেছেন, কিন্তু সেই সব চিত্রসৃষ্টিতে তাঁর পারদর্শিতা, গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় রস সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে। কিছু ছবিতে রামকিংকর প্রচন্ডভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন দ্বিধাহীন ভাবে, সেখানে তিনি সত্যই সার্থক।

শিল্পী রামকিংকরের এই বোধহয় একক চিত্র আর ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী তাই উদ্যোক্তারা তাঁর বিভিন্ন সময়ের কাজ উপস্থিত করেছেন, কিন্তু এতে শিল্পীর আধুনিক চিন্তার প্রকৃত চিত্রটি উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয়। আধুনিকতম মতবাদ একজিস্‌টেন সিয়ানজিম প্রসূত নিও—রিয়ালিজম এবং নিও—প্লাসটিসিজম প্রভৃতি মত প্রকরণের বয়সকাল অনুপাতে রাম-

কিংকর অপেক্ষাকৃত তরুণ সেখানে শিল্পীর আধুনিক চিন্তার স্ফুরণগুলিকেই সন্নিবিষ্ট করলে, বর্ত্তমানে রামকিংকর কি ভেবেছেন সেটার প্রতি বেশী করে লক্ষ্য পড়ত।

আধুনিক শিল্প

রুশীয় কানডিনেস্কি প্রথম এ্যাবস্ট্রাকট্ ছবি মিউনিকে ১৯১০ সালে প্রদর্শিত করেন, ছবির নাম ছিল Improvisation. কানডিনেস্কি নন—অবজেকটিভ্ ছবিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তুর আকারকে বর্জন করে নিছক রং আর রেখার গঠন পদ্ধতির প্রতি বেশী জোর দেন। এই পদ্ধতিতে শিল্পী ম্যালভিচ প্রমুখ শিল্পীও বিশ্বাসী।

চলতি বছরে পিকাসোর ছবি 'কম্পোজিশন এ্যান চিয়েন ড্যালমেট' (১৯৫১ সালে আঁকা) প্রদর্শিত হয়—প্যারিশ শহরের 'স্যালোন ডি মাই' হলে। আশী বছরের শিল্পী ভিলোঁর ছবির প্রদর্শনী হয়—'গ্যালারী চারপেনটার' হলে। তিনি মোট একশোটি ছবি প্রদর্শিত করেন।

দমেয়ার

লণ্ডনের স্টেট্ গ্যালারী দমেয়ারের একটি উৎকৃষ্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। দমেয়ার অত্যন্ত ভাল জাতেরকার্টুনিষ্ট ছিলেন। চিত্রজগতে তিনি কার্টুনিষ্ট অপেক্ষা—ওস্তাদ আঁকিয়ে হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু তিনি তাঁর জীবিত কালে কার্টুনিষ্ট হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছবির আবেদন প্রকৃতি ধর্ম্মী কিন্তু বাস্তব জগতের সংস্পর্শে সেগুলি সংবেদনশীল এবং বলিষ্ঠ গঠন পদ্ধতিতে প্রাণবন্ত।

পলক্লি

জার্মান শিল্পী—পলক্লি স্যুররিয়ালিজম্ চিন্তায় চিত্রসৃষ্টি করেছেন। তাছাড়াও পিওর ফর্ম নন অবজেকটিভ দৃষ্টিকোণে তাঁর ছবি নিছক রং আর রেখায় প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কালে পলক্লি অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পী—। মলটন গ্যালারী তাঁর তেত্রিশ বছর বয়েস থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। (১৯১২ থেকে ১৯৪০ পর্য্যন্ত আঁকা)

জর্জিয়ানি

লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারী জর্জিয়ানির আঁকা সান্ সেট ল্যাণ্ডস্কেপ্ উইথ সেন্ট জর্জ এ্যান্ড সেন্ট এ্যান্থনি' ছবিটি কিনেছেন নাম মাত্র মূল্যে। গ্যালারীর ছবি ক্রয় করার বাৎসরিক তহবিল ছবিটির দামের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ছিল। এটি নিয়ে জর্জিয়ানির ছবি দুটো হলো ন্যাশনাল গ্যালারীতে।

শিল্প সম্পর্কীয় নূতন বই

নতুন বই কিছু বেরিয়েছে তার মধ্যে Kangra Painting Of Bhagabata Purana, M. S. Randhawa কৃত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বইটি প্রকাশ করেছেন National Museum of India. কুড়িটি চিত্রফলক এবং দশটি রেখাচিত্র সমন্বিত এই বইটি ভারতবর্ষের শিল্পের ইতিহাসে এক নতুন সংযোগ। এছাড়া মার্শাল ব্রাউন প্রণীত 'রোমান্টিক আর্ট' বইটিও উল্লেখযোগ্য। রোমান্টিক চিন্তার উদ্ভব, তার গতি প্রকৃতি এবং রোমান্টিক আর্টের মূল্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এস্কিমো স্কাল্‌পচার' জরগান মেলগার্ড কৃত আর একটি ভাল বই। এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন লেখক। বিশেষ করে এস্কিমো সম্পর্কে লেখা হলেও, তাদের ভাস্কর্য্য রীতি সম্পর্কে লেখা বোধ হয় এই প্রথম।

নিখিল বিশ্বাস

বাঁচতে সবাই চায়।। অসীম বর্ধন। প্রকাশক বি, মিসা আল্‌ফা বিটা পাব্‌লিকেশনস্‌। কলিকাতা-১। মূল্য ৩·৭৫ টাকা।

গল্প, উপন্যাস, কবিতা যেমন বাংলাভাষার পুষ্টি সাধন করেছে তেমনি দর্শন বা ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলীও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও গণিতের পাঠ্য পুস্তক। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনচর্যার ছোট খাটো সমস্যাগুলি নিয়ে রসরচনা বা আলোচনা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই পরিবেশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ বা সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই নেবার সাহস কোনও লেখক বা প্রকাশকের হয়নি।

মনোবিজ্ঞানের ওপোর লেখা অসীম বাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ এইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। এরপর প্রবন্ধগুচ্ছের যথারীতি পরিণতি হয়নি। বারটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ করেছে। ঝকঝকে বাঁধাই ও ছাপা, জ্যাকেটের আকর্ষণীয় বর্ণপ্রলেপ প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বইখানির প্রতি। পড়বার পর মনে হল বই খানি প্রকাশের সার্থকতা আছে।

বাঁচতে সবাই চায় অথচ তার উপায়গুলির প্রতি সরাসরি অগ্রসর না হয়ে অনেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এড়িয়ে চলেন। নীতিকথাগুলি একান্তই বাসি, এই ধারণা নিয়ে একদা উপেক্ষার মনোবৃত্তি আমাদের জীবনকে ক্ষয়িষ্ণু ও জটিল করে তুলেছে। আমাদের এই ধরণের স্বখাত সলিলে ডুবে মরবার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলার সহজ পন্থাটি অসীমবাবু সহজ সরল ভাষায় বলেছেন।

বেঁচে থাকবার জন্য যেমন দেহের পরিচর্য্যা দরকার তেমনি দরকার মনের অথচ এই দিকটাই আমরা নজর দিই না। মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে অসীমবাবু দেখিয়েছেন যে মনের প্রতিটি রোগই সংক্রামক। সেগুলির আক্রমণ একদিক থেকে যেমনি ব্যাপক তেমনি অমোঘ, কখনও বা অবশ্যম্ভাবীও বটে। কিন্তু এর বিস্তার যেমন সহজে হয় উৎখাতও তেমনিই সহজে হয়। সেই রোগের বীজটিই হল রোগের প্রতিষেধক।

মানসিক রোগগুলি যে কতদূর ব্যাপক তা বইখানি পড়লেই হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। "সকলেই হিংসুটে" প্রবন্ধটিতে মাৎসর্য্য রিপুর প্রাগৈতিহাসিক কালের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে লেখক বলছেন যে হিংসার যথার্থ প্রয়োগই জীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। হিংসার প্রভাবে পরশ্রীকাতর না হয়ে মনকে সহানুভূতি, সহযোগীতা আর প্রতিদ্বন্দ্বীর উপ-যোগী করে তুলতে হবে।

"ভোর হল দোর খোলো" প্রবন্ধটিতে ভোরে বিছানা ছেড়ে না ওঠার আলস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শারীরিক বা মানসিক ক্লান্তির ওজর যে ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে না উঠবার একান্তই একটা অজুহাত সেই সত্যটি একটি আক্রান্ত ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়া যেমন "কথামালা" পুস্তকের বৈশিষ্ট আলোচ্য পুস্তক-

খানিকেও তেমনি, "কি কি না করা উচিত" সেই সম্পর্কে কয়েকটি উপদেশাবলীর সমষ্টি বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু অসীমবাবু জানেন যে নিছক উপদেশ কচিমনের পক্ষে উপকারী হতে পারে পরিণত বয়স্কদের জন্য নয়। তাদের জন্য চাই আত্ম বিশ্লেষণ। পুস্তক খানি এই আত্মবিশ্লেষণকে সাহায্য করবার জন্যই লেখা।

এ যেন সেই অশীতিপর বৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যিক পঞ্চতন্ত্র লেখকের নির্গলিত সার। ভয় সম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্র লেখক বলছেন,

"তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যং যাবৎ ভয়ম্ অনগতম্
আগতম্ তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্"

অসীমবাবুও তাঁর "ভয়কে জয় করুন" প্রবন্ধে বলছেন মানুষ মাত্রেই ভয় থাকা স্বাভাবিক এবং উচিত যেহেতু ভয় আমাদের ভবিষৎ বিপদ থেকে সতর্ক করে দেয়। দূরাগত ভয়ের কারণ থেকে নিস্কৃতি পাবার উপায় যেমন সহজেই নির্দ্ধারণ করা যায় তেমনি ভয়কে অকারণ আস্কারা দিলে মানুষ প্রয়োজনের সময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

এমনি করে রসিকতা, বুদ্ধি, কান্ডজ্ঞান, স্মৃতি, বিস্মৃতি, স্নেহ, ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করে অসীমবাবু কয়েকটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বর্ত-মান নৈরাশ্যবাদ মূলক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অসীমবাবুর পুস্তকখানি পাঠকমহলে নূতন জীবনদর্শের পথ দেখাবে। প্রগতিবাদী কবি ও সাহিত্যিকদের একখানি অবশ্য পাঠ্য বই, প্রত্যেক পাঠকের ঘরে থাকা উচিত।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা-১

এখন পিলফার-প্রুফ ক্যাপযুক্ত শিশিতে
পাওয়া যায়
●ঝরঝরে লেখা হয়
●তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়
●সাবলীল গতিতে কালি নামে
রেনবো কালি
রেনবো ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
২।২ এ, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১
PERMANENT
Rainbow
THE QUALITY FOUNTAIN PEN
Ink

হিমানী
বিউটি পাউডার
রূপের জৌলুস বাড়ায়
স্বচ্ছ আবরণের মত মুখশ্রীকে আবহাওয়ার রুক্ষতা ও ময়লার হাত থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন সূক্ষ্ম "শেড"-এ পাওয়া যায়
Himani
IPM
HIMANI PRIVATE LTD-CALCUTTA-2

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

শারদীয় শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

নবম বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৬৮

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
সবুজ
LUX
Pink
গোলাপী
LUX
নীল
LUX
হলুদ
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন ! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
মোড়কে—সাদাটিও রয়েছে । প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
রক্ষায় যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন ।
LUX
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

নবম বর্ষ। ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ফ্রীড্‌রিখ ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ফ্রেড্‌রিখ ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আন্‌হাল্ট রাজ্যের রাজধানী ডেসাউ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই নগরী পূর্ব জার্মানি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ম্যাক্সমুল্যারের পিতা উইল্‌হেলম্‌ স্থানীয় ডিউকের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি জার্মাণ ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করেন। ম্যাক্সমুল্যারের মাতা স্থানীয় একজন উচ্চস্থানীয় রাজপুরুষের দুহিতা ছিলেন। ম্যাক্সমুল্যারের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তখন তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে উইলহেল্‌মের মৃত্যুর পর আন্‌হাল্টের ডিউক মুল্যার্‌ পরিবারের জন্য সামান্য কিছু ভাতার ব্যবস্থা করেন। সঞ্চিত অর্থ না থাকায় এই সামান্য ভাতা হইতেই মুল্যার্‌ বিশেষ মেধার পরিচয় দেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। একসময়ে ম্যাক্সমুল্যার্‌ গায়ক হিসাবেই জীবিকার্জন করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু একজন শুভানুধ্যায়ী সংগীতজ্ঞের পরামর্শে তিনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌ লাইপ্‌জিগ্‌ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তিনি লাইপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ঠ হন। বাল্যকাল হইতেই মুল্যারের ভাষা শিক্ষার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা সমূহ (গ্রীক্‌, ল্যাটিন) অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করেন। এই সময়ে লাইপ্‌জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারমান ব্রুক হাউসের নির্বন্ধাতিশয্যে ম্যাক্স্‌মুল্যার অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট" উপাধি লাভ করেন। মুল্যারের বিধবা জননী বহুকষ্টে ও যত্নে একমাত্র পুত্রকে শিক্ষাদান করেন। "ডক্টরের" মাতা রূপে তিনি যে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। পি-এইচ-ডি উপাধিলাভের অল্পকাল পরেই ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌ বিষ্ণু শর্মা রচিত "হিতোপদেশ" জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (লাইপ্‌জিগ্‌ ১৮৪৪)।

অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ম্যাক্সমূল্লার্ বার্লিনে আসেন। বার্লিনে তিনি বোপের নিকট সংস্কৃত ও দার্শনিক শিলিং এর নিকট দর্শন পড়িতে থাকেন। উত্তরজীবনে ম্যাক্সমূল্লার্ দর্শন বিশেষতঃ হিন্দুদর্শনে যে দক্ষতা অর্জন করেন তাহার মূলে ছিল দার্শনিক শিলিংএর নিকট দর্শন অধ্যয়ন। অপর দিকে ভাষা বিজ্ঞানী বোপের নিকট তিনি তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা লাভ করেন। এক বৎসর পর ম্যাক্সমূল্লার্ প্যারিসে আসিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বর্ণুফের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বর্ণুফ এই তরুণ শিষ্যের সংস্কৃতানুরাগ ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সায়ণ ভাষ্য সহ-ঋগ্বেদের সম্পাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করেন। বুর্ণুফের এই প্রেরণা ম্যাক্সমূল্লারের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। আচার্যের এই আদেশ রক্ষার জন্য ম্যাক্সমূল্লার্ সঙ্কল্প বদ্ধ হন। অতঃপর ম্যাক্সমূল্লার্ প্যারিসে ঋগ্বেদ ও সায়ণভাষ্যের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে থাকেন কারণ পুঁথি ক্রয় করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না—এবং ক্রয়যোগ্য পুঁথিও ছিল দুর্লভ। নিজের প্রয়োজনে পুঁথি নকল ছাড়াও ম্যাক্সমূল্লার্ অপর পণ্ডিতদের নানারূপ খুচরা কাজ করিয়া দিয়া যে অর্থ পাইতেন তাহাতেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহ হইতে সাহায্য লাভের আশায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংল্যাণ্ডে আসেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে প্রুসিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন ব্যারণ বুনসেন। প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী বুনসেন তাঁহার স্বদেশীয় এই তরুণ যুবকের পাণ্ডিত্যে সবিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্ হেমান্ উইলসনের চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ম্যাক্সমূল্লার্ সম্পাদিত ঋগ্বেদ প্রকাশের সমুদয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে সম্মত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালা হইতে ঋগ্বেদ মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্সমূল্লার্ লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড চলিয়া আসেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল বৃটিশ প্রজারূপে তিনি অক্সফোর্ডেই অতিবাহিত করেন। মূল্লারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মূল্লার্ জর্জিনা এডিলেইড্ নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহসূত্রে তিনি জে. এ. ফ্রড্, প্রসিদ্ধ লেখক কিংসলি, লর্ড উইলভারটন্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আত্মীয়রূপে লাভ করেন। মূল্লারের স্ত্রী অতিশয় সাধ্বী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই বৎসরই ম্যাক্সমূল্লারকৃত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয় (হিষ্ট্রি অফ্ এনশিয়েন্ট্ স্যানস্ক্রিট্ লিটারেচর ১৮৫৯)। শুধু মাত্র বৈদিক কালের সাহিত্যই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছিল, আলোচিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই ছিল এ যাবৎ অপ্রকাশিত। আলোচিত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয় ছিল এই পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের সংস্কৃতাধ্যাপক হোরেস্ হেমান্ উইলসন্ পরলোক গমন করেন। ম্যাক্সমূল্লার্ ও সার মনিয়ার উইলিয়ামস্ এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী এবং জাতিতে জার্মান এই কারণে ম্যাক্সমূল্লার্ এই পদ লাভ করিতে পারেন নাই। এই নির্বাচন ভোটদ্বারা করা হয়। ইংরাজ পাদ্রীগণ দলবদ্ধ ভাবে এই জার্মান পণ্ডিতের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কিশোরকাল হইতেই ম্যাক্সমূল্লার্ সংস্কৃত ভাষার নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন, সংস্কৃতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই জন্য সংস্কৃত অধ্যাপনার সুযোগ লাভ তাঁহার

পক্ষে অতিশয় কাঙ্খনীয় ছিল। এই পদ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় ম্যাক্স্‌মূল্যার্‌ সাতিশয় মনোবেদনা ভোগ করেন। যাহা হউক ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (কম্পারেটিভ্‌ ফিলোলজি) বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপন পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। এ যাবৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। জীবনান্তকাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডের তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন, অবশ্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পরে আর ক্লাসে অধ্যা-পনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৮৬১-৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল্লার্‌ কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডে বিশেষ কোন চর্চা হয় নাই, ম্যাক্স্‌মূল্লারের বক্তৃতাগুলি সবিশেষ আদৃত হয় ও ভাষা বিজ্ঞানের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইংল্যাণ্ডে ও ইংরাজী ভাষায় ম্যাক্স্‌মূল্লারকে ভাষা বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষা তত্ত্ব চর্চার প্রবর্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধও পুস্তক প্রকাশিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় (কেল্টিক্‌) ভাষা সমূহের সহিত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার ম্যাক্স্‌মূল্লারের জীবনের অন্যতম কীর্তি।

ভাষা বিজ্ঞানের ন্যায় তুলনামূলক ধর্ম (কম্পারেটিভ্‌ রিলিজন্‌) ও বিভিন্ন জাতির পুরাণ কথা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা (কম্পারেটিভ মাইথোলজি) বিষয়েও ম্যাক্সমূল্লার্‌ ছিলেন পথিকৃৎ। তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ম্যাক্স্‌মূল্যার্‌ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা দেন ও পুস্তক রচনা করেন (গিফোর্ড লেকচারস্‌ ১৮৮৮-৯২ হিবার্ট লেকচারস্‌;-১৮৭৮, সায়েন্স অফ্‌ রিলিজন্‌, ১৮৭৩ প্রভৃতি)

ম্যাক্স্‌মূল্লার্‌ সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসে সায়ণাচার্যের ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদের প্রকাশ একটি অতি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিখ্‌ রোজেন নামে এক জার্মান পণ্ডিত ঋগ্বেদের মোট আটটি অষ্টকের মধ্যে প্রথম অষ্টক মাত্র প্রকাশ করেন। রোজেনের অকাল মৃত্যুতে এই শুভ উদ্যোগ অংকুরেই বিনিষ্ট হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মূল্লার্‌ সম্পাদিত ঋগ্বেদের শেষ ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ঋগ্বেদ সম্পাদনের কাজে ম্যাক্সমূল্যারের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় (প্রায় বিশ বৎসর) গুরুতর পরিশ্রমে ব্যয়িত হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে ঋগ্বেদ প্রকাশের ভার লইয়া ম্যাক্সমূল্লার্‌ প্রকাশক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রচুর অর্থলাভ করেন। ম্যাক্সমূল্লার্‌ স্বয়ং এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনার্থে লিখিয়াছেন যে তিনি এই কাজে যে পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন তাহা ইণ্ডিয়া অফিসের নিম্নতম বেতনের করণিকের পক্ষেও অনুপযুক্ত ছিল। যাহা হউক ঋগ্বেদের সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঋগ্বেদ মুদ্রণ দ্বারা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই। মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের দ্বিগুণ অর্থ মুদ্রিত ঋগ্বেদ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

প্রায় চারিসহস্র বৎসর পূর্বে রচিত মানবজাতির আদিমতম ধর্ম গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশে শুধু ভারতবর্ষ উপকৃত হয় নাই, সমগ্র সভ্য জগত ইহা দ্বারা উপকৃত হয়। ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য প্রতীচ্যে ম্যাক্সমূল্লারই প্রথম প্রচার করেন। বহু পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদ সংহিতা রচনার কাল ও ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ম্যাক্সমূল্লার্‌ কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সর্বজন গ্রাহ্য না হইলেও প্রাথমিক আলোচনারূপে মূল্যবান। সত্য নির্ণয়ে ইহা প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

ভারতবর্ষে ম্যাক্সমুলারের ঋগ্বেদ পৌঁছিলে একদল ধর্মান্ধ ব্যক্তি ম্লেচ্ছের দ্বারা সম্পাদিত এই হেতু এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন কিন্তু ইহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিছুকাল পরে নৈষ্ঠিক সংস্কৃত পণ্ডিতদের দুর্গ স্বরূপ পুণা নগরীতে দেখা যায় যে একজন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের ঋগ্বেদ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া যাইতেছেন এবং অপর পণ্ডিতেরা ম্যাক্সমুলারের পাঠ অনুযায়ী নিজ নিজ অশুদ্ধ পুঁথি সংশোধন করিয়া লইতেছেন। ম্যাক্সমুলার নানা স্থানের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পাঠ, ভেদ, বিচার ও বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ পাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া উহা মুদ্রাঙ্কণ করান, সায়ণভাষ্য সম্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। ম্যাক্সমুলার নিজে ভারতবর্ষ হইতে ৮০ খানি বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করেন।

সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ প্রকাশ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জগদ্ব্যাপী 'চাহিদা'র জন্য ঋগ্বেদ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কোনও কোনও খণ্ড কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিতেন—সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়। ভারতের বিজয় নগরের মহরাজা সার পশুপতি আনন্দ গজপতিরাজ তাঁহার ইংল্যাণ্ডস্থিত প্রতিনিধির মারফৎ সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ সংগ্রহে বিফল মনোরথ হইয়া ম্যাক্সমুলারকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন যে ঋগ্বেদ যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন কেন উহা পুনর্মুদ্রিত হইতেছে না। ম্যাক্সমুলার মহারাজাকে জানান যে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই সময় ভারত-শাসন ভার ইংল্যাণ্ডের রাণী গ্রহণ করিয়াছিলেন) ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড মাত্র ছাপাইতে চান, বাকী খণ্ড গুলির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাঁহারা অপব্যয় মনে করেন, সমগ্র খণ্ড গুলি প্রকাশের ব্যবস্থা না হইলে মাত্র একখণ্ড প্রকাশে তিনি উৎসাহী নহেন। বিজয়নগরের মহারাজা ঋগ্বেদের সমগ্র খণ্ডগুলি এমন কি ম্যাক্সমুলারের সহকারী ইত্যাদির বেতনের ভার বহন করিতে সম্মত হইলে ম্যাক্সমুলার ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে চারিখণ্ডে তাঁহার ঋগ্বেদের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালা হইতে প্রকাশিত হয়। এখানে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে এইসময়ে পুণা নগরী হইতেও ঋগ্বেদের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার সপ্ততিতমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয় শিষ্য তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ ডাঃ উইণ্টারনিৎজ তাঁহকে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজে সহায়তা করেন। এই সংস্করণটি প্রকাশ করিতে বিজয়নগরের মহারাজা প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঋগ্বেদের শ্রেষ্ঠ টিকাকার সায়ণাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অনতিকাল পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমুলার "সেক্রেড্ বুকস্ অফ্ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার পরিকল্পনা ও সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। প্রাচ্যের সমুদয় ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞ কুড়ি জন পণ্ডিত (ম্যাক্সমুলার সহ) কর্তৃক অনুদিত হইয়া এই গ্রন্থমালার এক একটি খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালার ৫১টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৪৮টি খণ্ড ম্যাক্সমুলারের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। বাকী ১ খণ্ড পুস্তক ও দুইখণ্ড নির্ঘণ্ট ম্যাক্সমুলারের মৃত্যুরপর প্রকাশিত হইলে এই গ্রন্থমালা প্রকাশ সুসম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থমালার ৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২৯ খানি ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণ্যধর্ম

সম্পর্কীয়, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে দশ ও দুই, অর্থাৎ মোট ৩৩ খানি গ্রন্থই ছিল ভারত সম্পর্কিত। বাকী গ্রন্থগুলি ছিল পারসিক, ইসলাম ও চৈনিক ধর্ম সংক্রান্ত।

এই গ্রন্থমালার তিনটি সম্পূর্ণ খণ্ড ম্যাক্সমূল্লারের স্বকৃত অনুবাদ, আর দুইটি খণ্ড আংশিক ভাবে তিনিই অনুবাদ করেন। ম্যাক্সমূল্লার অনূদিত দুইখণ্ড "দি উপনিষদস্" এই গ্রন্থমালার প্রথম ও পঞ্চদশ খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমখণ্ড ছান্দোগ্য, তলবকার, ঐতরেয় আরণ্যক, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ এলং বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ খণ্ডে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বেতর প্রশ্ন ও মৈত্রায়নের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। দুই খণ্ডেই অনূদিত উপনিষদ্‌গুলি সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যাক্স্‌মূল্লারের নিজস্ব ভূমিকা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থমালার দ্বি-ত্রিংশ খণ্ডটির নাম ছিল "দি বেডিক্ হিম্"। ইহাতে মারুত, রুদ্র, বায়ু ও বাত সম্বন্ধীয় সূক্তগুলি ম্যাক্সমূল্লার্ কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। সর্বপ্রধান বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধম্মপদ' ও পালি হইতে ম্যাক্সমূল্লারের দ্বারা অনূদিত হইয়া এই গ্রন্থমালার ১০ম খণ্ডের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সুখাবতী ব্যূহ, বজ্রচ্ছেদিকা ও প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্রের ম্যাক্সমূল্লারকৃত অনুবাদ এই গ্রন্থমালার ঊন-পঞ্চাশতম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয়। আপস্তম্ব ও যজ্ঞপরিভাষা সূত্র নামে স্মৃতি গ্রন্থের ম্যাক্সমূল্লার্ কৃত অনুবাদ গ্রন্থমালার ত্রিংশখণ্ডের দ্বিতীয়ভাগ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ম্যাক্স্‌মূল্লার্ ইংলণ্ডে ও ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক ধর্ম শাস্ত্রের প্রবর্তক ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। "সেক্রেড্ বুকস্ অব্ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার সম্পাদন দ্বারা তিনি বিশ্ব বিদ্যার এই শাখাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক মিলন স্থিতধী মনুষ্য মাত্রেরই ঈপ্সিত, শতাব্দী কালপূর্বে মনীষী ম্যাক্সমূল্লার্ এই গ্রন্থমালা প্রবর্তন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পারস্পরিক হৃদ্যতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্স্‌মূল্লার্ জীবনে যদি আর কিছুও না করিতেন তথাপিও "সেক্রেড্ বুকস্ অব্ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার অক্লান্ত কর্মা সম্পাদকরূপে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মূল্লার্ কতকগুলি বক্তৃতা দেন, এই বক্তৃতামালা "ইণ্ডিয়া হোয়াট্ ক্যান্ ইট্ টিচ্ আস্" নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূল্লারের ধারনা কি ছিল তাহা বুঝা যাইবে—

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty of nature can bestow, in some parts a very paradise on earth I should point out to India. If I were to ask under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts. has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of these who have studied. plato and kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature, we here in Europe, we who have been nurtured almost excllusively at the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semite race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universe, in fact more truly human, a life. not for this life only, but a transfigured and eternal

life—again I should point to India." (India What Can It Teach Us)

যৌবন কাল হইতেই ম্যাক্সমূলার দর্শনের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। যৌবনের এই দর্শনানুরাগ লইয়া তিনি হিন্দু দর্শন বিশেষভাবে বেদান্ত অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (লেকচারস্ অন্ ভেডাণ্ট্ ফিলজফি—১৮৯৪)। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সিক্স্ সিস্টেমস্ অফ্ ইণ্ডিয়ান্ ফিলজফি নামক ৬০০ পৃষ্ঠা সমন্বিত বিরাট পুস্তকে তিনি হিন্দুর ষড়দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্রম বিকাশ আলোচনা করিয়া তিনি দেখান কি ভাবে ভারতীয় দর্শন ভারতীয় জাতির জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলার রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (রামকৃষ্ণ-হিজ্ লাইফ্ য়্যাণ্ড সেইংস্)। এই পুস্তকে রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে রামকৃষ্ণ উচ্চারিত উচ্চ ভাবধারা যে দেশের জনচিত্তে প্রবাহিত সেই দেশবাসিকে পৌত্তলিক জ্ঞানে মধ্য-আফ্রিকার লোকদের ন্যায় ধর্মান্তর গ্রহণ করানো যুক্তি যুক্ত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে ম্যাক্সমূলার ভারতে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে বেদান্তকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলে কি পরিমাণে পবিত্রতা, সারল্য ও নিঃস্বার্থপরতা প্রতিফলিত করিতে পারা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পুস্তক রচনার পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ অক্সফোর্ডে মূলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বেই কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নিকট ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হন। স্বয়ং সুপণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্সমূলারের ভারত বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা ও মানসিক শক্তি দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়া যান। ম্যাক্সমূলারের ভারতানুরাগ সম্বন্ধে স্বামীজি লিখিয়াছেন যে "ম্যাক্সমূলার ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালবাসেন আমি আমার মাতৃভূমিকে তাহার শতাংশ ভাগ ভালবাসিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম (ইংরাজী হইতে অনূদিত)।" শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে ম্যাক্সমূলার বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারেন যে বেদান্ত প্রচার দ্বারা তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতেছেন তখন ম্যাক্সমূলার বিশেষ হৃষ্ট হন। স্বামীজি যে রাত্রে অক্সফোর্ড ত্যাগ করেন সে রাত্রে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও বৃদ্ধ ম্যাক্সমূলার স্বামীজিকে বিদায় জানাইতে ষ্টেশনে উপস্থিত হন। বিবেকানন্দ ইহাতে দুঃখ প্রকাশ ও অনুযোগ করিলে ম্যাক্সমূলার তাঁহাকে বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যের দর্শন ত প্রত্যহ পাওয়া যাইবে না তাই তিনি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অপেক্ষা ম্যাক্সমূলারের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর অধিক ছিল।

ম্যাক্সমূলারের সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভারত বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদের এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। এই সব পণ্ডিতেরা ভারত বিদ্যা প্রেমিক ছিলেন, ইহারা প্রায়ই ভারত-প্রেমিক ছিলেন না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সব পণ্ডিতদের শবদেহ ব্যবচ্ছেদকের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"তাঁহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিপ্রদ হয় তাহা বলিতে পারিনা। আচার্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক শবদেহ ভাবিতেন না। অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলির মধ্যে এককালে রক্ত

প্রবাহ সঞ্চালিত হইত এবং ইহার হৃৎপিণ্ড এককালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন, এবং বাক্যের ও কার্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ" (অধ্যাপক মক্ষ-মুলের, চরিত-কথা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)। ম্যাক্সমুল্যার্‌ শুধু প্রাচীন ভারত নহে নবীন ভারতকেও ভালবাসিতেন। সমসাময়িক বহু ভারতবাসির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তিনি পরিচিত হন। বহুবর্ষ পরে দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিতও লণ্ডনে তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হয়। কবিগুরুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ম্যাক্সমুল্যার্‌কে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে পত্রালাপও চলিত। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের সহিত ম্যাক্সমুল্যারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শেষ জীবনে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার ভূতপূর্ব অনুগামিবৃন্দ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হওয়াতে ম্যাক্সমুল্যার্‌ বেদনা বোধ করেন। কেশব চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বধে ম্যাক্সমুল্যার্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে "দোষ ত্রুটি সত্বেও কেশব ভারতের একজন মহান পুরুষ, মানব জাতির একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবেও তাঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে (মর্মানুবাদ)।"

"আউল্ড ল্যাঙ্গ সেইন" নামীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯৯) "আমার ভারতীয় বন্ধুগণ" শিরোনামায় ম্যাক্সমুল্যার্‌ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, নীলকণ্ঠ গোরে, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে ম্যাক্সমুল্যার্‌ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে রাজার পঞ্চাশত্তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া ম্যাক্সমুল্যার্‌ নিজেকে রাজার একজন অকপট অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ভাষণটি তাঁহার রচিত "বায়োগ্রাফিকেল এসে্‌স্‌" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থিদের নিকট তিনি ভারতবাসির সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন যে ইংল্যাণ্ড হইতে যাঁহারা ভারতে যান তাঁহারা ভারতবাসিরা যে মিথ্যাবাদী ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লন। এইরূপ অন্যায় ধারণা রাখা উচিত নহে। ইংল্যাণ্ডে যাঁহারা ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করেন তাঁহারা ম্যাক্সমুল্যারের এই মন্তব্যে খুবই অসন্তুষ্ট ও বিব্রত বোধ করেন। ম্যাক্সমুল্যারকে অপদস্থ করিতে ইহাঁরা সততই প্রয়াস পাইতেন। ম্যাক্সমুল্যারের ভারত ভ্রমণ ইহাঁদের অভিপ্রেত ছিলনা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ম্যাক্সমুল্যারের ভারতভ্রমণের কথা উঠিয়াছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। এই ঘটনার পশ্চাতে যে ভারত বিদ্বেষিদের হাত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্যাক্সমুল্যার্‌ নিজে এই ঘটনায় ব্যথিত হন নাই। তিনি বলিতেন যে ভারতের যে চিন্ময় রূপ তাঁহার মনে অঙ্কিত আছে তাঁহার সহিত বাস্তব ভারতের কোনরূপ বৈষম্য দেখিলে তিনি মনে নিরতিশয় বেদনা পাইবেন—এইজন্য তিনি ভারত ভ্রমণে উৎসাহী নহেন। অক্সফোর্ডে সংস্কৃত পুস্তকাকীর্ণ তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষটি দেখাইয়া তিনি বলিতেন যে ওই কক্ষে বসিয়া সংস্কৃত চর্চা করিতে করিতে তিনি বারাণসী বাসের আনন্দ উপভোগ করেন। ম্যাক্সমুল্যারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিপুল পুস্তক সংগ্রহ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ক্রীত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার কারা-মুক্তির জন্য ইংল্যাণ্ডে যে আন্দোলন হয় ম্যাক্সমুল্যার্‌ তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ফলে তিলক মহারাজ কারামুক্ত হন। ইতিপূর্বে তিনি কারারুদ্ধ তিলককে পাঠের

জন্য নিজ সম্পাদিত ঋগ্বেদ উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

শ্বেতকায় অপরাধিদের বিচার কোন কৃষ্ণকায় ভারতীয় বিচারকের দ্বারা করানো যাইবে না ভারতে তদানীন্তন কালে প্রচলিত এই বৈষম্যমূলক আইনটি তুলিয়া দিবার জন্য লর্ড রিপনের সময়ে সরকারী ভাবে একটি বিল উপস্থিত করা হয়। ইহার নাম ইলবার্ট বিল। এদেশের ও ইংল্যাণ্ডের শ্বেতকায়দের মধ্যে ইহাতে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই সময়ে ম্যাক্সমূল্যার সুপ্রসিদ্ধ "টাইমস্" পত্রিকায় এই বিলের সমর্থন করিয়া এক পত্র লেখেন। দেখা যাইতেছে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ভারত বিদ্বেষিরা ম্যাক্সমূল্লরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের ঊষাকালে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ ও তাহার মহিমা কীর্তন দ্বারা ম্যাক্সমূল্যার এই আন্দোলনকে প্রেরণা দান করেন। ভারতবাসী ম্যাক্স-মূল্যারের অক্লান্ত প্রচারে আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া পায়। অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা জাতীয় জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। ম্যাক্সমূল্যারের মৃত্যুর পর মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় ভারতের জাতীয় জাগরণে ম্যাক্সমূল্যারের রচনাবলির প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

ম্যাক্সমূল্যারের এই সুগভীর ভারত প্রেমের প্রতিদান দিতে ভারতবাসী কার্পণ্য করে নাই। "ম্লেচ্ছ" ম্যাক্সমূল্যার ভারতবাসির নিকট "ভট্ট মোক্ষ মূলর" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদের আখ্যা পত্রে (টাইটেল পেজে) "ভট্ট মোক্ষমূলর" নামটিই ব্যবহৃত হইয়াছে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি শব্দকল্পদ্রুম সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব ম্যাক্সমূল্যারকে কলিযুগের বেদব্যাস বলিয়া অভিহিত করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাক্সমূল্যারের পি এইচ ডি উপাধি প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এই উপলক্ষ্যে ম্যাক্স-মূল্যার বহু অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে স্বাক্ষর কারিদের নামের তালিকা এত দীর্ঘ হয় যে উহা পরে প্রেরণ করিতে হয়। ভারতের সর্বধর্মের পণ্ডিতেরা মিলিতভাবে যে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন উহাই ম্যাক্সমূল্যারকে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দিয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাখালচন্দ্র সেন নামে কলিকাতার একজন কবিরাজ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রচুর 'বিদায়' দেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমূল্যারকেও এই উপ-লক্ষ্যে তিনি ধুতি চাদর 'বিদায়' স্বরূপ প্রেরণ করেন। আরও কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ম্যাক্সমূল্যার শ্রাদ্ধের 'বিদায়' হিসাবে রেশমীবস্ত্র, ধাতু-কলম প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। তিনি এই গুলি গর্ব ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ম্যাক্সমূল্যার গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহার রোগমুক্তি কামনা করিয়া মাদ্রাজের একটি মন্দিরে তাঁহার অনুরাগিবৃন্দ কর্তৃক পূজা দেওয়া হয়। অহিন্দুর কল্যাণার্থে পূজা দিতে মন্দিরের পূজারী প্রথমে সম্মত হন নাই। ম্যাক্সমূল্যারের বেদপারঙ্গমতার কথা অবগত হইয়া পূজারী সানন্দে দেবতার নিকট ম্যাক্সমূল্যারের রোগমুক্তি কামনা করিয়া পূজা দেন। আশ্চর্যের বিষয় এই বার ম্যাক্সমূল্লর মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পান। ম্যাক্সমূল্যারের গুরুতর পীড়ার সংবাদে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল্ কংগ্রেস) ইংল্যাণ্ড স্থিত শাখা এই ভারতবন্ধুর পীড়ায় গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন ও তাঁহার আশুরোগমুক্তি কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে ম্যাক্সমূল্যারের প্রতি ভারতবাসির গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার সুসন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার অনূদিত ইংরাজী রামায়ণ ম্যাক্সমূল্যা-রের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ভারত বিদ্যাবিদ্‌ রূপে প্রধানতঃ পরিচিত হইলেও ম্যাক্সমুল্লার প্রকৃত পক্ষে ছিলেন অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ভাষা বিজ্ঞান, তুলনা মূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি হিতোপদেশ, কালিদাসের মেঘদূত, ধর্মপদ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি দার্শনিক কান্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ক্রিটিক্‌ অব্‌ পিওর রিজন" ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। এইগুলি ছাড়াও তিনি নানা বিষয়ে আরও কয়েকটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মুল্লারের অধিকাংশ রচনাই ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় যদিও ইহা ছিল তাহার পক্ষে বিদেশী ভাষা।

দুঃখের বিষয় একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রচনার নানাস্থানে ম্যাক্সমুল্লারের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি ম্যাক্সমুল্লারের ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রকে ম্যাক্সমুল্লার দূষণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। ম্যাক্সমুল্লার জাতিতে ইউরোপীয় ছিলেন কাজেই তাঁহার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁহার নিন্দা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও এই ইউরোপীয় মানসিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন ইহা বলা যায়না। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস বেদ অপৌরুষের, ইহা কাহারও দ্বারা রচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, নিশ্চয়ই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্রের ম্যাক্সমুল্লার-সমালোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুধীবর ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় একটি ভাষণে বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিরা এই সব পণ্ডিতদের মতামত নির্বিচারে মানিয়া লইত, ইহাতে তিনি বিরক্তি বোধ করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণভাবে যে সমালোচনা তথাকথিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাপ্য ছিল ম্যাক্সমুল্লারের উপর তাহাই প্রযুক্ত হইয়াছিল (কলিকাতাস্থিত ম্যাক্সমুল্লার ভবনে ১৮-১-৬১ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষের মর্মার্থ)।

ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্সমুল্লার সাতিশয় উদারহৃদয়, বন্ধু ও স্বজন বৎসল ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রীতি-মধুর থাকিত। কার্যব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে বাস করিতে হইলেও তিনি সর্বদাই তাঁহার স্বদেশস্থিতা জননীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সুবিধা পাইলেই স্বদেশে গিয়া জননীর চরণ দর্শন করিয়া আসিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়েন। সহযোগী পণ্ডিতদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে ও আবশ্যকমত উপদেশাদি দিতে ম্যাক্সমুল্লার সদাই তৎপর থাকিতেন। সাংসারিক ব্যাপারেও প্রয়োজন হইলেই তিনি তাঁহাদের সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইত। ম্যাক্সমুল্লার যদিও নিছক সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন না তবু ও তিনি সর্বদাই ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করিতেন। অক্সফোর্ড আগত তিনজন জাপানী ছাত্রকে তিনি ভারতবিদ্যা তথা সংস্কৃত চর্চায় দীক্ষা দেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন বুনিও নানজিও কয়েকশত চীনভাষান্তরিত সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। এইগুলি খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরও কয়েকশতক পর্যন্ত সংস্কৃত হইতে চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়জন—কেনিও কাসাউরা সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থগুলির পরিভাষা সঙ্কলন করেন। এই পরিভাষাগুলি অধ্যাপক ম্যাক্সমুল্লার প্রবর্তিত "য়্যানেকডোটা অক্সনিয়নসিয়া" গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তৃতীয় জন চীন হইতে খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভ্রমণকারী ই-সিং এর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ম্যাক্সমুল্লারের চেষ্টায় তাঁহার একজন শিষ্য জাপান হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে

একটি সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেন (প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র)। ইহা জাপানের একটি মন্দিরে খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। তালপত্রে দুইখণ্ডে লিখিত এই পুঁথি ষষ্ঠশতাব্দীরও পূর্বে ভারতে লিখিত হয়। ভারত হইতে চীনের মধ্য দিয়া এই পুঁথি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোনরূপে জাপানে গিয়া পেীছিয়াছিল।

পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্সমূলারকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স কনসর্ট, জার্মান সম্রাট ফ্রেড্‌রিখ্, সুইডেন ও রুমানিয়ার রাজা, তুরস্কের সুলতান প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্বের বহু বরেণ্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। প্রুশিয়া ও ইটালির সরকার তাঁহাকে "নাইট" উপাধি দেন। সুইডেন, ফ্রান্স, ব্যাভেরিয়া ও তুরস্কের সরকার ও তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারকে "প্রিভি কাউন্সিলার" নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন যদিও সাধারণতঃ উচ্চস্তরের রাজনীতিজ্ঞেরাই এই সম্মান পাইয়া থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের নবম অধিবেশনে ম্যাক্সমূলার্ সভাপতিত্ব করেন (ইণ্টার ন্যাশনাল কংগ্রেস অব্ ওরিয়েণ্টেলিষ্টস্)।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর অক্সফোর্ডে মনীষী ম্যাক্সমূলার্ পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। স্থানীয় সেন্ট্ মেরী গির্জার হোলিওয়েল্ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। ম্যাক্সমূলারের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ম্যাক্সমূলারের অন্যতম সুহৃদ বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত বেরহামজী মালাবারী তদীয় সহধর্মিণীর নিকট শোকসূচক একটি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই তারবার্তায় বলা হয় "আপনার শোকে সমগ্র ভারতবর্ষও শোকমগ্ন।" ভারতীয় পণ্ডিতের এই সংক্ষিপ্ত শোকবার্তাটিতে সমগ্র ভারতেরই মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

রবীন্দ্র অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

ইতিহাস—১৩৬২ সালের ২২শে শ্রাবণ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি একত্র করে প্রকাশ করেন। লোক শিক্ষা গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ১২৮৪ সাল থেকে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত লেখা ইতিহাস-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি একত্র গ্রথিত হয়েছে। বালক, ভারতী, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, ঐতিহাসিক চিত্র প্রবাসী এবং শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলি প্রকাশের কাল এবং পত্রিকার নাম গ্রন্থের সূচী অনুযায়ী দেওয়া হলো—

ভারতবর্ষের ইতিহাস	বঙ্গদর্শন	ভাদ্র ১৩০৯
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী	বৈশাখ ১৩১৯
শিবাজী ও মারাঠী জাতি		
শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ	প্রবাসী	চৈত্র ১৩১৬
ভারত-ইতিহাস চর্চা	শান্তিনিকেতন	চৈত্র ১৩২৬
কাজের লোক কে	বালক	বৈশাখ ১২৯২
বীর গুরু	বালক	শ্রাবণ ১২৯২
শিখ স্বাধীনতা	বালক	আশ্বিন ও কার্তিক ১২৯২
ঝান্সীর রাণী	ভারতী	অগ্রহায়ণ ১২৮৪
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ	ভারতী	বৈশাখ ১৩০৫
সিরাজদ্দৌলা (১)	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
সিরাজদ্দৌলা (২)	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
ঐতিহাসিক চিত্র	ভারতী	ভাদ্র ১৩০৫
ঐতিহাসিক চিত্র-সূচনা	ঐতিহাসিক চিত্র	জানুয়ারী ১৮৯৯
গ্রন্থ সমালোচনা—		
	তিবৃত্ত ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী	ভারতী	শ্রাবণ ১৩০৫
৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস	ভারতী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
৪) ইতিহাস কথা	ভাণ্ডার	আষাঢ় ১৩১২

ইতিহাসের নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ শুধু ইতিহাস গ্রন্থই নয়; কথা, কাহিনী, কথাও কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাসের বহু কাহিনী কাব্যরূপ লাভ করেছে। ইতিহাসকে তিনি কেবল ঘটনা ও তারিখের সমষ্টি হিসাবে দেখেন নি। ভারতের ইতিহাসে বহু ভাষা বহু রাজত্বের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, মারামারি করেছে, নিজের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এনেছে। কিন্তু ইতিহাসপাঠের এই গতানুগতিক দৃষ্টি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের একটি নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শেখালেন। নানা বিরোধ ও বিচ্ছেদের মধ্যে তিনি দেখলেন 'বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রাগ অন্তরতররূপে উপলব্ধি করাই ভারতবর্ষের যথার্থ সার্থকতা; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই সার্থকতার ইতিহাস। নানা বিষয়ের আলোচনা করলেও ঐ মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সামনে ধরে রেখেছেন।

ইতিহাসের আলোচনায় সত্যসন্ধানী লেখকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কি পরিমাণ

শ্রদ্ধাবিজড়িত তা ইতিহাস গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি পড়লেই বোঝা যাবে। বিজ্ঞান-সাধনায় তিনি যেমন জগদীশচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ইতিহাস চর্চায় তেমনি। অক্ষয়কুমার মৈত্রয়কে উৎসাহিত করে-ছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধ তার সাক্ষ্য দেবে। অক্ষয় মৈত্রেয় যেদিন ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশ করতে স্থির করলেন তখন তার সূচনার প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে লিখতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চর্চা সম্বন্ধে অক্ষয় মৈত্রেয় কি অভিমত পোষণ করতেন তা এই উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকেই বোঝা যাবে—"শ্রাবণের ভারতী পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের ইতিহাসের সমালোচনায় এবং প্রসঙ্গ কথায় এবার ভারতী সম্পাদক ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বাংলা সাময়িকপত্রের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে; এমন সুচিন্তা-প্রসূত প্রবন্ধ বাংলা সাময়িকপত্রে সর্বদা প্রকটিত হইলে আমাদের সাময়িক সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা স্বতঃই আকৃষ্ট হইবে। আপনি ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার যোগ্যপাত্র বলিয়াই সে ভার আপনাকে দিয়াছি, এখন আর বলিতে পারিবেন না যে আমি সে গান গাহিতে শিখি নাই। আপনার প্রবন্ধ না পাইলে কার্যারম্ভ হইবে না।"

ইতিহাসের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই তিনটি গ্রন্থ সমালোচনা।

ইংরাজি পাঠ—শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বালকদের জন্য কবি লিখলেন ইংরাজি পাঠ। প্রকাশকাল ১৯০৯ খৃঃ (১০ সেপ্টেম্বর)। রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয় খণ্ড আর বেরোয়নি।

সবশুদ্ধ আঠারোটি পাঠ আছে। ছোট ছোট ছোট ইংরাজি বাক্য এবং ছোট ছোট বাংলা বাক্য দেওয়া আছে স্পষ্টতঃই ভাষান্তরের উদ্দেশ্যে। মধ্যে মধ্যে দুই এক পংক্তিতে ব্যাকরণগত নির্দেশ দেওয়া আছে। **ইংরাজি প্রতিশিক্ষা**—১৯০৯ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিও রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি শিক্ষাদানের সরল পদ্ধতির প্রমাণ। ১৯০৪ সালে ইংরাজি সোপান প্রকাশিত হয়। ইংরাজি সোপানের ১ম খণ্ডের ৩য় সংস্করণে বলা হচ্ছে—"প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের আরম্ভে যে অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা ইংরাজি শ্রুতিশিক্ষা নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিবেশিত হইয়াছে।"

অল্পবয়সের ছেলেদের ইংরাজি শেখানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কি পরিমাণ উৎসাহ ছিল এবং তার জন্য তাদের কানে ও জিহ্বায় কি করে ইংরাজি ভাষাটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে তাঁর চিন্তার গভীরতা এই ক্ষুদ্র চটি বইটিতে লক্ষ্য করা যাবে। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"ইংরাজী শিক্ষার্থী বালকেরা যখন অক্ষর-পরিচয়ে প্রবৃত্ত আছে সেই সময়ে কেবল কানে শুনাইয়া ও মুখে বলাইয়া তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া লইবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইখানে একথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে কোন পথ দিয়া ছেলেদের কানে এবং জিহ্বায় ইংরাজি ভাষাটা অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে আমরা এই গ্রন্থে তাহার আভাস দিয়াছি মাত্র।" এই গ্রন্থটিও বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্যই লেখা।

ইংরেজি সহজ শিক্ষা—১৩৩৬ সালে ইংরেজি সহজ শিক্ষা দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়—পৌষও চৈত্র মাসে। এই বইটি ১৯০৪ সালে লেখা ইংরাজী সোপানের পরিবর্ধিত সংস্করণ। ভূমিকায় লেখা আছে—"মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বারবার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে ইহাই লেখকের অভিপ্রায়। যে রীতি অনুসরণ করিয়া লেখক একদা কোন ছাত্রকে অল্পকালের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ইংরাজি শিখাইতে পারিয়াছিলেন এই গ্রন্থে সেই রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।" প্রথম সংস্ক-

রণের প্রথম ভাগের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ভুলক্রমে ১৩১৬ ছাপা হয়। ১৩৫৫ সালের বিশ্বভারতীর পুনরমুদ্রণেও ভুল সংশোধিত হয়নি।

ইংরাজি সোপান—ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষার জন্য রবীনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ইংরাজি সোপান। প্রথম প্রকাশ ৭ই মে ১৯০৪। ভূমিকায় কবি বলছেন—"কয়েক বৎসর বোলপুর বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া যেরূপ ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে অসঙ্কোচে এই গ্রন্থ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

কবি তখন মজঃফরপুরে বড় মেয়ে বেলাদেবীর কাছে। সেখান থেকে ইংরাজী সোপানের কপি পাঠিয়ে লিখছেন অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনকে—"ইংরাজি সোপানের কপি পাঠাচ্ছি। একবার revise করে নেবেন। অনেক জায়গায় যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া হয়নি, সেগুলি পূরণ করবেন Adverbগুলি ঠিক খাপ খায় কিনা দেখে নেবেন। কারণ, প্রথম লেখার পর sentenceগুলি স্থানে স্থানে বদল ও কমবেশি হয়ে গেছে—Adverbগুলির সেই অনুসারে পরিবর্তন হয়নি। পান্ডুলিপির যে যে অংশ মার্জিনে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে সেগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করে নেবেন। ইংরাজি সোপান প্রথমভাগে subject predicate সম্বন্ধে শিক্ষকদের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে আমার বোধহচ্ছে শিশু পাঠকদের পক্ষে সেটা ঠিক উপযোগী হয়নি—ওটা সমীর মতো ছেলেকে বোঝানো শক্ত। ইংরাজী সোপান ১ম ভাগ খুব ছোট ছেলেদের জন্যেই তো।"

ইংরাজি সোপানের সহজ শিক্ষা পদ্ধতির প্রশংসা করে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (তখন তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দেন সেটি দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে ভূমিকারূপে সংযুক্ত হয়। ইউনিভার্সিটি কমিশনের কাছে তিনি ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে ইংরাজী সোপানের শিক্ষা পদ্ধতির গভীর মিল ছিল। তিনি বলেছেলেন "the way in which English is taught in the lower classes is faulty in the extreme..The methods of otto, ollendorf and saner are real improvements on the old classical device of grammar grinding and written exercises....Constant and familiar use of certain simple forms of clauses and phrases, the sentence taken as the unit of speech rather than the word, the cooperation of the tongue and the ear in reciting page after page, these are the surest, the most rapid and the most powerful means of learning a foreign language".

রবীন্দ্রনাথকে আচার্য শীল চিঠিতে লিখলেন—"এইরূপ পুস্তক বাংলায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto,Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষাশিক্ষা পুস্তক প্রণেতাগণ এই প্রণালী কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজি শিক্ষার বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।"

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করেন। তাঁর ভূমিকায় বলছেন 'ইংরাজী সোপানের উপসত্ব বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দান করা হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থ অপরাপর বিদ্যালয়ে প্রচলিত ও সাধারণের নিকট আদৃত হয় তবে তদ্দ্বারা বোলপুর বিদ্যালয় সাহায্য লাভ করিবে। "

স্তাঁদাল ও সাহিত্যে বাস্তব রীতি

মনোজ রায়

১৮৩২-৩৩ এর প্যারী। রিউ রিচেলিউর শেষের দিককার অন্ধকারময় ঘরখানিতে স্তাঁদাল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস লিখে চলেছেন। টেবিলের দুধারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দুপুর হতে তিনি লিখে চলেছেন। দুপর কেটে রাত হয়ে গেলো, স্তাঁদালের লিখতে আর ভালো লাগলো না। তিনি উঠে পড়লেন। এ সময় একটু সাজগোজ করে বন্ধু মহলে মিশতে ভাল লাগে—মেয়েদের সংগে ভাব করতে আনন্দ লাগে। সাজ গোজ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে ওঠে ভারী দেহখানা তাঁর আরো ভারী হয়ে গিয়েছে। মোটা ঘাড়, বুলডগের মত মুখখানা থ্যাবড়া—নাক—মোটা লাল টকটকে। ঝাকড়া ভুরু-পা দুখানা ছোট—মনে হয় চলমান দুর্গ। "কসাই-এর মত" চেহারা এ চেহারায় কোন মেয়েই বা ভাব করতে আসবে! বয়স বেড়ে গিয়েছে, চেহারা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছে। নিরাশার সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে তিনি মুষড়ে পড়েন।

১৭৮৩ সনে গ্রেননোবেলে তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম ছিল। চিরুবিন বাইল। তাঁর নাম আঁরি মাঁরি বাইল। যে সময় তাঁর জন্ম হয়, তখন ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইয়ের রাজত্ব চলছে। বাবা তাঁর রাজতন্ত্রের ভক্ত। যখন তাঁর দশ বৎসর বয়স সে সময় চিরুবিন তাঁর পুত্রের কাছে লুইয়ের মৃত্যু সংবাদ এনে দেন। রাজতন্ত্রের অবসানে আঁরি বাইল খুসী হয়ে ওঠেন। ছেলেবেলা হতে রাজতন্ত্রের অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাবাকে তিনি রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবেই ভাবতেন। সংকীর্ণ মনা, দাম্ভিক, অহংকারী আর বিত্তশালী। বাবা তাঁর লেখাপড়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন একজন জেসুট পুরোহিত। এই দুইজনের অত্যাচারে আঁরি বাইলের জীবন গ্রেণনোবলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তিনি পরে তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "রুজ এল নয়ারে" এ তাঁর পিতার এই রূপটি প্রকটিত করেছেন।

অংক বিষয়ে তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তিনি সে বিষয়ে বিশেষভাবে ভাল ছাত্র ছিলেন। তাই গ্রেণ নোবলে পড়া সাংগ হবার সংগে সংগে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর কল্পিত স্বপ্নপুরী প্যারীতে পলিটেকনিকে ভর্তি হতে এলেন। ফ্রান্সে তখন রাষ্ট্রের নোতুন পটভূমিকা উত্তোলিত হয়েছে। রাজতন্ত্রের পর রিপাবলিক গর্ভণমেন্ট স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু নেপোলিয়ান কৌশলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে চতুর্দশ কু পিদিতাতে রিপাবলিক শাসন-তন্ত্রকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে প্রথম কনসাল হয়ে বসেছেন। প্রতিক্রিয়া আবার জেগে উঠতে সুরু করেছে—রাষ্ট্র এবার নূতন বুর্জ্জোয়াদের অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে যাদের প্রধান সহায় হয়েছে পুরোহিতগণ।

আঁরি বাইলকে পরে জীবনে এই সমস্ত সমাজের স্তরের লোকদের সংগে, তাঁদের কৃষ্টি, সামাজিক রূপ সকলের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। যে সময় তিনি প্যারীতে আসেন, তখন মাত্র তাঁর ষোল বছর বয়স। নোতুন কল্পনায় দুলতে দুলতে তিনি প্যারীতে আসেন। ষ্টেজ কেচ তাঁকে নিয়ে চলে খোয়া ওঠা, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায়—দুধারে নোংরা—গলিগুলো অন্ধকার—আবর্জনাগুণ। এমন একটা গন্ধ উঠছে যে একেবারে অস্বাস্থ্যকর।

গাড়ী তাঁর গন্তব্যস্থান সেন্ট জেমিনিকে নামিয়ে দিল। যে বাড়ীটার তেতালায় তাঁকে উঠতে হোল তার সিঁড়িগুলো এ-তো অন্ধকার যে হাতড়ে হাতড়ে উঠতে হয়। ঘরখানার অবস্থা

আরো খারাপ, আলো বাতাস ঢোকে না-একটা মাত্র ছোট্ট গর্ত্ত। দিনের বেলায় ঘরে ঢুকতে হলে আলো জেবলে ঢুকতে হয়। বাইলের চোখে জল এলো। তিনি বই পত্র ফেলে দিয়ে প্যারীর পথে পথে ঘুরতে আরম্ভ করলেন।

প্যারীতে তখন বুর্জ্জোয়া সভ্যতার নিদর্শন সুরু হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় কি সুন্দর তরুণীরা—সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দেহলগ্ন হয়ে তরুণেরা! জীবনটাকে হাল্কা ফোয়ারার মত উপভোগ করা চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার আর এক দল তরুণী দেহ সাজিয়ে নানা রকম কলা কৌশলে রাস্তার মোড়ে, গ্যাস আলোর নীচে পথিকদের ব্যবসার জন্য আহবান করছে।

আঁর বাইলের অর্থও শেষ হোল আর বেড়ানোও শেষ হোল। গ্রেণনোবল হতে তিনি একটা পরিচয় পত্র এনেছিলেন। সেটা নিয়ে তিনি তাঁর আত্মীয় পিয়ের দারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দারুরা তখন বেশ সঙ্গতিপন্ন—বুর্জ্জোয়া। পিয়েরে নেপোলিয়ানের ডান হাত। তিনি নেপোলিয়ানের সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করছেন বিভিন্ন স্থানে হুকুমনামা প্রেরণ করছেন নির্দেশ দিচ্ছেন। বাইলকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিভাগের একজন কেরাণী হিসাবে নিযুক্ত করেন। সকাল আটটা হতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চিঠি নকল করতে করতে হুকুমনামা পাঠাতে পাঠাতে আঁরি বাইলের পিঠ টন্ টন্ করে ওঠে আঙ্গুল গুলো আড়ষ্ট হয়ে যায়।

অথচ ষোল বছর ধরে উদরের সংস্থানের জন্য তাঁকে এই বিভাগে চাকরী করে যেতে হয়। কতবার বিক্ষুব্ধ হয়ে, বিদ্রোহ করে তিনি চাকরী হতে ইস্তফা দেন—আবার পেটের জবালায় এই চাকুরীতে এসে যোগ দিতে হয়। তবে এই বিভাগে থেকে তিনি যেমন বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে মিশতে পারেন, অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন, সমাজের ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করতে পারেন, তার অধোঃগতি লক্ষ্য করতে পারেন, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন স্বার্থপর লোকের কৌশল মহিমামণ্ডিত করে স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা।. রাষ্ট্র তখন নেমে এসেছে ভার্সাইলের রাজপ্রাসাদ থেকে বুর্জ্জোয়াদের স্যালোন বা বৈঠকখানায়।

নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানে তিনি সঙ্গী ছিলেন। "পৃথিবী বিখ্যাত মস্কো সহর তখন জবলছে"—তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। তারপর নেপোলিয়ানের "গ্র্যাণ্ড আর্মি" যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে আসে-তাঁর কর্ণ কুহরে বাজতে থাকে হাহাকার, আর্তনাদ—মুমূর্ষু সৈনিকদের করুণ চিৎকার"। এই যুদ্ধকে তিনি তাই তাঁর শাণিত খড়্গ দিয়ে লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "সার্ত্তরুজ দ্য পাকারামা" বইখানাতে—পৃথিবী বিখ্যাত ওয়াটারলু যুদ্ধকে অতি সাধারণ বাস্তব ভাবে প্রচার করেন—'বিশৃঙখলা—অহেতুক দৌড়াদৌড়ি—সেনাপতিদের স্বার্থপরতা।'

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাইল সমাজের আসল রূপটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাষ্ট্রনায়কেরা কিভাবে মোহ সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে—যে মোহ সৃষ্টির প্রধান সহায়ক পুরোহিতেরা। এই পুরোহিতদের বৃত্তি, জীবনধারা, কার্য্য প্রণালী তিনি রুজ এল নয়ার লামিয়েল প্রভৃতি গ্রন্থে নির্ম্মম ভাবে প্রকাশ করেছেন। কি ভাবে অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় সহজ লভ্য আহারের সম্ভাবনায় পুরোহিতবৃত্তি অবলম্বন করে—তাদের মোটা মস্তিষ্কে অনুশাসন সহজে প্রবেশ করেনা—কিভাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে ধনতন্ত্রের ধারক হিসাবে শিক্ষানবীশী করতে হয় কিভাবে তার মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা, দল পাকানো নীচ মনোবৃত্তি সব গড়ে ওঠে—কিভাবে ভেল্কীবাজীর আশ্রয় নিয়ে লোকদের মনে অন্ধবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা হয়—সমস্ত পুরোহিত কুল গীর্জা, ধর্মকে তিনি এমন বিশ্লেষণ করে তিল তিল করে লোকের সামনে তুলে ধরেছেন—যা একেবারে অনবদ্য অভিনয়।

বাইলের স্পর্শ কাতর মন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো সমাজের প্রতি স্তর যখন পচতে আরম্ভ করেছে। তিনি অবাক হতেন—ব্যাভিচারকে যেন সমাজ মেনে নিয়েছে। কোন সুন্দরী আভিজাত মহিলার প্রেমিক নেই এ কথা তখনকার সমাজে যেন অসম্ভব ছিল। আর এটা সংক্রামক ব্যাধির মত প্রতিটি স্তরে নেমে চলেছে। মিলানে থাকাকালীন স্বালাতে নাচ গান দেখতে যাওয়ার সময় তিনি দেখতেন—সুন্দরী তরুণীরা প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে বড় বড় অফিসারদের কণ্ঠলগ্না হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—।

কতদূর কতদূর ব্যাভিচার সমাজের বিভিন্নস্তরে নেমে গিয়েছে বাইল তা বলেছেন। পিয়েরে দারু আর তাঁর সঙ্গীরা মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন—কোন গভীরতা না নিয়ে উপভোগ করতেন—ভুলে যেতেন-কোন জায়গায় তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকতো না।

বাইল নাটক লিখে অর্থ উপার্জ্জন করতেন এই জন্য মলিয়ের আর কর্ণেলীর সঙ্গে মেলামেশা করেন, আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আরম্ভ করেন। কোথায় তাঁর সেই কল্পিত শিল্পীরা—!বেরুকেত্ এর সঙ্গে মিশতে গিয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন-আর তদানীন্তন প্রসিদ্ধা সুন্দরী অভিনেত্রী লাউস'কে পাবার জন্য তিনি সরসেমিতে যেখানে লাউস' ছুটি কাটাচ্ছিলেন সেখানে বহু কষ্টে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু যে বিতৃষ্ণায়—মোহ ভঙ্গের যে হতাশা তাঁকে পেয়ে বসলো তার থেকে মুক্তির জন্য তিনি পালিয়ে এলেন।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হতে বাইল তিক্ত বিরক্ত হয়ে মস্কো অভিযান থেকে ফিরে এসে চাকুরী হতে ইস্তফা দেন ১৮১৩ সনে। কারো হুকুমনামা পালন করতে রাজি নন। এবার লিখে উপার্জ্জন—করার জন্য তিনি কলম ধরেন। ১৮১৪—২১-এই সাত আট বছর তাঁর সাহিত্য সাধনা চলে। এর আগে ছদ্মনামে তিনি কিছু কিছু সাহিত্য চর্চ্চা করেছিলেন। কয়েকটা দার্শনিক প্রবন্ধ তিনি লিখে ফেলেছিলেন; একটা গীতি নাট্য যা কোন দিনও শেষ হয়ে ওঠে নি; ইতালির লেখক কারপানির লেখা হতে চুরি করে La vie de Hayden নামে একখানি গ্রন্থ লিখে ফেলেন; কারপানি চেঁচামেচি সুরু করলে বাইল কিঞ্চিত মাত্র ভীত না হয়ে নানা লেখকের গ্রন্থ হতে চুরি করে ইতালির চিত্রকলা সম্বন্ধে আর একখানা গ্রন্থ লিখে ফেলেন। লেখাটা তিনি ভাবতেন "মোটেই তেমন কঠিন নয়"—আর "লেখক হওয়াটা তিনি ভাবতেন এমন কিছু নয়, যাতে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গর্বিত বোধ করতে পারে, বা এমন একটা কিছু নয় যাতে বিশেষ একটা উৎসাহ লাগানো যেতে পারে"।

এবার অর্থের তাগিদে তাকে কলম ধরতে হোল। ১৮২২ সনে প্রকাশিত হোল দ্য এল আমুর। এগারো বছরে মাত্র সতেরো খানি কপি বিক্রী হোল। প্রকাশকের দাঁত খিচুনি সহ্য করে ১৮১৭ সনে প্রকাশ করলেন—"আরামাঁসে"। বইখানার এক কপিও বিক্রী হোল না—কোন সমালোচক এক লাইনও সমালোচনা করলো না!

কাজেই নিরন্ন বেকার হয়ে আবার চাকুরীর পেছনে তাঁকে ছুটতে হোল বন্ধু বান্ধবের চেষ্টায় ত্রিয়েস্তে একটা কাজ জোগাড় হোল। কিন্তু রাষ্ট্রনেতা মেটারলিঙ্ক তাঁর সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন—'লোকটা বড্ড আজ বাজে লেখে। সমসাময়িক জগতে মাত্র দুইটি লোক তাঁর লেখা বুঝতে পেরে ছিলেন—একজন মেটারলিঙ্ক আর দ্বিতীয় হচ্ছে পুলিশ বিভাগ—পুলিসের সর্ব্বময় কর্তা—যিনি তাঁর লেখার মধ্যে একেবারে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি শুনতে পেয়ে তাঁকে মিলান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন।

বন্ধু বান্ধবেরা বহু চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সিভিটা ভিয়েচাতে একটা চাকুরী নিয়ে

পাঠাতে সক্ষম হলেন। এই নিঃসঙ্গ নিরন্ন লোকটি শেষ পর্যন্ত আবার পোষাক পরিচ্ছদ পরে জনহীন অস্বাস্থ্যকর সিভিটা ভিয়েচাতে নির্বাসিত হলেন। এখানে তিনি যা রিপোর্ট বা ডেস্প্যাচ লিখতেন—সেগুলো তিনি জানতেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেই ফেলে দেওয়া হয়, একবার খুলেও দেখা হয় না। কিন্তু তবু এই জনহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁকে দিনের পর দিন কাটাতে হয় তিনি ভালবাসতে চেয়েছিলেন—মেরিমীর কথায়—সারা জীবন তিনি ভালবাসার পেছনে ছুটেছিলেন। কিন্তু তখনকার আবহাওয়া তিনি ধরতে পারতেন না। ভালবাসার আবরণের নীচে যে ছলনা, অগভীরতা, ব্যভিচার লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি বুঝতে পারতেন না। তাই তাঁর ভালবসা আর পাওয়া হয়ে উঠলো না। জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁর গৃহকর্ত্রী লনড্রেসের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু এ হচ্ছে তৃতীয় জনা যে তাঁর বিদ্রোহ, সাংঘাতিক কথাবর্তা ও মতামতের জন্য তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হয় নি।

সিভিটা ভিয়েচাতে শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না পেরে ছুটি নিয়ে তিনি প্যারীতে পালিয়ে আসেন। তাঁর অনুপস্থিতি কেউই লক্ষ্য করে না। বাইল ক্রমাগত তিন বছর প্যারিতে থেকে সাহিত্য চর্চ্চা করতে লাগলেন।

সাধারণ লোকে বাইলকে কেউ চিনতো না—উপর তলাকার মহলেও তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না—তাঁর কথাবার্ত্তা অনেকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। পণ্ডিত মহল তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। ১৮২৪ এ প্যারীতে বিখ্যাত দার্শনিক ট্র্যাসীর বাড়ীতে একটা পার্টিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মাদাম ট্র্যাসী অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে করতে পাশের ঘরে মেয়েদের হাসির হুল্লোড় শুনতে পেলেন, নিশ্চয়ই বাইল। অবশেষে আর সহ্য না করতে পেরে তিনি পাশের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যা ভেবেছিলেন তাই—চিমনীর অন্ধকারে মোটা শরীরটাকে লুকিয়ে বাইল নানা রকম কাহিনী বলছেন—মেয়েরা যাই যাই করার ভাব দেখাচ্ছে—অথচ গোগ্রাসে কাহিনী গিলছে। অবশেষে মাদাম ট্র্যাসীর জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে বাইলকে থামতে হোল—মেয়েরাও হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে গেলো।

অভ্যাগতেরা একে একে চলে গেলেন। মাদাম ট্র্যাসী দরজা বন্ধ করে দিলেন। কেউ একবার বাইলকে একটা লিফ্‌ট্ দেবার কথা চিন্তাও করলেন না। তাঁর কাজ হচ্ছে লোক হাসানো তাই ক্লাউনের কাজ শেষ হয়েছে—আসর ভাঙ্গার পর তাঁর কথা কেউ মনে করে দেখে নি। অঝোরে তখন বৃষ্টি পড়ছে—ঠাণ্ডায় শরীরের হাড় পর্য্যন্ত কেঁপে উঠছে। বাইল জলে কাদায় ভিজে হেটে চললেন। তাঁর সুট্‌টা কাদায় ভিজে একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো। এই একটি মাত্র সুটই তাঁর ছিল—তার দামও দেওয়া হয়ে ওঠে নি। বাইল রুয়েদ্য রিচেলিউর ঘরখানায় গিয়ে আলোজ্বালিয়ে পয়সা খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কোথায় পয়সা। মাত্র কালই প্রকাশকেরা তাঁকে বিদ্রূপ করে বলেছে—"আপনার বইগুলো খুব পবিত্র, কেননা কেউই তা স্পর্শ করে না।"

দিনের বেলায় মাত্র পাঁচ ফ্রাঙ্ক অতি কষ্টে জোগাড় হয়েছিল। তাতে পেট ভরে না; রাত্রিতে নিরম্বু উপবাস। তারচেয়ে এই বিড়ম্বিত জীবন না রাখাই ভালো। এই ভয়াবহ মাসে এই নিয়ে বাইল পঞ্চমবার তাঁর উইল করলেন—"আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র রোমেইন কোলম্বকে আমার ৭১ নং রুয়েদ্য রিচেলিউর যাবতীয় জিনিষ দিয়ে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা আমাকে সোজা কবর খানায় নিয়ে যাওয়া হয়—আর আমাকে কবর দেওয়ার জন্য ৩০ ফ্র্যাঙ্কের বেশী খরচ না করা হয়—আর আমি ভিক্ষে করছি যে অসুবিধায় তাঁকে ফেলে যাচ্ছি—তার জন্য সে যেন আমায় ক্ষমা করে—"

বাইল পরের দিন আত্মহত্যা করবার জন্য স্থির করেন। বন্ধু বান্ধবরা খবর পেয়ে এসে নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। কাগজ ঘাটতে ঘাটতে একটা কাগজে, "জুলিয়েন" নামটা লেখা দেখে তাঁরা কৌতুহলী হয়ে উঠেন। "বাইল একটা উপন্যাস লেখার জন্য মনে মনে স্থির করেছেন। বন্ধুরা তাঁকে লেখার জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। বাইল এবার লেখা সুরু করলেন। জুলিয়েন -নামটা পরিবর্তন করে উপন্যাসটার নাম রাখলেন—'লে রুজ এত্ লে নায়ের।' আর বাইল নামটাও লোকে ভুলে গেলো। তার জায়গায় তাঁর ছদ্মনাম "স্তাঁদাল" বেঁচে রইলো। কিন্তু তাঁর ছুটি নিয়ে চুরি করে সাহিত্যচর্চা কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা পরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কলম ফেলে আবার তাঁকে সিভিটা ভিয়েচাতে ফিরে যেতে হয়। এই তাঁর শেষ যাত্রা। এর মধ্যে তাঁর সার্তরুজ দ্য লাকমা প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র বালজাক তাঁকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী 'প্রতিভাময়' লেখক বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। স্তাঁদাল সিভিটা ভিয়েচা থেকে তার উত্তর দিয়েছেন (৩০শে অক্টোবর, ১৮৪০)— —"একজন পিতৃমাতৃহীন, অবলম্বনহীন অনাথের উপর আপনি করুণা দেখিয়েছেন—"।

স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ার জন্য ১৮৪১ সনে কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সিভিটা ভিয়েচা হতে ফিরে আসতে অনুমতি দেন। সেই বছরেই মার্চ মাসের বাইশ তারিখে প্যারীর বুলেভার্ড দিয়ে যাবার সময় বাউবসের-কাছে এসে তিনি মাটীতে লুটিয়ে পড়েন—আর উঠতে পারেন না। নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর সেইখানে সাঙ্গ হয়ে যায়। একদিন যে কথা তিনি লিখেছিলেন—'রাস্তায় মরা আমি হাস্যাস্পদ বলে মনে করি না-যদি না তা ইচ্ছাকৃত হয়—' সেটা আজ হুবহু তাঁর জীবনে ঘটে যায়। প্যারীতে কোন আলোড়ন হয় না—কেউ মাথাও ঘামায় না; প্যারীর মাত্র দুইটি কাগজ তিন লাইনে ছোট্ট একটু স্থানে তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত করে। তাঁর শবাধারের সঙ্গে একমাত্র মেরিমি ছাড়া আর কেউই অনুগমন করে না।

তারপর তাঁর ভাইপো রোমেইন কোলম্বো খুল্লতাতের প্রতি নেহাৎই শ্রদ্ধাবান্ হয়ে তাঁর লেখাগুলো সিভিটা ভিয়েচা থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লেখেন। একটা বিরাট বাস্ক বোঝাই করে তাঁর লেখাগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রোমেইন তা হতে একটা লেখার পরিচ্ছন্ন সংস্করণ-করতে ব্যর্থ হয়ে বাস্ক বোঝাই স্তাঁদালের এক বন্ধু ব্রেগজেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ব্রেগজেট সেগুলো আবার গ্রেণ নোবল গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দেন। সেগুলি সেখানে অবহেলিত ধুলি মলিন হয়ে ষাট্ বছর পড়ে থাকে।

ষাট্ বছর পরে সটানিসলাস স্টাইনুস্কি নামে একজন ভাষাবিদ শিক্ষক গ্রেণ নোবলে নির্বাসনে কাটাচ্ছিলেন। গ্রেননোবেলের গ্রন্থাগারের এই অবহেলিত কাগজগুলো ঘাটতে ঘাটতে কিছুটা সাধারণ ভাবে পড়তে গিয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে উঠেন। তাঁরই চেষ্টায় ;হেন্‌রী ব্রুলার্ড" লুসিমেন লিউয়েন লোক সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়। প্রায় ষাট বছর পরে লোকে স্তাঁদায়কে জানতে পারে। স্তাঁদালের কথাই শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়—"লোকে আমার লেখা ১৯০০ সনে পড়বে।"

স্তাঁদালের লেখা হচ্ছে বিশ্লেষণ। মানুষের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম মনোবৃত্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিকের মত ল্যাবরেটরীতে বসে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানুষের সমগ্র রূপটা—তার আশা, আকাঙ্খা, প্ররোচনা সমস্ত ধীরে ধীরে চোখের সামনে প্রতিফলিত হয়ে উঠে—আর যা হয় সত্যিকারের ইতিহাস।

এই তত্ত্ব ধরা পড়ে যদি বিশ্লেষণ সততার মধ্য দিয়ে করা হয় "মানুষকে দেখতে হলে তাই সততার মধ্য দিয়ে দেখতে হবে, তিল তিল করে—তিল তিল করে প্রত্যেক ভাব, এমন কি

যত অস্পষ্ট অনুভূত হোক না কেন তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, মনের নানা দুর্গম গলির মধ্যে প্রবেশ করে তার স্পষ্ট রূপ প্রকাশ করতে হবে—প্রত্যেক অনুভূতিকে ল্যাবরটরীতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করতে হবে—আবেগের তীব্রতা পরীক্ষা করতে হবে যন্ত্রপাতি আর ঔষধের দ্বারা যেন এগুলো বিরাট একটা অসুখ নিয়ে এসে পেঁৗছেচে।" স্তাঁদাল স্পষ্ট ভাষায় তাই বলেন— "যেমন জীবনে, তেমনি আর্টে একমাত্র জিনিষ যা কোন ফলপ্রসূ হয় না—তা হচ্ছে অস্পষ্টতা, চিন্তার অসুষ্ঠুতা, সাহিত্যিক যদি আবেগের ব্যাপার নিয়ে নিজের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকেন তবে নিজেরই কর্দমাক্ত ভাবের এঁদো ভূমিতে ডুবে যান।

তিনখানি বইয়ের তিনজন নায়ক—লে রুজ এত্ নয়ারের কৃষক সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত তরুণ নায়ক জুলিয়েন—সার্ত্তরুজ দ্য পাবাজার অভিজাত সম্প্রদায়ের আদুরে তরুণ নায়ক ফ্যাবারিশ—আর লুসিয়েন লিউয়েনের এর তরুণ ব্যাঙ্কার লুসিয়েন লিউয়েন—তিল তিল করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছল, চাতুরী, শঠতা, ষড়যন্ত্র কৌশল আর সুতীক্ষ্ম হিসেবী গতি, তার ধারাকে ধরে ফেলে। তাদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমস্ত তদানীন্তন বাস্তব জগৎ তার কর্দম পঙ্কিল সমস্ত চোখের সামনে তাদের ফুটে ওঠে। তারা নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে চতুর ধাপ্পা বাজ, ক্রূর, খল মানুষে পরিণত হয়—আর সমাজকে নীচু স্তরে সকলের সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে চলে।

যেমন হল মাদাম রেনল, ম্যাদাম দ্য চ্যাসটেলার, দুাসেস্ দ্য স্যান্‌সেভিরণা; মহত্তর চরিত্র সকলের। কিন্তু এঁদের আত্মসমর্পণেও তরুণ নায়কদের চরিত্র, আত্মা পবিত্র থাকতে পারে নি—প্রতি পদক্ষেপে তারা মনুষ্যত্বের নিম্নতম মনোবৃত্তির স্তরে নমে গিয়েছে। এই সমস্ত মেয়েরা যারা আত্মাকে স্বর্গে তুলে ধরতে পারে তারা পারিপার্শ্বিকের চাঁপে সাধারণ পর্যায় পড়ে গিয়েছে। উঁচুস্তরে ওঠার যাঁরা চেষ্টায় আছেন তাঁদের ষড়যন্ত্রে, চক্রান্তে, চাতুরিতে পরে এঁরা একেবারে নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুঞ্জীভূত ঘৃণা, ক্রোধ নিয়ে স্তাঁদাল এই সব নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের কাদার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। এঁদের থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিচারকদের আইনজীবীদের, স্বার্থপর মন্ত্রীদের—প্যারেড্ গ্রাউন্ড ভরে যায় এমন সব বিস্তৃত অফিসারদের—সুন্দর সুন্দর ড্রইং রুমে বসে থাকা বুর্জোয়াদের—এই সব হীনমনা অর্থহীন লোকদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মানুষের এক বিশাল অরণ্য ফুটে উঠেছে তাঁর কলমে যারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয় মহিমামণ্ডিত মহৎকে। স্তাঁদালের সমস্ত রচনাগুলিতে ফুটে উঠছে—যা কিছু-তেই তাঁর উৎসাহ ভরা মন থেকে যায়নি—এমনি এক সর্বনাশী কারুণ্য, আর একদিকে শাণিত চোখের তীক্ষ্ম ছুরিকার মত শাণিত বিদ্রূপ। তাঁর লেখাতে বাস্তব জগৎকে তিনি দেখিয়েছেন সুতীব্র ঘৃণা আর শাণিত খড়্গ নিয়ে—চোখে তাঁর কল্পনার স্রোত খেলে নি—সংস্কার তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেনি।

বাস্তব জগৎ তার সংস্কারহীন সাদা চোখে যথার্থ ভাবে ধরা দিয়েছে—আর তিনি সেটা কশাঘাত করে সামনে তুলে ধরেছেন। যে আবরণ এই উলঙ্গ বাস্তবকে লুক্কায়িত করতে চেষ্টা করেছে তিনি তাকে ঘৃণা করেছেন।

ঠিক এই কারণে তিনি রোম্যান্টিক লেখকদের দেখতে পারতেন না। কল্পনার আশ্রয়ে এঁরা সত্যটাকে শুধু বিকৃতই করে ফেলে বাস্তবকে রূপকের সাহায্যে বিভ্রান্ত করে। এ জন্য তিনি এঁদের সহ্য করতে পারতেন না—তাঁদের বইয়ের পাতা পর্যন্ত খুলতে পারতেন না। স্যাঁতোব্রায়কে তিনি বিষের মত ঘৃণা করতেন। আটালায়—তাঁর একটা রূপক—বনের সীমা-

নাটা স্পষ্ট নয়—(la cimeindeter mine des for its) একজন ফরাসী সেনাপতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে তিনি তাঁর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্যত হন। একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে ভিকতর হিউগোকে দেখে তিনি তার উপরে বাঘের মত লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলেন।

রোম্যান্টিকেরা তখন ভিকতর হিউগো, মেরিমি দ্যলা ভিগী, আলফ্রেড দ্য মুকো থেয়োফিল গতিয়ে প্রভৃতি স্যাঁতোব্রায়াকে কেন্দ্র করে একটা গোষ্ঠি গড়ে তুলেছিলেন—যাঁদের সততার চেয়ে আঙ্গিকটাই ছিল প্রধান। ঠিক যেন এই কারণেই এই আঙ্গিকের ওপর স্তাঁদাল খড়্গ হস্ত হয়ে উঠতেন।

তিনি স্পষ্ট কথায় বলতেন সৃষ্ট বাস্তব ঘটনার বিবৃতির জন্য ভাষা হবে "আবেগহীন নিরুত্তাপ, বিশেষণহীন ছুরিকা। আবেগ সুললিত ভঙ্গিমা, কল্পনা, ব্যঞ্জনা বা অলঙ্কার তীক্ষ্ন ফলার মত সত্যটাকে প্রকটিত করতে পারেনা। এর জন্য অষ্টাদশ শতকের ভাষাও আদর্শ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে না, তা হচ্ছে অতিরিক্ত সৌন্দর্যপূর্ণ, এর রীতির মতে কৃত্রিম একটা পরিচ্ছন্নতা আছে যা ঘটনাকে আড়াল করে নিম্নস্তরে নামিয়ে দেয়। সততা প্রকাশ করার জন্য ভাষা বা আঙ্গিক হিসাবে যা গ্রহণ করতে পারা যায়, তা হচ্ছে 'কোড্ নেপোলিয়ান' কেননা তথ্যটাই এখানে মুখ্য, অন্য সমস্ত জিনিষ অপ্রয়োজনীয় হিসাবে স্তিমিত করে রাখা হয়েছে। আইনের ভাষার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কোন সৌন্দর্য্য বা অস্পষ্ট ব্যক্তিগত ভাব থাকতে পারে না। এটা হবে একটা কাঁচের প্লেটের মত যার মধ্য দিয়ে প্রতিটি জিনিষ তার যথার্থ আকারে পরিষ্কার ভাবে দৃষ্টি গোচর হয়।

স্তাঁদাল তাঁর লেখায় এই নিরত্তাপ বিশ্লেষণ আনবার জন্য প্রতিদিন প্রাতঃরাশের পর এই কোডের কিয়দংশ পড়ে নিতেন গাণিতিক সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করতে পারলে বোধহয় তিনি সবচেয়ে খুসী হতেন। আর এই বিশেষণ হীন, নিরুত্তাপ শব্দের দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে ঘটনার বিশ্লেষণ করেন—তা হয়ে ওঠে যেন কল্পনার চেয়ে ভয়াবহ—ভীষণ, তীব্র মর্মস্পর্শী।

মেজর রেনল

অজিত দাস

সূর্য্যসম্ভূত গ্রহরাজির মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীতে কবে, কোন কালে মানবজীবন প্রথম পদক্ষেপণে কুমারী মৃত্তিকার নিদ্রাভঙ্গ করে তাঁর দিগন্তবিসারী ভ্রূধনুতে কুণ্ঠন জাগায় সে ইতিহাস আজও অসম্পূর্ণ, কারণ প্রতিনিয়ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আদিমযুগের মনুষ্যকীর্তির স্মৃতিফলক আজো আবিষ্কৃত হচ্ছে সুতরাং সেই অসম্পূর্ণ ইতিহাসের রন্ধ্রপথে গমনাগমনে যদি কোনও লুপ্ত ইতিবৃত্তের সূত্র সন্ধানে সফল হওয়া যায় তাহলে সেই লুপ্ত রত্নটিকে আমাদের এলোমেলো ইতিহাসের হারানো যোগসূত্ররূপে অভিহিত করতে দ্বিধা কোথায় ?

আদিম মানবসমাজে পৃথিবী সম্বন্ধে যে বদ্ধ ধ্যান-ধারণার প্রচলন ছিল তা অধুনা প্রাক-গ্রহান্তর যাত্রার যুগে অলীক বলে মনে হলেও আমাদের আদিমপুরুষের কাছে সে মনন ও স্মরণ ছিল কঠিন অনুশাসন অথবা ধর্মাবরণে আচ্ছাদিত অমিশ্র সত্য। তাঁদের ধারণা ছিল পৃথিবী এক বিশাল সমতলভূমি। ধারণার বশবর্তী হওয়ার অন্যতম কারণ হল, তাঁরা বাসভূমির নিকটবর্তী ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হতেন মাত্র এবং সেই স্বল্পপরিধির অপর পারে গমনাগমনের উপায় তাঁদের ছিল না প্রথম কারণ নির্দেশিত সীমালঙ্ঘন বিষয়ে গোষ্ঠীর অমোঘ নিষেধ, দ্বিতীয়তঃ দেশভ্রমণের উপযুক্ত যানবাহন ছিল না—একমাত্র ভরসা ছিল নিজস্ব সীমিত-সক্ষম চরণযুগল।

প্রাগঐতিহাসিক যুগের চিন্তাধারার কথা যথাযথ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না হলেও প্রাচীন গুহাচিত্র অথবা প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহে পৃথিবী সম্বন্ধে যে ইতিবৃত্ত লাভ করা যায় তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মানব সভ্যতা উন্মেষের প্রথমযুগে মিশরীয়গণ পৃথিবীকে বিশাল বিনামা—আধারের ন্যায় এক আয়তভূমির রূপ জ্ঞান করতেন। এ বিষয়ে হিন্দুসমাজ ধর্মের স্বর্ণজালে নিজ চিন্তা আচ্ছন্ন করে এই পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে অপরূপ সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা কল্পনা করতেন সসাগরা ধরিত্রী এক বৃহৎ হস্তীপৃষ্ঠে ন্যস্ত এবং সেই হস্তী তদাপেক্ষা বৃহৎ এক কূর্মপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, সর্বনিম্নস্তরে সেই কূর্ম স্বচ্ছন্দে ক্ষীরসমুদ্রে ভাসমান। দ্বিতীয় কল্পনার রূপ পৃথিবীর নিম্নে চারিটি স্তর আছে, প্রথম স্তরে পৃথিবী বৃহৎ হস্তীচতুষ্টয়ের উপর স্থিতিশীল, দ্বিতীয় স্তরে হস্তীযূথ এক বিশাল কূর্মপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, তৃতীয়স্তরে কূর্মাবতার অবস্থান করছেন বৃহদাকার কুণ্ডলীবদ্ধ সর্পরাজ বাসুকেয়র মস্তকে এবং সর্পরাজ মহাজাগতিক জলরাশির মধ্যে অবলীলাক্রমে ভাসমান কিন্তু সেই জলরাশি কোন বস্তুর উপর ন্যস্ত তা চিররহস্যময় ও বহু যুক্তিতর্কের বিষয়।

গ্রীক সভ্যতার আদিপর্বে প্রাচীন গ্রীকগণ পৃথিবীকে সমতলভূমি এবং সমগ্র নভোমণ্ডলের প্রাণকেন্দ্ররূপে কল্পনা করতেন। কিন্তু কয়েকজন গ্রীক বিজ্ঞানী তাঁদের চিন্তাধারায় কিঞ্চিৎ প্রগতির পরিচয় দিয়েছিলেন যা সেকালের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, যার ফলে বহু বিজ্ঞানী অশেষ নিপীড়ন লাভ করেছিলেন এমনকি প্রাণবলির নজিরও প্রত্যক্ষিত হয়। এই সকল মহাপ্রাণ সত্যান্সন্ধানীগণ চিন্তা করতেন আমাদের পৃথিবী গোলাকার এবং রাতের আকাশে যে অসংখ্য আলোকবিন্দু দেখা যায় তা বহুদূরবর্তী তারকারাজি অথবা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রহসমূহ। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা কারণ তখনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবি-

র্ভাব ঘটেনি। পিথাগোরাস ৫৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসদেশে সূর্য্য, পৃথিবী এবং মহাজগত সম্বন্ধে যে মত প্রচলন করেন তা এইরূপ—সূর্য্য, চন্দ্র অন্যান্য গ্রহসমূহ এবং দূরবর্তী তারকারাজি কতকগুলি বিরাট স্ফটিকস্তরমন্ডলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং সেই গতির ফলে একপ্রকার স্বর্গীয়-সুরলহরী অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মূর্চ্ছিত হতে থাকে যদিও তা অশ্রুত ছিল। পিথাগোরাস এই সুরলহরী সমূহকে "স্তর-সংগীত" নামে অভিহিত করেছিলেন।

সৌরমন্ডল এবং মহাজগত সম্বন্ধে গ্রীসদেশীয় সিদ্ধান্তের সংকলক ক্লডিয়াস টলেমিয়াস যিনি টলেমি নামে খ্যাত তিনি এক নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। তাঁর মত ছিল পৃথিবী স্থিরীভূত এবং সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সকল পূর্ব হতে পশ্চিমে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। টলেমির এই সিদ্ধান্তে অনুমিত হয় যে তিনি সৌরতন্ত্রের নিয়মগুলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি পরন্তু তিনি যা অনুভব করেছিলেন তা আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আদিম অনভূতি এবং এই উপলব্ধি এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন— বৃহৎ ত্রয়োদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ "আলমোজেস্ত" নামে বিখ্যাত। আলমোজেস্ত শব্দটি আরবিক, যার অর্থ বৃহৎতন্ত্র।

তারপর কালের বিবর্তনে এবং বহুল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানুষের জ্ঞানের পরিধি আজ দিগন্ত বিস্তৃত। আজ মানুষ অচিন্তনীয় মহাজগতের সীমারেখায় হানা দেবার চিন্তায় বিভোর কিন্তু আমাদের আদিমপুরুষ যাঁরা তখনও যন্ত্রদানবের হদিশ পাননি অথচ আবিষ্কারের নেশা তাঁদেরও কিছু কম ছিল না সুতরাং কি উপায়ে তাঁরা সেযুগে সেই সব কীর্তির (যা আজও মানুষের অসাধ্য বলে বিবেচিত) অমিতবিক্রম নায়ক হতে পেরেছিলেন তা চিন্তার বিষয়। ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যানুসন্ধানে মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল নিজস্ব পদযুগল, সমুদ্র ভ্রমণ আরম্ভ হয় বহুপরে সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। দেশ আবিষ্কারের নেশায় মানুষ বহুকষ্ট স্বীকার করেছে, বহু ভ্রমণকারী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু নব নব আবিষ্কারের নেশায় কত নূতন রক্ত পুনরায় নূতন উদ্যমে যাত্রা সুরু করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁরা যে রোজনামাচা রাখতেন অথবা মানচিত্র অংকণ করতেন সেইগুলিই আমাদের কালে ভৌগলিক ইতিবৃত্তের মূল্যবান দলিলপত্র হিসাবে পরিগণিত। সম্ভবতঃ ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক পণ্ডিত আনাক্সিমান্দার সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করেন এবং এবিষয়ে অদ্যাবধি প্রাচীন নথিপত্র অন্য কোনও পাইয়োনীয়ারের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়নি।

সেইসব রোমান্টিক মানুষ যারা দেশভ্রমণ ও আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা এ্যাডভেঞ্চারের আশায় সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন তাঁদের একজন অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। তাঁর নাম মেজর জেমস রেনল, জাতিতে ইংরাজ' পেশা ছিল নৌসৈনিকবৃত্তি। মেজর রেনলের কীর্তিকাহিনী অনুধাবন করলে একথাই সতত মনে হয় যে শাসকগোষ্ঠীও কদাচিৎ নিজপ্রয়োজনে অজ্ঞাতসারে শাসিতের মহোপকার করতে সক্ষম হয়।

ইংলণ্ডের পশ্চিমপ্রান্তে ডিভনসায়ার জেলার এক্সেটার থেকে প্লিমাথের দিকে অগ্রসর হলে দশমাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী টাইজেনের ক্ষীণস্রোতের সান্নিধ্যলাভ করা যায়। নদীর পূর্বতীরে, হালডন পর্ব্বতশ্রেণীর কক্ষপুটে প্রাচীন বাণিজ্য শহর সাডলী আপন গরিমায় বিরাজমান। শহরের চৌহদ্দির একমাইলের মধ্যে রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন জন রেনলের ওয়াল্ডন এবং আপকট নামে দুইটি ভূসম্পত্তি ছিল। জন রেনল ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে সাডলির কুমারী এ্যান ক্লার্কের পাণিগ্রহণ করেন। আপকটে বসবাসকালে ১৭৪০ সালে দম্পতিযুগল শারা নাম্নী এক কন্যাসন্তান লাভ করেন।

১৭৪২ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে জন রেনলের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, নামকরণ করা হয় জেমস রেনল। পুত্র জেমস যখন নিতান্ত বালক তখন পিতা জন রেনল যুদ্ধক্ষেত্রে হত হন এবং কয়েকমাস পরে বিধবা এ্যান রেনল সাডলির ইলিয়ট নামে অপর এক অতিসাধারণ নাগরিককে পতিত্বে বরণ করেন এবং কন্যাসহ দুঃখে কালাতিপাত করেন। কিন্তু জেমসের পরম সৌভাগ্য যে বাল্যকালে পিতৃহীন এবং মাতৃপরিত্যক্ত হয়েও তাঁকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করতে হয়নি কারণ সাডলি গীর্জ্জার পাদ্রী গিলবার্ট বারিংটন জেমসকে আশ্রয় দেন ও সন্তানস্নেহে প্রতিপালন করেন।

কথিত আছে জেমস কিছুকালের জন্য সাডলি শহরে পিনসেণ্টের ফ্রি গ্রামার স্কুলে পাঠভ্যাস করেছিলেন কিন্তু লাতিনভাষার দুর্ব্বোধ্য স্বরগ্রাম তাঁকে আকৃষ্ট করতে অক্ষম হয়। পাদ্রী বারিংটন জেমসের শিক্ষার প্রতি অমনোযোগ অবলোকন করে তাঁকে সেনাদলে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে দেন। ১৭৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে জেমস মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে "ব্রিলিয়াণ্ট" নামক যুদ্ধজাহাজে ক্যাপ্টেন হাইড পার্কারের ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত হন। এই সময় ব্রিটানীর সমুদ্রসৈকতে সেণ্টকাস্ত নামক স্থানের নৌযুদ্ধে ব্রিলিয়াণ্ট জাহাজের সলিলসমাধি ঘটে। জেমস কোনক্রমে অন্যান্য নাবিকের সাহায্যে তীরভূমি স্পর্শ করেন। শাস্তিস্বরূপ ক্যাপ্টেন পার্কার "গ্রাফটন" নামক অপর এক তৃতীয় শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজে বদলি হন, স্বভাবতঃই জেমসও ক্যাপ্টেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

১৭৬০ সালে জেমস রেনল যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন ইংরাজ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশে রাজ্যবিস্তার করেছে। পণ্ডিচেরী বন্দরে ফরাসীদের সঙ্গে গ্রাফটন জাহাজ নৌযুদ্ধে লিপ্ত হয়। রেনল সেই সময় এই জাহাজে সামুদ্রিক জরীপের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেইসময় সামুদ্রিক জরীপের কাজে রেনলের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ক্যাপ্টেন পার্কার রেনলের জরীপ কার্য্যে পারদর্শিতা অবলোকন করে তাঁকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য জাহাজে স্থানান্তরিত করেন এবং প্রায় এক বৎসর কাল তিনি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকট বিরাট জরীপকার্য্য করেন। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৭৬২ সালে রেনল পাঁচটি সামুদ্রিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন—১। কমোর্ত্তা উপসাগর ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ২। কোয়েদা, ৩। সাম্বীলান দ্বীপপুঞ্জ, ৪। মলাক্কা অন্তরীপ ও প্রণালী, ৫। আবাই বন্দর ও উত্তর পশ্চিম বোর্ণিও। এই মানচিত্রগুলি সামুদ্রিক জরীপকার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। সে যুগের বিখ্যাত শিল্পী দালরিম্পল তাম্রপত্রে এই মানচিত্রগুলি ক্ষোদিত করেন। মানচিত্রগুলি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে সংরক্ষিত আছে। দুঃখের বিষয়, প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তিনি যে সমুদ্রযাত্রা করেন তার কোনও বিবরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

১৭৬৩ সালের এপ্রিলমাসে রেনল মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করেন এইসময় ইংলণ্ডে সপ্তবর্ষের-যুদ্ধ শেষ হয় এবং রাজকীয় নৌবাহিনীতে উন্নতির আর কোনও আশা নেই দেখে তিনি সাড়ে সাত বৎসরের চাকুরীতে ইস্তফা দেবার সঙ্কল্প করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই মাদ্রাজে পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। ইতিমধ্যে রেনল ক্যাপ্টেন পার্কারের পরামর্শে একটি দুশোটনের জাহাজের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড বেতন স্থিরীকৃত হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জাহাজটি মাদ্রাজের উপকূলে এক ভীষণ ঝড়ে ভরাডুবি হয় রেনল কোন ক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পান। ১৭৬৩ সালের ২১ অক্টোবর তারিখের সেই ঝড়ে মাদ্রাজ বন্দরের কোন জাহাজই সেদিন রক্ষা পায়নি।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় রেনল অচিরেই "নেপচুন" নামক এক ক্ষুদ্র বাণিজ্য জাহাজের

কর্তৃত্বলাভ করেন। এই ক্ষুদ্র জাহাজটিই তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করে। তিনি নেপচুনের সাহায্যে ১৭৬৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এক কষ্টসাধ্য সামুদ্রিক জরীপকার্য্যে ব্রতী হন। কেপ কালিমীর এবং পাম্বেন স্রোতের জরীপ শেষ করে তিনি সিংহল এবং ভারতভূমিতে অবস্থিত তিন্নেভেলীর মধ্যস্থ যে জলপ্রণালী আছে তার জরীপকার্য্য সমাধা করেন। এই জলপ্রণালী আজ অবধি পাক্ স্ট্রেট নামে সদাপ্রবাহমান। রেনল কৃতজ্ঞতাবশতঃ মাদ্রাজের তদানীন্তন গভর্ণর রবার্ট পাকের নামানুসারে পাক্ প্রণালীর নামকরণ করেন কারণ গভর্ণর পাক্ স্নেহপরবশ হয়ে রেনলকে নেপচুন জাহাজের লোভনীয় কর্তৃত্ব সংগ্রহ করে দেন।

এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের পর রেনল সমতটভূমির দিকে জাহাজের মুখ ফিরিয়ে পাল তুলে দেন, তিনি এই যাত্রার কথা তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। স্মৃতিকথার কিছু কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাক—"তারপর আমি বঙ্গদেশে গমন করি এবং কলিকাতায় উপনীত হই। তথায় আমার পরমবন্ধু ক্যাপ্টেন টিঙ্কারের সহিত দেখা করি। বন্ধুবর টিঙ্কার বাংলার গভর্ণর-জেনারেল ভ্যান্সিস্টার্ট মহাশয়ের একান্ত সচিব হওয়ায় আমার সৌভাগ্যের উদয় হয় এবং বন্ধুবরের সাহায্যে আমি বাংলার সার্ভেয়ার জেনারেলের পদের জন্য নিয়োগপত্র লাভ করি। ইহার কিছুদিন পরেই 'বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্স' সংস্থায় পূর্ত্তবিভাগের শিক্ষানবিসী—তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত হই সেই দিনটির কথা আজো আমার মনে আছে সেটা ১৭৬৪ সালের ৯ এপ্রিল। সেই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের রাজধানীর পুনর্বিন্যাস চলেছে এবং নূতন ইমারত ও স্থপতির পরিকল্পনা করা আমাদের অন্যতম কাজ ছিল। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণপদ অলঙ্কৃত করে অশেষ দুরূহ কার্য্যসকল সম্পাদন করা এক বিরাট দায়িত্বের ব্যাপার ছিল কারণ আমি তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ, আমার বয়স মাত্র একুশ বৎসর ছিল।"

গভর্ণর-জেনারেল ভ্যান্সিস্টার্টই প্রথম ইংরাজ শাসক যিনি বাংলার প্রাচীন ভৌগলিক রাজত্বের সীমানার ভৌগলিক সংজ্ঞায় আলোকসম্পাত করেন। রেনলকে সার্ভেয়ার-জেনারেলের সিদ্ধান্তের উপর আস্থাপ্রকাশ না করে নূতন নিয়মে এবং সঠিক জরীপের সাহায্যে ইংরাজ পদে অধিষ্ঠিত করার মূলে ছিলেন গভর্ণর পাক্। ভ্যান্সিস্টার্ট ও রবার্ট পাকের সম্বন্ধ অতিমধুর ছিল। পাক্, ভ্যান্সিস্টার্টের ভগ্নী এ্যানকে বিবাহ করেছিলেন। পাক্ পরিচয় পত্রে লিখেছিলেন যে রেনলের মত মধুর স্বভাব, করিৎকর্ম্মা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন যুবক অতি বিরল। রেনলের উপর যে কোনও গুরুদায়িত্ব বিনা দ্বিধায় অর্পণ করা যায়।

বাংলাদেশে পদার্পণের পর রেনলের প্রথম অবদান হল গঙ্গানদীর গতিপথ জরীপ করা, ১৭৬৪ সালের শরৎকালে ফোর্ট উইলিয়মের শয়নকক্ষ ত্যাগ করে তিনি জীর্ণ এক বজরায় ওঠেন এবং গঙ্গানদীর জরীপকার্য্যে রত হন। কয়েকমাস পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে ভ্যান্সি-স্টার্টকে জ্ঞাপন করেন যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সম্পূর্ণ জরীপকরণের প্রয়োজন আছে।

বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ রেনলের কর্ম্মকুশলতায় প্রীত হয়ে তাঁকে লেফ্টেনান্টের পদে উন্নীত করেন ১৭৬৫ সালের ১৪ জানুয়ারী তারিখে। এই সময়ে ভ্যান্সিষ্টার্ট স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং লর্ড ক্লাইভ ৩রা মে তারিখে বাংলার গভর্ণর হয়ে এদেশে আসেন। ইতিমধ্যে রেনল বাংলা-দেশের মধ্যে গঙ্গার গতিপথের অংশটুকু জরীপ করেন। ক্লাইভ রেনলের দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে উইলিয়ম রিচার্ডস নামে সেনাবাহিনীর এক পতাকাবাহীকে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োগ করেন।

রেনল বাংলাদেশে বর্ষার বিমোহন রূপ অবলোকন করে বিমুগ্ধ হন এবং বর্ষাঋতুতে তাঁর প্রধান কার্য্যালয় ছিল ঢাকা শহরে। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলের অতি নিকটবর্ত্তী

হওয়ায় ঢাকা শহর তাঁর আরব্ধকার্য্যের আদর্শস্থল বলে বিবেচিত হয়েছিল। তিনি ঢাকায় নিজ-আদর্শে তাঁর বাসগৃহ স্থাপন করেন এবং স্থল জরীপ এবং মানচিত্র অঙ্কন কাজ অধিকাংশ সময় এখানেই সম্পন্ন করতেন।

স্থলজরীপের কাজ সেই সময় অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং দুরূহ পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল কিন্তু রেনল তাঁর নিজস্ব কর্ম্মদক্ষতায় আত্মবিশ্বাসী ছিলেন সেইহেতু সমগ্র উত্তর বঙ্গের জরীপ অতি নিপুণভাবে সমাধা করে ১৭৬৬ সালের শীতকালে ভূটানের সীমান্তদেশে জরীপ আরম্ভ করেন। এই জরীপ কিন্তু তাঁর প্রাণ সংশয়কারী হয়ে উঠেছিল। বার নামক স্থানে তিনি এবং তাঁর দলবল প্রায় ৮০০ শত সহস্র ভূটানী সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন।

সন্ন্যাসীরা তাঁর দলের অধিকাংশ সাহায্যকারীকে হত্যা করে এবং তিনি ভীষণভাবে আহত হন। তাঁর দুটি হস্ত তরোয়ালের আঘাতে বিক্ষত হয় এবং কয়েকটি পঞ্জরাস্থি ছিন্ন হয়, মস্তক এবং দক্ষিণ পদের ক্ষত হতে প্রচুর রক্তমোক্ষণ হওয়ায় তিনি জ্ঞানহারা অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খুনী সন্ন্যাসীরা রেনলকে মৃত জ্ঞান করে আর শেষ আঘাত দেবার চেষ্টা না করায় সে যাত্রা তিনি কোনক্রমে রক্ষা পান। ডক্টর ফ্রান্সিস রাসেল বহুচেষ্টার পর তাঁকে সুস্থ করেন কিন্তু রেনল চিরতরে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন এবং আজীবন পঙ্গু হয়ে পড়েন। এই দুর্ঘটনার পর লর্ড ক্লাইভ আদেশ দেন যে সার্ভেয়ার-জেনারেলের জন্য কিছু পদাতিক সৈন্য যেন সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে। তর্জ্জনী বিসর্জ্জনের বিনিময়ে রেনল ক্যাপ্টেন পদের মর্য্যাদালাভ করেন বটে কিন্তু তিনি সেই পঙ্গুতার বেদনাময় কবল থেকে কোন-দিনই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন নি।

মনোবল যাঁর বিশেষ সম্বল, দৈহিক পঙ্গুতা হয়ত সাময়িকভাবে তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে কিন্তু তা চিরকালের জন্য নয়। রেনল, কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর আরব্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার প্রাথমিক মানচিত্র অঙ্কণ করেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দিল্লীসহ বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের এবং গঙ্গানদীর অববাহিকার সম্পূর্ণ রেখাচিত্র প্রস্তুত করেন। গুণী এবং বিদ্বৎসমাজ রেনলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাঁকে এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই মানচিত্রগুলি তৎকালীন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক ওর্ম্ম মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়। ওর্ম্ম তাঁর "হিষ্ট্রী অব দি মিলিটারী ট্রানজাকসানস্ অব দি ব্রিটিশ নেসন ইন ইন্দোস্তান (১৭৪৫—১৭৬০) পুস্তক প্রণয়নে রেনলকৃত মানচিত্রের মূল্যবান সাহায্য লাভ করেন। ওর্ম্মের অপর এক বৃহৎ ইতিহাসমূলক রচনা "ওর্ম্মস হিস্টোরি-ক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস" পুস্তকে রেনল কৃত অপরাপর বহু মানচিত্র ব্যবহার করেন। ১

ভারতবর্ষের নদ-নদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের যেমন ভয়াল-সুন্দর রূপ আছে তেমনটি আর কোন নদ-নদীর নেই, আজও এই নদের তীরবর্তী বহুস্থান অগম্য সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ অভিযান যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল তা সহজেই অনু-মেয়। কিন্তু সেই ভয়ালরূপের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ১৭৬৮ হতে ১৭৭০ সাল পর্য্যন্ত এই তিন বৎসরের মধ্যে বিপদসঙ্কুল ও হিংস্র অরণ্যচারীময় পার্বত্য বনভূমি মধ্যস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার মানচিত্র অঙ্কন করেন। এই বৃহৎ অভিযানের মাশুল হিসাবে

১। ওর্ম্মের "হিস্ট্রী অব দি মিলিটারী ট্রানজাকসনস অব দি ব্রিটিশ নেসন ইন ইন্দোস্তান (১৭৪৫-১৭৬০) তিনখণ্ডে ১৭৬৩ সালে এবং "ওর্ম্মস হিস্টোরিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস" চারখণ্ডে ১৭৬৩ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মপুত্র তাঁর কপালে পাহাড়ী কম্পজ্বর ও বিবমিষার তিলক পরিয়ে দেয় যার ফলে তিনি পুনরায় হীন স্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং সুচিকিৎসার আশায় রেনল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। সদর স্ট্রীটের মিস্টার কার্টিয়ার তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং প্রায়শঃ রেনলকে সান্ধ্যভোজনে আমন্ত্রণ জানাতেন। এমনই এক সান্ধ্যভোজে কুমারী জেন এবং হেনরীয়েটা থ্যাকারে ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে রেনলের পরিচয় হয়। জেন ছিলেন মিষ্টভাষী, মমতাময়ী এবং বিশেষ অনুভূতিসম্পন্না কিন্তু হেনরীয়েটা উগ্ররূপ ও বিপরীত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। এই ভিন্নমুখী চরিত্রের কুমারীদ্বয়ের মধ্যে রেনল জেনকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে লাভ করার ইচ্ছা মিস্টার কার্টিয়ারের নিকট জ্ঞাপন করেন। ১৭৭২ সালের ১৫ অক্টোবর তারিখে ক্যাপটেন জেমস রেনল ও কুমারী জেন থ্যাকারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং মাত্র পাঁচদিন কলিকাতায় অবস্থানের পর দম্পতিযুগল ঢাকা অভিমুখে মধুযামিনী যাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে কলিকাতার থ্যাকারে পরিবার বিশ্ববিখ্যাত কারণ স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক উইলিয়ম মেকপীস থ্যাকারে। এই পরিবারে ১৮ই জুলাই ১৮১১ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জেন এবং হেনরীয়েটা, উইলিয়মের প্রপিতামহী ছিলেন।

বিবাহকালে রেনলের বয়স ছিল একত্রিশ এবং জেন ছিলেন ৩৪ বৎসর বয়স্কা অর্থাৎ রেনল অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাঁরা অশেষ সুখী ছিলেন। ১৭৭৩ সালে রেনল একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। মাতার নামানুসারে কন্যার নামকরণ করা হয় জেন, রেনল তাকে লিটল জেন বলে আদর করতেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র একবৎসর ছয়দিন বয়সে লিটল জেন অকালে ইহজগত ত্যাগ করে। ঢাকায়, অশ্রুসিক্ত নয়নে রেনল দম্পতি লিটল জেনের ক্ষুদ্রদেহটিকে সমাধিস্থ করেন।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্সের সামরিক চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় রেনল ১৭৭৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি মেজরের পদে উন্নীত হন। মোট ত্রয়োদশ বর্ষ তিনি বাংলার পূর্তবিভাগের এক বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সারা ভারতের জরীপকার্য্য সম্পূর্ণ করেন এবং আর কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর ভূগোল সংক্রান্ত কাগজপত্র ও মানচিত্র অঙ্কণের কাজ শেষ করেন, উদ্দেশ্য "বেঙ্গল এ্যাটলাস" প্রকাশ করা।' ২

"অসবর্ণহ্যাম" জাহাজে সস্ত্রীক রেনল স্বদেশাভিমুখে ১৭৭৭ সালের মার্চ্চ মাসে যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে অবতরণ করে তিনি স্বদেশের বহুপ্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হন। কলিকাতায় যখন তিনি অবস্থান করছিলেন তখন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ডের অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরর্সের নিকট এক সুপারিশপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রেনল বোর্ডের সদস্যদের ব্যবহারে বিব্রতবোধ করেন। বোর্ড প্রথমে ৪০০ পাউন্ড ভাতার ব্যবস্থা করেন কিন্তু হেস্টিংসের যুক্তিজালে পরাজিত হয়ে নিজেদের ভুল সংশোধন করেন এবং ১৭৮১ সালে ৬০০ পাউণ্ডের ভাতার সুপারিশ সমর্থন করেন। কয়েকদিন পরে পুনরায় রেনল অপর এক বিপদের সম্মুখীন হন, বোর্ডের সদ্য নির্বাচিত সদস্যগণ তাঁর গুণপনার সঙ্গে পরিচিত না থাকার দরুণ তাঁকে "বেঙ্গল এ্যাটলাস" প্রকাশন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অর্থসাহায্যদানে কৃপণতা করে। বহু তর্কবিতর্কের পর ১৭৭৯ সালের নভেম্বর মাসে "বেঙ্গল এ্যাটলাস" একখণ্ড ফোলিও উদ্যমে মোট চৌদ্দটি পত্রে প্রকাশিত হয়।

১। রেনলকৃত অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে অদ্যাবধি সযত্নে রক্ষিত আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৮১ সালে। রেনল সর্বপ্রথম মোট পনের বৎসরের বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে এই মানচিত্র সম্পূর্ণ করেন।

লণ্ডনের ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারে ১৮ নম্বর চার্লস স্ট্রীটে দ্বিতীয়া কন্যা জেন, জ্যেষ্ঠপুত্র টমাস থ্যাকারে রেনল এবং শিশুপুত্র উইলিয়ম সহ সস্ত্রীক রেনল কিছুকাল বসবাস করেন। পরে মিডলসেক্স হসপিটালের নিকট ২৩ নম্বর সাফোক স্ট্রীটের (এখন নাসার্ড স্ট্রীট নামে অভিহিত) এক গৃহে শেষের কদিন কাটিয়ে দেন। এখানে রয়াল সোসাইটির সভাপতি স্বনামধন্য স্যার যোসেফ ব্ল্যাংকস মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হয়। ১৭৮১—৮২ সালে রেনল অসুস্থ হন এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। এই সময় আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের বন্দীদের প্রতি বৃটিশ রাজতন্ত্রের রূঢ় ব্যবহারে তিনি উত্তেজিত এবং ব্যথিত হন।

"বেঙ্গল এ্যাটলাস্" প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রেনল ভূগোলতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সুবৃহৎ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। "দি ম্যাপ অব হিন্দুস্তান উইথ এ মেময়আর" নামক পুস্তক রেনলের এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। এই রচনায় তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূগোলবিদ্যার উপর আলোকসম্পাত করেন। ভারতবর্ষের প্রথম এবং সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রণয়নে রেনলের কৃতিত্ব, বিশ্বব্যাপী বিদগ্ধ সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন আনে এবং তিনি তাঁর জীবিতকালে প্রথমশ্রেণীর ভূগোলতত্ত্ববিৎ হিসাবে স্বীকৃত হন, ১৭৮০ থেকে ১৮৩০ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ ভূগোলতত্ত্ববিৎ আর কেহই ছিলেন না। ভারতবর্ষের মানচিত্র তাঁকে খ্যাতির শীর্ষদেশে পৌঁছিয়ে দেয়। এই সময় ইংলণ্ডে বিজ্ঞান এবং সাহিত্য জগতে সর্বোচ্চ সম্মান ছিল রয়াল সোসাইটি প্রদত্ত "কোপলে মেডাল"। সোসাইটি ১৭৯১ সালে রেনলকে এই পদক প্রদান করে বিশেষভাবে সম্মানিত করে।

"দি ম্যাপ অব হিন্দুস্তান" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮৩ সালে, এই সংস্করণে "মেময়আর" বা স্মৃতিকথা সংযুক্ত ছিল না কিন্তু ১৭৯৩ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় তা, আকারে বৃহৎ এবং "মেময়আর" প্রযুক্ত ছিল। এই পুস্তক বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের একমাত্র প্রামাণিক ভূগোলরূপে পরিগণিত ছিল। তৎকালীন ভৌগলিক বিবরণ সম্বলিত ভ্রমণ কাহিনী সমূহের মধ্যে দি ম্যাপ অব হিন্দুস্তানই একমাত্র পুস্তক যা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে লিখিত।

রেনল যখন সাফোক স্ট্রীটে বাস করতেন তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্য্যটকগণের তীর্থক্ষেত্র ছিল রেনলের নাতিবৃহৎ পাঠাগারের মনোরম পরিবেশ, এখানেই বিখ্যাত পর্য্যটক হাউটন, মাঙ্গো পার্ক প্রভৃতি পর্য্যটনশেষে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রেনলের নিকট ব্যক্ত করতেন এবং সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনায় তাঁরা এমনই নিবিষ্ট হতেন যে রাত্রি প্রভাত হলেও তাঁদের সংবাদের আদান প্রদান প্রায়ই অসমাপ্ত থেকে যেত। এই আলোচনার ফলে রেনলের মনে এক বৃহৎ তুলনামূলক রচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়, যার ফলে তাঁর জীবনের ম্যাগনাম ওপাস—"হেরোডটাসের ভূগোলতত্ত্ব" বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে।

"হেরোডটাসের ভূগোলতত্ত্ব" রেনলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনারূপে স্বীকৃত। ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি তুলনামূলক ভূগোলতত্ত্বের উপর বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাঁর বিশেষ লক্ষ্যবস্তু ছিল পশ্চিম এশিয়াভূমির ভূপ্রকৃতিগত বিচিত্রতা। সেই সুচিন্তিত এবং বৃহৎ অনুসন্ধানের ফল হল "হেরোডটাসের ভূগোলতত্ত্ব", এই আংশিক গ্রন্থ রচনায় যে কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তা তিনি এবং দুই পুত্র টমাস ও উইলিয়ম সমভাবে বহন করেন।

এই পুস্তকের দ্বিতীয়খণ্ডের বিষয়বস্তু ছিল আফ্রিকা মহাদেশের ভূগোলতত্ত্ব এবং প্রাণীজগত সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ রচনা। নীলনদের গতিপথ সম্বন্ধে হেরোডটাসের যে সকল বিভ্রান্তকারী অভিমত প্রচলিত ছিল তা রেনল যুক্তিপূর্ণ উপায়ে সংশোধন করেন এবং আফ্রিকার দুর্ভেদ্য ভূগোলের উপর নূতনভাবে আলোকসম্পাত করেন।

বস্তুতঃ ১৮১৪ সালের পর রেনল গবেষণামূলক রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই সকল রচনা জ্ঞানরাজ্যের উজ্জ্বল বর্তিকাস্বরূপ দেদীপ্যমান। অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল—'অবসারভেসান অন টপোগ্রাফী অব দি প্লেন অব ট্রয় (১৮১৪)", "ইলাস্ট্রেসনস অব দি রিট্রিট অব দি টেন থাউসান্ডস ("১৮১৬)", "ট্রিটিজ অন দি কম্পারেটিভ জিয়োগ্রাফী অব ওয়েস্টার্ণ এশিয়া (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)", "মাঙ্গো পার্কের ভ্রমণ কাহিনী সম্পাদন, "অতলান্তিক মহাসাগরের মেরিণ চার্ট" ইত্যাদি। রেনল, তাঁর আবিষ্কারের কথা একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনায় লিপিবদ্ধ করতে মনস্থ করেন কিন্তু সে রচনার পাণ্ডুলিপি আজও মুদ্রাকরের করস্পর্শ লাভ করেনি।

ভূমধ্যসাগরস্থিত সিসিলি দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণে যে জলস্রোত প্রবাহিত তা রেনল কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং "রেনল কারেন্ট" নামে পরিচিত। এই বিষয়ে, রয়াল সোসাইটিতে তিনি দুইটি মূল্যবান রচনা ১৭৯৩ সালের ৬ জুন এবং ১৮১৫ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে পাঠ করেন। তাঁর এই আবিষ্কার রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের আকৃষ্ট করে এবং নৌবাহিনীর প্রধান সামুদ্রিক মানচিত্রকরের পদ গ্রহণের জন্য রেনল অনুরুদ্ধ হন কিন্তু সেই লোভনীয় অনুরোধ তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন, অবশ্য তিনি নৌবাহিনীকে আশ্বাস দেন যে সামুদ্রিক মানচিত্রের সম্পূর্ণ রচনা আটখণ্ডে প্রকাশিত হলে তাঁরা তা বিনামূল্যেই লাভ করবেন।

রেনল তাঁর পঙ্গু এবং অসুস্থ দেহ আজীবন বহন করেও যে বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরল। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে তিনি তাঁর কর্ম এবং পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ও সুখী ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্য ছাত্রদের নিকট লোভনীয় ছিল কারণ তিনি যখন তাঁর বিচিত্র বাচনভঙ্গীর সাহায্যে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকার অভিযান কাহিনী বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কথা উপভোগ করত।

রেনল, তাঁর জীবনকালে প্রভূত যশ এবং সম্মানের অধিকারী হন। সার যোসেফ ব্যাঙ্কস পরলোক গমন করায় বৃটিশ জিয়োগ্রাফিকাল সোসাইটির সভাপতির পদ শূন্য হয়, রেনল গুণীসমাজের অনুরোধক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং দশবৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কোপুলে মেডাল পূর্বেই লাভ করেন এবং ১৮০১ সালে তিনি প্যারিসের ইনিস্টিটিউট অব ফ্রান্সের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮২৫ সালে রয়াল লিটারেচার সোসাইটি এক সুবর্ণ পদক প্রদান করে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। সেই পদকে কয়েকটি যথার্থ কথা খোদিত আছে—"মেজর রেনল, যিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পৃথিবীর ভূগোলতত্ত্ববিদগণের শীর্ষমণি ছিলেন।"

বৃদ্ধবয়সে রেনল সোসাইটি অব এ্যান্টিকোয়েরিস সমিতির সদস্যগণের সমক্ষে মোট চারটি মূল্যবান রচনা পাঠ করেন। রচনাগুলির বিষয়বস্তু ছিল—১। ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ, ২। জেরসার পরিচিতি, ৩। সেন্টপলের জাহাজডুবি, ৪। ব্রিটানীতে জুলিয়াস সীজারের অবতরণ। এই বিচিত্র রচনাগুলি শ্রবণ করে জ্ঞানতপস্বী সার এডওয়ার্ড বার্ণবেরী বৃদ্ধ রেনলকে আলিঙ্গন করে বলেন — "আজ আমরা ধন্য," এই ঘটনায় রেনল বিশেষ অভিভূত হন সেটা ৪ঠা মে ১৮১৮

সালের কথা। ১৮১৮ এবং ১৮২৭ সালে আর্কটিক অর্থাৎ উত্তরমেরু প্রদেশে যে অভিযান চালান হয় তার উপদেষ্টা সমিতির পুরোভাগে ছিলেন মেজর রেনল।

১৮১০ সালে রেনল বিপত্নীক হন। জ্যেষ্ঠপুত্র টমাস অবিবাহিত অবস্থায় ১৮৪৬ সালে পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠপুত্র উইলিয়ম বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত থাকাকালীন ১৮১৯ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন। একমাত্র কন্যা জেন ১৮০৯ সালে নৌসেনাধ্যক্ষ সার জন ট্রিমেন রড, কে, সি, বি, মহাশয়ের সঙ্গে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং লেডি রড নামে খ্যাত হন। লেডি রড, পিতার যাবতীয় রচনা নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশনের ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় ১৮৬৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বৃদ্ধ, পঙ্গু এবং অসুস্থ অবস্থায় রেনল আরামকেদারা হতে পড়ে যান এবং জঙ্ঘোস্থি ভগ্ন হয়। এই দুর্ঘটনার পর রেনলের পক্ষে শয্যাত্যাগ করা আর সম্ভব হয়নি। অষ্টাশী বৎসর বয়সে, ১৮৩০ সালের ২৯ মার্চ্চ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুযন্ত্রণার কোন চিহ্নই তাঁর দেহে অঙ্কিত ছিল না কারণ দেহ পঙ্গু হলেও তাঁর মন ছিল অদম্য উদ্দীপনাময়, যে মন সততই দুঃসাহসিক অভিযানের আকাঙ্খায় চঞ্চল কারণ তিনি ছিলেন পাকা নাবিক, সম্ভবতঃ সেই কারণে তাঁর ভাঙাচোরা জীবননৌকার ছেঁড়াপালে মৃত্যুঝড় বিন্দুমাত্র আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়নি।

এদেশের সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ ১৮৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের এক সংখ্যায় মেজর রেনলের মৃত্যুসংবাদ পরিবেশনে শোক প্রকাশ করে—

"মেজর রেনল।—ইংলণ্ড দেশের সংবাদ পত্রেতে অবগত হওয়া গেল যে অষ্টাশীতি বর্ষবয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মেজর রেনল সাহেব লোকান্তর গত হইয়া উএষ্ট মিনিষ্টর আবি অর্থাৎ ইংগ্লন্ডদেশে মহামহিম ব্যক্তিদের যে স্থানে সমাধি হয় তথায় উক্ত সাহেবেরো সমাধি হইয়াছে। ঐ সাহেব বহুকালবধি কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষতা কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া এতদ্দেশে ভূগোল বিদ্যাবিষয়ে মনোভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং ভারতবর্ষের নকশা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করেন যদ্যপিও তদনন্তর তদ্বিষয়ে বহুবিধ নবানুসন্ধান হইয়াছে তথাপি তাঁহার কৃত পুস্তক সকলেই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করেন।"

শিল্পী স্কট, লর্ড স্পেন্সারের অনুরোধে রেনলের যে ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিকৃতি অঙ্কণ করেন তা আজও প্রামাণিক চিত্ররূপে স্বীকৃত। এই প্রতিকৃতি ১৭৯৯ সালে কার্ডোন কর্তৃক ক্ষোদিত হয় এবং ইউরোপীয়ান ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

যে সকল মনীষী কর্তব্য নিযুক্ত অথবা ভারতবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন করেছেন তাঁদের সঙ্গে মেজর রেনলের স্মৃতি চিরকাল আমাদের স্মরণে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত প্রতিভাত থাকবে কারণ আমাদের জন্মভূমির মানচিত্র চোখের সামনে মেলে ধরলে যে নামটি প্রথমেই মনে পড়বে তা হল মেজর রেনল।

খাদ্য অন্বেষণে সহযোগিতা

জগন্নাথ সাহু

জীবন বিস্ময়জনক। পৃথিবীতে কোন এক শুভলগ্নে তার আবির্ভাব হয়েছিল। সেই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা একটি বিরাট সমস্যা। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নানা শ্রেণীর প্রাণী বিভিন্ন পথে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে চলেছে। জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

যে কয়েকটি জিনিষ না পেলে প্রাণীরা জীবন ধারণ করতে পারে না তাদের মধ্যে খাদ্য প্রধান। এই খাদ্য সংগ্রহ করা প্রাণীদের কাছে একটি মৌলিক সমস্যা। তাই অ্যামিবা থেকে আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ—সকলেই খাদ্য অন্বেষণে ব্যস্ত। এই খাদ্য-অন্বেষণ কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কখনো গোষ্ঠিকেন্দ্রিক, আবার কখনো বা সমাজকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। কারণ পরিবেশের পরিবর্তন এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে প্রাণীর খাদ্য-অন্বেষণ প্রণালীও রূপ বদলায়। কোন ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় সহযোগিতা; আবার কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে প্রতিযোগিতা।

সাধারণতঃ নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে সহযোগিতার প্রবণতা খুব বেশী, প্রিন্স ক্রপোট্‌-কিন্‌ সাইবেরিয়ার গভীর জঙ্গলে অনুসন্ধান করে দেখেছেন—একই শ্রেণীর পশু, পক্ষী এবং পিপীলিকারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে চলেছে। যেন সহযোগিতাই তাদের জীবনের ধর্ম। কিন্তু আমাদের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নিম্ন স্তরের প্রাণীরা বুদ্ধি অথবা পূর্ব অভিজ্ঞ-তার মাধ্যমে সহযোগিতা করে না, তাদের সহযোগিতার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তি। প্রকৃতি যেন নিজের খেয়ালে কতকগুলি জন্মগত উপাদান নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই উপাদানগুলির প্রভাবে তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে সহযোগী হয়ে ওঠে। তাই অনেক সময় পিপীলিকা, অথবা মৌমাছির সহযোগিতা ভাবুক অথবা কবির মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেও, বুদ্ধিবাদীর কাছে তার মূল্য খুবই কম। অবশ্য যাদের মধ্যে সহযোগিতা যত বেশী তাদেরই species বিবর্তনের মধ্যে তত বেশী দীর্ঘ স্থায়ী হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক গবে-ষণা এবং ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি—নিম্ন স্তরের প্রাণীদের সহযোগিতাপূর্ণ খাদ্য-অন্বেষণই তাদের জীবন ধারণের পথ। এ পথ তাদের সহজাত প্রবৃত্তির। এখন স্বাভাবিক-ভাবে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে। মানুষের মধ্যে এই সহযোগিতা রয়েছে কিনা? যদি না থাকে, মানুষের মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা? আবার এই কৃত্রিম সহ-যোগিতা খাদ্য অন্বেষণে মানুষের মনকে কতদূর উদ্বুদ্ধ করতে পারে?

প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে হলে আমাদিগকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি ও অর্থনীতির গবেষণা-লব্ধ তথ্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কারণ প্রশ্নগুলির সঙ্গে উক্ত বিষয়গুলির আবিষ্কার ও আলোচনা নিবিড়ভাবে জড়িত। আমরা সহজভাবে তাদের মূল সূত্রগুলি অনুধাবন করে দেখনবা।

এক শ্রেণীর সমাজতত্ত্ববিদের ধারণা —সভ্যতার জন্মের অনেক পূর্বে পৃথিবীতে আদিম সমান্তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যুগে মানুষের খাদ্য-অন্বেষণ প্রণালী ছিল সম্পূর্ণভাবে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। একই দল বা গোষ্ঠীর স্ত্রী ও পুরুষরা সহযোগিতার মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করতো।

শুধু সংগ্রহ নয়, তাদের খাদ্য-বন্টন ব্যবস্থারও মধ্যে সহযোগিতা ও সমাজতন্ত্রের মূল নীতি বর্তমান ছিল। প্রাপ্ত খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ভাগবাটোয়ারা করতো যে তাদের কারো মনে কোন প্রকার অসন্তোষের সৃষ্টি হতো না। এটা আজকের দিনে অনেকের কাছে Utopian মনে হতে পারে। কিন্তু আদিম সমাজে নরনারীর স্বাভাবিক জৈবিক প্রেরণা, যূথবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি, বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কিছু পরিমাণ বুদ্ধি ও বিবেচনা তাঁদিকে সহযোগিতার পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। নৃতত্ত্ববিদের ধারণা—হয়তো একদিন আদিম পুরুষ ও নারী মিলিত হয়েছিল যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায়। কিন্তু তাদের দৈহিক মিলন পর্বের পরও তারা একত্রিত হয়ে রইলো আর একটি তীব্র তাগিদে। সে তাগিদ খাদ্য-অন্বেষণের। আদিম পুরুষ ও নারী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল—দুজনের সহযোগিতায় যে-পরিমাণ খাদ্য সহজে সংগ্রহ করা যায় তার অর্ধেকেরও কম অংশ একক প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাঁদের এই নূতন অভি-জ্ঞতা আদিম সমাজে আনলো একটা বড় রকমের রূপান্তর—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা দিল বিরাট পরিবর্তন। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিয়ে দুটি নরনারী অন্য নরনারীদের আহ্বান করলো সহযোগিতায়। গড়ে তুল্‌লো একটি দল। দলের সমস্ত নরনারী সমবেত চেষ্টায় খাদ্য-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলো। একক অসহায় প্রচেষ্টার স্থলে এলো সঙ্ঘবদ্ধ বলিষ্ঠ সহযোগিতা।

আদিম সমাজে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা ছিল অত্যন্ত প্রকট। শুধু তাইনয়, প্রতিকূল হিংস্র পরিবেশের মধ্যে এই দুষ্প্রাপ্য খাদ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল। সেজন্য আদিম নরনারী বুঝতে পেরেছিল সহযোগিতা ছাড়া জীবন ধারন সম্ভব নয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে সমাজতন্ত্র এবং সহযোগিতার উচ্চ আদর্শ বুঝবার মত কোনও বুদ্ধি আদিম নর-নারীর ছিল না। কিন্তু খাদ্য অন্বেষণের অভিজ্ঞতাই তাদিকে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকভাবে সরল অনাড়ম্বর সমাজতন্ত্রের পথে অনুপ্রাণিত করেছে।

ইতিহাসের এই যুগান্তকারী ঘটনা আমরা আজো লক্ষ্য করি বিভিন্ন দেশের আদিবাসী-দের মধ্যে। এ সম্বন্ধে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আমরা দুএকটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি।

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে এক শ্রেণীর আদিবাসী নরনারী বাস করে যাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকটা সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ দেখা যায় যদি কোন দলের একটি পরিবারের কেউ একটি কাঙ্গারু শিকার করে, তা হলে সে পরিবারটি দলের অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে মাংস ভাগ বাটোয়ারা করে খায়। অনেকের মতে এই প্রথা আদিম সমাজতন্ত্র বা এরই প্রকাশ। আবার কেউ কেউ মনে করেন ইহা সভ্যতার প্রথম পর্বের সামাজিক অর্থনৈতিক সহ-যোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই রকমের সামাজিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা এস্কিমোদেরও মধ্যে দেখা যায়। শীতকালে যখন খাদ্য অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে, তখন এস্কিমোরা খাদ্য বন্টনে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা প্রকাশ করে। কোন প্রকারে যদি কোন একটি পরিবার তিমি মাছ শিকার করে তাহলে পরিবারটি স্থানীয় অন্যান্য পরিবারের কাছে মাছের ভাগ পাঠিয়ে দেয়। ভারতবর্ষে খাসীদের এবং আদি-বাসী মুণ্ডাদের কৃষিব্যবস্থাও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে একথা বোঝা যায় যে খাদ্য অন্বেষণে স্বতঃস্ফূর্ত সহ-যোগিতা বর্তমানে পৃথিবীর কেবল আদিবাসীরাই অনাড়ম্বরভাবে অনুসরণ করে চলেছে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে—বর্তমানে সভ্যসমাজের কৃষিকার্যে—তথা খাদ্য অন্বেষণে—সহযোগিতার অভাব কেন? কি কারণে আদিম সমাজের সরল সামাজিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সভ্যসমাজে

হারিয়ে গেল ?

বর্তমানে মানুষের মধ্যে যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায় তার একমাত্র কারণ অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ও প্রকৃতি। মার্ক্সীয় এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ করেছে, এবং পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আমরা কোন গোঁড়া মতবাদ ও জটিল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করেও একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যখন মানব সমাজ কৃষিযুগ অতিক্রম করে বৃহৎ শিল্পযুগে প্রবেশ করলো—অর্থাৎ ব্যাপক কৃষিকার্যের পরিবর্তে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো—তখন থেকেই সহযোগিতার স্থলে এলো প্রতিযোগিতা। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অর্থনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হলো।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতির মূলকথা হলো অবাধ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা বিক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার, এবং অন্যদিকে বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার। প্রতিযোগিতা শুধু যে বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলো তাই নয়, অবহেলিত কৃষির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব দেখা গেল।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিবিদগণ অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে স্মিথিয় "অদৃশ্য হাতের" বিস্ময়জনক সাফল্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে অবাধ প্রতিযোগিতা দেশের কাম্য সর্বোচ্চ উৎপাদন সৃষ্টি করতে পারে। অন্য দিকে মার্ক্সীয় অর্থনীতিবিদগণ অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে শোষণ ও শ্রেণী-সংঘাতের বীজ লক্ষ্য করেছেন। তাই তাঁরা ধনতান্ত্রিক অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে রাষ্ট্র নির্ধারিত উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা না থাকলেও, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাব দেখা যায়।

বর্তমানে আমরা বাস্তব জীবনে দেখতে পাচ্ছি অবাধ প্রতিযোগিতার সাহায্যে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হলেও (ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকা এর উদাহরণ) মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর পৃথিবীর জনসংখ্যা যেহারে বেড়ে চলেছে সে-হারে বৃহৎ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান যেতে পারে; কারণ শিল্পের ক্ষেত্রে যোগান অনেকটা স্থিতিস্থাপক। কিন্তু একই হারে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান সম্ভব নয়; কারণ কৃষির ক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কৃষিভিত্তিক অনুন্নত দেশগুলির যেখানে প্রতিবছর জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে চলেছে। জমির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে সীমাবদ্ধ হওয়ায় প্রয়োজন এসেছে স্বল্প পরিমাণ জমিতে বেশী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করার। বেশী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করতে হলে কৃষিকার্য বিস্তৃতভাবে করা প্রয়োজন যাতে বৃহৎ শিল্পের মত অর্থনৈতিক সুফল এবং সুযোগগুলি কৃষিকার্যেও লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠানে জমির পরিমাণ কম বলে বিস্তৃতভাবে কৃষিকার্য করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সমাজকেন্দ্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এই সমাজ কেন্দ্রিক কৃষি প্রতিষ্ঠান হলো সহযোগিতাপূর্ণ কৃষি সমবায় সমিতি।

বর্তমান বিভিন্ন দেশে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা রাশিয়া, চীন, পোল্যান্ড, ইস্‌রায়েল এবং মেক্সিকোর নাম করতে পারি।

আমাদের একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে প্রথম তিনটি দেশের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে পরবর্তী দুটি দেশের রাজনৈতিক আদর্শের বিরাট পার্থক্য রয়েছে। রাশিয়া, চীন ও পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে ইস্‌রায়েল এবং মেক্সিকোতে অনেকটা গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য থাকায়

তাদের কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিও গঠনগত ও আদর্শগত দিক থেকে বিভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠান দেখা যায় তাদের সভ্য কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা হয়েছে বাধ্যবাধকতার সাহায্যে। সেখানে সর্বশক্তিমান সরকার কৃষকদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে সহযোগিতা সৃষ্টি করতে বেশী আগ্রহশীল এবং কৃত্রিম সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির দ্রুত উন্নতি করতে ব্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের মূল প্রেরণা এসেছে খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা থেকে। এইভাবে গঠিত হয়েছে রাশিয়া ও চীনের যৌথ খামার প্রথা। এই যৌথ খামারে কৃষকদের সহযোগিতার ভাব কতটুকু স্বতঃস্ফূর্ত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে যে কৃষি সমবায় সমিতি এবং সমবায়মূলক যৌথ খামার প্রতিষ্ঠিত সেখানে জনসাধারণের ঐচ্ছিক সহযোগিতার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে কৃষকদের সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করার প্রবণতা একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত না হলেও, সরকার নির্ধারিত কৃত্রিম ইচ্ছা নয়, গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচারের ফলে অনুপ্রাণিত কৃষকগণ ইচ্ছা অনুসারে কৃষি সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছে। এই কৃষি সমবায় সমিতি ভারতের কয়েকটি প্রদেশে গড়ে উঠেছে। আমাদের সরকারী নীতি স্বেচ্ছামূলক কৃষি সমবায় সমিতি গঠনের পক্ষপাতী।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে গত কয়েক বছরে একনায়কতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাধ্যতামূলক কৃষি সমবায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা রাশিয়া ও চীনের যৌথ খামার প্রথার উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করে কোন দেশ যে সমবায় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কৃষির দ্রুত উন্নতি করতে পারেনি এমন নয়। আমরা জানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসরায়েল সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিকার্যের দ্রুত উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। ইস্‌রায়েলের কৃষি-সমবায়ের মূলে রয়েছে ইহুদি জাতির নবজাগ্রত চেতনা। নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইহুদি কৃষকগণ খাদ্য অন্বেষণে এক উজ্জ্বল সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসতে পারিঃ সাধারণতঃ নিম্ন স্তরের প্রাণীরা সহজাত প্রবৃত্তির বশে খাদ্য-অন্বেষণে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা প্রকাশ করে। এই রকম সহজাত সহযোগিতা উন্নত স্তরের প্রাণী মানুষের মধ্যে দুর্লভ। বর্তমানে আদিবাসিদের মধ্যে খাদ্য সংগ্রহের সময় যে সহযোগিতার ভাব ফুটে উঠে তা খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং আদিম জীবনের সারল্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। আধুনিক যুগে কয়েকটি সভ্যদেশ যে কৃষি সমবায় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার পশ্চাতে আছে রাজনৈতিক মতবাদ, খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, বিবেচনা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা, বাধ্যতামূলক কৃষি সমবায়গুলিতে দেখা যায় কৃত্রিম সহযোগিতার প্রকাশ। অন্যদিকে ইস্‌রায়েলের সাফল্য মণ্ডিত কৃষি সমবায় প্রমাণ করতে পারে যে শিক্ষার মাধ্যমে কৃষকগণ উন্নত আদর্শ লাভ করে নিজেদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার ভাব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ—সমগ্র জাতির মানসিক বিকাশ।

সাহিত্যে অশ্লীলতা ও সমাজ

আজকের দিনে কোন বই সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয় বলে পাঠকরা মনে করেন? যাঁরা এবিষয়ে ওয়াকিবহাল তাঁরা নানান নামের ফিরিস্তি দাখিল করবেন। নাম নিয়ে আমার প্রয়োজন নেই, বইগুলির মধ্যে যে মিল আছে তার দিকেই আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বইগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাত স্বীকার করবেনই, যাঁরা পড়েননি তাঁরাও মানবেন যে বইএর মধ্যে যৌন বিকৃতি বা অশ্লীলতা তাঁদের আকৃষ্ট করেছে বই পড়তে। দৃষ্টান্ত ধরা যাক, নোভোকভের অধুনা বিখ্যাত উপন্যাস 'ললিতা' তাঁর একমাত্র বই নয়, প্রথম বইও নয়, শেষ বইও নয়। অথচ তিনি 'ললিতা'র লেখক বলেই পরিচিত এবং ঐ বইটি যত বিক্রী হয়েছে বা হচ্ছে তাঁর অন্য সব বই মিলিয়ে তার চেয়ে অনেক কম বিক্রী হয়েছে বা হচ্ছে। আবার, লরেন্সের বিখ্যাত বই, 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার' সম্বন্ধে আজ আমাদের মধ্যে যতটা ঝোঁক দেখা যায়, লরেন্সের সন্স্ এণ্ড লাভার্সের মত অতিবিখ্যাত বই সম্বন্ধে তার একাংশও দেখা যায় না। এমন কি 'প্লুমড্ সারপেন্ট' বা 'কাঙগারু'র নাম করলে তা যে লরেন্সের লেখা এমন কথা জোর করে কজন বলতে পারেন?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বইএর অন্তর্নিহিত গুণ থেকেই সর্বদা পাঠকেরা সে বই পছন্দ করেন না, বরং একই লেখকের অপেক্ষাকৃত যৌন উত্তেজক লেখাই বেশী জনপ্রিয় হয় অন্য-লেখার চেয়ে। বিদেশী উদাহরণ দেওয়া হ'ল বলে পাঠকরা যেন মনে না করেন যে, বাঙগলা ভাষায় এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাঙগলাতেও অবস্থা একই। তবে নামকরণ করে ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করি কেন?

অবশ্য সাহিত্য ক্ষেত্রে এধরণের তথাকথিত অশ্লীলতা আজকে নতুন আমদানি নয়। বাঙগলা ভাষার জননী সংস্কৃততেও অশ্লীল রচনার অভাব নেই। কালিদাস বা অন্যান্য কবিদের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র, পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারতেও অশ্লীলতার কমতি নেই। বাল্মিকীর রামায়ণে আছে যে, অশোকবনে যখন হনুমান সীতা সন্নিধানে উপনীত হলেন এবং নিজের পরিচয় সীতাকে বিশ্বাস করাতে পারলেন, তখন সীতা নিজের পরিচয়জ্ঞাপক নিদর্শনস্বরূপ মাথার মণির সঙ্গে বায়সরূপী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের তাঁর উপর আক্রমণ ও ফলে রামের ক্রোধের কাহিনী বর্ণনা করলেন। আমরা হনুমানকে সীতার পুত্রতুল্য বলেই কল্পনা করে এসেছি কাজেই সেই অশ্লীল কাহিনী অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। অথচ বাল্মিকী রামায়ণকে নিঃসন্দেহে রাম বিষয়ক কাহিনীর মূল উৎস বলেই স্বীকার করতে হয়।

আবার মহাভারতের ক্ষেত্রে অবস্থা আরো শোচনীয়। ব্যাসের জন্মকথা থেকে সুরু করে মহাভারতের পাতায় পাতায়ও অশ্লীল কথা ও কাহিনীর ছড়াছড়ি। সেই জন্যই বোধহয় কোমলমতি বালক-বালিকাদের চরিত্রশুদ্ধি অক্ষুন্ন রাখার জন্য মূল রামায়ণ-মহাভারত পড়বার কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না; এমনকি বাঙগলা ভাষার আদ্যগ্রান্থ সম্পূর্ণ করবার জন্য কালীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকৃত

রামায়ণ মহাভারতের সর্টকাট বা সংক্ষিপ্তসার পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য সেজন্য ছোটদের রামের ঠাকুরদার নাম জিগ্যেস করলে তারা যদি নাতি-ঠাকুরদার সন্ধি করে বসে, অপরাধটা নিশ্চয়ই কর্তাব্যক্তিদের নয়। মধুসূদনের মত সাহেব লোক কেন যে হোমারকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করার চেষ্টা না করে, বাল্মিকীকে অনুসরণ করতে গেলেন সেটাই বিস্ময়ের কারণ থেকে যায়।

তাছাড়া ভাগবতে কালোমানিকের যেসব কান্ডকারখানর কথা ঠারে ঠোরে বলা হয়েছে আর যেগুলো বৈষ্ণব কবিরা ভক্তিগদগদ চিত্তে বেশ ফলাও করে রসিয়ে বলেছেন সেগুলোকেও নিশ্চয়ই অশ্লীল রচনার পর্যায়ভুক্ত করতে হবে?

এমনকি প্রচন্ড সাহেব মধুসূদন তাঁর প্রহসন গুলোতে যে ধরনের ঘটনা সাজিয়েছেন বা সংলাপ ব্যবহার করেছেন তাও আজকের সাহেবরা উচ্চারণ করতেই পারবেন না। নাটকের এধরনের ঘটনা সমাবেশ বা সংলাপ প্রয়োগত দীনবন্ধু মিত্র বা গিরিশচন্দ্রেও বেশ দেখা যায়।

সাহিত্যকে সমাজ জীবনের প্রতিফলন বলা হয়। সাহিত্যে এই ধরনের অশ্লীলতা নিশ্চয়ই তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল? ছিল যে একথা আজকের মধ্যবয়স্কদের দাদামশায়-ঠাকুরদারা বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন। আমরা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নকসা বা বাবুবিলাস, বিবিবিলাস ধরনের বই থেকেও তার প্রমাণ পাই।

তাহলে আমাদের সমাজে এই ধরনের অশ্লীলবস্তুর প্রয়োগ বা ব্যবহার বন্ধ হ'ল কবে থেকে উনবিংশশতকের শেষদিক থেকে ইংলন্ডের ভিক্টোরীয় যুগের লিউরিটানিজম আমাদের দেশে আমদানি হতে সুরু করল। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত নানাধরনের রসিকতা বা আচার ব্যবহার ভদ্রসমাজে জল-অচল হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমেই এই ছুঁৎমার্গী মনোভাব সমাজ জীবনে শিকড় গেড়ে বসল।

অবশ্য যাঁরা থিয়েটারকে পর্যন্ত নরকে যাবার সোজা রাস্তা মনে করতেন বলে, জানলেও থিয়েটারের পথ বলতেন না তাঁদের কাছে অশ্লীল রসিকতা যে অসহ্য মনে হবে তার আর বিচিত্র কি! তাঁদের মধ্যে যে সব শব্দ বা রসিকতা অগ্রহণীয় বলে মনে হ'ত ক্রমশঃ তা ভদ্রসমাজে (শিক্ষিত সমাজ বলাই বোধ হয় সমীচিন হবে) অচলিত হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মরা স্কুল কলেজের পড়ানোর ব্যাপারে অগ্রণী থাকায় (এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম বলতে ব্রাহ্মভাবাপন্নদেরও ধরা হচ্ছে), শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁদের মতের প্রচলন খুব তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভব হ'ল।

যতদিন আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজী ছুৎমার্গী রীতিটা বহুলে প্রচলিত হয়ে পড়েছে, ততদিনে ইংলন্ডে কিন্তু বিপরীত হাওয়া বইতে সুরু করেছে। ভিক্টোরীয় যুগের অবসানে লিউ-রিটানিজমের খোলসটা খসে গিয়ে দেখা দিয়েছে বোহেমিয়ানিজমের নতুন ঢেউ। অনেক দিন যে সব বিধিনিষেধের নাগপাশ সবাইকে জড়িয়ে রেখে দিয়ে ছিল, তাদের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াই হ'ল এই সব বোহেমিয়ানদের কাজ। অবশ্য এ পরিবর্তনের ঢেউ বোধ হয় ভিক্টোরিয়ার জীবন—কালেই সুরু হয়েছিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার জীবনাবসানের পর তা প্রায় দাবানলের রূপ নিলে, কাজেই একে উত্তর-ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হবে না। ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যে এ পরিবর্তন দ্রুততর করেছিল।

যথাসময়ে সে ঢেউ টেমস পেরিয়ে, আটলান্টিকের টান এড়িয়ে, ভূমধ্যসাগরের কূল বরাবর এগিয়ে এসে, সুয়েজ খালে ঢুকে পড়েছিল। সেখান থেকে লোহিতসাগর, আরবসাগর, ভারত-মহাসাগর, মায় বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে হুগলী নদীর মোহনা দিয়ে সহর কলকাতায় এসে

পেীছেছিল। ততদিনে আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে গেছে, মাত্ আলিঙ্গনের মধ্যেও আমরা অশ্লীলতার ভয়ে শিউরে উঠি। সেই অবস্থায় বিদেশী নয়া ধরণ এসে পেীছুতেই আমাদের কর্তাব্যক্তিরা আঁতকে উঠে, পাপ, পাপ বলে হাঁক ছাড়তে আরম্ভ করলেন। যদি তাঁরা মুখে আর মনে এক হতেন, তাহলে বোধ হয় ঝামেলা থাকতনা। কিন্তু তাঁরা পাপকে তাড়াবার আগে পাপকে জানার কাজে লেগে গেলেন। ছেলে ছোকরারা ভাবলে কর্তারা যখন এনিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন তা নিশ্চয়ই রমনীয়, তাই তারা ঢাক পিটিয়ে তার প্রচার সুরু করলেন।

এখনো পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে সেই অবস্থাই বলবৎ রয়েছে। অবশ্য কর্তারা ক্রমেই সংখ্যায় অল্প থেকে অল্পতর হচ্ছেন এবং অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট সাহিত্যের প্রচারের প্রসারই হয়ে চলেছে। কর্তারা যাঁরা আছেন তাঁরা এখনও গেল, গেল, সব গেল সর্বনাশ হ'ল !" বলে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে চলেছেন, কিন্তু কালের চাকা তাঁদের কোনো পরোয়া না করেই ঘর্ঘর শব্দে এগিয়ে চলছে।

বিদেশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যে এখন অশ্লীলতা যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে তাদের সংগে পরনোগ্রাফির চুল পরিমাণ ফারাকই দেখা যায়। আমাদের দেশে অবস্থা এখনও ঠিক ঐস্তরে গিয়ে পেীছায়নি, তবে সম্ভাবনা ক্রমশঃই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সে সম্ভাবনা যখন বাস্তবরূপ নেবে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে তা বিবেচনা করা উচিত।

যে সব দেশে সাহিত্য আর পরনোগ্রাফি প্রায় এক শ্রেণীভূক্ত হয়ে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যৌন উত্তেজনা অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে যৌনজ অপরাধের সংখ্যা ঊর্ধমুখী। আমাদের দেশেও ক্রমশঃ সেই অবস্থাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের ঘটনার প্রতিফলনই দেখা যায় সাহিত্যে। আজকে যদি সমাজ জীবনে ভাঙ্গন ধরে থাকে ত সাহিত্যে তার প্রতিফলন বন্ধ করলেই গোলমাল মিটবে না। সমাজের ফাটলগুলো বন্ধ করবার মিলিত চেষ্টা না করলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেনা। সাহিত্যে সে পরিবর্তনের পক্ষে বড় হাতিয়ার।

সাহিত্যে অশ্লীলতা থাকাটা আমার কাছে দোষই মনে হয় না, যদি সে অশ্লীলতা আসে কাহিনীর প্রয়োজনে কাহিনীর পূর্ণতা দিতে। কিন্তু অশ্লীল অংশটুকুকেই মূলধন করে কেউ যদি কাহিনীর পসরা সাজিয়ে বসেন তাহলে আমার আপত্তি আছে। এ আপত্তি শুধু অকারণ অশ্লীলতার বেসাতির জন্য নয়, অক্ষমতার জন্যও।

আর এক ধরণের প্রচেষ্টাকে আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি। প্রাচীন সংস্কার বা কাহি-ণীকে অসার প্রমাণ করাতে তার মধ্যে অশ্লীলতার প্রয়োগে পাণ্ডিত্য থাকলেও ঠিক স্বাভাবিকত্ব নেই। মনোবৈজ্ঞানিকদের পরিভাষায় এ এক ধরণের বিকৃতি। অকারণ বিকৃতি সুস্থমস্তিষ্কের প্রমাণ দেয় না।

পরিশেষে সৎসাহিত্য চিরকালই সৎসাহিত্য, যৌনবিকৃতির মালিন্য তাকে স্পর্শ করে না। সাহিতের মহাজনদের সোনায় খাদ থাকলে তা সোনাকে উজ্জ্বলই করে। যে সব ব্যাপারী দস্তাকে পালিশ করে সোনা বলে চালায় ভয় তাদের নিয়েই। সোনাকেও তাদের জন্য মাঝে মাঝে দস্তা বলে মনে হয়।

রবি মিত্র

বাংলাদেশ ও আধুনিক শিল্পপ্রসঙ্গে

তথাকথিত ঐতিহ্য পন্থী ও আধুনিক বিলাসীরা অন্যমনস্ক চিন্তায় নিন্দার দোহাই দিয়ে শিল্পে আধুনিকতর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে, আধুনিক মতবাদ প্রসূত প্রথা প্রকরণ প্রয়োগ উপলক্ষ্যে যতই আন্দোলন করুন না কেন, শিল্পের এই পর্য্যায়ে বিবর্তন রোধ করা সম্ভবপর, কারণ ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের বিষয় যে এ'দের ঐতিহ্য সম্পর্কে গণ্ডিবদ্ধ চিন্তা, সত্যদৃষ্টির অসম্পূর্ণ প্রকাশ, আধুনিক শিল্পকলার প্রয়োগপদ্ধতির প্রতি অহেতুক বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে এ'দের ভারতীয় শিল্পের পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে উদাসীনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ছবির রস গ্রহণ উপেক্ষা করে নিজেদের মতপ্রকাশকে ক্রমশঃই ভীরু করে তুলেছেন।

ইতিহাস বিচারে দেখা যাবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইয়োরোপীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাবে যাঁরা শিল্পচর্চ্চায় ব্যাপৃত ছিলেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক গতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না, তাই অনুকরণ প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়। শিল্পের অন্তর্নিহিত ভাবধারা থেকে বিচ্যুতি অবশ্যই অবনতির সূচনা করে। (বর্তমানেও শিল্পবিচারে এবং রসগ্রহণে অধিকাংশই এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাবের গণ্ডির মধ্যে সীমায়িত) সমাজের বিবর্তনমূলক চেতনা এদের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভুঁয়া দৃষ্টিকোণের চিন্তার কাছে মূল্যহীন হয়ে উঠেছিল। এই সময়কার মোহ থেকে মুক্তির সন্ধান তখনকার কোন শিল্পীই সম্ভবপর করে তুলতে পারেননি। সেই জন্যেই এই সামাজিক অবস্থায় গগনেন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি একটি বিপ্লব। আর সেই কারণেই বোধহয় এযাবতকাল পর্যন্ত তাঁকে শিল্পী হিসাবে কতটা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেকথা বিচার্য্য। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তখনকার কোন শিল্পীই আধুনিক গগনেন্দ্রনাথকে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি লব্ধ শিল্পসম্পর্কে সম্যক জ্ঞানকে উপলব্ধি করে অনুপ্রাণিত হননি। গগনেন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পকলার বলিষ্ট চিন্তার প্রতীক। বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাসে গগনেন্দ্রনাথ একক এবং নিঃসঙ্গভাবে রোমান্টিক শিল্পী এবং অগ্রগামী চিন্তায় প্রথম ব্যক্তি। এই শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত শিল্প ইতিহাস বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ক্লিষ্ট। কিন্তু তারপরেই আধুনিক বাংলা শিল্পকলার স্ফুরণ দেখা দিল। গগনেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে দেখা যাবে যে সেই অনুকরণ প্রকৃতির গণ্ডি থেকে একা অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে ও পরে তাঁর মতাবলম্বী এক শিল্পীগোষ্ঠী পুরাতাত্ত্বিক ক্লাসিকবাদে মনোনিবেশ করেছেন। এর সূত্রপাত হলো এই শতকের প্রথম দশকের শেষ অবস্থা থেকেই। পুরাতাত্ত্বিক ক্লাসিকবাদের সমন্বয় চিন্তার মধ্য পথেই ১৯৩০-৪০ সালের মাঝামাঝি থেকে আধুনিকতায় বিশ্বাসী আর এক শিল্পী পক্ষ তথাকথিত আধুনিকবাদের সূত্রপাত করলেন মধ্যপন্থার ভূমিকা নিয়ে। এই আন্দোলনের বয়সকাল ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত। এ'দের কাছে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য দুটি বিষয়ই মধ্যপন্থার ভূমিকায় সত্যদৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। দুটি বিষয়েই একটা ভাসা ভাসা চিন্তার আবরণ ওই সময়ের তাঁদের শিল্প আন্দোলনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁরা একথা ভুললেন যে

আধুনিক শিল্পের উদ্ভব মধ্যপন্থার চিন্তা দিয়ে নয়। সেখানে ক্লাসিকবাদ বিরোধী—রোমান্টিসিজিম প্রভৃত আধুনিক মতবাদগুলি মধ্যপন্থা চিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ক্লাসিক ও রোমান্টিসিজিম দুটি সম্পূর্ণভাবে বিপরীতমুখী স্রোত। আধুনিক শিল্পের ক্রমবিকাশ রোমান্টিসিজিমের প্রাণবন্যা উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। সৌন্দর্য্য তত্ত্বের নতুন রূপ উপলব্ধিতে মধ্যপন্থীয় শিল্পীদের চিন্তা অসম্পূর্ণ কঠিন গঠন পদ্ধতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এদিকে বয়স্ক পুরাতাত্ত্বিক ক্লাসিকবাদীরা সমন্বয়ের ভূমিকা নিয়ে লুপ্ত কলাশৈলীকে পুনরুদ্ধারে ব্রতী হলেন।

সমন্বয় করাই তাঁদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা এই কাজে এতই ব্যস্ত থাকলেন যে বিভিন্ন দেশের শিল্পের লুপ্ত, প্রচলিত প্রথা প্রকরণ প্রযোগ সম্পর্কে সমন্বয় করার পথে তাঁদের শিল্প সৃষ্টি পরিচালিত হলো একটি সমষ্টিগত গোষ্ঠির মধ্যে এবং ভবিষ্যতে গণ্ডিবদ্ধতায় নতুন কিছুকে গ্রহণ করার পথে তাঁদের লুপ্তপ্রথার সমন্বয়ই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে আধুনিকবাদে বিশ্বাসী—শিল্পীরা মধ্যপন্থীর ভূমিকা নিয়ে যে শিল্প আন্দোলন সুরু করেছিলেন তাতে নিজেদের যেমন বঞ্চিত করেছেন তেমনিই মোহাবিষ্ট হয়েছেন। তবে এই আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল কারণ বাংলাদেশে আধুনিকবাদের তাঁরাই সমষ্টিগত ভাবে আন্দোলন কারী। এবং আজকের শিল্পদৃষ্টিতে তাঁদের অবদান কম নয়। সেদিক থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে পুরাতাত্ত্বিক ক্লাসিকবাদীদের দাবীও অবশ্যই বিবেচ্য। আধুনিকতায় রোমান্টিসিজিম প্রসূত বিভিন্ন মতবাদের আন্দোলন সামাজিক বিবর্তনকে সমর্থন করে। তবে এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে অবশ্যই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। বর্ত্তমানে যদিও আধুনিক কাল বাংলাদেশে অল্পকাল বয়সী—তবুও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য যে তথাকথিত মধ্যপন্থার ভূমিকা বর্ত্তমানের শিল্পীরা বিসর্জন দিয়েছেন। কালোপযোগী—সামাজিক বিবর্তন তাঁদের শিল্পে নিও- রোমান্টিসিজিমের উদ্দাম বাধা বন্ধহীন, স্বৈতসত্ত্বার আবেদনে মুক্ত শিল্পচিন্তা সঞ্চারণ করবার আশ্বাস দিয়েছে। একজিস্টেটেন সিয়ালিজিম্ মতবাদের নতুন সংজ্ঞা নিও রিয়ালিজম্, নিও ন্যাচারালাজিম প্রভৃতি নবীন দৃষ্টিকোণ বাংলা দেশের আধুনিক শিল্প কলায় প্রতিভাত হচ্ছে। সামাজিক জীবন—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-দৃষ্টিভঙ্গী—শিল্পে বিবর্ত্তনের ভূমিকা সব দেশেই নিয়েছে। বাংলাদেশ আর ব্যতিক্রম নয়। বর্ত্তমানের শিল্পীরা সমাজের বিবর্ত্তনকে অনুভব করছেন—তাই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনের পশ্চাদপট অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বদলাচ্ছে। আধুনিক কালের দ্রুত সভ্যতার রথ চিন্তার ক্ষেত্রে সংক্ষেপ সময়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটে চলেছে। তাই—দ্রুতলয়ের সঙ্গে দ্রুততর পদক্ষেপ আধুনিক শিল্পের। তবে একথা নিঃসন্দেহে সমর্থন যোগ্য যে কিছু সংখ্যক শিল্পী—আধুনিকতর ছদ্মবেশে বিগত নিঃশেষিত-মতবাদের চর্বিত চর্বনে কষ্টকল্পিত ছবিতে নিজেদের প্রকাশিত করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে চলেছেন। গতশতাব্দীর ইমপ্রেসোনিজম্ কিংবা বিগত কিউবইজম্ মতবাদ প্রসূত চিন্তায় চিত্রসৃষ্টি আধুনিক শিল্প কলায় অনুকরণকেই প্রাধান্য দেয়। একথা স্বীকার্য্য যে বিভিন্ন মতবাদের স্ফুরণের পশ্চাদপট ছিলো সমাজজীবনে তৎকালীন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বের কিংবা গত শতাব্দীর সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত মতবাদে বর্ত্তমানের শিল্প সৃষ্টি ঐতিহ্য বিরোধী—এবং প্রগতি পরিপন্থী—বিশেষতঃ আজকের এই দ্রুত বিবর্ত্তন মূলক সমাজ জীবনে। সামাজিক জীবনে—বিভিন্নদিকের অনুচিন্তা, তাদের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করলে নবচিন্তার স্ফুরণ দেখা দেবেই। সেখানে দীনতা দেখিয়ে-অনাবশ্যকভাবে কঠোর হয়ে কিংবা বিকৃত অনুকরণের প্রশংসার করে, গণ্ডিবদ্ধ স্থবির চিন্তার—পাহারা বসিয়ে—নতুন শিল্প

আন্দোলনকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার মধ্যে ভীরুতাই সর্বাধিক ভাবে প্রকটিত। ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সাহায্য নিয়ে খোলামন নিয়ে ছবির বিচার করলে শিল্পী ও শিল্পরসিক উভয় সমাজই লাভবান হবেন।

সংস্কৃতি সংবাদ

ডমিনিকো টিয়োপোলো

ভিনিসীয় শিল্পী—ডামিনেকো টিয়োপোলো ভিত্তিচিত্রে ওস্তাদ আঁকিয়ে ছিলেন। ভিনিসের কাছাকাছি জেয়ানিগোতে অঙ্কিত মনোরম ভিত্তিচিত্র সম্পর্কিত বিতর্কের সমাধান হয়েছে। টিয়োপোলো জেয়ানিগোতে যে ভিত্তিচিত্রগুলি এঁকেছিলেন তাদের সাল বছরের যা হিসাব পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে সেগুলি ১৭৫৯ পূর্ব্বে আঁকা হয়নি। বর্ত্তমানে টিয়ো-পোলো অঙ্কিত তিনটি প্যানেল লণ্ডনের ন্যাসানল্ গ্যালারী কিনেছেন। টিয়োপোলোর ভিত্তি-চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্ম্মীয় দৃষ্টিকোণ সম্ভূত বিষয়বস্তু।

বিংশ শতাব্দীর শিল্প কাজ

মার্লবারো ফাইন আর্টস্ "বিংশ শতকের শিল্পকাজ" এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। ড্যুফে অঙ্কিত তিনটি ছবি প্রদর্শীর অন্যতম আকর্ষণ। আর্ণস্ট্রের আঁকা (১৯৫৭ সালে) একটি উল্লেখযোগ্য ছবিও এতে আছে। মিরো, মনড্রে, ক্লি, আধুনিক শিল্পের বিভিন্ন মতবাদের শিল্পী এঁরা, এঁদেরও উল্লেখযোগ্য ছবি কিছু আছে। তিনটি পিকাসোর ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

রোমানেস্ক শিল্পকলা

বারসিলোনার, ক্যাটাল্যান্ ম্যুজিমে, কাউনসিল অব্ ইয়োরোপ এবং স্পেনের গর্ভনমেন্টের উদ্যোগে রোমানেস্ক্ শিল্পের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, বৃটেন, স্পেন, নরওয়ে, ইটালী, জার্মানি, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ এই প্রদর্শনীতে যথাসাধ্য রোমানেস্ক্ শিল্পের নিদর্শন সন্নিবেশিত করেছেন। এই প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হয়েছে 'বিশ্ব রোমানেস্ক্ শিল্পকলা'।

গয়ো

স্প্যানিশ শিল্পী গয়ো অঙ্কিত "ডিউক অব অয়েলিংডন্" চিত্রটি সম্প্রতি লণ্ডনের ন্যাসনাল গ্যালারী থেকে চুরি গেছে। শিল্প রসিকদের মতে গ্যালারীতে গয়োর অঙ্কিত আরও উন্নত ধরনের ছবি আছে। তুলনামূলকভাবে গয়ো অঙ্কিত 'ডক্তর পেরাল' সুষম ও গঠন মাধুর্য্যে রসোত্তীর্ন চিত্র। বৃটিশ ম্যুজিয়ামে গয়ো অঙ্কিত আরও চিত্র সংরক্ষিত আছে। চিত্র রসিকরা বলেন ছবিটির অলংকরণে মাধুর্য্যের অভাব বর্ত্তমান।

মার্ক স্যাগাল

বর্ত্তমানে লণ্ডনের ওহানা গ্যালারীতে মার্ক স্যাগালের একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। স্যাগাল স্যুর রিয়ালিষ্ট চিত্রে নিজস্ব স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। তবে বর্ত্তমানে নিও এক্সপ্রেসেনিজম সম্পর্কিত কাজও করে চলেছেন। স্যুর রিয়ালিজম্ মতবাদে আধুনিক অন্যান্য উদ্দাম মুক্ত—

চিন্তার অবকাশ থাকায় বিভিন্ন কর্মপন্থা এবং দৃষ্টি কোণের উদ্ভব হচ্ছে। স্যাগাল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লায়সনোতে জন্মগ্রহণ করেন। স্যাগাল এচিং এবং গ্রাফিক্ শিল্পের অনান্য দিকেও উচ্চাঙ্গ কাজ করেছেন।

পুনরুদ্ধার

১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকালে পেনেন সেলভিয়ানার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুাজিয়াম থেকে এই তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে—খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাম্র যুগের শেষভাগে বর্ত্তমানের তুর্কির গেলিডোন্যা অন্তরীপের একটু দূরে—একটি-জাহাজ ডুবি হয়। ভূমধ্যসাগরের ঠিক কোন জায়গাতে এই জাহাজডুবি হয় তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করে—তুর্কি আর গ্রীসের সমুদ্র থেকে স্পঞ্জ উত্তলোকরা। এদের খবরের ওপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায় যে সুধু তাম্রযুগের জাহাজ ডুবির হদিশ মেলে তা নয়, বাইজেনটাইন সময়কারও জাহাজ-ডুবির সংবাদ পাওয়া যায়। জাহাজের কাঠের অংশগুলির চিহ্ন না থাকলেও হোমারের সময়ের জাহাজ গঠনের লিপির নির্দ্দেশিত—অন্যান্য বিভিন্ন অংশ আবিস্কৃত হয়েছে। ক্লাসিকযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী—তাম্রযুগের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং ব্যবহৃত বস্তুগুলির পুনরুদ্ধারে—পুরাতত্ত্ববিভাগ এই যুগের সভ্যতার অন্যান্য দিকে আলোকপাতে সক্ষম হবেন। সমস্তই-তাম্র নির্মিত। উত্তোলিত সামগ্রীর মধ্যে কুঠার, আয়না, ছুরি, বর্শার অগ্রভাগ, হাতধোবার বাটি এবং তীরের তীক্ষ্ণফলা উল্লেখযোগ্য। ঢালাই করবার একটি যন্ত্রও পাওয়া যায়। মনে হয় অব্যবহৃত তামাকে আবার কাজে লাগাবার জন্যে জাহজেই ঢালাই-চুল্লী ছিল। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বস্তুর মধ্যে ঈজিপ্টিয় উজ্জ্বল পাথর এবং স্ফটিক অন্যতম।

বোনিংটন

সাতাশ বছরের বয়সের মধ্যে মৃত পার্কস্ বোনিংটনের একটি মনোজ্ঞ চিত্রপ্রদর্শনী কিংস লিনে আয়োজিত হয়েছে। বোনিংটন ঊনবিংশ শতকের শিল্পী কিন্তু প্রথম দুই দশকের মধ্যেই তিনি জন্মান এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর চিত্র সম্পর্কে ডেলাক্রোয়া অত্যন্ত ভালো মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে বোনিংটন তাঁর চিত্রে আধুনিক চিন্তার ছাপ রেখেছেন। কিন্তু তার মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য পরিকল্পনায় একটি সুষম লাবণ্যময় ভাব অনুভূত হয়। বোনিংটন জাতে ইংরেজ।

নিখিল বিশ্বাস

স মা লো চ না

শ্রীশুভঙ্কর বিরচিত—সঙ্গীত দামোদর ।। কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা। গ্রন্থাঙ্ক—১১। শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৫ টাকা।

সঙ্গীত দামোদর সঙ্গীত শাস্ত্রের একখানা মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। গ্রন্থখানির মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয় পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন যে স্বর্গীয় প্রোফেসর ডি সি চক্রবর্তীর মতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সঙ্গীত দামোদরের তিনখানি পাণ্ডুলিপির সন্ধান জানা ছিল,—দুখানি নদীয়া মহারাজের লাইব্রেরীতে এবং একখানি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে দুখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে আনানো দুখানি মাইক্রোফিল্ম্ কপি ও এই দুইখানি সদ্যপ্রাপ্ত পুঁথির সাহায্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পাদিত হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পুঁথির আকারে যখন পাওয়া যায় তখনই কিন্তু প্রামাণ্য হিসাবে সেগুলিকে মেনে নেওয়া চলেনা। সম্পাদকদ্বয় বোধকরি সেইজন্যই চারখানি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। মাদ্রাজের সঙ্গীত একাডেমী প্রকাশনী ১৯৩৩ সালে তাঁদের প্রকাশিত সাময়িক মুখপত্রে সঙ্গীত দামোদরের সম্পাদনা করবার সংকল্প প্রকাশ করেন। উক্ত একাডেমীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডাঃ ডেনিয়েল ও ডাঃ রাঘবনের মতে তখনও কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে ও কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীতে দুখানি পাণ্ডুলিপি বর্তমান ছিল। শ্রীডেনিয়েল পরে মৈথিলি ভাষায় সঙ্গীত দামোদর সম্পাদনা করেন। শ্রীশুভঙ্কর লিখিত আর একখানি নৃত্য বিষয়ক গ্রন্থ "হস্তমুক্তাবলী" ১৯৫৮ সালে মাদ্রাজ সঙ্গীত একাডেমীর জার্নালে দেবনাগরী হরফে সম্পাদিত হয়। "হস্তমুক্তাবলী" গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচ্য গ্রন্থে একাধিকবার বলা হয়েছে এবং বলাবাহুল্য যে "সঙ্গীত দামোদর" "হস্তমুক্তাবলীর" পরে লেখা। আলোচ্য গ্রন্থের মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয়ের বিবৃতিতে মাদ্রাজে প্রকাশিত মৈথিলি ভাষায় "সঙ্গীত দামোদর" সম্পর্কে কোনও উল্লেখ নেই।

মুখবন্ধে শ্রীশুভঙ্করের পরিচয় নির্ধারণ সম্পর্কে গবেষণার ফলাফল দেওয়া হয়েছে। এর আগে শুভঙ্করের জন্মস্থান সম্পর্কে যে মতানৈক্য ছিল সেগুলির নিরসনকল্পে সম্পাদকদ্বয় বিশেষ যত্ন সহকারে যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপিত করে জানিয়েছেন যে শুভঙ্কর বাঙ্গালী ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী ছিলেন বলেই নয়—গ্রন্থখানির মূল্য বিচার তার বক্তব্যের উপর নির্ভরশীল। আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি অতিমূল্যবান সঙ্গীতগ্রন্থ এবং গ্রন্থখানি সম্পাদনায় যে পরিশ্রম করতে হয়েছে, প্রকাশ করেই সেই পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থখানির রচনাকাল আনুমানিক ১৫ শত খৃষ্টাব্দ। এরই সামান্য কিছু আগে লেখা

শ্রীশুভঙ্করের "হস্তমুক্তাবলী"র একটি পাণ্ডুলিপি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের লাইব্রেরী থেকে আহরণ করেন। হস্তমুক্তাবলীর মধ্যে শ্রীশুভঙ্কর একজায়গায় লিখ-ছেন যে যাবতীয় সঙ্গীত গ্রন্থ যথার্থরূপে অনুশীলনের পর তবেই তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে তৎপর হয়েছেন। এই কারণেই বোধকরি প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থের প্রতিধ্বনি আলোচ্য গ্রন্থে অনেক জায়গায় দেখা গেছে। এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি সম্পাদকদ্বয় বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রন্থখানির শেষ কয়টি পাতায় দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এইগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি শ্লোক বহু প্রাচীন গ্রন্থ মাণ্ডুকী শিক্ষা নারদীশিক্ষা ও পার্শ্বদেবের সঙ্গীত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। শুভঙ্কর প্রাচীন গ্রন্থকারদের সব কথাই মানেননি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর বলিষ্ঠ নিজস্ব মতামত প্রকাশ পেয়েছে। এইকারণেই বিভিন্ন মতামতে সমৃদ্ধ সঙ্গীত দামোদর পরবর্তীকালীন সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণেতাদের গ্রন্থ প্রণয়নের সহায়ক হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি ঠাকুরের ভক্তি রত্নাকর উল্লেখ-যোগ্য।

সঙ্গীত দামোদর সবশুদ্ধ ৫টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। যদিও গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি বিষয়ই আলোচ্যগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে তবু নাট্যব্যাপার সম্পর্কেই তাঁর বক্তব্য কেন্দ্রীভূত। শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্বর্গীয় রামদাস সেন মহাশয় তাঁর ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র, ঐতিহাসিক রহস্য ১ম ভাগে বলেছেন "বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীত দামোদর সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্বে ভাবিয়া-ছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয় গুহ্য কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু গ্রন্থপাঠে এককালে হতাশ হইলাম। এখানিও একপ্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ কিছুমাত্র সম্বলিত হয় নাই।" আমরা কিন্তু গ্রন্থ পাঠের পর ঠিক একই উক্তি করতে পারছিনা। সঙ্গীত সম্বন্ধে উক্তি সামান্য হলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাছাড়া মতামতের বৈশিষ্টও লক্ষ্য করবার মত। কয়েকটি বৈশিষ্টের নিদর্শন আমরা এখানে তুলে ধরব।

১। প্রাচীন মাণ্ডুকীশিক্ষায় সপ্তস্বরের নামকরণ কল্পে যে শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে শ্লোক সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই "ষড়্জ ঋষভশ্চৈব" ইত্যাদি দিয়ে শেষে মাণ্ডুকী বলেছেন "স্বরাঃ সপ্তেহ সামসু" অর্থাৎ এই সাতটি বৈদিক সাম-গানের ব্যবহৃত স্বর। ঋক প্রাতিশাখ্যে বৈদিক স্বর বলা হয়েছে ক্রুষ্ট, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি এবং সেইখানে লৌকিক স্বরের পরিচয় রয়েছে ষড়জঋষভাদি। শুভঙ্কর বোধকরি মাণ্ডুকীর এই ভ্রম(?) উপলব্ধি করেই লিখছেন "স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্তিতঃ"।

২। রাগরাগিণীর নামকরণে ব্রহ্মা, হনুমন্ত ও নারদ এই তিনজনেরই মতামত আছে। সাধারণ্যে হনুমন্তের মতামতই গ্রাহ্য। অথচ শ্রীশুভঙ্কর ব্রহ্মার মতামতই গ্রাহ্য করেছেন। ব্রহ্মার মতানুযায়ী বসন্ত ও পঞ্চম এই দুইটিই আদি ছয়টি রাগের মধ্যে। ব্রহ্মার ছয়রাগের মধ্যে মালবকৌশিকীর স্থান নেই। শুভঙ্কর ব্রহ্মার মতামতকে কিছুটা শুদ্ধ করে পঞ্চম রাগ বাদ দিয়ে মালবকৌশিকীকে স্থান দিয়েছেন।

৩। ভরতের নাট্যশাস্ত্র মতে ওড়ব ষাড়ব ও সম্পূর্ণ তান ও মূর্চ্ছনার বিভাগ। শুভঙ্কর রাগ রাগিণীর জাতি বিচার করেছেন এই তিনবিভাগের মধ্যে দিয়ে। এই তিনটির সংজ্ঞা বিশেষ পরিস্ফুট হয়নি তবে রাগ রাগিণীর উদাহরণ গুলি লক্ষ্য করবার বিষয়। বলছেন সম্পূর্ণ স্বর বলতে স ঋ গ ম প ধ নি, নিষাদ বর্জ্জিত স ঋ গ ম প ধ—ষাড়ব স্বর এবং ঋ ও প বর্জ্জিত স গ ম ধ নি—ওড়ব স্বর বোঝায়। এরপরই বলছেন যে সম্পূর্ণ রাগ সাতস্বরের যথা নাট,

বসন্ত ইত্যাদি, ষাড়ব রাগ ছয় স্বরের যথা সৈন্ধবী (পাঠান্তরে সৈন্ধোড়া) ইত্যাদি এবং ওড়ব রাগ পাঁচ স্বরের যথা—মল্লার ইত্যাদি। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ওড়ব, ষাড়ব ইত্যাদি স্বর ও রাগের ভেদ দেখানো হয়েছে। আধুনিক ওড়ব, ষাড়ব ইত্যাদি রাগের সঙ্গে উদাহরণগুলির কিছুমাত্র মিল নেই।

৪। মূর্চ্ছণার বিবরণ ও নামকরণ শুভঙ্করের নিজস্ব। এখানে তিনগ্রামের পরিচয় দান করেছেন সঙ্গীতরত্নাকরের শ্লোক আহরণ করে অথচ নামকরণ ও প্রস্তাবের বিবরণে সঙ্গীত রত্নাকরের সঙ্গে কোনও মিল নেই। শ্রুতি প্রসঙ্গে ষড়জ, ঋষভ ইত্যাদি সাতটি স্বরের শ্রুতি স্থান সম্পর্কে শ্লোকটি সঙ্গীতরত্নাকর থেকে গৃহীত হয়েছে অথচ শ্রুতির নামকরণ ভিন্ন।

৫। গমক প্রসঙ্গে পার্শ্বদেবের সংজ্ঞাই গ্রহণ করা হয়েছে। পার্শ্বদেব বলছেন "স্বশ্রুতি স্থান সম্ভূতাং চ্ছায়াং শ্রুত্যন্তরাশ্রয়াম। স্বরো যদ্ গময়েদ গীতে গমকোই সৌ নিরূপিতাঃ"। শুভঙ্কর কিছুটা পরিবর্তন করে বলছেন,—স্বশ্রুতি স্থান সম্পন্ন চ্ছায়াং শ্রুত্যন্তরাশ্রয়াম্। স্বরো যো মূর্চ্ছনামেতি গমকঃ স ইহোচ্যতে।।" এখানে মূর্চ্ছণা শব্দটি ধাতু গত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে গমকের সংজ্ঞা অনেক পরিষ্কার হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গমক প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।

৬। তাল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাল ও মাত্রার বিবরণ এবং মৃদঙ্গের বোল সহ বিভিন্ন তালভেদ গ্রন্থখানির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭। নৃত্য সম্বন্ধে সঙ্গীত দামোদরের মতামত অল্প হলেও সারগর্ভ এবং গতানুগতিকা বর্জিত। এখানে তিনি স্বপ্রণীত "হস্তমুক্তাবলীর" কথা উল্লেখ করেছেন। অল্পের মধ্যেও এই গ্রন্থে বিভিন্ন সংযুতা, অসংযুতা ও নৃত্যহস্তার নামকরণ ও সংখ্যাগুলি দিয়েছেন। স্থানক, চারী, মহাচারী, করণ, মণ্ডল ও অঙ্গহারাদির বিবরণ দিয়েছেন। নান্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ প্রাচীন নৃত্য বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ অথচ সঙ্গীত দামোদরের নৃত্য বিষয়ক বক্তব্য অভিনয় দর্পণ, ভরত বা ভট্ট অভিনবগুপ্তের মত থেকে ভিন্ন। নান্দীকেশ্বর বলছেন, "অসংযুতা সংযুতাশ্চ হস্তদ্বেধা নিরূপিতাঃ" শুভঙ্কর বলছেন, অসংযুতা, সংযুতা ও নৃত্যহস্তা "হস্তাস্ত্রিধা মতাঃ" নান্দীকেশ্বরের মতে হস্তামুদ্রা ৫১টি, ভরতের মতে ৬৪টি, ভট্ট অভিনবগুপ্তের মতে ৬৭টি এবং শুভঙ্করের মতে ৭১টি।

৮। আগেই বলেছি যে সঙ্গীত দামোদরে নাট্যপ্রকরণের উপর অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানেও বিষয় বস্তুর আলোচনা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল। ৩৮৪ প্রকার নায়িকার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার দূতীর চেহারা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন নাট্যলক্ষ্মাদির পরিচয় দিয়ে নাটকের রসবিচার প্রসঙ্গে পাত্র পাত্রীর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন রসের উদ্রেককারী বিভাব সকল বর্ণিত হয়েছে। জাতি বয়স ও সাজসজ্জার ভেদে বিভিন্ন রসের উদ্দীপনা সম্পর্কে অনুচ্ছেদটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। নাটকের স্থায়ীত্বকাল সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের মত বলেছেন যে তিনঘন্টার অধিক সময় ব্যাপী নাট্যাভিনয় দর্শকদের পক্ষে ক্লান্তিকর।

এই ধরণের আরও অনেক মূল্যবান ও চমকপ্রদ মন্তব্যে সঙ্গীত দামোদর সমৃদ্ধশালী। আগেই বলেছি যে সঙ্গীত দামোদর থেকে অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা উদ্ধৃতি করেছেন। এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি কিছু কিছু আলোচ্য গ্রন্থে অনুপস্থিত কোথাও বা পাঠান্তর রয়েছে।

সঙ্গীত দামোদরের একটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃত শ্লোক,—

"ষড় জো ২চল পঞ্চমশ্চ ঋষশ্চলতি স্বরঃ।
গান্ধারো মধ্যমাশ্চার্থ নিষাদো ধৈবতশ্চলঃ ।।"

এখানে বলা হয়েছে যে ষড়জ ও পঞ্চম অচল স্বর। এই মতামতের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষ মূল্যবান। অথচ এই উক্তি আলোচ্য গ্রন্থে খুঁজিয়া পাইলাম না। আর একটি শ্লোক,—"ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথা।
আনন্দাংশা ইতি প্রোক্তা গীয়ন্তে গান কোবিদৈঃ।।"
এই শ্লোকটিও রাগ রাগিণীর নামকরণ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়ে থাকে অথচ আলোচ্য গ্রন্থে অনুপস্থিত।

সঙ্গীত দামোদরের আর একটি প্রসিদ্ধ উদ্ধৃত শ্লোক হল গান্ধার স্বরটির উৎপত্তি স্থান নিয়ে। অনেক সঙ্গীত-পণ্ডিত এই শ্লোকটি সঙ্গীত দামোদরের উদ্ধৃতি হিসাবে দেখিয়েছেন। শ্লোকটি হল,—"বায়ুঃ সমুদ্গতোনাভেঃ কন্ঠশীর্ষ সমাহতঃ।
নানা গন্ধবহঃ পুন্যোগান্ধার স্তেন কথ্যতে।।

এই শ্লোকটি অবশ্য নারদীশিক্ষার থেকে আহরিত শ্লোক এবং আলোচ্য গ্রন্থে গান্ধারের উৎপত্তি স্থান বর্ণনায় যে শ্লোক ব্যবহৃত হয়েছে তার সঙ্গে সামান্য কিছুটা মিল আছে। আসলে "কন্ঠশীর্ষ সমাহতঃ" এবং "গন্ধবহ" ধ্বনির উল্লেখ এই শ্লোকটির বৈশিষ্ট এবং দুইটি অংশই আলোচ্য গ্রন্থে নেই।

খ্যাতনামা সঙ্গীত দামোদরের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আর একটি পাঠান্তর আমরা লক্ষ্য করেছি। পশুপক্ষীর স্বরের অনুকরণে লৌকিক স্বরোৎপত্তির প্রসঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের, "ময়ূরবৃষভশ্ছাগো ক্রোষ্টু কোকিল বাজিনঃ" ইত্যাদির পরিবর্তে উদ্ধৃতিগুলির প্রত্যেক স্থলেই, ময়ূরবৃষভশ্ছাগো ক্রৌঞ্চ কোকিল বাজিনঃ" এই পাঠ লক্ষ্য করেছি। মাণ্ডুকী শিক্ষায় অবশ্য এই শ্লোকটিই নেই কিন্তু কোন সংস্কৃত গ্রন্থকারই "ক্রোষ্টু" শব্দটি উল্লেখ করেন নি।

এই সমস্ত পাঠান্তর ও শ্লোকের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে আমাদের সন্দেহ হয়েছে যে বোধকরি সঙ্গীত দামোদরের পাণ্ডুলিপির যথাযথ সম্পূর্ণ পুঁথিটি পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটি আমাদের সন্দেহ মাত্র। এমনও সম্ভব যে উক্ত উদ্ধৃতিগুলি ভিত্তিহীন ভ্রমাত্মক ও নকল "সঙ্গীত দামোদর" থেকে সংগ্রহ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মনে হয় "সঙ্গীত দামোদর" সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সমাবেশের বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্যণীয় এবং সম্পাদকদ্বয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু হরি বা কৃষ্ণ ভক্তির প্রসঙ্গই যে সঙ্গীত গ্রন্থের সর্বত্র উল্লিখিত হয়েছে নৃত্য প্রসঙ্গে হঠাৎ ব্রহ্মা ও শিবের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া সেখানে কিছুটা আশ্চর্যজনক মনে হওয়া স্বাভাবিক। আলোচ্য গ্রন্থটি এই পরিপ্রেক্ষিতেও কিছুটা বিচার করা দরকার।

সম্পাদকদ্বয় অসীম ধৈর্য ও পাণ্ডিত্য সহকারে প্রত্যেক পাতার পাদটিকায় চারখানি পুঁথির বিভিন্ন পাঠান্তর উল্লেখ করেছেন। ইংরাজিতে লিখিত বিষয় বস্তুর পরিচয় সম্বলিত টিকা এই গ্রন্থ পাঠের সহায়ক হবে। সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সঙ্গীত রসিক

বিদগ্ধ পাঠকের কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। এই সমস্ত প্রাচীন পুঁথিগুলির সম্পাদনা ও প্রকাশ যতই অধিক হবে ভারতীয় শিল্প সাহিত্য ততই সমৃদ্ধি লাভ করবে একথা বলাই বাহুল্য।

আমরা সংগীত অনুশীলকদের ও ঐতিহাসিক গবেষকদের গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের সংগে সংগে বাংলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অনুশীলন বেড়ে উঠেছিল। সংগীত দামোদরের বিষয় বস্তু এই দিক থেকেও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র।। মোহিতলাল মজুমদার। প্রকাশক—বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, ১নং শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ পৃঃ ৩৬০, মূল্য দশ টাকা।

মোহিতলাল মজুমদার বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অতি শ্রদ্ধেয় নাম। রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করিয়া যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় 'কবি' প্রকৃতই কবিখ্যাতির যোগ্য মোহিতলাল ছিলেন তাহাদের অন্যতম। সৃজনধর্মী কবি মোহিতলালের অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও রসমর্মিতা বাঙলা সাহিত্যের যে একটি অপুষ্ট শাখাকে পরিণতির দিকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল তাহা বাঙলার সমালোচনা সাহিত্য।

নিষ্ঠাশীল, রসবেত্তা কাব্যসাহিত্য-পাঠক মোহিতলাল জীবনের শেষ কয় বৎসর স্বীয় কবি কৃতি ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাকে বলিদান দিয়া পূর্বসূরিদের সৃষ্ট সাহিত্যের সমালোচনাকেই তাঁহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুজুগ প্রিয়, বিভ্রান্ত বাঙ্গালী পাঠককে আত্মস্থ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার এই আত্মবলিদান সার্থক হইয়াছিল কিনা ইহার উত্তর দেওয়া আজিও সহজ নয়। তবে সমালোচনাও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হইতে পারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচক ভূমিকান্তে মোহিতলাল আর একবার তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

মোহিতলালের মৃত্যুর বেশ কয়েকবৎসর পরে তাঁহার রচিত "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" নামীয় সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশ সাহিত্য রসিকদের নিকট নিঃসন্দেহে একটি সুসংবাদ। এই পুস্তকের কিছু কিছু অংশ মোহিতলালের স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। মোহিতলালের জীবদ্দশাতেই বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অল্পায়ু ও স্বল্প প্রচারিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যাঁহারা ইহার অংশ বিশেষও পাঠ করিতে পারেন নাই, এবং যাঁহারা ইহার কিছু অংশ পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহারা সকলেই এখন এই পুস্তকটি একত্রে পাঠ করিবার সুযোগ পাইলেন।

চারিখণ্ডে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীকান্ত পাঠ করেন নাই এমন বাঙ্গালী পাঠক অল্পই আছেন। সম্ভবতঃ চারিখণ্ড শ্রীকান্ত শরৎ সাহিত্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। আলোচ্য পুস্তকে মোহিতলাল বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, গহর, কমললতা ও অভয়ার চরিত্র লইয়া পৃথক আলোচনান্তে ইহাদের পারস্পরিক আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে সাহিত্য শিল্পকলার একটি অভিনব রূপ চাক্ষুষ করাইয়াছেন। নরনারীর বিশেষ করিয়া নারী-হৃদয়ের অসীম ঐশ্বর্য আবিষ্কারে শরৎচন্দ্রের যে অসীম কৃতিত্ব ছিল তাহার গভীরতার পরিমাণ মোহিতলালের এই আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে।

মোহিতলাল বইখানির নামকরণ করিয়াছেন শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত নহে। মোহিত-লালের মতে শরৎচন্দ্র এই চারিখণ্ড পুস্তকে গল্পের আকারে, কাহিনী রচনার ছলে তাঁহার ব্যক্তি জীবনের এমন সকল অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক সংকট—প্রাণের অন্তস্থল উন্মুক্ত করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যে তাহাতে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা ত নহেই বরং ব্যক্তির হৃদয়-শোণিত রাগে তাহা শিল্পকেও পরাস্ত করিয়াছে। শরৎচন্দ্র যেন যোগীর দৃষ্টিতে আপনার মূর্তিটিকে দৃশ্যরূপে দেখিয়াছিলেন, সমগ্র শ্রীকান্তখানি সেই স্বপ্ন, তিনি আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট আত্মমূর্তির পরিচয়ই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীকান্তের জবানীতে মোহিতলাল শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনীকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপন্যাস বা কাব্য হিসাবেও অসীম দক্ষতার সহিত ইহার সৌন্দর্য বিচার করিয়াছেন। সমুদ্রিত, সুগ্রন্থিত এই পুস্তকের জন্য প্রকাশক অবশ্যই সাধুবাদার্হ।

বিভা সেনগুপ্ত

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 Nov. '61 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

"হামারে ভাই
কো লে যাও"

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
সবুজ
LUX
নীল
LUX
গোলাপী
LUX
হলুদ
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন ! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই
মোড়কে—সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য
রক্ষায় যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন।
LUX
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

নবম বর্ষ। ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

রবীন্দ্র-অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

উৎসর্গ — কবিবন্ধু মোহিতসেন ১৩১০ সালে কাব্যগ্রন্থ সংকলন করেন। এই কাব্যগ্রন্থে কবিতার ভাবানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ হলো, গ্রন্থানুযায়ী নয়। এই বিভিন্ন ভাগগুলির প্রবেশক কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতা লিখে দেন। তাছাড়া তখনকার লেখা কিছু অপ্রকাশিত কবিতাও কাব্যগ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছিল। কাব্যগ্রন্থ একবারই মুদ্রিত হয় এর আর কোন দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি।

কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত প্রবেশক কবিতাগুলি এবং যে কবিতাগুলি অন্য কোন গ্রন্থে নেই, সেগুলি উৎসর্গ কাব্যে স্থান পেয়ে ১৩২১ সালে প্রকাশিত হলো।

কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগের প্রবেশক কবিতা হিসাবে যে কবিতাগুলি সন্নিবেশিত হয়েছিল সেগুলির তালিকা দেওয়া গেল —

যাত্রা	— কেবল তব মুখের পানে
নিষ্ক্রমণ	— আঁধার আসিতে
বিশ্ব	— আমি চঞ্চল হে
হৃদয়অরণ্য	— কুঁড়ির ভিতরে
সোনারতরী	— তোমায় চিনি বলে
লোকালয়	— হে রাজন তুমি আমারে
নারী	— সাঙ্গ হয়েছে রণ
কল্পনা	— মোর কিছু ধন
লীলা	— তোমারে পাছে সহজে বুঝি
কৌতুক	— আপনারে তুমি করিবে গোপন
যৌবনস্বপ্ন	— পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
প্রেম	— আকাশসিন্ধু মাঝে

কবিকথা	— দুয়ারে তোমার
প্রকৃতিগাথা	— তোমার বীণায় কত তার আছে
হতভাগ্য	— পথের পথিক করেছ
সংকল্প	— সেদিন কি তুমি এসেছিলে
স্বদেশ	— হে বিশ্বদেব মোর কাছে
রূপক	— ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে
কাহিনী	— কত কী যে আসে
কথা	— কথা কও কথা কও
কণিকা	— হায় গগন নহিলে
মরণ	— চিরকাল একী লীলা গো
নৈবেদ্য	— প্রতিদিন তব গাথা
জীবনদেবতা	— আজ মনে হয় সকলের নামে
শিশু	— জগৎ পারাবারের তীরে
নাট্য	— আঁধারে আসিয়া এরা

এই বিভিন্ন বিভাগের প্রবেশক কবিতাগুলির মধ্যেও একটি ভাবসূত্রের যোগ সন্ধান করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা উৎসর্গ কাব্যে স্থান পেয়েছে। নিজেকে এই কবিতাগুলির মধ্যে যেমনভাবে প্রকাশ করেছেন তেমন ভাবে আর খুব অল্প কাব্যেই করেছেন।

উৎসর্গের অধিকাংশ কবিতায় হয় সুদূরের জন্য উৎকণ্ঠা না হয় না-পাওয়ার বেদনা ছড়িয়ে আছে। প্রথম যৌবনের হতাশার সুর জড়ানো কবিতাগুলির চেয়ে এগুলি অনেক সম্পূর্ণ, সংযত এবং নিটোল রূপের অধিকারী। অসাফল্য বা ব্যর্থতার হাহুতাশ নেই অথচ কোথাও একটা অতৃপ্তির ব্যথা জমে রয়েছে তার প্রমাণ আছে। শ্রীপ্রমথবিশী উৎসর্গ সমালোচনায় এই কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন "উৎসর্গ দীর্ঘনিঃশ্বাসের কাব্য। যাহা চাই অথচ পাওয়া গেল না, যাহা কাম্য অথচ করতলগত হইল না, যাহা সাধনার কিন্তু সাধ্য নহে এ দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহারই জন্য; কবির মুখ কখনো অতীতের দিকে কখনো বা ভবিষ্যতে, বর্তমানে কদাচিৎ; অতীতের আশ্বাস ও ভবিষ্যতের আশাই কাব্যের প্রবীন উপজীব্য।"

তত্ত্বের দিক থেকে উৎসর্গের মূল্য অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়নি। একাধিক সমালোচক এই কবিতাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ রহিত বিচ্ছিন্ন বলে মনে করেছেন। অধ্যাপক টমসন লিখছেন—"It has no unity no connecting thread of thought or emotion" নীহাররঞ্জন রায় বলছেন "কবিতাগুলির মধ্যে কোনও ভাবের যোগাযোগ বিশেষ নাই, থাকিবার কথাও নয়। তাহার কারণ, উৎসর্গের অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছিল মোহিতবাবুর সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থের' এক একটি গুচ্ছের এক একটি ভূমিকারূপে।"

জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় ঐ দুই সমালোচকের উল্লেখ করে বলেছেন "তত্ত্বের দিক দিয়া সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমপরিণতির ধারা যদি কোন একখানি কাব্যে সংহতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে উৎসর্গ।....আমাদের কাছে সমগ্র কাব্যটি একটি অখণ্ড সৃষ্টি-রূপেই প্রকাশিত হইতেছে, কারণ সেগুলি বিশেষ একটি ভাবধারার অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্যই রচিত।"

উৎসর্গ কাব্য সি. এফ. এণ্ড্রুজকে উৎসর্গীকৃত। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সুদীর্ঘকাল কবির একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

ঋণশোধ — ১৩১৫ সালে কবি আশ্রমে অভিনয়ের উদ্দেশে শারদোৎসব লেখেন। ঐ বছরই আশ্রমে শারদোৎসব প্রথম অভিনীত হয়। ১৩২৮ সালে শারদোৎসবের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ঋণশোধ লেখা হল। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে ঋণশোধ ছাপা হয়— বিজ্ঞাপনে লেখা আছে—"এই নাটিকাটি বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।" ঋণশোধ পরে আর ছাপা হয়নি।

ঋণশোধ নাটিকাটি কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধানতম হল নাটিকায় ভূমিকা সংযোজন। কবি, মন্ত্রী ও রাজার কথোপকথনের মধ্যে শারদোৎসবের মূল সুরটি এখানে ধরিয়ে দেওয়া হল। ঋণশোধ নাটিকায় কবি নিজে শেখর কবির ভূমিকা গ্রহণ করতেন। প্রমথনাথ বিশী তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন "শারদোৎসবের নূতন রূপ ঋণশোধ প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ শেখর কবির ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু সন্ন্যাসী সাজিতেন। দিনুবাবু বরাবর ঠাকুর্দা সাজিতেন। সন্তোষবাবুও কখনো কখনো সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।" শেখর চরিত্রও শারদোৎসবে নেই।

১৩২৮ সালে কবি এই নাটিকাটির কিছু কিছু বদল করেন। প্রমথ বিশী মহাশয়ের কাছে পরিবর্তন সমেত তখনকার ব্যবহৃত গ্রন্থখানি আছে। রচনাবলী ১৩ খণ্ডে সেই পরিবর্তনগুলি উল্লেখিত হয়েছে।

ঋণশোধ নাটিকাটিকে কেউ কেউ 'অভিনয়যোগ্যতর' বলে মনে করেছেন (সুকুমার সেন—বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস) আবার কেউ কেউ এটিকে 'শারদোৎসবের একটি বিকৃত সংস্করণ মাত্র' বলে মনে করছেন।' প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখছেন "শারদোৎসবের মধ্যে যে অপরিসীম সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন ছিল, রাজা বিজয়াদিত্যই যে সন্ন্যাসী এই তত্ত্বটি নাটকের শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিয়া অতি সহজে নাটকীয়ভাবে তাহাকে প্রকাশ করার মধ্যে যে রচনানৈপুণ্য ছিল 'ঋণশোধে' তাহার কিছুই নাই।'

ঋতু-উৎসব — ১৯২৬ সালে (আশ্বিন ১৩৩৩) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে পাঁচটি নাটিকা ও গীতিনাট্যের সংকলন ঋতু-উৎসব নামে প্রকাশিত হয়। যে নাটিকাগুলি ছিল সেগুলি হলো—শেষ বর্ষণ, শারদোৎসব, বসন্ত, সুন্দর, ফাল্গুনী। সুন্দর ও শেষ বর্ষণ ইতিপূর্বে মুদ্রিত হয়নি। ঋতু উৎসব আর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়নি।

ঔপনিষদ ব্রহ্ম — ১৩০৮ সালের শ্রাবণ মাসে ঔপনিষদ ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়। ১৩০৬ সালে প্রকাশিত 'ব্রহ্মোপনিষদ' নামে পুস্তিকাটি এই পুস্তকের ভিতর স্থান পায়। আখ্যাপত্র এই রকম—ঔপনিষদ ব্রহ্ম/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত/৫৫ আপার চিৎপুর রোড/শ্রাবণ ১৩০৮ সাল/মূল্য চারি আনা।

রবীন্দ্রনাথ যে অল্পবয়স থেকেই পিতার কাছে ঔপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন এ খবর সকলেই জানেন। উপনিষদের মুক্ত উদার জীবনদর্শন তার মনের মধ্যে প্রথম থেকেই সাড়া পেয়েছিল। ঔপনিষদ ব্রহ্ম গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বহু শ্লোকের ব্যাখ্যা করে সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

জীবনস্মৃতিতে মহর্ষিদেবের উপনিষদপাঠ সম্বন্ধে লিখছেন "সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসানা করিতেন।"

নৈবেদ্যকাব্যে ঔপনিষদিক চিন্তার যে প্রকাশ দেখা গেল তার আগেই উপনিষদ নিয়ে, বিভিন্ন মন্ত্র নিয়ে 'ঔপনিষদ ব্রহ্মে' রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করলেন। সমগ্র উপনিষদ রবীন্দ্রনাথ

পড়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান রচনায় যে অংশগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি কবি শুধু বার বার পড়েন নি, একেবারে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

উপনিষদের কয়েকটি শ্লোকে তাঁর কাব্যের মধ্যে কেমন ভাবে মিশে গেছে সে আলোচনাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

সারা জীবন তিনি এই পৃথিবীর প্রতি অসীম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। এমন কোন সংসারাতীত বস্তুকে তিনি মানতে পারেন নি যার টানে এই সংসারকে মায়া বলে পরিত্যাগ করতে উৎসাহ পাওয়া যায়। মাটির পৃথিবীর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণের কথা তাঁর পাঠক মাত্রেই জানেন।

ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক তুলে কবি বলছেন

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"

রবীন্দ্রনাথ এর ব্যাখায় বলছেন যে কর্মকেই কর্মের চরম লক্ষ্য বলে জানবেনা, কর্ম হলো ঈশ্বরের আদেশ "কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্মনির্বাহও ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ সাধনের জন্য ব্রহ্মসম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

ব্রহ্মাকে পাবার একমাত্র পথ, রবীন্দ্রনাথ যা স্বীকার করেছেন তা হলো এই সংসার— "সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার—আমাদের এই কর্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির।

আবার এই যে পৃথিবীর অনন্ত প্রাণপ্রবাহ নানা রূপে চলেছে, তার মূলে আছে প্রাণউৎসের পরম ঐক্য—একথা রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রের প্রতি, অহল্যার প্রতি, বসুন্ধরা কবিতায়, ছিন্নপত্রের চিঠিতে বলেছেন। ঔপনিষদ ব্রহ্মে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলছেন—"উপনিষদে আছে, যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে।....এই যাহা কিছু জগৎ সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণগুল্মলতা পুষ্প পল্লব পশুপক্ষী মনুষ্য চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অনু পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই-এক মহাপ্রাণের অনন্ত কম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই।"

এমনি ভাবে উপনিষদের আরও কয়েকটি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদ ব্রহ্মে ব্যাখ্যা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মতামতের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বলতে চেয়েছেন যে উপনিষদকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ আত্মীয়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন নৈবেদ্যর যুগে, যদিও "নৈবেদ্য রচনার পূর্বে 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' (পরে 'ব্রহ্মমন্ত্র') রচনার মধ্যেই কবিকে প্রথম স্বকীয়ভাবে উপনিষদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা যায়।" ক্ষুদিরাম বাবুর মূল বক্তব্য এ প্রসঙ্গে এই যে নিজের উপলব্ধির সমর্থনেই উপনিষদের বাণীকে কবি ব্যবহার করেছেন। "রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য জীবনের কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদ বা বেদ থেকে কোন কোন কল্পনা বা তত্ত্ব গ্রহণ করলেও আর কবিমানসের মূলে সমগ্রভাবে উপনিষদের বা বেদের প্রভাব স্বীকার করা যায় না, এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য মানতেই হয়।" (রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—২য় সংস্করণ পৃঃ ১৯৪)

প্রাচীন ভারতীয় ভূগোল গ্রীস্ ও রোমের অবদান

প্রসেনজিৎ সিংহ

প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দরবারে ভারতবর্ষের দান চিরশাশ্বত এ সত্য অনস্বীকার্য, কিন্তু আক্ষেপের কারণ তখনই ঘটে যখন দেখা যায় এই সুপরিচিত দেশটির ভৌগোলিক পারিপার্শ্বিকতা এবং যথাযথ অবস্থান সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রায়শঃই নীরব। ইতিহাস কি কেবল রাজনীতির আবর্তনে অবিরাম পরিবর্তনশীল রাজ্য ভাঙাগড়ার ধারাবিবরণীমাত্র? একথা স্বীকার করে নিলে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অপূর্ণতা ঘটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষের সুমহান আত্মার যে স্বরূপটি তার পুরাকালীন সাহিত্যে দর্শন, অর্থনীতি, সামাজিক আচারবিচার ও ধর্মীয় রীতি-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সমগ্র ও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে—তার পটভূমিকায় প্রচ্ছন্ন ভৌগোলিক বিবরণ অবশ্য একেবারে অবহেলিত বলা চলেনা। ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিকে আরও উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর করতে সাহায্য করেছে এই সুবিশাল উপ-মহাদেশের নিবিড় অরণ্য, উন্মুক্ত উর্ব্বর প্রান্তর, সুদীর্ঘ নদনদী, আকাশচুম্বিত পর্বতশ্রেণী আর ঊষর মরুর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাগের প্রাঞ্জল ও সুখকর বর্ণনা। ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্য অতি আধুনিক কালেও কম আকর্ষণীয় নয়; এরই ফলে বর্তমান জাতীয় সরকারের আয়ের উৎস হিসাবে বিদেশীর ভারত-ভ্রমণ একটি প্রয়োজনীয় বিষয় ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে।

প্রাচীনযুগেও ভারতবর্ষের রূপবৈচিত্র্যের রহস্যময় তুলনাহীনতা অনায়াসে দেশ বিদেশের পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকদের কাছে অপরিসীম মূল্যলাভ ক'রেছে তার অসংখ্য প্রমাণ আছে। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির প্রায় সমকালীন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার অবদানে প্রাপ্ত এই জাতীয় বিবরণগুলি উপরোক্ত সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। এই ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা যে কি কারণে সে যুগে 'ক্লাসিক্যাল্' রচয়িতারূপে সহজেই সম্মানিত হ'য়েছেন, তার কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয়না।

অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই যে এ'দের বিবৃতি নির্দোষ—তা নয়; সময়ে সময়ে বিবরণে উল্লিখিত বহু কষ্ট-কল্পিত ও অবিশ্বাস্য কাহিনী রীতিমত বিভ্রান্তিকর! কিন্তু যে কালের ভারতীয় ভৌগোলিক ইতিহাস প্রায় দুর্লভ, সেই অন্ধকারে এই বিদেশীজাতির রচনার ছায়াপথ দেখে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমরা অনন্যোপায়। কাজেই, তাদের রচনার মূল্যায়নও ঠিক এই ভাবেই হওয়া উচিৎ ব'লে মনে হওয়া একেবারে অসঙ্গত নয়।

ফিনীসীয় ও পারসিক বিবরণগুলি তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানের কিছু কিছু উল্লেখ ক'রেছে, কিন্তু তথ্যের দিক দিয়ে সেগুলিক বিশেষগুরুত্ব দেওয়া যায় না। অপরপক্ষে, যে গ্রীসীয় ভৌগোলিক বিবৃতিগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক থেকে পরবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় ভূগোলের উপর আলোকপাত ক'রেছে—তার মূল্য গভীর। পূর্ব্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এইসব বিবৃতি সবসময়েই নির্ভুল নয়। অনেকক্ষেত্রেই রচয়িতারা পরনির্ভরশীল হওয়াতে এইসব ত্রুটি ঘটেছে। যাঁরা, এ'দেরই মধ্যে আবার পর্য্যটকশ্রেণীর ছিলেন, তাদের রচনা অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রকৃত তথ্যের থেকে বিশেষ দূরে সরে যায়নি দেখা যায়। কিন্তু, যেখানেই রচনার মূল উপাদান অপরের-অভিজ্ঞতা-প্রসূত হ'য়েছে সেখানে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। হয়ত ভারতের ভাষা-

সমস্যাই এই সব বিবৃতির বিভ্রান্তির কারণ। ভারতবর্ষে প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা অনেকাংশেই তাঁদের স্বভাবতঃ পরমুখাপেক্ষী ক'রে তুলছে।

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে এই ধরণের রচনার মধ্যে যেটুকু অতিশয়োক্তি আছে তা হয়ত বা ইচ্ছাকৃত। কেননা, তাঁরা স্বদেশের কাছে ভারতবর্ষকে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে কিছু-মাত্রায় ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে দেখা যায় এই অতিশয়োক্তি ভারতকে উজ্জ্বল ক'রে তুলছে না বা তার মনোমুগ্ধকর একটা রূপ পরিবেশন করছেনা, সেখানে কি ক'রে এই মত মেনে নেওয়া যায়?

প্রাথমিক ভাবে, পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে তৎকালীন ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা নিতান্ত হাস্যকর মনে হয়। তাঁদের মতে পৃথিবী হ'লো একটি সমতল থালার মত বস্তু ও নদীসমুদ্র পরিবেষ্টিত! অবশ্য গ্রীসীয় ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি ভাগ্যক্রমে মানুষকে অধিকদিন এই বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকতে দেয়নি। বিখ্যাত মহাকবি হোমার ও তাঁর সমকালীন মনীষীরা সিসিলিদ্বীপ, ইতালি, গ্রীস্‌ এশিয়া মাইনর এবং মিশরের বাইরে কোথাও স্থলভাগ আছে—এ সত্য জানতেন না। তাঁদের এই অতি-সীমিতজ্ঞান কালক্রমে বিস্তৃত হয়েছিলো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম বলেন— "the first introduction of maps, at least in Greece, and the discovery of an instrument to fix the latitude by Anaximander, a disciple of Thales, helped this expansion". The Ancient Geography of India; পৃষ্ঠা xxi). কিন্তু কীনু বলেন, এর পূর্বেই মিশরীয়রা ও ব্যাবিলনবাসীরা মানচিত্র অঙ্কনে কৃতি হয়েছিলেন। (The Evolution of Geography—১৮৯৯। পৃঃ ৫

যেসব গ্রীসীয় ও রোমক মনীষীরা ভূবিজ্ঞানে উৎসাহবশতঃ ও ভারতবর্ষের প্রতি কৌতুহলবশতঃ প্রাচীন ভারতের ভূগোল রচনা করে গেছেন, তা বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক ও প্রাচীন-ভারতীয়-ভূগোল রচনায় পথিকৃত হ'লেও, আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য্য। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন ক'রে, তবেই এইসব উপাদান ব্যবহার যোগ্য হবে। সর্বপ্রথম প্রামাণ্য রচনা হিসাবে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ অব্দে রচিত 'পৃথিবী পরিক্রমা! বা 'দি সার্ভে অব্‌ দি ওয়ার্ল্ড' হেকাটিউস কর্তৃক প্রাচীন ভূগোলশাস্ত্রে একটি মূল্যবান সংযাজন। কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেখ করেছেন মাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বৃত্তান্তটি পরে হারিয়ে যায়।

হেরোডোটাস্‌কে 'ইতিহাস-জনক' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এঁ'র কালক্রম আনু-মানিক ৪৮৪-৪৩৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ। ইনি পরিশ্রমী পর্যটক ছিলেন। 'সমতল পৃথিবীর' হাস্য-জনক ধারণাটি তাঁর কাছে অবাস্তব ব'লে প্রতিভাত হ'লেও, জনসাধারণের সামনে পৃথিবীর যথার্থ আকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনও ধারণা তিনি তুলে ধ'রতে পারেননি। হেরোডোটাসের বিবরণপাঠে জানা যায়, তিনি সিথিয়া, আবিসিনিয়া ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অংশবিশেষ থেকে 'হারকিউলিসের স্তম্ভ' পর্য্যন্ত ভূভাগ অবহিত ছিলেন। ম্যাক্‌ক্রিণ্ডলের মতানুসারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ভারতবর্ষ যে পারস্যের পূর্ব্বে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী দেশ, এই তথ্যটুকুই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনভারতের ভৌগো-লিক বিবরণের জন্য হেরোডোটাসের বিবৃতির উপর বিশেষ নির্ভর করা চলেনা।

টিসিয়াস্‌ আনুমানিক ৩৯৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পারস্যের রাজপরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থটির কাহিনীগুলিকে প্রায় 'আষাঢ়ে গল্পের' সমপর্য্যায়ে ফেলা যায়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষপাদে এ দেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীসীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে একটি সহজও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আলেকজাণ্ডার স্বদেশ থেকে ভারতে আগমনের সময়ে সঙ্গে কিন্তু সংখ্যক নির্বাচিত বিজ্ঞানী ও সুপণ্ডিতকে নিয়ে এসেছিলেন। এঁরা ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সন্ধানে নিজেদের মননশক্তিকে নিয়োজিত করেন। অনুমান করা যেতে পারে, এই অসীম প্রতিপত্তিশালী গ্রীসীয় বীর ভারতের একটি সামগ্রিক চিত্র চোখের সামনে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন এবং সেইকারণেই এই তথ্যসংগ্রাহক ও বিবৃতিকারদের পরিবেশিত বিবরণ তার কাছে কম মূল্যবান ছিলনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিবৃতিগুলিকেও ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে এর অংশবিশেষ প্রয়োজনানুসারে ডায়োডোরাস্, প্লুটার্ক, ষ্ট্র্যাবো, কার্টিয়াস্, আরিয়ান্ এবং জাস্টিনাস্ প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক-রা তাঁদের রচনায় সবিশেষ গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এঁদের মধ্যে আরিয়ানের বিবরণকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মনে করা যেতে পারে নানাকারণে। তার মধ্যে বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার স্থান সর্ব্বাগ্রগণ্য।

আনুমাণিক ৩০২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষের নদনদী, পর্ব্বতশ্রেণী ও বিখ্যাত শহরগুলির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা তাঁর রচনায় দিয়েছিন।

আনুমাণিক ২৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক এরাটোস্থিনিস্ সর্ব-প্রথম ভূগোলশাস্ত্রে গণিত প্রয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। গোলাকৃতি পৃথিবীর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থানের মতবাদ তাঁরই সৃষ্ট। অবশ্য এই মতবাদ পিথাগোরাস ও থালেসের অনুমানের ভিত্তিতেই গ'ড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক বানবারির মতানুসারে, এই মতবাদের মৌলিকতাই পরবর্ত্তীকালে টলেমীর মতন প্রখ্যাত ভূগোলশাস্ত্রবিদ্‌কে আসল রহস্য উদ্ঘাটনে প্রেরণা দেয়।

ষ্ট্র্যাবো তাঁর অভিজ্ঞতানুযায়ী পূর্বসূরীদের ভ্রমগুলি সংশোধনে ব্রতী·হন। সমতল মানচিত্রে পৃথিবীর অভিক্ষেপন যে অংশতঃ দুষ্ট, তার প্রতি তিনি সুস্পষ্ট ইংগিত করেন। ভারতবর্ষের দূরত্ব ও পূর্বসূরীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব—প্রধানতঃ এই দুই কারণে তিনি রচনাকালে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন।

প্লিণী ইতিহাসে 'ন্যাচারালিষ্ট' নামে পরিচিত। এঁর কালক্রম আনুমানিক ২৩-৮১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল বলেন— "his love for the marvellous disposed him to accept far too readily even the most absurd fiction".

বাস্তবিকই তাঁর রচনায় এই ধরণের বহু অসতর্কতা আমাদের চোখে পড়ে। সাধারণভাবে ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে তিনি কিন্তু আলোচনা করেছেন। প্লিণীর বিবৃতি অনেকসময়েই অনভিজ্ঞ-নাবিক-প্রদত্ত-বিবৃতি এবং সম্রাট আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসি-কদের কল্পনাপ্রসূত কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে এক বিসদৃশ ও অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি ক'রেছে।

হিপ্পেলাস্ সর্বপ্রথম মৌসুমীপ্রবাহের দিক ও গতি নির্ণয় ক'রে, সেই গবেষণালব্ধ ফলাফলকে তৎকালীন বাণিজ্যিক ব্যাপারে প্রয়োগ করবার রীতি প্রচলন করেন।

কোনও অজ্ঞাত নামা লেখক রচিত 'দি পেরিপ্লাস অব্ দি এরিথ্রিন সী' খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকুল সম্বন্ধে একটি মোটামুটি আভাস দেয়। এই অজ্ঞাতনামা লেখক ব্যক্তিগতভাবে নেলকিন্ডা পর্যন্ত ভারতবর্ষের উপকূল অঞ্চল পরিদর্শন করেন ও একটি সম্পূর্ণ

চিত্র ফ্রুটিয়ে তুলতে প্রয়াসী হন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়—তিনি এদেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চল-গুলি সম্পর্কে বিশেষ পরিচিতি কোথাও রেখে যেতে পারেননি। অনুমিত হয়, তিনি এইসব অঞ্চল সম্ভবতঃ পরিভ্রমণ করেননি। এই অনভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি পৈঠানকে নিঃসংশয়ে ব্যারিগ্যাজা'র (ভৃগুকচ্ছ) দক্ষিণে নির্দ্দেশ করে তার দূরত্ব নিরূপণ করেছেন কুড়িদিনের ভ্রমণ। অথচ পৈঠান প্রকৃতপক্ষে ব্যারিগ্যাজা থেকে মাত্র দু'শ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এইসব কারণেই আভ্যন্তরীণ ভূগোলের দিক দিয়ে 'পেরিপ্লাস' বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হ'তে পারেনা।

টলেমী (আনুমাণিক ১৫০ খৃষ্টাব্দ?) একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, ভূগোলশাস্ত্রবিদ, ঐতিহাসিক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ্ রূপে বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকাকালীন তিনি ভূগোল-শাস্ত্রে জ্যামিতিক পদ্ধতির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে কোনও স্থানের প্রকৃত অবস্থান তারই একান্ত স্বউদ্ভাবিত। আধুনিক ঐতিহাসিক কানিংহ্যাম টলেমীর কয়েকটি ভ্রম আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। ভারতবর্ষের থাকার ও অবস্থান সম্বন্ধে টলেমীর দুটি ভ্রম অত্যন্ত মারাত্মক।

ক। টলেমীর মতে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আকার উত্তরভাগে সংকীর্ণ ও দক্ষিণে প্রশস্ত; এই কারণে এশিয়ার পূর্বভাগ থেকে ইউরোপ ও আফ্রিকার দূরত্ব প্রচুর হয়ে গেছে।

খ। উপরোক্ত কারণেই টলেমীর মানচিত্রে পৈঠানের অবস্থান ঘটেছে বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরে, লঙ্কাদ্বীপের আকৃতি হয়েছে বিশাল, ক্যান্টনের কাছে গঙ্গার সাগর-সম্মিলন হয়েছে, শ্যাম ও কাম্বোডিয়ায় মহানদী প্রবাহিত হয়েছে এবং টঙ্কুইন্ ও পিকিং-এর পূর্বে পাটালিপুত্র স্থান পেয়েছে।

যদিও এই ধরণের ভ্রম অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক, তবুও সেই যুগের ভারতীয় ভূগোল রচনায় টলেমীর দান অপরিসীম। কেননা, এই সব ভ্রম ঘটেছে তাঁর অভিক্ষেপনের দোষেই, কিন্তু তাঁর প্রয়াসই, ভৌগোলিকশাস্ত্রের একটি নতুন দিক, পরবর্ত্তী কালের ভূগোলশাস্ত্রবিদ্দের সামনে তুলে ধরেছে।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় গ্রীসীয় ও রোমক লেখকেরা ভারতবর্ষের পাঞ্জাব (ভারত ও পাকিস্তান), উত্তর—পশ্চিম সীমান্ত (পশ্চিম পাকিস্তান) এবং সিন্ধু অঞ্চলের (পশ্চিম পাকি-স্তান) বিষয় একটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণে অনেক দোষত্রুটি থাকলেও, তাঁর বিবরণই বোধহয় এদিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা দেশের হিন্দী-কবি নিরালা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

হিন্দী জগতের সুপ্রসিদ্ধ কবি নিরালা (১৮৯৬-১৯৬১) দীর্ঘ রোগভোগের পরে ৬৫ বছর বয়সে সম্প্রতি লোকান্তরিত হন। কবি-জীবন তাঁর অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। গত ১৫ বছর ধরে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য নতুন কিছু লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৯২০-১৯৪৫ এই পঁচিশ বছর তাঁর সাহিত্য-জীবনের পরিধি।

হিন্দী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবিরূপে পরিচিত হলেও জন্ম ও শিক্ষাসূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে। পরবর্তী জীবনের প্রারম্ভিক অংশও (৩২ বছর বয়স পর্যন্ত) অতিবাহিত হয় এই বাংলাদেশে। পিতা রামসহায় ত্রিপাঠী উত্তর প্রদেশের পল্লী অঞ্চল থেকে এসেছিলেন তৎকালীন মহিষাদল রাজ্যের সামরিক চাকরী নিয়ে—সিপাহীর চাকরী। যোগ্যতা-বলে তিনি জমাদার পর্যন্ত হয়েছিলেন। সেই উত্তর প্রদেশীয় জমাদারের ছেলে 'সুরিয়কান্ত' (সূর্যকান্ত) মহিষাদলের বাঙালী সহপাঠীদের সঙ্গে রীতিমত বাঙালি হয়ে উঠলো। একদিকে গৃহ-জীবন মাতৃভাষা অবধী (হিন্দী), অন্যদিকে বহির্জীবনে শিক্ষার ভাষা বাংলা—দুই-ই তার পক্ষে সমান ছিল। উত্তরকালে কবি মাঝে মাঝে একথা বলতেন (এবং তাঁর "প্রবন্ধ প্রতিমা" গ্রন্থেও তা বলা হয়েছে) —"হিন্দীর ন্যায় বাংলাও আমার মাতৃভাষা।" বস্তুত মাতৃভাষার মতো সহজভাবেই তিনি বাংলা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা গান ও কবিতা, বিশেষভাবে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও-কবিতা, ছিল তাঁর পরম প্রিয় বস্তু। কবির বিভিন্ন ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, জীবনের নানা সুখদুঃখের মধ্যে হিন্দীভাষী বন্ধু বান্ধবদের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়া এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনানোর মতো তৃপ্তিকর আর কিছুই ছিলনা। কবি যে সমস্ত গান গাইতেন, তার মধ্যে কয়েকটি এই; '(১) আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী; ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী। (২) যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে। (৩) সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িবনা। ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে হিন্দীর প্রসিদ্ধ মহিলা কবি মহাদেবী বর্মার বাড়ীতে কবি নিরালা যখন একের পর এক গাইছিলেন—আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে····যদি বারণ কর তবে গাহিবনা ইত্যাদি, তখন উপস্থিত সাহিত্যিক মণ্ডলী থেকে অনুরোধ জানানো হল কবির নিজের গান গাইতে। উত্তরে কবি বললেন, "আমার গান শুনে কী হবে? শিল্পসুষমার চরমরূপ রবীন্দ্র-সঙ্গীত।"

এহেন কবি বাংলা লেখা পড়া শিখে যদি একনাগাড়ে বাংলাদেশেই থেকে যেতেন তবে হয়তো এই শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে একজন উত্তরপ্রদেশীয় বাঙালী কবির আবির্ভাব কিছু অসম্ভব হতনা। কিন্তু কবির অধ্যয়ন ও সাহিত্য সাধনার মোড় ঘুরে গেল একটি ঘটনায়। সেটি হল তাঁর বিবাহ। এগারো বছরের একটি দেশোয়ালী বালিকার সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন কবি বিদ্যালয়ের ছাত্র; বয়স মাত্র চৌদ্দ। তিন বছর বয়সে মা-কে হারাবার পরে দেশী ভাষার সঙ্গে কবির নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হল বৈবাহিক সূত্রে। উন্নাব্‌ জেলার গড়কোলা গ্রামের মনোহর কান্তি কিশোর বর সূর্যকান্তকে দেখে শ্বাশুড়ী সন্তুষ্ট হলেও বিয়ের আগেই এই প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে নিয়েছিলেন যে, মেয়ে ৬ মাস থাকবে মায়ের বাড়ীতে, আর বাকী ৬ মাস শ্বশুর বাড়ী গড়কোলায়—সুদূর 'বাংগাল' দেশে তাঁর একমাত্র আশ্রয়-কে নিয়ে যাওয়া

চলবেনা। ফলে সূর্যকান্তের মহিষাদল থেকে গড়কোলায় যাতায়াত বেড়েই গেল এবং সেই হারে বেড়ে চলল অবধী ভাষার জ্ঞান। খড়ীবোলী হিন্দী তখনও তেমন রপ্ত হয়নি। সেজন্য এগারো বছরের বালিকার কাছেও তাঁর লজ্জা বোধ হল। উত্তরকালে 'গীতিকা' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে স্বর্গীয়া পত্নীকে লক্ষ্য ক'রে কবি যা বলেছেন তার মর্মার্থ এইরূপ; 'প্রথম পরিচয় কালে যার হিন্দী জ্ঞানের আলোর সম্মুখে আমি চোখে চোখ মেলাতে পারিনি, বরং লজ্জা পেয়ে হিন্দী শিক্ষার সংকল্প নিয়ে দেশ থেকে বিদেশে (বাংলাদেশে) বাবার কাছে চলে গেলাম; যার কন্ঠ-সঙ্গীত আমার সঙ্গীতকে হার মানিয়েছিল; আমার রুক্ষমূর্তি দেখামাত্র যার মৈত্রী-দৃষ্টিতে দেখা দিত প্রসন্ন হাসি; অবশেষে যে নারী অদৃশ্য থেকে তার চেতনা কর-কমল দিয়ে আমার জড় হাতকে তুলে নিয়ে দিব্যশৃঙ্গারের পূর্ণতা ঘটিয়েছে, সেই লোকান্তরিতা মনোহরা দেবীকে'।

মহিষাদলে ফিরে এসে কবি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সরস্বতী'র সাহায্যে খড়ী-বোলী হিন্দীর সাহিত্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে থাকেন। অন্যদিকে অবধী, ব্রজভাষা ও বাংলার প্রতি আকর্ষণও ছিল। কবির সেই সময়-কার সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত পংক্তি দুটির প্রতি নজর দিতে পারিঃ

কিরি অঙ্গ্-ভঙ্গ্ বঙ্গ্‌ভাষাকে সমস্ত ছন্দ
ব্রজ-অব্‌ধীমেঁ অব কবিও হমেঁ লিখনো হৈ।

শোনা যায়, এই সময়ে তিনি কিছু বাংলা কবিতাও রচনা করেছিলেন। সাহিত্যচর্চা অগ্রসর হলেও বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী পর্যন্ত এসে লেখাপড়া আর অগ্রসর হলনা। সেই বয়সেই সূর্য-কান্তের কেমন একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে, কবির পক্ষে বিদ্যালয়ের গন্ডীবাঁধা অধ্যয়নের আবশ্যকতা নেই। চোখের সামনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঠিকভাবে সাহিত্য জীবন শুরু হওয়ার আগেই কবির পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। ১৯১৬ সালে স্ত্রীর মৃত্যু এবং তার কিছুকাল পরে পিতার পরলোক গমন কবিকে দু'দিক থেকে আশ্রয়-চ্যুত করল। ২০ বছর বয়সে বিপত্নীক কবি দুটি শিশু-সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্যজীবনের পরিবর্তে কর্ম-জীবনের সন্ধানে বেরোলেন—যে কর্ম-জীবনে চরম ব্যর্থতা-ই ছিল তাঁর বিধিলিপি। এলেন মহিষাদলে, কিন্তু রাজকর্মচারী হওয়া তাঁর বেশিদিন পোষালনা। ১৯২০ সালে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলেন কলকাতায়।

নিরালার সাহিত্যসাধনার প্রধান কেন্দ্র দুটি—কলকাতা ও লখনউ। ১৯২০ থেকে ১৯২৮ এই আট বছর কলকাতায়; ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ এই চৌদ্দ বছর লখনউতে; বাকি অংশ কখনো এলাহাবাদে, কখনো তাঁর পৈতৃক ভিটে গড় কোলায়।

কলকাতায় যখন চাকরীর জন্য ঘোরঘুরি করছিলেন, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগা-যোগের ফলে বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হিন্দী মাসিকপত্র 'সমন্বয়' সম্পাদনার কাজ পেয়ে যান। প্রথমে অবৈতনিক, পরে কিছু বেতনের ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন এই কাজ চলল না। কারণটা আর্থিক নয়, সাহিত্যিক। বেদান্ত সাহিত্যের উচ্চাসন থেকে রস-সাহিত্যের সরোবরে অবতরণের জন্য কবি-চিত্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। সুযোগও জুটে গেল একটা। ১৯২০-১৯২২ এই দু বছর সমন্বয় সম্পাদনাকালে কবি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের যে পরিচয় লাভ করেন, তাঁর জীবনে তার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ও প্রত্যক্ষ প্রভাব—বিপত্নীক যুবক কবির দ্বিতীয়বার দায়পরিগ্রহ না করা। দ্বিতীয় ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে তাঁর সাহিত্যে। রামকৃষ্ণমিশন, তার সেবাধর্ম তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও সারদানন্দের প্রভাব ও পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর প্রবন্ধে ও

কবিতায়।

কলকাতার জনৈক শেঠ—নাম মহাদেবপ্রসাদ—একটি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন—নাম হল "মত্‌বালা"। সূর্যকান্ত এসে যোগ দিলেন সেখানে এবং মত্‌বালা-র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবি তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'নিরালা'। মাত্র একবছর এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত থেকেই কবি স্বনামে, বেনামে ও ছদ্মনামে প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প রচনা ক'রে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন। পরবর্তীকালে কবি লিখেছেন; এই সময়ে বেদান্ত-বিষয়ক নীরস সাম্প্রদায়িক পত্র 'সমন্বয়' ছেড়ে দিয়ে মনসা, বাচা ও কর্মণা সরস কবিতা-কুমারীর উপাসনায় লেগে গেলাম।' হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে এইভাবে একটি নতুন নাম যুক্ত হল 'নিরালা' অর্থাৎ সব চেয়ে আলাদা ও অদ্ভুত। সার্থকনামা কবি। নিরালার সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কাব্যসাহিত্যের গুণাগুণ নিয়ে হিন্দীর ক্ষেত্রে যত বাদ-বিতণ্ডা-মতভেদ দেখা দিয়েছে, তার ইতিবৃত্ত বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

মূলত কবি হলেও নিরালার প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি প্রবন্ধ। ১৯১৯ সালের সরস্বতী' পত্রিকায় মুদ্রিত সেই প্রবন্ধটির বিষয় বস্তু হল বাংলা ও হিন্দী ব্যাকরণের তুলনাত্মক আলোচনা। নবীন লেখকের রচনা সমাদৃত হলেও সেই সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীর কাছ থেকেই তাঁর কবি-সত্তা প্রথম আঘাত পেল যখন তাঁর কবিতা 'জুহী কী কলী' সম্পাদকের দপ্তর থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে। ১৯১৬ সালে রচিত এই কবিতাটি হিন্দী সাহিত্যের একটি বহু—আলোচিত এবং নিরালা সাহিত্যের বোধ করি, সর্বাধিক আলোচিত কবিতা। রচনার সাত বছর পরে কবির স্ব-সম্পাদিত 'মত্‌বালা' পত্রিকায় সেটি প্রথম প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করে। ভাব, ভাষা ও ছন্দ সকল দিক থেকে নিরালা হিন্দী সাহিত্যে আসরে 'নিরালা' অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও অদ্ভুত হয়ে দেখা দিলেন। সমাদর যা পেয়েছিলেন, বিদ্রূপের আঘাত জুটেছিল তার ঢের বেশি। হিন্দী সমালোচনা সাহিত্য নিরালার কাব্যসাধনা ও সিদ্ধি সম্পর্কে আজও দ্বিধাগ্রস্ত।

নিরালা-কাব্যের রসাস্বাদনের প্রথম বাধা—ভাবের অস্পষ্টতা। দ্বিতীয় বাধা ভাষার দুরূহতা। তৃতীয় এবং সবচেয়ে কঠিন বাধা—ছন্দের অব্যবস্থা। যে কবির অন্যতর মাতৃভাষা বাংলা, মধুসূদন-গিরিশচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক যিনি মূলরূপে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, দোহা-চৌপঈ-প্লাবিত হিন্দী সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক ও অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। মধুসূদনকে নিয়ে প্যারোডী হয়েছিল, নিরালাকে নিয়েও হ'তে থাকল। হিন্দী সাহিত্যের অনেক 'বাদ'-এর মধ্যে একটির নাম 'ছায়াবাদ'—যার অন্যতম প্রবর্তক নিরালা। সহযাত্রী প্রসাদ, পন্ত্‌ প্রমুখ কবিও কতকটা বাংলার কাছে ঋণী ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিম্নলিখিত আক্রমণের লক্ষ্যস্থল যে নিরালা বুঝতে কষ্ট হয় না।—

> কিসনে **ছায়াবাদ** চলায়া, কিসকী হৈ য়হ্‌ মায়া ?
> হিন্দী ভাষামেঁ য়হ্‌ ন্যারা শব্দ কহাঁ সে আয়া? তারপরে আছেঃ
> মত পীছে পড়ো **বঙ্গালী** কবিয়োঁকে তুম,
> কবি সম্রাট হো য়া বাপ হো সম্রাটোঁকে।

নিরালা উত্তরে বলতেন; 'কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু হাতী চলে তার আপনার তালে। ব্যাঙের ডাকে মেঘের গর্জন বন্ধ হয়না।' (কুত্তে ভূখতে হী রহতে হৈঁ, হাথী আপনী চালমেঁ চলা জাতা হৈ। সে ঢকোঁকী টর্র্‌-টর সে বাদলোঁকা গরজনা নহী রুক্‌তা।) কিন্তু এ হল আক্রমণের প্রত্যাক্রমণ, সাহিত্য বিশ্লেষণ নয়।

নিরালা আত্মবিশ্লেষণ করলেন তাঁর 'পরিমল' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায়। ছন্দ

সম্পর্কে বললেন; 'লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, আর সেই জপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জিহ্বাগ্র থেকে প্রতিদিন প্রবাহিত হচ্ছে ভাষার মুক্তি প্রবাহ। কিন্তু সেই মন্ত্রের অর্থ ও সার্থকতা তাঁরা ভুলে গেছেন। ব্রহ্ম যেমন মুক্ত-স্বভাব, তেমনি মুক্ত এই গায়ত্রী-ছন্দ।....বৈদিক সাহিত্যে ছন্দো-মুক্তির এরূপ উদাহরণ অজস্র।....অনন্ত মহাসমুদ্রের বুকে ছোট-বড়ো সমস্ত তরঙ্গ যেমন দূর প্রসারিত দৃষ্টিতে একাকার, একই লয়ে উত্থানপতনশীল বলে বোধ হয়, মুক্তছন্দও তেমনি বিষম লয়ে একই সাম্যের অপার সৌন্দর্যের আভাস দেয়। মুক্তছন্দ ছন্দের ভূমিতে থেকেও মুক্ত। তার আসল তাৎপর্য প্রবাহ। প্রবাহে তার ছন্দত্ব, নিয়ম-রাহিত্যে তার মুক্তি।'

বাঙালি পাঠকের মনে রাখা প্রয়োজন, এ ভূমিকা লেখা হয়েছিল ১৯২৯ সালে, রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যরচনা এবং গদ্য-ছন্দ নিয়ে আলোচনার তিন বছর আগে। জুহী কী কলী রচিত হয় তারও ১৩ বছর পূর্বে। সুতরাং নিরালা পুরোপুরি বাংলার কাছে ঋণী ছিলেন বলা কঠিন। অবশ্য মধুসূদনের মিলহীন প্রবহমান পয়ার এবং গিরিশচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ ছন্দ যে তাঁকে সাহস জুগিয়েছিল সে কথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। 'জুহী কী কলী' সেই স্বচ্ছন্দ ছন্দে রচিত। কিন্তু সত্যই কি তা মধুসূদন বা গিরিশচন্দ্রের ছন্দের সগোত্র? নিরালা যে মুক্ত ছন্দে কবিতা লিখেছেন, আসলে তা বাংলার 'মুক্তক' নয়, গদ্যছন্দ। 'সে নাচেনা, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা।..তার ভঙ্গি পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহারে গদ্যের চাল।' নিরালার কবিতায় সেই গদ্যছন্দের মুক্ত পদক্ষেপ। তিনি দেখিয়েছেন, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

উল্লিখিত কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে গৃহীত, কিন্তু নিরালার রচনায় সর্বপ্রথম পরীক্ষিত। 'জুহী কী কলী'র প্রথম কয়েকটি পংক্তি এইরূপঃ

বিজন-বন-বল্লরী পর অমল-কোমলতনু তরুণী—জুহী কী কলী,
সোতী থী সুহাগ-ভরী স্নেহ-স্বপ্ন-মগ্ন দৃগ বন্দ কিয়ে শিথিল পত্রাঙ্কু মেঁ।

হিন্দী সাহিত্যের অগ্রণী সমালোচক রামচন্দ্র শুক্ল একে বলেছেন চরণের স্বচ্ছন্দ বিষমতা। অসম চরণের অদ্ভুত পরীক্ষাই নাকি নিরালা-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ছন্দোবিৎ হিন্দী সমালোচকবৃন্দকে আমরা এ সম্পর্কে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

কবিতাটির প্রথমাংশের ভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ব্যাপারটা কতখানি অস্পষ্ট। কবি বলছেনঃ 'বিজন বনের বল্লরীতে, শিথিল পত্রে পর্যঙ্কে শুয়েছিল একটি অমল-কোমলতনু তরুণী—যূথীর কলিকা। প্রেমময়ী, নিমীলিতাক্ষ, ভালোবাসার স্বপ্নে নিমগনা।' তারপরে? 'কাল বসন্তকালের রাত্রি। বিরহ-বিধুর প্রিয়াকে ছেড়ে মলয় পবন ছিল বহুদূর দেশে।'

বাসন্তী নিশা থী; কিসী দূর দেশ মেঁ থা পবন
বিরহ-বিধুর-প্রিয়া-সঙ্গ ছোড় জিসে কহতে হৈঁ মলয়নিল!

'তারপরে বিরহের দিনে মনে এলো সেই মিলন-মাধুরী কথা' মনে এলো জ্যোৎস্না-ধৌত অর্ধরাত্রি, মনে এলো কান্তার কম্পিত কমনীয় কান্তি। আর কি? মলয়ানিল ধেয়ে চলল নদী-সরোবর-উপবন পেরিয়ে, দুর্গম অরণ্য-পর্বত ডিঙিয়ে, কুঞ্জলতাপুঞ্জের আকর্ষণ উপেক্ষা ক'রে। লক্ষ্য তার সেইদিকে যেখানে মিলন হয়েছিল যূথীর কলিকার সঙ্গে।'

আঈ য়াদ বিছুরন সে মিলন কি রহ মধুর রাত
আঈ য়াদ চাঁদনী কী ধুলী হুই আধীরাত,
আঈ যাদ কান্তা কী কম্পিত কমণীয় গাত।
ফির ক্যা? পবন

উপবন-বন-সরিত গহনগিরি-কানন
কুঞ্জ-লতাপুঞ্জোকো পারকর
পহুঁচা জহাঁ উসনে কী কেলী
কলী-খিলী সাথ।

অবাঙালী পাঠকের কি মনে হয় জানিনা, আমাদের মনে হয় মহিষাদল-প্রবাসী কিশোর প্রেমিকের মন ছুটে চলেছে বৈস্‌বাড়া-র সেই ডলমউ বা গড় কোলার অভিমুখে যেখানে রয়েছে তার 'জুহী কী কলী'—কিশোরী মনোহরা দেবী। মনেরাখা প্রয়োজন, কবিতাটি রচিত হয় মহিষাদলে, স্ত্রীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে।

রামচন্দ্র শুক্ল বলেছেন, সমাস-গুম্ফিত পদগুচ্ছ, ক্রিয়াপদের লোপ ইত্যাদি থেকে নিরালার রচনায় বাংলার কাব্যশৈলীর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোদ্ধৃত কাব্যাংশগুলিতে বিজন-বন-বল্লরী, স্নেহ-স্বপ্ন-মগ্ন, অমলকোমলতনু, বিরহ বিধুর প্রিয়া, গহনগিরিকানন ইত্যাদি শব্দ সমষ্টি-তৎসম রচনায় বাংলার প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই, হিন্দী ও বাংলার শব্দগত পার্থক্য কি এতই মৌলিক যে নিরালার এই ঋণ-গ্রহণে হিন্দীর আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে? ভাব ছন্দ ও ভাষার দিক থেকে 'জুহী কী কলী'র যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল, পাঠক তার থেকে বিচার করবেন হিন্দী-সাহিত্য-সরস্বতী-র পূজারীরা কবিতাটি ফেরৎ পাঠিয়ে কতটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

নিরালার উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব কিছু অস্বাভাবিক নয়। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদ করেছেন, অনুবাদ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। 'রবীন্দ্র কবিতা কানন' গ্রন্থে (১৯২৮) আলোচনা করেছেন কবির সংকল্প, স্বদেশ প্রীতি শিশু-বিষয়ক রচনা, প্রেম, সঙ্গীতকাব্য এবং কবি-প্রতিভার বিকাশ নিয়ে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ থেকে সেই আলোচনার সূত্রপাত। "প্রবন্ধপ্রতিমা" গ্রন্থে (১৯৩০) চন্ডীদাস প্রভৃতি কবি সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু এই পর্যায়ের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আলোচনা মধ্যযুগীয় হিন্দী কবি বিহারীর ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। 'রীতিকাল'-এর প্রতিনিধি কবি বিহারীর শৃঙ্গার-রসে নিমজ্জিত হিন্দী চেতনাকে নিরালা রবীন্দ্রসাধনার মন্দ্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কোনো দার্শনিক সাধনা নয়, সাহিত্যিক সাধনা। রুচির উৎকর্ষ, ভাবের সূক্ষ্মতা। একটি উদাহরণ ধরা যাক। ফোটা শিউলির উপরে শিশির বিন্দু। শিউলি ফুলের মনের কামনা হল ঐ দূর আকাশের ভালোবাসা। কিন্তু সে তো নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, তাই সে নীরব আহ্বান (মূক আবাহন) জানায় আকাশের কাছে। লজ্জায় তার কপোল রাঙা হয়ে আসে, মিলনের ব্যাকুলতায় পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয় সারারাত ধ'রে। আর তারই উপর আকাশের কোমল চুম্বন নেমে আসে শিশিরের রূপ ধ'রে —

> মূক আবাহন ভবে লালসী কপোলোঁকে ব্যাকুল বিকাস পর
> ঝরতে হৈঁ শিশির সে চুম্বন গগনকে। —(শেফালিকা)

এ ধরণের বিষয়-বস্তু বা প্রকাশরীতি কোনোটাই হিন্দীর দস্তুর ছিল না। তাই নিরালার ছায়াবাদ বৈদেশিক বলে নিন্দিত হলে কবি ক্ষুব্ধ বেদনায় বলেছিলেন—'হিন্দীতে সাহিত্যসৃষ্টির যুগ এখনও ঠিক ঠিক আসেনি। বিংশ শতকে নির্মীয়মাণ সাহিত্যের উপকরণ হিন্দীতে নেই।' আরও বলেছিলেন—'অন্য ভাষার সাহিত্যর সঙ্গে যদি আদানপ্রদান না ঘটে তবে হিন্দীর কূপ-মণ্ডূকত্ব দূর হবে না। মহাকবি ও মহৎ সাহিত্যিকের আবির্ভাব রুদ্ধ হয়ে থাকবে।'

বাংলা সাহিত্য কবিকে নিরন্তর প্রেরণা দিলেও বাংলা দেশ তাকে বেশিদিন জীবিকা দিতে পারেনি। এক বছর কাজ করার পর 'মত্‌বালা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল। আরও পাঁচ বছর তিনি কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু রুজি-রোজগারের বিশেষ কিছু সুরাহা হল না। অর্থাভাবে কবিকে নানা ধরণের বাজারু কাজ করতে হয়েছে—অনুবাদ, বিজ্ঞাপন, ওষুধের পুস্তিকা ইত্যাদির জন্য কবির শক্তিও সময় ব্যয়িত হয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাঁকে চলে যেতে হয় লখনউ, এবং

দীর্ঘ ১৪ বছর (১৯২৮-১৯৪২) একরকম এই শহরেই অতিবাহিত হয়। কলকাতার সাধনা লখনউ এসে ফলবতী হল। একদিকে যেমন কাজের সংস্থান হল 'সুধা' পত্রিকা এবং 'গঙ্গা-পুস্তক-মালা' নামক প্রকাশন-সংস্থায়, অন্যদিকে তেমনি বন্ধুরূপে পেলেন দুই প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিকে—জয়শঙ্কর প্রসাদ এবং সুমিত্রানন্দন পন্ত। একদল ছাত্রকে পেলেন ভক্ত পাঠক রূপে। কলকাতায় ছিলেন একাকী, পেয়েছিলেন বিরোধ। লখনউ-তে পেলেন গোষ্ঠী, পেলেন সম্বর্ধনা। এতদিনের সঞ্চিত পাণ্ডুলিপিগুলি এবং সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগ পেল। লখনউ-বাস নিরালার সাহিত্যজীবনের আশীর্বাদ।

কিন্তু কলকাতাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, ভুলতে পারেন নি বাংলাদেশকে। বাংলার জলবায়ু, ঋতুবৈচিত্র্য, নদীনালা-পুকুর বড়ো ভালো লাগত তাঁর। বাংলা ও 'রোমান্টিক' এ দুটি শব্দ ছিল তাঁর কাছে সমার্থক। কবিতা-রচনার জন্য লখনউ অপেক্ষা কলকাতার পরিবেশকে তিনি অনুকূল মনে করতেন। আর বলতেন—'যতদিন বেঁচে আছি, কলকাতাকে আমি ভুলতে পারিনা'। (জবতক মেরী আঁখ খুলী হৈ, মৈঁ কলকতা কো ভূলনহীঁ সকতা।)

একবার কিন্তু বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে এলাহাবাদের জনৈক বাঙালি বন্ধুকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—'মৃতের সংখ্যা ছেপে ছেপে পত্রিকায় দুর্গন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার বাংলাদেশ বদলায়নি। লক্ষ লক্ষ লোক কুকুরের মতো মরছে। না হয় তারা ডাকাতি ক'রে, লুটপাট ক'রে, রাজকোষ আক্রমণ ক'রে গুলি খেয়ে মরতো। ক্ষমা কর বন্ধু, বংগালী বহুৎ গাবদী (গায়+ধী অর্থাৎ গোরুর মতো বুদ্ধি অর্থাৎ মূর্খ) হোতে হৈঁ।'

গদ্যে-পদ্যে নিরালার মৌলিক রচনা-সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা সব দিকেই তিনি লেখনী চালিয়েছেন। প্রধানত কবিরূপে পরিচিত হলেও তাঁর গদ্যরচনা বেশ শক্ত সমর্থ সন্দেহ নেই। গদ্যে হোক, পদ্যে হোক ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। একদিকে আবেগ ও উচ্চকাঙ্ক্ষা, অন্য দিকে প্রাচীনপন্থী সাহিত্যরথীদের বিরোধিতা; একদিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের উচ্চাদর্শ প্রচার, অন্যদিকে পদে পদে তাঁদের ভণ্ডামিও অসাধুতা—এই সংঘর্ষ ও অসঙ্গতি নিরালাকে অনেকটা উগ্র ক'রে তুলেছিল। এবং এই উগ্রতার ফলেই শেষ জীবনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অন্যায়ের সঙ্গে ক্রমাগত আপোষ ক'রে চললে যেমন তার পরিণতি ভয়াবহ হাতে পারে, তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করতে গেলে তার পরিণাম যে কতটা শোচনীয় হ'তে পারে হিন্দী সাহিত্যের নিরালা তার একটা বড় উদাহরণ। ধনিক শ্রেণীর কপট দেশপ্রেম সম্পর্কে একজায়গায় বলেছেন, হিন্দুস্তানের বড় লোকদের উচিত লক্ষ্মীর বাহন উল্লুর (পেঁচা) উপর আরোহণ করা, কিন্তু আশ্চর্য এই তারা মোটর গাড়িতে চড়ে এবং আরো আশ্চর্য নিজেদেরকে দেশভক্ত বলে জাহির করে। জওহর লাল নেহরুর দেশভক্তি সম্পর্কে নিরালার মনোভাব কিরূপ ছিল বোঝা যায় "আজকল পণ্ডিতজী দেশমেঁ বিরাজতে হৈঁ" এই ব্যঙ্গকবিতা থেকে।

নিরালার সবচেয়ে দুঃসহছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের পাণ্ডাগিরি, সাহিত্য জ্ঞানবর্জিত ব্যক্তিদের খবরদারি। এলাহাবাদের 'হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন' নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন, এই সম্মেলনের কর্ণধারগণ বিদ্যার্থীদের কর্ণধারণে যতটা উদ্যত, সাহিত্যের ধ্রুবজ্ঞান থেকে ততোধিক বঞ্চিত। ১৯৩৮ সালে ফৈজাবাদের প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরুদ্ধ হ'লে তিনি কর্মকর্তাদের কাছে একটি মাত্র শর্ত রেখেছিলেন যে, সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যিকদের প্রাধান্য থাকা চাই, রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলবেনা। কথা হল,

প্রবীণ সাহিত্যসেবী রামচন্দ্র শুক্ল হবেন মূল সভাপতি। কিন্তু সভায় গিয়ে দেখলেন ব্যাপার অনরূপ। টণ্ডন ও সম্পূর্ণানন্দ—উত্তর প্রদেশের দুই ধুরন্ধর রাজনীতিক—সাহিত্য সভার মণ্ডনায়ক। কবি ক্ষুব্ধ হলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নরেন্দ্রদেব তাঁর ভাষণে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে আজ দুজন মহাপুরুষ উপস্থিত হয়েছেন। একজন পূজ্য বাবু পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন, দ্বিতীয় জন মাননীয় সম্পূর্ণানন্দ।' নিরালা লিখছেন ; 'আমার মনে ভারি গ্লানি জন্মালো। সেখানে সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্য কোনো মহাপুরুষ নাই থাক্‌ আচার্য রামচন্দ্র শুক্ল তো ছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রদেব তাঁর উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। তার দৃষ্টিতে মহাপুরুষ মাত্র দুজন—টণ্ডন ও সম্পূর্ণানন্দ।' কলা প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন প্রসঙ্গে সম্পূর্ণানন্দ বেশ একটু মুরুব্বির সুরে বললেন, 'কবিদের উচিত রাজনীতিকদের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া।' নিরালা আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন, 'হিন্দী কবিরা রাজনীতিকদের অনেক অগ্রগামী হয়েই আছেন।' সভাপতি টণ্ডনের সঙ্গেও তাঁর বিবাদ হল। নিরালা লিখেছেন, 'সাহিত্য সম্মেলন একটা প্রহসনে পরিণত হল, আর সেই প্রহসনের অধিকর্তা রাজনীতিক মহাপুরুষবৃন্দ।' হিন্দী সাহিত্য সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ মন্তব্যের জন্য গান্ধীজীর কাছেও কবি একবার সাক্ষাৎ প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন।

নেহরু যেমন রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও অতি অবলীলাক্রমে বলে থাকেন, 'কবিগুরুর ভাষা অতিসহজ সরল, তাই বাংলাদেশের হাটে-বাটে-মাঠে কৃষকের মুখেও তাঁর গান শোনা যায়,' তেমনি হিন্দী সাহিত্যের খবর না রেখেই কাশীর এক সম্বর্ধনা সভায় বলে ফেললেন, 'হিন্দীতে আজকাল দরবারী ঢঙের কবিতা প্রচলিত'। নিরালা তাঁকে বলেছিলেন, 'পণ্ডিতজী, এটা আমাদের পক্ষে কমদুঃখের কথা নয় যে, আপনার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই প্রদেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও এখানকার মুখ্য ভাষা হিন্দী ও তার সাহিত্য সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। অন্য প্রদেশের রাজনৈতিক নেতারা ঠিক এরকম নন। এই সেদিন সুভাষবাবু তাঁর সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আপনার মুখে তো প্রসাদ বা প্রেমচন্দের নাম শোনা যায় নি।'

বলা বাহুল্য, এই প্রকৃতির ব্যক্তির পক্ষে বৈষয়িক সাফল্য লাভ সুকঠিন। নিরালার জীবন দারিদ্র্য-বিড়ম্বনার ইতিহাস। তার জন্য, অবশ্য, কবির অমানুষিক উদারতাও কিছুটা দায়ী। কবি-সম্মেলনে উপস্থিত থেকে যে দক্ষিণা পেতেন তা প্রায় সভাস্থলেই বিলি-ব্যবস্থা হয়ে যেত বলে শোনা যায়। ১৯৪৯ সালে তাঁর 'অপরা' (কাব্য সঞ্চয়ন) গ্রন্থের জন্য ইউ. পি, সরকার যে ২১০০ পুরস্কার দিয়েছিলেন, কবি তা নিজে গ্রহণ না ক'রে জনৈক স্বর্গত বন্ধুর দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যে দান করে দিলেন। এমন হৃদয়বান্ মানুষ যে মানুষকে ব্যঙ্গ করতেন ভাবতে কেমন বিসদৃশ লাগে। আসলে নিরালার ব্যঙ্গবিদ্রূপ কখনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে জন্ম নেয়নি। কবি বলতেন—'ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা ভাঁড়ের কাজ; আমি ভাঁড় নই, কবি। গান্ধী-নেহরু-টণ্ডনের প্রতি তাঁর যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁদের বচনেও আচরণের উৎকট অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গ না ক'রে পারেন নি।

ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় সিদ্ধকাম হলেও পরবর্তী যুগের মানুষের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অন্যবিধ সৃষ্টির জন্য—যেখানে কবি প্রসন্নচিত্তে জগৎ ও জীবনকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কখনো দেখি তাঁকে যুগসঞ্চিত রহস্যময় সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু-রূপে, কখনো দেখি প্রত্যক্ষ জীবনের দ্রষ্টারূপে। কখনো কবীর-বিবেকানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন; 'ওরে, পাশেই রয়েছে হীরের খনি। মূর্খ, কোথায় তুই খুঁজে বেড়াচ্ছিস?' (পাস হী

রে, হীরে কী খান, খোজতা কহাঁ ঔর নাদান) কখনো বা রবীন্দ্রকাব্যের আনন্দ-রসে মগ্ন হ'য়ে বলছেন; 'বার বার, প্রিয়, ভরে দাও তুমি, করুণা-কিরণে ক্ষুব্ধ হৃদয় পুলকিত ক'রে দাও।'

ভর দেতে হো
বার বার, প্রিয়, করুণা কী কিরণোঁ সে
ক্ষুব্ধ হৃদয় কো পুলকিত কর দেতে হো।

কখনো বা নির্ঝরকে সম্বোধন করে বলছেন;

বস অজান কী ওর ইশারা করকে চল দেতে হো।

অন্যদিকে রয়েছে মানুষ, রয়েছে প্রকৃতি। রয়েছে বাল্যবিধবা, কবির চোখে যে নারী দেব-দেউলের পূজার ন্যায়, দীপ-শিখার ন্যায় শান্ত, ভাবমগ্ন; যেন ক্রুর মৃত্যুর মহাতাণ্ডবের স্মৃতি-রেখা; যে নারী—

টূটেতরু কী ছুটী লতা-সী দীন দলিত ভারত কী হী বিধবা হৈ।

রয়েছে ভিক্ষুক, কবির চোখে যে হতভাগ্য—

পেট-পীঠ দোনোঁ মিলকর হৈ এক, মুট্ঠীভর দানে কো—ভূখ মিটানে কো
চল রহা লকুটিয়া টেক, মুঁহ ফটী পুরাণী ঝোলী কা ফৈলাতা—

দোটূক কলেজে কে করতা পছতাতা পথ পর আতা। তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা, ভিক্ষার জন্য হাতপাতাই রয়েছে, বা হাত পেটের উপর, ডান হাত সামনে বাড়ানো। ক্ষুধার জ্বালায় যখন ঠোঁট শুকিয়ে অসে, কিছুই যখন মেলেনা ভাগ্যবিধাতা দাতার কাছে, তখন তারা সান্ত্বনা পায় অশ্রুজলের ঢোক গিলে। কখনো বা তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাটে এঁটো পাতা, আর পাশেই কুকুর আড়ি পেতে থাকে সেই পাতা ছিনিয়েনেবার জন্য —

চাট রহে হৈঁ জূঠী পত্তল কভী সড়ক পর খড়ে হুএ,
ঔর ঝপট লেনেকো উনসে কুত্তেভী হৈঁ অড়ে হুএ।

আর রয়েছে পাথর-ভাঙা মজদুরিন যাকে কবি গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে দেখেছেন এলাহাবাদের পথের পারে পাথর ভাঙ্তে—

রহ তোড়তী পাথর, দেখা উসে মৈঁনে ইলাহাবাদ কে পথ পর।

নারী সম্পর্কে কবির পূর্বসূরী রীতিকালীন দরবারী কবির যে 'আদর্শ' রেখে গিয়েছিলেন, নিরালা সেই কলঙ্ক ঘোচাতে চেয়েছেন তাঁর 'তুলসীদাস' কাব্যে। দরবারী সাহিত্যে নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়—সে বিলাসিনী। নিরালা বধূ সম্পর্কে বললেন—'জলতী অন্ধকারময় জীবন রহ এক শমা হৈ'। তুলসীদাসের পত্নী রত্নাবলী-ই তাঁর আদর্শ নায়িকা যিনি মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষকে নারী মোহে কর্তব্য ভ্রষ্ট দেখে ধিক্কার দিয়ে বলেছিলেন—'তোমার-কুলধর্ম বিসর্জন দিয়ে অনাহূত হয়ে তুমি আমার পিত্রালয়ে এসেছ ধিক্ তোমাকে। তুমি কি রামের ভক্ত, না কামের? এ তোমার কেমন শিক্ষা, আর কী শোচনীয় তোমার পরিণাম? যার জন্য তুমি বিনা মূল্যে নিজেকে বিকিয়ে দিলে সে যে আর কিছুই নয়, অস্থি-চর্মের সমাবেশ মাত্র'—

ধিক! আএ তুম য়ে! অনাহূত, হো বক জহাঁ তুম বিনা দাস,
ধো দিয়া শ্রেষ্ঠ কুল-ধর্ম ধূত, রহ নহীঁ ঔর কুশ—হাড়, চাম!
রাম কে নহীঁ, কামকে সূত কহলাএ! কৈসী শিক্ষা, কৈসে বিরাম পর আএ।

স্ত্রীর ভর্ৎসনায় মহাকবির চৈতন্য হল। তিনি দেখলেন, রত্নাবলী সেই পূর্বদিগন্তের সূর্য-কিরণ-রেখা—ধরিত্রীবক্ষে আলোক-চেতনা-প্রসারিনী।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। পরিমল, গীতিকা, বেলা, অনামিকা, নয়ে পত্তে—প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই বর্ষার উপর কিছু-না-কিছু কবিতা রয়েছে। একটি গানে আছে ঃ

অলি, খির আয়ে ঘন পাবস কে।

বর্ষার মেঘ ঘিরে এসেছে চারিদিক থেকে। কালো কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকন—যেন নীলসিন্দুর বুকে কমল-পুঞ্জের বিচরণ। একটি কবিতায় আছে ঃ

ঝুমে-ঝুম মৃদু গরজ-গরজ ঘন ঘোর।

আর একটি গানের আরম্ভটা বাংলায় তর্জমা করলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বাদল এসেছে ঘিরিয়া, অলস কবির আঁখির স্বপন বেড়ায় ফিরিয়া ফিরিয়া।

মানুষ ও প্রকৃতি—এই দুয়ের মধ্যে মানুষই বেশি জায়গা পেয়েছে নিরালার কাব্যে। আর সেই মানুষ যন্ত্রণা-কাতর বঞ্চিত মানুষ। আমার তো মনে হয় নিরালা-র "রাম কী শক্তিপূজা" সেই বঞ্চিত মানুষের জয়গান। রাবণের দানব-শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ প্রায় অসম্ভব জেনে রামের অন্তরে নেমে এল নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার। আর কী আশ্চর্য, শবাকীর্ণ রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁর মন চলে গেছে মিথিলার সেই উপবনে, যেখানে লতান্তরালে হয়েছিল রাম ও সীতার মিলন, নয়নে নয়নে গোপন প্রিয় সম্ভাষণ। সহসা রাবণের খলখল অট্ট হাসে চমক ভাঙে, রামের দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু ফোঁটা অশ্রু। আধুনিক যুগের দানব-সভ্যতা কি এমনি ক'রেই অট্টহাস করছেনা সাধারণ মানুষের বঞ্চনাকে? তারা কি পারবে শক্তি-পূজায় রাজীব-নয়ন দিয়ে নীল-পদ্মের অভাব মেটাতে? নিরালার কাব্যে মহাশক্তির আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'হে নবীন পুরুষোত্তম, তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।'

কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেন। "রাম কী শক্তিপূজা" রচনার দু' বছর পরে 'বন বেলা (১৯৩৭) কবিতায় শোনা গেল তাঁর ক্লান্ত কণ্ঠ—

হো গয়া ব্যর্থ জীবন মৈঁ রণ মেঁ গয়া হার।

কবি হয়তো বুঝলেন, মুক্তি নেই। জমিদার-মহাজন-মালিক-শাসকের দুষ্ট পাপচক্র থেকে মুক্তি নেই সাধারণ মানুষের। অথবা হয়তো বুঝলেন, কবির সংগ্রাম-শক্তিক্ষীয়মাণ। যে বাঙালি কবি একদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি সেইদিন হব শান্ত,' ভাগ্যের পরিহাসে সময় না হতেই তাঁকে স্তব্ধ হ'তে হল। হিন্দী কবি নিরালার ক্ষেত্রেও সেই একই নিষ্ঠুর পরিহাস। চারিদিকে আদর্শ ও সততার পরাভব এবং কাপট্য ও চাটুপ্রবৃত্তির জয়লাভ কবিকে ধীরে ধীরে অসহায় অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিল। আনন্দ-মন্ত্র কি ভুলে গেলেন? ক্ষুব্ধ হৃদয় তো আর পুলকিত হয়ে ওঠেনা। ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্রও যে নিষ্ফল হল। কবি বলছেন, 'কিছুই হলনা। নাহোক। আমার সকল সুখ-ঐশ্বর্য তাতেই, যদি তুমি কেবল পাশে থাকো।' কে সে? হয়তো কাব্যলক্ষ্মী

কুছ না হুআ, না হো।

মুঝে বিশ্ব কা সুখ, শ্রী, যদি কেবল পাস তুম রহো।

কিন্তু অসুস্থ কবির জীবন-বৃত্ত থেকে কাব্য লক্ষ্মীও বিদায় নিলেন। শেষ কয় বছর শূন্যতার কাল, স্তব্ধতার যুগ। মৃত্যু এসে কবিকে সেই গভীর কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়ে গেল।

অবক্ষয় প্রসঙ্গে

নিরাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি হোমর ও থেলস্ প্রমুখ মাইলেশীয় দার্শনিকদের হাতে যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির একদা সূত্রপাত হয়েছিল তা বিগত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়ে, প্রভূত ঐশ্বর্য্য এবং বৈচিত্রের সঞ্চয় যুগে যুগে নতুন ও অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এই বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের মধ্যে ইউরোপীয় মানস ও সমাজ জীবনের ক্রমিক রূপান্তরের চিহ্নগুলিকে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত করেছে। প্রায় প্রত্যেকটি যুগেই ইউরোপের সাংস্কৃতিক রূপান্তর তার-সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকের একদল মুষ্ঠিমেয় ইউরোপীয় লেখকদের ক্ষেত্রে ও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। এঁরা এঁদের রচনার সাহায্যে এবং একটি বিশেষ সৌন্দর্য্যতাত্ত্বিক ভাবধারা প্রবর্ত্তন করে আকস্মিক ভাবে খ্যাতিমান হয়েছিলেন এবং এঁদেরই রচনা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু। সাধারণতঃ সমালোচকরা এঁদেরই ডিকাডেন্ট বা-অবক্ষয়ী আখ্যা দিয়ে থাকেন; একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে এঁদের রচনা আজ খুবই মূল্যবান বলে মনে হয়।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই একটা কথা পরিস্কার করে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। প্রগতি, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কয়েকটি সাম্প্রতিক শব্দের মত অবক্ষয় শব্দটিও বহু ব্যবহারে জীর্ণ এবং শব্দগুলির আপেক্ষিকতা এমনই যে এগুলির কোন সুনির্দ্দিষ্ট অর্থোদ্ধার প্রায় দুঃসাধ্য। আপেক্ষিকতার এই জটিলতা যথাসম্ভব পরিহার করে, আলোচনার সুবিধার্থে, সাধারণতঃ সমালোচকরা যে অর্থে এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বা করে থাকেন, আমরা সেই অর্থেই ব্যবহার করব। যে বিশিষ্ট লেখকদের রচনা অবক্ষয়ী চিহ্নিত হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করে এবং তাঁদের রচনা বিশ্লেষণ করে অবক্ষয়ের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা যেতে পারে এবং এই জাতীয় রচনাগুলির কি ধরণের মূল্য আধুনিক পাঠকদের কাছে থাকতে পারে সেটাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। যদিও অবক্ষয়ের প্রধান চিহ্নগুলি, গত শতাব্দীর শেষাংশে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ হয়েছিল কিন্তু এর প্রধান পুরোধা ছিলেন আশীর দশকের কয়েকজন ফরাসী এবং নব্বুইয়ের দশকের কয়েকজন ইংরেজ লেখক ও শিল্পী। ঐ দুই বিশিষ্ট ফরাসী এবং ইংরেজ লেখক বা শিল্পীর সম্প্রদায় তাঁদের রচনা এবং তাঁদের প্রবর্তিত শিল্পদর্শের জন্য বহুলাংশে তাঁদের অগ্রবর্ত্তী কয়েকজন ফরাসী লেখকদের কাছে ঋণী ছিলেন। এই অগ্রবর্ত্তী ফরাসী লেখকরাই গত শতাব্দীর মধ্যভাগে "আর্ট ফর আর্টস সেক" বা "শিল্পের খাতিরে শিল্প" নামে এক, অভিনব এবং ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত শৈল্পিক আদর্শের প্রবর্ত্তন করেন। এই 'শিল্পের খাতিরে শিল্প' আন্দোলনই আঠারোশ আশীর দশকের অবক্ষয়ের প্রধান ভিত্তি এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার মধ্যে।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রায় সময় থেকেই এবং তার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ "সন্ত্রাসের রাজত্বে" ফ্রান্সে ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং জোতদার শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বিপাকের সুযোগ নিয়ে ধনোপার্জনের কতকগুলো সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছিল। ময়দা কাপড়, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু স্বল্পমূল্যে বিদেশ থেকে আমদানী করে অত্যন্ত চড়া দামে ফ্রান্সে সেগুলি বিক্রয়

করে ও নানাবিধ সৎ ও অসৎ উপায়ে এরা অনেকেই অনতিবিলম্বে প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়। একাধারে এদের এই সদ্যোপার্জ্জিত সম্পত্তি ও অন্যধারে বিপ্লবের ফলে বিনষ্ট, ক্ষয়িষ্ণু মেরুদণ্ডহীন অভিজাত সম্প্রদায়ের দৌর্ব্বল্য এবং ঔদাসীন্য; এই দুই প্রধান কারণে এই নবজাত ধনী-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নেপোলিয়নের রাজত্ব কালেই ফ্রান্সে সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রধান যন্ত্রগুলিকে করায়ত্ত করতে পেরেছিল। এই ব্যবসায়ীদেরই সাধারণতঃ বুর্জোয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিল স্বল্পশিক্ষিত এবং সাহিত্যরুচি ও শিল্পবোধে সম্পূর্ণবঞ্চিত। এদের অধিকাংশেরই পরিবারে কোন শিক্ষার প্রচলন না থাকায় এরা নীতি বা দুর্নীতি এবং শ্লীলতা বা অশ্লীলতা সম্পর্কে কতকগুলো অতিশয় অদ্ভুত ধারণা পোষণ করত। খৃষ্টধর্মের নৈতিক বা মানবিক দিকগুলির সঙ্গে সম্পর্কে রহিত হয়ে এরা অনেকেই গভীর ধর্মবিশ্বাসী এবং খৃষ্টানের অভিনয় করত কেউবা আবার যুক্তিবাদী ও নাস্তিকের ভান করতে ছিল অক্লান্ত। আসলে এরা অর্থোপার্জন এবং সাংসারিক সাফল্য ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর কথা চিন্তা করতে পারত না। এরাই বোদলেয়ারের রচনা কে অশ্লীল ঘোষণা করে এবং ফ্লবেয়ারের রচনাকে বেআইনী করবার চেষ্টা করে। তৎকালীন প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বুর্জোয়াদের নির্বুদ্ধিতা স্বার্থান্বেষ এবং অর্থগৃধ্নুতাকে কঠিন ভাবে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করেছেন। স্তাঁদেলের "ল্য রুজ এ ল্য নোয়ার" উপন্যাসে মঁসিয়দ্য রেনালের পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বালজাকের উপন্যাসগুলির মধ্যে আদাম ভোকে, মাদামদ্য ন্যুসিনজেন, তাইয়েফ্যার প্রমুখ চরিত্র এবং ফ্লবেয়ারএর "মাদামবোভারী" উপন্যাসে যে কোন একটি প্রধান চরিত্র সামান্য যত্নসহযোগে পরীক্ষা করলেই বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা হবে। কিন্তু সাংসারিক সাফল্য মানুষকে বেশীদিন সন্তুষ্ট রাখতে পারেনা; পূর্ণ সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজন সামাজিক প্রতিষ্ঠা; বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। নিজেদের ঐশ্বর্য্যের সুযোগ নিয়ে এরা শীঘ্রই ফ্রান্সের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে এবং স্থূল রুচি এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষার সাহায্যে এরা সংস্কৃতির রাজ্যকেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ফলতঃ একাধিক বিখ্যাত রচনা এদের কাছে অশ্লীল, দুর্নীতি, বা অধার্মিক বলে বিবেচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই জাতীয় কোন সামাজিক পরিবেশ কে কোন মহৎ শিল্পী সহজে মেনে নিতে পারেন না। অধিকাংশ শিল্পীই বুর্জোয়াদের এই নৈতিক অনুশাসনে উত্যক্ত বোধ করতেন; বোদলেয়ার তাঁর "জুর্নোজ অ্যাঁতিম্" বা "গোপনীয় রোজনামাচার" একাংশে লিখেছিলেন যে এই নির্বোধ বুর্জোয়ারা "আমাকে পাঁচ ফ্রাঁ দামের বারবণিতা লুইজ ভিল্‌দিত্তর কথা মনে করিয়ে দেয় যে আমার সঙ্গে একদা লুভ্র্ এ গিয়ে, যেখানে সে ইতি পূর্ব্বে কখনো যায়নি, সেই অবিনশ্বর প্রস্তর মূর্ত্তি আর চিত্রকলার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল আর মুখ ঢাকছিল আর ক্রমাগত আমার জামার হাতাটাকে টেনে ধরে আমায় প্রশ্ন করছিল কিভাবে লোক এই জাতীয় অশ্লীলতা কে সাধারণ্যে খুলে রাখে।"

উক্ত লেখকদের রচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গতশতাব্দীর মধ্যভাগেই লেখকরা তাঁদের সমাজের সঙ্গে রফা করতে না পেরে নিজেদের সমাজ বহির্ভূত জীব হিসাবে জ্ঞান করতে শুরু করেন। নীতি বা দুর্নীতি সম্বন্ধে বুর্জোয়াদের যে ধারনা ছিল তার সঙ্গে বস্তুতঃ শিল্পের যে কোন সম্পর্ক ছিলনা একথা বোঝবার মত ক্ষমতা বুর্জোয়াদের ছিলনা; তার ফলে শিল্পীদের সঙ্গে সাধারণ সমাজের এই বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং লেখকরা ক্রমশঃই নিজেদের নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। এই মনোভাব শীঘ্রই একটি বিশিষ্ট শিল্প আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এবং এই আন্দোলনেরই নাম "আর্ট ফর আর্টস সেক" বা "শিল্পের জন্য শিল্প"

আন্দোলন। এ'র প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ফরাসী কবি তেয়ফিল গোতিয়ে। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল যে শিল্প সর্ব্বদাই নৈতিক বিচারের ঊর্দ্ধে; শ্লীলতা বা অশ্লীলতার প্রশ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অবান্তর; জীবনের কোন সমস্যাকে দেখবার বা তাকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করবার কর্ত্তব্য শিল্পীর নয়; শিল্প সৃষ্টির একমাত্র উপাদান শিল্পীর নিজস্ব কল্পনা এবং উপভোগ্য হওয়ার মধ্যেই শিল্পের সার্থকতা। এই ভাবধারাকে গোতিয়ে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে রূপ দেন তাঁর "মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ" নামক একটি অতি সুখপাঠ্য রোমান্টিক বড় গল্পের মধ্যে। বই খানি কে অনেকেই ভুল করে উপন্যাস আখ্যা দিয়ে থাকেন। কাহিনীর নায়ক দালবেয়ার একজন শিল্পী এবং আদর্শবাদী যিনি তাঁর কবিকল্পনা আর সৌন্দর্য্যবোধকে তীব্র এবং সজাগ করে তুলতে ব্যস্ত, এবং যিনি তাঁর কবিকল্পনার সাহায্যে গড়ে তুলেছেন এক মানসী নারী মূর্ত্তি; এই মানসীই তাঁর জীবনের একমাত্র অভিষ্ট। ইত্যবসরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল রোজেৎ নাম্নী এক ধনবতী, অভিজাত রমণীর। অনতিবিলম্বে এ'দের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হল; তারপর এ'রা এলেন সহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলের এক নির্জন প্রাসাদে যেখানে চলল অবাধ মেলামেশা। কিন্তু শীঘ্রই দেখা দিল ক্লান্তি আর বিরক্তি, সম্ভোগ ক্লান্ত দালবেয়ার বুঝলেন যে রোজেতের মধ্যে তাঁর মানসীর সন্ধান বৃথা। এই সময়ে সেই প্রাসাদে এক তরুণ অশ্বারোহী তার বালক সঙ্গীকে নিয়ে উপস্থিত হল। অশ্বারোহীর নাম তেত্তদোর। তেত্তদোরের রূপও লাবণ্য গভীর ভাবে নাড়া দিল দালবেয়ারের মনে; তাঁর মনে হল কোথায় যেন মিল রয়েছে তাঁর সেই মানসী আর এই তরুণ অশ্বারোহীর মধ্যে। অবশেষে বিভিন্ন ঘটনার পর জানা গেল যে ঐ অশ্বারোহী ও তার বালক সঙ্গী এরা দুজনেই আসলে নারী। সাহসিকা মাদ্‌লিন দ্য মো প্যাঁ, জীবনের বৈচিত্র্যকে পূর্ণভাবে উপভোগের জন্য তেত্তদোরের ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। মাত্র একরাত্রির জন্য মাদ্‌লিন দ্য মোপ্যাঁ তাঁর পুরুষের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে মিলিত হলেন দাল-বেয়ারের সঙ্গে; পরদিন প্রত্যুষেই একটি ইঙ্গিত পূর্ণ চিঠি লিখে প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন।

এই কাহিনীর উপর সেক্সপীয়রের প্রহসনগুলি বিশেষতঃ টুয়েলফ্‌থ নাইটের প্রভাব স্পষ্ট এবং লেখক নিজেই ইঙ্গিত দিয়ে এই প্রভাবের কথা জানিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এটি নয় কিন্তু রচনা শৈলীর চমৎকারিত্বে এবং কাহিনীর বৈচিত্র্যে বইখানি খুবই উপভোগ্য; অধিকন্তু শিল্পের খাতিরে শিল্প আন্দোলনের স্বরূপ জানবার পক্ষে বইখানি অপরিহার্য্য। বাস্তব জীবন ক্লান্তি আর মোহভঙ্গের হতাশায় পূর্ণ; সৌন্দর্য্যের উপভোগ শুধু কল্পনাতেই সম্ভব। বাস্তব জীবনে সৌন্দর্য্যের দেখা মেলে কদাচিৎ আর তা আসে মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। সুতরাং শিল্পীর প্রধান অবলম্বন তাঁর স্বীয় কল্পনাশক্তি। শিল্প নৈতিক বিচারে ঊর্দ্ধে; সৌন্দর্য্য ও সুষমামণ্ডিত বস্তু মাত্রই শ্লীল এবং শোভন। সুন্দরের মধ্যে কোন গভীর দর্শন আবিষ্কার করে তাকে সমাজের পক্ষে শ্রেয় ও স্বাস্থ্যকর নীতি কথায় পরিণত করা শিল্পীর পক্ষে নিষিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই কথাই গোতিয়ে তাঁর ঐ রচনার মধ্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সৌন্দর্য্যের কাছে তন্ময়চিত্তে আত্ম সমর্পণ করা ভিন্ন শিল্পীর যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই একথা বোদলেয়ার ও তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছেন। ইংরাজী রোমান্টিক কবিদের অন্যতম জন কীটস্‌, বেলিকে লিখিত পত্রে যে নেগেটিভ্‌ ক্যাপাবিলিটির কথা উল্লেখ করেছেন তার বক্তব্য ও মোটামুটি একই।

শিল্পকে সর্ব্বতোভাবে জীবন ও বস্তু জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার ও তার অন্ত-র্নিহিত সৌন্দর্য্যকে তার বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবার এই তত্ত্ব গতশতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপ, বিশেষতঃ ফ্রান্সে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সাহিত্য ও চিত্রকলা—

ফরাসী সংস্কৃতির এই দুই প্রধান শাখায় এর প্রতিক্রিয়া চলেছিল বহুকাল ধরে। একাধারে এই নতুন নন্দনতত্ত্ব ও অন্য ধারে হকুসাই প্রমুখ জাপানী চিত্রকরদের রচনা যার মধ্যে না ছিল বাস্তবের কোন অনুকৃতি না ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য, তার প্রচলন; এই দুইয়ের যুগ্ম প্রভাবে ফরাসী চিত্রকলা আমূলভাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে ইমপ্রেসনিষ্ট পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। মার্কিন লেখক এড্‌গার অ্যালান পো—যিনি বলেছিলেন যে শিল্পীর কর্ত্তব্য শুধু তাঁর রচনার মধ্যে একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া—তাঁর প্রভাবে সাহিত্যে প্রতীকবাদী আন্দোলনের প্রবর্ত্তন হয়। বোদলেয়ার এবং মালার্মে এঁরা দুজনেই ছিলেন পোর গুণমুগ্ধ এবং অনুরাগী। প্রতীকী কবিরা বিশেষতঃ মালার্মে পোকে অনুসরণ করে কাব্য থেকে অর্থ বা অভিধাকে বর্জন করে শব্দের ব্যঞ্জনাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন; তাঁর ধারনা ছিল যে প্রভূত মানসিক শৃঙ্খলার সাহায্যে শব্দকে যথাযথ ভাবে সাজিয়ে তার মধ্য থেকে সঙ্গীতের শুদ্ধি ফুটিয়ে তোলা-ই কবির কর্ত্তব্য। বোদলেয়ার এবং মালার্মেকে অবক্ষয়ী হিসাবে আখ্যায়িত করা অসঙ্গত হবে; কারণ প্রথমোক্তের রচনা অতি গভীর ও দার্শনিকতায় পূর্ণ এবং শেষোক্তের সংযম ও শৃঙ্খলা যার সাহায্যে তিনি সর্ব্বপ্রকারের রোমাণ্টিক বদখেয়াল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত ভৌতিক গল্পগুলির জন্য পোকে অবক্ষয়ীদের পূর্ব্বসূরী বলা যেতে পারে।

"শিল্পের জন্য শিল্প" আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে আঠারোশ আশী এবং নব্বুইয়ের দশকের একটি সুনির্দ্দিষ্ট লেখক গোষ্ঠীর রচনায়। এঁদের পুরোধা যিনি ছিলেন তিনি যদিও ফরাসী লেখক হিসাবে খ্যাত কিন্তু জাতিতে ইনি ছিলেন ওলন্দাজ। তাঁর নাম ভোরি কার্ল আয়সমাঁ বা অনেকের মতে ইস্‌মাঁ। অবক্ষয় বলতে যা বোঝায় তার প্রায় প্রত্যেকটি চিহ্ন এঁর রচনায় এমন স্পষ্ট যে অনেকে এঁকে অবক্ষয়ের প্রতিভূ আখ্যা দিয়ে থাকেন। প্রথম জীবনে ইনিও ছিলেন "নাতুরিলিস্ত" লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম এবং জোলা বা গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুকরণে কয়েকখানি বাস্তবধর্মী উপন্যাসও লিখেছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই এক নতুন শিল্পাদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বাস্তববাদ বর্জন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "আ বেরুর" বা "স্রোতের বিরুদ্ধে" নামে এক অতি আশ্চর্যকর গদ্যরচনায় তিনি এই নতুন শিল্পাদর্শকে সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। অবক্ষয়ের স্বরূপ জানতে হলে বইখানি অবশ্যপাঠ্য; কিছুদিন পূর্বে মূল-বইখানে অথবা তার ইংরেজী অনুবাদ দুইই দুষ্প্রাপ্য ছিল কিন্তু সম্প্রতি বইখানির একটি চমৎকার ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনীর একমাত্র চরিত্র কাউন্ট দেজ্‌ এস্যাঁৎ এক ধনবান ও অভিজাত ব্যক্তি যাঁর শিল্পরুচি বিচিত্র এবং খেয়ালগুলি অত্যদ্ভুত। বহুদিন যাবৎ নানাবিধ অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর উপায়ে জীবনকে উপভোগ করবার পর ক্লান্ত দেজ এস্যাঁৎ চিকিৎসকের পরামর্শে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছেন প্যারিসের কাছে ফাৎনের এক নির্জন বাড়ীর মধ্যে। এই জন-মানব শূন্য বক্ষপুরীতে নিজেকে বাস্তব জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত করে এই ব্যক্তির দিন কাটে শুধু মাত্র কল্পনার উপর আর অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতার মধ্য দিয়ে আর তারই মাঝে মাঝে চলে অতীত স্মৃতির রোমন্থন; তার বিগত জীবনের নানাবিধ বিচিত্র খেয়াল, বিকৃতি অথবা পাপাচার যার সাহায্যে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কে তীক্ষ্ম ও সজাগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এর পরিণতিতে সেজ্‌ এস্যাঁতের জীবনে এসেছে বিরক্তি, তিক্ততা আর অপরিসীম ক্লান্তি, সুতরাং বর্ত্তমানে বাস্তবকে ঘৃণা ও অনুকম্পা সহযোগ বর্জন করে তিনি কল্পনাকেই তাঁর জীবনের মুখ্য উপজীব্য করেছেন। কল্পনার সাহায্যে এবং কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে ইনি গৃহত্যাগ না করেও সমুদ্রযাত্রা এবং দেশ ভ্রমণ করতে সক্ষম অথবা নিজের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও এঁর পক্ষে

সমুদ্র স্নান সম্ভব। বর্ষামুখর দিনে প্যারিসের রাস্তায় ঘোরাফেরা করে এবং ইংরেজ ব্যবহৃত এক পানশালায় কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে এই ব্যক্তি ধরে নিতে পারেন যে, ইনি লণ্ডনেই রয়েছেন। কিন্তু এই ভাবে দেজ এস্যাঁৎ তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। নিউরোসিস, অনিদ্রা, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়ুবৈকল্যজাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তিনি আর সেই সংগে দেখা দিল দুরপনেয় শূন্যতাবোধ, জীবনের অর্থহীনতা, মানুষের প্রতি ঘৃণা আর মাঝে মাঝে তীব্র বিবমিষা। পরিত্রাণের অন্যকোন পথ খুঁজে না পেয়ে দেজ এস্যাঁৎ অবশেষে আত্মসমর্পণ করলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মের কাছে। সাহিত্যিক রচনা হিসাবে বইখানির কয়েকটি উল্লেখ্য ত্রুটি আছে। একে উপন্যাস আখ্যা দেওয়া বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবেনা কারণ এর মধ্যে ঘটনা প্রবাহ বলতে কিছুই নেই অথবা রচনায় বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার ঐক্য ও সংযোগ যাকে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন "অর্গানিক ইউনিটি" তাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বইখানির মধ্যে এর নায়কের বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে অবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তথাপি এটি যে একটি রসোত্তীর্ণ এবং সুখপাঠ্য রচনা এ বিষয়ে দ্বিমত চলেনা। বইটির প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাই হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য উৎকেন্দ্রিকতায় পূর্ণ কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে এই উৎকেন্দ্রিকতার পিছনে আছে নিপুণ ভাবে গড়ে তোলা একটি সাহিত্যিক মতবাদ। অবসমাঁর ধারণা যে শিল্পী বা শিল্পমনস্ক ব্যক্তির একমাত্র সম্বল তার কল্পনা এবং অনুভূতি। এই কল্পনা বা অনুভূতিকে তীব্রতর করে তোলার মধ্যে তার শিল্পীমনের সার্থকতা; এবং যেহেতু মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিই তার অনুভূতির ধারক সেই কারণে নানাবিধ সম্ভব ও অসম্ভব প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করতে পারলে তার অনুভূতি তীব্রতর হবে এটা আশা করা যায় বিশেষতঃ সেই প্রক্রিয়াগুলি যদি হয় নিষিদ্ধ, বিকৃত, সমাজ অপ্রচলিত ও নীতিশূন্য। কিন্তু এই সত্যটা সকলেরই মোটামুটী জানা আছে যে এই জাতীয় উত্তেজনার শেষে আসে ক্লান্তি, বিরক্তি, হতাশা অথবা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে সক্রিয় রাখার ফলে অনুভূতিবাহী ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিতান্ত প্রাথমিক সংবেদনশীলতাও হারিয়ে ফেলে। এর সবগুলিই বাস্তব জীবনে ঘটে থাকে সুতরাং অয়সমাঁর নায়ক বাস্তবজীবনকে বর্জন করে আপাততঃ কাল্পনিক জগতের অধিবাসী। কল্পনার সাহায্যে যে কোন দুর্লভ বস্তুকেও ভোগের সামগ্রী করা যায়; কাল্পনিক জীবনে মোহভঙ্গের জ্বালা নেই, নেই প্রবঞ্চনার তিক্ততা। সুতরাং সৌন্দর্যের ধ্যান ও তার উপলব্ধি একমাত্র এই জাতীয় কল্পনা সর্বস্ব জীবনেই সম্ভব।

আঠারোশ আশীর দশকের একাধিক ফরাসী লেখক এই বিশেষ শিল্পবেদকে সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলেন; তাঁরা সকলেই এই মত পোষণ করতেন যে শিল্প বা সাহিত্য বাস্তবজীবন থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত; শিল্পী অনিবার্য্য ভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও অহংবাদী এবং মনুষ্য জীবনের আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা সাংসারিক সমস্যার প্রতি উদাসীন; একমাত্র কল্পনার রাজ্যই তাঁর যোগ্য বাসস্থান; শ্লীলতা, সুনীতি স্বাভাবিকতা অথবা সুরুচির প্রশ্ন শিল্পে অবান্তর ইত্যাদি। বিশেষতঃ অনুভূতিকে প্রখর করে তোলবার চেষ্টা এ'দের অনেকেরই রচনায় স্পষ্ট। এই সূত্রে আর একজন ফরাসী লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাম ভিউয়ের্স দ্য লিল আদাম। এ'র অধিকাংশ রচনার মধ্যে বিশেষতঃ "আক্‌সেল" নামক নাটকটিতে অবক্ষয়ের উপরোক্ত লক্ষণ গুলি বিদ্যমান। "আক্‌সেল" সম্প্রতি ইউরোপ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিদগ্ধ সমাজে খুবই আদৃত হচ্ছে। কাহিনীর নায়ক যথারীতি ধনবান ও অভিজাত যিনি অকস্মাৎ তাঁর দুর্গের একাংশে খুঁজে পেলেন গোপনে রক্ষিত প্রভূত ধনসম্পত্তি আর সেই সংগে একটি সুন্দরী তরুণী যার সংগে অবিলম্বে তাঁর প্রেম বিনিময় হল। কিন্তু লোকে সাধারণতঃ যা করে থাকে তা তাঁরা করলেন না;

প্রভূত ধনসম্পত্তি ও সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে মহাসুখে কালাতিপাত করবার মত বাস্তব বুদ্ধি শিল্পীমনের পরিপন্থী, এই জাতীয় স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রতি নায়কের প্রচণ্ড অনুকম্পা; সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন যে আত্মহত্যা করে তাঁরা তাঁদের ক্ষণিকের সুখানুভূতিকে শেষ করবেন এবং আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে তাঁরা পাঠকদের জানিয়ে দিলেন যে "বেঁচে থাকা? ও কাজটা আমাদের চাকরেরাই আমাদের হয়ে করে দিতে পারে।"

ফ্রান্সে এই বিশিষ্ট শিল্পতত্ত্বের যে রকম সুষ্ঠুভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা হয়েছিল এবং একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে তথাকার সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল, ইংল্যাণ্ডে ঠিক সেরকম হয়নি। যদিও শিল্প বা সাহিত্য যে দার্শনিক তত্ত্বের ভারে পঙ্গু এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ প্রচারের উপযোগী যন্ত্র মাত্র নয় এবং শিল্পের প্রাথমিক উপাদান যে শিল্পীর কল্পনা ও ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি এই ধারণা কীট্‌সের হাতে সূত্রপাত হয়ে এবং সুইনবর্ণ বা প্রি-রাফ্যায়েলাইট কবি গোষ্ঠীর দ্বারা অনুসৃত হওয়ার ফলে ইংরেজ পাঠকমহলে অজানা ছিল না। কিন্তু অবক্ষয়ের সত্যকারের চিহ্নগুলি মাত্র কয়েকজন ইংরেজ লেখক বা চিত্রকরের মধ্যে কিছুদিনের জন্য দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ্য তিনি অস্কার ওয়াইল্ড। যখন ফ্রান্সে এই বিশিষ্ট নন্দনতত্ত্ব ধীরে ধীরে প্রচারিত হয়ে তথাকার লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল প্রায় সেই সময়েই প্রাবন্ধিক অ্যাডিংটন সাইমণ্ডস তাকে ইংল্যাণ্ডে আমদানী করেছিলেন ও তাঁর বিভিন্ন সমালোচনা ও প্রবন্ধের মধ্যে এই ভাবধারাকে প্রচারিত করেছিলেন। কিছুদিন পরে ইংরেজ কবি আর্থার সাইমনস ও তাঁর কয়েকটি সমালোচনার মধ্যে এই সৌন্দর্যতত্ত্বের অনুশীলন করেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন শক্তিমান লেখক এবং এঁদের রচনাগুলিও খুব মূল্যবান কিন্তু সমালোচক হিসাবে এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে সমালোচ্য রচনার আঙ্গিক অথবা তার অন্তর্নিহিত বস্তু বক্তব্যকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ বা বিচার করে তার যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা এঁরা করেন নি। একাধারে তৎকালীন ফরাসী শৈল্পিক ভাবধারা ও অন্যধারে পেটার প্রমুখদের প্রভাবে এঁরা শিল্পকলা বা সাহিত্যিক রচনা এঁদের মধ্যে কি ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে সেগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। নব্বুইয়ের দশকের গোড়ার দিকে "ইয়োলো বুক জার্নাল" নামে একটি সাময়িক পত্রিকা ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পত্রিকাটির চতুষ্পার্শ্বে একটি তরুণ লেখক বা চিত্রকরের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে; এঁরা প্রায় সকলেই ঐ দুই ইংরেজ প্রাবন্ধিকের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; এবং এঁদের মধ্যে ওব্রে বিয়ার্ডস্‌লি প্রমুখ অনেকের রচনাই অবক্ষয়ের লক্ষণাক্রান্ত। এতদ্ব্যতীত আর্ণস্ট ডসন, জন ডেভিডসন প্রমুখ কয়েকজন অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী লেখক ও 'অবক্ষয়ী' বলে আখ্যায়িত হতে পারেন। কিন্তু ওয়াইল্ডের রচনায় অবক্ষয়ের চিহ্নগুলি যত প্রকট হয়েছে অন্য কোন ইংরেজ লেখকের রচনায় তা হয়নি। তাঁর যৌবনের প্রাক্কালেই এই শক্তিধর আইরিশ লেখক রাস্কিন, পেটার প্রমুখ মনীষীদের সাহচর্যে এসে নিজের শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধকে উন্নত ও তীব্র করতে শেখেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে কিছু কবিতা লিখবার পর ওয়াইল্ড কিছুদিন ধরে প্রহসন লিখেছিলেন। আঙ্গিকের চরমোৎকর্ষ, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য, অনাবিল কৌতুক ও রসবোধ এবং তীব্র ও শাণিত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সাহায্যে ইংরেজী উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের যে ছবি এঁকেছেন তার তুলনা শুধুমাত্র বেন জনসন, মলিয়ের, কণগ্রীভ বা শেরিডানের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যেই মেলে। কিন্তু শুধু প্রহসন রচনার মধ্যেই ওয়াইল্ড তাঁর প্রতিভাকে সীমিত রাখেন নি; ফরাসী লেখকদের দ্বারা প্রচারিত সেই বিচিত্র সৌন্দর্যতত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি শীঘ্রই তাকে সাহিত্যে রূপ দিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে"র মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম

ফরাসী সাহিত্যিক অবক্ষয়কে ইংল্যাণ্ডে আমদানী করলেন। ডোরিয়ান গ্রের অভিনব রূপকথা বাঙালী পাঠক সমাজে সুপরিচিত সুতরাং তাঁর বিশদ বিবরণ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য বিনাদ্বিধায় যে কোন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, সমাজে প্রচলিত সাধারণ নৈতিক মূল্যগুলিকে সগর্বে অস্বীকার করা, বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত সুখ ও প্রমোদের সন্ধান, সমাজের অন্যান্যদের অস্বীকার ও তাদের প্রতি ঘৃণা ও অনুকম্পা, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি সৌখীন এবং সময়বিশেষে কৃত্রিম অনুরাগ, এইগুলিই উক্ত রচনাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। একাধিক সুপন্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে কাহিনীর শেষাংশে ডোরিয়ানের ছবির বীভৎস বিকৃতি ঘটিয়ে ওয়াইল্ড আসলে অবক্ষয়ী লেখক ও সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের শিল্পসমীক্ষার রূঢ় সমালোচনা করেছেন অর্থাৎ শিল্পানুভূতির নাম দিয়ে নানাবিধ জঘন্য ও নীতিশূন্য ক্রিয়াকলাপের অনিবার্য পরিণতি যে আত্মিক অধঃপতন এই কথাই নাকি উক্ত কাহিনীর মূল বক্তব্য; এই ধারণা সর্বৈব মিথ্যা না হতেও পারে। ওয়াইল্ড যদি এই ভাবে ঐ নতুন শিল্পতত্ত্বের সমালোচনা করে থাকেন তবে তা শুধু তাঁর সাময়িক শুভবুদ্ধির নজীর মাত্র। তিনি নিজেও এই সমালোচনাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন নি কারণ ঐ উপখ্যানটি লেখবার মাত্র দুতিন বছর পরে তাঁর "সালোমে" নামক ফরাসী নাটকে তিনি অবক্ষয়ী শিল্পাদর্শকে প্রায় চরমে ঠেলেছেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের এক রেস্তোরাঁয় বসে ওয়াইল্ড "সালোমে" নাটকটি ফরাসীতে লেখেন ও ঐ বছরেই ঐ সহরে সেটি মঞ্চস্থ হয়; শোনা যায় "আফ্রোদিৎ" খ্যাত প্রসিদ্ধ লেখক পিয়ের লুই নাকি নাটকটির কয়েকটি গৌণ ত্রুটী সংশোধন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বলাবাহুল্য এই রচনার সমস্ত কৃতিত্বই ওয়াইল্ডের প্রাপ্য। কি ধরণের প্রতিভা থাকলে একটি বিদেশী ভাষাকে উত্তমরূপে আয়ত্তে এনে এবং তার মধ্যে এই আশ্চর্যকর স্বচ্ছতা ও গতির সঞ্চার করে "সালোমের" মত নাটক লেখা যায় সে কথা বোধহয় ঠিক বুঝিয়ে বলা যায় না। জুডিয়ার রাজা হেরোডের তার সপত্নী কন্যার প্রতি লালসা ও অবশেষে জন দি ব্যাপটিষ্ট হত্যার কাহিনী নূ্য টেষ্টামেন্টের বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীই ওয়াইল্ডের নাটকের মূল ভিত্তি যদিও নাট্যকার তাঁর নিজের সুবিধামত কাহিনী এবং চরিত্রগুলিকে বদলে নিয়েছেন। ইয়োকানানের প্রতি সালোমের আকর্ষণ ও তাকে না পাবার ক্ষোভে পরিশেষে হেরোডের সাহায্যে তাকে হত্যার এই কাহিনীর মধ্যে ওয়াইল্ড যৌনপ্রেম সম্বন্ধে এক অতি উগ্র রকমের রোমান্টিক ধারণা ব্যক্ত করেছেন। যৌন প্রেম স্বভাবতঃই মানুষের অনুভূতিগুলিকে তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলে এবং তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়; কিন্তু এই অনুভূতি তীব্রতর হয় যদি যৌন প্রেমকে একটি নতুন রূপ দেওয়া যায়, যদি প্রমাণ করা যায় যে প্রেম ও মৃত্যু অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইতিপূর্বে বোদলেয়ার ও সুইনবর্ণ তাঁদের কিছু রচনায় প্রেমের এই বৈনাশিক রূপকে চিত্রিত করেছেন। অবক্ষয়ীদের অনেকেরই রচনায় এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে; এক্ষেত্রে তাঁদের উপর বোদলেয়ার ও সুইনবর্ণের প্রভাব স্পষ্ট। অয়সমাঁ তাঁর "আরেবুরে"র পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুস্তাভ্ মোরো অঙ্কিত "সালোমে" ছবিখানির একটি অতি মনোজ্ঞ বর্ণনা ইমপ্রেশনিষ্ট পদ্ধতিতে দিয়েছেন; ওয়াইল্ডের উপর ঐ রচনাটির প্রভাবের কথাও অবশ্য বিবেচ্য। তাঁর "ইনটেনসন্স" নামক প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত 'পেন, পেন্সিল এ্যান্ড পয়জন' নামক প্রবন্ধটিও অবক্ষয়ের ভাবধারায় পুষ্ট। টমাস ওয়েনরাইট নামে এক সাংবাদিক, শিল্পী ও অতি চতুর নরঘাতকের জীবনী এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ ইংরেজ নরঘাতক সাংবাদিকতা করে জীবিকা সংগ্রহ করতেন, তাছাড়া চিত্রকর হিসাবেও তিনি পরিচিত ছিলেন; পরে অর্থের লোভে ইনি উপর্যুপরি কয়েকটি নরহত্যা করে খুনী আসামী সাব্যস্ত হয়ে ইংল্যান্ড পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ওয়াইল্ড

নিজেই আমাদের জানিয়েছেন যে লেখক বা চিত্রকর হিসাবে এই ব্যক্তি কিছু অসামান্য ছিলেন না তথাপি তিনি যে কেন ওয়েনরাইটের রচনা বা ব্যক্তিত্বকে স্থানে স্থানে উচ্চপ্রশংসা করেছেন তা দুর্বোধ্য। মনে হয় নরঘাতক বলে চিহ্নিত না হলে ওয়াইল্ড তাঁর রচনা কোন দিনও পড়্‌তেন না। তাঁর যাবতীয় অনাচার ওয়াইল্ড প্রশংসা বা সমর্থন তো করেইছেন, উপরন্তু এমনভাবে তাঁকে বিচার করেছেন যা দেখে অনেকেরই মনে হবে যে ওয়াইল্ড পরোক্ষভাবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে শিল্পীদের পক্ষে এই জাতীয় কার্যকলাপই শ্রেয়। অধিকন্তু, এই প্রবন্ধটির সাহায্যে ওয়াইল্ড খুব সহজেই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন শিল্পের সঙ্গে নৈতিক বিধিনিষেধের কোন সম্পর্ক নেই; যে শিল্পী যত বেশী নৈতিক বিচারের অবান্তর উৎপাত থেকে মুক্ত তিনি ততবেশী মহৎ। একাধারে তিনি যেমন জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে এই নতুন ভাবধারাকে তাঁর কল্পনামূলক রচনার মধ্যে রূপ দিয়েছেন অন্যধারে তিনি ঐ নব্য নন্দনতত্ত্বের তথ্যের দিকটিকে পরিস্ফুট করেছেন, ইনটেনসন্‌স এর অন্তর্ভুক্ত তাঁর দুটি দীর্ঘ ও সুলিখিত প্রবন্ধে। শুধুমাত্র সাহিত্যের ছাত্রই নয়— নন্দনতত্ত্বে উৎসাহী যে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রবন্ধ দুটি অবশ্য পাঠ্য। সাধারণ নন্দনতত্ত্বের কয়েকটি অতিশয় দুর্বোধ্য ও দুরূহ সমস্যা ও সিদ্ধান্তকে ওয়াইল্ড তাঁর প্রাঞ্জল গদ্য ও দক্ষ আলোচনার সাহায্যে সহজ করে বুঝিয়েছেন; কিন্তু এই দুটি প্রবন্ধে এমন অনেক কথাও প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে যা বিচার ও তর্ক সাপেক্ষ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে উত্তম শিল্পী মাত্রই আত্মসর্বস্ব ও বহিরাগত অনুপ্রেরণায় আস্থাহীন; প্রকৃতি বা জীবনের সঙ্গে সংস্রব মুক্ত হয়ে অপরাপর মানুষের 'অশুভ' সংক্রমণ পরিহার করে শিল্পীর একমাত্র কর্তব্য তাঁর স্বীয় অহংএর আরাধনা; কল্পনা বা শিল্পানুভূতি ব্যতীত শিল্পের অন্যকোন উপাদান নেই; শিল্পীর পক্ষে জীবনানুগত্য নিষিদ্ধ। ওয়াইল্ড ব্যতীত যে কয়েকজন ইংরেজ লেখক বা শিল্পীর উপর এই জাতীয় শিল্পচেতনার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল তাঁদের মধ্যে ওব্রে বিয়ার্ডসলি, আর্ণেষ্ট ডসন, জন ডেভিডসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যদিও উপন্যাস একখানি লিখেছিলেন, বিয়ার্ডসলি ছিলেন মূলতঃ একজন চিত্রকর; ওয়াইল্ড এবং এডগার অ্যালান পো'র অনেক রচনার ছবি এঁকে ইনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। তুলির টানে যত অবাস্তব ও অসম্ভবকে চিত্রিত করে ইনিও প্রমাণ করেছিলেন যে শিল্পের সঙ্গে বাস্তব জীবনের বস্তুত কোন সম্পর্ক নেই। ইংল্যান্ড উত্তম কবিদের জন্মস্থান তাই অনেকেই আজ ডসন বা ডেভিডসনের নাম ভুলে গেছেন এবং বস্তুতঃ মহৎ কবিদের সমপাংক্তেয় হবার মত কিছুই এরা রচনা করেন নি, তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এঁরা দুজনেই প্রশংসনীয় কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। শুধু এঁদের রচনাতেই নয় এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও এঁরা, বিশেষতঃ ডসন, ফরাসী শিল্পীদের বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা প্রণালী অনুসরণ করে চলতেন। সহরের অন্ধকার ও নানাবিধ আপত্তিকর অঞ্চলে নতুন অনুভূতি ও শৈল্পিক অনুপ্রেরণার সন্ধানে ডসন বহুরাত্রি অতিবাহিত করেছেন; দূষিত ও অপরিচ্ছন্ন কাফের মধ্যে বেপরোয়া ও বিশৃঙ্খল জীবন কাটিয়ে শিল্প কৃষ্টির ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় ইনি ছিলেন অক্লান্ত। আবেগের তীব্রতা ও ঘনত্ব, যৌনপ্রেমের অলজ্জ প্রকাশে এবং আকাঙ্খার বস্তুকে না পাবার বেদনায় এঁর বহু কবিতা জর্জরিত, বিশেষতঃ তাঁর বহু পঠিত "সায়নারা" কবিতার মধ্যে এই ভাব খুবই স্পষ্ট। ডেভিডসনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হতাশা নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ। এক অবর্ণনীয় ক্লান্তি, তিক্ততা ও নৈরাশ্য তার সমগ্র জীবন ও শিল্প চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে; শোনাযায় যে এই নৈরাশ্য সহ্য করতে না পেরে ইনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন। এগুলি সবই অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ। পরিশেষে আরও একজন শক্তিধর লেখকের নাম একান্তই উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি যার নাম অবক্ষয়ের ইংরেজ সমালোচক বা লেখকেরা প্রায়ই

করেন না অথচ যাঁর মধ্যে অবক্ষয়ী শিল্পাদর্শের চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে। ইনি আধুনিক ইটালীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লেখক গ্রাবিয়েলে দান্নুনৎসিও, দান্নুনৎসিওর ভাষার গতি, স্বচ্ছতা ও কাব্যিকতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে অল্পই মেলে, যেমন আশ্চর্য্যকর এ'র আবেগকে শব্দের সাহায্যে চিত্রিত করবার ক্ষমতা তেমনই অপূর্বও চমকপ্রদ এ'র কাহিনীকে বিবৃত করবার ভঙ্গী। তাঁর "ইল্ পিয়াচেরে" বা 'আনন্দ' নামক উপন্যাসটির নামই উল্লেখ্য। সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বই খানি মিলান সহরে প্রকাশিত হয়।

প্রিয়মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা, সন্দেহ, ঈর্ষ্যা, ক্ষোভ প্রভৃতি প্রেমের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি অনুভূতিকে দান্নুনৎসিও একজন শল্যচিকিৎসকের যোগ্য যত্ন নিয়ে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটিকে বিস্ময়কর দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। কিন্তু রচনাশৈলীর উৎকর্ষ এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ব্যতীত এই রচনায় অন্য কিছুর সন্ধান মেলেনা। বইটি পড়বার সময় এর পাত্রপাত্রীদের বাস্তব জীবন থেকে বহুদূরে সরে থাকা কোন এক স্বপ্নময় রূপকথার রাজ্যের জীব বলে মনে হয়। জীবনানুগত্য তো দূরের কথা এই কাহিনীর স্থানে স্থানে সাধারণ মানুষ বা বাস্তবজীবনের প্রতি ঘৃণাও অনুকম্পা সহজেই চোখে পড়ে। এই জাতীয় রচনার কি ধরণের সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে আপাততঃ সেটাই আমাদের বিবেচ্য।

অবক্ষয়ী লেখকদের রচনা বা তাঁদের নন্দনতাত্ত্বিক ভাবধারার আলোচনাকালে প্রথমেই আমাদের যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তা হল সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং থাকলেও তার স্বরূপ কি। তাঁর আদর্শ সাধারণতন্ত্র থেকে কবিদের নির্বাসিত করবার স্বপক্ষে প্লেটো দুটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন; প্রথমতঃ—সাহিত্যিক রচনা অধিকাংশই এমন দূষিত যে তার প্রভাবে মানুষ দুর্বল, কামুক বা ব্যভিচারী হয়ে কর্তব্যজ্ঞান শূন্য হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ যেহেতু, প্লেটোর মতে, পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুই কোন শাশ্বত বা আদর্শ বস্তুর (বা সত্যের) অকিঞ্চিৎকর অনুকৃতি মাত্র এবং যেহেতু কবি বা শিল্পীরা সেই দৃশ্যমান বস্তুগুলিরই অনুকারক সেই কারণে তাঁদের রচনা, প্লেটো কল্পিত সেই আদর্শ সত্যথেকে দুই দফা দূরে সরে থাকা বস্তু যার কোন দার্শনিক মূল্য থাকতে পারে না। প্রথমোক্ত যুক্তির আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। শেষোক্ত যুক্তি প্লেটোনিক দর্শনের সারাংশ এবং এই যুক্তিকে অ্যারিষ্টটল খণ্ডন করে প্রমাণ করেছিলেন যে সাহিত্যে এর প্রয়োগ অসিদ্ধ। তাঁর মতে সাহিত্য প্লেটো কথিত ঐ আদর্শ সত্য থেকে দুই দুই দফা দূরে সরে থাকা কোন বস্তু তো নয়ই; উপরন্ত এ দুইই, পরস্পর অঙ্গাগীভাবে জড়িত। মানুষ মাত্রই যেমন তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বে বিরাজমান এবং তার বিবেক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতার সাহায্যে তার অস্তিত্বকে বিকশিত করবার দায়ীত্ব যেমন তার একার তেমনই একথাও অনস্বীকার্য যে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ বিদ্যমান। এবং এই সামান্য লক্ষণগুলি থাকার ফলেই গড়ে ওঠে মানুষের মধ্যেকার আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব বা একাত্মবোধ আর এই গুলির সাহায্যেই প্রমাণ করা যায় যে মানব জাতির একটি সাধারণ বা সার্বলৌকিক সত্ত্বা আছে। সাহিত্যিকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য মনুষ্যজীবনের এই সার্বলৌকিক সত্ত্বাকে উদঘাটিত করা; বিশেষকে বর্জন করে সামান্যকে চিত্রিত করা; বৈসাদৃশ্যের অন্তরালে সাদৃশ্যের সন্ধান করা। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মহৎ লেখকের রচনা, এই গুণগুলি থাকার ফলে দেশ কাল অতিক্রম করে সার্বজনীন স্বীকৃতি পেতে সমর্থ হয়েছে; এবং এই গুণ আছে বলেই সাহিত্যকে অ্যারিষ্টটল ইতিহাসাপেক্ষা অধিকতর গভীর ও দার্শনিকতায় সমৃদ্ধ আখ্যা দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এর জন্য লেখকের প্রয়োজন গভীর জীবনবোধ ও প্রেক্ষণক্ষমতা, ধৈর্য্য এবং স্থিত প্রজ্ঞা।

আঠারোশ আশীর দশকের ফরাসী এবং নব্বইয়ের দশকের ইংরেজ লেখক বা নন্দনতাত্ত্বিকেরা লেখকদের এই দায়িত্ব এবং চরম পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা সমস্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে সাহিত্য সর্বতোভাবে জীবনবিমুখ; লিখন শৈলীর উৎকর্ষ সাধন, সৌন্দর্যের আরাধনা ও নানাবিধ কৃত্রিম পদ্ধতিতে আবেগকে প্রজ্বলিত করাই শিল্পীর স্বধর্ম; এভিন্ন তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। ফলতঃ তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শক্তিমান লেখক এবং তাঁদের রচনায় কয়েকটি সদ্‌গুণ থাকা সত্বেও সেগুলি অত্যন্ত অগভীর এবং স্থানে স্থানে হাস্যকর ভাবে শিশু শোভন। বিশ্ব সাহিত্যের যে কোন একটি শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে এগুলির তুলনা করলেই এগুলির দৈন্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকার দায়িত্ব চাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এক বায়বীয় সৌন্দর্য্যের সাধনা করার এই জাতীয় পরিণতি অনিবার্য।

দ্বিতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারবুদ্ধিকে অস্বীকার করতে গিয়ে এঁরা প্রায় সকলেই জীবনের কয়েকটি সাধারণ মূল্যকে অগ্রাহ্য করেছিলেন; তাঁদের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বুর্জোয়াদের মাত্রাতিরিক্ত নৈতিকবোধকে সংযত ও দমন করবার জন্য গোতিয়ে প্রমুখ নন্দনতাত্ত্বিকেরা যে ভাবধারার প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রয়োজন ছিল এবং তা বোধহয় সমর্থনেরও যোগ্য; কিন্তু অবক্ষরী লেখকেরা এই ভাবাধারাকে এমন এক চরম পর্য্যায়ে ঠেলেছিলেন যার ফলে মনুষ্যজীবনের কয়েকটি সাধারণ মূল্যের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুন্দরের সাধনায় এঁরা সত্য বা শিবকে পরিহাস্য করে তুলেছিলেন। শিব ও অশিব বা শুভ ও অশুভের সাধারণ পার্থক্যটুকুও এঁরা ভুলেছিলেন। একথা ঠিকই যে বিশ্বসমাজের ধ্যান ধারনায় আপেক্ষিকতা এমনই প্রবল যে শুভ ও অশুভের কোন নির্দিষ্ট সর্বজাগতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব। তথাপি মানুষ তার শুভবুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তির সাহায্যে, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি মূল্য প্রস্তুত করে নিয়েছে। গ্রীক মনীষী প্রোটাগোরাস বলেছিলেন যে দুটি অভিমতের মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর সত্য একথা প্রমাণ করা যদিও অসম্ভব কিন্তু দুটি অভিমতের পরিণতি বিচার করে এটা স্থির করা অসম্ভব নয় যে একটি অভিমত অপরটি অপেক্ষা শ্রেয়। এই শ্রেয়বোধ এবং বিবেচনা বুদ্ধির সাহায্যেই মনুষ্য জীবনের যাবতীয় মূল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিব ও অশিব বা শুভ বা অশুভ এ দুইই যে বিভিন্ন এবং এই দুয়ের মধ্যে যে শিব বা শুভই শ্রেয় এ ধারণা মানুষের হয়েছে। নরহত্যা বা এই জাতীয় অনাচারকে যে অবক্ষয়ীরা যে উৎসাহ নিয়ে সমর্থন করতেন তা দেখে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁরা মানুষের এই শাশ্বত মূল্যবোধে অবিশ্বাসী ছিলেন। যদিও সাময়িক ভাবে সেক্সপীয়র বা গ্যয়টে ও জীবনের অর্থহীনতা এবং নাস্তিকত্ববোধের দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন কিন্তু এই মানবিক মূল্যে তারা কখনই সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারান নি; নরহত্যা করা অথবা অন্তঃস্বত্বা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করার পরিণতি যে বিবেক দংশন অথবা এক অপ্রতিকার্য মানসিক যন্ত্রনা এ কথা তাঁরা তাঁদের রচনায় স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। অবক্ষয়ীদের রচনার এই জাতীয় জীবন-সমালোচনা দুর্লভ। সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর অধিকাংশ মহৎ সাহিত্যিক রচনার বিষয়বস্তু এবং এই গুরুতর বিষয়বস্তু শুধু তিনিই আলোচনা করতে পারেন যিনি সত্য শিব ও সুন্দরের শাশ্বত মূল্যে আস্থাবান; এবং এই মূল্যে আস্থা হারালে মানুষ স্বভাবতঃই এক শূন্যতা বোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যা করে নচেৎ শূন্যগর্ভ অতীন্দ্রিয় বাদ বা ফাসী-জমে আত্মসমর্পণ করে। অবক্ষয়ীদের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

এঁদের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্যও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। এদের অনেকেই বিশেষতঃ অস্কার মধ্যে বহির্জগৎ কে অস্বীকার করবার চেষ্টা দেখা যায়। মানুষের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করে এবং বাস্তব জীবন বা জড়জগতের সান্নিধ্য পরিহার করে দেজ এঁষ্যাৎ নিজেকে সঙ্কুচিত

করেছিলেন তাঁর নিজের কক্ষের অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে। এই জাতীয় উগ্র অন্তর্মুখীনতা বা ইন্‌ট্রোভার্সানের বস্তুতঃ কোন মূল্য নেই। জীবনের স্বরূপ তার সম্পূর্ণতা বা সামগ্রিকতার মধ্যে, আর এই সামগ্রিকতা গড়ে ওঠে বস্তু জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সম্মিলনে, জড়ের চৈতন্যের সন্ধিতে; এই দুটির কোন একটিকে বাদ দিলে অস্তিত্ব নিরর্থক হয়। আমাদের অনুভূতি এবং চৈতন্যের সক্রিয়তার ফলেই বস্তুজগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় পক্ষান্তরে মানুষ স্বয়ম্ভু অথবা কোন বায়বীয় জীব নয়; জীবনধারণের প্রত্যেকটি উপাদানের জন্য সে নিয়তই বস্তু জগতের প্রতি নির্ভরশীল। অবক্ষয়ী লেখকেরা জীবনের এই পূর্ণাঙ্গ রূপকে গ্রহণ করেন নি; তাঁরা একটি মূল্যবান অংশকে বর্জন করে অন্য অংশটির উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর একমাত্র কারণ তাঁদের জীবনবিমুখীনতা ও সত্যকারের জীবনবোধের অভাব। এ'রা সকলেই ছিলেন স্পষ্টতঃ গণতন্ত্র বিরোধী এবং এ'দের এই অত্যুগ্র অহংবাদ এবং আত্মকেন্দ্রিকতা তথা মানবিক মূল্যের প্রতি অনাস্থার শেষ পরিণতি ফাসীজম। দান্নুন্‌ৎসিত্ত যিনি তাঁর উপরে আলোচিত উপন্যাসের একাংশে গণতন্ত্রকে পাঁকের স্রোত আখ্যা দিয়েছেন তিনি তো মহাউৎসাহে ফাসীস্ত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন; এবং শুনেছি তিনি নাকি একদা বলেছিলেন যে একমাত্র রক্তপাত সমন্বিত যুদ্ধই মানুষের অস্তিত্বকে স্ফুরিত করতে পারে।

অবক্ষয়ীদের রচনার গুণাগুণ বিচারের শেষে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাঁরা নিপুণ ও উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর অধিকারী হওয়া সত্বেও এমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি যা বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনার সমপাংক্তেয় হতে পারে তথাপি তাঁদের রচনাবলীর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় লেখকেরা তাঁদের রচনায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তার অধিকাংশই অবক্ষয়ীদের রচনায় দেখা যায়। হতাশা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা, বৈক্লব্য, গভীর শূন্যতাবোধ, সমাজে প্রচলিত মূল্যের প্রতি অনাস্থা এবং সর্ব্বতোভাবে নিজেদের সমাজ বহির্ভূত জীব হিসাবে জ্ঞান করা; এইগুলিই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এ সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে এগুলির প্রত্যেকটিই গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকের ইউরোপীয় সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছিল। সমাজ জীবনের যে ভাঙন বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যে কেন্দ্রবিমুখতার ফলে বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সমাজচ্যুত হিসাবে জ্ঞান করছেন সেই ভাঙন বা কেন্দ্রবিমুখতার পূর্ব্বাভাস গত শতাব্দীতেই সূচিত হয়েছিল; তাঁর একমাত্র প্রমাণ এ'দের এই রচনাগুলি। সাহিত্যের সমাজ সচেতনতা বা যুগসচেতনতায় অবক্ষয়ীরা বিশ্বাস করতেন না অথচ তাঁরা তাঁদের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের রচনার মধ্যে তাঁদের সমাজ বা কাল কে চিত্রিত করে গেছেন।

আধুনিক কথা সাহিত্যে 'চরিত্র'

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ জন বেলে সম্প্রতি ওঁর "ক্যারাক্‌টারস্‌ অব্‌ লভ" গ্রন্থে আধুনিক কথা সাহিত্যের একটি বিশেষ দৈন্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে আধুনিক কথা সাহিত্যে 'ক্যারাক্‌টার', অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রের একান্ত অভাব। তিনি আরো বলেন যে আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জগতকে দেখেন এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্য ও জগতের প্রতি তাঁদের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীরই রূপায়ণ মাত্র। ফলে আধুনিক কথাসাহিত্যে এমন চরিত্রের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে যে শুধু মাত্রই একটি জীবন্ত চরিত্র, এবং একটি বিশিষ্ট চরিত্র, কোন ভাব বা সত্যের প্রতীক বা বাহক নয়। বেলের মতে অতিরিক্ত প্রতীক ধর্মিতার ফলে আধুনিক কথা সাহিত্য এমন এক উষর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে যে পাঠকেরা সাম্প্রতিক কালে কথা সাহিত্য ছেড়ে বাস্তব আশ্রয়ী, জীবনী, স্মৃতিচিত্র ইত্যাদির দিকে ঝুকেছেন।

বেলের অভিমত সম্ভবতঃ এই যে এই অবস্থার জন্য আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরাই দায়ী। কিন্তু একথা আপাতদৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য মনে হলেও এর কী কোন অন্যতর কারণ নেই? 'বেলে' নিজেও স্বীকার করেছেন যে ফ্রয়েড ও মার্ক্সের চিন্তাধারার প্রভাবও এরজন্য অনেকটা দায়ী। এঁরা দুজনে যে তত্ত্ব প্রচার করলেন তাঁর ফলে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারনার অনেক ব্যতিক্রম হয়েছে এবং কোন ব্যক্তিত্বই যে স্বয়ম্ভু নয় একথা স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য এঁদের প্রচারিত তত্ত্বের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের ব্যাখ্যা এক-দেশদর্শী প্রমাণিত হয়েছে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে কোন 'ব্যক্তিত্ব' বা 'চরিত্র'কেই সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভু বলে বিনা তর্কে মেনে নিতে আমাদের আজ দ্বিধা জাগে।

আর এই দ্বিধার ফলেই সাহিত্যিকের মনোযোগ 'চরিত্র' হতে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পারি-পার্শ্বিক বা নির্জ্ঞান মনের ওপর গিয়ে পড়েছে, এর ফল ভালো হয়েছে কী মন্দ তা বিচার করার সময় এখনো আসেনি। তবে একটা কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যিক-দের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, একটু চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে আলবেয়ার কামুর বিভিন্ন নায়কের দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে লেখকের জীবন দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি। অথচ সেক্‌পীয়রের ম্যাকবেথ বা হ্যামলেটের জীবন দর্শন একান্ত ভাবে তাদের নিজস্ব। লেখক এখানে সৃষ্ট চরিত্রের সংগে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন—নিজের জীবনদর্শন বা দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী চরিত্রকে গড়ে পিটে তৈরী করেন নি।

চরিত্রের চেয়ে পারিপার্শ্বিকের প্রতি জোর দেওয়া বা সৃষ্টি চরিত্রকে শুধু কোন একটি ভাব বা তত্ত্বের বাহক করে তোলা কী শুধু লেখকদের কল্পনাশক্তির দৈন্যের পরিচায়ক? আমার কিন্তু মনে হয় এর মূল আমাদের বর্তমান জীবনেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিগত শতাব্দীগুলিতে আমাদের জগতের পরিধিটা ছিল ছোট। পরিধি ছোট হওয়াতে পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও ছিল আমাদের মধ্যে। ফলে মানবমনে এমন একটা

আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল যে জাগতিক ও আত্মিক সর্বদিক দিয়েই সীমালঙ্ঘন করার মতো দুঃসাহসী চিত্তের অভাব ছিলনা। হয়তো এই দুঃসাহসের পরিণাম শেষ পর্যন্ত হোতো ট্র্যাজিক,—তবু চেষ্টা করলে আমাদের পারিপার্শ্বিককে আমরা নিজেরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, এই বোধটুকুই জাগাতো উচ্চাশা, রোপন করতো বিশাল ব্যক্তিত্বের বীজ। কিন্তু বর্তমান জগতে মানবমনের সেই আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের জগতের পরিধি আজ এতই বিস্তৃত, পারিপার্শ্বিক এতই জটিল যে কোন একজন মানুষের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রিত করা প্রায় অসাধ্য। শুধু তাই নয়, পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় আজ আমরা বুঝতে পারছি একক ভাবে আমরা কত ক্ষুদ্র। যে জটিল শক্তিগুলি আমাদের সার্বিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে তার কাছে আমাদের একক ইচ্ছার আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গতি নেই। এ অবস্থায় যদি মানবমনে উচ্চাশার অভাব দেখা দেয় যদি আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকে তবে অবাক হবার কিছু নেই। আর এই অবস্থায় আর যাই হোক, বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্ম হওয়া কঠিন। ব্যবহারিক জীবনেও আমরা দেখতে পাই যে বর্তমানে সত্যিকারের বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক খুব কমই দেখা যায়। আমাদের জীবনের নানা বিভাগের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের উর্ধগতিও অনেকাংশে ঘটনা নির্ভর। তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব জনিত ততোটা নয়।

এছাড়া আরো একটি কারণ আছে। যে কোন কারণেই হোক বর্তমান যুগে জাগতিক ও আত্মিক সর্বদিক দিয়েই ষ্ট্যাণ্ডারাইজেশন্‌ এর দিকে একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই সার্বিক একীকরণের ফলে সুধু আমাদের দৃষ্টিভংগীর নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও প্রায় লোপ পাচ্ছে। কিন্তু বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণই হোলো যে সে অনন্য, বিশিষ্ট। বর্তমান জগতে সে বৈশিষ্ট্যের স্থান কতটুকু?

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা যদি আমাদের জীবন থেকেই নির্বাসিত হয়ে যান তবে সাহিত্যে কী আমরা তাঁদের সৃষ্টি করতে পারব? বাস্তব জগতে আমরা যদি ক্রমশঃ পারিপার্শ্বিক ও বিভিন্ন শক্তির ক্রীড়নক হয়ে উঠি তবে সাহিত্যেও কী পারিপার্শ্বিক রচনার প্রতি জোর পড়বে না? বহির্জগতের প্রতি মানবমন যখন আর আস্থা রাখতে পারছেনা তখন সাহিত্যিকের মন তো অন্তর্মুখী হতে বাধ্য। আর এরই ফলে সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর রঙে বিশ্বকে রঙীন করার প্রয়াস—নিজ নিজ ভাবনা ও বিশ্বাসের আলোতে সৃষ্ট চরিত্রও ঘটনার মূল্যায়ন।

চেষ্টা করলেই কী এই স্রোতকে ফেরানো সম্ভব? প্রতীক বক্তব্য সব কিছু বাদ দিয়ে 'চরিত্র' আঁকার চেষ্টাতো আজো অনেক সাহিত্যিক করে আসছেন কিন্তু সেসব চরিত্রগুলি আজো গত শতাব্দীর সাহিত্যের 'চরিত্রে'র পাশে দাঁড়াতে পারে না কেন? একী শুধু আধুনিক লেখকদের ক্ষমতার অভাব? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ডিকেন্সের কথা। এ কথা কী করে মানবো যে বর্তমানে ডিকেন্সের সমতুল লেখক একজনও জন্মাননি। কিন্তু তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ডিকেন্সের সৃষ্ট চরিত্রগুলি আগামী শতাব্দীতেও বেঁচে থাকবে—হয়তো তার পরের শতাব্দীতেও। কিন্তু আজ যদি কোন সাহিত্যিক ডিকেন্সের আদর্শে চরিত্র সৃষ্টি করেন তবে তিনি শত কলাকুশলী হলেও তাঁর প্রচেষ্টা হাস্যকরই হবে। কারণ বর্তমান যুগের বাত্যাবিক্ষুব্ধ ও নানা শক্তির সংঘর্ষে খণ্ডবিখণ্ড জীবনে গতযুগের 'সুডৌল' ব্যক্তিত্বকে মনে হবে অবাস্তব, গতযুগের পরিপ্রেক্ষিতে যা ছিল আনন্দ দায়ক, বর্তমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তা শুধু পীড়াই জন্মাবে।

তাই মনে হয় যে গত যুগের সাহিত্য আমাদের যত মনোরঞ্জনই করুক না কেন, আধুনিক

সাহিত্যকে সেই খাতে বহানোর চেষ্টা শুধু মাত্র পণ্ডশ্রম, অতিরিক্ত প্রতীক ধর্মিতা ও বক্তব্যের ভারে প্রপীড়িত হয়ে আধুনিক সাহিত্য যদি উষর মরুভূমিতে এসে পৌছেও থাকে তবু ফেরার পথ নেই। এই মরুকে অতিক্রম করেই যেতে হবে এবং খুঁজে নিতে হবে নতুন কোন শস্য শ্যামল প্রান্তর।

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

'রামমোহনের গদ্যরচনা' প্রসঙ্গে

'সমকালীনে'র গত আশ্বিন সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৬৮) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহনের গদ্য রচনা'—শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তার সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমার বক্তব্য বা সমালোচনা রামমোহনের গদ্য বিষয়ে নয়, তাঁর ধর্মমত বিষয়ে, অর্থাৎ অসিতবাবু ঐ প্রবন্ধে রামমোহনের ধর্মমত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন সেই প্রসঙ্গে। অসিতবাবু তাঁর সুলিখিত প্রবন্ধটিতে নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বাংলাদেশে রামমোহন বেদান্তচর্চ্চার সূত্রপাত করেন বলে যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়। মধ্যযুগে বাংলাদেশে বেদান্তসূত্রের দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী দুরকম আলোচনাই সুপ্রচলিত ছিল। মধুসূদন সরস্বতী (১৬শ শতাব্দী), ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, রামানন্দ বাচস্পতি (১৮শ শতাব্দী), বলদেব বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতাব্দী), ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাঙালী বৈদান্তিকেরা বেদান্ত বিষয়ে নানা মৌলিক গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধকারের মতে ঊনিবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রামমোহন এই ধারারই অনুবর্ত্তন করেছেন মাত্র ('সমকালীন', আশ্বিন ১৩৬৮, পৃঃ ৩৯০)। উপরের সব কথাগুলিই নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের সবটুকু অসিতবাবু তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ করেন নি। সম্পূর্ণ সত্যের খাতিরে এ কথাও পাঠকদের স্মরণ করিয় দেওয়া প্রয়োজন যে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী বৈদান্তিক পণ্ডিতদের বিস্তর পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ, রামমোহনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী বৈদান্তিকেরা কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের সামনে বেদান্তের শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেন নি। ফলে সমাজের সাধারণ শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেকেই বেদান্ত কাকে বলে জান্‌ত' না, কেউ কেউ একে রামমোহনের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ বলেও মনে করেছেল। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তিকায় রামমোহন এঁদের অজ্ঞতাই দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুতঃ, রামমোহন বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে মুষ্টিমেয় দার্শনিকের ব্যক্তিগত অনুশীলনের বস্তু বলে মনে করেন নি। সেই জন্যই তিনি বেদান্তসূত্র ও প্রধান প্রধান উপনিষদের সটীক অনুবাদ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় রচনা করে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সেগুলি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। [এস্‌, ডি,, কলেট "লাইফ এ্যাণ্ড লেটারস্‌ অব্‌ রাজা রামমোহন রায়" ক্যালকাটা, ১৯১৩), পিপি ২৫-২৬]

দ্বিতীয়তঃ রামমোহন বেদান্তের শিক্ষাকে ব্যবহারিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন আমাদের উপাসনা পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তিত করে। এ চেষ্টা অসম্পূর্ণ হলেও বাঙালী সমাজে সম্পূর্ণ নূতন। সেইজন্যই রামমোহনের বেদান্তপ্রচার সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল মধুসূদন সরস্বতী বা বলদেব বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ বা টীকা তা কোনো দিন করতে পারে নি। এ কথাগুলি মনে না রাখলে রামমোহনের প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমার ধারণা।

অসিতবাবু তাঁর প্রবন্ধের অন্যত্র বলেছেন যে "রামমোহন বেদান্তের একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রচার করলেও 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—ব্রহ্মবাদের এই তত্ত্বটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।.... প্রতিভাসিক জগৎচেতনা খপ্নেপের মত অলীক—রামমোহনের মত বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ এ কথা মানতে পারতেন না। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।" এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রবন্ধকার রামমোহনের বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে লেখা সুবিখ্যাত পত্রটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে রামমোহন বেদান্তের মায়াবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অসিতবাবুর মতে "সাধারণ বৈদান্তিকের সঙ্গে রামমোহনের এইখানে মৌলিক পার্থক্য।" ('সমকালীন', আশ্বিন ১৩৬৮, পৃঃ ৩৯১) কিন্তু অসিতবাবু বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেন নি যে রামমোহন আমহার্স্টকে লেখা পত্রে বেদান্তের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন তার উত্তর-ও তাঁর নিজের অবিদিত ছিল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বেদান্তগ্রন্থে'র ভূমিকায় রামমোহন লিখছেন,—"যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদ জ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কে থাকিবেক তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হইবেক যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্তা ব্রহ্ম হয়েন যেমন দশ জন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোক সকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক।" ('বেদান্তগ্রন্থ', 'রামমোহন গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬) রামমোহনের অন্য কয়েকটি রচনাতেও আমরা এই যুক্তির পুনরুল্লেখ দেখি। ('ঈশোপনিষৎ,' 'রামমোহন গ্রন্থাবলী' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১; 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'রামমোহন গ্রন্থাবলী' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৫।) অসলে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের পত্রটি একটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা, এ থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মত জানবার চেষ্টা করা বৃথা। ক'লকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮২৩) পরিবর্ত্তে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক, এই ছিল বড়লাট-সকাশে রাম-মোহনের প্রার্থনা, এবং নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় করবার জন্য রামমোহন প্রাচীন হিন্দু দর্শনের প্রায় সমস্ত বিভাগের, এমন কি বেদান্তেরও বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হ'ন নি। তবে রাম-মোহন ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসী ছিলেন না, বরং ভোগীই ছিলেন। তাই মায়াবাদকে বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করলেও হৃদয় দিয়ে করেন নি বরং সেইজন্যই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মধ্যে একেশ্বর-বাদের দিকটাই তাঁকে বেশী করে আকর্ষণ করেছিল। উপনিষদের জ্ঞানবাদকে 'ইন্টেলেকচুয়াল' স্বীকার করে নিয়েও তিনি ভক্তিমূলক ব্রহ্মোপাসনার উপরেই বেশী জোর দিয়েছিলেন। উপ-নিষদের মায়াবাদকে যুক্তি দিয়ে স্বীকার না করলে রামমোহন বেদান্তের মায়াবাদী শাংকরভাষ্যকে আগ্রাহ্য করে দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তা করেন নি। বরং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী চৈতন্য-সম্প্রদায়ের উপর তাঁর কিছুটা বিরাগ ছিল বলেই মনে হয়, এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যাও তিনি কোথাও অনুসরণ করেন নি। (এ বিষয়ে তাঁর 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার'—পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।) অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস অবশ্য এর মধ্যে রামমোহনের উপর তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন ('রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৭) কিন্তু সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

রুশ-সাহিত্যের বিবর্তন ঃ কবি নেক্‌রাসভ্‌

সাহিত্যের মধ্যে দেশের সমাজ ও মানুষ বিধৃত হ'য়ে থাকে। এ দুয়ের বিবিক্ততা অসম্ভব। সাহিত্যের ইতিহাসও শুধুমাত্র সাহিত্যের ইতিহাস নয়, সে দেশের সমাজ ও মানুষেরও ইতিহাস। এ দুয়ের পৃথকীকরণ অসম্ভব। উপর্যুক্ত চিরন্ত রুশ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে গভীরভাবে সুপ্রযোজ্য।

সভ্যতার বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে গ্রাম রূপ নেয় নগরে—গ্রামীন সভ্যতা নাগরিক সভ্যতায়। পত্তন হ'ল অন্যান্য সহরের সংগে বিখ্যাত কিয়েভ সহরের। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নীপার নদীর কূলে এই নব-স্থাপিত কিয়েভে যে সভ্যতার উৎসার তারই সার্থকতম প্রকাশ ও প্রসার ঘটল পরবর্তীকালে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কো নগরীর মাধ্যমে। ইতিহাস প্রাগ্রসর—পথ সে আপনিই কাটে। সোনার-হরিণের আকর্ষণে ক্ষীণ ঔপনিবেশিক চেতনা জাগ্রত হ'ল নানাজাতির অন্তর্লোকে। বাঁধা-না-মানা প্রবল বহির্মুখী মন সব খোয়া-বার অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে এগিয়ে চলে। কেউ হয় জয়ী, কেউ প্রতিহত হ'য়ে আসে ফিরে, আবার কেউ বিসর্জন দেয় সর্বস্ব। নবম শতাব্দীতে স্ক্যানডিনেভিয়া হ'তে আগত সশস্ত্র সুকৌশলী বণিকদল অনুপ্রবেশ করে রাশিয়ায়। দুর্বলতার সুযোগে তারা ক'রে কর্তৃত্ব। সাঙ্গীকরণে ভাব-বিনিময় ঘটল অন্তরে ও বাইরে। এর সাথে দশম শতকের শেষ দিকে এসে যুক্ত হ'ল খৃষ্টধর্ম; আর ধীরে ধীরে এ ধর্মের প্রচার ও প্রসার। একটা যুগান্তর ঘটল সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে।

এসব পরিবর্তনের মাঝে সাহিত্য-রচনাও চ'লতে থাকে কিন্তু তখনও সাহিত্যে আসে নি কোনো স্থিরতা। বিচ্ছিন্নভাবে এর অগ্রসরতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একাদশ ও দ্বাদশ শতকে রুশ সাহিত্যে একটা নতুন অথচ স্থায়ী সুর ধ্বনিত হ'ল যা' পরবতীকালে সাহিত্যকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত ও পথনির্দেশ ক'রেছে। এই মূলসুরটি হ'ল 'ডেমোক্র্যাটিক্‌ ক্যারেক্‌টার্‌ এ্যান্ড আই-ডিয়া'। এ সুর তখন ক্ষীণ হলেও প্রভাব স্বল্প নয় বরং সুদূরপ্রসারী।

উনবিংশ শতাব্দী। এক আশ্চর্য উন্মাদনা ও নবচেতনার যুগ। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকেই জীর্ণ সংস্কার ও পুরোনো ভাবধারাকে ভাঙবার নেশা। ফরাসী বিপ্লবে উপেক্ষিত, এতদিন পিছয়ে—থাকা জনগণের বলিষ্ঠ কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়েছে। নেপো-লিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও পরাজয়, ভিয়েনা কংগ্রেস সমাপ্ত। যুদ্ধ শেষে ফিরে এসেছে দেশের সৈন্যদল আর 'মেনি অফিসার্‌স্‌ বিকেম ইনফেকটেড উইথ দি নিউ আইডিয়াস' তাদের প্রচারিত নতুন ভাবধারায় জনগণ উদ্বুদ্ধ। স্পেনে ও ইতালীতে বিপ্লবীদের হয়েছে বিপুল জয়। রাশিয়ার জনসাধারণের মনে এল উদ্যম, এল প্রেরণা। নেপোলিয়নকে পরাভূত করায় আত্মপ্রত্যয় ও উল্লাস। এর কিছু পরেই বিদ্রোহী-মনোভাব ও কার্যকলাপের জন্য কবি রিলেয়েভ্‌-এর হ'ল প্রাণদন্ড। শাসকবর্গ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উত্তেজনা প্রশমিত ক'রতে ব্যস্ত। তারা উত্তরোত্তর হ'ল নিষ্ঠুর। সব মিলিয়ে এক আভ্যন্তরীণ জটিলতা।

ধর্মীয় মনোভাব তখনও বর্তমান থাকলেও সে তার সজীবতা, গভীরতা ও প্রাণশক্তি হারিয়েছে। রোমান্টিক যুগ সাহিত্যে হ'য়েছে শুরু। এইসব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রুশ-সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল। ইউরোপীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলো অনূদিত হ'ল সেই সাহিত্যে। রাশিয়ার মানুষ পরিচয় পেল হোমার-শীলার-শেক্‌স্‌পীয়র-গ্যয়টে-বোদ্‌লেয়ার প্রভৃতির, আর তাদের ভাবধারায় নতুনভাবে চিন্তার খোরাক পেল। নব-দিগন্ত

উন্মুক্ত হল। রুশ-সাহিত্যে পুশকিন্ তখন তরুণ হ'লেও অপরিচিত ও অপঠিত নন। গোগোল ও লারমনতফ্-এর হ'য়েছে জন্ম। প্রথম পেশাদারী রুশ-নাট্যকার অস্ত্রোভস্কিরও ঘটেছে প্রকাশ। এমনই এক পরিমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল মানুষের কবি নেক্রাসভ্-এর ও কৈশোর-কাল ক'রলেন অতিবাহিত। এই সময় হ'তেই মানুষ সাহিত্যে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হ'ল। সে এখন অনুকম্পার শৃঙ্খল-মোচনে পেল সত্যকার স্বীকৃতি। সে জেনেছে এই সভ্যতার বিকাশের মূলে তারই হাড়-ভাঙা-খাটুনি। তাই অনুকম্পাকে সে ঘৃণা ক'রতে শিখল, সে চায় মর্যাদা।

নেক্রাসভ্ ছিলেন তৎকালীন রাশিয়ার একজন উল্লেখযোগ্য সংযত শিল্পী। গীতি-কবি হ'লেও এই তার একমাত্র পরিচয় নয়। রোমান্টিক ভাবাবেগে সুদূর কল্পনাভিসারী মনো-ভাব-ব্যঞ্জনায় তাঁর চরম অনীহা। গান গেয়েছেন সুখ-দুঃখের, মন্দ লাগা-ভাল লাগার। তিনি ছিলেন অনমনীয় বাস্তববাদী—কল্পলোকাভিসারিতার স্থান সেখানে সামান্য। করুণরস ও গভীরানুভূতির পরিস্ফুটনে তাঁর লেখনী ছিল সুগভীর ও মর্মভেদী। আর কাব্যের উপজীব্য ও উপাদান ছিল মানুষ ও প্রকৃতি।

প্রকৃতি তাঁর কাব্যের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। এ প্রকৃতিকে শুধুই সৌন্দর্যপ্রতিমারূপে দেখতে তিনি চান নি। নেক্রাসভের প্রকৃতি মানুষের মিত্র, মানুষের শত্রু। মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতি যেখানে সুসংলগ্ন, সেখানকার চিত্রই তিনি এঁকেছেন। এ দৃষ্টি তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। দ্বাদশ শতাব্দীতে 'দি ষ্টোরি অব্ দি রেড্ অব্ প্রিন্স ইগোর' নামে এক অনবদ্য গদ্য-মহাকাব্য রচিত হয়। এর মধ্যে ইগোর-এর অভিযান বর্ণিত হয়েছে। এ গদ্য-মহাকাব্য এজন্য উল্লেখযোগ্য যে, প্রকৃতি এখানে মানুষের সহচর, মানুষের মতই তার আচার-আচরণ। ইগোর-এর পরাজয়ে প্রকৃতির সহানুভূতির এক আশ্চর্য বেদনাময় রূপ ফুটে উঠেছে। সে মর্মব্যথায় নুয়ে পড়ে—যেমনটি হয় মানুষের। মানুষ আর প্রকৃতিকে পৃথকভাবে চিন্তা করা সেখানে অসম্ভব। প্রকৃতির অভিব্যক্তি সেখানে প্রাণবন্ত, মানব-সুলভ। মানুষও সেখানে তাঁর নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রকৃতিকে অকপটে প্রকাশ ক'রতে দ্বিধা করে না। নেক্রাসভ্ও মানুষের এই অতি-নিকট আত্মীয় প্রকৃতিকে সাহিত্যে তুলে ধ'রেছেন মানুষের পরিপূরকরূপে।

তৎকালীন রাশিয়ার অনেক সাহিত্যিকই এসেছিলেন অভিজাত সমাজ থেকে। এই সামন্ত-শ্রেণী কৃষক-সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষকের দুঃখ-অপমানে তাদের বিলা-সের কোনো ব্যাঘাত ঘটিত না। এসব ব্যাপারে তারা ছিলেন নিস্পৃহ। নেক্রাসভ্ও এসেছিলেন এমনি এক পরিবার থেকে। কিন্তু তিনি দাসত্বকে ঘৃণা ক'রতেন, কৃষকের অবমাননায় অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস্ মানুষকে যে নব-স্বীকৃতি জানাল তা তাঁর মনে পরি-পূর্ণ ও সার্থকভাবে কার্যকর হয়েছিল। অবশ্য এর আগে পুশকিন রাশিয়ার মানুষ ও তার অবস্থাকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। পুশকিনকে বাদ দিলে এক নেক্রাস্ভ ছাড়া তাঁর আগে মানুষের কথা এমন সহৃদয়তার সাথে আর কেউ বলেন নি। কৃষকের সঙ্গে কবির ছিল অন্তরঙ্গতা, আত্মার আত্মীয়তা, তাই 'নেক্রাসভ্ রাইটস্ অব দি পেজান্টস সাফারিংস উইথ টিয়ারস এ্যান্ড সিদিং কম্প্যাশন" তাঁর ইচ্ছা ছিল এমন একটি কবিতা লিখবার যার মধ্যে তৎকালীন রাশিয়ার সব-রকমের মানুষের চরিত্র অঙ্কিত হবে। এই প্রচেষ্টায় তিনি লিখলেন হু লিভস্ ওয়েল ইন রাশিয়া'। এইটি লোকউপখ্যান জাতীয় রচনা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ জার, হতে আরম্ভ করে বণিক, যাজক, দরিদ্রতম কৃষক সবাই আছে। তিনি নিপুণভাবে সহানুভূতির দ্বারা এইসব চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'We care for literature primarily on account of its deep and lasting

human significance. A great book grows directly out of life'.

এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে নেক্‌রাসভ নিঃসন্দেহে সার্থক শিল্পী। মানুষের জীবনকথা শোনাতে, মানুষের অন্তরের কামনা-বাসনাকে কাব্য-তুলিকায় আঁকতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ ক'রতেন না। তৎকালীন রাশিয়ার মানুষের পরিচয়ের মধ্য-দিয়েই চিরন্তন-মানুষের মানবিক আবেদনই তিনি রঞ্জিত ক'রেছেন। রাশিয়ায় সাহিত্য-সাধনা শুধু একটি বিলাসিতামাত্র নয়, তার চেয়েও বড় কিছু এ হল জীবনের প্রতিফলন। এ নিজেই জীবন ও জীবন্ত।

নেক্‌রাসভের আর একটি কৃতিত্ব যেখানে তিনি রঙ্গব্যঙ্গকারী। মানুষের অবিচার-অত্যাচার-অসঙ্গতিকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি নির্মম—সত্য-উদ্‌ঘাটনে এতটুকু ভীতি বা জড়তা নেই। তাই তিনি তাঁর স্বভাবজাত পথ ছেড়ে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বেদনার সুগভীর অকপট সরলতা, বর্ণনায় বাস্তবতা ও প্রকাশ নির্মলতা তাঁর এইসব রচনাকে স্থায়ীত্ব দিয়েছে। এই রচনা সম্বন্ধে তুর্গেনিভ্‌ ব'লেছেন, 'Nekrasov's poems, focused on one point, are scorching.' V. P. Kranickfeld-এর মতে, 'Being a satirist, striking evil not with a lash, but with a hammer, Nekrasov directed his blows to those points where contradictions were the sharpest, where sufferings were the keenest.

তাঁর কালে তিনি প্রগতিবাদী তরুণদের মনে অভাবিত প্রভাব ও উন্মাদনা-সৃষ্টিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তরুণেরা তাঁকে এমনভাবে নিজের ক'রে নিয়েছিলেন যার ফলে, কিছুদিনের জন্য পুশকিন ও লারমন্‌তফের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল। একজন কবির পক্ষে এটি কম বড় সম্মানের কথা নয়। কিন্তু তাই ব'লে দুদিনের উচ্ছ্বাসের পরেই তাঁর জনপ্রিয়তা ও তাঁর রচনার সর্বজনীনতা ক্ষুণ্ন হ'য়ে যায় নি। চিরন্তন সাহিত্যের আসরে তাঁর কাব্য স্থায়ীত্ব লাভ ক'রেছে। মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নেক্‌রাসভের যে ধারণা, যে মনোভাব; রুশসাহিত্যে তা নতুন না হ'লেও বলিষ্ঠভাবে এর প্রকাশ বোধকরি এই প্রথম। অতীতের ভাবধারা বর্তমানে উপলব্ধি ও প্রত্যয়ের সাথে প্রকাশ ক'রে তাকে ভবিষ্যতের দিকে তিনি এগিয়ে দিয়েছেন এইখানেই তাঁর সবচেয়ে-বড় কৃতিত্ব। ব্যথিত, উপেক্ষিত, কিছু-না-পাওয়া জনগণের কবি নেক্‌রাসভ্‌ ছিলেন, 'এ ষ্ট্রং সল্‌ট্রী ব্রীজ ফ্রম্‌ এ হিভিং সী'।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

স্থায়ী আর্ট গ্যালারী

মন্দিরের ভিত্তিচিত্র আর বিভিন্ন ভঙ্গিমার দেব মূর্ত্তি, পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের সংগে শিল্পের এইছিল যোগসূত্র। চিত্র সাধারণ মানুষের হাতের সীমানার মধ্যে কোনদিনই ছিল না। সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প কিংবা শিল্পী উভয়ই 'বিশেষ গুণান্বিত' এই আখ্যায় সাধারণ মানুষের থেকে অনেকদূরে ছিল। বিশেষ মানুষরাই শুধু তাঁদের চিন্তা প্রসূত ভাবধারাকে চিত্রে কিংবা ভাস্কর্যে রূপায়িত করে দেবতার কিংবা রাজন্যবর্গের আনন্দ উৎপাদন করতেন। সেখানে ভাবধারাকে রঙ কিংবা পাথরে রূপদান করতে অনুশাসনের বাঁধনে শিল্পীদের উৎসর্গ করা হতো। বিশেষ শ্রেণীর মানুষরাই শিল্পকলার পোষণকারী ছিলেন। লোকায়ত শিল্পকলা ব্যতীত ক্লাসিক শিল্প সাধারণের সম্ভ্রম এবং দূরত্ব বর্দ্ধনই করত। সাধারণ মানুষের জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শিল্পের প্রয়োগ এবং তার পদ্ধতি উভয়ই অকল্পনীয় ছিল। সেখানে রাজন্যবর্গের ভক্তির এবং পুরোহিত সমাজের অনুমোদন অনুকূলে দেবতার গুণকীর্ত্তন সমন্বিত শিল্প কলার পুনঃ পুনঃ প্রচারই প্রধান এবং শাস্ত্র নির্দেশিত সৌন্দর্য্য রীতির প্রকাশই পুণ্যের কাজ বলেই পরিগণিত হতো।

পূর্ববর্তী আদিম সমাজে সব মানুষের জীবনেই শিল্পের একটি প্রয়োজনীয় প্রকৃতিগত ভূমিকা ছিল। জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ মানুষকে আদিম বন্যসমাজে আনন্দ ও প্রয়োজন দুয়েরই সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করত। কিন্তু সামাজিক বিবর্ত্তনে অর্থ সঞ্চয়ের যুগে মানুষ নিজের মধ্যেই স্তর ভেদে, একে অন্যকে শক্তির ক্ষমতায় বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ করে নানা মতবাদের অবতারণা করল। ক্লাসিকপূর্ব যুগে বাহুবলে মানুষ নিজেকে আপন দলের দুর্বল মানুষদের থেকে আলাদা করে নিল। শক্তির ক্ষমতায় বিশেষস্তরের দলপতির আসন নিয়ে অবশিষ্টদের আপন চিন্তার বাহকে পর্য্যবসিত করল। ক্লাসিক যুগে এই বিশেষস্তরভুক্ত মানুষরাই যাঁরা সমাজের সর্বপ্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁরাই শিল্প কলার পৃষ্ঠপোষক ক্রেতা এবং রসিক বলেই পরিগণিত হতেন। সেখানে এঁদের অভিমত এবং পোষকতাই প্রধান ও প্রয়োজনীয় ছিল। সাধারণের শিল্পবোধ ক্লাসিক শিল্পের প্রতি চন্দন ফুল আর সিন্দুর লেপনের মধ্যেই প্রকাশ পেত। শতাব্দী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা মসৃণ সৌন্দর্য্যতত্ত্বের নিছক আবেদন সাধারণে বিস্ময় বিমুগ্ধতায় অবলোকন করত। নন্দনতত্ত্বের আস্বাদন সেখানে সুদূর পরাহত।

ক্লাসিকযুগে স্থায়ী চিত্রাগারের অস্তিত্ব ছিল অগণিত মন্দিরের গর্ভগৃহে, গুহাচিত্র শৈলীতে আর মন্দির এবং স্তূপের পরিকল্পনা অসংখ্য মূর্ত্তির অবতারণায় স্থায়ী ভাস্কর্য্য সংগ্রহশালার রূপ নিয়েছিল। মন্দির কিংবা স্তূপের অলংকরণ হিসাবে চিত্র এবং ভাস্কর্য্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতো। রাজন্যবর্গ, মন্দিরের পুরোহিত সম্প্রদায়, বিহারের অধ্যক্ষ ও উপাসনাকারী ভিক্ষুরাই শিল্পের রস আস্বাদন করতেন। সেখানে ভক্তি ও উপাসনার অঙ্গ হিসাবেই চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রয়োজন ছিল। মানুষের জীবনে নিছক আনন্দ আবেদনে নন্দনতত্ত্বের, সৌন্দর্য্যের অবতারণা এবং শুধুমাত্র চিত্র, নন্দনতত্ত্বের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো না। তবুও

বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা মানুষকে বিশেষ এক রস সম্ভোগের মাধ্যমে সৌন্দর্য্যে সৃষ্টির রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। লাবণ্য, সংযোগ পদ্ধতি, মূর্ত্তির বিভিন্ন তাল-সমীকরণ; রসস্থ দিকগুলি অপূর্ব শিল্প মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা ও অনুশাসন এই দুই এর প্রয়োগে ক্লাসিক যুগ বিশেষ শিল্প নিদর্শনের উন্নত উদাহরণ। পরবর্ত্তী কাল অবনতি লক্ষণাক্রান্ত। এই যুগে শিল্পী ও জনসমাজ উভয়ই সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে শাস্ত্র নির্দ্দেশিত কলাশিল্প সম্পর্কে শুচিগ্রস্থ ছিল। তাই ক্লাসিক যুগে মানুষের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এত মসৃণ এবং অভিজ্ঞতা দীপ্ত। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের বাদদিলে অগণিত মানুষের রস-সম্ভোগ, চিত্র এবং ভাস্কর্য্য বিষয়ে ভক্তি এবং পুণ্য অর্জনের মাধ্যমেই অনুভূত হতো।

আধুনিককাল ছাড়া মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ কোন যুগেই হয় নি। লোকায়ত শিল্পের কথা বাদদিলে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। ক্লাসিক পরবর্ত্তী যুগে মধ্যযুগীয় শিল্পকলা এবং পরবর্ত্তী কালে মুঘল যুগের চিত্রশৈলী উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগীয় চিন্তায় অবনতির লক্ষণ পরিস্ফুট এবং ভাস্কর্য্যে অহেতুক দৈব অনুশাসনের নিপীড়ন দেখা যায়। সমগ্র জনসমাজের প্রতি উদাসীন থেকে কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর আনন্দবিধানে শিল্পকলা গণ্ডীবদ্ধ থাকলে কালক্রমে তা নিঃশেষপ্রাণ হতে বাধ্য। জীবনের অভিব্যক্তিই 'শিল্প'—শুধুমাত্র ধর্ম্মীয় চিন্তার প্রকাশই শিল্প নয়। জীবনের অন্যসব ছেঁটে ফেলে কেবলমাত্র অনুশাসনের মাধ্যমে শিল্প প্রচেষ্টা মৃত এবং অবনতি লক্ষণাক্রান্ত হতে বাধ্য।

ক্লাসিকযুগে কিংবা মধ্যযুগে চিত্র কিংবা ভাস্কর্য্যের সংযোগসূত্র মন্দির অথবা বিহার। সেখানে সাধারণের জীবনে শিল্পের অবতারণা এদের মাধ্যমেই প্রকাশ পেত। কিন্তু মুঘলযুগে চিত্রকলা কেবলমাত্র সম্রাট ও সম্রাট অনুগৃহীত ব্যক্তিদের জন্যই সম্পাদিত হয়েছে। সম্রাটদ্বারা পালিত একটি চিত্রাগারও থাকতো, কিন্তু সে চিত্রাগার কেবলমাত্র বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য। মুঘল সম্রাট আকবর তাঁর চিত্রগারে অগণিত পারস্য শিল্পশৈলীর নিদর্শন সংযোজিত করেছিলেন, তাঁর অনুগৃহীত শিল্পীদের পারস্য-শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত করবার জন্য। কিন্তু সম্রাটের অনুগ্রহ ব্যতীত সেই চিত্রগার অগণিত মানুষের কাছে কোনদিনই আত্মপ্রকাশ করেনি। লোকশিল্পের সার্থক ও বিচিত্র অলংকরণ এবং ভক্তিমূলক ভাবধারায় সংমিশ্রণে 'রাজস্থানী' চিত্র উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেশীয় রাজা ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তিরাই সেই চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করতেন। দিল্লীতে সেই সময় 'বাজার পেনটিং' চালু হয়েছিল জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে। কিন্তু সে সব ছবি রুচি এবং সৌন্দর্য্যে রাজকীয় মুঘলশিল্প এবং রাজপুত চিত্র অপেক্ষা হীন স্তরের ছিল। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মীয় অনুশাসনের তাড়নায় চিত্র সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন।

এর পরবর্ত্তী কাল অন্ধকারাচ্ছন্ন। চিত্রশিল্প সম্পূর্ণভাবে মৃতপ্রায় হয়ে গেল। শুধু বাংলাদেশের ভাস্কর্য্যরীতি লোকায়ত তন্ত্রের সংমিশ্রণে তিব্বতে এক বিচিত্র শিল্পকলার উদ্ভব করে। ক্লাসিক শিল্প রাজানুগ্রহ বঞ্চিত হয়ে সেই সময়ে লোক শিল্পের প্রয়োগ ভঙ্গিমায় সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। আদিমযুগের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে যে লোকশিল্পের অবদান জনজীবনকে সৌন্দর্য্য আস্বাদন করাতো তাও রাষ্ট্রনৈতিক ও বর্ত্তমানের যন্ত্র সভ্যতায় বিলুপ্তপ্রায়।

ইংরেজ আমলে আমরা আমাদের চিত্ররসের সমস্ত কিছু ভুললাম। সাধারণে কালীঘাটের পট ইত্যাদির মাধ্যমে ছবির জগতকে জানত—কিন্তু সে শুধু গল্প বলা ও আসর জমানো ছাড়া কিছু নয়। শক্তিশালী ক্লাসিক শিল্পকে ভুলে নিকৃষ্টতর আবেদনের দিকে আমাদের দৃষ্টি গেল।

ইংরেজ আমলে সমাজের চূড়ামণিরাই শিল্প-সংবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না।

তাঁদের কাছে বিকৃত রুচি-বিদেশী চিত্র অধিক সমাদরে স্থান পেত।

ইংরেজ রাজত্বের শেষ আমলের দিকে ওরিয়েন্টাল্ আর্ট সোসাইটী অবনীন্দ্রনাথের দলপতিত্বে ভারতশিল্প পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করে। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় আর্ট সোসাইটী স্থায়ী চিত্রাগার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং চিত্রশিল্প যাতে সাধারণে সমাদর করে তার জন্যে-যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। এবং আজকের এই চিত্রচর্চার যে আন্দোলন তার পেছনে আর্ট সোসাইটীর অবদানই প্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে দলগত স্বার্থ ও শিথিল চিন্তায় আজ ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটী সেই কর্ত্তব্য থেকে চ্যুত। এদিকে বাংলা-দেশের আকাদেমী দেশজ শিল্পের ধারক এই ফতোয়াজারি করে বাংলাদেশের শিল্প উদ্ধারের কাজে অভিনিবেশ করেছেন, কিন্তু আর্থিক আনুকূল্য থাকা সত্ত্বেও আকাদমী আধুনিক কাল উপযোগী কোন স্থায়ী চিত্রাগার নির্মাণে একান্ত অপরাগ। বিভিন্ন শিল্প সংস্থাও এই বিষয়ে কোন উৎসাহ প্রদর্শন করেন না। তাঁরা মরশুমী প্রদর্শনীর মাধ্যমেই শিল্প-রস জন সাধারণকে বিতরণ করবেন এই মনস্থ করেছেন। শিল্প সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন বাংলা সংবাদপত্রের সমা-লোচকরাও শিল্প সম্বন্ধীয় যে অশিক্ষা প্রসূত হামবড়ী আলোচনা করেন তাতে করে জন সমাজ শিল্প আন্দোলনকে অনুধাবন করা দূরে থাকুক তার থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখাই শ্রেয় মনে করেন। এইরূপ অবস্থায় কোন স্থায়ী চিত্রাগারের প্রতিষ্ঠা মানুষের সৌন্দর্য্যপ্রীতি এবং চিত্র সম্বন্ধীয় চর্চা বাড়িয়ে তুলবে। অপর ব্যক্তির চশমা দিয়ে ছবি না দেখে সর্বদা ছবির সঙ্গে ঘর করে মানুষের মন ও চোখ দুই অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

পৃথিবীর অপরাপর দেশে স্থায়ী চিত্রাগার (আর্ট গ্যালারী) জন সমাদর লাভ করেছে। অবশ্য স্থায়ী চিত্রাগারে অনেক সময়ে শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মন ভরে ওঠে। সেখানে মানুষ দিনের পর দিন চিত্রের প্রাণবস্তুকে উপলব্ধি করতে শেখে। এছাড়া অনেক স্থায়ী চিত্রাগারে ছবি কেনা-বেচারও আয়োজন আছে। ছবি কেনার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন ছবির রস আস্বাদনে মন পাকা হয়ে ওঠে।

কিন্তু চিত্রের রস আস্বাদন করবার যে শিক্ষা সেই শিক্ষা থেকে জনসমাজ যদি বিশ্ব-বিদ্যালয়, সরকার এবং পত্রপত্রিকা দ্বারা বঞ্চিত হয় তখন কোন স্থায়ী বেসরকারী চিত্রাগার অবশ্যই আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন সর্বদাই ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মানুষের জীবনে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা যে আছে, তা সম্যক উপলব্ধি করেন না। শিক্ষায় শিল্পের স্থান অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিশ্ব-বিদ্যালয় কোন উদ্যোগ করেন নি, জীবনের সঙ্গে শিল্পের সংযোগ প্রধান এবং প্রথম ব্যাপার। মানুষের জীবনে শিল্পের স্থান ন্যূন হলে—জীবনের প্রকাশও পরিসর অনেকাংশে বিনিষ্ট হয়। এই বিনিষ্টকরণ থেকে মানুষকে বাঁচতে হলে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় প্রকাশ-মাধ্যমকে শিক্ষায়, রুচিতে যুক্ত করতে হবে। ক্লাসিকযুগে মানুষ শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে যে ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতো, আজকের সমাজ ব্যবস্থায় তা অচল। রাজতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বদল হলো। মন্দির নির্মাণে অলংকরণ কিংবা রাজসভাগৃহকে চিত্র সংযুক্ত করবার যুগ পার হয়ে আমরা যন্ত্রের যুগে, যেখানে সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত সেই অব-স্থায় উপনীত হয়েছি। বিগত যুগের অর্থনৈতিক পরিবেশে যে পৃষ্ঠপোষকতা মুষ্টিমেয় ব্যক্তি

বর্গের অধীনে ছিল তা বিবর্ত্তনশীল নতুন অর্থ বন্টনের যুগে জনসমাজের বৃহত্তর গন্ডির মধ্যে এসে পেঁাছেছে। বিশেষ কোন দৃষ্টি কোণে দেখা চিত্র সৃষ্টির সময় থেকে-জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ সম্ভূত, অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত জগতে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। সেই আধুনিককালে মানুষ নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানে, নতুন লব্ধ জ্ঞানের সমীকরণে এত বিব্রত হয়ে পড়ছে যে তার ক্লান্ত মনের কাছে ছবির জগত আজকে নতুন অর্থ এনে দেবে। চিত্রের রস নতুনভাবে নতুন দৃষ্টিকোণে গৃহীত হবে। এই রস গ্রহণের পথে স্থায়ী চিত্রগারের (আর্ট গ্যালারী) প্রয়োজনীয়তা উপযোগী ও কল্যাণকর।

কলকাতায় কোন স্থায়ী চিত্রাগারের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই অবস্থায় গত মাসে একত্রিশ নম্বর পার্ক ম্যানসনে 'প্রিন্টস্ আর্ট গ্যালারী' নামে এক স্থায়ী চিত্রগারের উদ্বোধন অনেক আশার উদ্রেক করেছে। বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবেও এর কার্য্যপদ্ধতি চলবে। এই রকম একটা স্থায়ী চিত্রগার মানুষকে সর্বদা ছবির সঙ্গে পরিচিত করে রসিক করে তুলবে। সর্বাপেক্ষা—বড় ব্যাপার এই যে এই—চিত্রাগারের উদ্বোধন ভবিষ্যতে আরও স্থায়ী চিত্রাগার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা আনবে। বাংলাদেশে বিগত বহু বৎসরের মধ্যে এই প্রথম একটি স্থায়ী চিত্রাগার রসিক সমাজের সমাদর লাভ করবে।

নির্মলা রক্ষিত

স মা লো চ না

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস॥ অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। পরিবেশক—ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মানবতাবাদ।। বসুধা চক্রবর্তী। দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯,

ইতিহাস কতিপয় রাজার রাজ্যশাসন, দেশজয়ের গৌরব কাহিনী, অনুচরবৃন্দের ষড়যন্ত্র, সুনির্দিষ্ট তারিখ চিহ্নিত ঘটনাপুঞ্জের হিসাব নিকাশ, যুদ্ধ বিপ্লবের যথাযথ বিবরণ মাত্র নয়, লক্ষ-লক্ষ অজ্ঞাত সাধারণ সজীব মানুষ যারা ইতিহাসের পাতার অন্তরালে চিরকাল আত্মগোপন করে রয়েছে তাদের জীবন কলধ্বনি ইতিহাসের গতিকে বেগমান, বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতে মন্দ্রিত করে রেখেছে। ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তথ্যের কার্যকারণ অনুবিশ্লেষণ করে সত্যকে উদ্ঘাটন ও অতীতের বিস্মৃত প্রায় ঘটনাবলীকে যথাযথ ও সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলা। ইতিহাসের লক্ষ্য তথ্যের উপর, উপন্যাসের লক্ষ্য শুধু তথ্য নয়, কল্পনার দূরগামী প্রসারতা, বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি, মানবহৃদয়ের ভাবাবেগ, রোমান্স, অথবা ট্র্যাজেডী নানারসে পরিপূর্ণ করে তথ্য অথবা বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করে তোলা। ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিল্পী তথ্য অথবা মূল চরিত্রকে অক্ষুন্ন রেখে কোন ভাবে বিকৃত না করে, অপ্রয়োজনীয় অংশকে পরিবর্জন অথবা পরিবর্তন করে মূল বিষয়বস্তু রসগ্রাহী ও সাহিত্যের সামগ্রী করে তুলছে।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়দ্বয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুমারবাবু তাঁহার "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন—"ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংগঠনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনা বৈচিত্র্য ও বর্ণ সম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে; অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, এবং সর্বোপরি, উভয়ের মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।"

শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন, "সহজ কথায় বলতে গেলে ইতিহাস পুরাপুরি তথ্যসর্বস্ব এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস অংশত তথ্যনির্ভর ও অংশত কল্পনানিষ্ঠ। ইতিহাসে কল্পনার স্থান নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে আছে। কাহিনীর পরিকল্পনায় তথ্য-সম্ভারের উন্নত কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নেবার অধিকার আছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকের। ঐতিহাসিক উপন্যাসের চমৎকারিত্ব অনেকটা নির্ভর করে এই কল্পনা ভেজালের উপর। অনৈতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করবার পক্ষে কোন বাধা নেই, কিন্তু তার কল্পনা ইতিহাসকে অনুসরণ করতে বাধ্য নয়। গল্পরসের স্বাদের উপরই উপন্যাসে ঐতিহাসিকত্ব অনৈতিহাসিকত্ব নির্ভর করে। গল্পরস সুনির্দিষ্ট দেশকালের আধারে (আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় স্পেস্-টাইম

কনটেকস্‌ট-এ) পরিবেশিত হলেই উপন্যাসকে বলব ঐতিহাসিক, তা-না হলে নয়।" (ইতিহাস— প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮)

আমাদের আলোচ্য পুস্তকের লেখক বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্য আলোচনা করে স্বকৃত সংজ্ঞায় উপনীত হয়েছেন। এই আলোচনায় লেখক গভীর নিষ্ঠার ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক নিছক পল্লবগ্রাহী নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেখক নিপুণতার সংগে স্কট ও বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে স্কটের সুবিধে (য়ুরোপে প্রকৃত ইতিহাসের অভাব নেই) ও বঙ্কিমচন্দ্রের অসুবিধে (("বাঙ্গলার ইতিহাস নাই")। এই আলোচনা যুক্তিপূর্ণ। যদিও এই আলোচনার পূর্বসূরী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ("বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা" দ্রষ্টব্য)।

বঙ্কিমের রাজসিংহ একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন—"রাজসিংহ লিখিতে তিনি যতটুকু প্রকৃত ইতিহাস পাইয়াছিলেন অন্য কোন উপন্যাস রচনা কালে তাহার সামান্য অংশ ও নিঃসন্দেহে পান নাই"—লেখকের এই মন্তব্যটি সর্বৈব সত্য।

ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের ধারণার ক্রম পরিণতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ" উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের প্রভাব—প্রসংগটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

সাধারণ উপন্যাসের আঙ্গিকের (কাহিনী নির্বাচন ও চরিত্র সৃষ্টি) সংগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আঙ্গিকের মূলগত পার্থক্য নিরূপণে লেখকের চেষ্টা প্রশংসার্হ।

সাহিত্য সৃষ্টিক্ষেত্রে কোন বিরাট প্রতিভার আবির্ভাবের পূর্বে অনেক ক্ষুদ্র প্রতিভা নীরবে সেই বিরাটের আবির্ভাব ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে যান। বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্বে যাঁরা নীরবে সাধনা করে তাঁর আবির্ভাব ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে গেছেন এই পুস্তকে সেই লোকচক্ষুর বহির্ভুত নীরব সাধকদের পরিচয় দিয়ে লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

লেখক প্রভূত পরিশ্রম করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মন্তব্য অবলম্বনে বঙ্কিমের উপন্যাস চতুষ্টয়ের (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর,) যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিকা পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে চারটি উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবনাপূর্ণ মানবজীবনকে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক বা ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্ব কী ভাবে ট্র্যাজেডীর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে পাঠকচিত্তে সমবেদনা সৃষ্টি করেছেন, সে দিকেও ইঙ্গিত দিতে ভোলেননি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল ইতিহাসের অভাব এবং বঙ্কিমচন্দ্র কীভাবে ইতিহাস, কল্পনা ও কিম্বদন্তীর সমন্বয়ে এই নিষ্কাম ধর্ম প্রচারক আনন্দমঠ, দেবী ও সীতারাম তিনটি উপন্যাস রচনা করেছেন তার সংগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মনে নবজাগ্রত দেশাত্ম ও স্বাজাত্যবোধের কতটুকু সংযোগ ঘটেছে লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা বিশ্লেষণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসে ইতিহাসের সত্যের সংগে চিত্তচমৎকারী ঘটনা সংস্থান, ঘটনার তীব্রগতি ও বাস্তবানুগ চরিত্র কী ভাবে দক্ষ শিল্পীর মত একসূত্রে নিপুণভাবে বেঁধে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন—লেখক সুন্দর যুক্তি দিয়ে তাহা প্রতিপাদন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি অবহেলিত রত্ন, উপেক্ষিত প্রতিভা যাঁর দানের যথাযোগ্য মূল্যায়ন আজ ও সম্যগভাবে হয়নি। বঙ্কিম প্রতিভার প্রচণ্ড দীপ্তিতে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী পাঠকের মনের দ্বারদেশে এই ঐতিহাসিক দৃষ্টি সম্পন্নব্যক্তি পরিচ্ছন্ন সংহত গদ্যলেখক কতকাল প্রতীক্ষা করবে তা কে জানে? রমেশচন্দ্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যুক্তিগ্রাহ্য

বিস্তৃত আলোচনা করে বর্তমান গ্রন্থের লেখক রমেশচন্দ্রের নিকটে আমাদের ঋণের ভার কিছুটা লাঘব করেছেন। একথা এখানে স্বীকার্য, রমেশচন্দ্রের মাধবীকঙ্কনে ইতিহাস এবং গল্পের যেমন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয় হয়েছে অন্যকোন উপন্যাসে তা হয়নি। মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবনসন্ধ্যা হিন্দু বীরত্ব ও হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে রচিত, ফলে লেখকের উদ্দেশ্য হয়তো সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু কোন চরিত্রই দোষে গুণে রক্তমাংসের গড়া মানুষ চরিত্র হয়নি, এখানেই তাঁর প্রতিভার দুর্বলতা, কিন্তু, যুদ্ধ বর্ণনা প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা, মানবহৃদয়ের নিগূঢ় ভাবাবেগ বর্ণনা, তাঁর ভাষার মাধুর্য অবশ্য প্রশংসার্হ, তাছাড়া তাঁর ইতিহাস চেতনা বঙ্কিমের থেকে স্পষ্টতর ছিল একথা সর্বজন গ্রাহ্য। রমেশচন্দ্রের সাহিত্য কৃতির দোষত্রুটির বিশদ আলোচনা করে এক বিস্মৃত প্রতিভাকে লোকচক্ষুর গোচরে এনেছেন বলে বর্তমান লেখক বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

"রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। রাখাল দাসের অপর পরিচয় তিনি একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ছিলেন।" শশাঙ্ক, ময়ূখ, করুণা প্রভৃতির স্রষ্টা সম্পর্কে বাঙ্গালী পাঠক আজ অবহিত নয়। লেখক মহেঞ্জোদারোর আবিষ্কর্তাকে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন করে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উপরি উক্ত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ছাড়া লেখক অন্যান্য বহু ঔপন্যাসিকের উল্লেখ করেছেন ক্ষুদ্র পরিসরে তার সুবিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সুদীর্ঘ আলোচনায় লেখকের মননশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা ভূয়সী প্রশংসার দাবী করতে পারে।

হিংসায় উন্মত্ত যুদ্ধ পীড়িত জগতে সভ্যতার প্রাণবায়ু প্রায় নিঃশেষিত। রাষ্ট্র শক্তি ও যন্ত্ররাজের বিপুল আয়তন, ক্রমশঃ মানুষকে গ্রাস করে তাকে প্রায় দাসে পরিগণিত করেছে। অতীতে একদিন মানুষ প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে আপনার একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা, নিয়ামক বলে সগৌরবে ঘোষণা করেছিল। ইতিহাসের দীর্ঘপথে বহু ঘাতপ্রতিঘাত, পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর সে পুনরায় সেই সত্যকে আবিষ্কার ও আপনার সত্তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কোরল।

মানুষ বিশ্বের কেন্দ্রমণি। সে কারুর অধীন নয়। মানবতা তার অন্তরের ঐশ্বর্য, সে আজ জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্যাসে পূর্ণ মানবতার ভিতরে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যগ্র। বিশ্বকেন্দ্রিক মানুষের জীবনদর্শন, তার জয়গান করা মানবতাবাদের একমাত্র ধর্ম। ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা, ধর্মীয় নীতিপ্রথা, সংস্কার ঐতিহ্যকে যুক্তি ও শাণিত মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা মানবতাবাদের একমাত্র পথ। প্রাচীন গ্রীস চিন্তাধারায়, প্রাচ্যভাবধারায় মানবতাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ধর্মীয় অনুশাসন ও তথাকথিত পাণ্ডিত্যের নাগপাশে মানবতার বাণী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিদ্রোহের জয়ধ্বজা আচ্ছন্ন হয়েছিল। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে রেনেসাস আন্দোলনে মানবতাবাদের পুনরভ্যুদয় হলো। একথা সত্য মানুষের মনে মানবতাবাদী চিন্তাধারা নিছক বস্তুবাদ অথবা প্রাকৃতিকত্ববাদের থেকে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফরাসী বিপ্লবে মানবীয় শক্তির শুভ উদ্বোধন সূচীত এবং এই আত্মোদ্বোধনে মানবতাবাদের জয়যাত্রা নির্নীত হলো। ঈশ্বর মানুষের আপনার প্রতিমূর্তি, অধ্যাত্ম চেতনার প্রতীক মাত্র, মানবতাবাদ অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে অস্বীকার করছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে তার একমাত্র আশ্রয় ও আনন্দ। মানবতাবাদীদের আন্তরিক কামনা যে প্রতিটি মানুষ জীবন বিকাশের সুযোগ সুবিধা থেকে যেন রাষ্ট্র অথবা কোন শক্তির স্বার্থে ব্যাহত না হয়। সার্বিক, সর্বতোমুখী গণতন্ত্র, আন্তর্জাতীয়, জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক সবক্ষেত্রে পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপনা মানবতাবাদের কাম্য।

ব্যক্তিসত্তার অবাধ স্ফুরণের উপর মানববাদীরা রাষ্ট্রকে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ মানুষের পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের নির্দেশ দেয়। লেখক মানবতাবাদের আদিযুগ যথা প্রাচীন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারায় সূচনা, ক্রমবিকাশ, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার প্রভাব, সুচিন্তিত সুনিপুণ বিশ্লেষণে সাবলীল ভঙ্গীতে লিপিবন্ধ করেছেন। পরিশেষে লেখক দেখিয়েছেন শ্রেণী বৈষম্যভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজে পূর্ণমানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা মরীচিকা,, অপরদিকে আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলোপ দলও রাষ্ট্রের রথতলে মানবিক মূল্যবোধ পিষ্ট। ইতিহাসে একদিন কম্যুনিজমের আদর্শ লক্ষলক্ষ লোককে শ্রেণীশোষণ থেকে মুক্ত করে শ্রেণীহীন ভাবী নতুন সমাজ গঠনের আশা নিয়ে এসেছিল লেখকের মতে তাহা ব্যর্থ হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে ষ্ট্যালিন শাসিত সোভিয়েত রাশিয়ার বিগত ২৫ বছরের বেদনাময় ইতিহাস থেকে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো অমূর্ত মানবতার রূপায়ন হচ্ছে কম্যুনিজম ভাবধারার সার্থক বিকাশের উপর। রাষ্ট্র ও ব্যক্তিজীবন বিপক্ষ শক্তি হিসেবে গণ্য হবেনা, রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনকে পূর্ণায়ব প্রদান করবে, রাষ্ট্রের ভিতর ব্যক্তি মুক্তির নিশানা প্রতীক খুঁজে পাবে। মানবতাবাদ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অমূর্ত ভাবধারায় সীমাবন্ধ। ইতিহাসের রক্তরাঙ্গা পথে, মানবতাবাদের সৌধ গড়ে তোলা ও তার আলোতে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনকে পরিচালিত করা সম্ভব কিনা আজ পর্যন্ত তার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। সভ্যতার গতিপথে আজ মানবতাবাদীর নিঃসঙ্গ যাত্রা।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

শরৎচন্দ্র ও তারপর।। কাজী আব্দুল ওদুদ। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাব্লিশিং। কলিকাতা দাম চার টাকা।

১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎস্মৃতি' উপলক্ষে লেখক যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন আলোচ্য পুস্তকটি তাহারই সংকলন। লেখক শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, তাঁহার জীবনদর্শন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অবদান ও বর্তমান সাহিত্য কিভাবে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে—তাহাই এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে।

খুব বিশদভাবে বা গভীরভাবে করিবার সুযোগ যে লেখক পাইয়াছেন, তাহা নহে। মুখবন্ধে লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মাত্র চারিটি বক্তৃতার মধ্যেই তাঁহার সমগ্র বিষয়বস্তুটিকে উপস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। এ হেন ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট শরৎচন্দ্র বা তাঁহার উত্তরসাধকদের সম্বন্ধে কোন বিরাট তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা যদি আশা করি তো লেখকের প্রতি স্পষ্টতঃই অবিচার করা হইবে। মোহিতলাল মজুমদারের মত বিশদ আলোচনার অবকাশ তাঁহার ছিল না, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত তীক্ষ্ন রসানুভূতি প্রকাশের পরিসরও ছিল তাঁহার অত্যন্ত অল্প। তাই তাঁহার পুস্তককে শরৎসাহিত্যের ভাষ্য হিসাবে লইলে ভুল করা হইবে। তবু স্বল্প পরিসরের মধ্যে সুন্দর স্বচ্ছ ভাষায় তিনি আমাদের যাহা দিয়াছেন তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদের যোগ্য।

বিশেষ করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহার মধ্যেই একটা নূতনত্ব আছে। শরৎ সাহিত্যের গহনলোকের মধ্যে পথ না হারাইয়া তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার কথা তিনি

আলোচনা করিয়াছেন। শিল্পীমনের উপর জীবন ও পরিবেশের কি প্রভাব পাড়িয়াছিল, বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা—যে সম্বন্ধে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যে দুইখানি উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'——কৌতূহলের বিষয়, সে দুইটি রচনা শরৎচন্দ্রকে বিপরীতভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এবং তাঁহার এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আমরা তাঁহার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিব। 'চোখের বালি' যেমন তাঁহাকে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণী চরিত্র' তেমনই তাহাকে বঙ্কিম বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণী চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। যে পাপের পথে গেল। তারপর পিস্তলের গুলীতে মারা গেল। পাপের পরিণামের বাকি কিছুই আর রইল না। ভালই হল। ......কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?" এই কয়টা কথায় শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার শিল্পজীবনের যে মূলসূত্র, তাঁহার কাব্যের যে মূল সুর তাহা এখানে ধরা পাড়িয়াছে। এবং লেখকও তাঁহার স্বচ্ছদৃষ্টিতে এটিকে দেখিয়াছেন ও পাঠককে প্রাঞ্জল ভাষায় দেখাইয়াছেন। নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে এক গভীর চেতনা যথার্থ প্রেম যে অকুন্ঠিত আত্মবলিদানের মধ্য দিয়া চিত্তকে মহীয়ান করিয়া তোলে, নরনারীকে জীবনমুক্তির অধিকারী করে এই নিগূঢ় সত্যটি শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে নানানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই গেল এক দিক। শরৎ-সাহিত্যের আর এক দিক আছে। মানবিক প্রেমের একনিষ্ঠ পূজারী হলেও তিনি সামাজিক রীতিনীতি বা সনাতন সংস্কারকে পুরোপুরি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এবং এইখানেই আমাদের মনে হয় তাঁহার উপর বঙ্কিমের প্রভাব হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই কাজ করিয়াছে। যে সুনীতি, সদাচার, পবিত্র দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র তাহাকে কোথাও অবনমিত বা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। এই দ্বন্দ্ব বা দ্বিমুখীতা তাঁহার রচনার মধ্যে। চরিত্র রূপায়নের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পল্লী সমাজে রমা ও রমেশের গভীর প্রেম দেখাইয়াও যুগ্ম মিলনের ভিতরে তাহাদের জীবনকে সার্থকতায় পুষ্পিত করিতে পারেন নাই। গৃহদাহে অচলা, সুরেশ ও মহিমের মধ্যে কত বিপরীতমুখী আবেগের সংঘাত, কত বিচিত্র ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত। তবু প্রেমের প্রবল আকর্ষণ সেখানে দাম্পত্য নীতিকে জয় করিতে পারে নাই, শুধু তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া জীবনকে ট্র্যাজেডীতে পরিণত করিয়াছে। আর 'চরিত্রহীনে' কিরণময়ীর দৈহিক শুচিতা রক্ষার উৎকণ্ঠা প্রায় শুচিবায়ুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। লেখকও এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন, দেহটাকে বাঁচাবার জন্য শরৎচন্দ্রের যে উৎকন্ঠা অনেকেই তা অদ্ভুত ভেবেছেন। আমরাও তার বেশী আর কিছু ভাবতে উৎসাহবোধ করছি না। আর এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন, "শরৎচন্দ্র নতুন করে এই কথাই বলতে চেয়েছেন—নারীর সতীত্বকে যদি আমরা মূল্য দিতে চাই তবে বিবাহের অবেচ্ছদ্যতার কথা আমাদের বিশেষভাবে ভাবতে হবে। শরৎচন্দ্রের এই চিন্তায় শ্রদ্ধেয় অনেক কিছু আছে, সেই সঙ্গে এতে দুর্বলতার পরিমাণও কম নয়।......শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।" ক্ষুদ্র পটভূমিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা বাস্তবিকই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। শরৎ-পরবর্তী কালের লেখকদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার সময় তিনি পান নি। কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক বিবরণী দিয়াছেন।

সুনীতি রায়

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

No. C3597 Phone : 23-5155 Dec. '61 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

মীটারে
পরিবর্ত্তন
করুন
গত ১লা অক্টোবর থেকে দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হিসেবে মীটার ব্যবহার আরম্ভ করা হয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে গজ, ফুট ও ইঞ্চির আইনসঙ্গত ব্যবহার রহিত হয়ে যাবে।
বস্ত্রাদিতে ইতিমধ্যেই মীটারের মাপ সুরু করা হয়েছে এবং দামও মীটার অনুযায়ী বলা হয়।
এক মীটার, এক গজের চাইতে
৩⅜" বেশী লম্বা
10
20
40
মেট্রিক
মাপে
কিনুন
ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত

স্বল্প
ব্যয়ে
দ্রুত
বিলি

ভারতের গৃহিনীরা চিনতেন গাছগাছড়া

যাহা চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে

এমন কি এই সেদিনও ভারতের মহিলারা গাছগাছড়া দিয়ে তাঁদের ভেষজ কেশতৈল ঘরে তৈরী করতেন—তার মধ্যে কতকগুলি পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয় ছিল যাতে চুল পরিমাণে বেশী জন্মাতে এবং দেখতেও খুব চক্‌চকে হতে সাহায্য করত।

এখন এইরূপ ভেষজ কেশতৈল তৈরীর পদ্ধতি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

অবশ্য কেয়ো-কার্পিনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত এমন একটি ভেষজ তৈল পাওয়া যায় যাতে ঘন ও সুন্দর চুল জন্মাবার ও মাথা ঠাণ্ডা রাখবার সব উপাদানই আছে।

মনোরম গন্ধযুক্ত **কেয়ো-কার্পিন**

সুষ্ঠুতর কেশচর্য্যার জন্য

জনপ্রিয় ভেষজ কেশতৈল

ডেজ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বম্বে • দিল্লী • মাদ্রাজ

পাটনা • গৌহাটি • কটক

নবম বর্ষ। নবম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড. কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY GLUCOSE BISCUITS
KOLAY Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

নবম বর্ষ। নবম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' আটষট্টি
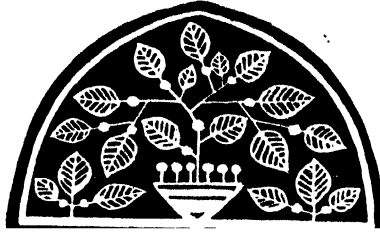
অলঙ্কার শাস্ত্রে হাস্যরস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

সৌন্দর্য্যের যথাযথ স্বরূপ নিরূপণ করা যেমন অসম্ভব, হাস্যবিদ্রূপেরও তেমন যথার্থ লক্ষণ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। জর্জ বানার্ড শ এজন্য বলিয়াছেন ১ "There is no more dangerous literary symptom than a temptation to write about wit and humour. It indicates the total loss of both".

হাস্য তাহার বাহ্য প্রকাশের মধ্য দিয়াই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র হাস্যকারী জীব। হাস্যের মূলীভূত মানসিক বৃত্তি সমূহও একমাত্র মানুষের মধ্যেই পরিপূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। যদিও হাস্যের বাহ্য প্রকাশ আনন্দের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষী, ও ইতর প্রাণীকুলের মধ্যেও আনন্দের প্রকাশ দেখা যায় তাহা হইলেও হাস্য সৃষ্টির কারণ স্বরূপে যে মানসিক বৃত্তি-গুলি স্বীকৃত তাহাদের অস্তিত্ব নিম্নশ্রেণীর প্রাণীসকলের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বাক্যের মধ্যে এবং বাহ্য আচরণের মধ্যেও মানসিক আনন্দের প্রকাশ হইতে পারে কিন্তু হাস্যের মধ্যে যে আনন্দ জন্মলাভ করে তাহা অপরাপর মনোভাব হইতে ভিন্ন। বাক্‌সৃষ্টির বহু পূর্বে হাস্য জন্মলাভ করিয়াছে। প্রথমে হাস্য বাহ্য আচরণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিত। পরবর্ত্তীকালে লিপি কৌশল, শিল্প ও সাহিত্যের বিবর্ত্তনের সহিত হাস্যেরও ক্রমবিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনিপ্রধান শব্দের মধ্যে এবং চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে সুপ্রাচীন যুগেও হাস্যানুকূল মনোভাবের বিকাশ হইয়াছে। আদিম যুগের মানবও গুহার মধ্যে দীর্ঘনাসাযুক্ত মানবের চিত্র অংকন করিত, স্ত্রীলোকদিগের দেহের মধ্যদেশ অপেক্ষাকৃত স্থূলভাবে চিত্রিত করিত।২ সুতরাং শিল্প ও সাহিত্যের সহিত হাস্যও প্রাচীনকাল হইতে মানবচিত্তে স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া আছে।

বর্ত্তমানযুগের সাহিত্যে হাস্যের যেরূপ প্রকাশ দেখা যায় ঠিক্ সেইরূপে না হইলেও কোন না কোন প্রকারে হাস্য সকলপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টিতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হাস্য সকলেরই প্রিয়। হাসিতে সকলেই চায়, যে ব্যক্তি স্বাভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতিসম্পন্ন সেও কখনই আপনাকে হাস্যরসানুভূতি বর্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। হাস্য কৌতুকের প্রতি মানুষের এক

সহজাত আকর্ষণ রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন৩—"আমি কাঙ্গাল, আমার উপর এ দৌরাত্ম্য করিও না, এইরূপ কথা কাহার মুখে শুনিতে না পাওয়া যায়? কিন্তু কে কোথায় কবে বলিয়াছেন, মহাশয়, আমি অরসিক আমার সঙ্গে হাস্য পরিহাস করিবেন না, কে কোথায় কবে ভাবিয়াছে যে আমার কথায় রস নাই, আমি আর রসিকতা ছড়াইবার চেষ্টা করিব না?······ কেহ কাহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে আপনার ঐশ্বর্য্যের বা বিদ্যাবত্তার বা যশস্বিতার বা অন্য গুণের পরিচয় দিবার জন্য তাদৃশ ব্যস্ত হয় না, কিন্তু রহস্য উত্থাপন করিয়া রসিকতার পরিচয় দিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত।" হাস্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কোন প্রকার নির্দেশ অথবা বাহ্য প্রেরণা ছাড়াই হাস্যর সৃষ্টি হয়। সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্ব (সাব লাইম্) বলিতে যাহা বুঝায় হাস্য তাহা হইতে কেবলমাত্র পৃথকই নহে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সত্তা, যেজন্য বলা হইয়াছে "From the Sublime to the ridiculous thers is but one step)" হাস্যরসকে বিচার এবং বিশ্লেষণ করিতে গেলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অনুভূতি লইয়াই বিচার করিতে হয়। দৃশ্যবস্তুর সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে কমনীয়তা এবং মাধুর্য্য আছে অথবা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মহত্ব ও ঔদার্য্য বর্ত্তমান তাহা হাস্যরসের মধ্যে দুর্লভ। স্থায়িত্বের মূল সঙ্গতি, কিন্তু হাস্য অসঙ্গতি এবং বৈষম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা চিত্তে কোন স্থায়িভাবের অনুরণন তুলিতে পারে না। হাস্যের আবেদন হৃদয়ে নহে, মনে। ৪ ইহা সম্পূর্ণরূপেই ক্ষণস্থায়ী। ইহার স্বাভাবিক সংবেদনও আমাদের আলস্য, দৌর্বল্য, অসঙ্গতি, অহঙ্কার, শ্রেষ্ঠত্বাভিমান প্রভৃতির প্রতি। ৫ এমন কি বীররস, শৃঙ্গাররস, প্রভৃতির মধ্যে যে গভীরতা এবং ব্যাপ্তি রহিয়াছে হাস্যরসের মধ্যে তাহার কোন নিদর্শন নাই। উৎকৃষ্ট শিল্পরসের অনুভূতি (এস্‌থেটিক ফিলিং) যে প্রকার মনোবৃত্তির দ্বারা সাধিত হইতে পারে, হাস্যরসের উদ্বোধক মনোবৃত্তিসকল তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। বেনেদেতো ক্রোচে হাস্য ও হাস্যের প্রকাশক মনোভাবসকলকে (অর্থাৎ উইট্, হিউমার, স্যাটায়ার প্রভৃতি) উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচায়ক ভাবরূপে গ্রহণ করেন নাই, বরঞ্চ অপেক্ষাকৃত নিম্ন বা ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য প্রকাশকসত্তারূপে (সিউডো এসর্থেটিক কনসেপ্ট) স্বীকার করিয়াছেন। কোনও বস্তুর গাম্ভীর্য্য অথবা মহত্ত্বে অভিভূত না হইয়াই শিশু হাস্য করিয়া থাকে, পরিণত বয়স্কগণের হাস্যও সৌন্দর্য্য অথবা মহত্ত্বের দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়াই। উচ্চহাস্যের মধ্যে বন্ধনহীন আনন্দের প্রকাশ হয়-কিন্তু সৌন্দর্য্যের অথবা সুরুচির পারিপাট্য তাহাতে নাই। হাস্যের এই স্বরূপগত তারল্য এবং অগভীরতার নিমিত্ত সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন—ঃ 'সত্ত্বাভাবো হি হাস্যঃ' অর্থাৎ সত্ত্বের (চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্যের অথবা সত্ত্বগুণের) অভাব হইতেই হাস্য জন্মলাভ করে। পুনরায় হাস্য "নীচপাত্র প্রয়োজিতঃ" এবং সকল প্রকার অসঙ্গতি ও বৈরূপ্য হাস্যের 'বিভাব' (অর্থাৎ অলৌকিক কারণ)—এই প্রকার উক্তি হাস্যের স্বরূপবিষয়ে আলঙ্কারিকগণের মনোভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলে। অভিনবভারতী টীকায় হাস্যের রূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও পূর্বোক্ত মনোভাবের সহিত পূর্ণ সঙ্গতি বহন করে। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"হাসস্য সানুসন্ধানস্য বিদ্যুৎ সদৃশ তাৎকালিকাল্প দুঃখ-রূপ সুখানুগতো"। হাস স্থায়ী ও প্রকাশমান নহে, তাহাকে চিত্তবৃত্তিসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে তাহার প্রকাশ; হাস্যের আস্বাদন প্রথম ক্ষণেই দুঃখজনক হইলেও পরবর্ত্তী কালে আনন্দদায়ক। অর্থাৎ অসঙ্গতি—যাহা হাস্যের মূল—তাহা চিত্তকে যেরূপ পীড়া দেয় তাহা দুঃখের হইলেও আনন্দজনক। কিন্তু এই বিশ্লেষণে হাস্যের তুচ্ছতা এবং সঙ্কীর্ণতা প্রকাশিত হইয়া উঠিলেও হাস্য মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য্যের দ্বারা; এজন্য সাহিত্যের আসরে

হাস্যরসের আসন সহজেই নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ নবরসের অন্যতমরূপে হাস্যরসকে স্বীকার করিয়া এবং অন্যতম প্রধান মনোবৃত্তিরূপে হাসস্থায়িভাবকে অঙ্গীকার করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহার প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আচার্য্য ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন—"শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ

বীভৎসাদ্ভূত সংজ্ঞৌ চের্ত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা,
জুগুপ্সাবিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবা প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

হাস্য এক বিশেষ স্বাধীন প্রেরণার পরিচায়ক হইলেও তাহা অপেক্ষাকৃত অপ্রধান মনোবৃত্তি সমূহের অন্তর্গত—বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ম্যাক্‌ডুগল তাঁহার গ্রন্থে এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে — "Laughter also expresses an independent impulse which sometimes as we know is almost or quite uncontrollable. It belongs to the group of minor insticts but is of special interest and deserves some special discussion".

হাস্য হইতে গভীর অনুভূতি সকলের মৌলিক পার্থক্য থাকিলেও তাহা যে অনুভূতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা আলঙ্কারিকগণের স্থায়িভাবরূপে হাস্যের পরিগণনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। হাস্যের সহিত কল্পনার কোন যোগ নাই, ইহা একান্তই বুদ্ধিপ্রধান। হাস্যের প্রকাশ ও তাহার সংবেদন ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। একজন একযুগে যে কারণে, যে প্রকার হাস্য করিবে, অপরযুগে অপর একজন সেইরূপে হাস্য করিবে। হাস্য সকল সময়েই চেতন মানবসত্তার সহিত জড়িত। আপাত প্রতীয়মান যে সকল বিশৃঙ্খলা এবং অসামঞ্জস্য হাস্যের কারক, অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহার মধ্যেও শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এজন্য অসঙ্গতি হাস্যের জনক হইলেও হাস্যের নিজস্ব প্রকাশের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নাই। লৌকিক হাস্যের অনুভূতির সহিত সাহিত্যে অভিহিত হাস্যের প্রবল ব্যবধান রহিয়াছে। সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক নিবন্ধে যে হাস্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লৌকিক হাস্য হইতে "ব্যবহিত।" এজন্য অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষানুসারে তাহা "অলৌকিক"। জর্জ বুলোর অভিমতে "সাইকিক্যালি ডিসট্যান্‌সড্‌"। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে 'হাস্য' কথাটিকে বর্ত্তমান নিবন্ধে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে, অর্থাৎ সকল প্রকার হাসানুকূল বা পরিহাসাত্মক মনোভাবের অভিধায়করূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। বিভাব অনুভাব প্রভৃতি যোগে নিষ্পন্ন ও কার্য্যকারণ সীমার উর্দ্ধস্থিত যে অলৌকিক "হাস্যরস" অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, এস্থলে "হাস্য" এই পদের দ্বারা তাহার গ্রহণ হয় নাই। বাংলায় হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, মস্করা, ভাড়ামি, রঙ্গরস প্রভৃতি পদ যে অর্থের বাচক "হাস্য" এই পদটিকে সেই ব্যাপক অর্থে এস্থলে গ্রহণ করা হইয়াছে, উহা 'হাস'রূপে স্থায়িভাব হইতে পৃথক। ইংরাজী সাহিত্যে উইট, হিউমার, স্যাটায়ার, ল্যামপুন্‌, কমিক, জেস্‌ট, ফানি, সারকাজম্‌, লাফ্‌টার প্রভৃতি প্রতিটি শব্দেরই যেমন গুণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ ঠিক সেইরূপে হাস্যের মধ্যে গুণগত ভেদ পরিগণনা করেন নাই,—কিন্তু বিদ্রূপ, রসিকতা, রহস্য, ভাড়ামি, প্রভৃতির আপনাপন বৈশিষ্ট্য ভেদে অর্থগত যে বৈলক্ষণ্য—তাহার প্রকাশ সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্য, নর্ম, উপহসিত, অতিহসিত, প্রভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উৎপত্তির দিক হইতে বিচার করিলে হাস্যের মধ্যে কিছু পরিমাণে অমার্জিত ও অসংস্কৃত মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহা হাস্যের বিশুদ্ধ ও অলৌকিক আনন্দরূপে পরিণত হইবার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ।৬

হাস্যের মধ্যে একদিকে যেমন অসাধারণ মানসিক আনন্দের প্রকাশ হইয়াছে তেমনভাবে কৌতূহল ও আমোদ প্রিয়তাও প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং স্থায়ী হাস্যানুকূল মনোভাবের প্রকাশকরূপে এবং ক্ষণস্থায়ী কৌতুক প্রভৃতির প্রকাশকরূপে হাস্যের স্বরূপগত ভেদ অঙ্গীকার করা কর্তব্য। হাস্যের মধ্যেও প্রকারগত ভেদ রহিয়াছে এবং আলঙ্কারিকগণ সকল ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ না করিলেও তাহাদিগের সাধারণরূপে পরিগণনা করা সম্ভব। ৭

হাস্যরসসৃষ্টির অনুকূল মনোভাব বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (সাইকো এ্যানালিসিস্) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রতীচ্য দেশীয় চিন্তাধারার ফল। সুতরাং অপরদেশের চিন্তাশৈলী ও সমীক্ষাপদ্ধতির মানদণ্ডে ভারতীয় রসশাস্ত্রকে কিরূপে বিচার করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে পাশ্চাত্ত্য মনোবিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তের আলোকে ভারতীয় আলঙ্কারিক প্রস্থানের সিদ্ধান্তকে বিচার করা বর্ত্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। যে সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ 'হাস্য' নামক মনোভাবের বিকাশের কারণগুলিকে ন্যায়শাস্ত্রের সংযত এবং সংক্ষিপ্ত পরিভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া কেবলমাত্র কুশাগ্রবুদ্ধি বিবুধমণ্ডলীরই যশোভাজন হইয়াছেন, সেই সকল দুরূহ এবং সংক্ষিপ্ত পারিভাষিক উক্তির সহিত পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য দেখাইয়া ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের তুলনামূলক উৎকর্ষ দেখানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সুপ্রাচীনযুগে অ্যারিস্টটল্ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগে বেনেদেতো ক্রোচে পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্ব ও সমীক্ষাশাস্ত্রের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখা যায় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও খৃষ্টীয় বা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ভরতাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রেরও সেইরূপ অগ্রগতি দেখা যায়।

'অসঙ্গতি' বা অনৌচিত্য হইতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, অথচ সঙ্গতি বা ঔচিত্যই হইতেছে সকল রসের মূল। ঔচিত্য বলিতে যথার্থতাকে বুঝায়, অর্থাৎ যাহা যেখানে যেরূপে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য তাহা সেস্থলে সেইরূপে সন্নিবিষ্ট হইলে তাহা হইতে ঔচিত্যের সৃষ্টি হয়। উচিতের অর্থাৎ যথার্থতার ভাব ঔচিত্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন—"উচিতং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ। উচিতস্য, চ যো ভাবস্তদৌচিত্যং প্রচক্ষতে। যৎ কিল যস্যানুরূপং তদুচিতমুচ্যতে, তস্য ভাবমৌচিত্যং কথয়ন্তি।" সুতরাং সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলির স্বরূপে, সন্নিবেশে অথবা সংস্থানে কোন প্রকারের বৈষম্য দেখা গেলে, অর্থাৎ রসসৃষ্টির অলৌকিক উপাদানগুলির মধ্যে দেশ, কাল, বয়স, বর্ণ প্রভৃতির ভেদে যে কোনও রকমের অসঙ্গতির উদ্ভব হইলে তাহা হইতে অনৌচিত্যের সৃষ্টি হয়, এবং এই অনৌচিত্যই হাস্যরসের সৃষ্টির কারণ।৮ অনুভূতি মাত্রেই মূলতঃ সুখের কিন্তু সাধারণ সুখের অনুভূতি হইতে বৈষম্যজনিত সে আনন্দের অনুভূতি তাহার পার্থক্য রহিয়াছে। অসঙ্গতি সর্বকালের নহে,—প্রথমতঃ তাহা চেতনপ্রকৃতির সহিত জড়িত এবং কখন কখন তাহার মধ্যে নিয়মভঙ্গ জনিত কৌতুকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণরূপে আমরা বলিতে পারি, যে দেশে যেপ্রকার আচার ব্যবহার, বেশবাস, কথোপকথনের রীতি প্রচলিত তাহার বিপরীত কিছুর অনুষ্ঠান হইলে তাহা হইতে হাস্যের সৃষ্টি হয়। এজন্য ভরতাচার্য্য বলিয়াছেন যে মেখলাকে (যাহা সাধারণতঃ নারীরা কটিদেশে ধারণ করে) বক্ষে ধারণ করিলে তাহা হাস্যেরই জনক হয়।৮ক

বালকে বৃদ্ধের আচরণের অনুকরণ করিলে যে অসংগতির সৃষ্টি হয় তাহা বয়সের বৈপরীত্য হইতে জন্মলাভ করে। আচরণের ও বয়সের এই বৈপরীত্য এবং অসামঞ্জস্য সহৃদয়ের চিত্তে যে আকস্মিক আন্দোলনের সূচনা করে তাহা হইতেই হাস্যের জন্ম হয়। অভিনয়ের সময়ে বিদূ-ষক অথবা ভাঁড়কে দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠি। কেন? কারণ, বিদূষকের আচরণের অসা-মঞ্জস্য হইতে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহা চিত্তে নিয়মভংগ জনিত মৃদু পীড়ার সৃষ্টি করে। এজন্য অল্লরাজ তাঁহার "রসরত্ন প্রদীপিকা" শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন— "বালকাদি ব চো বেষ বৈষম্যজনিতা হিযা, চেতসো বিকৃতিঃ স্বল্পা স হাসঃ কথিতঃ খলু।" মানবচিত্তে জন্মজন্মান্তর হইতে যে সকল ভাব সুপ্ত হইয়া আছে রতি, হাস, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। যে কোনও প্রকাবের বাক্ বয়স প্রভৃতি জনিত বৈষম্য বা অসংগতি চিত্তে "স্বল্প বিকৃতি" অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে। এই বিকৃতি অথবা পরিবর্তন কোন প্রকারের? গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে অপরিচিত কোনও চেতন দৃশ্যবস্তুর বৈষম্য অথবা অসংগতি দর্শনে প্রথমতঃ চিত্তে সেই বিষয়ে বিরাগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্ব হইতেই ঐ বস্তুটির দর্শন-বিষয়ে দর্শকজনের মনে কৌতূহল সঞ্চিত হইয়া আছে, অথবা প্রথমদর্শনমাত্রই স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাদিগকে ঐ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে; এই অবস্থায় দৃশ্যের প্রতি এই স্বাভাবিক কৌতূহল মনকে তাহার প্রতি এরূপ একাগ্র করিয়া তুলে যাহাতে সমস্ত বাহ্যচাঞ্চল্যকে সেই সময়ে সংযত করিতে হয়। দৃশ্যবস্তুর অসংগতি চিত্তে যে অপ্রীতির উদ্রেক করে তাহাতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে সকল প্রকার কৌতূহল নিরস্ত হইয়া যায়। বৈপরীত্য মূলক এই সংঘাতই হাস্যকে উদ্রিত করিয়া তুলে।৯ কৌতূহলজনিত এই হাস্যানুকূল চিত্তবৃত্তির উৎপত্তি সূচিত করিবার জন্য সাহিত্য দর্পণকার বলিয়াছেন "বিকৃতাকারবাগ্বেষ চেষ্টাদেঃ কুতুকাদ্ ভবেৎ।" রুচিরা টীকায় ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বলাহইয়াছে "কুতূহলাত্তন্নিমিত্তীকৃত্যেতি যাবৎ।" কৌতূহল জনিত বৈচিত্র্য কেন এবং কিরূপে বৈপরীত্যের দ্বারা হাস্যকে উদ্রিক্ত করিবে তাহা আরও গভীর আলোচনায় বোধগম্য হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'কৌতূহলের একটা প্রধান অংগ নূতনত্বের লালসা, অসংগতের মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ নিছক নূতনত্ব আছে, সংগতের মধ্যে তেমন নাই।' যাহা অসংগত বা অসমঞ্জস তাহাতে ক্ষণকালের জন্য নিয়মভংগ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু যাহা সুসংগত তাহাতে কোন নিয়মভংগ নাই। নিয়মভংগের মধ্যে একটা পীড়া আঘাত বা উত্তেজনা আছে, তাহা অধিক না হইলে চিত্তে সুখদায়ক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যাহা যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ হইলে তাহা কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে না, কিন্তু ঠিক্ সেইরূপ না হইলে আকস্মিক এবং অনতিপ্রবল আঘাত চিত্তে একটি বিশেষ চেতনার উদ্রেক করে।১০ তাহার পশ্চাতে রহি-য়াছে নূতনত্বের লালসা,—এই নূতনত্বের চমকে যে আন্দোলন তাহাতেই আমরা হাসিয়া উঠি।'১১ কৌতূহল জনিত যে নূতনত্ব লালসা হইতে হাস্যের বিকাস হয় তাহা সূচিত করিবার অভি-প্রায়ে টীকাকার "কুতূহলাত্তনিমিত্তীকৃত্য" এই পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। রংগমঞ্চে দৃশ্য অভিনয়ে, এবং বর্ণনাপ্রধান কাব্যে ও নাটকে উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপে হাস্যরসানুকূল মনোভাব জন্মলাভ করে। উদাহরণ স্বরূপে বিদূষকের, বিটের অথবা শকারের চরিত্রকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। রংগমঞ্চে ইহাদের সাক্ষাৎলাভের পূর্বে অথবা ইহাদের সহিত পরিচয়ের পূর্বে প্রেক্ষক সমাজের অথবা পাঠকসমাজের চিত্তে সেই সেই চরিত্রের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য, রূপ, অংগ সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু পঠ্যমান গ্রন্থে অথবা অভিনীয়মান নাটকে ওই সকল চরিত্রের সহিত পরিচয়ের পরমুহূর্তেই বিদূষকের সশিখবপু, অংগভংগী, ভীরুতা, প্রতীয়মান নির্বুদ্ধিতা ও শকারের অসংলগ্ন উক্তি, প্রভৃতি পূর্বসঞ্চিত

কৌতূহলকে বর্ধিত না করিয়া চিত্তে নৈরাশ্য এবং বঞ্চনার ভাব সৃষ্টি করে। এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বিদূষক, শকার, প্রভৃতি চরিত্র বিষয়ে দ্রষ্টা বা পাঠকের মনে হেয়ত্বজ্ঞান এবং তুচ্ছতা-বোধের উদয় হয়। বৈষম্য জনিত এই অপ্রীতি ও বঞ্চনার ভাব এবং কৌতূহল জনিত পূর্বনিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তির মুক্তিলাভ—ইহাদের মধ্যে যে আকস্মিক পরিবর্তন (ট্রান্‌জিসন্‌) তাহাতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে তাহাই হাস্যের জনক হইয়া দাঁড়ায়। এসম্বন্ধে বেনেদেতো ক্রোচে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য "The Comic has been defined as the displeasure arising from the perception of a deformity immediately followed by a greater displeasure arising from the relaxation of our psychical forces, strained in expectation of a perception looked upon as important.....This is the pleasure of the Comic with its physiological equivalent of laughter".

হাস্যরসের জনক যে সকল অলৌকিক কারণ-যাহাদের আমরা 'বিভাব' এই বহুমানসূচক শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকি তাহাদের সকলেরই পশ্চাতে অসংগতি বা বৈষম্য কোন না কোন প্রকারে বর্তমান। সকল প্রকার বিকৃতি, বৈষম্য, অনুকৃতি, বাক্যগত বৈপরীত্য প্রভৃতির মধ্যে একটিমাত্র সত্য ব্যাপকভবে বর্ত্তমান। তাহা হইতেছে স্বভাবের অথবা স্বরূপের অতিক্রমণ। স্বভাবের ভাবই হইতেছে স্বাভাবিক। রূপের বিকৃতি বলিতে স্বাভাবিক এবং সর্বজনজ্ঞাত যে শারীর সংস্থান, তাহার অন্য রূপ, বাচিক বিকৃতি অর্থে সর্বজনস্বীকৃত যে বাক্যোচ্চারণ পদ্ধতি যাহা স্বাভাবিক বলিয়া অঙ্গীকৃত তাহা হইতে বিচ্যুতি অথবা অপরের অনুকরণ—এই জাতীয় ধারণা সকলেরই সূচনা হয়। সামগ্রিক ভাবে দেখিলে স্বভাব হইতে বিচ্যুতি—ইহাই হইতেছে সকল প্রকার অসঙ্গতির মূল। স্বভাব বলিতে আমরা কি বুঝি? প্রকৃতি ভেদে, দেশভেদে কালভেদে বয়সভেদে এবং অবস্থাভেদে মানবের যে আপনাপন রূপ তাহাই স্বভাব। সুতরাং স্বভাবের অতিক্রমণ হইলে মানুষের কোন না কোন বৈশিষ্ট্যের অতিক্রমণ হইয়া পড়ে। সামাজিক নীতি ও সমাজস্থাপক শক্তির যথাযথ অনুসরণ করিয়া চলাও মানবের অন্যতম স্বভাববৈশিষ্ট্য। মানবসমাজের পশ্চাতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে সংঘাত (টেন্‌শন্‌) ও বিবর্তনশীলতা (ইলাস্‌টিসিটি)। সমাজশরীরে অথবা ব্যক্তিশরীরে অথবা ব্যক্তিমানসে ইহাদের অভাব হইলে অস্বাস্থ্য, রুগ্নতা, মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি দেখা দেয়। সমাজে এই সংঘাত ও বিবর্তনের অভাব হইলে মানব সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। একাধিক মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হওয়ায় মানব স্বভাবই সমাজনীতির নিয়ামক। সুতরাং শিশুর বৃদ্ধজনোচিত আচরণ, বৃদ্ধের শিশুসুলভ তরলতাপ্রকাশ, অথবা বিদূষকের অসঙ্গত আচরণ প্রভৃতি মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠিত-স্বভাবের ও ব্যবহারের বিরোধী। সর্বজনস্বীকৃত আচরণের বৈষম্যে সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছেদ ও গতিহীনতা সূচিত হয়। বয়সের অগ্রগতির সহিত যে পরিবর্ত্তন সুসঙ্গত তাহাই মানবের স্বভব, তাহার মধ্যে কোন বৈপরীত্য দৃষ্টি হইলে অর্থাৎ বৃদ্ধ আপন বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করিয়া শিশুর ন্যায় আচরণ করিলে, অথবা শিশু তাহার বয়সোচিত চাঞ্চল্য ও চপলতা ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধজনোচিত অকাল গাম্ভীর্য্য এবং প্রবীণতা প্রকাশ করিলে স্বভাব ও বয়সের বৈপরীত্য বা বিকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সময়ের এবং গতির সহিত আপনাকে মানাইয়া লইয়া চলা, ইহাই স্বাভাবিক জীবনের লক্ষণ, তাহা না হইলে জীবনের স্বাভাবিক গতি প্রতিহত হইয়া কৃত্রিমতার শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। এই অসঙ্গতিই হাস্যের কারক। এজন্য নাট্যদর্পণকার (১২) হাসের যে লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য—ঃ "অথ হাস্যঃ বিকৃতঃ প্রকৃতি দেশকাল বয়োঽবস্থাদিবিপরীতঃ, অঙ্গস্য চ বিকৃতত্বং

বিরূপো ব্যাপারঃ খঞ্জকুব্জত্বাদৈর্বা।" মানবজীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া আছে দেশকাল, অবস্থা, প্রকৃতি বয়স, প্রভৃতি ভেদজাত অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা। সত্তার স্বাভাবিকরূপ তাহার বিবর্ত্তন শীলতা। জীবন প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে,— আজকের "আমির" সহিত গতকল্যকার "আমি"র কোন ঐক্য নাই ভবিষ্যতের আমির সহিত ও কোন মিল থাকিবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সে বালক না আছে আপন সত্তায় না আছে আপন স্বরূপে।" যে মুহূর্ত্তে কোন ব্যক্তি আপনার বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করিয়া অপরের গতির, অপরের বাক্যের, অপরের চেষ্টার অনুকরণ করিতেছে সেই মুহূর্ত্তেই সে আপনার গতিশীল জীবন হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে এই পশ্চাদ্‌গতি যাহা অসঙ্গতিরই প্রকারভেদ তাহা হাস্যকেই কেন উদ্রিক্ত করিবে? অস্বাভাবিকতার মধ্যে হাস্যের অবকাশ কোথায়? বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সে মানবজীবনে অথবা সাহিত্যে যাহারা হাস্যের কারক তাহাদিগের সকলের মধ্যেই স্বাভাবিক একগুঁয়েমি বশতঃ অথবা অনবধানতা হেতু অথবা বিশেষধরণের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত একপ্রকারের অভ্যস্ত গতানুগতিকতা আসিয়া পড়ে। এই গতানুগতিকতার ফলে তাহারা অযৌক্তিক দৃঢ়তার সহিত অপরের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া আপনাপন জীবনযাপনপদ্ধতি ও মতবাদকে অনুসরণ করে। এজন্য তাহারা উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। যে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সামাজিক জীবন আবর্ত্তিত তাহা হইতে যেন ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এবং এই পশ্চাদ্ গমনের অনিবার্য্য ফলস্বরূপে তাহারা যেন যান্ত্রিক কৃত্রিমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে থাকে॥ বিদূষক যে মুহূর্তে তাহার বিকৃত অঙ্গভঙ্গী আচার ব্যবহার ও বিকৃত ভাষণ প্রভৃতি লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেই মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন শীল এবং স্বাভাবিক জীবন-ছন্দ হইতে তাহার বিচ্যুতি দর্শক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৩ অপরের উৎসাহমূলক চেষ্টা, বীরত্ব ব্যঞ্জক চেষ্টা, শৃঙ্গারানুকূল ব্যবহার—এই সকলের প্রত্যেকের অনুকরণের মধ্যেই এই গতিশীল জীবন প্রবাহ হইতে বিচ্যুতি প্রকাশ পাইতেছে। যে মুহূর্ত্তে অপরের অনুকরণ প্রচেষ্টায় আমরা আপনাপন সত্তা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি সেই ক্ষণেই জড়তার এবং সঙ্কীর্ণতার শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। সামাজিক জীবনে ও ব্যষ্ঠিজীবনে সকলপ্রকার কর্ম্মের মধ্যেই একপ্রকার কার্য্যকারণ সংযোগ রহিয়াছে। যে কোন কর্ম্মেরই কোন না কোন অনিবার্য্য শুভাশুভ ফল দেখা যায়। কিন্তু এই গন্ডীর বাহিরেও এমন একটি জগৎ রহিয়াছে যেখানে কোনও মানুষের স্বভাবের অসঙ্গতি বা বিকৃতি অপর মানবকে আকৃষ্ট করিলেও তাহার ফল সহসা দেখা যায় না। কিন্তু কিছুকাল পরে ইহার ফল দেখা যাইতে পারে। সমাজও সঙ্গে সঙ্গে এই আকস্মিক বিচ্যুতি ও সঙ্কীর্ণতাবিষয়ে সন্দিহান হইয়া উঠে ও তাহার সংশোধনের প্রয়াস পায়। হাস্যকে এইভাবে সামাজিক জীবনের বাহ্য ত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টা রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। রামচন্দ্রগুণচন্দ্র ১৪ প্রকৃতি দেশকাল বয়স অবস্থা প্রকৃতির বৈপরীত্য হইতে হাস্য জন্মলাভ করে এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে যে সর্ব্বব্যাপী অসঙ্গতি ও গতানুগতিকতা তাহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন মনে হয়। অপরের উৎসাহমূলক চেষ্টা, বীরত্বব্যঞ্জক চেষ্টা, শৃঙ্গারানুকূল ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণের মধ্যে এই গতিশীল জীবন প্রবাহ হইতে বিচ্যুতি প্রকাশ পাইতেছে। একজনের বিবর্ত্তন শীল জীবনপ্রবাহের সহিত যাহা সুসঙ্গত তাহার স্থানে তাহাকে অস্বীকার করিয়া অপরের আরোপ—এই যে "পরের ভঙ্গী নকল করা" ইহা গতিতে স্থিতির আরোপ ইহা অনুভবের মধ্যে অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। ব্যাপক অর্থে দেখিতে গেলে এই অসঙ্গতি মানবজীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে বর্ত্তমান। স্বাভাবিক এবং গতিশীল জীবনে অস্বাভাবিকের এই আরোপ—ইহা জীবনের অস্বীকৃতি এবং সকলপ্রকার

অসঙ্গতির মূল ইহাই। বার্গস' ইহাকে 'মেকানিক্যাল রিজিডিটি' নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় "the mechanical encrusted upon the living....the laughable element consists of a certain mechanical inelasticity; just when one would expect to find the wide awake adaptability and to living pliableness of human being.....Rigidity retarding motion and movement may be turned into ridicule.....Buffoonery is voluntary in congruity and incongruity excites laughter......" (Laughter.) সকল প্রকার হাস্যরসেরই পশ্চাতে এই বিরাট অসঙ্গতি বর্ত্তমান। পরিবর্ত্তনই একমাত্র সমঞ্জস ও সঙ্গত—অপরের আচরণের অনুকরণ করিলে স্বভাবের সহিত যাহা সঙ্গত তাহার বিপরীত আচরণ করা হয়, এবং তাহা পরিণামে হাস্যকে উদ্রিক্ত করে। রামচন্দ্র গুণচন্দ্র 'বৈপরীত্য' শব্দের দ্বারা এই গূঢ় ভাবদ্যোতনাকেই ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

১. থিওরি এ্যান্ড প্রাক্‌টিস অব সাইকোলজি গ্রন্থে উদ্ধৃত (পৃঃ ১০৫)

২. হিস্ট্রি অব দি আর্ট অব রাইটিং গ্রন্থের সপ্তম সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য।

৩. "রসিকতা" প্রবন্ধ ; বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১২৭৯।

৪.প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন—"এ রস মধুর নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয় মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন—(ভারতচন্দ্র, প্রবন্ধসংগ্রহ পৃঃ ২৫৫)

৬. তুলনীয়— "Wit and humour appeal to our indolence, our vanity, our weakness, and insensibility; serious and impassioned poetry appeals to our strength, our magnanimity, our virtue and humanity....." (Lectures on English Comic Characters by W. Hazitt pp. 40-41).

ভূত প্রেত প্রভৃতি পিশাচযোনি হাস্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা এই প্রকার মনোভাব হাস্যের স্বরূপের নিকৃষ্টতাকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলে। অলঙ্কার শাস্ত্রে হাস্যরসকে যে আসন দান করা হইয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "হাস্যরসের প্রতি" শীর্ষক কবিতায় বলিয়াছেন—

হাস্য তুমি উপভোগ্য,
করতালি পাবার যোগ্য,
পূজার অর্ঘ্য চেয়োনা তাই বলে;
ভীভৎস-অদ্ভুতের জ্ঞাতি,
স্বল্প আয়ু, ক্ষণিক খ্যাতি,
এগিয়ে কোথা আসছ গণ্ডগোলে?
.....হাস্য রসটা রসের মধ্যে ফেউ যে,"......(হসন্তিকা পৃঃ ৮৪)

৬. এই অমার্জ্জিতরূপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জার্মান দার্শনিক জে' পল রিখটার হিউমারকে "সাবলাইম বিভার্স" বলিয়াছেন। (ভর্শাল দ এস্‌থেটিক পৃঃ ৮-৯)

৭. হাস্যরসের স্বরূপ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে পূর্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার সহিত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রসঙ্গতঃ তুলনা করা যাইতে পারে—

"The humorous writer professes to awaken and direct your love, your pity, your kindness....your scorn for untruth, pretension, imposture,......your tenderness for the weak, the poor, the oppressed, the unhappy; a literary man of the

humouristic turn is pretty sure to be of Philanthropic nature, to have a great sensibility to be easily moved to pain or pleasure, kindly to appreciate the varieties of temper of people round about him, and sympathise in their laughter, love, amusement, tears.... "

৮. ঔচিত্য কোন ক্ষেত্রে কি প্রকারের হইবে তাহার উল্লেখ করিয়া যশোবর্মন তাঁহার "রামাভ্যুদয়" নাটকে বলিয়াছেন— "ঔচিত্যং বচসাং প্রকৃত্যনুগুণং সর্বত্র পাত্রোচিতা
পুষ্টিঃ স্বাবসরে রসস্য চ কথামার্গে ন চাতিক্রমঃ।
শুদ্ধিঃ প্রস্তুতসংবিধানকবিধৌ প্রৌঢ়িশ্চ শব্দার্থয়োঃ
বিদ্বদ্ভিঃ পরিভাব্যতামবহিতৈঃ এতদেবাস্তু নঃ", এই নিয়মগুলির বিপরীত হইলেই তাহা অনৌচিত্য-মূল হাস্যের জনক হইবে (লোচনটীকা, ধ্বন্যালোক, তৃতীয় আনন, পৃঃ ১৫৮)
রবীন্দ্রনাথের "খাপছাড়াতে"—ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।...... এই কবিতায় অন্যান্য কারণের মধ্যে সন্নিবেশ ও সংস্থানের বৈষম্য অনৌচিত্যমূলক হাস্যের কারণ।

৮ক আদেশজো হি বেষস্তু ন শোভাং জনয়িষ্যতি। মেখলোরাসিবন্ধে তু হাস্যং সমুপাদয়েৎ। "(নাট্য-শাস্ত্র ২১তম অধ্যায়। পৃঃ ১২৯, গাইকোয়াড় সিরিজ।)

৯. দ্রষ্টব্য—"While laughter may be defined to be the same sort of convulsive and involuntary movement, occasioned by mere surprise or contrast before it has time to reconcile its belief to contradictory appearences". (Lectures on English Comic Characters. page 34).

১০. কৌতূহল হাস্যের জনক ইহা স্বীকার করিলেও পীড়নমাত্রই হাস্যের জনক ইহা বলা যায় না। জড় প্রকৃতির মধ্যেও অসংগতি রহিয়াছে কিন্তু তাহা হাস্যের উদ্রেক করেনা। অসংগতি যখন চেতন পদার্থে দৃষ্ট হয় তখনই তাহা হাস্যের সৃষ্টি করে। ছায়াচিত্রে মিকি মাউস নামক ব্যঙ্গ চরিত্রের কার্যকলাপ চেতন বলিয়াই হাস্যের উদ্রেক করে।

১১. নূতনত্বের এই যে চমক হইতে হাস্য জন্মলাভ করে ইহা প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্ততলও স্বীকার করিয়াছেন; প্রসংগতঃ আমরা স্বমন্তব্যের অনুকূলে নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারি—
"Incongruity in order to be ludicrous, requires a transition, a change of mood resulting in the discovery either of an unexpected resemblance...where there was resemblance. There is always a blending of contrasted feelings. The pleasure of the ludicrous thus arises from the schock of surprise at a painless incongruity. It sometimes allies itself with malice sometimes with sympathy and sometimes again is detached from both" (Poetics ed. by Butcher. page 376).

১২. গাইকোয়াড ওরিয়ান্টাল সিরিজ; পৃঃ ৭৩।

১৩. প্রাকৃত নাটক কর্পূরমঞ্জরীর প্রথমাঙ্কে সপরিবারে নৃপতির সহিত বিদূষকও প্রবেশ করিতেছে। কিন্ত প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরিবর্তী কালেই অপরাপর নাটকীয় চরিত্রের সহিত তাহার পার্থক্যই তাহাকে হাস্যের পাত্রে পরিণত করিয়া তুলিতেছে।

১৪. পূর্বের ১২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আর্থার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল্‌

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আর্থার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মজঃফরপুর শহরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাক্‌ডোনেলের পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন স্কচ্‌ দেশীয়। ম্যাক্‌ডোনেলের পিতা আলেকজাণ্ডার ম্যাক্‌ডোনেল ভারতীয় সেনাবিভাগের একজন সৈনিক-রূপে ভারতে আগমন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টব্দে ইনি কর্নেলের পদলাভ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুসৌরিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ম্যাক্‌ডোনেলের জন্মকালে তাঁহার পিতার কর্মস্থল ছিল মজঃফরপুর। ম্যাক্‌ডোনেলের মাতৃকুলের ও অনেকে ভারতে বাস করিয়া ভারতেই শেষ শয্যায় সমাহিত হইয়াছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের শৈশবাবস্থা অতিক্রম হইলে মাতার সহিত তাঁহাকে ইউরোপ প্রেরণ করা হয়। পিতা ভারতেই রহিয়া যান। ইউরোপ প্রত্যাবর্তনান্তে ম্যাক্‌ডোনেল জার্মাণীর অন্তর্ভুক্ত ড্রেসডেন নগরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রবিষ্ট হন। অতঃপর গোটিঙেগনে পাঁচবৎসর অধ্যয়নের পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোটিঙেগনে অধ্যয়ন কালে প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর বেনফির নিকট ম্যাক্‌ডোনেল সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। বেনফির প্রেরণাতেই তাঁহার মনে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার স্পৃহা জন্মে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল অক্সফোর্ডে আসিয়া তথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সার মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ এর নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে বি—এ ডিগ্রীলাভ করিয়া তিনি তথাকার জার্মান ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি ম্যাক্সমুল্লারের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রীলাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মেনীতে আসেন এবং লাইপ্‌ জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিবন্ধ রচনা দ্বারা পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। বৈদিক সংহিতাগুলি রচিত হইবার পরবর্তী সময়ে বৈদিকমন্ত্রগুলির অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও পরিচায়িকা সমন্বিত কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এইগুলি "অনুক্রমনী" নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ সূচী সমন্বিত কাত্যায়ন নামে কোন ব্যক্তির রচিত "সর্বানুক্রমনী" নামে প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ দুইটি টিকা সহ সম্পাদন করিয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই পি-এইচ্‌-ডি উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১)। "সর্বানুক্রমনী" নামীয় এই পুস্তকে ঋগ্বেদের প্রতিটি মন্ত্রের আদ্যাক্ষর, মন্ত্রের সংখ্যা, ছন্দের নাম, রচয়িতা ঋষির নাম, উদ্দিষ্ট দেবতার নাম প্রভৃতি সূত্রাকারে লিখিত আছে। মনে হয় সংহিতার মন্ত্রগুলি সহজে কণ্ঠস্থ রাখিবার সহায়ক হিসাবেই এই অনুক্রমনী জাতীয় রচনার উদ্ভব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অনুক্রমনী রচয়িতৃগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে কতকগুলি 'অর্বাচীন' মন্ত্র সংহিতাগুলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে এবং আসল নকলের পার্থক্য না বুঝিতে পারার জন্য ভবিষ্যতে সংহিতা পাঠকেরা বিভ্রান্ত হইবেন। অনুক্রমনীর সূচী মিলাইয়া কোনটি জাল বা প্রক্ষিপ্ত ইহা ধরিয়া ফেলা সহজ হইয়াছে। অনুক্রমনী উদ্ভাবকগণের দূরদৃষ্টি ও চাতুর্যের ফলে সংহিতাগুলির মধ্যে 'ভেজাল' বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়াছে।

এইবার জার্মানীতে অবস্থান কালে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ টুবিঙ্গেন নগরে বেদবিৎ রোটের

নিকট কিছুকাল বেদ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

অক্সফোর্ডের স্নাতকত্ব লাভ করিবার পূর্বেই ম্যাকডোনেল্‌ সংস্কৃতবিৎ হিসাবে খ্যাতি-লাভ করেন। এই সময়ে ও জাপানী পণ্ডিত বুনিও নানজিওকে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ বেলিওল কলেজে আই-সি-এস পরীক্ষার্থিদের সংস্কৃত শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক (বোডেন প্রোফে-সার্‌) সার মনিয়র উইলিয়ামস্‌ এর মৃত্যু হইলে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই পদ লাভ করেন। ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সপ্তবিংশতিবর্ষকাল ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই পদে আসীন ছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ রচিত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হয়(২)। এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ইহাতে বৈদিক শব্দগুলি ও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বেন্‌ফি, রোট্‌ ও ম্যাক্সমূলার ইউরোপের এই তিন প্রমুখ বেদবিৎ পণ্ডিতের শিষ্যত্ব-লাভের সুযোগ পাইয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অতি নিষ্ঠার সহিত বৈদিক সাহিত্য চর্চা করেন। ম্যাক্সমূল্যরের পর বেদবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে ম্যাক্‌ডোনেলের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডে বিশেষতঃ অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূল্যরের পর ম্যাকডোনেলই বেদ-চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ কৃত "ভেডিক্‌ মাইথোলজি" জার্মানীর ষ্ট্রাসবুর্গ হইতে প্রকাশিত হয়(৩)। বেদে উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবতা কিভাবে বেদমন্ত্র রচয়িতাদের কল্পনায় উদ্ভূত ও কালক্রমে পরিণত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ধারাবাহিক বিচার ও বিশ্লেষণ এই পুস্তকটিতে দেখানো হইয়াছিল। বৈদিকঋষিগণের কল্পনায় উদ্ভাসিত এই সব দেব দেবীগণের আলোচনা সমন্বিত এই পুস্তকটি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস জিজ্ঞাসুর পক্ষে অতিমূল্যবান।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ রচিত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়(৪)। এই পুস্তকটির একটি বৃহৎ অংশ বৈদিক সাহিত্যের অলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেলে আর একটি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ সম্পাদন করেন, এই বইখনির নাম "বৃহদ্দেবতা"। অনুক্রমনীগুলি হইতে বিস্তৃততর এই গ্রন্থের ১২০০ শত শ্লোকে, আটটি অধ্যায়ে ঋগ্বেদের অষ্টকগুলির ক্রমানুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার সূচী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদের দেবগণের নির্ঘন্ট ব্যতীত এই পুস্তকে বহু পুরাণ-কথা (মিথস্‌ য়্যাণ্ড লিজেণ্ডস্‌) উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যাস্কের উল্লেখ থাকায় মনে হয় যাস্কের নিরুক্ত রচনার পরেই এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অনুমান করেন যে শৌনক নামধেয় ব্যক্তির রচিত বৃহদ্দেবতা নামীয় বৈদিক সূচী পুস্তক খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য এই পুস্তকটি দুইখণ্ডে "হারভার্ড ওরিয়েন্টেল সিরিজ" নামক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডে মূল সংস্কৃত ও দ্বিতীয়খণ্ডে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ কৃত ইংরাজী অনুবাদ ও টিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল (৫)। ইহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেলের "বৈদিক ব্যাকরণ" (ভেডিক্‌ গ্রামার) প্রকাশিত হয়(৬)। বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি

পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ব্যাকরণ রচনায় ইতিপূর্বে আর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। পূর্বাচার্যেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি পর্যায় রূপের বৈদিক ব্যাকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫০ হইতে ৯১১০ খৃষ্টাব্দে এই ষষ্টি বর্ষকাল যাবৎ বৈদিক ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা প্রসূত যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই বৈদিক ব্যাকরণটি রচনা করেন। এই ব্যাকরণ রচনায় ম্যাক্‌ডোনেলের অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য এই পুস্তকের একটি সহজ পাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়(৭)। ছাত্রদের সুবিধার জন্য ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ঋগ্বেদের ৩০টি সূক্ত ইহাদের ইংরাজী অনুবাদ, শব্দার্থ ব্যাখ্যা ও টিকা সহ একটি পুস্তক সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন (৮)। বৈদিক সাহিত্য ও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন শিক্ষকের অপ্রাচুর্য হেতু বেদপাঠার্থী ছাত্রদের অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া ছাত্র পাঠ্য বৈদিক ব্যাকরণ ও পাঠিকা (রীডার) রচনার কাজে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ নিজের অমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। উচ্চ কোটির পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের গবেষণাতেই নিজেদের শ্রম ও সময় নিয়োগ করিয়া থাকেন শিক্ষার্থিদের জন্য পুস্তক রচনা করা তাঁহারা পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যার সাগর হইয়াও ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনাতেই তাঁহার জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত করিয়ছিলেন—এই সময় উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় বা গবেষণায় নিয়োগ করিলে পণ্ডিত হিসাবে তিনি আর ও কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে নিজের ভূতপূর্ব ছাত্র ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক আর্থার ব্যারিডেল কীথের সহযোগিতায় ম্যাক্‌ডোনেল "ভেডিক্‌ ইনডেক্স অফ্‌ নেমস্‌ য়্যাণ্ড্‌ সাবজেক্টস্‌" নামে একটি পুস্তক দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক তথ্যাবলী বিচার এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য(৯)।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ভারতে আসেন। ভরতের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্বীয় স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রত্ন-দ্রব্য সমূহ পর্যবেক্ষন করাই ছিল তাঁহার ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভারত পর্যটনান্তে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ লণ্ডন, অক্সফোর্ড, এবার্ডিন প্রভৃতি স্থানে ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্‌ডোনেলকে তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে "ষ্টিফেনস্‌ নির্মলেন্দু ঘোষ স্মারক" বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানান। অতঃপর ম্যাক্‌-ডোনেল ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভারতে আসিয়া এই বক্তৃতামালার বিষয় হিসাবে ৮টি ভাষণ দান করেন। ম্যাক্‌ডোনেলের বক্তৃতার উপজীব্য ছিল আদিযুগের ধর্ম (প্রিমিটিভ রিলিজন), চীন ও পারসীক ধর্ম, ভারতের সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, গ্রীকদেশের ধর্ম, ইহুদীধর্ম (জুডাইজ্‌ম), মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম। বক্তৃতাগুলি আরম্ভ করিবার পূর্বে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তিনি ভারতের মৃত্তিকাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার শৈশবের স্মৃতিতে গঙ্গা-শোন-গণ্ডক বিধৌত অঞ্চল উজ্জ্বল হইয়া আছে। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার পিতা ও কয়েকজন মাতুল এই দেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনেলের এই বক্তৃতামালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়(১০)। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্‌ডোনেল্‌কে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করিয়া সম্মানসূচক ডি.

সি. এল্‌ (ডক্টর অফ্‌ সিভিল ল) উপাধি দান করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতার এশিয়াটিক্‌ সোসাইটি তাঁহাকে "ফেলো" মনোনীত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে মূল্যবান গবেষণার জন্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখা ম্যাক্‌ডোনেলকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "ক্যাম্বেল স্মৃতি পদক" দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "ভেডিক্‌ হিমস" নামে ম্যাক্‌ডোনেলের একটি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়(১১)। ইহার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌-ডোনেল্‌ রচিত "ভারতের অতীত" (ইণ্ডিয়াস্‌ পাষ্ট) নামীয় পুস্তক অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়(১২)। এই পুস্তকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ে এ যাবৎ জ্ঞাত তথ্যাবলী সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ম্যাক্‌-ডোনেলের এই পুস্তকটি ভারততত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের নিকট অপরিহার্য রচনা।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইণ্ডিয়ান্‌ ইনষ্টিটিউট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ম্যাক্‌ডোনেল্‌। ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব গৃহের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বোডেন অধ্যাপক পদাধিকার বলে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ (কীপার) হন। এই ইনষ্টিটিউটে ম্যাক্‌ডোনেল প্রায়ই ভারত বিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার যত্নে ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই পাঠাগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠাগার "বডলেয়ন লাইব্রেরীর" অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। প্রথমবার ভারত ভ্রমণকালে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ কাশীতে একটি হস্তলিখিত পুঁথিশালার সন্ধান পান। এখানে ৭,০০০ সংস্কৃত পুঁথি ছিল। এই সংগ্রহের অধিকারী পুঁথিগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের অনুরোধে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অর্থে এইগুলি ক্রয় করিয়া অক্সফোর্ডে প্রেরণ করেন। এইভাবে বডলেয়ন লাইব্রেরীতে ম্যাক্‌ডোনেলের জীবদ্দশায় সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা দাঁড়ায় দশ সহস্র। বর্তমানে বডলেয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ইউরোপের মধ্যে বৃহত্তম। অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমুল্লারের বৈদিক গবেষণার উত্তরা-ধিকারী ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ম্যাক্সমুল্লারের পরলোক গমনের পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ যে ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহার পরিচালক নিযুক্ত হন। এই পদে আসীন থাকা কালে তিনি এই ধনভাণ্ডার হইতে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। জাপানী ভারততত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক তাকাকুসুর সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান এই ধনভাণ্ডারের সহায়তায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। গবেষণায় ছাত্রদিগকে উৎসাহ দান অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ছাত্রদের সহিত তিনি সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পরিচিতদের নিকট ম্যাক্‌ডোনেল অতিশয় সচ্চরিত্র ও সজ্জন বলিয়া বিবেচিত হইতে। সদা প্রসন্নতা ম্যাক্‌ডোনেলের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল মেরী লুসী নাম্নী এক উচ্চবংশ সম্ভূতা সুন্দরী রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের দুইটি কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেলের পুত্র অতি তরুণ বয়সেই প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে নিহত হন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ম্যাক্‌ডোনেলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়—ও ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতে থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ হইতে তিনি ইচ্ছা পূর্বক অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঋগ্বেদের গদ্যানুবাদ কার্য আরম্ভ করেন কিন্তু অত্যধিক রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য উহা সম্পন্ন

করিতে পারেন নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর অক্সফোর্ডে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্‌ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অক্সফোর্ডের হোলিওয়েল সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। ম্যাক্‌ডোনেলের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নী ও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহাকে ও ম্যাক্‌ডোনেলের শয্যাপার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছিল।

---

(১) Sarvanukramani—Ed. by A. A. Macdonnel, Oxford, 1886.

(২) Sanskrit-English Dictionary—London, 1892.

(৩) Vedic Mythology—Strossburg, 1897.

(৪) History of Sanskrit Literature—London, 1900.

(৫) Brihaddevata—(2 Vols.), Harvard Oriental Series, 1905.

(৬) Vedic Grammar—Strassburg, 1910.

(৭) A Vedic Grammar for Students—London, 1916.

(৮) A Vedic Reader for Students,1917.

(৯) Vedic Index of names and subjects in collaboration with A. B. Keith—London, 1912.

(১০) Lectures on Comparative Religion, A. A. Macdonnel—Calcutta University, 1925.

(১১) Vediv Hymns.—Calcutta, 1925.

(১২) India's Past—Oxford, 1927.

শিল্পের ধ্যান ও দা ভিঞ্চির ছবি

অমলেশ ভট্টাচার্য

শিল্পী-পিকাশোর একখানি সূর্যাস্তের ছবি দেখে তাঁর এক অনুরাগী বন্ধু মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেছিলেন যে এমন সূর্যাস্ত তিনি জীবনে দেখেননি। এই বিস্ময়োক্তির মধ্যেই শিল্পের মর্ম পাওয়া যাবে। শিল্পীর তুলিতে রূপই অপরূপ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত চেনা জিনিষ হঠাৎ নতুন ক'রে চিনি। আমরা অবাক হয়ে দেখি পরিচিত দৃশ্যের সীমানা ছাড়িয়ে এক অজানা বিস্ময়ের ইসারা ফুটেছে। পূর্বের পরিচয়কে ছাপিয়ে এক নতুন অজানার ঝলক লেগেছে। মনে মনে বলি—এমনটি ত' আর দেখিনি।

আমাদের প্রত্যহের জানাচেনার মধ্যে কিসের যেন এক দুস্তর ব্যবধান র'য়ে গেছে। এই ব্যবধানকে জয় করাই আর্টের সাধনা। তাই হাতে ক্যামেরা থাকতেও আমরা ছবি আঁকি। দৃশ্যের মাঝে অদৃশ্যকে দেখব ব'লে। মন যখন কথা হারায় তখন আসে কাব্য। চোখ যেখানে যায় না শিল্পীর দৃষ্টি সেখানে ছবি আঁকে। তিনি আমাদের চোখের আড়াল সরিয়ে দিয়ে বিষয়ের মর্মসত্যকে ব্যক্ত করে ধরেন। আত্মার আনন্দকে ফুটিয়ে ধরেন।

সকল বস্তুরই-স্থূলরূপের পশ্চাতে একটি পরমাশ্চর্য্য সুষমার জগৎ রয়েছে। আমরা সাধারণ চোখে দেখতে পাইনে। কিন্তু শিল্পী তাঁর তৃতীয় নয়নে দেখেন। আর দেখেন বলেই একটা সামান্য প্রস্তর কখন অপূর্ব সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে তাঁর হাতের স্পর্শে। একটা নগণ্যপট—কখন জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর তুলির ছোঁয়ায়। বস্তুরূপের পশ্চাতে শিল্পরূপের দ্যোতনাটুকু ফোটাবার জন্যই হয়ত এ্যাঞ্জেলো তাঁর শিলামূর্তির স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ রেখে দিতেন। তাই আমাদের দেশে শিল্পের ষড়ঙ্গের মধ্যে প্রথমেই বলা হয়েছে 'রূপভেদ',—অর্থাৎ শুধু বিষয়রূপ নয়, বিষয়ের গভীরতম অর্থ, যেটা তার আত্মরূপ।

শিল্প তার চারিপাশে একটা ধ্যানের মণ্ডল সৃষ্টি করে। তার রূপের গড়নের চেয়ে ধ্যানের গরিমা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে। চিত্র তখন চিত্তের মাঝে আপন সমাহিতিতে মিশে যায়। শিল্প সাধনা তাই এক রকমের যোগ সাধনা। ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তির শুধু মাত্র গঠন রূপ দেখে আমরা কতটুকু আনন্দ পাব যদি না তথাগতের সেই ধ্যান মৌন সমাহিতি অনুভবের মধ্যদিয়ে না দেখি! অথবা যদি আমরা নটরাজের প্রলয় নৃত্যের মূর্তি দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাব মূর্তিটির গঠনরূপকে ঘিরে রয়েছে মহাকালের এক রুদ্র ভয়ঙ্কর শক্তির উল্লাস। শিল্পের এই ধ্যানের গণ্ডী এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে তাকে নির্দেশ ক'রে দেওয়া যায় না। —একখণ্ড সাদা কাগজে নিখুঁত কয়েকটি কালির আঁচড় টেনে আচার্য্য নন্দ-লাল শান্তিনিকেতনের উধাও প্রান্তর আর উদাসীন আকাশকে ধ'রে দিতে পারেন, কারণ তিনি সেই উদার ব্যাপ্ত আকাশ ও প্রান্তরের বিরাট গম্ভীর বিস্তারকে নিজের আত্মার ধ্যানরূপেরই অনুসঙ্গ ক'রে তোলেন। যে অসীমকে কোন সীমা দিয়ে মাপা যায় না তাকে একমাত্র ধ্যানের মধ্যেই ধরা যায়। তাই সব শিল্পই শিল্পীর ধ্যানসাক্ষী। এই ধ্যানরূপ কখন স্থির, কখন চঞ্চল। ছবির মধ্যে আছে আত্মার প্রকাশময়ী লাস্যরূপ। একটা সাবলীল খরতা। রঙ মাত্রেই চঞ্চল আনন্দের বর্ণাভাস। একটা প্রচ্ছন্ন সংযম তাকে সুমিতি দিয়ে ধ'রে রেখেছে। শিল্পের

আলঙ্কারিক নাম যার 'প্রমাণ'। তাই ছবি যখন একটা নীরব, নিঃশব্দ রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চায় তখন রঙের ব্যবহার ততবেশী আবছায়া হয়ে আসে। যেমন নন্দলালের 'উমার তপস্যা' চিত্রটি। উমার তপস্বিনী, ধ্যানী, সর্ব্বরিক্তা রূপটি ফোটাতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ একটি ধূসর বর্ণের আবছায়া আভাস মাত্র দিয়েছেন। কেন না ছবির সেই ভাবরূপের কাছে সন্ন্যাসীর গৈরিকও অত্যন্ত বিলাস বলে মনে হ'ত। চিত্রের ভাবরূপের সঙ্গে বর্ণের এই অনুপাতকে বলা হয় 'বর্নিকাভঙ্গ'। এরই মধ্যে এসে অব্যক্ত সুষমা ব্যক্ত হয়। ছবির ধ্যানরূপের আভাসটা বিভাস হয়ে ওঠে। ফুল ফোটার সঙ্গেই যেমন তার আত্মার লাবণ্যটুকুও বিকশিত হয়। মায়ের মুখের হাসির মধ্যেই মাতৃত্বের দিব্য লাবণ্য যেমন আপনিই টল্‌মল্‌ করে। বিষয়ের রূপটা তাই গভীরতম আনন্দ হিল্লোলের একটি আবরণ। ধ্যানের একটি মুদ্রা। ছবির রেখা ও রঙে শিল্পীর ধ্যান পুষ্টির বর্ণটাই প্রতিফলিত হয়। আত্মার মহিমাই বর্ণতরঙ্গে ছবি হয়ে যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিল্প দৃষ্টির ঝোঁক প্রধানত প্রকৃতির বহিরাঙ্গ রূপের দিকে। প্রকৃতিই তাদের মডেল। তাদের কল্পনার বিস্তার মুখ্যত অনুলিপির মধ্যে। Realism এবং Naturalism প্রভৃতি নানা নামে তারই গর্ব্ব ক'রে আসা হয়েছে। পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আবির্ভাবে ধন্য ইতালীও তার ব্যতিক্রম নয়। এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীর শিল্প রেনেশাঁর শুরু পর্য্যন্ত এই একই দৃষ্টিভঙ্গী বাহ্য জীবনের নিষ্প্রাণ অনুকরণের মধ্যে পর্য্যবসিত ছিল। এক মাত্র দা ভিঞ্চির মধ্যদিয়েই ইতালীর চিত্রশিল্প ধ্যানদৃষ্টি লাভ করে। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্পী তাকেই ফুটিয়ে তোলা তাঁর সাধনার লক্ষ্য ছিল। তাঁর ছবি আত্মোপলব্ধির জ্যোতির্লেখা।

পঞ্চদশ শতাব্দী ইতালীর শিল্প জগতে এক দ্বন্দ্বের কাল। এক দিকে পিসানেল্লো, ভন্‌ ঈক্‌ ও তাঁদের অনুগামী অন্যদিকে বেল্লিন, পেরুগিনো, মেমলিং প্রভৃতি। ভেনিস নগর তখন এক অবক্ষয়ের মধ্যে। দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলাসী অমাত্যদের হাতে। কৃতদাস প্রথা মানব জীবনের মূল্যকে এক ঘৃণিত অবস্থার মধ্যে এনেছে। অভিজাত সমাজের মন গোঁড়া রক্ষণশীল। চিরাভ্যস্ত নিয়মের মধ্যেই তাদের স্বস্তি। সর্ব্ব প্রকার অভিনবত্বে তাদের বীতরাগ। নতুন পথে চলতে তাদের ভয়। চিত্রেও তাই এই বিলাস ও জাঁক জমকের ছাপ। গাঢ় রঙ, প্রচুর অলঙ্কার আর মাত্রাতিরিক্ত রূপসজ্জা না হ'লে ছবি হ'ত না। এমনকি ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুর কারুণ্যের পশ্চাদ্‌পটে সোনালী ফুল, লতাপাতা আর উজ্জ্বল ঝর্ণা আঁকা হ'ত। এতে চিত্রের মূল আবেদনের ভারসাম্য হারায়।

এই স্থবির বিলাসিতার মোহভঙ্গ ঘটাতে শিল্পী সাভোনারোলার দান অনেকখানি তাঁরই প্রেরণায় দেশময় এক তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। তিনি চিত্রে নিতান্ত বাহ্য অনুকৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে দেশে এক জাগরণ আনেন। ফলে গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি আঁকা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এই জন্য অনেকে তাঁকে শিল্পক্ষেত্রে কালাপাহাড় বলে থাকেন। কিন্তু আসলে তিনি চিত্রাঙ্কনে বিষয়ের বাহ্যরূপের চেয়ে তার আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। বাইজান-টিয়ন রীতিতে ভাবলেশহীন দেবমূর্তি এঁকে দেবত্বকে ক্ষুণ্ণ করার বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর প্রতিবাদ।

এই আন্দোলনের ফলে পরবর্তী শিল্পীদের দৃষ্টি কিছুটা অন্তর্মুখী হল। শিল্প-কৃতির মধ্যে কিছু কিছু বিষাদ, চিন্তামগ্নতা মানসিক ভাব ও আবেগ ফুটতে লাগল। বিশেষ ক'রে বেল্লিন, পেরুগিনো ও মেম্‌লিং-এর মধ্যে। শিল্পের এই অন্তর্মুখীনতা তখন নানা-

প্রকার রীতিগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। ছবির গঠন ও বিন্যাস, রঙের ব্যবহার, বিভিন্ন রঙ ও তাদের ভাববাহীতার বৈশিষ্ট্যজনিত প্রশ্ন, এক কথায় শিল্পের ধ্যান ও শৈলীগত যাবতীয় জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়।

তখন দা ভিঞ্চির মত বিরাট দেবোপম ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় (১৪৫২ খৃঃ)। তাঁর জীবন অসীম অধ্যাত্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রখর বাস্তব জ্ঞানের এক অপূর্ব রসায়ন। জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁর জাগ্রত চেতনায় উদ্দীপ্ত। যখন কোন যুদ্ধের ছবি তখন যুদ্ধের যাবতীয় বীভৎসতা, ভয় ও উন্মত্ততাকে তিনি অনায়াসে ফোটাতে পারেন। আবার এক গুচ্ছ তৃণের সবুজ পেলবতা, তার শান্ত ও মৃদু ভাবটাও সমান ভাবে মূর্ত ক'রে ধরতে পারেন। সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় কল্পনায় তিনি যেমন আইডিয়ালিষ্ট আবার বস্তুরূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তিনি তেমনি রিয়েলিষ্ট। বস্তুরূপের বাইরের গঠন নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তাঁর অন্বীক্ষা খুঁজেছে গভীর মর্মের বিচিত্র গঠনের স্বরূপটি।

গানের সুর যেমন বিচিত্র হিল্লোলে সংগীতের ভাবটিকে পরিস্ফুট ক'রে তোলে, রঙের মধ্য দিয়ে ছবির ভাবটিও তেমনি ক'রেই অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী হিসাবে দা ভিঞ্চি এটা জানতেন। হৃদয়ের এক একটি ভাব এক একটি বর্ণের আভা নিয়ে মুখে প্রতিফলিত হয়। সকল অনুভবের ছাপ প্রতিটি অঙ্গে রেখায়িত হয়ে ওঠে। চোখে মুখের এই আলো আঁধারীর বর্ণাভা থেকেই ছবির রঙ এবং দেহভঙ্গীর প্রতিটি রেখা থেকেই ছবির রেখা টানতেন তিনি। নানা রকমের পর্য্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এগুলো তিনি আয়ত্ব করেছিলেন। শোনা যায় আসামীকে যখন প্রাণদণ্ডের সময় বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ত তিনি তখন অলক্ষ্যে অনুসরণ করতেন, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখতেন কেমন ক'রে আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্ক ও ভয় চোখে মুখে আলো আঁধারী বিস্তার করে। গ্রামের চাষীদের ডেকে নিয়ে গল্প করতেন আর লক্ষ্য করতেন তাদের নানা অনুভূতিতে দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্য। অবাধ মুক্তির আনন্দ পাখীর ডানায় কী উল্লাস সৃষ্টি করে তা' দেখবার জন্য বাজার থেকে খাঁচায় পোরা পাখী কিনে কিনে তিনি আকাশে উড়িয়ে দিতেন, উড়িয়ে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেন। এইভাবে জীবনের প্রতিটি গতিভঙ্গীর পশ্চাতে এক গভীর বিপুল ছন্দের যোগকে তিনি আবিষ্কার করেন। দা ভিঞ্চির ছবির আবেদন তাই শিল্পের ভাব বস্তুকে ব্যক্ত করেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, উৎকৃষ্ট কবিতার চরণের মত বার বার নতুন নতুন ভাব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। এটাই হল শিল্পের, পুনর্ভব শক্তি। চিত্রিত ক'রে যেটুকু ধরেছেন, চিত্রিত না ক'রে তার চেয়েও যেন বেশি অনুভব করিয়েছেন।

গ্যেটে বিস্মিত হয়ে তাই একবার বলেছিলেন যে দা ভিঞ্চির ছবির প্রতিটি অঙ্গ যেন কথা বলে। যেমন তাঁর 'ম্যাডোনা অব দি গ্রোটো' ছবির দিকে তাকালে, ম্যাডোনার চোখের পরমাশান্তি আর সুন্দর স্নিগ্ধ দৃষ্টির বিস্ময়ই কেবল আমাদের অভিভূত করে না, আমাদের নির্বাক করে দেয় দেবদূতের অপূর্ব ভঙ্গিটি। মনে হবে কাছে থেকেও অনেক দূরে। ম্যাডোনার শিশুর দিব্য জ্যোতি তাঁর মুখে পড়েছে এবং তিনি নিবিড় দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চেয়ে আছেন কিন্তু কোন দূরাগত সংগীতের সুর যেন তাঁকে মগ্ন ক'রে রেখেছে। এমন কি আমরাও বুঝি তার রেশটুকু শুনছি আবার হয়ত শুনছি না। মনে হবে শিল্পী স্বয়ং নেপথ্যে এক মধুর সুরে বাঁশি বাজাচ্ছেন—যেমন ক'রে তিনি একবার বাঁশি বাজিয়ে বিহ্বল ক'রে দিয়েছিলেন মিলানের রাজসভা এবং রাজাকে। ম্যাডোনার মুখের শান্তি, চোখের দীপ্তি, হাসির আভা যেন আপনা হতেই রঙের মত তরল হয়ে ছবি হয়ে গেছে। ছবির বর্ণ-বিন্যাসে এ এক অপার বিস্ময়।

আবার গঠন রীতিও লক্ষ্য করবার মত। প্রথমে জ্যামিতির সমবাহু ত্রিভুজের মত তিনটি মূর্তির ছক বেঁধে নিয়ে তাকে আলোছায়ার সন্নিপাতে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিতে জ্যামিতিক মাপ প্রয়োগে স্থাপত্যের মত তিন মাত্রার সৌষ্ঠব শুধু দা ভিঞ্চিই প্রথমে এনেছেন। এটা তাঁর সব ছবিতেই একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। একটা ছবিতে অনেকগুলি মানুষের চিত্রাবলী দিতে হ'লে, ছবির সংহতি রাখবার জন্য তিনি স্থাপত্য রীতিতে আলাদা আলাদা unit ক'রে তাদের মধ্যে একটা নিখুঁত সমতা সৃষ্টি করতেন। তার ফলে একসঙ্গে অনেকগুলি পরস্পর বিরোধ ভাব ও আবেগকে নিয়ে তিনি অনায়াসে তীব্র নাটকীয় আবেদন আনতে পারতেন। যেমন তাঁর একখানি বিখ্যাত ছবি 'দি লাস্ট সাপার'। এতে নৈঃশব্দ, বিষাদ, বেদনা, শান্তি, ঔৎসুক্য, ঘৃণা, ত্রাস, আগ্রহ, প্রশ্ন ইত্যাদি একই সঙ্গে অনেকগুলি ভাব ফোটান হয়েছে। —খৃষ্ট তাঁর বারজন শিষ্য নিয়ে ব'সে আছেন। স্থির, শান্ত, নীরব তাঁর ভঙ্গী। আনত দৃষ্টি। হাত দু'খানি শিথিল ভাবে সামনের টেবিলে প্রসারিত। তিনি মাত্র একটি কথা বলে নীরব হয়ে আছেন,— "তোমাদের মধ্যেই একজন আমাকে প্রতারণা করবে—" পরম ক্ষমায় তিনি নির্লিপ্ত। আর শিষ্যেরা কেউ স্তম্ভিত, বিস্মিত, ভীত। এক এক জনের মুখের এক এক ভাব। কিন্তু সব ছাপিয়ে রয়েছে খৃষ্টের মৌন প্রশান্তি।

এই চমৎকারিত্বের তুলনা হয় না। এর পনের বছর আগে পিরলাণ্ডোর আঁকা একই ছবি মনে হবে নিষ্প্রাণ, আড়ষ্ট। এই দুইটি ছবির পার্থক্য লক্ষ্য করলেই দা ভিঞ্চির রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যাবে।

প্রথমে কক্ষের পরিসরকে সংকোচ করে এবং যিশুর স্থান কেন্দ্রে দিয়ে তিনি দর্শকের দৃষ্টি একমাত্র আকৃতিগুলির উপর নিবন্ধ রেখেছেন। স্থাপত্য রীতিতে বারো জন শিষ্যের যিশুর দুই পাশে ছয় জন ক'রে বসিয়ে, উভয় পাশে প্রতি তিনজনে একটি ক'রে ইউনিট তৈরী করেছেন। যাতে এতগুলি ব্যক্তির ভিঁড়ে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে না যায়। বিভিন্ন ভাব এক একটি ইউনিটকে সংহতি দিয়েছে। সেই সঙ্গে চলছে আলোর খেলা। খৃষ্টের পশ্চাদ-পটে জ্যোতির্লেখা আলোকোদ্ভাসিত দুয়ার। ঊর্ধ্বের এক প্রান্ত থেকে বিকীর্ণ আলোর ছটা পড়েছে ঘরে। প্রত্যেকের মুখে সেই আলো। আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে শুধু যুডাস্। তার মুখ অন্ধকার। (যুডাসের বিশ্বাসঘাতকতার এ এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা।) সেন্ট-জনের মত পরম ভক্তের পাশে বসান হয়েছে চরম বিশ্বাসহন্তা যুডাসকে। দুই বৈপরীত্যকে মিলিয়ে দা ভিঞ্চি এখানে এক বিস্ময়কর নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন। গতিভঙ্গির পশ্চতেও আবার এক নিখুঁত বিন্যাস কৌশল রয়েছে। দুই প্রান্তবর্তী যারা তাদের গতি স্থির। ক্রমশঃ প্রত্যেকের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়ে চলেছে মুখভঙ্গী ও দেহের উৎক্ষেপের মধ্য দিয়ে। এই সমগ্র আলোড়নকে আবার ধরে রয়েছে কেন্দ্রস্থলে যিশুর পরম শান্তি।

দা ভিঞ্চি সৃষ্টি লীলাকে দু'চোখ ভ'রে দেখেছেন এবং তাঁর ছবির মধ্যে আমাদেরও দেখিয়ে ধন্য করেছেন।— আর্টের সাধনা কী—এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেখো, তবেই দেখতে পারবে। সৃষ্টির লীলা চারদিকেই আছে, এই সহজ সত্যটি যদি শিল্পী আজও আবিষ্কার করতে না পেরে থাকে, পুরাণ কাহিনীর পুঁথির মধ্যে, প্রাচীন রাজপুতনার পটের মধ্যে যদি সে দেখার জিনিষ খুঁজে বেড়ায়, তাহলে বুঝব কলা সরস্বতীর পদ্মাসন তার মনের মধ্যে বিকাশিত হয়নি।" (যাত্রী) এইভাবে ভারতীয় শিল্পের অধ্যাত্ম দৃষ্টিও বিষয়ের বাহ্য এবং অন্তরকে মিলিয়ে দেখেছে। একটার জন্য আর একটাকে উপেক্ষা করেননি। দা ভিঞ্চির দৃষ্টিও যেন সম্পূর্ণ ভারতীয়।

কিন্তু শিল্পে এই দেখা ও দেখানো বলতে আধুনিক শিল্পীরা একটু যেন অন্যরকম বোঝেন। যার উপর ভিত্তি ক'রে আর্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যটুকু সংক্ষেপে এখানে ইঙ্গিত করা বাঞ্ছনীয়।

কেউ বলেন—আদিম গুহা চিত্রের যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত শিল্পীর দেখার সঙ্গে বস্তুর যথাযথ রূপের মধ্যে একটা ব্যবধান চিরকালই রয়েছে। আমরা কোন কিছুর সবটা দেখি না, কোন বিশেষ বিশেষ অংশের গড়নের ভঙ্গী দেখি। বিভিন্ন রঙের আভা এবং তাও পৃথক পৃথক ভাবে নয়, সবটা একসঙ্গে জড়িয়ে একটা চকিত অনুভূতির ছাপ বা ইম্‌প্রেশনের মত দেখি। রঙের অংশ মোলায়েম ভাবে হাল্‌কা হয়ে একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যায় না, রঙের বিভিন্নতা গুলো তীব্রভাবে দৃষ্টিতে ঝলকে ওঠে মাত্র। তাই পিকাসো ছবিতে বেহালা আঁকেন, বেহালার একটা একটা অংশ ছিন্নভিন্নভাবে ছড়িয়ে। অর্থাৎ ছবিটা আঁকা হবে না, যেটা আঁকা হবে তাকে অবলম্বন ক'রে দ্রষ্টার মনে ছবিটা আপনিই চিত্রায়িত হয়ে উঠবে।

কেউ বলেন—দৃশ্যবস্তু শিল্পীর চোখে একটা ঘন ক্ষেত্র কিউবিক ফর্ম বা স্তম্ভবৎ ক্ষেত্রের মত (সিলেণ্ডার) প্রতিভাত হয়। কোন বস্তুর আবেদন তার এই ঘনত্বের আকারে (প্যাটার্ন) ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই সত্যকার আর্ট।

আবার কেউ বলেন,—ছবির সারল্য ও স্বচ্ছতা নির্ভর করে শিল্পমনের বিচারশীলতাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে। কতটুকু আঁকব আর কতটুকু আঁকব না, কোথায় কোন মাপের তারতম্য, কিসে সাদৃশ্য কিসে বৈসাদৃশ্য এসকল মানসিক বিচার শিল্পীর থাকবে না। বিষয়রূপের সঙ্গে চিত্ররূপের যদি আদৌ কোন মিল না থাকে তাহলেও বুঝতে হবে সেইটাই তার সত্যকার শিল্প-রূপ। এই ধরণের দৃষ্টিকে সংক্ষেপে যথাক্রমে বলা হয়—ইম্‌প্রেশনিজম, কিউবিজম্ ও প্রিমিটি-ভিজম্। আর এ ছাড়াও আরও কিছু মতবাদ অনেকটা ঐ ধরণের বক্তব্যকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে।

অর্থাৎ এদের মতে দেখাটা প্রাথমিক ভাবে চোখের। তারপর সেটা মনের মধ্যে গিয়ে একটা রসাবেশ ঘনিয়ে তোলে এবং শিল্পী তখন সে অনুভূতিকে পুনরায় চোখের-দেখা-রূপের মধ্যে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিল্পদৃষ্টি হল একটা 'ভিশ্যন্'। রূপ ও ভাব একই সঙ্গে যুগপৎ ঝলকে ওঠে চেতনায় বিদ্যুৎদ্যুতির মত। সেই হঠাৎ আলোর ঝল্‌-কানিকে কবি ব্যক্ত করেন কাব্যে। চিত্রকর ব্যক্ত করেন চিত্রে। গায়ক প্রকাশ করেন গানে। কোনটা থেকে কোনটা পৃথক নয়। ছবি, গান ও কাব্য পরস্পর সম্পৃক্ত।১ কালিদাস যখন বলেন,—'ভাগিরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ' তখন আমরা যেমন কাব্য শুনি, তেমনি আবার একখানি চমৎকার ছবিও দেখি। রাগ ও রাগিনীতে যেমন ধ্বনি আছে, তেমনি আছে রঙ। শাস্ত্রে রাগকে বলা হয়েছে,—'রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ উদাহৃত'—চিত্তের আন-ন্দকে বর্ণময় করাই তার কাজ। রাগ আর রূপ তাই অভিন্ন। ভৈরোঁ যেমন একটি রাগ তেমনি আবার ভোর বেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণের ছবি। সুরের নিবিড়তা আর ছবির ঘনত্ব এক জিনিষ।১

শিল্পদৃষ্টি হল এক অভিন্ন সাক্ষাৎ দৃষ্টি। ভারতীয় সিদ্ধকাম ঋষিদের তাই বলা হত সত্যদ্রষ্টা। এ দৃষ্টি চক্ষুর অতীত। উপনিষদ তাকেই বলেছে—'যচ্চক্ষুর্ষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।'

শিল্পদৃষ্টির এই চকিত বিস্ময়কে আধুনিকরা যদি ইম্‌প্রেশন বলে তর্জমা করেন

ক্ষতি নেই। কিন্তু এটা সত্য যে এই ইম্‌প্রেশনের মধ্যে কোন ছেদ নেই। তার গতি আলোর মত বিরামহীন-যতিহীন। ভাব যখন ছবি হয় তখন তার বিচার ছবি বলেই। অর্থাৎ ভাবের দৃশ্যমান মহিমা বলেই। ভাবকে দৃশ্যমান ক'রে তোলাটাই ছবি আঁকা। কেবলমাত্র আভাস দেওয়া নয়, উদ্ভাসিত করা।

ধরা যাক কোন কিছুকে দেখবার সময় আমরা আলো ছায়া যে হাল্‌কা হয়ে একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে যাচ্ছে এটা দেখি না অথবা তার সবট দেখিনা, রঙের বিভিন্নতাও দেখি না। কিন্তু এটা সত্য যে আমরা একটা রূপের প্রকাশ দেখি। এই দেখার মধ্যে আবার স্পর্শবোধ (টেক্স্‌চার) এবং তলগত পার্থক্যবোধ (রিলিফ্‌) মিশে আছে। এখন এই প্যাটার্ন, টেক্সচার ও রিলিফ্‌কে ফোটাতে গিয়ে যদি আলোছায়া এবং দৃশ্যাতিরিক্ত রূপের বিন্যাসের প্রয়োজন হয় তাহলে বুঝতে হবে ছবিতে সেটা অপরিহার্য অঙ্গ। কারণ দৃশ্যাতিরিক্তকে বর্জন করা এক প্রকার অসম্ভব। দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্যাতীতকে দেখার সাধনাই ছবি আঁকা। তাই যদিও দেহের মধ্যে আমরা রেখা বা রঙ দেখিনা, শুধুমাত্র একটা উদ্ভাস দেখি। তবু ছবিতে রঙ ও রেখা বাদ দেওয়া যায় না।

চিত্রাঙ্কনের এই সকল আধুনিক তর্ক বিচার শুরু হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করি লিওনার্দ অনেক শতাব্দী আগে বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করেছেন। শিল্প সাধনার মধ্যে তার উত্তর খুঁজেছেন এবং উপলব্ধি-সত্যকে লিখে গেছেন।২

মুহূর্ত্তের ক্ষণসঞ্চারী ভাবচ্ছবিকে ছিন্নভিন্নভাবে রেখার চাঞ্চল্যে ধরার অক্ষম চেষ্টার নাম ছবি আঁকা নয়। সমগ্র আকাশজোড়া মেঘের সঞ্চারের মত বিশ্বজীবন ব্যাপী সৌন্দর্য্যের মহান ব্যাপ্ত পটভূমি। অবশ্য তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাষ্পকণার ইতিহাস। সে কথা মনে রেখেই তাদের বিশাল অম্বরে বিপুলভাবে ঘনিয়ে ওঠার আয়োজনকে রূপ দিতে পারলে তবেই সত্যকার মেঘের ছবি আঁকা হবে। নইলে মেঘ না হয়ে হবে রঙমাখা তুলির দাগ। এইভাবে অসংখ্য রূপের মধ্যে বিচিত্র গতিভঙ্গীমা খেলছে আবার তাদের ধ'রে রাখছে স্বতন্ত্র, স্থির এক একটি ভারকেন্দ্র। দেহের সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে শিল্পী দেখেন বিচিত্র গতি ছন্দের মিলিত মূর্চ্ছনা। দা ভিঞ্চিই প্রথম এই গতি ছন্দকে এবং তার মাঝে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক পরিমিতিকে আবিষ্কার করেন। তাঁর মতে আর্টের চারুতা নির্ভর করে নির্ভুল গণিতের জ্ঞানে।৩

সৃষ্টির রূপরহস্যের যত গভীরে তিনি তাকিয়েছেন ততই গভীরতর আর এক রহস্যের দ্বার তার চোখের সামনে খুলে গেছে। তাঁর এই দুর্গম রূপাভিসারের অক্লান্ত পদচিহ্ন আমরা দেখতে পাই অসংখ্য স্কেচ্‌, কার্টুন আর ষ্টাডিতে। সে তুলনায় তাঁর সম্পূর্ণ ছবির সংখ্যা কত সামান্য। এই থেকেই মনে হয় তিনি যত বড় শিল্পী ছিলেন তার চেয়েও বড় ছিলেন আবিষ্কারক।

ছবির মধ্যে অজানা মহত্বর কিছুকে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য তাঁর কাছে আর কিছু ছিল না। আপন তপস্যায় তিনি মানবদেহে এক সুষমার প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন প্রথম জীবনের আঁকা 'দি ভারজিন্‌ অব্‌ দি অ্যানান্‌সিয়েশন্‌' (১৪৭২ খৃঃ) ও 'জেনেভার ডি বেনসি' (১৪৭৪ খৃঃ) ছবি দুটির সঙ্গে যদি মোনালিসার (১৫০৩ খৃঃ) তুলনা করি তাহলে অতি সহজেই বোঝা যায় সৌন্দর্য্য সাধনায় কী দুরূহ তপশ্চর্য্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে।— নারীদেহের উষ্ণ কোমল পেলবতাকে প্রতীয়মান করার জন্য প্রথম দু'খানি ছবিতে বুকের কাছে জামার ভাঁজ, কুঁচি দেওয়া সেলাই এর রূঢ়তা, পশ্চাদপটের ধূসর

পাহাড়ের সামান্য আভাস এবং ঝর্ণার জলে আলোছায়ার ঝিকিমিকি, একটা রোমান্টিকতা ইত্যাদি এ সবই মোনালিসার রহস্যময় হাসি এবং তার অঙ্কন শৈলীর পূর্বাভাস। কিন্তু পূর্ব-বর্তী ফ্লোরেনটাইন রীতির প্রভাবে অলংকরণের অংশই বেশী থাকায় কেবল মনে হয় ছবি দেখছি যার সৌন্দর্য্য কেবল দেহের ত্বক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেছে। তাই রূপ সৃষ্টির দিক দিয়ে প্রথম দু'টি ছবি হিউমেন কিন্তু ডিভাইন্ নয়। সৌন্দর্য্যের দিব্য মহিমাকে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপ-লব্ধি করার তখন যেন কিছুটা অভাব রয়েছে। এর পর মিলানের যুবরাজ বন্ধু লুডোভিকোর অনুরোধে যুবরাণী গ্যালিরাণীর প্রতিকৃতি (১৪৮৩ খৃঃ) আঁকার সময় পশুদেহের সঙ্গে মানবদেহের প্রত্যক্ষ তুলনা করতে গিয়ে বিস্ময়কর ভাবে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যের আলো দেখতে পান তিনি। রাণীর কোলে রয়েছে একটি উদ্বিড়ালী (মিলান রাজ সিংহাসনের প্রতীক)। এই বঙ্কিম দেহভঙ্গী এবং তার সর্পিল দৃষ্টি এর সঙ্গে সামন্তরাল ক'রে রাণী গ্যালীরাণীর মুখ ও দৃষ্টি আমাদের চমকে দেয় পশুদেহের তুলনায় মানবদেহের সৌন্দর্য্যের বিপুল মহিমা দেখিয়ে। এ পার্থক্য যে কত ব্যাপক দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। আর এই থেকে মানুষীতনুর সঙ্গে দিব্য সৌন্দয্যের তফাৎটা আন্দাজ করা যায়। ছবিটিতে উদ্বিড়ালী যেমন কন্‌ট্রাস্‌ট্‌ এর কাজ করেছে তেমনি মোনাসিলাতে মানবিক দেহের গঠন এবং তার মধ্যে দিব্য সুষমার প্রতিফলন এনে মানুষীতনুকেই কন্‌ট্রাস্‌ট্‌ এর মত ব্যবহার করা হয়েছে।

নারীদেহের 'ভাইটালিটি', তার প্রাণতরঙ্গ যেন পশ্চাদপটের ঝর্ণাধারার মত উচ্ছ্বল হয়ে সারা ছবিতে থৈ থৈ করছে। মোনালিসার হাসির অন্তরাল দ্যুতি যেন সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়ে ঝর্ণার জলের মধ্যে ঝিক্‌মিক্‌ করে বয়ে চলেছে। দেহভঙ্গীটা যেন দর্পণ, তার উপরে অন্তরের ভাব স্পষ্ট হয়ে ঝল্‌মল্‌ করছে। ক্ষীণ অদৃশ্য হাসির কম্পন যেন ছবির আলো ছায়ার মধ্যে মিশে গিয়ে সংগীতের মত—কবিতার মত অনন্তকাল ধরে ঝংকৃত হচ্ছে। এই হাসিতে সম্রাজ্ঞীর মহিমা, সন্ন্যা-সিনীর পবিত্রতা, জলের স্বচ্ছতা আর আলোর ভাস্বরতা সব কিছু যেন মিশে আছে! দুপাশ দিয়ে কালো কুন্তল কোমল ঢেউ তুলে হাসির তরঙ্গকে ঝর্ণার মত প্রবাহিত ক'রে দিয়েছে। শিল্পীর দীর্ঘদিনের সাধনা যেন রূপ ধরেছে। দা ভিঞ্চির অন্তরের বিশ্বাসটি এখানে যেন বাণী পেয়েছে। সত্যই এ ছবি 'ফ্রোজেন্ মিউজিক্' এই হাসি ও গানের সঙ্গে মোনালিসার চোখের বাষ্পাকুল ভাবটি এক গভীর বিষাদের স্পর্শ দিয়েছে। চোখের নিম্নাংশ আঁকা হয়েছে পতিত ভাবে (হোরাইজেন্টাল)। এই গথিক রীতিতেই চোখের বাষ্পাকুল ভাবটি ফুটেছে।

সৌন্দর্য্যের আনন্দের তীব্রতার মধ্যে এক নিগূঢ় ঘন বেদনা রয়েছে। সেই বেদনা আত্ম-বিস্মৃত হয়ে অনুভবের ছায়া কুহেলীর মধ্যে পথ হারিয়ে ফিরছে।

অধরের হাসি আর চোখের দৃষ্টি এই দুই এর মধ্যে বিষাদ মিশে মোনালিসাকে আমা-দের অত্যন্ত নিকটের আবার দূরের ক'রে দিয়েছে।

অঙ্কন রীতি দেখতে গেলে দা ভিঞ্চির সবগুলি পরিচিত বৈশিষ্ট্য এখানে সার্থকতা পেয়েছে। পশ্চাদপটের ধূসর পাহাড় আবছা আকাশের মধ্যে-চোখের সীমা ছড়িয়ে মিশে গেছে। ঝর্ণার চঞ্চল গতিধারা—সব মিলে একটি 'মিষ্টিক্' আবহাওয়া যার সূচনা আমরা দেখেছি 'দি এ্যাঞ্জেল ফ্রম্ দি অ্যানান্‌সিয়েশন্ (১৪৭২-৭৩ খৃঃ), জিনেভার দি বেন্‌সী (১৪৭৪ খৃঃ) এবং ভারজিন অব্ দি রকস্ (১৪৮২-৮৩ খৃঃ) ছবিগুলিতে। জ্যামিতিক সমাম্বিবাহু ত্রিভুজের পরিমাপ সংস্থাপনা, পোষাকের ভাঁজ এবং ছবির পারস্‌পেক্‌টিভ্ গঠনের বিস্ময় এখানে এক উচ্চ-চূড় সার্থকতা লাভ করেছে।

এমন দুর্লভ শিল্প সিদ্ধি একমাত্র তাঁরই, যিনি সৃষ্টির ধ্যানসত্তাকে যোগ বলে লাভ

করেছেন। এক একখানি ছবি যেন সুকঠোর তপস্যা। নিবিষ্ট অনুশীলনে একই ছবি তিনি কতবার এঁকেছেন আবার মুছে ফেলেছেন। এই সাধক শিল্পীর সম্পূর্ণ ছবির সংখ্যা তাই বেশী নয়। তাঁর তুলিতে দেহ আত্মার আবরণ না হয়ে, হয়ে উঠেছে আনন্দের এক স্বচ্ছ প্রদীপ্ত আধার। দুঃখ নেই, শোক নেই, জরা মৃত্যু নেই—আত্মার শাশ্বত আনন্দের মূর্তি গড়েছেন তিনি।

এই জন্য 'দি লাষ্ট সাপার' ছবিতে যিশুর বিদায় কালীন শোকের ছায়া নেই, আছে এক দুর্লভ মুহূর্তের নাটকীয় মহিমা। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নির্যাতনের ছবি তিনি কখনই আঁকেননি। তিনি দেখেছেন যিশুর সর্ব্ব জয়ী দেবত্ব, তাই এঁকেছেন 'রেজারেক্শ্যন্'। মাতা মেরীও তাঁর হাতে কখনও বর্ষীয়ান হননি। দেব মাতার কি জরা স্পর্শ করতে পারে? গণিতে, বিজ্ঞানে সংগীতে, সাহিত্যে এবং চিত্র শিল্পে তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। বিজ্ঞানের সাধনা দিয়ে তিনি চিত্রশিল্পে নিখুঁত অ্যানাটমি ও যতগুলি সূক্ষ্মতর দিক সবেতেই তাঁর ছিল পূর্ণ অধিকার। এ সাধনা পূর্ণযোগীর।

১। লিওনার্দোর "পারাগন" পুস্তকে কাব্য, সংগীত ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে গভীর ঐক্যের এবং একই উৎসের কথা বলেছেন। লিওনার্দোর মতে ছবি হল 'ফ্রোজেন মিউজিক'। কিন্তু যেহেতু গানের সুর স্থির নয়, স্থায়ী নয়, তার ধ্বনি এবং চিত্ররূপ সর্বদা ভাসমান, বিলীয়মান তাই দা ভিঞ্চি গানের চেয়ে ছবিকে উচ্চ আসন দিয়েছেন। কারণ ছবিতে ধ্বনি এবং রাগরূপ স্থির হয়ে ধরা পড়ে হারিয়ে যায় না।

২। "Shadows, have their bounderies at certain determinable points. He who is ignorant of these will produce work without relief, and relief is the summit and the soul of painting."

[Trattato Della Pittura by Leonardo da Vinci (English Version) p. 121.]

আধুনিক যুগে এসে চিত্র যে একটা মূল জিজ্ঞসা নিয়ে মোড় ঘুরবে এটা তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখেছিলেন। এ সম্পর্কে বিখ্যাত শিল্প সমালোচক কেনেথ ক্লার্ক এর মন্তব্য স্মর্তব্য :—

"His notes on the perspective of colour, however, and what he calls the perspective of disappearance contain many of those acute observations in which he anticipated the doctrines of impressionism—". ['Lionardo Da Venci' by Kenneth Clark, p. 76.]

৩। লিওনার্দো, যেমন বড় শিল্পী তেমন বড় গণিতজ্ঞ। সময় সময় এই দুই সত্তার বৈপরীত্য তাঁর জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এ সম্বন্ধে Fra Pietroর পত্রাংশে আছে—

"He is working hard with Geometry and has no patience with his brush, his Mathematical experiments have go distracted him from painting that the sight of a brush puts him out of tempe''"—[Ibid.—p. 108.]

রবীন্দ্র অভিধান

সোমেন্দ্রনাথ বসু

কণিকা—১৮৯৯ সালে কণিকা প্রকাশিত হলো দু-চার লাইনের কবিতার সংখ্যাই বেশী। তবে আরও দীর্ঘ আট দশ লাইনের কবিতাও আছে। অধিকাংশ কবিতাতেই মানুষের সাধারণ দুর্বলতা-গুলিকে রূপকের আবরণে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতি বড় বড় সত্যকে অতি সহজে এই কবিতাগুলিতে বিধৃত করা হয়েছে।

কবিতাগুলি তাতে সহজসারল্য ও ভাবের স্পষ্ট প্রকাশে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ অক্ষয় মৈত্রেয়ের সমালোচনা। অক্ষয় মৈত্রেয় বইটি উপহার পেয়ে কবিকে একটি চিঠিতে লিখলেন—"আপনার কণিকা পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিলাম। কেহ কেহ হাত ঝাড়িলেই পর্বত হয় আপনার 'কণিকাই' তাহার প্রমাণ। কথায় ছোট হইলেও কাজে কম নহে, ইহাতে আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব দূর করিবে। আমরা দশজনে সন্ধ্যার ছায়ায় একত্র মিলিত হইয়া বাঙ্গলা কবিতা হাতে করিলেই বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়কে ডাকিতে হয়। জলের মত সরল, জ্যোৎস্নার মত নির্মল, প্রিয়জনের মত সুন্দর বলিয়া 'কণিকা'র কবিতা সহজেই সকলকে পুলকিত করিতে পারিবে।"

১৩০৬ সালের মাঘ মাসে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'প্রদীপ' পত্রিকায় কণিকার একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাতে এই কাব্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেনঃ— "স্বল্পাক্ষর কবিতায় সৌন্দর্য সমাবেশ করা, ভাবোদ্দীপন করিয়া চিত্ত বিনোদন করা এবং লেখকের বক্তব্য না বলিয়াও পাঠকের হৃদয় দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দেওয়া, বিলক্ষণ ক্ষমতার কথা। সুদীর্ঘ প্রবন্ধে যাহা হয় না, সংক্ষিপ্ত কবিতায় তাহা সাধন করিতে কত ক্লেশ? অথচ কণিকার কবি সহজে সরল ভাষায় স্বল্পাক্ষরে এমন কত তর্কের মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন।..ভাষার সৌন্দর্য একরূপ, তাহাতে কবিতাকে ভাবুকের নিকট মনোজ্ঞ বেশে উপনীত করিয়া দেয়। ক্ষুদ্র কবিতায় সে কৌশল বিস্তার করিবার স্থান অতি অল্প। সে অল্পের মধ্যে যিনি শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি ধন্য। কণিকার কবি এ বিষয়ে সুনিপুণ।"

রবীন্দ্রনাথের কণিকার কবিতাগুলির অনুসরণে প্রিয়ম্বদা দেবী কাব্যকণা লিখতে সুরু করেন। সেগুলি এতই সুন্দর যে রবীন্দ্রনাথ ভুল করে সেগুলি নিজের কবিতা বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গটি লেখন গ্রন্থের আলোচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

কড়ি ও কোমল—১২৯৩ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয়। এই কবিতা-গুলি সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন আশুতোষ চৌধুরী—কবির বন্ধু, প্রমথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঐ বছরেই কিছুদিন নাসিকে ছিলেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থটি সত্যেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেন।

আশুতোষ চৌধুরী ও কড়ি ও কোমল সম্পর্কে কবি বলেছেন জীবনস্মৃতিতে—"ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমলের কবিতা-গুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখায় তিনি ফরাসী কোন কোন কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমলের কবিতার ভিতর দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ

পাইতেছে।....আশু বলিলেন "তোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়া আমিই প্রকাশ করিব।" তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়াছিল। মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।" ১২৯১ সালে বৈশাখ মাসে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম যথার্থ শোকের কারণ হয়ে এলো। যে গভীর স্নেহ ও প্রীতির প্রশ্রয় তিনি বৌদিদি কাদম্বরীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তার স্মৃতি সারা-জীবন তার মনে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। কবি প্রথমে সেই মৃত্যুর আঘাতে শূন্যতার অন্ধকারে আত্ম-হারা হলেন কিন্তু প্রকৃতি যেমন বিচ্ছেদকে জয় করে তার আপন প্রাণের শক্তিতে তেমনি কবির মনেও মৃত্যু জয়ের সুর বেজে উঠলো। মরণ তাঁকে নির্লিপ্ত করলো, নিরাসক্ত করলো—প্রকৃতির এক আশ্চর্য অপূর্ব রূপ কবি দেখতে পেলেন—জীবনস্মৃতিতে বলছেন—"সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীর রূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।" কড়ি ও কোমলের পটভূমিকাটির সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেন লিখছেন—"বধূঠাকুরাণীর আকস্মিক মৃত্যুজনিত শোকের রূঢ় স্পর্শ কবির চিত্ত হইতে ছবি-ও-গানের অলস রসমাদকতা দূর করিয়া দিল।..কবির অন্তরের দুঃখ-বৈরাগ্য বৃহৎ প্রকৃতির সৌন্দর্যে কারুণ্যের গৈরিক রঙ ধরাইয়া অপরূপ অশ্রুধৌত মাধুরীর সঞ্চার করিল। যৌবনস্বপ্ন জাগরোন্মুখ হইল। পূর্বেকার রসদৃষ্টির সঙ্গে ইহার পার্থক্য গভীর। শোকের আঘাত কবিচিত্তে সংসারবন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়া একটি নির্লিপ্ত ভাব আনিল, তাহাতে রসদৃষ্টির মধ্যে হৃদয়াংশ বা আসক্তি কমিয়া গিয়া রোমান্সের রঙ সংসারের ছবিকে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করিয়া তুলিল। এই নিরাসক্তির আনন্দ দৃষ্টিই কড়ি-ও কোমলের রসসৃষ্টি।"

ছবি ও গানের পরবর্তী কাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ বর্ষা ও শরতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—"আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালে কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কার-বারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্ট করিতেছে।" শ্রীআশুতোষ চৌধুরী এই কাব্যের প্রথমেই 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' কবিতাটিকে স্থান দিয়ে কবির জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসাকে গুরুত্বদিতে চেয়েছেন। মোহিতচন্দ্র সেন পরে যখন কাব্যগ্রন্থের সম্পাদনা করেন তখন কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি 'যৌবনস্বপ্ন নামে তাতে স্থান পায়। কবি প্রবেশক কবিতায় লিখলেন

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম।

প্রমত্ত যৌবনের যে আবেগ, যে উচ্ছ্বাস তা কড়ি ও কোমলে সংযত হলেও অনুপস্থিত নয়। কবি গ্রন্থাবলীতে কড়ি ও কোমলের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলছেন "কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রথম আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।"

ঐ ভূমিকাতেই কবি আরও তিনটি কথা বলেছেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কবির

কোন আকর্ষণ ছিলনা, বিহারীলালের ধারা তাঁর তৎকালীন রচনা মুক্ত হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য ভাল লাগা সত্ত্বেও কবিপ্রকৃতির সঙ্গে মিল না থাকায় সে পথ গ্রহণ করেন নি,"তাই কড়ি ও কোমলের কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎস থেকে উথলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোন মিশ্রণ যদি থাকে তো সে গৌণভাবে।"

দ্বিতীয়তঃ এই কাব্যেই বিষয়বৈচিত্র্য ও বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তৃতীয়তঃ এসেছে মৃত্যুর আর্বিভাব "যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলই তার প্রথম উদ্ভব।"

কড়ি ও কোমল কয়েকটি কবিতা কাদম্বরী দেবীর বিয়োগজনিত বিচ্ছেদ বেদনার সুরে রণিত। মৃত্যু এলো কাব্যে। কয়েকটি কবিতা সনেট. সেগুলির রূপ খুব দৃঢ় নয়। সমালোচক বলেছেন "রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে ইউরোপীয় সনেটের দৃঢ় পিনদ্ধভাব নাই মধুসূদনের কাঠিন্যেরও হয়তো ক্কচিৎ অভাব আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ লিরিকসৌন্দর্যে এবং ভাব ও ভাষার সংহত পেলবতায় এই কবিতাগুলি শুচিতায় ও রুচিমাধুর্যে অভিষিক্ত হইয়াছে।" আর কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ। অনূদিত কবিরা হলেন আর্ণেষ্ট মেয়ার্স, অব্রে ভের, ওয়েবষ্টার, মার্সস্টোন, হুগো, মুর, রসেটি, শেলী, মিসেব্রাউনিং সুইনবার্ণ ও হুড। কতকগুলি কবিতায় নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনা আছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনচারটি কবিতা আছে। তখনই কবির মনে জেগেছে 'বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি।' কড়ি ও কোমল যখন প্রকাশিত হলো তখন বাংলা সাহিত্যের আসরে তার নতুনত্ব বোঝবার লোক ছিলনা বল্লেও চলে। এই নতুন ছন্দ, এই কল্পনার গতানুগতিকতা পরিহার সাধারণ সমালোচকদের আক্রমণের বস্তু হয়ে পড়লো। অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবজীবন ১২৯৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ব্যঙ্গ করে সমালোচনা লিখলেন—রবীন্দ্রকাব্য শেলী প্রভাবিত. রবীন্দ্রনাথ বাংলার শেলী এই কথার উপরেই তাঁর ব্যঙ্গের ঝোঁকটা পড়েছে— —

"তোমাদের উচ্ছ্বাস—ন কাব্য ন কবিতা। কেবল কাব্যি। না মরদ, না মহিলা। কেবল কাব্যি।..

"শেলি শেলি শেলি—কেবল শেলির দোহাই দিয়া কি এই কৃত্তিবাস, কাশীদাস. কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জনের পরিপুষ্ট ও পরিত্যক্ত অপূর্ব সাহিত্য সম্পত্তি নষ্ট করিবে?"

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৩ চৈত্র সংখ্যা ভারতীতে এর উত্তর দিলেন, সে উত্তরের নাম কাব্য স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট।' ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তির উপর অনাস্থাকে লক্ষ্য করে কবি বললেন—"কাব্যে অনেক সময় দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এই প্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া' কেহ বলেন ছায়া, কেহ বলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।"

কালীপ্রসন্নকাব্যবিশারদ কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলিকে প্যারডী করে ১৮৮৮ সালে 'কড়ি ও নহে, কোমল ও নহে পুরো সুরে মিঠেকড়া' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। নিন্দাবাক্যকে তীক্ষ্ণ অম্লরসে জারিত করে দিতে তা সহজেই স্থলবুদ্ধি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। তিনি ব্যঙ্গ করে লিখলেন

উড়িসনে রে পায়রা কবি

খোপের ভিতর থাক ঢাকা
তোর বক বকম আর ফোঁস ফোঁসানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা
তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো
নগদ মূল্য একটাকা।

রবীন্দ্রকাব্যের দুর্বোধ্যতা নিয়েও কালীপ্রসন্ন লিখলেন—

না হয় না হবে মানে
রস চাই — কবিতার
মিষ্টি হলে বেঁচে যাই
ভাবনা থাকে না আর

ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথকে নাম করে আঘাত করতেও ছাড়েন নি—

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের আদর্শ কবি
শিখেছি তাঁহারি দেখে তোরা কেউ কবি হবি?

ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন লিখছেন—"মোটকথা—যদিও ইহাতে কড়ি ও কোমলের ন্যায় 'স্তন নং১', 'স্তন নং ২', 'চুম্বন' "বিবসনা" প্রভৃতি সুরুচি সঙ্গত কবিতা লিখি নাই, তথাপি তদ্রূপ ঈশ্বর-প্রেমাত্মক এক আধটি কবিতার অভাব হইবেনা।"

এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেটি মানসীতে প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা সাহিত্যে কবির ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন একটি কবিতা লেখেন। সেই কবিতাটির উপরে লেখা ছিল—(বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কড়ি ও কোমল কাব্য-পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রবিরাহু শর্মা 'মিঠে কড়া' লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রবিরাহুর করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পিত হইল।)—কবিতাটি এই

"কায়া,, কা-আ, কা-আ" বাসের ডাকে
" কাগা মামা কাগা মামা কাগা মামা" বলি,
মদনা চন্দনা টিয়া এল ঝাঁকে ঝাঁকে,
বক ঘুঘু হরিয়াল ঠ্যাঙ নলি নলি;
—ঝুঁটি মাথে কত পাখী এল লাখে লাখে;
চড়াই টুন্টুনী এল কাতারে কাতারে;
আইল রে শঙ্খচিল, শালিক ছাতারে;
আসিয়া বসিল সবে আমড়ার শাখে।
বায়স কহিল হর্ষে, "শোন পক্ষী সব,
আমের মদিরা পিয়ে ওই যে ডাকিছে,
উহু, উহু! শুনে ওর কুহু কুহু রব
আমার বয়েস প্রাণ ফাটিয়া যাইছে
O birdie, O birdie, what name ownest thou
The jackdaw replies 'I am called রবিরাহু।

কিন্তু মিঠেকড়া আজ নিতান্তই literary crisis। সাহিত্যের দরবারে রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জুড়ে থেকেই যেটুকু অস্তিত্ব তার এখনো আছে—তার বেশী কিছু নেই।

সাহিত্য সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে চতুর্দ্দশ দ্বীপের মেখলা সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সম্ভার নিয়ে বিরাজমান। ইদানীং সামোয়ায় পলিনেশিয়ান সভ্যতার কোন চিহ্নই নেই, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাপে আদিবাসীদের আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সম্ভবতঃ সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি তাঁর তুলি দিয়ে আজও প্রান্তরে, বৃক্ষ শাখায় আপন মনে নানা রঙের ছবি এঁকে চলেছেন। আজও সেখানে জবা ফুল ফোটে, প্রজাপতিরা ডানা মেলে বনফুলের মধু আহরণ করে আর স্বর্ণাভ তীরভূমিতে নীল ঢেউ আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়া ভঙ্গিতে, হয়ত পুরাতন দিনের কথা শোনাতে চায় শীর্ষমুখী নারিকেল বীথির তলে দাঁড়িয়ে থাকা কৃত্রিম রঙেরাঙ্গান কোন আধুনিক বিম্বাধরোষ্ঠীকে।

কিন্তু এককালে সামোয়ার রূপ ছিল অন্য—তখন কৃত্রিমতার কোন চিহ্নই ছিল না। সামোয়ানরা সহজ সরল জীবন যাত্রায় নিজেদের দিনগুলি কাটিয়ে দিত। প্রকৃতি যেন সামোয়ানদের লক্ষ্য করেই যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বিচিত্র বর্ণসম্ভার দিয়ে সাজিয়ে সেই সামোয়া দ্বীপপুঞ্জকে পৃথিবীর স্বর্গে পরিণত করেছিলেন। তখন সামোয়ান সুন্দরীরা এলায়িত কেশে রক্তজবা গুজে, বাহুমূলে ও গলায় বনফুলের গহনা আর ঘাসের ঘাঘরা পরে ধীর পদক্ষেপে লীলায়িত ভঙ্গিতে বাহু আন্দোলন সহযোগে নীল সাগরের পটভূমিকায় ছন্দোবন্ধ নৃত্য-গীত করত। সেই কালে ভাইলিমার তালপাতায় ছাওয়া বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধ সেই রূপ সুধা পান করতেন আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দূরে আগ্নেয় গিরির ধূম্র উদ্গীরণ শঙ্কিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। তারপর সূর্য্য যখন সাগর দিগন্তে পাটে নামত সেই অশীতিপর বৃদ্ধ তখন পাঠাগারে বসে তার নবতম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতেন, ঝিল্লীরব হয়ত তার একাগ্রতার আবরণে মাঝে মাঝে হানা দিত তাতে তিনি মোটেই বিরক্তি বোধ করতেন না বরং স্মিতহাস্যে সাগরের বুকে ঢেউয়ের মধ্যে রাত্রির ঝিকিমিকি লক্ষ্য করতেন আবার কখন চমক ভেঙে পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তার কোন স্থিরতা ছিলনা।

বৃদ্ধের পরিচয় তিনি ঔপন্যাসিক নাম রবার্ট লুই স্টিভেনসন সংক্ষেপে আর, এল, এস। তাঁর সৃষ্ট লঙ্ জন সিলভার অথবা ডক্টর জেকিল চরিত্র সম্বন্ধে সাহিত্য পাঠকের কাছে নূতন করে নিবেদন করার কিছুই নেই এবং সম্ভবতঃ ট্রেজার আইল্যান্ড তার বহুল পঠিত রোমান্টিক উপন্যাস যার আবেদন আজও অনস্বীকার্য্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম রোমান্টিক পুরুষ স্টিভেনসন তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সামোয়ার এক ক্ষুদ্র দ্বীপে নিজস্ব বসতবাটী ভাইলিমায় কাটিয়েছিলেন। সামোয়াতেই তিনি সমাধিস্থ হন, উপোলুতে তাঁর সমাধিক্ষেত্র আজও জবাফুলে ঢাকা আছে।

স্টিভেনসনের জীবন সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেছেন কিন্তু প্রামাণিক জীবন কথা হিসাবে মাত্র দুইখানি গ্রন্থই আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রথমটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত—, লেখক গ্রাহাম বলফোর, দ্বিতীয়টি ঊনিশশো একান্ন সালে প্রকাশিত লেখক জে, সি, ফার্ণাস এই দুই জীবন কথাই নিজস্ব স্বকীয়তায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্টিভেনসনকে আরও

নিবিড়ভাবে জানতে হলে তুইলার ১ "দিস লাইফ্ আই হ্যাভর্ড" নামক আত্মজীবনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। তুইলা পিতার জীবন সম্বন্ধে বহু ক্ষুদ্র রচনার মাধ্যমে সাহিত্য পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করেছেন কিন্তু দিস লাইফ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক আকরগ্রন্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক ও স্টিভেনসনের জীবন যাত্রার ইতিহাসের মধ্যে তুইলাই ছিলেন একমাত্র সেতু যিনি সব কিছু কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। তাই ১৯৫৩ সালে চুরান্নবই বৎসর বয়সে যখন তুইলা পরলোক গমন করেন তখন অনেকেই আশংকা করেছিলেন যে জীবনকথার ইতিহাসে স্টিভেনসনের জীবন পরিচ্ছেদ সম্ভবতঃ এইখানেই শেষ হল, কিন্তু সে আশংকা সম্প্রতি অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তুইলার কাছে যাঁরা স্টিভেনসন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন তাঁদের মধ্যে মিসেস এল সি নোবল কল্ডওয়েল অন্যতম এবং পত্রালাপের মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। স্টিভেনসনের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তুইলা যে বিবরণ দিতেন মিসেস কল্ডওয়েল তার নোট রাখতেন এবং তুইলার মৃত্যুতে বিশ বৎসরের বন্ধুত্বের যখন অবসান ঘটল তখন মিসেস কল্ডওয়েল তুইলার স্মৃতি এবং স্টিভেনসনের নূতন পুরাতন কথা লিপিবদ্ধ করতে মনস্থ করেন। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে মিসেস কল্ডওয়েল সম্প্রতি "লাস্ট উইটনেস ফর রবার্ট লুই স্টিভেনসন" নামক গ্রন্থে তাঁর ও তুইলার আলোচনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। স্টিভেনসনের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থমালায় আর একটি নূতন সংযোজন সাহিত্য পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহে আনন্দ সংবাদ।

নূতন বই।। লিভিং ফ্রি

প্রাণীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে অভিনব এবং সরস সাহিত্য যে রচনা করা যায় তা জয় এ্যাডামসন প্রমাণ করেছিলেন তাঁর "এলসা দি লায়নেস" গ্রন্থে। একটি সিংহ ও তার শাবককুলের বিচিত্র ব্যবহার ছিল ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এ্যাডামসন সরসভাবে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। লিভিং ফ্রি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থেরই উত্তরভাগ এবং এইটিও উৎকর্ষতায় সমভাবে সরস ও চিত্তাকর্ষক।

এ্যাড্রিফ্‌ট্ ইন সোহো

বিট্‌নিক অথবা বিটবংশ সম্বন্ধে যারা কৌতূহলী তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে কলিন উইলসন এই অদ্ভুত রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন বলে মনে হয়। আপামর পাঠক সমাজে এই গ্রন্থের সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ-আবেদন থাকত যদি উইলসন বিট্‌নিকদের সত্য পরিচয়দানে সক্ষম হতেন।

দি এম্পটি ক্যানভাস

আলবের্ত্তো মোরাভিয়া ইতালির অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত। মোরাভিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় যোগদান করেছিলেন, বম্বেবাসীরা তাঁর বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিল। তাঁর রচনার স্বাদ এদেশের সাহিত্য পাঠকের কাছে অজানা নয়। যুদ্ধোত্তর হতাশা অস্বাভাবিক যৌন সম্বন্ধ মোরাভিয়ার রচনার অন্যতম হাতিয়ার এবং এই গ্রন্থটিও সেই একই হাতিয়ারের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। মনে হয় তাঁর রচনার বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ শিল্পেরক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি শুভ লক্ষণ নয়।

রামানুজ রায়

Last witness for Robert Luis Stevenson. By Elsie Noble Coldwell. Pp. xiv + 386. Norman, Oklahoma. Oklahoma University Press. 1960.

অপূর্ণতার ইতিবৃত্ত

মানুষের জীবনটাই আগাগোড়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও শিক্ষার সমর। অভিজ্ঞতার অন্ত যেমন নেই, শিক্ষার তেমনি নেই সমাপ্তি। জীবন যত দেখা যায়, যত শেখা যায় ততই দৃষ্টিভংগী পালটায়। অবশ্যি—দেখার চোখ চাই; শেখার মন ও সামর্থ চাই। অনেকেই সংসারে চোখ থাকতে অন্ধ, চামড়ায় ঢাকা মন থাকতেও মননশীল নয়। এই জন্যই কোনো কোনো মানুষ আজীবন বহুকিছু দেখলেও দেখার মতন জিনিস তার চোখে খুব কমই পড়ে, জীবনের শেষ দিনেও প্রকৃত শিক্ষার সন্ধান অনেকের মধ্যে দুর্লভ দেখা যায়। এরই বিপরীত ঘটনা সংসারে ঘটেছে ও ঘটে এবং ভবিষ্যতে ও ঘটবে বললে ভুল হবে না।

রাজনীতিবিদদের জীবনে দেখবার ও অভিজ্ঞতার সুযোগ অনেক। সাধারণ মানুষ, অসাধারণ মানুষ, মধ্যবর্তী মানুষের সমস্যা নিয়ে, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে রাজনীতিবিদগণ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে থাকেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতা বাস্তবে বহুবিস্তৃত হওয়া উচিত। কিন্তু ধার করা অভিজ্ঞতাকে ভাঙিয়ে শিল্পী সাহিত্যিক রূপে যাঁরা খ্যাত তাদের অভিজ্ঞতা সত্যমূল্যে কেনা হলে আরও উজ্বল ও ভাস্বর তথা গরীমাময় হতো।

সাংবাদিক জীবনে এক একজন প্রতিনিয়তই নানা প্রকৃতির মানুষের সান্নিধ্যে এসে থাকে। সভাসমিতিতে, ব্যক্তিগত পরিবেশে, সেক্রেটারীয়েটে, বিধানসভায়, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে, শিল্পায়াতনে, কল কারখানায়, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায় না একালে সাংবাদিকদের ডাক পড়ে? অমুক ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্রকন্যার বিবাহ থেকে বিদেশাগত শিল্পপতির আগমনী অভ্যর্থনাসভাতে পর্যন্ত সাংবাদিকদের না হলে এযুগে কোনো অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ হতে পারে না এতবস্থা। এই অবস্থায় সাংবাদিকদের কত জায়গায়, কত রকমের দৃশ্যের ও চরিত্রের সংগে কতবার কতভাবে মুখোমুখি হতে হয়, তার হিসাব নেই। সাংবাদিকের বয়স যতই বাড়ে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভান্ডার ততই বিচিত্র সম্পদে ভরাট হতে থাকে। এই সঞ্চয়ের অন্ত কোথায়।

মাত্র দুই দশকের-ও সাংবাদিক বৃত্তির সম্বল যার, অভিজ্ঞতার ইতিহাস তার কতই না আশ্চর্য বর্ণালিতে মনোহারি। উনিশ শত কোনো সালে আজ থেকে বিশ বছর আগে, যে ব্যক্তি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, কোনো এক অমানিশায় কোনো এক সাংবাদিককে মধ্যরাত্রিতে টেলিফোনে পরবর্তী রাজনীতিক কর্মপন্ধতির যেরূপ আভাস দিয়েছিলেন, কম্পিত ত্রস্ত কণ্ঠে; সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ এখন পুলিশী মন্ত্রীর মসনদে দীর্ঘদিন বহালতবিয়তে রাজত্ব করছেন। সেদিনকার সামান্য স্বেচ্ছাসেবক, যিনি কোনো এক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক নেতার মঞ্চে আলকাতরা ছুড়েছিলেন তিনিই হয়ত একালের ডাকসাইটে মুখ্যমন্ত্রী কোনো রাজ্যের। আর ওই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা এখন-ও চুরাশি বছর বয়সে ভাবীদিনের মসনদের সোনালী স্বপ্ন দেখছেন।

রাজনীতির থেকেও রোমাঞ্চকর সিনেমা জগৎ। বিশ বছর আগের ভিখিরী এখন বৃহত্তর ষ্টুডিওর মালিক। তাঁর ছবির নায়ককে তিনি এখন একটি ছবির জন্য কিনে নেন তের চোদ্দ লক্ষ টাকা দিয়ে। আর সেদিনের নায়িকা শ্রীমতী নয়নাভিরাশ্রু দেবী এখন বাড়ীভাড়া দিয়ে সংসার চালান। অলক্ষে অশ্রুপাতে অভিশাপ দেন কোনো অভিনেতা কিংবা পরিচালককে অকালে নিজের দেহপট ধ্বংসের কারণ লক্ষ্যকরে।

সাহিত্যিকদের ভাগ্য পরিবর্তনও কম আশ্চর্যজনক নয়। বিশ বছরে কত রূপান্তর তাঁদের লেখার ও দেখার। দেড় শত টাকায় যিনি উপন্যাস বিক্রী করতেন তিনি সেকালে বিপ্লবের স্বপ্নও দেখতেন; অগ্নিবর্ণা সে রূপসী সর্বগ্রাসী। এই বিশ বছর পরে তাঁর প্রতিটি প্রয়াস সিনেমাকে লক্ষ্য রেখে, আর অর্থের কবন্ধ অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে। যে সাহিত্যিক "সর্বহারার চা" দিয়ে সাংবাদিকদের তৃপ্ত করতেন সেদিন, তাঁরই এখন মুঠিতে আবদ্ধ কত সর্বহারা।

এ কিন্তু আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য নয়। আসলে বিগত বিশ বছরে নানা সূত্রে নানা জনের সংস্পর্শে এসে কী দেখলাম; যা সবচেয়ে আশ্চর্য অথবা সর্বাপেক্ষা হতাশাব্যঞ্জক। বিশ বছর অতীতে দেশের যে চেহারা ছিল বর্তমানের চেহারার সংগে একদমই সে-মেলে না; একমাত্র রেলগাড়ীতে বেদম ভিড় অনেকটা সমান থাকা ছাড়া। তবে রেলওয়ের একালে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কর্মচারীগণ আগে ভাবতেন—যাত্রীদের প্রতি তাঁদের কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য পালনে গাফিলতি ঘটলে বিপদ। এখন ভাবেন; তাঁরাই যাত্রীদের মা-বাবা, অতএব গাফিলতি ঘটতেই পারে না। ঘটলেও সে দোষ যাত্রীগণের। আমরা দূরপথের যাত্রীদের কথাই ধরছি, কলকাতা, বম্বে বা মাদ্রাজের সহরতলীর নিত্য যাতায়াতকারী যাত্রীদের কথা তুলছি না। আইন আদালত, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সকলেরই চেহারা রীতিমত পালটে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোকে প্রথম শ্রেণীর পদ দখল করেছে খুঁটির জোরে ও মুরুব্বির তারিফে। এখন সে মুরুব্বিকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। আবার অন্যটাও ঘটেছে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ তৃতীয় শ্রেণীর কর্তার গোদা পায়ের তলায় গোঁঙাতে গোঁঙাতে আরও তলে নামছেন। তাঁদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা প্রথম শ্রেণীর মানুষ সে সত্য তৃতীয় শ্রেণীর দাপটেও ভুলতে পারেননি।

রাতারাতি সামান্য কেরানী অতি সামান্য পুঁজি নিয়ে শিল্পপতি হয়েছেন। ক্রমশ তাঁর শিল্প সাম্রাজ্য বেড়েই চলেছে, এমন দৃশ্যও দেখবার সুযোগ হয়েছে কিছু কিছু।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বর্ণছাতার তলে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত রাজা মহারাজার রাজ্য গেছে, শিকার খেলার রাইফেল বেচার দশা হয়েছে এই দুই দশকের ব্যবধানে।

এর চেয়েও অবিশ্বাস্য, গ্রামের সুদূর প্রান্তে বিজলি বাতির আলোতে এখনকার অমাবশ্যার অন্ধকার আড়ালে লুকিয়ে মানুষের হাতে সৃষ্ট নিত্য জোছনাকে বেশ আতঙ্কে দেখে নিচ্ছে। চাষী তার ক্ষেতে জলসেচন করছে নিদারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে ওই বিজলি শক্তির সাহায্যে।

আর তারই নওজোয়ান ছেলে এখন অদূরের স্কুলে লেখাপড়া করে লায়েক হতে চলেছে। তার মাষ্টার মশায়ের তেমন মান সম্মান কিছু নেই আগের মতন; সেই যেকালে এ গাঁয়ের গৌর গোস্বামী-ও তাদের পুরানো দিনের জলধর পণ্ডিতকে প্রাতঃস্মরণীয় না ভেবে পারত না।

অনেক অনেক পরিবর্তন। যেমন আশ্চর্য, তেমনি অভাবনীয়। বাঙলা দেশ থেকে

হিমশৈল শিখর সুন্দরী কাশ্মীর; রাজপুতনা থেকে সমুদ্রমেখলা কন্যাকুমারীকা কতই না পালটে গেছে।

দেশের নারী সমাজেও যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেই যে বলা হত,

"বাঙলা দেশের নারী"
সচল হয়েও অচল তারা
পাষাণের চেয়ে ভারী।"

সে কথা প্রায় সারা ভারতের নারী সমাজের পক্ষেই অনেকটা খাটত বিশ বছর আগে। বিশ বছর পরে বর্তমানে ওই মন্তব্য করলে মানহানির মামলায় জড়াবার আশঙ্কা। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ বন্ধনের শৃংখল ছিড়ে আজকাল দেশের নারীরা রীতিমত স্বাধীনতা ভোগ করছেন। এদেশের অন্তত একজন নারী রাষ্ট্র সংঘের সভানেত্রী হয়েছেন। কয়েকজন কেন্দ্রের উপমন্ত্রীপদে যোগ্যতার সংগে কাজ করেছেন। প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রীসভাতে কোথাও কোথাও নারীদের প্রবেশ ঘটেছে। একজন বাঙালী মহিলা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছেন আর একজন তো প্লেনের পাইলটের দায়িত্বে যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়ছেন। এরপর রাইফেল চালনায় প্রথম শ্রেণীর কৃতীর উল্লেখ না করলেও চলে। তবে ইদানিং নারী সাংবাদিকদের সাংবাদিকতা বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ-ও আমাদের আলোচনায় বাহ্য।

"লড়কে লেংগে পাকিস্থান" বলে কলকাতা নোয়াখালির নাঙ্গা দাঙ্গা থেকে পাকিস্থানের সৃষ্টি, দেশ ভাগাভাগি—বিগত বিশ বছরের মধ্যেকারই ঘটনা। ভাষা ভিত্তিক প্রদেশের দাবীতে অন্ধ্রের পট্টি শ্রীরামালুর আত্মদান অন্তে বিশাল অন্ধ্র গঠন থেকে মহারাষ্ট্র গুজরাটের ভাগাভাগি-ও এই সেদিন চোখের উপরেই সংঘটিত হল। পঞ্চশীলের নীতিতে সহ-অবস্থানের চমকপ্রদ সংগীত (?) "হিন্দি চীনী ভাই ভাই ভাই" কান থেকে মিলাতে না মিলাতে আত্মপ্রসারী চীনা কমিউনিষ্ট ধুরন্ধররা ভারতের হাজার হাজার মাইল জমি দখল করে নিল, আরও নিচ্ছে এবং নেবেও বলে ধারণা জন্মিয়ে ছাড়ছে। নাক কামড়ে দিলে প্রতিশোধ নেবার কথাটা উচ্চারণ করতে যেমন বাঁধে, তেমন অবস্থায় এদেশের কোনো কোনো নেতাকে বেশ কিছুকাল থেকে বড়ই বিপাকে ঘোরা ফেরা করতে হচ্ছে। এ-দৃশ্য ও দেখবার মত।

বিদেশে দুর্দান্ত ষ্টালিনকে দ্বিতীয়বার নয়, সম্ভবতঃ শেষ বারের মতই কবরস্থ করায় এদেশের ক্ষুদে ষ্টালিনদের মুখে গম্ভীরভাব নেমে এসেছে। তাঁরা দুর্দান্ত গোঁসায় নিজেদের দাঁত দিয়ে জিব কামড়াচ্ছেন। আর থেকে থেকে চাপা আর্তনাদ গোপনের জন্য আরও তীব্র চীৎকারের তলে তলে বলছেন, "ডুবিয়ে দিলো, ডুবিয়েই দেবে।"

রুশিয়ার আকাশ পেরিয়ে শূন্যবিজয় এবং মেগাটন বোমার পঞ্চাশ মেগাটন হিসাবের ভুলে সত্তর মেগাটন বিস্ফোরণের ঘটনা যেমন আশ্চর্যজনক তেমনি ভয়ঙ্কর রূপে ভয়াবহ। অ্যামেরিকার চন্দ্রবিজয়ে এখনও রুশদের সমকক্ষতা অর্জনে অক্ষমতা-ও কম আশ্চর্য নয়।

এ-পৃথিবী প্রকাণ্ড বিরাট! অত প্রকাণ্ড পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণের প্রাণান্ত চেষ্টা না করে আমাদের উপমহাদেশেই পরিক্রমাটা সীমাবদ্ধ রাখতে পারি যদি—তাতেই বা ক্ষতি কী!

বিগত বিশ বছরে এই উপমহাদেশ আর সেই আগের দিনের মতন বিরাট আকার নেই। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান ভারত উপমহাদেশের অংগচ্ছেদেই সৃষ্টি হয়েছে। এই অংগচ্ছেদের অগ্রণীরা অনেকেই এখন মৃত্যুর পরপারে। তাঁদের দলবলের যাঁরা এখনও জীবিত

আছেন তাঁরা পূর্বসূরীদের প্রেতাত্মার ছায়াবহন করছেন। কায়েদ আজম জিন্না নেই, লৌহ মানব সর্দার প্যাটেলও গত হয়েছেন। আছেন ভারতবিভাগের অন্যতম ধুরন্দুর রাজনীতিজ্ঞ চক্রবর্তী রাজগোপাল আচারী। বুড়ো বয়সে তিনি এখন আবার সম্পূর্ণ সাধ পূরণ করতে সারা ভারতময় ছুটাছুটি করছেন নতুন রাজনৈতিক দলকে খাড়া করবার উদ্দীপনায়! যে ব্যক্তি দেশের মংগল-কামনায় ভারতবিভাগে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সম্মত হতে পারেননি, সেই মহাত্মা গান্ধী দেশ-বাসীর অস্ত্রাঘাতে শহীদ হয়েছেন আমাদের চোখের উপরেই। আর বিগত বিশ বছরের প্রথম উষাকালে পৃথিবী থেকে মহাপ্রয়াণ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এই দুই জন মানব, কেবল মানবই ছিলেন না, ছিলেন মহামানব। বৃহৎ কিছুর তুলনায় সূর্যকে নিয়ে টানাটানি করা হয়, কিংবা ডাক পড়ে হিমালয়ের। মহাত্মা ও বিশ্বকবির সংগে যাঁদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ রয়েছে তাঁরাই স্বীকার করবেন, ওই দুজনেই যেন ছিলেন এক একটি সূর্য! এককালে একই দেশে দুই সূর্যের উদয় যেমন কল্পনাতীত আশ্চর্যজনক ঘটনা, তেমনি তাঁদের প্রভাব জাতীয় জীবনে একাধারে সর্বব্যাপ্ত ও সর্বাগ্রগণ্য! মহামানবের জীবনকে কেন্দ্র করে যে গুণাবলীর বিকাশ ঘটে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ মহাভারত লেখা যায়। মুখে মুখে সে সকল গুণের প্রশংসা ঘুরে বেড়ায়। অতি সাধারণ মানুষের মুখেও মহামানবের শত গুণের কথায় খই ফোটে। যে সমস্ত অপগুণ আচ্ছন্ন করে রাখে সাধারণ জীবনকে সে গুলি মহামানবের ধারে কাছেও ঘেসতে ভয় পায়! নীচতা, হীনতা, হৃদয়ের অনুদারতা, মনের সংকীর্ণতা, অন্তরের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ যে জীবন; সেও মহামানবের মনের স্পর্শে নতুন জন্মলাভ কোরে ধন্য হয়।

এই যে ধন্য হবার সুযোগ; সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার এ-দেশবাসী আমরা কতটা করতে পেরেছি? না-পারলে; তার যে অক্ষমতা; তারই অন্তর্জ্বালায় সত্যিই কী আমাদের দগ্ধে দগ্ধে, পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করছে? না—বিরাট খাদ নিয়ে আমরা ক্রমশ অতল পাতালে চির অন্ধকারের জীব হতে চলেছি! আর মনে মনে ভাবছি, হোক না অতল পাতাল, সেখানে সূর্যের আলো নাই বা ঢুকল; বিজলির তার সে ঢোকানো চলবে!

হঠাৎ অতল পাতাল প্রসংগে আসার কারণ আছে বৈ কী! মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর এই দীর্ঘকাল মধ্যে এদেশের ভাগ্যে আর কোনো "মানব—সূর্যোদয়" হয়নি। দুই সূর্যের অস্তগমনের উত্তরপর্বে তাঁদের মন্ত্রশিষ্যগণ সামান্য উপগ্রহরূপেও দেশের আকাশে নিজেদের উপস্থিতিতে জনচিত্তে স্থায়ী কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন কি-না সন্দেহ! রাজনীতিক আবহাওয়া দেশে আজ আর বিশুদ্ধ নেই। সাহিত্য শিল্পের রাজ্যটাও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি সারা দেশ খুঁজে এমন দুদশজন মানুষ মেলা ভার; যাঁরা যথার্থই অসাধারণ ও সর্বজনমান্য সর্বাকর্ষণীয়! কী রাজনীতি, কী অর্থনীতি, সমাজনীতি, কী নৃত্য-গীত কিংবা সিনেমা নাটক; কী সাহিত্যসৃষ্টি ও সংবাদিকতা সর্বত্রই একালে আগুণতি মাথার ছড়াছড়ি! কিন্তু ইতিহাসের শেষ বিচারে মানুষের ও কালের উর্ধ্বে স্থানলাভের যোগ্যতায় মহামানব ও মহানস্রষ্টা হিসাবে পৃথিবীতে স্থানলাভের অনন্যসাধারণ দাবীদার বর্তমান ভারতবর্ষে যে মন্বন্তর ঘটিয়ে ছাড়ল; এই কী এই বিশ বছরের সবচেয়ে হতাশা ব্যঞ্জক বেদনা-দায়ক ঘটনা নয়?

অমল ঘোষ

অসুবিধা

বিরহী যক্ষ যখন মেঘকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করার জন্য যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ-কামা' অধমের কাছে চেয়ে সফল হবার চাইতে মহতের কাছে প্রার্থনা করে বিফল হওয়া বরং ভাল—এসব বলে খোসামুদী করছে তখন সে যাত্রাপক্ষের কোন অসুবিধার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করে নি। তার যাত্রাপক্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা সৌন্দর্য এবং আকর্ষণের সূচক।

অনেক যে ব্র্যাডশয়ে ভারতভ্রমণ করার পক্ষপাতী তার প্রধান কারণ অর্থাভাব হলেও সেটি একমাত্র কারণ নয়। পথক্লেশ এমনই এক বস্তু যা অনেককে টাইম টেবলে দেশভ্রমণ করায় উৎসাহ যোগায়। ছত্রিশ হাঙ্গামা ও ঝঞ্চাট পোহানো অনেকের ভ্রমণে আগ্রহ স্তিমিত করে। বাড়ীতে, সে যেমনই হোক, প্রত্যেকের একটা নিজস্ব আরাম আছে। সেখানকার অসুবিধাগুলো তার জানা, আর তা দূর করার অভ্যাস তার আয়ত্বে। হঠাৎ বৃষ্টি সুরু হলে মোড়াটা হাত দুয়েক সরিয়ে বসে মোড়ার জায়গায় সস্‌প্যান রাখার কারণ আপনি দুমিনিটে বুঝতে পারবেন, যখন দেখবেন ঐ জায়গাটায় ছাত দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু স্বল্পক্ষণ দাঁড়ায় এমন স্টেশনে গাড়ী ছাড়বার বাঁশি বেজেছে অথচ বড় মালপত্র নামাবার কুলি পাওয়া যায় নি তদবস্থায় যে কোন ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অথচ তা সত্বেও দেখা যায় অনেকে দুঃসাহসিক অভিযানে যাত্রী হন। একদল এলেন হিমালয়ের নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গ বিজয় করে। আবার কজন বঙ্গতনয় কিছুদিন আগে হিমালয়ের মানা শৃঙ্গ বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান করে সামান্য কয়েক শ ফুট বাকী থাকা সত্বেও প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রতিকূলতার জন্য বিজয়ী হতে পারেন নি; ফিরে এসেছেন। এ ধরণের অভিযান, যাকে ইংরেজীতে এডভেঞ্চার বলে, এক অবিমিশ্র অসুবিধার সমষ্টি। আরাম ত হারামই, অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোও কোনটা সহজে হবার নয়। আর এত সাধের যে জীবন তাও সর্বক্ষণ বিপন্ন। এই প্রসঙ্গে জি-কে চেস্টারটনের দুটি বাক্য উল্লেখযোগ্য। 'An adventure is only an inconvenience rightly considered. An inconvenience is only an adventure wrongly considered.' অভিযানে অসুবিধাকে ন্যায্য ও কাম্য জ্ঞান করা হয়। অসুবিধাকে অন্যায্যভাবে রোমাঞ্চকর জ্ঞান করা হয় না।

সার্কাসে যে মেয়েটি ছাতা হাতে তারের উপর হেঁটে যাওয়ার খেলা দেখাচ্ছে (যা লোকে পয়সা দিয়ে দেখে এবং যাকে আর্থার কোয়েসলার বললেন সাহিত্যিকের নাকি অবস্থা তাই) সকলের ভাগ্যে তারমত ব্যাপারটা অভ্যাস করার সুযোগ আসে না। তত্রাপি সহরের লোক যখন গ্রামে যায় আর দেখে একটা বাঁশের সাঁকো তাকে পার হতে হবে তখন সে আংশিক একটা সুযোগ পেল ভেবে খুসী না হয়ে দুর্গানাম জপে। বলা বাহুল্য অহৈতুকী ঈশ্বর প্রীতি তার কারণ নয়, অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে ব্যাপারটাকে অভিযাত্রীর মনোভাবে গ্রহণ না করাই তার কারণ।

নৈয়ায়িকের দেশ বাংলা। কাজেই কেউ যদি বলেন যে ব্র্যাডশয়ে ভূ প্রদক্ষিণের যিনি পক্ষপাতী তিনি কখনো মানা অভিযাত্রী দলের অধিনায়ক হতে যাবেন না অতএব দুখানি মাত্র চলবার এবং একখানি ধরবার বাঁশ সমবায়ে নির্মিত সাঁকোর সম্মুখীন হয়ে দুর্গানাম জপাই সঙ্গত তবে আমরা তার প্রতিবাদ করব না। কিন্তু তা সত্বেও বলব যে অসুবিধা বস্তুটি একান্ত-ভাবে মানসিক, ওটা শারীরিক নয়। কোন দুর্ঘটনায় যিনি একখানি পা হারিয়েছেন তিনি ক্রাচের সাহায্যে চলাফেরা করেন, যিনি দুখানিই হারিয়েছেন তিনি হাতে চালানো চাকার গাড়ীতে। দুখানি পা যাঁর আছে তিনি নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন কিন্তু জুতো

না থাকার যে অসুবিধা সেটা মানসিক; জুতো ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তির জুতো না থাকার অসুবিধা খানিকটা অভ্যাস জনিতও বটে। তবু বাধ্য হয়ে হলেও পিতৃদশা বা মাতৃদশা কালে অশৌচ পালন করার সময় জুতো ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তি কমপক্ষে এগার দিন নগ্ন পদে চলা ফেরা করেন। কাজেই অন্যথা জুতোর অভাবের অসহ্য অসুবিধা ক্ষেত্র বিশেষে সহ্য।

একদিকে, বসতে পেলে শুতে চাওয়া যেমন আরামপ্রিয় মানুষের স্বভাব অন্যদিকে তেমনি অপরিসীম সইবার ক্ষমতার জন্য শরীরের নাম মহাশয়। সইতে পারা যাচ্ছে না—এ ভাবটি মনে ওঠামাত্র আর সহ্য করা যায় না। সত্য বলতে কি অসুবিধা বলে আসলে কিছু নেই। ডস্টয়েভস্কির ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট গ্রন্থের এক জায়গায় আছে—যেখানে নায়ক প্রবল অন্তর্জ্বালায় নানা কথা ভাবছে,—একটি লোককে প্রাণদণ্ডের বিকল্পে একটি সর্ত পালনের কথা বলা হয়েছিল; তা হল সমুদ্রের মধ্যে একটা সামান্য জেগে থাকা পাহাড়ের চূড়ায় কোনক্রমে দুখানি পা রেখে দাঁড়িয়ে (বসার স্থানাভাব) বাকী জীবনটা কাটানো অথবা মৃত্যুদণ্ড। তা লোকটি সর্বক্ষণ কেউ আছড়ে পড়া ঐ স্বল্প পরিসর স্থানে দাঁড়িয়ে বাকী জীবন কাটানোর প্রস্তাব মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প হিসাবে বেছে নিয়েছিল। ডস্টয়েভস্কির নায়ক আগে কাহিনীটা বিশ্বাস করত না কিন্তু নিজে যখন প্রাণভয়ে পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তখন তার কাছে কাহিনীটা সহজেই বিশ্বাস্য বোধ হয়েছিল। পূর্বকথিত ঐ তিনখানা বাঁশে প্রস্তুত সাঁকো পার হলেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে জানলে আর অসুবিধার কথা সহরের লোকের মনেই পড়বে না, তখন সংখ্যাধিক্যে বিরক্ত হয়ে মনে হবে আবার তিনখানা কেন, একটাই ত যথেষ্ট।

এ সবই শরীরের সঙ্গে পরোক্ষ সম্পর্কের কথা; প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হল আহার—যা নাকি শরীর ধারণের পক্ষে অপরিহার্য। সেই আহার কেমন হলে ঠিক হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক হিসেব কষে বলেছেন,, প্রতিদিন এত হাজার ক্যালোরি খাদ্যগ্রহণ শরীরটি টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন। সেই ক্যালোরি বানাতে যতটা মাছ-মাংস-ডিম, দুধ-ঘি-মাখন, ফল-মূল-শবজী লাগে সব তাঁরা সুন্দরভাবে তালিকা করে দিয়েছেন। আজ থেকে বিশ বছর আগে কোন বঙ্গতনয় হয়ত ঐ তালিকা অনুযায়ী আহার গ্রহণ করে থাকবেন। কিন্তু আজ তাঁর পুত্র ঐ তালিকার কোন অংশের ব্যাপারেই নিশ্চিত নয়; ঐ তালিকার শতকরা নব্বুইভাগ আজ কোন বাঙালীর ভাগ্যে জোটে না অথচ সে সশরীরে জীবিত আছে! শুধু জীবিত নয় ভাসানের লরীতে নৃত্যরত দেখে বেশ জীবন্তই মনে হয় তাকে। সারামাসে সে যা আহার করে তা হয়ত অনেক সময় ঐ তালিকার একদিনের পূর্ণ আহার নয় তবু তার তেমন কিছুই হয় নি। উমা গাছের পাতাও না খেয়ে তপস্যা করছিলেন শিবের—পর্ণ গ্রহণও করলেন না বলে নাম হল অপর্ণা। ভরসা হয়, অন্নপূর্ণার বাপের বাড়ীর দেশের ছেলেরা অপর্ণার নাম রাখতে পারবে।

শঙ্কর গুপ্ত

বাংলা সংস্কৃতির রূপান্তর

আমাদের গর্ব আমাদের সংস্কৃতি। বাংলার সংস্কৃতি যে ভারতের অন্য যে কোন অঙ্গরাজ্যের সংস্কৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর একথাত আমরা সদর্পে উচ্চারণ করে থাকি; এমন কি পৃথিবীর যে কোন দেশের সংস্কৃতির চেয়ে আমরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ন্যূন নই এমন একটা ধারণা আমাদের অবচেতন মনে শেকড় গেড়ে বসে আছে। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের সংস্কৃতির বর্তমান রূপ নিয়ে কি কেউ চিন্তা করেছি? করলে কি আজও আমরা সংস্কৃতি গর্বে গর্বিত বোধ করতে পারব?

আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব আমাদের সাহিত্য; শুধু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বলেই এ গর্ব নয়, রবীন্দ্র-পূর্ব যুগের সাহিত্যে সৃষ্টির যে বিপুল প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তারই মিলিত প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্য তথা ভাষাকে যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও ভাষার সমশ্রেণীভুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। অথচ সেদিন সাহিত্যিকের আত্ম-প্রকাশ আজকের মত সহজ সাধ্য ছিল না। (হয়ত তাই সৃষ্টির সাধনায় একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা অনেক বেশী ছিল।) আজ যে কোন লেখকই তাঁর রচনা প্রকাশ অতি সহজেই করতে পারেন, ফলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে শূন্যতারই সৃষ্টি হচ্ছে বেশী। এখনো বাংলা সাহিত্যের বাজার যাঁরা মাত করে রেখেছেন, তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি কাল ন্যূনপক্ষে শতাব্দীর একপাদ অতিক্রম করেছে। অন্য লেখকেরা মরসুমী ফুলের মত ফুটে উঠেই ঝরে যান, তাঁদের হঠাৎ আলোর ঝলকানি চোখ ধাঁধালেও মন ভরায়না। তার ওপর বিদেশী দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্য কর্মের নিত্য নিয়মিত অনুকরণ অনুসরণ আর যাই হোক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের গৌরবান্বিত বা আশান্বিত করতে পারেনা।

সাহিত্যের অন্যতম অংগ গানের কথা ধরা যাক। একদিন বাঙালী কবি গর্ব করে বলেছিলেন,

> জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব,
> বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।

আজ কিন্তু সে গর্ব দূরে হতে বসেছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল প্রসাদ এমন কি নজরুল পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে বিদেশী সুরের অনুসরণ করেছেন বটে কিন্তু তাঁদের প্রতিভার যাদুদণ্ড স্পর্শে সে সুরলহরী আমাদের জাতীয় চরিত্র গ্রহণ করেছে। আজকে কিন্তু সুর-কারেরা সে যাদুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছেন, তাই একদা কংগো, নাইজার, জাম্বেসি তীরবর্তী অবাধ আনন্দের উন্দামতা আমাদের জীবনে পূর্ণ প্রতিফলনের প্রচেষ্টা এমন উৎকট আকার ধারণ করেছে যে সেই সুরবাহী হিন্দী গানের বাংলায় কথান্তর ঘটছে। অবশ্য সুরকারদের অক্ষম অপচেষ্টাকে ক্ষমা করা যেত যদি জনসাধারণ সে সব গানকে অগ্রাহ্য করত কিন্তু এই সব গানের অসম্ভব জনপ্রিয়তা এক অশুভ ইংগিতই বহন করছে। আমরা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বাংলা গানের প্রতি বিরূপতা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, উষ্মা প্রকাশ করি কিন্তু নিজেরা স্বেচ্ছায় বাংলা গানের যে সর্বনাশ করছি সে নিয়ে কোন কথাই বলিনা। ধৃতরাষ্ট্রের মত আমরা

এমনি ভাবে জেনে শুনে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছি।

শিল্পকলার অন্যান্য ক্ষেত্রেও আজ এই অবক্ষয়ের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমন কি বাংলার বিশ্বজিৎ প্রচেষ্টা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। একটু বিচার করলেই দেখা যাবে, 'পথের পাঁচালী' প্রভৃতি চলচ্চিত্র রূপায়নে মুখ্যত বিদেশীর চোখেই বাংলা দেশের ছবি ফুটে উঠেছে, কাজেই বিদেশে এত সুনাম পাওয়া সত্বেও স্বদেশে তা জনচিত্ত মনোহারী হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য জনসাধারণের রুচিবিকারের প্রশ্ন তুললে বলার কিছু থাকে না, কারণ কথাটা অপ্রিয় হলেও রূঢ় সত্য। তবুও প্রশ্ন থাকে, মুষ্টিমেয় যে চিন্তাশীল মণীষী আজো আমাদের মধ্যে আছেন, তাঁদের মত আমার মতের সংগে মেলে কি করে? কেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রশংসা করতে গিয়ে থিতিয়ে যান?

এত গেল শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্র। এবার ধরা যাক সামাজিক দিকের কথা। প্রথমে বলি সাজ পোষাকের কথা। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজেতো বটেই তথাকথিত নিম্নবিত্তের মধ্যেও আজ কাল বিদেশী পোষাক বিশেষতঃ ফুল প্যান্টের প্রচলন খুব বেশী দেখা যাচ্ছে। ঐ পোষাকে কাজকর্মের সুবিধা হয় একথা না হয় মেনে নেওয়া গেল কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে ঐ ধরণের বিদেশী পোষাক পরার কি যুক্তি থাকতে পারে? অথচ বিবাহাদি শুভকর্মেত বটেই শেষ কৃত্যের সময়ও ট্রাউজার পরিহিত শবযাত্রী আজকাল স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। স্বাধীনতার পর পোষাকের এ বিদেশীয়ানা যেন ক্রমবর্ধমান। অথচ নব জাগ্রত আফ্রিকায় এর বিপরীত ঘটনাই ঘটছে। সেখানে আগে পুরোপুরি পশ্চিমী পোষাকই ব্যবহৃত হ'ত কিন্তু স্বাধীনতার পর সামাজিক অনুষ্ঠানে জাতীয় পোষাক পরার রীতিই প্রচলিত হয়েছে।

নারীদের বেশভূষা সম্বন্ধে মন্তব্য অবান্তর বলে মনে করি। এ বিষয়ে নারী সমাজ থেকেই অশালীনতার কথা উঠেছে। তবে প্রসংগতঃ আধুনিক পোষাক সমর্থন করতে গিয়ে নারী আজ পুরুষের কর্মসংগিনী বলে যুক্তি দেখানো হয়, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি। নারীকে পুরুষের সংগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাতে নারীর নারীত্ব লুপ্ত হয়ে যায়নি। যদি প্রয়োজনে কোন নারীকে ট্রাউজার সার্ট পরতে হয়ত আমি তার সে পোষাকের সমর্থন করব; যেমন, নারী পাইলট বা ইঞ্জিনীয়ার বা ঐ ধরণের কর্মরতাদের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাই বলে নারীর উলংগবাহার পোষাকের পক্ষে কোন যুক্তি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এধরণের পোষাক নারীর হীনতারই দ্যোতক॥ পুরুষের কামনার সামগ্রী হওয়া ছাড়া তার যে অন্য কোন পথ নেই, এ পোষাক প্রকারান্তরে সেই কথাই স্বীকার করায়।

সংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশ পূজা, পার্বন, মেলা ইত্যাদি। বাঙালীর পূজাপার্বনে বাংলা সংস্কৃতি তথা বাঙালী সমাজের অবক্ষয়ের চিত্রই পরিস্ফুট। পূজা উপলক্ষে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কেউ আপত্তি করেনা, করা উচিত ও নয়; এমনকি প্রতিমা নির্মাণে আধুনিকত্ব ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ না করলেও তাকে মানতে রাজি আছি কিন্তু এগুলি শালীনতার গন্ডী ছাড়িয়ে যাতে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। ইদানীং কিন্তু প্রায় সর্বত্রই এ অবশ্য কর্তব্যে ত্রুটি ঘটছে। পূজাতে প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ গৌণ, মুখ্য হয়ে উঠেছে সাজ-সজ্জা, বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল। বৈদ্যুতিক আলোককে নিয়ন্ত্রিত করে প্রতিমাকে ক্ষণিকের জন্য অবলুপ্ত করে অন্য কিছু দেখানো কলা-কৌশলের দিক থেকে যতই আকর্ষণীয় হ'ক তাকে কোনমতেই অনুকরণীয় বলা চলেনা। কারণ কিন্তু ধর্মবিশ্বাস নয়, কারণ এ অবস্থা চলতে থাকলে পূজা-পার্বনের কোনই সাংস্কৃতিক মূল্য থাকবেনা। যাঁরা বৈজ্ঞানিক

কলা-কৌশল দেখাতে চান বা আমোদ-আহলাদ, হৈ-হুল্লোড় করতে চান তাঁরা স্বচ্ছন্দে জলসা বসাতে পারেন। অন্তত তাহলে কারো তরফ থেকে আপত্তি করার কোনো কিছু থাকবে না কিন্তু পূজা যদি করতে হয় তবে তা যেন যথোপযুক্ত পরিবেশেই হয়।

মেলার সংগে দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরতম যোগের কথা সুবিদিত কিন্তু সেখানেও আজ নাগরিক কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। সহরের মাইক পল্লীতেও অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং তারই আনুষংগিক হিসাবে পল্লীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবলুপ্তির পথে। এখন গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপায়ন আর গ্রামবাসীদের প্রীত করতে পারেনা, তাদের এখন প্রয়োজন নাগরিক আনন্দ বিলাসের উত্তেজনা। এতে শুধু যে সামাজিক বনিয়াদেই ভাঙন ধরছে তাই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপর্যয়ের সূচনা হচ্ছে।

মোটকথা, বাংলা সংস্কৃতির যে নবরূপায়ন ধীরে ধীরে আমাদের সজ্ঞান মনের অগোচরে গড়ে উঠছে তাকে স্বাগত জানাতে পারছিনা। অবশ্য সহর কলকাতার জলসার মালায় বংগ সংস্কৃতির রূপরেখা প্রস্ফুটনের কিছুটা প্রচেষ্টা যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু আমাদের উলটো রাজার দেশে তার ফল ভালর চেয়ে খারাপই হয়; গ্রামের সরল বাউল সহরের পরিবেশে এসে চোখ ধাঁধানো অবস্থায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; তার তখন সিল্কের আলখাল্লা, বিজলী বাতি, ধূমায়মান চায়ের কাপ না হলে চলে না। ফলে তার পুরানো পরিবেশের সংগে সংযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়, সহরের কৃত্রিমতার মধ্যে আর এক কৃত্রিম বস্তু হয়ে ওঠে সে।— না ঘরকা, না ঘাটকা।

এই না ঘরকা, না ঘাটকা অবস্থা আজ বাঙালীর জীবনের সর্বত্র। হয়ত জীবন যুদ্ধে পশ্চাদপসরণের যে ইতিহাস বাংলা ও বাঙালীর জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে উঠেছে, এ অবস্থার মূলকারণই তার মধ্যেই নিহিত। বাঙালী আজ হারছে তাই জয়ের আশায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পরানুকরণ তথা অনুসরণ তার অবশ্যকর্তব্য মনে হচ্ছে। কিন্তু ফলে আর্থিক দিক থেকে কতদূর লাভবান হওয়া গেছে সে খবর অর্থনীতিকরা বোঝাতে পারবেন, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের যে কোন রকম লাভই হচ্ছেনা তাতো দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

এত কথা বলার পর, পাঠকদের পক্ষ থেকে আমাকে সেকেলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল বলার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু পুরানো সব কিছুকেইত আমি ভাল বলছিনা। আজকের দিনে উনবিংশ শতকের পরিবেশকে ফিরিয়ে আনার বাতুল পরিকল্পনা আমার নেই। আমি সতীদাহ প্রথাকে বর্বরতা বলেই স্বীকার করি; শিশুকন্যা হত্যা বা গংগাসাগরে সন্তান বিসর্জনকে সমর্থন যোগ্য বলে বিবেচনা করিনা। আজকের সমাজে যে পুরানো জাতিভেদ প্রথা মূল্যহীন একথা মানতে আপত্তি নেই আমার কিন্তু তাই বলে আমাদের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সবটুকু অর্থহীন কুসংস্কার এমন কথাও মানতে পারিনা। বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণেও এ কথা স্বীকৃত হয়নি।

প্রত্যেক জাত নিজেদের কোন কিছু বৈশিষ্ট নিয়েই গর্বান্বিত থাকে; আমাদের মত নিজেদের বৈশিষ্টকে অবজ্ঞা করার রীতি পৃথিবীর সর্বাধিক প্রগতিশীল দেশেও প্রচলিত নেই। মুখে আমরা নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে যতই বড়াই করিনা কেন, মনে মনে যে আমরা সে সংস্কৃতিকে সামান্য সাধারণ বলে মনে করে থাকি, তাতো আমাদের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে নিত্য সপ্রমাণ হচ্ছে। নিজের জিনিষকে ভাল বলে মনে করলে কেউ কি পরমুখাপেক্ষী হয় না পরের আচার, পোষাক নকল করে সঙ সাজে?

বাঙালীর সংস্কৃতিই বাঙালীর একমাত্র গৌরব, এমন একটা বোধ বাঙালীদের সকলেরই মনে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। একটা জাত অবশ্য তার সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু সে সংস্কৃতিরও উন্নততর ও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত স্থাপনের আন্তরিক প্রচেষ্টা হচ্ছে কোথায়? জলসা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এদিক থেকে অনস্বীকার্য। অথচ বাঙালী জীবনের অবক্ষয়েরই প্রকাশত সেখানে দেখা যাচ্ছে। জাতীয় জীবনের এ দুর্লক্ষণের প্রতি বাঙালীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অবহিত নাহলে বাংলা সংস্কৃতির নবরূপায়নে বাঙালীয়ানা বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকবেনা। বাঙালীকে তখন সংগ্রহশালা আর গ্রন্থাগারে খুঁজতে হবে। তার আগেই আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙা উচিত নয় কি?

রবি মিত্র

গগনেন্দ্রনাথ

বাংলাদেশে যত শক্তিশালী শিল্পী জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ অন্যতম। দুর্ভাগ্যক্রমে গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা ও তাঁর চিত্রের ক্রমশঃ বিবর্ত্তন ইতিহাস বিমুখ সমালোচক দ্বারা সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত। এই অবজ্ঞা নৈরাশ্যজনক ও শিথিল চিন্তার পরিচায়ক। রং ও রেখার মায়াজাল গগনেন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে এক অনন্য সাধারণ স্তরে উন্নিত করেছে। কিন্তু সমালোচকের অন্যায় দণ্ড সেখানে রস গ্রহণে বাধা এনেছে। তাঁর ছবির নতুনরূপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। তাই ইদানিং কালে গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা প্রস্তাবনা এদিকে ওদিকে হচ্ছে, কিন্তু এ ধরণের আলোচনা, যা লঘু মনোভাব থেকে সৃষ্ট, না হলেই যেন ভাল হতো। এই সমস্ত আলোচনায় শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অপেক্ষা আমাদের পরমত অসহিষ্ণু মতবাদের ধৃষ্টতা বেশী মাত্রায় প্রকট। আমরা ভুলতে বসেছি যে গগনেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের প্রধান ঋত্বিক। তাঁর শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান, রেখার পরিমার্জিত অবতারণা, প্রয়োগ পদ্ধতির অসাধারণ মাধুরী বর্তমানকালের শিল্পীদের শিক্ষার ও আলোচনার বিষয় হওয়া উচিৎ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেখানে আলোচনা কিংবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁর ছবির মূল্যায়ন না করেই লঘুভাবে তাঁকে আমরা কিউবিষ্ট মতপন্থী শিল্পী হিসাবে অখ্যায়িত করি। এই ধরণের উক্তি শিল্পীর প্রতি যেমন অসৌজন্যমূলক মনোভাবের পরিচায়ক তেমনি কিউবিজিম্ সম্পর্কে নতুন তথ্য অন্বেষণ করার পথেও অন্তরায়।

যে সমাজে গগনেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, সেই সমাজ তখন পুরাতাত্বিক জ্ঞান চেতনায় অতীত অন্বেষণ এবং সমন্বয়ের পথ সন্ধানে ব্যাপৃত। সেই অবস্থায় গগনেন্দ্রনাথের শিল্প সৃষ্টি বলিষ্ঠ ভাবের দ্যোতক। তাঁর ঐতিহাসিক বুদ্ধি উদ্দীপিত শিল্প জ্ঞান তখনকার সামাজিক আবহাওয়ায় বিপ্লব বিশেষ। আর সেই কারণেই তিনি শিল্পী হিসাবে অল্প কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চিত্র সম্পর্কিত আলোচনা এবং গগনেন্দ্রনাথ চিন্তা মানসের সঙ্গে পরিচয় ইদানিং কাল ছাড়া তখনকার রসিক সমাজে তাঁর পরিচয় কার্টুনিষ্ট্ হিসাবেই সমধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনে তিনি শিল্পী অপেক্ষা কার্টুনিষ্ট্ হিসাবেই পরিচিত হয়েছিলেন।

যে কালে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভায় ভারত শিল্পের আত্মার সন্ধান ও পুনরুদ্ধার কালে জাপানী শিল্পী ওকাকুরা ও টাইকোয়ানের সংগে পরিচিত হন, সেই সময়েও তিনি গোঁড়া তথাকথিত সমাজবাদী সংরক্ষণশীল ব্যক্তি দ্বারা আক্রান্ত এবং অন্যায় সমালোচনায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন। তবুও তিনি তাঁর শিল্প প্রতিভায় অমার্জিত সমালোচনার উদ্‌গীরণকে অবহেলা করে ভারতশিল্প কলার মাল্যসূত্রে যে আশ্চর্য্য কলাচাতুর্য্যের অবতারণা করেছিলেন তাতে করে বাংলাদেশে এক অভিনব শিল্প পদ্ধতির উন্মেষ দেখা দিল। গগনেন্দ্রনাথও একান্ত নিভৃত সাধনায় অত্যাদ্ভুত জাপানী জলে ধোয়া পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে অবনীন্দ্রযুগে আর এক বিচিত্র শিল্প পদ্ধতির পরিচয় দিলেন। তখন তাঁর বিচিত্র চিত্রমালা আমাদের এক আশ্চর্য্য জগতের সংগে পরিচয় করিয়েছিল, কিন্তু সেই পরিচয় পত্র বহন করেছিল যে চিত্রমালা তাকে সাদর শিল্পের অন্দর মহলে স্থান দেইনি। অবনীন্দ্রনাথ ভারতচিত্র কলার এক নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা করলেন, গগনেন্দ্রনাথ সেই নতুনযুগে আরও আধুনিক চিন্তা সংযোজন করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের জগত আমাদের অনেক পরিচিত ভাবের দ্যোতনাকে রূপায়িত করল জাপানী 'হোতিহার' কিংবা তুলির মাধ্যমে। বর্ণলেপনের মাধুরী ছায়াময় মিষ্টতা মনের দরজায় বহন করে আনল অনেক দিনের বিস্মৃত স্বপ্নাবেশ। যেন মনে হলো এ জগত আমার পরিচিত আমার ঘরোয়া গল্পের ঘরোয়া পরিবেশে তা মধুর। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা মুগ্ধ শিষ্য সমাজে এই রং আর রেখার যাদুতে নতুন পদ্ধতি প্রকরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রথায় প্রচলন করলেন। উল্লেখযোগ্য যে জাপানী শিল্পী টাইকোয়ানও ভারত শিল্প সন্ধানের প্রয়াস কল্পে অবনীন্দ্র সান্নিধ্য জাপানী শিল্প মালায় এক অদ্ভুত চিত্রসৃষ্টিতে অমর হয়ে আছেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি উল্লেখ করি তাঁর অমর চিত্র 'রাধাকৃষ্ণের দোললীলা'। ভারত জাপান চিত্রকলার এক চমৎকার নিদর্শন।

গগনেন্দ্রনাথ এই আবহাওয়ায় থেকেও একক এবং অনন্য সাধারণ। মনোরম জাপানী ওয়াস পদ্ধতিকে তিনি আলোছায়ার মায়াজালে মনন ধর্মী শিল্প চাতুর্যে প্রকাশ করেছেন। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি কিংবা আইডিয়ার অবতারণার যে প্রয়াস শিল্পকলায় প্রচলিত ছিল তার বন্ধন থেকে মুক্ত গগনেন্দ্রনাথ আপন প্রয়োগ ভঙ্গীমায় আধুনিক শিল্প কলার নতুন দিক দর্শনে প্রতিভাত করলেন। যে জগতের সৌগন্ধ তিনি বহন করে আনলেন তার সংগে, সেই অভিনব জগতের সৌন্দর্য্য সত্বার সংগে আমাদের মানসিক যোগসূত্র একান্তভাবে ক্ষীণ। কিন্তু সহিষ্ণু শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ না করে অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। অজ্ঞতাবশত তাঁর ছবির কালোসাদা জমির কৌণিক, সরল ও বক্ররেখা সমন্বিত বিন্যাস; আলোছায়ার ছায়াঘন মায়ামাধুরীকে লঘুভাবে আমরা কিউবিজিম্ পদ্ধতি বলে অভিহিত করেছি। কিউবিজিম্ শব্দটি প্রকৃত পক্ষে আধুনিক শিল্প কলার এক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধি, যুক্তি এবং কল্পনার বাধা বন্ধনহীন বিহার, কিউবিজিম্ শিল্প পদ্ধতিতে এক নতুন অর্থের এক নতুন জগতের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছিল। কিউবিজিম্ শিল্প পদ্ধতিতে ডাইমেনসন্ বা বেদ এক নতুন দৃষ্টিতে প্রতিফলিত। শিল্পী কল্পনার উদ্দাম ঘোড়া ছুটিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টি সীমাকে অতিক্রম করে আপন মনোজগতের অভিনব রূপ প্রকাশকে প্রকাশ করেছে। ডাইমেনসন্‌গত যে ইল্যুশন ছবিতে অবতারণা করা হয়, সেই ইল্যুশনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে দূরত্বসূচক স্পেস্ কল্পনাকে সমষ্টিগত একটি ফর্মে প্রকাশ করে। কল্পনার চোখে দেখা এই কল্পিত ফর্ম দুটি ডাইমেনসন্‌গত (ফর্ম ও সারফেস্) চিত্র সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়। সে ইল্যুশনের মায়ালোক সাধারণত আমরা ছবিতে দেখি সেই ইল্যুশনকে কিউবিষ্ট্ শিল্পী নিছক রূপ প্রকাশের দ্বৈত ডাইমেনসনের মাধ্যমে প্রকাশ

করে। সেখানে শিল্পী-সৃষ্টি জগতের সন্ধান করতে হলে বস্তুরূপের বাহ্যিক প্রকাশের অন্তরালে যে অব্যক্ত রূপটি আছে তার বহিরারণ সরিয়ে নিছক রূপ বিকাশকে উপলব্ধি করতে হবে। বাহ্যিক রূপ আমাদের সর্বদাই সর্বসময়ে চোখের সীমিত অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতার খিদে মেটাচ্ছে। তাই সেই বস্তুরূপই চূড়ান্ত এই বোধের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা সেই বস্তুরূপের বাহ্যিক-রূপ প্রকাশের মধ্যেই নিজেদের অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। চিত্রবিচারে আমরা সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাই। চোখের দৃষ্টি সীমার মধ্যে যে গতানুগতিক ফর্ম তার মাধ্যমেই ছবির রস গ্রহণে প্রয়াসী হই। তখন আর সেখানে নতুন দৃষ্টিকোণে দেখা রূপটি থেকে রস আমর পাইনা। সত্যবস্তুর অন্বেষণ তখন আমাদের দৃষ্টি সীমাগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা অর্জিত আংশিক বোধের কাছে মর্যাদার আসন পায় না। গগনেন্দ্রনাথ কিউবিষ্ট্ মতানুসারে ডাইমেনসনকে আরও সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করাটি গ্রহণ করেন নি। তিনি ডাইমেনসন্‌কে ছবির প্রয়োজনীয় ইল্যুশনের মাধ্যমে প্রকাশ করে ছবি এঁকেছেন। কল্পনার পথে কিউবিষ্ট্ উদ্দামতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতিগুণে ছবির রস বস্তু কিউবিষ্ট্ রচনার মূল সুর থেকে অনেক দূরে। সেখানে তিনি একান্তভাবে গগনেন্দ্রনাথ পন্থী। শিল্প ইতিহাসে গগনেন্দ্রনাথ একক এবং নবমতের ধারক। তাঁর রং ব্যবহারে ডাইমেনসন্ তার ইল্যুশন্ নিয়েই আশ্চর্য্য মায়ালোকে দূর প্রসারী কল্পনায় মোহময় হয়েছে। সেখানে গগনেন্দ্রনাথ কিউবিষ্ট্ এইমত শিল্পীর পক্ষে অবমাননাকর। সাধারণভাবে কৌণিক, জ্যামিতিক প্রয়োগভঙ্গী দেখলেই কিউ-বিজিম্ বলার একধরণের প্রবণতা আমাদের আছে। গগনেন্দ্রনাথের কৌণিক ফর্ম এবং সরল রেখা আর বক্ররেখার সমন্বয়গত ছবিগুলি দেখেই তাঁর ছবির বিভিন্ন রূপ মাধুরীর উৎস অনুসন্ধান না করেই তাঁকে কিউবিষ্ট্ বলে অভিহিত করি।

আধুনিককালে ম্যালভিক্ কিংবা মনড্রে প্রমুখ শিল্পীরা প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের বিভিন্ন উপলব্ধির রূপ কল্পনাকে বিশেষ এক পদ্ধতিতে নিছক রেখা আর জমির সমীকরণ মাধ্যমে প্রকাশ করে চলেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ বিকাশ তাঁদের অনুভূতির জগতে এক বিচিত্র প্রতিফলিত চেতনায় মিশ্রিত হয়েছে। সরল রেখা, বক্ররেখা স্পেসের সমতল তট প্রান্তকে বিচিত্র রূপ বন্ধনে অলংকৃত করে সহজ রূপের বিকাশকে মেলে ধরেছে। বস্তুরূপের বাহ্যিক প্রকাশকে তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করে মনোভাবের জগতকে প্রতিফলিত করেছেন। জগদ্দল পাথরের মত বস্তুপিণ্ডের ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত বোঝাকে মুক্তি দিচ্ছেন সরল সাধারণ প্রতীক ধর্ম্মী চিত্র বিন্যাসে। গোলাকার, ত্রিকোণ; সরলরেখা ও বক্ররেখার বিভিন্ন সমীকরণকে প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণভাবে অনুভবের জগত থেকে। শিল্পীর সঙ্গে প্রকৃতির আত্মাকে একাত্মা করার জন্যে বহুযুগ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত বস্তুরূপের প্রকাশটি মার্জিত, পরিশ্রুত, মনন ধর্মী চিন্তায় রূপ দিচ্ছেন। আধুনিক গগনেন্দ্রনাথ তাঁর মননধর্মী চিত্র সৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগতের পটভূমিকে মার্জিত রূপবোধের মাধ্যমে অনেকাংশে প্রতীকী করে তুলছেন। ছবির অনাড়ম্বর পরিবেশ সহজরূপবোধটিকে রেখা আর স্পেসের সমীকরণে পরিবেশন করেছে। বাহ্যিক রূপ প্রকাশকে অন্তর্নিহিত গূঢ় জগতের সঙ্গে মিলিত করে গগনেন্দ্রনাথ চিত্র সৃষ্টিতে প্রতীকধর্মী সুপ্রি-মাটিষ্ট্ চিন্তায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। রেখা আর জমির বিভিন্ন এ্যাবষ্ট্রাক্ট বিন্যাস, বিশেষকরে তাঁর শেষদিকের ছবিগুলিতে এক অদ্ভুত সাদৃশ্যবহন করে আধুনিক কালের ম্যালভিক্ ও মনড্রের শিল্প প্রয়াসের সঙ্গে। ম্যালভিক্ ও মনড্রে বস্তুরূপকে সম্পূর্ণ

ভাবে অস্বীকার করেছেন, গগনেন্দ্রনাথ বস্তুরূপের সত্বার নতুন মূল্যায়নের পথে বস্তুরূপেরই কৌণিক, ভঙ্গ ভঙ্গিমাকে ভাবাবেগের জগতে এক নতুন রূপ গত অর্থে প্রকাশ করেছেন। এখানেই তিনি একক এবং অগ্রগামী চিন্তার পথপ্রদর্শক।

হাজিমে সো

হাজিমে সো জাপানী শিল্পী। ভারতবর্ষে দুবছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভারতশিল্পের প্রকৃতরূপ বোঝবার জন্যে তিনি বিভিন্ন তীর্থ স্থানগুলিও দেখেছেন। উত্তর ভারতের বিশেষ স্থানগুলি দেখা শেষ করে দক্ষিণ ভারত দেখতে বেরুবেন। ভারতবর্ষের দর্শন, সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও ধর্মীয় রূপবন্ধনে বিভিন্ন মূর্ত্তি ও কারুকলার প্রতি তাঁর সহৃদয়তা বর্ত্তমান। গতমাসে আর্টিষ্ট্রী হাউসে তাঁর এক একক শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদেশের দেবতার লীলা সমৃদ্ধ বিভিন্ন লোকায়াত মূর্ত্তিগুলি তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস বলেই মনে হবে। শিবের কিংবা গঙ্গার রূপ কল্পনায় তিনি আধুনিক রূপ-বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করেছেন। 'ধ্যান' ছবিটির পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে শিল্পীর পাকা হাতের ছাপ বর্ত্তমান। কিন্তু স্কেচ্ কিংবা ছোট ছোট ছবিগুলির মধ্যে কোন ওস্তাদি হাতের ছাপ নেই। সেগুলি সাধারণ রেখা আর জমির সমীকরণ। তবুও ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি বিদেশী মন আমাদের মুগ্ধ করে। ছবিতেও ভারতীয় ভাবের আবেদন প্রদর্শনীটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল।

নিখিল বিশ্বাস

সমালোচনা

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৫৮॥ সম্পাদক ঃ বি এস কেশবন। সহসম্পাদক ঃ সুনীলবিহারী ঘোষ ঃ প্রকাশক; স্টেট ব্যুরো অব্ এডুকেশন শিক্ষাবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; মূল্য পাঁচটাকা।

মহাকাশচারী দ্রব্যমূল্য, ভেজাল এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই যুগে সরকারী উদ্যমের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠেন না, ভারতমাতার এমন সাহসী সন্তান মিলিটারী বিভাগের বাইরে একটিও আছেন কিনা জানবার জন্য আমার এক বন্ধু একবার কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। বন্ধুবর কলেজের অধ্যাপক, ফলে পরীক্ষার উপমা দিয়ে বলেছিলেন, চোদ্দ বৎসর বয়স্ক শ্রীমান ভারত সরকারের হোমটাস্কের খাতা পরীক্ষা করে দেখলে একশোর মধ্যে গোল্লার বেশী পাওয়ার কোনো চান্স নেই। তারপর একটু ভেবে বন্ধুবর নিজেকে সংশোধন করে বলেছিলেন, "থুড়ি একেবারে গোল্লা দেবোনা। অন্ততঃ এক দেবো"। শ্রীযুক্ত আজাদ এবং কবীরকে ধন্যবাদ, বাইরের লোকের পাতে দেবার মতো একটি জিনিস তাঁরা সযত্নে তৈরি করতে সাহায্য করেছেন। সেই জিনিসটির নাম ন্যাশনাল লাইব্রেরি। হাজাররকম দুষ্টুমির মধ্যেও কার্জন সায়েব যেমন ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করে ইনটেলেকচুয়াল কলকাতাওয়ালাদের প্রেস্টিজ রক্ষে করেছিলেন, তেমনি স্বাধীন শনিঠাকুরের নেক নজরেও রাজকীয় লাইব্রেরি সত্যিই জাতীয় গ্রন্থাগার হয়ে উঠেছে। এই আপাতঃ অসম্ভব ঘটনার জন্য যাঁরা দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাঁদের প্রায় প্রথমেই রয়েছেন শ্রী বেলারী সামান্য কেশবন।

শ্রীযুক্ত কেশবন শুধু জাতীয় গ্রন্থাগারের বারলক্ষ বই-এর গ্রন্থগারিক গার্জেন নন, তিনি কলকাতার নব্য-বিদ্যা আন্দোলনের একজন নেতাও বটে। কলকাতার সমাজ জীবনে কোনো ভিন্নপ্রদেশীয় সরকারি কর্মচারি কোনো দিন এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বর্তমান সমালোচকের জানা নেই।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির অংশ না হলেও, বেলভিডিয়ারের আশ্রয়ে এবং শ্রীযুক্ত কেশবনের নিপুণ প্রশ্রয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে তার নাম—সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরি। কোনো একদিন এই প্রতিষ্ঠানকে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করা হবে শুনেছি। দিল্লীর নিরস মাটিতে বনমহোৎসবের এই শিশুবৃক্ষের কী অবস্থা হবে তাও জানি না; কিন্তু আলিপুরের সবুজ ঘাসেভরা লাটভবনে কর্তৃপক্ষ যে প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন তা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়; বিশ্ব বিদ্যান সভায় জাতীয় সম্মান রক্ষার পক্ষে তা অপরিহার্য। জাত আছে, গ্রন্থ আছে, গ্রন্থাগার আছে অথচ জাতীয় গ্রন্থ-তালিকা নেই। এমনই এক লজ্জাজনক অবস্থায় কয়েকবছর আগেও আমরা পড়েছিলাম। সেন্টাল রেফারেন্স লাইব্রেরির তত্বাবধানে অবশেষে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল বিব্‌লিওগ্রাফী প্রকাশিত হয়েছে। পার্লামেন্টে পাশ করা এক আইনের বলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভারতবর্ষে প্রকাশিত সমস্ত বই-এর এক কপি বিনা মূল্যে পাবার অধিকারী। এই আইন অনুসারে পাওয়া অসমীয়া, ইংরিজী, উর্দু, ওড়িয়া, কান্নাড়া, গুজরাতী,

তামিল, তেলুগু, পাঞ্জাবী, বাংলা, মারাঠী, মালয়ালম, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত নতুন বই-এর প্রামাণ্য তালিকা হল, ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্জিকা ইংরিজীতে তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হওয়ার কথা। এবং বছরের শেষে ক্রমচয়িত বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থাও হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোনো প্রকাশন-সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত বই ছাড়াও, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবল, স্বরলিপি, মানচিত্র, পত্রিকা, পাঠ্যপুস্তক নির্দেশিকা, অর্থপুস্তক এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকাশন—যেমন ব্যবসায় তালিকা, টেলিফোন নির্দেশিকা, আইনবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বিবরণী ও আর্থিক হিসাব নিকাশ, সস্তাধরনের উপন্যাস এবং প্রচারপুস্তিকা—এই তালিকাভুক্ত করা হয় না।

মূল জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ইংরিজীতে প্রকাশিত হয়, কারণ পৃথিবী সবগ্রন্থাগারিকই এমন একটি বইকে হাতের গোড়ায় রাখতে চান। বিশ্বের দরবারে ভারতের সারস্বত সাধনার ওইটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য টাইমটেবিল। কিন্তু ইংরিজী বার্ষিক সংকলনটি শুধু আকারে বৃহৎ নয়, মূল্যেও অনেক সাধারণ গ্রন্থবিলাসীর আয়ত্তের বাইরে। এই কারণে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় কয়েকটি রাজ্যসরকার নিজ নিজ এলাকার ভাষায় প্রকাশিত সকল বইয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ১৯৫৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারে পাওয়া সমস্ত বাংলা বইয়ের এই গ্রন্থপঞ্জী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ১,০৮২টি বাংলা বই আইন অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে। সেই বইগুলির খবর দেওয়া হয়েছে এই তালিকায়। বইটির সুবিধে অনেক। একটি বিশেষ বইকে কোন তালিকায় ফেলা হবে, সে নিয়ে আমাদের পাড়ার অনারেরি এবং অ্যামেচার লাইব্রেরিয়ানদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকে। যিনি চাঁদা আদায় করেন, তিনি চান ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, ধর্মগ্রন্থ সবই "উঃ" চিহ্নিত করা হোক। তাতে সভ্যদের লাইব্রেরির উপর আস্থা বাড়ে —চাঁদা আদায় করা সহজ হয়, কারণ অধিকাংশ সভ্যই উপন্যাস তালিকার বহির্ভূত বই কেনাকে অর্থের অপচয় মনে করেন।

বর্তমান লেখকের এক বন্ধু একটি স্মৃতি কাহিনী রচনা করেছিলেন। একটি পাড়ার লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কিছুদিন পরে দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম, "বইটা সম্বন্ধে পাঠকরা কী বলছে? লাইব্রেরিয়ান নিবেদন করলেন, বলবেন না মশায়, এতোদিন "ইঃ" (অর্থাৎ প্রবন্ধ, জীবনী, অন্যরচনা, স্মৃতিচিত্র ইত্যাদি)র মধ্যে রেখেছিলাম, একবার ইসু হয়নি। গত সপ্তাহে ট্রান্সফার করে "উঃ"-তে ফেলে দিয়েছি। তারপর থেকে বই আর আলমারিতে ফিরছেনা। শুধুই ঘুরছে।"

যে লাইব্রেরিতে এই সমস্যা নেই সেখানেও গ্রন্থগারিকরা বিষয়তালিকা প্রস্তুত করতে বিশেষ বিপদে পড়েন। এই গ্রন্থ তালিকা কাছে থাকলে, তাঁদের খুব সুবিধে। বইটির নাম দেখে, তার পাশের ডিউই নম্বরটি লিখে নিতে পারেন। বই-এর নাম জানা থাকলেও প্রকাশকের ঠিকানা জোগাড় করা অনেক সময় বেশ কঠিন কাজ। এই তালিকা হাতের গোড়ায় থাকলে তারও কোনো অসুবিধা নেই।

গ্রন্থপঞ্জীর শেষে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই জানলাম ১০৮২টির মধ্যে সাহিত্যবিষয়ক (নাটক, নভেল, কবিতা ইত্যাদি) বই ৬২৮টি। তারপরেই (ইস্কুল কলেজের দৌলতে) ইতিহাস—১৪২, কৌতুক ও ব্যঙ্গসাহিত্যে আগ্রহী পাঠকরা জেনে রাখুন ঐ বিষয়ে লেখকরা পাঁচকোটি বঙ্গসন্তানদের জন্য মাত্র তিনখানি বই লিখতে সমর্থ

হয়েছেন! অথচ উপন্যাস ফে'দেছেন ৩৬১ খানা।

লেখকদের উৎপাদন ক্ষমতার ইঙ্গিতও একটু চেষ্টা করলে বই থেকে পাওয়া যেতে পারে। পুরোভাগে রয়েছেন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং শশধর দত্ত ইত্যাদি শ্রদ্ধেয়গণ। নীহারবাবুর বারোখানি, নরেনবাবুর ছ'খানি এবং শশধর বাবুর পাঁচখানি বই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একবছরের বাংলার তালিকা থেকে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ধারা সম্বন্ধে, একটি সুন্দর আলোচনা করা হয়তো সম্ভব হতো। কিন্তু তার মধ্যে যে হতাশার চিহ্ন প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বাঙালী লেখক ও পাঠক উভয়েরই ক্ষতি করতে পারে।

১৯৫৮ সালে গ্রন্থপ্রণয়নে লেখকরা কতকখানি নিষ্ঠাবান ছিলেন জানি না; কিন্তু ঐ সালের গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নে সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীলবিহারী ঘোষ যে অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের অভিনন্দন যোগ্য। তাঁর পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অভাব দূর হয়েছে। আমরা ১৯৫৯, ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালের তালিকাগুলির জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। আশা করি এগুলি সত্বর প্রকাশিত হয়ে গ্রন্থাগারিকদের কাজ সহজ করে দেবে।

পরিশেষে নিবেদন, এই সুমুদ্রিত, সুরুচিপূর্ণ সংকলনের প্রথমেই সামান্য ছন্দপতন ঘটেছে। ইংরিজী তালিকা বাংলায় মুদ্রণের জন্য যখন শ্রীযুক্ত কেশবন এবং তাঁর সহকারীরা এতই পরিশ্রম করলেন, তখন আরও একটু কষ্ট স্বীকার করে শ্রীযুক্ত কবীরের ইংরিজী ভূমিকাটিকেও বাংলায় ভাষান্তরিত করলে বোধ হয় শোভন হত।

এম্‌, শঙ্করন্‌

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্যে আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

আপনার মাল
পি প্যাক এল লেবেল এম মার্কা
পদ্ধতিতে রক্ষা করুন

ক্ষতিগ্রস্ত বা হারানো মালের খেসারত মেটাতে প্রতি বছর রেলওয়ের কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। আপনার সামান্য যত্নে জাতীয় অর্থের এই বিরাট অপচয় প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হতে পারে।

লেবেল

আপনার করণীয়:

- পাকাপোক্ত ভাবে পেরেক লাগান।
- বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে এমন জিনিষ প্যাকিং এর কাজে ব্যবহার করুন।
- একটি বা দু'টি পরিচয় পত্র এবং লেবেলের একটি সকল বাক্সের ভেতরে রাখুন।
- পুরনো মার্কা তুলে ফেলুন।
- পাকা কালিতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ক'রে ঠিকানা লিখুন।
- নির্ভুলভাবে মার্কা দিন।
- কি ধরনের মাল তা' লিখে দিন।

পূর্ব রেলওয়ে

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা। ষান্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা, ষান্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষান্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষান্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

কোলে
গ্লুকোস
বিস্কুট
রুচিপ্রদ ও পুষ্টিকর
স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিধির নির্দ্দেশমত
সেরা উপাদানে
বৈজ্ঞানিক উপায়ে
আধুনিকতম কলে প্রস্তুত
KOLAY
GLUCOSE
BISCUITS
KOLAY
Glucose
বিস্কুট ও লজেন্সের সেরা
কোলে
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

নবম বর্ষ। দশম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নীতি-কবিতা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

জীবনের রূপ বহুমুখী। একদিক থেকে তাকে দ্বিমুখীও বলা যেতে পারে একপক্ষে তার বাইরের রূপ তথা জীবন-পালা, অন্যপক্ষে তার অন্তর রূপ তথা মানস-লীলা। প্রথমটি ব্যবহারিক বিদ্যা, দ্বিতীয়টি, তাত্ত্বিক জ্ঞান। বাইরের রূপ অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা ও জীবনসংগ্রামপদ্ধতির সঙ্গে প্রচলিত-প্রবহমান মানস-আদর্শের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। তদভাবে অসুন্দর-বিকৃতি একাধিপত্য লাভ করে। হাজার-হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের পেরিয়ে-আসা অধ্যায়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে সভ্যতার উত্থান-পতনের বিচিত্র আবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। এই পতন-অভ্যুদয়ের নানা কার্য-কারণ আছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধানতম—ব্যবহারিক বিদ্যা ও তত্ত্বীয় জ্ঞানের যোগ-বিয়োগ।

এই দ্বি-মুখী রূপ কেবল যে সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রেই সত্য-তা নয়, জীবনের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কেও সমভাবে সত্য। কয়েক হাজার বছর আগে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রাচীন শিল্প বিজ্ঞান ও দর্শন বিকশিত হয়ে উঠেছিল ব্যাবিলনে, মিশরে ভারতবর্ষে, মহাচীনে, তার পশ্চাতে আরও অনেক-কিছুর সঙ্গে সক্রিয় ছিল তত্ত্ব ও তার ব্যবহার তথা প্রয়োগের সাযুজ্য। যেদিন এই সাযুজ্য বিচ্ছেদে পরিণত হল, সেদিন সেইসব সভ্যতারও পদস্খলন ত্বরিত হল। গ্রীক, বেদোত্তর ভারতীয় এবং তৎপরবর্তী আরবীয় শিল্প-বিজ্ঞান দর্শন সম্পর্কে এই একই তথ্য পাওয়া যায়। ধর্মের এলাকাতেও অনুরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ধর্মের একদিকে তত্ত্ব-দর্শন-সাধনা, অন্যদিকে এগুলির বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ। এই দুইয়ের মধ্যে নিবিড়তম যোগ যতদিন ছিল, ততদিন ধর্ম সমাজে ও মানসে একটি 'শক্তি' রূপে কাজ করেছে। আজ যে তার বিপরীত পরিণতি দেখি, তার কারণ ধর্ম বা ধার্মিকতা নয়, অন্যত্র নিহিত। এই পরিণামের সবচেয়ে বড়ো কারণ—ধর্মীয় তত্ত্বের এবং বাস্তব ও ব্যক্তি জীবনে তার প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে। আজও অনেকে মঠে-মসজিদে-গির্জায় যান, শাস্ত্র শোনেন ও পড়েন, দেবতার পুজো করেন, অনেক ক্ষেত্রে আন্তরিকতারও অভাব হয় না। কিন্তু সেও কেবলমাত্র ধর্মের

এলাকাটুকুরই মধ্যে, তার বাইরে বৃহত্তর সমাজ জীবনে ও ব্যক্তি-চরিত্রে সেই ধর্মবোধকে প্রয়োগ করেন না। দুটো আলাদা এলাকা হয়ে গেছে আজ, যেন পরস্পর-বিরোধী শিবির। দৈবচেতনা ভালো কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত, সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর, আসল কথা, আমাদের বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞান এবং আমাদের কাজ ও চরিত্র—এ দুয়ের মধ্যে আজ আর আদৌ কোন যোগ নেই। সে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, এমনকি নীতিবোধের ক্ষেত্রেও।

আদিম প্রস্তর-যুগের মানুষ সমাজ গড়েছিল বাঁচবার দুরন্ত তাগিদে, বাস্তব লড়াইয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে। কিন্তু এই ব্যবহারিক দিকটাই সেকালীন সমাজ-গঠনের একমাত্র উপকরণ ছিল না। সমাজগড়ার ভিত্তিমূলে ছিল কতকগুলি বিধি ও নীতি; শুধু বিধি-বিধান নয়, নীতিবোধও। দুটি সমার্থক নয়। একটি আইন, রুল্স্ ল; অন্যটি আদর্শ, মর্যালিটি, এথিক্স্। কালপ্রবাহে সমাজের বারেবারে রূপান্তর হয়েছে, নীতির বোধও বদলে গেছে। ব্যক্তিকে সংসারকে সমাজকে রাষ্ট্রকে বিধৃত ও সঞ্চালিত করেছে যেমন আইনের বিভিন্ন ধারা, তেমনি এমনকি তার চেয়েও বড়ো করে ধরে রেখেছে নীতির চেতনা তথা মহত্তর আদর্শ। আইন মানুষকে সংযত করেছে, আদর্শ তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আইন বাইরের। নীতি অন্তরের সামগ্রী।

আদি যুগে নীতিবোধ প্রকাশিত হয়েছে মৌখিক রচনায় বড়-ছোট বাক্য বা শ্লোকের মাধ্যমে। ক্রমে লিপি ও লেখনের আবিষ্কার হয়েছে, মৌখিক রচনাগুলি আক্ষরিক রূপ পেয়েছে। তা ব'লে তাদের মৌখিক রূপগুলিও বিলুপ্ত হয় নি, লোকশ্রুত প্রবাদ-বাক্যের পথ ধরে পুরুষানুক্রমে তারা চলে এসেছে কালের সিঁড়ি পেরিয়ে। অন্যদিকে লিখিত রূপগুলিও ক্রমে উজ্জ্বল উন্নত হয়ে উঠেছে। গ্রীক-সংস্কৃত-প্রাকৃতই শুধু নয়, পৃথিবীর প্রায়—সকল সভ্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এমন নীতি-প্রবচন লক্ষ্যগোচর হয়। এরও মধ্যে, নীতির ছদ্মবেশে বিপরীত বৃত্তিও প্রবেশ করেছে; কিন্তু সে ব্যক্তির বা যুগের সাময়িক ও শিথিল পরিচিতি মাত্র, সামগ্রিক নয়। নীতি—বাক্যগুলির মৌল উদ্দেশ্য ছিল ঃ সমাজ এবং মানুষকে সুন্দর সুস্থভাবে গড়ে তোলা।

এই নীতি-কবিতাগুলি ত্রিবিধ ঃ ভাবাত্মক, বিবৃতিমূলক ও কাহিনী-মুখ্য। প্রথমটির উদাহরণ আচার্য শংকরের মোহ-মুদ্গরের বিখ্যাত-চরণগুলি; দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত চাণক্যের নামে অভিহিত শ্লোকগুলি; তৃতীয় ক্ষেত্রে পাই পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প। এইসব রচনার অনেকগুলি আজও বিদ্যালয়-পাঠ্য। যার সঙ্গে পরিচয় প্রায় সকলেরই আছে। নীতি-কথার অন্তর্ভুক্ত এবং উপসংহারীয় দ্বি-পদী রচনাগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মধ্যযুগে লৌকিক গ্রাম্য প্রবাদ এবং অভিজাত নীতি-কবিতাগুলি মরে গেলনা, অপিচ ধর্ম-শাস্ত্রের মধ্যবর্তী নীতি-বচনগুলিও একই কাজ করেছিল। এইসঙ্গে সামাজিক শাস্ত্র তথা মনু-পরাশরের সংহিতাগ্রন্থ-গুলিও স্মরণীয়।

আধুনিক যুগ শহরমুখী ও অতিলৌকিকতা-বিমুখী। তার জীবনের পরিবেশ ও প্রয়োজন, সমাজের গঠন ও ব্যবস্থা, মনের আকাশ সবই নতুন, পূর্বতন রূপ থেকে স্বরূপত স্বতন্ত্র। ফলে, পুরনো বিধি বিধান ও সংস্কারগুলিকে মার্জিত করে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। যেমন হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শহর-কলকাতায়। বাঙালী তখন নতুন সমাজ গড়ছে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নীতির প্রশ্নও তাই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। গ্রাম্য প্রবাদ এবং সংস্কৃত শ্লোকের যেগুলি বর্তমান কালোপযোগী মনে হল, সেগুলি পুনরাবৃত্ত হল। সেইসঙ্গে বাঙলা ভাষায় রচিত হতে লাগল নতুনতর নীতি-বাক্য—কবিতায়ও কথায়। বিদ্যাসাগর লিখলেন 'কথামালা'; কবিতায় নীতিকে রূপ দিলেন—রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু করে

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-মুকুন্দদাস-রজনীকান্ত—কুমুদরঞ্জন—রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, ঐ শতাব্দী এবং পরশতাব্দীতে। রচনাগুলির পশ্চাৎপটে ছিল দেশ ও জাতিগঠনের নিরঙ্কুশ বাসনা, এবং তার ফল—মন্ত্রের মত এক—একটি পরিস্রুত শ্লোক বা কবিতা।

এগুলিও আমাদের অপরিচিত নয়, তবু পুনরুল্লেখ করা যেতে পারেঃ

নানান দেশে নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,

মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াওনা একবার ভাই।
ঐ ফুল ফুটে বনে, যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় তো নাই।

.. ..

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

এই জাতীয় নীতি-কবিতাগুলি একদা মুখস্থ শুধু নয়, মনেও আশ্রয় পেত। এই আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন অজস্র নীতি-কবিতা, 'কণিকা' গ্রন্থে যেগুলি সংগ্রথিত হয়ে আছে, (স্ফুলিঙ্গেও)। কণিকার সূক্তিগুলি আজও স্কুল-কলেজে ভাব-সম্প্রসারিত হয়, কিন্তু আমাদের স্বভাবে আদৌ প্রবেশাধিকার পায় না!

এই না-পাওয়ার অনেক কারণ আছে, সমাজের পালাবদল যার মুখ্য ভূমিকায়। একটি কারণ—স্বয়ং কবিতা, বিংশ শতকের রবীন্দ্রেতর কাব্য যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন নতুন উত্তেজনায় সঞ্চালিত কবিরা পুরোগামী সমস্ত কবিতাদের বাতিল করলেন অবাস্তব যুগ-অনুপযোগী ব'লে। ফলে, অবশ্য পুরোগামী কবিতারা অপাংক্তেয় হয়ে উঠলনা, কিন্তু মৃত্যু হল নীতি-কবিতাগুলির। পূর্বোল্লিখিত এবং ঐ জাতীয় চরণগুলি চিহ্নিত হল 'পদ্য' নামে, তাদের স্থান হল বিদ্যায়তনের আয়তনিক সংকলন গ্রন্থে।

তাতে দুঃখ নেই, ক্ষোভ নেই। বিবর্তনে যখন বিশ্বাস করি, তখন নতুনকে স্বাগত জানাবই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ব্যথাও বোধহয় অবান্তর নয় যে ঃ আধুনিক কবিতা যে পরিমাণে আত্মকেন্দ্রে সম্বদ্ধ, সেই পরিমাণে সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ নয়, এবং কবিতা পাঠ করে পাঠকও সর্বাংশে সমাজ-সচেতন হয়ে উঠতে পারে না। বলা বাহুল্য, সমস্ত কবির কথা বলছি না, অধিকাংশের কথা বলছি। সেই অধিকাংশ কবির বক্তব্য আজকের কবিতা সেকালের 'নীতি-বাগীশ পদ্য'নয়, সে ব্যক্তির স্বগত চেতনার অনুবাদক; তদুপরি কবি কোন বাঁধাধরা নিয়মের

অনুগত নন এবং সমাজ—সংস্কারকও নন; তাই এযুগে ঐ জাতীয় নীতি-পদ্য রচনা হাস্যকর প্রস্তাব।

বক্তব্যটির মূলগত অর্থ-ব্যঞ্জনাকে মেনে নিয়েই কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করা যেতে পারে। প্রথমত, নীতি-বাক্য মাত্রেই 'পদ্য', এমন সংকীর্ণ দৃষ্টি মানবতা ও শিল্পচেতনার অনুগামী নয়। নীতিমূলক অনেক রচনাই আছে, যেগুলি কবিত্বে রমনীয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই এই বাবদে উদ্ধৃত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সার্থক কবি হতে হলে নীতি-বাক্য লেখা চলবে না, এমন যুক্তিও অবান্তর। সমাজ যখন সশরীরে বিদ্যমান, তার সহযোগী নীতিও বর্তমান, না থাকলে তৈরি করতে হবে, জনগণকে নীতিবোধে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নইলে, সমাজ তো কেবলমাত্র পুঁথিগত কয়েকটি বিধি-বিধান, রুল-রুজের জোরে টিঁকে থাকতে পারে না; টিঁকে হয়তো থাকতে পারে, বাঁচতে পারে না। এই বাঁচার জন্যেই চাই নীতি-বচন। এইখানেই আসে তৃতীয় বক্তব্য। কবি যে কেন সমাজ-সংস্কারক হতে পারেন না, এ যুক্তি আমার বোধগম্য কোনদিনই নয়, বিশেষত রবীন্দ্র-জীবনী পাঠের পর। কিন্তু ব্যক্তির কথা থাক, কবিতারও তো সমাজ-সংস্কারের একটি ভূমিকা আছে। চারপাশ থেকে সে কেবলই নেবে, দেবে না, এ রীতি নীতি-সম্মত নয়। অপিচ, সংস্কারের প্রচারী প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলেও—কবি ও কবিতার যে সমাজসচেতন হওয়া দরকার কবি ও কবিতারই প্রয়োজনে একথা নিশ্চয়ই অনস্বীকার্য। কবি বলবেন: আমরা তো শুধুমাত্র আত্মকেন্দ্রিক নই, বিশ্ব-কেন্দ্রিকও। কিন্তু সে বিশ্ব-কেন্দ্রিকতাও যে স্বকীয় ভাব-দৃষ্টিতে রঞ্জিত। নিজেকে মাঝ-খানে রেখে যেমন কবিতা রচনা, তেমনি অপরকেও মাঝখানে রেখে লিখতে হবে। আধুনিক বিশ্বচেতনা যতটা কবি-মানসের আরোপিত, ততটা বিশ্ববৃত্তিক নয়। ফলে, কবিতা পাঠান্তে মন ঘুরতে থাকে একটুখানি গণ্ডীর মধ্যে, ছড়িয়ে পড়ে না সর্বসাধারণবৃত্তি হয়ে। তাতে যেমন সামাজিকের ক্ষতি, তেমনি তার চেয়েও বেশি ক্ষতি কবি ও কবিতার। কারণ—সে রচনা জীবনের সহযোগী হতে পারে না, তত্ত্ব ব্যবহারিক রূপ পায় না। ফলে আধুনিক গানের মত আধুনিক কবিতাও মনের ওপর দিয়ে বয়ে চলে, গভীরে ডুব দেয় না। মন হয়ত উজ্জ্বল হয়, দীপ হয়ে জ্বলে ওঠেনা।

চতুর্থ প্রস্তাব। আধুনিক কবিতায় নীতির উল্লেখ বলতে ইতিপূর্বে লেখা নীতি—কবিতাগুলির অনুসরণ করতে বলছিনা। কারণ আমাদের চারপাশের সঙ্গে মন, নীতিচেতনাও বদলে গেছে। মৌমাছি ও পিপীলিকার কাছে কর্মের যে শিক্ষার কথা কবি বলেছিলেন, আজ তাকে যথাযথ গ্রহণ করাও চলবে না। কিন্তু নতুন নীতিকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে বাধা কোথায়? সেই প্রকাশরীতি আবিষ্কৃত এবং তদনুযায়ী লেখা হোক না।

পঞ্চমত, নীতি-বাক্যগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নীতির কথাই যদি ধরি, তাহলে দেখি—সাহিত্যের আঙিনাতে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। সংস্কৃত নীতি-বাক্যগুলিকে বলা হয় 'সুভাষিতাবলী' এবং 'সূক্তি'। সূক্তির শব্দধ্বনিতে মনে আসে শুক্তি। অনেক নীতি-বাক্য, সবগুলি নিশ্চয় নয়, শুক্তির মতই সুন্দর, মুক্তোর মতই নিটোল। শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আরও অনেকের, অনেক ভাষার। এগুলিকে তখন কবিতা না বলে পারা যায় না। অন্যপক্ষে, কবিতার মধ্যেও কি নীতি-বাক্যের অসদ্ভাব আছে? সংস্কৃত ও প্রাকৃত, গ্রীক ও রোমক সাহিত্যে তাদের দর্শন মেলে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদেও যেমন অনেক সূক্তি ইতি-উতি ছড়িয়ে আছে, তেমনি তার পরবর্তী ধারা-প্রবাহেও। আধুনিক কালের কবিরাও তাঁদের রচনায় সামাজিক আদর্শের উত্থাপন করেছেন। নতুন মন পুরনো প্রবাদ-বাক্যে খুশি হতে

পারে না, ঊনবিংশ শতকীয়া তথাকথিত 'নীতি-পদ্যে'ও না; কিন্তু এইসব আধুনিক কবিতায় উদ্বুদ্ধ নিশ্চয়ই হয়। পূর্ব-উদ্ধৃত কেন পান্থ ক্ষান্ত হও' চরণ যদি চিত্তকে ক্ষান্ত করে, তবে পাঠক কান ফেরাতে পারেন নীচের কবিতা অংশটিতে। ভিন্ন সুরে ও স্বরে, একই কথা নয়, একই ভাবের ধ্বনি শুনতে পাবেনঃ

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনেরাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে;
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপনহাতে,
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি;
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী। (রবীন্দ্রনাথ)

এই ধরণের কাব্যোক্তি, যা মনকে সবল ও সচল করে, যা আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, রবীন্দ্ররচনাবলীতে অজস্র, রবীন্দ্রসংগীতেও। কবিতার এই শুক্তি তথা সূক্তি-রূপ আধুনিক কালের আরও অনেক কবির রচনায় ফুটে উঠেছে। নজরুল ইসলামের উচ্চকণ্ঠ কবিতা এবং সুকুমার রায়ের কলকণ্ঠ কবিতাগুলি শুধুই উচ্ছল আবেগের বা শুধুই শৈশব হাসির নয়; এদেরও মূলে আছে মহত্তর সামাজিক আদর্শ, যার ফলশ্রুতিতে কবিতার মাঝে মধ্যে নীতি-বচন আগুনের মতো জ্বলে উঠেছে, আলোর ফুল হয়ে ফুটেছে। কিন্তু এখনকার অনেকেই এঁদের সার্থক কবি বলে মনে করেন না। তেমনি মনে করেন না দিনেশ দাস ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও।. যদিও এঁরা একটি বিশেষ মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন আত্মরচনায়, তবু অনেক ক্ষেত্রে এঁদের কবিতা প্রসারিত মানবতার এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে এই মতাদর্শের বিরোধী পাঠকও আশ্রয় নিতে পারেন অনায়াস সহজতায়। উদাহরণত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'মে-দিনের'—র নাম করা যেতে পারেঃ

প্রিয়! ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য,
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য',
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।..
দুর্গমে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য,
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা।

এ-কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের সমজাতীয় উজ্জীবনী কবিতাগুলির পাশে নির্দ্বিধায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। (স্থানের কথা, আমি আদর্শের প্রসঙ্গেই বলছি)।

কিন্তু তেহি নো দিবসাঃ গতাঃ। এজাতের কবিতা আর লেখা হয় না, লেখা হবে না। স্বাধীনতার লড়াইয়ের যে উন্মাদনা ছিল, যার ফলে এইসব সূক্তি-মুক্তাবলীর আবির্ভাব, আজ আর সে উন্মাদনা নেই। আজ জীবন-সংগ্রাম আরও কঠিন ও নিষ্ঠুর হয়েছে, কিন্তু তার স্বাদ ও আস্বাদন বদলে গেছে। এখন নীতি-কবিতার ঠাঁই পত্রিকার নীচের মহলে, স্থান-পূরণের

মহৎ প্রয়োজনে, কবিতা-নামধারী রচনাগুলি সূক্তি-আহরণে অনীহ অথবা অপটু। (নীতি দূরের কথা, সমাজভাবনাই বা কতোটুকু?)

অথচ আজ এই মুহূর্তে এই জাতীয় রচনার প্রয়োজন বড় হয়ে উঠেছে। জীবন আমাদের এলোমেলো, সমাজ ভেঙে গেছে, মন বিপর্যস্ত দিশাহারা। চোখ যে দিকে, নেই কোন আদর্শ, নেই আলো। সব কিছুর জন্যে বরাত' দিয়ে বসে আছি ওপরের দিকে—হয় ঈশ্বরের নামে, নয় রাষ্ট্রের নামে। গড়ার প্রসঙ্গে আমাদেরও যে কর্তব্য ও কৃত্য আছে, ভুলে গেছি সেকথা; মনে মনে জপ করছি, (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। নীতিবোধও তাই পলাতক।

জনসমাজকে কর্মে-আদর্শে যারা জাগিয়ে তুলতে পারে, কবিতা তাদের অন্যতম। মানুষকে-মনকে-ব্যষ্টিকেও সে অনুপ্রাণিত করতে পারে, ঘুম ভাঙতে পারে, চরম যন্ত্রণায়ও সাহস ও শক্তি দিতে পারে, সামনে এগিয়ে দিতে পারে। আত্মকথনের চেয়ে এই সমাজ সচেতনতা কোন অংশে অকুলীন নয়, একথা বিশ্বাস করে সাম্প্রতিক কবিরা কি নীতি-কবিতার নবরূপ দিতে পারেন না, বাহির ও অন্তর, ব্যবহার ও তত্ত্বকে সমন্বিত করে কবিতার বৃন্তে নব্য জীবনাদর্শের ফুল ফোটাতে পারেন না, পারেন না পলাতক নীতিবোধকে জনমনে ফিরিয়ে আনতে?

অসঙ্গতি ও হাস্যরস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ যে কিরূপ সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতার সহিত হাস্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা আমরা 'সমকালীন' পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রস্তাবে আলোচনা করিয়াছি। চিত্ত বৃত্তির লঘুতা ও স্থৈর্য্যের অভাব হইতেই হাস্যের জন্ম। ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রের, সমাজের অথবা পরিপার্শ্বিকের যে কোনও প্রকারের বৈষম্য চিত্তবৃত্তিকে সহসা আন্দোলিত করিয়া যে আকস্মিক চমকের সৃষ্টি করে তাহা প্রথমেই দুঃখজনক হইলেও পরিণামে আনন্দঘন অনুভূতির সঞ্চার করে। বেদনা এবং চমকের এই হিল্লোল হইতে হাস্য জন্মলাভ করে ইহা অভিনব গুপ্ত তাঁহার অভিনব ভারতী টীকায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ যুক্তিসম্মত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে অনৌচিত্যই সকলপ্রকার হাস্যের মূল; যুগ দেশ, কাল, বয়স, ঘটনা এবং বক্তা ও বোদ্ধার ভেদে এই অনৌচিত্যই হাস্যের সৃষ্টি করে।

কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণে হাস্যের উপাদান যে অন্যত্র নিহিত রহিয়াছে ইহাও দেখান যাইতে পারে। আলঙ্কারিকগণের বিচারশৈলী অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে অসঙ্গতিমূলক শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান, অথবা উৎকর্ষবুদ্ধি অথবা আত্মস্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা ইহারাও একক বা মিলিতভাবে 'হাস্য'রূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে। পরাজিত শত্রুকে দেখিয়া বিজয়ী হাস্য করে। অপরের দুঃখদুর্দশা দেখিয়াও অবস্থাবিশেষে মানুষ হাস্য করে। কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তির পতনে জনসমাজ অনেকক্ষেত্রেই সহানুভূতি সম্পন্ন না হইয়া হাস্যের দ্বারা অভিভূত হয়। বৃদ্ধের স্খলিত বচন ও জীর্ণদেহ, খঞ্জ, কুব্জ, বামন প্রভৃতির বিকৃত এবং করুণ অবস্থা—এ সকল দেখিয়াও অনেকক্ষেত্রেই দ্রষ্টার হৃদয়ে করুণ রসের উদ্রেক না হইয়া হাস্যের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ কি? চিত্তবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক মানুষেরই চেতনার অন্তস্থলে সুপ্ত রহিয়াছে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ব বোধ অথবা উৎকর্ষাভিমান. প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন প্রকারে আপনাকে ভালবাসে। অপর ব্যক্তি হইতে আপন আপন চরিত্রের উৎকর্ষ বোধও সকলের মধ্যেই সমানভাবে বর্ত্তমান। কোনরূপে আপন সত্তাকে শৃঙ্খলিত করা বা নিয়মের বন্ধনের অধীন করিয়া তুলা মানবের সহজাত আদিম স্বাধীনতা স্পৃহার পরিপন্থী। প্রতি চিন্তায়, ভাবে এবং প্রত্যেক কর্মে এই দুর্বার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করে। একাধারে অসীম স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাবোধ, অপরদিকে আপনার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান—এই উভয়বিধ অনুভূতি মানুষের চেতনার গভীর প্রদেশে নিহিত। শিশুর মধ্যে যে হাস্য লক্ষ্য করা যায় তাহা আকস্মিক এবং প্রাচুর্য্যে উদ্বেল, তাহার মধ্যে বন্ধনহীন আনন্দেরই স্ফুরণ হয়। শিশুর ক্ষেত্রে বাক্যের বিকৃতি এবং পরিবর্ত্তনই প্রথমত, আনন্দের জনক। কিন্তু বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে নানা প্রকারের অনুভূতির উদয় হইতে থাকে। বিভিন্ন প্রকারের অনুকূল এবং প্রতিকূল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় এবং মানুষ ক্রমে ক্রমে কোনোটিকে গ্রহণ করিতে অথবা কোনটিকে বর্জন করিতে শিখে। জ্ঞানের পরিধির বিস্তারের সঙ্গে পূর্ব হইতে অর্জিত অনুভূতি সকলকে গোপন করিবার প্রচেষ্টাও অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিচেতনার মধ্যে চলিতে থাকে। এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত মানুষের

সহজ স্বাধীনতাবোধকে প্রতিপদক্ষেপে খণ্ডিত করিতে থাকে। সামাজিক বিধিনিষেধ, সভ্যজন সম্মত আচার পদ্ধতি—এইগুলি মিলিত ভাবে স্ব স্ব প্রভাবের দ্বারা চেতনার সহজ প্রকাশকে নিরুদ্ধ করিতে থাকে। অন্তরে বাহিরে সর্বত্র একটি যুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার প্রভাব বিদ্যমান থাকায় মানুষ স্ব স্ব চিত্তের প্রবণতাকে সহসা বুঝিতে পারে না; তাহার স্বভাবজ স্বাধীনতা নিয়ম শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না। এইরূপ জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের যে কোনও প্রকারের অসংগতি সহসা চিত্তপ্রবাহকে আঘাত দিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই উত্তেজনা হইতে যে বৈচিত্র্যের সঞ্চার হয় তাহাই চিত্তে অপরিসীম তৃপ্তির সৃষ্টি করে। এই পরিতৃপ্তির মূর্ত্ত প্রকাশ হয় হাস্যের মধ্যে।[১] এজন্য দেখা যায় অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যময় পরিবেশের মধ্যেও সামান্যমাত্র বাক্যের বিকৃতি অথবা উচ্চারণের বিকৃতি হইতে অথবা স্বল্পমাত্র অস্বাভাবিক আচরণ হইতেই প্রবল হাস্যের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘক্ষণস্থায়ী একাগ্র মনঃ সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে যেভাবে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় এবং সকল প্রকার দৈহিক চেষ্টাকে যেরূপ সংযত করিতে হয় তাহাতে চিত্তের সমস্ত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিপদে খণ্ডিত এবং সীমায়িত হইয়া যায়,—সুতরাং বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উদ্দাম স্পৃহা সামান্যমাত্র অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া প্রবল হাস্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। যে দর্শক সমাজ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দর্শন করে তাহারাই পরক্ষণে বিদূষকের শিখা এবং বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দর্শনে হাস্যে অভিভূত হইয়া পড়ে। অসঙ্গতি এই স্থলে আবদ্ধ চিত্তকে প্রসারিত করিতে সহায়তা করে বলিয়া সামান্য কৌতুকের উপাদানও প্রবল হাস্যের কারকে পরিণত হয়। এজন্য মুদ্রারাক্ষস নাটকে হাস্যের কোন অবকাশ না থাকিলেও কেবলমাত্র এই কারণেই ভাগুরায়ণ ও বৌদ্ধভিক্ষুর কথোপকথন আনন্দের সৃষ্টি করে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ, মানসিক সংঘাত এবং অসঙ্গতির দ্বারা সঞ্চারিত আকস্মিক বৈচিত্র্য—ইহাদের মিলনে যে মানসিক ব্যাপার হইতে হাস্যের জন্ম হয় তাহা প্রকারান্তরে সূচিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজচূড়ামণি দীক্ষিত তাহার "কাব্যদর্পণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "বিকৃতবেষাদিদর্শনা স্মনসীক্রিয়া," বিকৃতবেষাদিদর্শণ শ্রবণাদিনা যশ্চেতসো বৃত্তি বিশেষঃ স হাসঃ" বিকৃত বেষ প্রভৃতি দর্শন অথবা বিকৃত উচ্চারণ প্রভৃতি শ্রবণের পরবর্তীকালে পূর্বতন মানসিক অবস্থা হইতে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা "চেত সো বৃত্তি বিশেষ" এই কথাটির দ্বারা সূচিত হইতেছে। সাধারণভাবে নির্বিকার চিত্তবৃত্তিতে অথবা অন্য কোনও কারণে যেস্থলে চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবণতা নিরুদ্ধ হইয়াছে সেই স্থলে বিকৃতি দর্শনের দ্বারা যে অভূতপূর্ব বৈলক্ষণ্য সাধিত হয় তাহা কেবলমাত্র "বৃত্তিবিশেষ" এই কথাটির দ্বারা সূচিত হইতেছে। এবং মানসিক পরিবর্ত্তনের কারক যে সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পরিবর্তিত চিত্তবৃত্তি পুনরায় হাস্য ও তজ্জাতীয় ভাবে রূপান্তরিত হয় তাহাও "মানসীক্রিয়া"

(১). তুলনীয়····"আসল কথা এই যে কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ, এবং চিত্তের অনতি প্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তি সঙ্গত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য, সমস্তই চিরাভ্যস্ত চির প্রত্যাশিত, এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমি মধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করতে পারি না। ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথা পরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয়, তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধাপাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।····কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভব ক্রিয়াজাগ্রত করিয়া দেয়।"......(কৌতুক হাস্য—রবীন্দ্রনাথ)

এই পদের দ্বারা সূচিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে জেমস্ ড্রেভার তাঁহার সাইকোলজি অব এভরি ডে লাইফ নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

...."The insinuation provoked by laughter finds an echo in our more primitive self repressed by the customs and taboos of culture and civilization and it is the sudden and temporary freeing of the primitive natural man that produces the laughter. What laughs in us is the primitive elemental pugnacity released and triumphing over an imaginary, adversarry (page 32-33)."[২]

মানুষ কথা বলিবার পূর্বে হাসিতে শিখিয়াছে। শিশুর বাক্‌শক্তি জন্মাইবার পূর্বেই হাসি দেখা যায়। ইহার মূল কোথায়? সৃষ্টির আদিম প্রত্যুষে বাকসৃষ্টির বহু পূর্বে স্বাভাবিক শরীর চেষ্টার অভিব্যঞ্জকরূপে হাস্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আদিম যুগের মানব তাহার প্রতি কর্মের চেষ্টার ও আচরণের সার্থকতায় যে প্রবল মানসিক আনন্দ অনুভব করিত তাহাই অব্যক্ত ধ্বনির সাহায্যে হাস্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিত। বন্য পশুকে হত্যা করিয়া অথবা শত্রুকে নিহত করিলে যে আনন্দ এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোধের অনুভব হইত ভাষার অবর্ত্তমানে তাহাই হাস্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া উঠিত। বেদে দেখা যায় সোম ক্রয়ের সময়ে শূদ্রকে কর্দমের দ্বারা লিপ্ত করা হইত; ইহাও অনুরূপ ভাবেই হাস্যের জনক। এইরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে এবং গভীরতরভাবে বিশ্লেষণ করিলে উৎকর্ষজ্ঞান এবং আত্মশ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ইহারা যে সকল প্রকার অসঙ্গতি-জাত হাস্যেরই পশ্চাতে বর্ত্তমান তাহাও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের সহিত নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতার ভাবও জড়িত।[৩] সাধারণভাবে স্বীকৃত হাস্যজনক কারণগুলির মধ্যে বিকৃত পরবেষ (অর্থাৎ অপরের বেষভূষার বিকৃত অনুকরণ) অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, চঞ্চলতা, মিথ্যাপ্রলাপ, ব্যঙ্গদর্শন (অপরের দেহের বিকৃতি উপহাসের উদ্দেশ্যে দর্শন), আকারবিকৃতি প্রভৃতি প্রধান। শারদাতনয় হাস্যোদ্দীপক অলৌকিক কারণগুলির (যাহা-

(২). প্রসঙ্গতঃ সালী তাঁহার হিউমান মাইন্ড নামক গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে—

"It may be observed that there seems a special tendency to carryout the movements of laughter as a relief from a prolonged constrained attitude of mind involving forced self-control inhibition of movement, as in listencing to a serious discourse. The effect of very slight causes in proviking a smile on solemon occasions is well-known.

ইমানুয়েল কান্ট ও তাঁহার ক্রিটিক অব জাজ্‌মেন্ট্ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে উত্তেজনার অব্যবহিত পরকালবর্ত্তী শৈথিল্য হইতে হাস্যের জন্ম হয়।

(৩). ইতিহাস হইতে জানাযায় যে প্রাচীন রোমানগণ আরোহী সমেত রথগুলিকে ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে বিধ্বস্ত হইতে দেখিলে আনন্দে হাস্য করিত। এই হাস্য একাধারে অসঙ্গতি এবং বর্বরতা এই উভয়প্রকার প্রেরণায় সৃষ্ট। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে হাস্যজনক কারণগুলির পশ্চাতে যেমন অসঙ্গতি, কৌতূহল, নিষ্ঠুরতা, উপহাস প্রভৃতি ভাব বর্ত্তমান সেই প্রকারে ক্রমবিকাশের ধারাও বর্ত্তমান। যুগদেশও কালভেদ সকল প্রকার বৈষম্যই হাস্যের সৃষ্টি করে। বৈদিক যুগে সোমক্রয়ের সময়ে বৈশ্য এবং শূদ্রীর কলহে যে হাস্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কালিদাস অথবা ভাসের নাটকের হাস্য হইতে ভিন্ন। তাহাতে কোন সময়ে নির্মলতা কোনও সময়ে না স্থূলতা লক্ষিত হইয়াছে। যুগ-

দিগকে আমরা বিভাব এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করিয়াছি) স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ঃ

"বিকটাকার বেষেণ বিকৃতাচারকর্মভিঃ
বিকৃতৈরপি বাকৈশ্চ ধাষ্ট্যলৌল্যানুভূতিভিঃ।
বিকৃতাভিনয়েনৈব বিকৃতাঙ্গাবলোকনাৎ॥
কুহকাসৎপ্রলাপেন দোষোদাহরণাদিভিঃ
হাস্যঃ স্যাৎ সতু ভূয়িষ্ঠং স্ত্রীনীচাদিষু দৃশ্যতে॥"

কিন্তু বিকৃতি এবং বৈষম্য দর্শনের পর কোন মানসিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে হাস্যের জন্ম হয় এবং চিত্তের কোন বিশেষ অনুভূতির প্রতি তাহার প্রবণতা—এই সকল বিষয় অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশদ ভাবে আলোচিত হয় নাই। পুনরায়, বৈষম্য বিকৃতি প্রভৃতির কোন প্রধান অথবা অপ্রধান স্তরের প্রতি হাস্যের সংবেদন তাহাও রসশাস্ত্রে পরিস্কার ভাবে বলা হয় নাই। অভিনবভারতীর "অল্পদুঃখরূপসুখানুগতো" এই বাক্যের মধ্য দিয়াই তাহাকে অনুমান করিতে হইবে। বৈষম্য ও অসঙ্গতি জীবনের কোন ব্যাপক রূপের পরিচয় দেয় না। তাহারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে মানুষের নানা কাজে ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে "বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়।" যে বস্তু যেরূপ অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহার যেরূপ হওয়া উচিৎ সেইরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইলে তাহার স্বরূপ সঙ্কীর্ণতা এবং সীমাবদ্ধতার শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া পড়ে। এজন্য যে কোন বস্তুর মধ্যে যে কোন প্রকারের বৈষম্য দেখা গেলে অপরবস্তু হইতে তাহার সীমাবদ্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা সেই সেই বৈচিত্র্যের জন্য চিত্তকে সেই বস্তুর প্রতি সাধারণতঃ আকৃষ্ট করে। ব্যক্তির এবং পারিপার্শ্বিকের প্রবহমান স্বাভাবিক জীবন হইতে বৈষম্যজনক বস্তুর যে বিচ্ছেদ তাহা দ্রষ্টার চিত্তে সুপ্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে জাগ্রত করিয়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপে বানভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে বৃদ্ধ দ্রবিড় ধার্মিকের বর্ণনা, সেক্সপীয়ারের হাস্যকারী চরিত্র ফলস্টাফ্, টাচস্টোন প্রভৃতির বর্ণনা, অথবা রসরাজ অমৃতলালের সামাজিক প্রহসনে 'দেশহিতৈষী বাবু'র চরিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকে গদাইএর চরিত্র এই সকলকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ পাঠের সময়ে এবং অভিনয় দর্শন কালে ইহাদের সহিত পরিচিত হইলে কি প্রকারে চিত্তে 'হাসরূপ ভাবের উদয় হইবে? প্রথমত ইহাদের গ্রন্থোক্ত বিবরণ অথবা প্রত্যক্ষ দর্শন, পাঠকসমাজ অথবা দর্শকবৃন্দকে সেই সেই চরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের পশ্চাতে রহিয়াছে স্বভাবজ কৌতুহল। কৌতুহল সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালে বর্ণনীয় বা অভিনীয়মান চরিত্র সমূহের সহিত আপন আপন পার্থক্য বিষয়ে পাঠককুল সচেতন হইয়া উঠে। অসঙ্গতি যেমন আকস্মিকতার এবং অভিনবতার চমকে চিত্তকে কৌতুহলী করিয়া তুলে তেমন ভাবে দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের (চরিত্রের) মধ্যে ব্যবধানও সৃষ্টি করিয়া দেয়। এজন্য চরিত্রটি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে "বিদূষক এইরূপ কিন্তু আমি ঐরূপ নহি" "দ্রাবিড় ধার্মিক ওই প্রকার—আচারব্যবহারসম্পন্ন, কিন্তু আমি কদাচ ঐ প্রকার হইব না" "গদাই তাহার বয়সোচিত বুদ্ধির

ভেদে হাস্যের স্বরূপে এবং প্রকাশে বৈচিত্র্য আসিয়াছে। জীবনের অগ্রগতির সহিত নবীনতর অসঙ্গতি জন্মলাভ করিতেছে এবং হাস্যও গতিশীল জীবনপ্রবাহের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হইয়া উঠিতেছে। এজন্য স্টিফেন লিকক্ বলিয়াছেন—

"Humour, if thought at all, is looked upon us a growth, humour at its highest is a pant of the interpretation of life". সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের ধারাকে বিশ্লেষণ করিলে ইহার যথার্থতা

পরিচয় না দিয়া স্বীয় মূর্খতাকেই প্রকাশ করিতেছে কিন্তু ঐ অবস্থায় পড়িলেও আমি কখনই ঐরূপ করিব না" এই জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হয়।" এই ব্যক্তি বিকৃত দেহবিশিষ্ট, কিন্তু আমি সুন্দর" এই প্রকার মনোভাব হইতে অপর ব্যক্তির সম্বন্ধে উপহাসের মনোভাব জাগ্রত হয়। ৪ গদাই এর কাব্য প্রচেষ্টাও অনুরূপ ভাবেই সহৃদয় দর্শকের মনে হাস্যমূলক ভাবের উদ্রেক করে। উপহাস করিবার ইচ্ছা যে হাস্যরসের অনুকূল ভাবধারা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে তাহা পরে আলোচিত হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে অপরব্যক্তিকে উপহাস বা ঠাট্টা করিবার ইচ্ছার সহিত আপনার সম্বন্ধে প্রীতি ও শ্রেষ্ঠত্বের ভাবও জড়িত থাকে। লৌকিক জীবনেও আমরা দেখি যে পরাজিত শত্রুর দুর্ভাগ্যে বিজয়ী হাস্য করে এই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া। বৈষম্যমূলক এই মনোভাব, উপহাস বুদ্ধি এবং তাহাদের সহিত জড়িত শ্রেষ্ঠত্বমূলক ধারণা—ইহারা চিত্তে এক প্রকার কৌতুকের সৃষ্টি করে যাহা শেষ পর্যন্ত হাস্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়। শৃঙ্গাররস, করুণরস, বীররস প্রভৃতির নিষ্পত্তির ধারাকে বিশ্লেষণ করিলে আলম্বনবিভাগের উপস্থিতি, রসের আশ্রয় এবং রসবেত্তা সামাজিক-এই তিনটি পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায়। হাস্যরসের ক্ষেত্রে কিন্তু কেবলমাত্র আলম্বন (বিদূষক, শকার, অথবা অন্য হাস্যকারী চরিত্র) এবং রসের বোদ্ধা সামাজিক-এই দুইটি পর্য্যায় বর্ত্তমান,—স্থায়িভাবের আশ্রয়রূপে নায়ক কেহ উপস্থিত নাই। সুতরাং হাস্যরসপ্রধান কাব্য অথবা প্রহসন পাঠের সময়ে অথবা অভিনয় দর্শনের সময়ে সামাজিক বর্ণনীয় চরিত্রগুলির সহিত বা নাটকীয় পাত্রপাত্রীর সহিত "আমি ও আমার" অথবা "আমার নহে, আবার আমা হইতে পৃথকও নহে" "আমিই সেই" এই জাতীয় অনাসক্ত ঐক্য বোধ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সামাজিক এবং আলম্বন বিভাবের মধ্যে এইরূপ ভেদ থাকিতে পারে ইহা অঙ্গীকার করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পূর্বপক্ষরূপে মতবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"ননু রতিক্রোধোৎ সাহভয়শোকবিস্ময় নির্বেদেষু প্রাগুদাহৃতেষু যথালম্বনাশ্রয়য়োঃ সংপ্রত্যয়, ন তথা হাসে জুগুপ্সায়াং চ। তত্রালম্বনস্যৈব প্রতীতেঃ' (রসগঙ্গাধর)। সংস্কৃত সাহিত্যে ভগবদজ্জুকীয়ম্ নামক হাস্যরসপ্রধান প্রহসনে অথবা বঙ্গ সাহিত্যে পরশুরাম রচিত 'বিরিঞ্চিবাবা' নামক হাস্যরসাশ্রিত গল্পে হাস্যরসের আলম্বন যথাক্রমে পতিত পরিব্রাজক, গণিকা এবং সপার্ষদ বিরিঞ্চিবাবা স্বয়ং; কিন্তু হাসরূপ স্থায়িভাবের কোন আশ্রয় নাই। পাঠক স্বয়ং রসবোদ্ধা সামাজিক। সহৃদয় এবং সুরুচিসম্পন্ন মার্জিতবুদ্ধি পাঠক এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার সময়ে আপনাকে পতিত পরিব্রাজক, অথবা বিদূষক অথবা বিরিঞ্চিবাবার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। এই সকল চরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি পাঠকের অথবা দ্রষ্টার চিত্তে অজ্ঞাতসারে শ্রেষ্ঠতাজনিত কোন ব্যবধান অথবা উৎকর্ষ জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়া রাখিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কেবল মাত্র একপ্রকার কৌতুক বা আনন্দ বিকৃতি দর্শন মাত্রই চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে ইহাই প্রসঙ্গত স্বীকার করিতে হয়। রসগঙ্গাধর গ্রন্থে হাসরূপ স্থায়িভাবের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য—"বাগঙ্গাদি বিকার দর্শন জন্মা বিকাসাখ্যো হাস"—অর্থাৎ বাক্ অঙ্গ প্রভৃতির বিকৃতি দর্শন হইতে চিত্তের বিকাশরূপ হাস স্থায়িভাব জন্মলাভ করে। এই লক্ষণটিকে বিশ্লেষণ করিলে হাস্যের উৎপত্তির কয়েকটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়; যেমন প্রথমতঃ বাক্ এবং অঙ্গগত বিকৃতি দর্শন, তাহার পরে নির্বিকার চিত্তে সেই বিকৃতি দর্শন হেতু কোন বিশেষ ভাবের জন্ম এবং সর্বশেষে তাহা হইতে চিত্তভূমির ক্রমবিকাশ। অল্পরাজ তাঁহার রসরত্ন প্রদীপিকাতেও' বলিয়াছেন—"চেতসো বিকৃতিঃ স্বল্পা স হাস কথিতঃ খলু। চিত্তভূমির

প্রমাণিত হয়। (৪) তুলনীয়—"Inferiority in others excite laughter."—Hobbes.

আনন্দময় বিকাশকেও "বিকাশঃ কুসুমস্যেব' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সুতরাং কোন প্রকার অসঙ্গতি দর্শন করিলে দর্শনরূপ ক্রিয়া এবং হাসাত্মক পূর্ণ আনন্দসৃষ্টি ইহাদের মধ্যে হাসানুকূলভাবের বিকাশের পূর্বাপর ক্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। চিত্তের স্বল্প বিকৃতি, কুসুমের ন্যায় ক্রমে চিত্তভূমির বিকাশ ইহারা বস্তুত কৌতুকানুভূতি আমোদ প্রভৃতি ভাবের মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ সুখাত্মক আনন্দ সৃষ্টির ক্রম নির্দেশ করে। লৌকিক জীবনে দেখা যায় সহসা কোন ব্যক্তিকে পতিত হইতে দেখিলে অথবা কাহাকেও উৎপীড়িত হইতে দেখিলে আমরা দুঃখিত না হইয়া হাস্যে অভিভূত হই। ইহার কারণ কি? কারণ, ঐ প্রকার দৃশ্য দর্শনে প্রথমতঃই তাহার বুদ্ধি এবং আচরণ বিষয়ে দ্রষ্টারমনে উপহাস ও অবজ্ঞার ভাবজাগ্রত হয়। তাহার পরবর্তী কালেই "এই ব্যক্তি এরূপ স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু আমি কদাচ এইরূপ আচরণ করিব না" এই জাতীয় মনোভাব জাগ্রত হয়। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি হইতে স্বীয় পার্থক্য বিষয়ে সচেতন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রষ্টার চিত্তে আপন অস্তিত্ব বিষয়ে একপ্রকার প্রীতির উদ্রেক হয়। এই প্রীতিই চিত্তে ক্ষণস্থায়ী কৌতুক বা আনন্দের জন্ম দেয়। হাস্যের যে বিভিন্ন স্তর আছে কৌতুক বা ক্ষণস্থায়ী আমোদ তাহার অন্যতম স্তর। ইহা কিন্তু চিত্তে সুখের সৃষ্টি করে না, কিছু কাল পরেই আমরা ইহা বিস্মৃত হই। সুতরাং বিকৃতি দর্শন হইতে ক্রমান্বয়ে যেরূপ চিত্তে পরিপূর্ণ আনন্দরূপের উদ্বোধন হয় তেমনই সাধারণ কৌতূহলবোধ, উপহাসবুদ্ধি, প্রভৃতি ভাব সম্মিলিত হইয়া কোনও আমোদ বা কৌতুককর হাস্যানুভূতির উদ্রেককরে ইহাও অস্বীকার করা যায় না। যে কোনও প্রকারের বিকৃতির প্রথম সংবেদন এই কৌতুকানুভূতির প্রতি। পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিকগণ যে হাস্যের এই দুই প্রকার স্বরূপগত ভেদ এবং বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়াছেন তাহা হিউমার হইতে উইট্, স্যাটায়ার, জেস্ট্ প্রভৃতির পার্থক্য বিশ্লেষণ করিলে প্রতিপন্ন হয়। [৫] আলঙ্কারিকগণ স্পষ্ট ভাষায় হাস্যের স্বরূপগত এই দুই প্রকার ভেদ স্বীকার না করিলেও হাস্যকে উৎপত্তির দিক হইতে বিচার করিলে এই প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিকৃতি দর্শন হইতে যে কৌতুকানুভূতি জন্মলাভ করে তাহা মূল হাস্যরূপ চিত্তবৃত্তিরই আংশিক প্রকাশমাত্র। ইহা নির্মল প্রশান্ত রজোগুণের অতীত সত্ত্বরূপ আনন্দকে জাগ্রত না করিলেও হাস্যরস সৃষ্টির অনুকূল ভাবসন্ততিকে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করে। অতএব অন্যান্য রসের অনুভূতি হইতে হাস্যরসের বৈলক্ষণ্য ইহাই যে অসঙ্গতি যেমন বিভাব প্রভৃতির মাধ্যমেই চিত্তে আনন্দময় হাস্যের সঞ্চারকরে, তেমনভাবে প্রথমতঃ চিত্তে একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর কৌতুককর অনুভূতিরও সঞ্চার করে—যাহাতে হাস্যের সংস্পর্শ থাকিলেও পরিপূর্ণ আনন্দরূপ নাই। এই কৌতুকানুভূতির উদ্রেক হয় উপহাসবুদ্ধি, বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, কৌতূহল প্রভৃতি হইতে, এবং ইহাতে সকলসময়েই আপনার শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং অপরব্যক্তি বিষয়ে অকিঞ্চিৎকরত্ব বোধ জাগ্রত থাকে। এই অনুভূতি বাস্তবজীবনে যেরূপ সত্য, সাহিত্যবিষয়কগ্রন্থ পাঠ অথবা অভিনয় দর্শনকালে তেমন ভাবেই সত্য। কাব্যপ্রকাশের একটি উদাহরণ লইয়া বিচার করা যাইতে পারে—

(৫). আলোচ্য উদ্ধৃতি কয়টিকে বিচার করিলে আমাদিগের মন্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে—

"The favourite employment of wit is to add littleness to littleness, and heap contempt on insignificance by all the arts of pretty and incessant warfore" (Hazlitt on English Comic Garachors). "Humour is kindly and in its genuine forms includes the quality of sympathy; wit is sharper and more apt to wound. Wit is intensive, humour is releasing" (Encyclopaedia of Religion and Ethics Vol. VI p. 872).

আকুণ্ঠ্য পাণিমশুচিং মম মূর্ধনি বেশ্যা
মন্ত্রাম্ভসাং প্রতিপদং পৃষতৈঃ পবিত্রে।
লালাং প্রহিতথূত্কমদাৎ প্রহারম্
হাহা হতোঽহমিতি রোদিতি বিষ্ণুশর্মা।"

পূতদেহ, শুচি, বিষ্ণুশর্মা নামক ব্রাহ্মণের মস্তকে বারাঙ্গনা পদাঘাত করিতেছে এবং বিষ্ণুশর্মা তাহাতে তারস্বরে রোদন করিতেছে। এক্ষণে ইহা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিরও চিত্তে সর্বপ্রথম কোন্ ভাবের উদয় হইবে? বিষ্ণুশর্মা নামধেয় ব্রাহ্মণের দুর্দশা দেখিয়া সাধারণতঃ পাঠকচিত্ত করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিবে ইহাই আমরা প্রত্যাশা করি কিন্তু তাহা না হইয়া সর্বজননিন্দিতা বারাঙ্গনা যে ব্রাহ্মণের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে সেই ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অথবা তাহাতে ব্রাহ্মণোচিত গুণাদি বিন্দুমাত্রও নাই এই জাতীয় ভাব জাগ্রত হয়। এবং ইহার সঙ্গেই 'এই প্রকার ব্যক্তি প্রহৃত হইবারই যোগ্য' এই ভাবও মনে উদিত হয়। অপরের দুঃখে দুঃখিত না হইয়া হাস্যাপ্লুত হওয়া ইহা নিষ্ঠুরতারই প্রকাশক, এবং ইহার সহিত গভীর অবজ্ঞার ভাবও বিজড়িত হইয়া আছে। এই সকল ভাব একত্রে মিশ্রিত হইয়া হাস্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ইহার মধ্যে কৌতুক বা আমোদ প্রিয়তাই প্রধান। অনুরূপ ভাবে দেখান যাইতে পারে রত্নাবলী নাটকে মহিষী বাসবদত্তা যখন বিদূষককে লতাপাশে বন্ধন করিতেছেন তখন দুঃখের কারণ সত্ত্বেও সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া হাস্য জন্মলাভ করিতেছে—অর্থাৎ ইহা হাস্যবিভাবে পরিণত হইতেছে। অসঙ্গতির সকল ক্ষেত্রেই আবেদন চিত্তভূমির নিম্নস্তরের প্রতি, সেজন্য ইহা সৌন্দর্য্যবোধ, কারুণ্য প্রভৃতি মনোভাবকে জাগ্রত না করিয়া কৌতুক উপহাস প্রভৃতিকে জাগ্রত করে। যেক্ষেত্রে ইহা চিত্তের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে, সে ক্ষেত্রে ইহা হাস্যের অনতিগভীর রূপকে প্রকাশ করে। আমোদ বা কৌতুকপ্রিয়তার পশ্চাতে কৌতূহল, বৈষম্যবোধ, নিষ্ঠুরতা, শ্রেষ্ঠত্বাভিমান প্রভৃতি ভাব বর্তমান, এবং তাহা চিত্তের এই অনতিগভীর স্তরে সংবেদনশীল, এবং বিশুদ্ধ নির্মলহাস্য চিত্তের গভীর স্তরে। হাস্যের এই প্রকার বৈষম্যমূল উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া প্রতাপরুদ্র যশোভূষণ টীকাকার মল্লিনাথপুত্র কুমারস্বামী তাহার রত্নাপণ টীকায় 'হসিত' লক্ষণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন "যৌবনাদি বিকারজম নতু হাস্যবদ্ দ্বেষভাবাদি বিকারজম্"; অর্থাৎ হসিত যৌবনকালীন বিকার হইতে উৎপন্ন কিন্তু সাধারণ হাস্যের ন্যায় "দ্বেষভাব" প্রভৃতি বিকার হইতে উৎপন্ন নহে। 'দ্বেষভাব' পদটির যথার্থ তাৎপর্য টীকাকার উল্লেখ না করিলেও মনে হয় যে শ্রেষ্ঠত্বমূলক মনোভাব, ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত মনোভাব, আক্রোশ প্রভৃতি হাস্যের উৎপত্তিতে সহায়তা করে। সম্মানিত ব্যক্তির আকস্মিক পতনে যে হাস্যের সৃষ্টি হয় তাহা বিদ্বেষমূলক মনোভাবপ্রসূত; বিদূষকের শিখা সমাকর্ষণে সামাজিকের চিত্তে যে হাস্যোদ্রেক অথবা মত্তবিলাস প্রকরণম নামক প্রকরণে বৌদ্ধভিক্ষুর দুর্দশায় যে হাস্যের উদ্রেক তাহারাও দ্রষ্টার স্বীয়উৎকর্ষ মূলক ধারণা হইতে প্রসূত। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তে কোনও ব্যক্তি অথবা বস্তুর মধ্যে উপলব্ধ বৈষম্য প্রধানভাবে প্রতীত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে উপহাসবুদ্ধিই প্রধান থাকে এবং অন্যান্য কারুণ্যমূল মনোভাব জাগ্রত হয় না। আপন উৎকর্ষবোধ হইতে চিত্তে পরিহাসানুকূল মনোভাব জাগ্রত হয় ইহা লক্ষ্য করিয়া অভিনব ভারতী টীকায় বলা হইয়াছে—"সর্বো রিরংসয়া ব্যাপ্ত স্বাত্মন্যুৎকর্ষমানিতয়া পরমুপহসন্নভীষ্ট বিয়োগ সন্তপ্ত স্তব্ধেতুষু কোপ পরব শো......"। কাব্য প্রকাশের আদর্শ টীকায়ও বলা হইয়াছে—"চেতোবিকাশ উপহসনীয়ত্বেন জ্ঞানং মুখবিকাশরূপ হাস্যহেতু।"

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দেশীয় আলঙ্কারিক এবং নন্দনতত্ত্ববিশারদগণের মধ্যে হাস্যের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উপহাস, অবজ্ঞা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব যে চিত্তে কৌতুককর নিম্নশ্রেণীর হাস্যানুভূতির সৃষ্টি করে এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রহসন এবং ভাণগুলির মধ্যে যে হাস্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মধ্যে কৌতুকপ্রিয়তাই প্রধান। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে অধমপাত্রগত যে কোন প্রকারের অসঙ্গতি চিত্তে স্থায়ী আনন্দাত্মক ভাবের অনুরণন তুলিতে পারে না। কোনও প্রকার উৎকর্ষাভিমান বা উপহাসবুদ্ধি সর্বক্ষণ জাগ্রত থাকে। এজন্য এই সকল গ্রন্থপাঠে কৌতুকানুভূতিই প্রধান হয়। ৭ সুতরাং সকল প্রকার হাস্যের মূল যে অসঙ্গতি তাহার স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখাযায় যে স্থলে অসঙ্গতিচিত্তের গভীরতর স্তরে আঘাত করিয়া সহানুভূতির অনুরণন তুলিতে পারে না সেস্থলে সকল প্রকার বৈষম্য এবং ত্রুটি লঘু কৌতুকের উপাদানে পরিণত হয়। এই হাস্যের মূল কৌতূহল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইহা নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইচ্ছা এবং অবস্থার মধ্যে অসঙ্গতি, উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে অসঙ্গতি, বাক্য এবং আচরণ ইহাদের মধ্যে অসঙ্গতি—এই সকলের মধ্যেই নিষ্ঠুরতার ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। শকুন্তলা নাটকের পঞ্চমাঙ্কে বিদূষক যখন অন্তঃপুরিকাগণের হস্তে তাহার লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করে······গহীদস্স তাএ পরকীয়েহিং হত্থেহিং শিহণ্ডকে তাড়ীঅমাণস্স অচ্ছরাএ বীদরাঅসস বিঅ ণত্থি দানিং মে মোকখো।"····তখন তাহতে ইচ্ছা এবং কার্যের মধ্যে প্রযোজ্য এবং প্রয়োজক ভেদে অসঙ্গতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শিখা ধারণে কেহ তাহাকে পীড়ন করিবে ইহা বিদূষকের অনভিপ্রেত, কিন্তু অনভিপ্রেত হইলেও সেই দুঃখকে তাহার বরণ করিতে হইতেছে এবং বিদূষকের পীড়ন দর্শনে (হাসবিভাব) দর্শকসমাজ হাস্যাভিভূত হইয়া উঠে। যাহাকে অথবা যাহাদিগকে লইয়া হাস্য সৃষ্ট হয় তাহারা আপনাপন অবস্থাকে হাস্যের বলিয়া জানিতে পারে না। হাস্যরসের ব্যাপারও সকল প্রকার প্রয়োজন সম্বন্ধ বিরহিত। সকল ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত এবং অজ্ঞানজড়িত পীড়ন হাস্যকে উদ্রিক্ত করিতে সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের অনুকূলে আমরা বলিতে পারি—"কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদমাত্র। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্যন্ত যায় তাহাতে চক্ষে জল আসে।" ৮ হাস্যরসের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে জীবনের সকল প্রকার বৈষম্যের ত্রুটির অথবা দুর্বলতারই একদিকে যেমন বেদনা ও সহানুভূতি উদ্রেক করিয়া অশ্রুঘন করুণরস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, অপরদিকে তেমনই তাহারা সহানুভূতি এবং অনুকম্পাকে জাগ্রত না করিতে পারিলে দ্রষ্টার স্বীয় অন্তরস্থ সুপ্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উপহাসমূলক হাস্যরসের কারক হইয়া দাঁড়ায়। "কান্নাহাসির দোল দোলানো" এই জীবন একাধারে যেমন মিলনান্ত অপরদিকে তেমনই বিয়োগান্ত। হাস্যরসের যথার্থস্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইলে এজন্য জীবনের যথার্থরূপ নির্ণয়েরও প্রয়োজন।

(৬). প্রসঙ্গান্তরে ভাণভিমপ্রকরণ প্রভৃতিতে রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইবে। সামাজিকভেদে রসাস্বাদও যে ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে তাহা হাস্যরসনিষ্পত্তির বিষয় বিচার করিলে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অ্যারিস্ততল্ সম্ভবতঃ "lower and the higher kind of audience" বলিতে সামাজিকের আলোচ্য ভেদকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। (৭) কৌতুকহাস্যের মাত্রা।

আর্থার ব্যারিডেল্ কীথ্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

আর্থার ব্যারিডেল্ কীথ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল এডিনবরার পোর্টোবেলো নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থারের পিতা ডেভিডসন কীথ ছিলেন একজন বিজ্ঞাপন প্রচারবিদ্। এডিনবরার সরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া আর্থার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। মাত্র সপ্তদশবর্ষ বয়সে তিনি ক্লাসিক্‌সে প্রথমশ্রেণীর সম্মানসহ বি-এ উপাধি লাভ করেন। পরীক্ষায় অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য একাধিক বৃত্তি ও তাঁহার অধিগত হয়। এডিনবরা হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া কীথ্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বেলিয়োল কলেজের আণ্ডার গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি পাঁচ বৎসরকাল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এখানে সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য তিনি "বোডেন স্যান্সক্রিট্ স্কলারশিপ্" লাভ করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ও পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ তিনি অক্সফোর্ডের বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কীথ ইতিমধ্যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। দুইটি অনার্স বি-এ ও এক বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী পাইয়াও কীথ্ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন না। পর বৎসর তিনি সংস্কৃত ব্যতীত অপর একটি বিষয়ে বি-এ পরীক্ষা দেন, এবারও প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। এই বৎসরই কীথ্ হোম্ সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে উভয় পরীক্ষাতেই কীথ্ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং দুই পরীক্ষাতেই যে মার্কস পাইয়াছেন তাহা এ যাবৎ কেহই পান নাই। কীথের জীবদ্দশায় তাঁহার এই 'রেকর্ড' কেহই ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। সমগ্র ইংল্যাণ্ডের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কীথের অসাধারণ ও বহুমুখী মেধার কথা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র কীথ্ ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়নেও আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইনার টেম্পলের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত হন। আইনের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ব্যবহার-শাস্ত্র বিষয়ে মৌলিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি অক্সফোর্ড হইতে "ডক্টর অফ সিভিল্ ল" উপাধিও অর্জন করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস ও হোম্ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন জীবিকা নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিল তখন কীথ্ হোম্ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিলেন। ১৯০১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কীথ্ হোম সার্ভিসের উপনিবেশ (কলোনিয়েল) দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে অতি গুরুদায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতি সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান কর্মী রূপে হোম্ সার্ভিসে তাঁহার সুনাম পরিব্যাপ্ত হয়।

প্রথম জীবনে সংস্কৃতের উপরে কীথের যে গভীর অনুরাগ ছিল অন্যান্য বহু শাস্ত্রে কৌতূহল ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাহা হ্রাস পায় নাই। সম্ভবতঃ আশু সংস্কৃত অধ্যাপক প্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়াই তিনি হোম্ সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়াছিলেন। এই গুরুদায়িত্ব পূর্ণ চাকুরী করিতে করিতেই তিনি অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউটে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সমূহের তালিকা (ক্যাটালগ) প্রস্তুত করেন (১)। অক্সফোর্ডের বড্‌লেয়ন লাইব্রেরীতে সংস্কৃত পুঁথি সমূহের যে বিরাট সংগ্রহ ছিল তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ উইন্টারনিৎজ্ তাহার তালিকা প্রস্তুত আরম্ভ করেন কিন্তু তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সিভিল সার্ভেন্ট কীথ্

এই বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করেন (২)।

১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে কীথ তথাকার সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। হোম সার্ভিস হইতে এই সময় তাঁহাকে ছুটি লইতে হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেলের প্রত্যাবর্তনের পর কীথ পুনরায় হোম সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কীথ্‌ অতি পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভূমিকা সহ সাংখ্যায়ন আরণ্যকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (৩)। পর বৎসর তিনি ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবাদ ও টিকা ভূমিকা সহ প্রকাশ করেন (৪)।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল "ভেডিক ইনডেক্স অফ্‌ নেমস য়্যান্ড সাবজেক্টস" নামে একটি বৈদিক সূচী পুস্তক দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। এই পুস্তক রচনায় বৈদিক সাহিত্যের তথ্যাবলী উদ্ঘাটনে কীথ তাঁহার শিক্ষাগুরুকে প্রভূত সহায়তা দান করেন। বস্তুতঃ পুস্তকটি উভয়েরই নামে প্রচারিত হইয়াছিল (৫)।

ব্যারিডেল কীথ্‌ আমাদের দেশে সাধারণতঃ সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবেই সুপরিচিত কিন্তু বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে তাঁহার অন্য এক পরিচয় ও আছে। সংবিধানিক আইন (কন্সিটিটিউশন্যাল ল) বিশেষতঃ বৃটিশ সাংবিধানিক আইন সম্বন্ধে কীথ্‌ অতিনির্ভর যোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হোম সার্ভিসে অধিষ্ঠান কালে ও তাহার পরেও তিনি এই বিষয়ে অনেকগুলি উল্লেখ যোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।* বর্তমানে ও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে প্রশাসনিক সংকটকালে কীথের রচনাবলীর উপর নির্ভর করা হইয়া থাকে। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে ভারতের প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে কীথের মতামত প্রায়ই আলোচনা সূত্রে উত্থাপিত হইত। কীথ্‌ ভারতবাসির অতীত লইয়াই শুধু আলোচনা করেন নাই, আধুনিক ভারতের আশা আশংকার সহিতও তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন। ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাঁহাদের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োজন কালে তিনি পত্রালাপ ও করিতেন। বৃটেনের ঔপনিবেশিক দপ্তরের বিশ্বস্ত কর্মচারী ও ঝানু সিভিলিয়ান কীথ্‌ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন স্পৃহার একজন সমর্থক ছিলেন এবং তিনি এমনই সত্যসন্ধ ছিলেন যে প্রয়োজন কালে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেও কুন্ঠিত হইতেন না।

প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল হোম্‌ সার্ভিসে থাকার পর কীথ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অধিকতর সুযোগ পাইবার নিমিত্ত কীথ্‌ অতি উচ্চ সম্ভাবনাপূর্ণ সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন, ইহা হইতেই তাঁহার সংস্কৃত ও ভারত বিদ্যা প্রীতির গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট হোম্‌সার্ভিস হইতে তাঁহাকে সহজে অব্যাহতি দেন নাই, পদত্যাগ করার

*(a) Responsible Government in the Dominions—1909. Second Edition in 3 Vols.—1912. Revised Edition in 2 Vols.—1928.
(b) Imperial Unity and the Dominions, 1916.
(c) The Soverignity of British Dominions, 1916.
(d) The Constitutional Law of British Dominions, 1933.
(e) The Govt. of the British Empire, 1935.
(f) History of the First British Empire, 1930.
(g) A Constitutional History of India 1600—1935. Pub. in 1936.

পরও তাঁহাকে সরকারী কাজে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতে হইত, জাতীয় প্রয়োজনে কীথ্ তাহা সানন্দেই সম্পন্ন করিয়া দিতেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাঁহাদের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক কীথকে নিষ্কৃতি দেন নাই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ব্যতীত বৃটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিংশ বর্ষ কাল কীথ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়া যান।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কীথ্ কৃষ্ণ যজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তক দুইখণ্ডে হারভার্ড ওরিয়েন্টেল সিরিজ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনূদিত বা সম্পাদিত হয় নাই (৬)। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কীথ্ ইণ্ডিয়ান মাইথোলজি নামে একটি পুস্তক রচনা করেন (৭)। ইহাতে তিনি প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন যে পুরাণ কথা (মাইথোলজি) হইতেই মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কীথের সম্পাদিত ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হয় (৮)। ইহার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বেদের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কীথ্ দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন (৯)। তরুণ যৌবনে কীথ্ ম্যাক্সমূলারের সাধনপীঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদাধ্যয়ন ও বেদ গবেষণা আরম্ভ করেন, এই পুস্তকটি তাহার এ যাবৎ সাধনার পরিণত ফলও তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিংশ শতাব্দীতে একমাত্র ম্যাক্‌ডোনেল ব্যতীত কেহই কীথের ন্যায় বৈদিক আলোচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

এই গ্রন্থ রচনার পর কীথ্ বৈদিক যুগোত্তর কালে তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। যৌবনে অক্সফোর্ডের বডলেয়ন্ ও ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পাঠাগারের সংস্কৃত পুঁথিগুলির তালিকা রচনা কালে কীথ্ এ যাবৎ অপ্রকাশিত ও অনালোচিত বহু রচনার সন্ধান পান। সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় কীথ এই পরিচয়ের সম্যগ্ সদ্ব্যবহার করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে কীথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১০)। সাংখ্য দর্শনের সূত্রগুলির বিবর্তন এই পুস্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। কীথের এই পুস্তকটি দুরূহ সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সহজ পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম মীমাংসা দর্শন সম্বন্ধে একটি ও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে আরেকটি পুস্তক প্রকাশ করেন। (১১, ১২)। সাংখ্য মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক—প্রাচীন হিন্দু দর্শনের এই কয়টি শাখা পরিক্রমান্তে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ও কীথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্তমতের নিরসন করা হয় (১৩)।

বৈদিক সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কীথ্ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রতি এবার তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। ভেবর, ম্যাক্সমূল্যার ও ম্যাক্‌ডোনেল্ ইতিপূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, কীথ্ এই সব রচনা প্রকাশিত হইবার পর প্রাপ্ত নূতন নূতন তথ্যাদির ভিত্তিতে এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ে একটি বিরাট পুস্তক রচনা করিলেন (১৪)। ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে এ বিষয়ে তাঁহার রচিত একটি নাতিক্ষুদ্র পুস্তক ও প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ ভারত-বিদ্ সিলভাঁ লেভি ভারতবর্ষের নাটক সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে ভাস ও অশ্বঘোষাদির রচনা আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কীথ নবাবিষ্কৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, নাট্য-সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রয়োগ বিধি সম্বন্ধে একটি সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে কীথের এই রচনাটি এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য রচনা বলিয়া পরিগণিত হয় (১৬)। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের পত্রিকাদিতে কীথ প্রায়ই নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, এইগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে তাঁহার এই প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় বহু পণ্ডিত কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পুস্তক রচনায় ব্যস্ত থাকিলেও কীথ ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুস্তকগুলির তালিকা সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন। বিভিন্ন লিপিতে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এই পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত রূপ সুদীর্ঘ সময় সাধ্য কাজ কীথ্ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করিয়া দেন। এই গ্রন্থতালিকা (ক্যাটালগ) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। শুধু মাত্র এই কাজটি সম্পন্ন করিয়াই যে কোন পণ্ডিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। ছাত্রাবস্থায় কীথ অস্বাভাবিক প্রতিভা (প্রডিজি) বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কর্মজীবনে ও তিনি এই অস্বাভাবিক প্রতিভা ধরের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর বিপুলতা পণ্ডিত সমাজে বিস্ময়ের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে কীথ সৎ, উদারহৃদয়, ন্যায়-নিষ্ঠ ও মনোরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাংবিধানিক বিষয়ে রচিত তাঁহার পুস্তকাবলীতে তাঁহার মানবিকতা পূর্ণ উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর লেখকেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে না দেখিয়া একটি বস্তু বা যন্ত্র হিসাবে বিচার করেন। কীথের রচনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষকে মানুষ হিসাবেই বিচার করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মানে ভূষিত হইলেও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এককালীন বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী ও বৃটিশ সাংবিধানিক আইনের অন্যতম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার কীথ্ কোন রাজ সম্মানে ভূষিত হন নাই ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কীথ্ মারগারেট্ ব্যালফুর নাম্নী এক রমনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। কীথ্ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, কীথ পত্নী ও ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী। কীথের বিদ্যাচর্চায় তিনি সর্বদাই সহযোগিতা করিতেন। একাধিক পুস্তকের ভূমিকায় কীথ স্বীয় পত্নীর এই সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুতে কীথ্ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙিয়া পড়িতে থাকে ও তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন বাছিয়া লন। মনোরম ব্যক্তিত্বের অধিকারী কীথের সঙ্গ এই সময় তাঁহার প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মিদের পক্ষেও দুর্লভ হইয়া উঠে। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন বটে কিন্তু কোন সভা-সমিতিতে যোগদান বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর কীথ্ এডিনবরায় পরলোক গমন করেন। ভারতের সংবাদ পত্রগুলিতে কীথের পরলোক গমন সংবাদ যথোচিত মর্যাদার সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে কীথ্কে শুধু প্রাচীন ভারতের নহে আধুনিক ভারতবাসিরও সুহৃদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।

(১) A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in the Indian Institute Library—Oxford, 1904.

(২) Catalogue of Sanskrit Mss in the Bodleian Library Vol. II completed by A. B. Keith, 1906.

(৩) The Sankhayana Aranyaka with an appendix on Mahabrata—London, 1908.

(৪) Aitareya Aranyaka—Anecdota Oxoniensia, Oxford, 1909.

(৫) Vedic Index of Names and Subjects—London, 1912.

(৬) The Veda of the Black Jajus School—Taithiriya Sanhita Haward Oriental Series (Vols. 18 and 19)—1914.

(৭) Indian Mythology (In the Mythology of All Races Series, Vol. 6), 1917.

(৮) The Aitareya and Kausitaki Brahmanas, Harvard Oriental Series (Vol. 25), 1920.

(৯) The Religion and Philosophy of the Veda and the Upanishads—Harvard Oriental Series (Vol. 31 and 32), 1925.

(১০) The Samkhya System: a history of the Samkhya Philosophy—Heritage of India Series—Calcutta, 1918.

(১১) The Karma Mimansa, (Heritage of India Series)—Calcutta,1921.

(১২) Indian Logic and Atomism: an exposition of the Naya and Vaicesika systems—Oxford, 1921.

(১৩) Buddhist Philosophy in India and Ceylon—Oxford, 1923.

(১৪) A history of Sanskrit Literature—Oxford, 1928.

(১৫) Classical Sanskrit Literature—Calcutta, 1923.

(১৬) The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice—Oxford, 1924.

চিত্রণ ও ভাস্কর্য

নীলরতন কর

ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা কলাবিৎ মনকে সুন্দরের প্রকাশে যে মাধ্যমে নিয়োজিত করে তদনুযায়ী সৃষ্টি হয় তার কারুশিল্প।

দেশে দেশে বিভিন্ন সভ্যতা অনুসারে রচিত হয়েছে যে জীবনের আলেখ্য, পত্রে, গিরি প্রাচীরে, গিরিগুহাগাত্রে, কাষ্ঠে, মৃত্তিকায়, কিংবা পাষাণ ফলকে, কালের বিস্মৃতি লোক অতিক্রম করে তার অবশেষগুলি উঁকি দিচ্ছে,—প্রত্নতাত্ত্বিকের খনিত্র সঞ্চালনে প্রাগৈতিহাসের অধ্যায়ে ঐতিহাসিকের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতিমূলক নৃতত্ত্বের গবেষণাগারে।

সৌন্দর্য-পূর্ণ চিত্রণ ও ভাস্কর্য অবসরের অপেক্ষা রাখে, নিয়ে আসে মুক্তির আবেদন ও ব্যঞ্জনা। প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাত সমাজে ও শরীরে যে সকল বিকৃতি আনে তার ছাপ বা প্রতিফলন যদি বা যখন পড়ে—এবং মাত্রাভেদে তা অবশ্যম্ভাবী হতে পারে,—তখন পাওয়া যায় একপ্রকার শিল্প যা প্রথম শ্রেণীর না-ও হতে পারে। ব্যষ্টির উপর জাতির বা সমাজ বিশেষের এবং ব্যক্তির উপর ব্যক্তি-বিশেষের পদমর্যদা, ক্ষমতা, চাপ ও প্রভুত্ব শিল্পীকে কখনও বাধ্য করেছে বিশেষ শিল্পে সৃষ্টিমূলক কার্যে নিয়োজিত হতে। এই সকল কারণে ব্যষ্টি, সমাজ ও কালভেদে শিল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, হয়েছে বিরচন ও গঠনে শ্রেণীভেদ, স্তরভেদ।

সকলের উপর রয়েছে ব্যক্তিগত রসানুভূতি, যা শিল্প স্রষ্টার মনকে আবিষ্ট করে, নিবিষ্ট করে, নিয়োজিত ও একাগ্র রাখে নিজ সাধনার ধনকে বাস্তবে বিকশিত করে তুলতে। এক প্রকার অধ্যাত্ম চেতনা এবং অবচেতন ও চেতনলোকের অবভাস, তার লেখনী, রঙ, তুলিকা ও তক্ষণযন্ত্র তার হস্তের দেশী, স্নায়ু, ধমনীর বেগ সমবায়ে কাজ করে; তার সূক্ষ্মসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান দৃশ্যলোক ভেদ ক'রে যতটুকু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে তাই দিয়ে সে নিজেকে ধন্যবোধ করে ও কৃতার্থ হয়।

সৌন্দর্য আছে বাইরে কিংবা অন্তরে? কে বা কি সেই বিষয়বস্তু? বিশেষ রেখা ও রঙের সমাবেশ, গঠনের বিশেষ ছন্দ, সূক্ষ্মতা ও গরিমা কি মহিমান্বিত করে শিল্পকে?

প্রাচীন অলঙ্করণের চারুপটত্ব একদিকে, অপরদিকে আধুনিক আভাষমূলক স্বল্পরেখা ভাব ব্যঞ্জনা যেন দুইটী বিপরীত দিকের সুদূর প্রসারী দিগন্তরেখা, যার অবকাশে শিল্প ক্ষেত্রের নানারূপ মেলা বসেছে। অলঙ্করণে আছে রেখার পাণ্ডিত্য বা পারদর্শিতা, হস্তের ধৈর্য ও সূক্ষ্ম-লীলা; আভাষমূলক শিল্পে আছে গদ্য ছন্দ অপরের মনকে দেখালোকের খাঁজে তুলি বুলিয়ে মৃদু ইঙ্গিত।

শিল্পী তার দেখা জগতকে সম্পূর্ণ ধরা দেবে কি! না কেবল ছুঁয়ে যাবে? তারবার্তা পেয়ে মানুষের মন সংবেদনশীল হয়; হয়ত ভুলে যায় যে ভাষায় সে সংবাদ পেল তা ব্যাকরণ-গতভাবে শুদ্ধ কিনা; একটা তন্ত্রীর কম্পন যদি অনুরণন আনে অপরের-ও প্রাণে আধুনিক শিল্পী বলে সে কৃতার্থ। একশ্রেণীর আধুনিকতায় আছে সেই দিকে গতি। শিল্পী কল্পনায় পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় রূপলোকে; পাখার অভাব বাধা দেয় তাকে যে গতিতে তা সত্ত্বেও সে বাধ্যহয় না তার সুন্দরকে ধরা দিতে, ঠিকানা জানিয়ে রসিকজনকে পাঠিয়ে দিতে নির্দিষ্ট অভিলাষিত স্থানে একারণে অধিক সংখ্যক রসসংবেদক-যাঁরা অতীতে হয়ত অবহেলিত অবজ্ঞাত

থেকে যেতেন,—এসে পড়েছেন শিল্পীর আসনে সামনের পংক্তিতে।

প্রকাণ্ড স্তূপশিখর, শিলাশৈলকে ছেনির আঘাতে বিঘোষিত ক'রে যে বিরাট সাফল্য এনেছিল ভারতের ভাস্কর, তার মৌনব্রতপরায়ণ স্তব্ধ সাধনা কি আজও আধুনিকের মনে জাগায় না শিল্পরসের অনুভূতি; হোক তা প্রাচীন, কে তার মহান বিরাটত্বকে অস্বীকার করবে? কে স্পর্ধিত বলতে পারে তা প্রথমশ্রেণীর রূপসৃষ্টির সম্মান পাবে না? প্রতিপক্ষ বলতে পারেন তবে কি আমরা পেছিয়ে যাব অতীতের অন্ধকারে? আধুনিকের দরদী প্রাণ কি ব্যর্থ! গুহাবাসী মানুষের আঁকা বাইসন শিকারের চিত্রে যে সংবেদন আধুনিক শিল্পী তার চেয়ে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন তুলনা করলে পাওয়া যায় এর উত্তর।

মানুষের মস্তিষ্ক আর তার স্নায়ুমণ্ডলী বিবর্তনের ঘাতে ঘাতে কতদূর সমুন্নত, কতদূর তরঙ্গ প্রেরক ও বাহক? তার পরিপুষ্টি, পরিণতি কি অনবদ্য অথবা আংশিক বিকৃত? সমাজের সংশয় সঙ্কুল মহারণ্যে কোলাহলের চূড়ান্ত রেখা শিল্পীকে কি পীড়িত করে না একটুও? জীবনের রস কি পরিপূর্ণ উপভোগ্য তার হৃদয় পরতে? কার উপর ভিত্তি করবে শিল্পী তার রস রচনাকে? বেদনার কশাঘাতে আনবে সে মোহনীয় স্পর্শ, সম্মোহিনী রূপের আবেশ! এই কি তার জীবনের অঙ্গীকার?

শিল্পী কি সমাজ নিরপেক্ষ? স্বতস্ফূর্ত? হয়ত বা হতে পারে; হয়ত নয়; সন্দেহ দোলা দেয় প্রাণে, এই ধূলিধূসর অন্ধমলিনতা কি এনে দেবে তার ক্ষয়িষ্ণু স্বল্পায়ু জীবনে। প্রাচী এবং প্রতীচীর সভ্যতার সংঘাত এনেছে এই জিজ্ঞাসা অধিকতর রূপে।

অল্প সংখ্যক জনসমষ্টির সুযোগ সুবিধা ও বেগবান প্রধাবন, জনতাকে ক্লেদকর্দম দৈন্যে সিক্ত করছে, অভ্যস্ত করছে পীড়নকে, অসুন্দর জীবনকে, ঠেলাঠেলির ভিড়কে, চিরন্তন অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করে নিতে। চেতনাজাগা বারণ তার মনে, চায় না সে সুন্দরকে কাম্য ব'লে; কিংবা ক্ষণিকের উত্তেজনায় যা সে চায় তা প্রকৃত সুন্দরের সম্মান পেতে পারে না।

নগোপকণ্ঠ বা নগর প্রান্তের মানুষ, মহানগর বা মহানগরীর অধিবাসী, গণ্ডগ্রাম, জনপদ, প্রান্তর বাসী, অরণ্যচারী, মরুবাসী ও মেরুবাসীদের মধ্যে কে কি শিল্প সৃষ্টি করেছে অনুসন্ধান করা যায়। কৃষক কি শিল্প সম্পদ দেয়? শিকারীব্যধই বা কি করে? উত্তরে যদি কেউ বলেন এরা শিল্পী নয় অন্তত কারুশিল্পী নয়, তা নির্ভুলকি না? শিল্পীর গোষ্ঠী পৃথক, ললিতকলা শিল্পী আজকের দিনে একথা বলতে পারেন। প্রাচীনের আলিম্পন কি শিল্প নয়? যে গৃহে কৃষিজীবি থাকে তার কুটিরের কাষ্ঠ স্তম্ভে কোথাও তক্ষণ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

প্রায় পাঁচসহস্র বৎসর পূর্বে মোহনঞ্জোদাড়োতে বালকবালিকাগণ যে ক্রীড়নক নিয়ে খেলা করত, মহিলারা যে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন, এবং যে সকল মৃৎপাত্র গৃহস্থলীর কাজে ব্যবহৃত হত তার মধ্যে তৎকালীন শিল্পকে অনুসন্ধান করা হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা লব্ধ নিদর্শন সমূহের প্রত্যেকটি শিল্পের পরাকাষ্ঠা নয়।

প্রয়োজনগতশিল্প, আর তথাকথিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিল্প, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে শিল্পকে; যদিও শিল্পের এই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ্য নয়। শিল্প সৃষ্টির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় ভারতের তথা বৃহত্তর ভারতের দেবালয়, মন্দির, গুহা, বিহার, তোরণ-চৈত্য ও স্তূপ সমূহ হতে। তালিপত্রের পুঁথিতে আঁকা চিত্র অথবা গুহাঙ্কিত চিত্র—যার পট-

ভূমি গুহা-প্রাচীর ও ছাদের অভ্যন্তর গাত্র—তার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শনের কিয়দংশ এখনও সুস্পষ্ট। বস্ত্রশিল্পের মাধ্যমে যা অঙ্কিত হয়েছে তার ও শিল্পমর্যাদা আছে। মৃৎপাত্রের উপর রঙতুলি দিয়ে যে টান, শিল্পক্ষেত্রে সেটি কাগজের উপর জলরঙা অথবা স্থূলবস্ত্রের উপর তেলরঙা চিত্রের সঙ্গে ও রেশমীবস্ত্রে আঁকাচিত্রের সঙ্গে একপংক্তিতে পড়বে কি? এ প্রসঙ্গে প্রধান বক্তব্য এই যে বিভিন্ন মাধ্যমের কোনটি কতদূর সুযোগ সুবিধা দেয় এবং প্রকাশের দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কি পর্যন্ত স্থায়ীত্বে ও নিত্যতায়, তার উপরে রয়েছে তার গুণগত ও কালগতভেদ।

তুষারাবৃত পথে বরফের গোলা দিয়ে মানুষগড়ার বাল্যক্রীড়ার পশ্চাতে রয়েছে শৈত্যের প্রাধান্য, গ্রীষ্মের রৌদ্রপেলে সে ক্রীড়নক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বাঙলার মৃৎশিল্পীর কাঁচা-মাটির মূর্তির অবলেপ নোনালেগে ঝরে যায়, মিশেযায় মাটির সঙ্গে বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপটায়। কাগজে আঁকা চিত্র অকসিজনের সংস্পর্শ এলে ক্রমশ লালচে বিবর্ণ হয়ে যায়, এবং ক্রমবিশুষ্কতায় হয় চূর্ণপ্রবণ; নিকৃষ্ট কাগজ আর্দ্র আবহাওয়ায় উত্তাপের তারতম্যে আয়তনে হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ায় প্রান্তভাগ বাঁধা থাকলে কুঞ্চিত হয়; বর্ষার প্রাবল্যে জীবাণুবাহী আবহাওয়ায় ছত্রকের আবাসভূমিরূপে চিত্রের উপর রচিত হয় উদ্ভিদের মন্ড, কীটের দংশন কাগজ পত্রের চিত্র ক্ষত করে ধরণীর ধূলিতে ধূলিস্মাৎ করে শিল্পীর সৃষ্টিকে ক্রমশঃ। কাগজে লেখনীর রেখাচিত্র ও তুলিকাঙ্কিত জলরঙাচিত্র, স্থূল বস্ত্রখন্ডের উপর তৈলাক্ত রঞ্জকময় তুলিকা দ্বারা প্রলিপ্ত তেলরঙাচিত্র, পক্ষীঅন্ড শল্কোপরি সূক্ষ্ম তুলিকাগ্রে আঁকা বর্ণময় ক্ষুদ্র চিত্র, শুভ্রমৃত্তিকা ফলকে বিশেষ রাসায়নিক রঞ্জক সাহায্যে অঙ্কনের অবশেষে বিদহন দ্বারা স্থায়ীকৃত চিত্র, প্রাচীরের গায়ে চূণাভূমি তৈরী ক'রে তার উপর আঁকা চিত্র প্রভৃতি স্থায়ীত্বের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। মাধ্যমে ভিন্ন হওয়ার জন্য প্রকাশে ভিন্নতা আসে (কাষ্ঠ, প্রস্তর, চূণবালু কঙ্কর মিশ্রময় কৃত্রিমশিলা, কাঁচ, কাঁচকড় বা এনামেল, তাম্র, পিত্তল, রৌপ্য স্বর্ণ ও অকলঙ্ক ইস্পাত মাধ্যম নিয়ে যথাক্রমে সূত্রধর, তক্ষণশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, কাচ ও এনামেল শিল্পী, কাংস্যকার রৌপ্যকার, স্বর্ণকার, লৌহকার, বিভিন্ন নির্মাণরীতি ও রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বনে রূপ ও বর্ণের বিবিধ শিল্প চাতুর্য প্রদর্শন করান।

সমতলক্ষেত্রের অঙ্কনশিল্পে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রকৃত অনুপাতে দেখানো যায় কিন্তু সেই সঙ্গে বেধ শিল্পীর কলা কৌশলে উদ্ভাসিত হয় পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞানালোকে। যে কোনও ঘনকের মধ্যে নির্দিষ্ট যে কোনও বিন্দু তার অপর কোনও স্থানের দূরত্বের যে আপেক্ষিকতা রক্ষা করে অক্ষাঙ্কের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের মূলত্রয় দ্বারা সেটি নির্বিশেষে সূচিত হয়। সবল ও বক্ররেখার মধ্যে আছে দৈর্ঘ্যাঙ্ক; আয়তক্ষেত্রের মধ্যে আছে প্রস্থাঙ্ক ও দৈর্ঘ্যাঙ্ক; ঘনকের মধ্যে আছে দৈর্ঘ্যাঙ্ক প্রস্থাঙ্ক ও ঘনাঙ্ক; এই তিনটি অঙ্ককে তার দিশাঙ্ক ডাইমেনশান্ বলতে পারি। দ্বিদিশাঙ্কিক ক্ষেত্রের শিল্পীদের মধ্যে কেউ হয়ত তৃতীয় দিশাঙ্ক বা বেধাঙ্ককে দেখাবার আগ্রহ না রাখতে পারেন। তক্ষণশিল্পে তৃতীয় দিশাঙ্ক কিছুমাত্র বাস্তব আর মূর্তি শিল্পে ও ভাস্কর্যে সেটি সম্পূর্ণ প্রকৃত। ভাস্কর্যের নিদর্শন পূর্ণভাবে দেখবার জন্য দর্শককে সেটি প্রদক্ষিণ করা প্রয়োজন হতে পারে; আলেখ্য প্রেক্ষণে যা অবান্তর।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কারুশিল্পে রচনাশৈলী ও কলারীতির পার্থক্য সুপ্রকট। চিত্র বা মূর্তি দেখলে বিশেষজ্ঞ বলে দিতে পারেন সেটি কোনকালের এবং কোনদেশের বা প্রদেশের রীতি অনুসারী কি পরিমাণে; কাঙড়া উপত্যকা, অথবা গৌড়বঙ্গের, দাক্ষিণ্যত্য অথবা উত্তর প্রদেশের, মগধ অথবা রাজস্থানের মধ্যপ্রদেশ অথবা কলিঙ্গের;—তদ্রূপ কালানুযায়ী হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা মুঘলযুগের। সামাজিক রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার এবং

আকার গত বৈশিষ্ট্য না থাকলে এরূপ বলা দুঃসাধ্য হত। বিষয়বস্তু এক হলেও—যথা বুদ্ধ-মূর্তিতে—এই বিশিষ্টতা অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্যে পড়ে; কিন্তু অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে তা বোঝা সুকঠিন। লাইডেন্ মিউজিয়মে রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্তি সাধারণে ভারতীয় ব'লে বুঝতে পারেন কিন্তু সেটি যে দ্বীপময় ভারত যবদ্বীপের বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সে কথা নিঃসন্দেহে বলা সহজসাধ্য হত না।

ভারতের কারু শিল্পক্ষেত্রে যে সকল নিদর্শন আছে তার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনগণের মন্দির শিল্প অধিকাংশ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সরস্বতী, লক্ষ্মী, শক্তি, সূর্য, বিষ্ণু, এবং গৌরী, শিব, নটরাজ, গণেশ, দশাবতার, রামায়ণীঘটনা, কৃষ্ণলীলা, বুদ্ধজীবনী ও জাতক, ধ্যানীবুদ্ধ এবং তীর্থঙ্করগণ, পৌরাণিক ঘটনাসম্বলিত যথা সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি বর্ণনামূলক মূর্তি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্র একান্তভাবে অবলম্বন করেছে স্থাপত্যকে তার ভিত্তিভূমিকারূপে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধীর গতির জীবনযাত্রা অতিক্রম ক'রে পণ্য-শিল্প-বিপ্লবের যুগ প্রাচ্যের জীবনে হটকারিতাময় সামাজিক বিপর্যয় ও কৃত্রিমতা এনেছে; সঙ্গতিময় সৌন্দর্যবোধে ছেদ পড়েছে সেদিন পল্লী অঞ্চলে। জলবাষ্পীয় ও তৈলগ্যাসীয় পরিবহন সেদিন মানুষের বসতির ঘনত্বেও উপজীবিকায় বৈষম্য ঘটিয়ে জঞ্জালনগরীর বিভীষিকার বীজ বপন করেছিল। শাসনব্যবস্থা নিষ্ঠুর সুরুচিবর্জিত, সুপরিকল্পনাহীন এবং শোষণমূলক হলে জন-সমাজে শিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্বাণ লাভ করে। বৈদেশিক শাসকের কথা, খড়্গ ও আগ্নেয়াস্ত্রের নিষ্ঠুরতা অতিক্রম ক'রে ক্ষয়িষ্ণু ভারতের স্বাধীনতা তার নবজন্মলাভের স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল যেদিন,—অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়েছিল যে কালে,—তৎপূর্বকালীন এদেশীয় শিল্প সৃষ্টির খর্বতা আজও সম্পূর্ণ প্রাচুর্যের সম্পদ আনতে পারেনি; অদূর ভবিষ্যতে প্রাণদ সুস্বাস্থ্য, আরোগ্য, অপঙ্গুত্ব এবং অনৈদানিক অবস্থা যদি আনে জীবনে নূতন আনন্দলোক তবে কলাশিল্পে নব নব বিকাশ স্বাধীনতালব্ধ সুরক্ষিত ভারতে অসম্ভব হবে না।

কারুশিল্পী সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও কাজ করে চলেছে; কলাবিৎ তার প্রাণস্পদ প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কখনও ক্ষীণ স্রোতধারায় কখনও কলকল্লোলে যখন যেরূপ খাত মিলছে তার। সেই প্রবাহ অনুসরণ করলে, শিল্পের পীঠস্থান বেদী, স্তূপ, গুম্ফা, চৈত্য বিহার মন্দির হর্ম্য ও প্রাসাদযুক্ত তীর্থ ও নগরীতে পৌঁছানো যায়। ভারতে অজন্তা, ইলোরা এলিফ্যান্টা ও বাঘগুহা, ভারুত, মামালাঝুরম্, অমরাবতী, মাদুরা কণারক, ভুবনেশ্বর, মথুরা; সাঁচি, চিতোর, জয়পুর খাজুরাহো, আবু পাহাড়, রাজগৃহ, গয়া, নালন্দা, গৌড়, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর ভারতে প্রবেশ করলে, সিগিরিয়া, আঙ্কোরভাট্ (=ওঁকার বট!), বরবুদুর (=বড়ভূধর|), যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, নেপাল, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় শিল্প-নিদর্শনসমূহ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যিক হবে। বরবুদুরে রামায়ণের বর্ণনা, ক্ষোদিত পাষাণ মূর্তিতে যেরূপে প্রকাশিত রয়েছে অধুনা বিকৃত আরবীদুষ্ট রাষ্ট্রে তদ্রূপ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হিন্দু শিল্পের নিদর্শন বৃহত্তর ভারতের অন্যত্র অতি অল্প সংখ্যায় মেলে। নেপাল এবং আধুনিক ভারতীয় হিমাচলের উত্তরসীমানা অতিক্রম ক'রে তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শাক্ত, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ ও শৈবশিল্পের আলেখ্যে রঙ ও রেখার উৎকর্ষ এবং ধাতু ও প্রস্তরময় প্রতীক-প্রতিমার গঠন চাতুর্য দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। গান্ধার দেশে হিন্দু ও যাবনিক গ্রীক সভ্যতা মিশ্রণজাত ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন মেলে। মুঘল আমলের কাংড়া, রাজস্থানী হিন্দু চিত্রকলায় এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণে উদ্ভূত চিত্রাদিতে সম্পূর্ণ হিন্দু

বিষয়বস্তুর মধ্যে রঙ রেখার ঔজ্জ্বল্য ও সূক্ষ্মতা বিশেষ লক্ষ্যণীয়; বৃক্ষ-মৃগপক্ষী-ফলপুষ্পে-পরিশোভিত শুভ্র-মর্মর ও ইষ্টকাদি হর্ম্যশ্রেণীর পটভূমিতে বস্ত্রপরিপাট্যে সুসজ্জিত নায়ক-নায়িকা ও নাগরগণের সমাবেশ পৃথিবীর চিত্রাতিহাসে অতি মূল্যবান সম্পদ। মুঘল যুগের চিত্র-সমূহ ভারতীয় জলরঙা চিত্র নিদর্শনসমূহের সর্ববৃহৎ অংশ বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের অতীত চিত্রশিল্প-কথার পর প্রধান উল্লেখযোগ্য আধুনিক যুগের প্রারম্ভে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নূতন ধারায় ভারতীয় কলারীতির প্রবর্তন কলিকাতাস্থ রাষ্ট্রীয় কারুমহাবিদ্যালয়ে; ক্রমে যিনি—প্রাচ্যরম্যকলা পরিষদ পৃথকভাবে গ'ড়ে তোলেন বঙ্গের উদীয়মান চিত্রশিল্পীগণ ও উড়িষ্যার প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক ধারায় শিক্ষিত মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর শিল্পীকে নিয়ে—শেষোক্ত পরিষদ বর্তমানে আর নাই, কিন্তু তার শিক্ষকবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষণ-বিদ্যালয়ে নূতন কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। বিশ্বভারতীর নন্দলাল বসুর চিত্র ও চিত্রশিল্প পুস্তক এদেশী শিল্প-শিক্ষানবীশগণের মধ্যে সুপরিজ্ঞাত। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর প্রভৃতি নগরস্থ কয়েকটি কারুশিল্প-মহাবিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ অধ্যক্ষগণের দ্বারা পরিচালিত পরিবেশে যে সকল ছাত্র ও শিক্ষানবীশ কাজ করছেন তাঁদের শিক্ষার ফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

সার্বোক কসবা।

জনতায় মানুষের এককব্যক্তিত্ব সমষ্ঠিতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিগত-ভাবে জনতার পরিচয় ও যে বিভিন্ন হতে পারে তা দেশের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি। ইয়োরোপে নানা অনুষ্ঠানে সমবেত বিরাট জনসমাগম দেখেছি এবং সেই জন-সমুদ্রকে দেখলে তার প্রত্যেকটি মানুষের জাতিগত পরিচয় ও তার ব্যক্তিত্ব নজরের বাইরে হারিয়ে যেত না। সেই মানুষগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যেন বহুজন হয়ে জমাট বেঁধে জনতায় অভিব্যক্ত করতো প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ, শোক, বা জয়োল্লাস, গর্ব অথবা প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহকে। জনতার আয়তনে প্রত্যেকজনের ব্যক্তিত্বই খর্ব হয়ে যাওয়া দূরে যাক্ তাকে যেন আরো পরি-স্ফুট করে ব্যক্ত করতো তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, বিচারবুদ্ধি ও ডিসিপ্লিনকে। কিন্তু আমাদের দেশের জনতাকে দেখলে মানুষের সেই ধরণের পরিচয় পাওয়া যায় না। এদেশী জনতায় মানুষের ব্যক্তিগত সত্বা বিলুপ্ত হয়ে জমাট বাঁধা অতিকায় এক অন্য কিছু অদ্ভুতের সৃষ্টি করে থাকে। এই অতিকায় অদ্ভুতের আয়তনে কি চেতনা, উন্মাদনা বা প্রেরণা বা ইচ্ছা নিহিত আছে এবং তা সুপ্ত কি জাগ্রত, তা নির্ণয় করা কঠিন।

বহুকাল ইয়োরোপে প্রবাসী এক বন্ধু কয়েক বৎসর আগে হঠাৎ দেশের প্রতি ভালবাসা জেগে তীব্র হয়ে উঠায় কয়েকসপ্তাহ ভারতে সফর করে লন্ডনে ফিরলেন। তাঁর সংগে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর স্বদেশ, এতকাল ব্যবধানের পর কেমন লাগল। তিনি বল্লেন "এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া দুষ্কর। বহুকালের অনুপস্থিতি দেশের সত্বার পরিহার্য্য উপসজ্জাকে ক্রমে তার সঠিক রূপের একটা নির্দিষ্ট পরিচয়কে পরিস্ফুটভাবে চোখের সামনে এনেছিল। দেশের সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শে সে স্বরূপ আজ আবার অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুখনো কাঁচা রাস্তায় দ্রুতগামী যান যেসব পিছনে ধূলার কুয়াসা উড়িয়ে অপরদিকের দৃশ্যকে অস্পষ্ট করে দেয় সময়ের পথে বিবর্তিত ঘটনাচক্র তেমনি তুলেছে প্রতিক্রিয়ার কুজ্ঝটিকা। অল্পদিনের অতিথিবাসে ওপারে —দেশের উপরে বিছান সেই ঘটনার খোলা বিস্তারে খুঁজে পাওয়া দু' একটা ফাঁক দিয়ে তার আকৃতিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়নি বরং সে চেষ্টা করে কিছুটা বিভ্রান্তই হয়েছি। সেভাবে চোখে পড়া দু'একটা বিভীষিকাময় দৃশ্যের ছাপকে স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারলে সুখী হতাম। যে দৃশ্যের স্মৃতি আজো আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয় সে হচ্ছে হাওড়া ষ্টেশন থেকে বেরুতেই চারিদিকে অসংখ্য মানুষের ভিড়ের আচমকা সাক্ষাৎ। জনতার মানুষ-গুলিকে মনে হল তারা যেন অতিক্ষুদ্র কোন কীটপতঙ্গের সমষ্ঠি নররূপ পরিগ্রহ করে জমাট বেঁধে গেছে। উচ্ছিষ্টে বসা মাছির রাশিকে যেমন সয়াট এর এক আকস্মিক আঘাতে মুহূর্তে পিষে একাকার করে দেওয়া যায় তেমনি ঐ সামনের ঐ নরকীটের পঙ্গপালকে যেন এক বিরাট সয়াট এর ঘায়ে অনায়াসে চেপ্টে দেওয়া যেতে পারে এমনি তাদের অক্ষম ও তুচ্ছ মনে হোল। জনতায় পড়ে মানুষকে এত ছোট ও নগণ্য দেখায় তারই বাস্তব পরিচয়ে ও নিজেকে তাদেরই একজন জেনে দুঃখে ও ক্ষোভে আমার মনটা উদ্বেলিত হল এবং বেদনায় বুকটা ভেঙ্গে গেল।"

বালিগঞ্জ ষ্টেশনের লেবেল ক্রশিংএ গেট পার হয়ে কসবার এলাকায় ঢুকতে যে অগণিত

মানুষের ভিড়ের সম্মুখীন হতে হয় তা দেখে প্রতিবার মনে পড়ে সেই বন্ধুটির অভিজ্ঞতার কথা। কবিগুরুর কথায় এর খানিকটা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে—

"এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা
পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা!
এদের চিনিনে আমি বুঝিতে পারিনে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল!
কী চায়! কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এককালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো,
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে!"

এখন থেকে তিরিশ বছর আগে কসবার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চোখে ধরা যেত এবং তাঁরা কোন উৎসব বা মিছিলে একজোট হলেও তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জনতায় বিলীন হয়ে যেত না। সে সময়ের ভিক্ষুকদের পর্যন্ত বেশ যেন একটা আভিজাত্য ছিল। তারা কেউ ভিক্ষা বঞ্চিত হোত কদাচিৎ এবং দাতার কাছ থেকে দান আসত অসংকোচে বিনাদ্বিধায়। এক-তারা বাজিয়ে এক বৃদ্ধ বাউল প্রতিসপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে পাড়ায় প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়ে গাইত।

হরিনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ রসনা।
পেয়েছো মানব জনম এমন জন্ম আর হবেনা।
ঐ হরিনামের ধ্বনি শুনে ঋষি বাজায় বীণে·
ও শিব ত্যেজে কাশী শ্মশানবাসী
ঘরের ভাবনা তাও ভাবে না।

সেই একটানা একই সুরের নৈমিত্তিক পুনরাবৃত্তিতে কোন গৃহস্বামী বা গৃহিণীর বিরক্তি কিংবা আপত্তি হোত না বরং অপরিহার্য অভ্যাসের মতো সেই বাউলের উপস্থিতি যেন একটা প্রয়োজনের তালিকাভুক্ত ব্যাপার ছিল। অসুস্থতা নিবন্ধন কখনও বরাদ্দ দিনে তার অনুপস্থিতিতে অনেক বাড়ীতেই সে দিনটার উপভোগে কিছুটা খালি পড়ে যাওয়ার মতো মনে হতো।

যে এক বৈষ্ণবী নাসিকার উপত্যকায় পরিপাটিভাবে অঙ্কিত তিলকে ভূষিত হয়ে "জয় রাধে গোবিন্দ"র আওয়াজে উদারা মুদারা তারা মন্দ্রিত করে দরজায় উপস্থিত হতো প্রতি সপ্তায় একটি নির্দিষ্ট দিনে, তার হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে সে ভিক্ষুণীর ভিক্ষা করাটা অবান্তর। কিন্তু সদর দরজার চৌকাটটি জুড়ে প্রতিমা প্রায় কায়েমী প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে যখন প্রত্যেক বাড়ীর অন্তবাসীদের সঙ্গে ঘরোয়া সংবাদের খোস গল্পে মেতে সকলকে মুগ্ধ শ্রোতায় পরিণত করত, তারপর সে ভিক্ষুণী কি পরমাত্মীয় তা প্রশ্নের বহির্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এরপর চালের সঙ্গে দু একটা আনাজও তার ঝুলিতে নিক্ষেপ না করলে গৃহলক্ষ্মীদের চক্ষু লজ্জায় সঙ্কুচিত হাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। পরদেশী নতুন এক পরিবার আমাদের পাড়ায় আবাসী হলে যখন এই বৈষ্ণবীর আয়তন ও সজ্জা নিয়ে মন্তব্য করে ভিক্ষা দেওয়া উচিত হবে কি না বলায়, তাকে সে হাত ঘুরিয়ে সতিলক নাসিকার ঝামকানিতে শুন্যে

যেন একটা বিস্ময়ে বিরাট রেখা টেনে বলল "আমরণ! সাত সকালে কি অলক্ষুণে প্রস্তাব, ভিক্ষা না হয় নাই দিলে, তাই বলে কি আমার জাত ব্যবসা, ধর্ম, তোমার কথায় ছেড়ে দেব?" বৈষ্ণবী সে বাড়িতে আর ভিক্ষে না চেয়ে বয়কট করাটা পাড়ার বহু লোকে সমর্থন করেছিল।

অজস্র তালির আলখাল্লা পরিহিত ফকির সাহেব লতানো কোন গাছ থেকে বানানো ফণা ধরা সাপের মতো অদ্ভুত আকৃতির লাঠি হাতে মোটা পুঁথির মালা জপ্‌তে জপ্‌তে হাঁকতেন "মুস্‌কিল আসান।" তখন মনে হত মোগল ছবিতে আঁকা দরবেশের ডেরা ছেড়ে তিনি বুঝি ভুল করে ঐ পল্লীতে এসে পড়েছেন। বাদশাজাদা ও বাদশাজাদীরা যখন জোড়হস্তে তাঁর দোয়া মাঙতে প্রস্তুত, তখন সাধারণ গেরস্থরা ফকির সাহেবের শিরনীর ব্যবস্থার কিছুটা দায়িত্ব নিয়ে ধন্য হবার চেষ্টা করবেন কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এ ছাড়া বিশেষ পর্ব ও পূজার সময় আসতো মরসুমী ভিক্ষুক। তারা খঞ্জনী বাজিয়ে এক এক বাড়িতে ফরমায়েসী চন্ডী, কি মন-সার গান কিংবা আগমনী গেয়ে একবেলা কাটিয়ে ধামা ভরা চাল ও সব্জীর সিধে উঠিয়ে নিত।

বিরাট এক সিঙ্গে ফুঁকে ওলাবিবির নামে কেবল একটি পদ গেয়ে গেয়ে দুটি লোক আসত প্রতি বছর দিন-কয়েকের জন্যে। তারা কোন দেশী লোক তা জানবার কারও আগ্রহ ছিল না। সিঙে ফু দেবার মাঝে মাঝে তাদের একজন গেয়ে উঠত "ছেলোপিলে রাখবি ভৃান্ডা ওলাবিবি মা—" আর বাকী পদটা মিলিয়ে তার সঙ্গী নাকিসুরে যা গাইত তা বোধকরি এক মা ওলাবিবি ছাড়া আর কারও জানা ছিল না।

আভিজাত্যবিহীন দীনহীন অসংখ্য অসভ্য রবাহূতের গড্ডালিকার আবির্ভাবে সেকালের সেই বনেদী ভিক্ষুকরা ঘৃণায় ও লজ্জায় বোধহয় সমাধি কি মাটি নেবার উদ্দেশ্যে কোথায় অন্ত-র্হিত হয়েছে। আগত এই রবাহূতের মধ্যে কে আসল আর কে নকল, তা নির্ণয় করতে গিয়ে ঠকে, জন সাধারণের মনে দয়া ও করুণার ধারা শুকিয়ে নিরেট পাথর হয়ে গিয়েছে। তাই ক্ষুধায় শীর্ণ কাতর দেহ, ভগ্নাংশ, দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত ভিক্ষারীর দুর্দশা ও আর্তরব মানুষের চোখ ও কানের নির্মম ও কঠিন পর্দায় প্রতিহত হয়ে হতাশার চোরা বালিতে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায় প্রায়ই। কিন্তু এর জন্যে কোন্ পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করবে কে? বর্তমান সভ্যতার ঘোড়দৌড়ের বাজিতে এ গুলিকে স্বাভাবিক হার্ডল্‌স্ হিসাবে অনাসক্ত হৃদয়ে লঙ্ঘন করবার জন্য আমাদের অনেককেই এই ছল দার্শনিকতার অজুহাতের আড়ালে আত্মগোপন করতে দেখা যায়।

আজকের কস্‌বায় খোয়া পিঠানো রাশি রাশি ফাটা, চাক্‌লা ওঠা পিচে মোড়া রাস্তাগুলি খোলা ড্রেনের দাঁড়ি টেনে দুপাশে "হিগ্‌ল্‌-গিগ্‌ল্‌ডি" একহারা দোহারা, বেঁটে খাটো, কিংবা সরু ও লম্বা, আধতোলা থেকে আড়াই তোলা বাড়ির স্তূপের জমজমাট স্ট্রীট বা রোডের নামে ব্যাপটাইষ্ট হয়ে এখন বেশ বাড়ন্ত গড়নে উপনীত হয়েছে। উন্নতি যে হয়নি তা কজন কসবাবাসী হলপ করে বলবেন, বলা শক্ত। রাস্তার দুপাশের সাবেকী চওড়া ও গভীর কাঁচা নর্দমাগুলিকে সিমেন্ট ইঁট দিয়ে মুড়ে বেশ ছিম্‌ছাম্ রূপ দিয়ে সভ্য করা হয়েছে। বর্ষায় যতটুকু ময়লা জল আগেকার গভীর খানায় স্থানলাভ করত, তা এখন সহুরে ড্রেনএ কূল না পেয়ে রাস্তার উপরে উঠে হাঁটু থেকে কোমর জলের বান ছুটিয়ে দেয়। কস্‌বায় সভ্যতার বর্ধন গতির রেট দেখে বলা চলতে পারে যে এর ভরা যৌবনের প্রাচুর্যে বার্ধক্যের ভাঙন আসতে খুব অসুবিধে হবে না। তবে বলা যায় না, বৃত্রাসুর কি ভস্মলোচনের মতো বর পেয়ে থাকলে, দধিচীর হাড়ের ঘায়ে চূর্ণ কিংবা মুকুরে আপন মুখ দর্শনে ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক যুগের এই শহুরে কীর্তি বোধহয় অবিনশ্বর থাকবে।

যে কালের কথা লিখছি সে সময় আজকের পাকা রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কেবল একটি সদর রাস্তাই কসবার মাঝখানে শিরদাঁড়ার মতো বজায়ছিল। পায়েচলা কাঁচা পথগুলি এ পাড়া ও পাড়াকে সংযুক্ত করে স্নায়ুমণ্ডলীর মতন মিলতো এসে ঐ সদর রাস্তায়। বাদশাহী কে সুলতানি আমলের কিছু একটা ছিটে ফোঁটা পড়ায় বোধহয় জায়গাটির কসবা নাম করণ হয়েছিল। সিরিয়া, ইজিপ্ট কি আলজিরিয়া প্রভৃতি আরব প্রধান দেশের কসবা বলতে যে রোমান্টিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী কল্পনালোক উদ্ভাসিত হতে থাকে তার কণামাত্রও এই কসবার কোথায়ও নেই। আদি বাসিন্দারা বোধ হয় ছিল বেশীর ভাগে কৈবর্ত্ত, বাগ্দী ও পদ্মরাজ গোত্রীয় চাষবাসই ছিল প্রধান পেশা। পরে হয়ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে এর এলাকাগুলি চলে যায়। তখন কসবার বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নাম ছিল একই শ্রেণীর বাসিন্দাদের দলাদলি হিসাবে এবং সেই কারণে প্রধান প্রধান পাড়ার নাম ছিল—মুখুজে পাড়া ঘোষাল পাড়া, কায়স্থ ও বিশ্বাস পাড়া ইত্যাদি। এগুলি আজকের পাড়াগুলিতে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো নানান লোকের পাঁচমিশেলী জনতা ছিল না। কাঁচা রাস্তার আসে পাশে ধানের ক্ষেতে কপির ক্ষেতে গাজর মটর ও অন্যান্য শাকসবজীর ক্ষেত তো ছিলই আর বাকি জায়গায় নানা আগাছার মধ্যে রাজা রাণী হয়ে জন্মাত অ্যাসশেওড়া ও ঘেঁটুর ঝোপগুলি। পাড়ার পোদ, কৈবর্ত্তদের ছেলেরা ঘেঁটুপুজোর সময় রাত্রে বাড়ী গিয়ে সিধে যোগাড় করতো গান গেয়ে। সে ছড়ার দু একটা পদ এখনো মনে পড়ে—

"আমার ঘেঁটু যায় রে
ধুলো ওড়ে পায় রে
যে দেবে থালা থালা
তার হবে সোনার বালা
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটি
যে দেবে পাথর পাথর
তার হবে ধুসসে গতর ইত্যাদি।

আর মাঝে মাঝে সমস্বরে চেচাত "ঘেঁটু যায় খোস পালায়" বলে।

বিশ্বাস পাড়ার বটতলায় গরমের দিনে হোত কথকতার উৎসব। প্রাঙ্গনে বড় সামিয়ানা খাটিয়ে উপরে বাঁশের আড়া থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোত আনারস, কলার কাঁধি, জামরুলের ঝাড় বাতাবী লেবু এবং আরো নানান রকমের ফল আনাজের ভার। কথকঠাকুর তাঁর পুঁথি পাটা নানা অনুষ্ঠানে বেদীর উপর খুলে সাজিয়ে বেশ আড়ম্বরে তিলকাদির প্রসাধন করতেন। তারপর তেত্রিশকোটি দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্তব ও প্রার্থনা যেন আর শেষে হতেই চাইত না। অধৈর্য্য হয়ে ভাবতাম আর কতক্ষণে তিনি আসল গল্প বলতে সুরু করবেন। ধ্রুবের উপ-খ্যানে বালক ধ্রুবের গৃহত্যাগ বর্ণনায় কথকঠাকুর ক্রন্দন সুরে গেয়ে উঠতেন

"বিদায় হলাম ও জননী
রইলে কি মা নিদ্রাগত
আজকে তোমার প্রাণের ধ্রুব
চলে যায় মা জন্মের মতো

সঙ্গে সঙ্গে সভায় সকলের চোখের অশ্রুধারায় বন্যা আনবার উপক্রম হোত। একা কথক ঠাকুর কোন মায়াজালের বিস্তারে সভাস্থলকে এক বিরাট নাট্যমঞ্চে পরিণত করে চোখের সামনে উপস্থিত করাতেন কত রম্য বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যপটে যেন শত শত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা মর্মস্পর্শী অভিনয় দেখাতে অবিভূত হতেন তাঁর ইচ্ছায়ও ইঙ্গিতে। তাঁর কুব্জাদলনের অঙ্গ-ভঙ্গী আজও স্মৃতির চোখে ভেসে উঠলে হাসিতে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়।

উত্তর পাড়ায় কালীপুজোর সময় খুব ধুমধাম করে যাত্রার আয়োজন হোত। গালভরা নামের পর অপেরা আখ্যা দিয়ে যাত্রা কোম্পানীর দল আসত প্রতিৎসর। বড় সামিয়ানার এক প্রান্ত কিছুদূরে কানাত ঘেরা সাজঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসত দেবতা দানব, বনদেবী অপ্সরা, ঋষি যোগিনীরা এবং আসরের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি তাদের উপস্থিতিতে পর্য্যায় ক্রমে হয় রাজসভা কি বনস্থলী কিংবা ইন্দ্রপুরী, বৈকুন্ঠধাম বা বলিরাজার পাতালপুরী অথবা শিবা শকুন পরিবৃত যোদ্ধার শবাকীর্ণ ভয়ংকর রণক্ষেত্রে হয়ে যেত নাটকের দৃশ্যের প্রয়োজনানুসারে। এক এক দৃশ্যের অন্তে জুরিয়া উঠে কালোয়াতি গান ধরত। এককানে হাতচাপা রেখে মুখ-ব্যাদনের রকমারি মোচড়ানি সহকারে ধামার, চৈতাল কি ঝাপতাল—

"সম্বর সম্বর ক্রোধ
ওহে মহাঋষিবর
করজোড়ে মাগি ক্ষমা
দীনে করুণা বিতর।" ধরনের গীত

হৈ হৈ রৈ রৈ রবে প্রকট হয়ে যেত। বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে দুর্বাসা মুনি কি দশভূজায় বলুন বা লক্ষ্মী অথবা বনবালাই বলুন এই বিরতির সুযোগে সাজঘরে সকলেই দেদার বিড়ি ও চায়ের সদ্ব্যাহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। মুখুজ্জে পাড়ায় হরিসভায় আটচালায় হোত কীর্তনের আসর। চন্দন চর্বিত কলেবর প্রবীণ কীর্তনীয়ার আল্‌খেল্লায় লট্‌কান অসংখ্য সোণা রূপোর মেডেলের ব্যবহার দেখলে স্বয়ং গোয়েরিং সাহেবেরও হিংসে হয়ে যেত। তখনকার দিনে কোন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হওয়াটাই স্বাভাবিক গর্ব্বের ব্যাপার ছিল। কোন পাড়ায় সেরকম কোন সামর্থবান গৃহস্থ না থাকলেই বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা হোত এবং সে ধরণের আয়োজন সম্মানে খাটো ছিল। আজকালকার অলিতে গলিতে সার্বজনীন দুর্গাপূজোর সঙ্গে আড়ম্বরে তালিম দেবার মতো ক্ষমতা সেকালে কারুর ছিল না বল্লে অত্যুক্তি হবে না কিন্তু সেকালের পূজোয় খাদের চেয়ে আসল আর্চ্চনার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠত বেশী। আমাদের পাড়ায় চারুঠাকুরের আরতি দেখতে অনেক দূর থেকে আগত দর্শকদের ভিড় লেগে যেত। ধূপ ধুনায় ধূমায়িত সেই পূজা কক্ষে পুরোহিতকে অস্পষ্ট দেখাত যেন ধূম ঘনীভূত হয়ে মানুষের আকার নিয়েছে আর তাঁর লাস্যে সঞ্চালিত ডান হাত সেই জমাট রঙ্গীন ধোঁয়ারই একটা অঙ্কুরিত রেখা ঢাক ঢোল, কাঁসর ও ঘন্টার নিনাদে কম্পিত হয়ে ছন্দে নেচে দিকে দিকে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। এত কলরোলেও ঢাকঢোলের আও-য়াজে ও তন্ময়তা যে কত গভীর হতে পারে তা চারু ঠাকুরের দেহকে প্রস্তরীভূতপ্রায় নিশ্চল রেখে বাঁ হাতে নিরবিচ্ছিন্ন ছন্দে ঘন্টাবাদন ও ডান হাতে উপকরণের পর উপকরণ বদল করে ঘন্টার পর ঘন্টা লীলায়িত ভঙ্গিমায় দেবতার আরাধনা দেখে যে কোন দর্শকে অনুমান করতে পারত। মাঝ মাঝে কেউ গিয়ে চারু ঠাকুরকে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে না দিলে তিনি বোধহয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর দেহ সচল থাকার শেষ মুহূর্তটুকু পর্য্যন্ত বিরামহীন আরতি করেই যেতেন। বর্তমানে ও ধরণের আরতি করে দেবতাকে তুষ্ট

করার চেয়ে মণ্ডপে লাউড স্পীকার লাগিয়ে ফিল্মের রম্যগীতির রেকর্ড বাজিয়ে দেবতাকে গান শুনিয়ে সস্তায় বড় রকমের বরলাভের চেষ্টার রেওয়াজটাই এখন যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়। কে জানে, এসব সংগীত শুনে শুনে মা দুর্গার এখন হয়ত' রুচি বদল হয়েছে। তাই গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বোঝা কৈলাস পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে যদি তাঁর বাহন ভয়ঙ্কর রকমের আপত্তি করে বসে তা হলে মায়ের দশটা হাতের একটা তো অভয় দিতে খালি আছে। সেই হাত খানায় একটা ট্রাঞ্জিষ্টার সেট তো সহজেই নিয়ে যেতে পারবেন। সেখানে নব্‌টা ঘুরলেই শুনতে পাবেন দেশী ফিল্মের নায়ক নায়িকাদের রুম্বা স্যাম্বা, ট্যাংগো কি মাম্বোর মসলা ফোড়নে মজান শ্রুতিরোচক বাছা বাছা গান। মা শুনে খুসি হয়ে মুখে আরো দুটো পানের খিলি পুরে মুচ্‌কি হাস্‌বেন আর ব্যোমভোলানাথ নন্দীর পিঠে সম্‌ এর ঘা দিতে দু'দশটা চাপড়ের তেহাই দিয়ে হেঁকে উঠবেন'। "সাবাস" কার্ত্তিক ও গণেশ কোন গানের পচ্ছন্দ হওয়া ধুয়াটুকু চরস করে হজম করার জন্য শিস! দিতে শুরু করবেন। আর বাকদেবী ও শ্রীদেবীতে হাতের বীণা পুস্তক ও ধান্যাধার এবং কমল সেকেলে ঢং বলে ফেলে দিয়ে বোধ হয় ইলেকট্রিক গীটার, ভ্যানিটি ব্যাগ ও ড্রেসিং কেসের অর্ডার পাঠাবেন।

সেকালের পুজোয় ভক্তিভরে "ধনং দেহি; পুত্রং দেহি বলংদেহি" বলে অঞ্জলি দিয়েও বাস্তবে আজকের তুলনায় বিশেষ কিছু ভক্তরা পেতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু মায়ের আজকালকার বরপুত্রেরা পুজোয় যে ধরণের সাড়ম্বর আয়োজন করে থাকেন এবং তাতে নায্য বা নিষিদ্ধ সর্বকিছুরই আমদানীর অত্যাশ্চর্য্য সত্যযুগের লোকেদের পক্ষেও দেখান সম্ভব হোত না। এত মনোরম আলো ও সাজসজ্জা, এতো রাজোচিত উদরপূর্ত্তিতে যাতে কোন অপরিষ্কার কলঙ্কের ছাপে না এসে পড়ে তার জন্য মাতৃপুজোর এই মহান আয়োজন নাছোড়বান্দা ভিখিরীগুলি ও পুজাঙ্গনকে নিখুঁত রাখতে এর ত্রিসীমা এড়িয়ে চলে। যে কয় কোটি বঙ্গসন্তান আজ বেঁচে আছেন তাঁরা যে সুজলাং সুফলাং ও শস্যশ্যামলাং দেশের আনন্দময় পুজামণ্ডপে দাঁড়িয়ে 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি''র ভাবে গদগদ হয়ে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি"-র কোরাস গেয়ে দশদিক মাত করে দিতে পারেন তা বাঙ্গালীর পরম শত্রুতেও সহজে স্বীকার করে নেবেন।

গদ্যকবিতা ও লিপিকা

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সমন্বয়-সিদ্ধ; নানা সাহিত্য-রীতি ও আঙ্গিকের সমবায়ে এবং বিচিত্র মানসিকতার মেল বন্ধনে মাঝে মাঝে তিনি এমন এক-একটি রস-বস্তু আমাদের উপহার দিয়েছেন যা' আজ তাবৎ পাঠকের অক্ষয় আনন্দ ও বিস্ময়ের উৎস। "লিপিকা" এই নিরীক্ষার একটি দীপ্ত একক দৃষ্টান্ত। কাব্য-ধর্ম এবং গদ্য-রীতির মসৃণ সংমিশ্রণ, নানা সাহিত্য-রূপের মিলিত চর্চা এবং রূপক, আখ্যা ও নিবন্ধের নিপুণ রসায়ন "লিপিকা"র মৌল বৈশিষ্ট্য। একটি ব্যক্তি মানসের বহুবর্ণ চিন্তা এবং কল্পনার প্রতিফলনও আছে এই 'লিপিকা'র মধ্যে। সাহিত্যিক রূপ-বিচারে 'লিপিকা'র তাই কোন নির্দ্দিষ্ট গোত্র-ভুক্ত করা অবিধেয়। গদ্য এবং কবিতার 'সঙ্গম-তীর্থ-যাত্রী' এই রচনাগুলি নানা স্থান থেকে প্রেরণার মাধুকরী আহরণ করে' ও নানা রীতির পাথেয় কুড়িয়ে যাত্রা করেছে সেই অপরূপের পথে যা'র শেষ হয়েছে, একমুখী মানসিকতার একটি অখণ্ড উপলব্ধিতে। কোবিদ রবীন্দ্রনাথের আছে সেই 'কল্পনার আভা',১ যে স্পর্শমণির ছোঁয়ায় 'গদ্যে রঙ্ ধরে পদ্যের', আপাত বিরুদ্ধ নানা অসম রস বস্তু সমীকৃত হয় মন্ত্রবলে।

'লিপিকার' আঙ্গিক এবং উপজীব্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধারায় এমনই অভিনব যে প্রচলিত কোন সাহিত্য-অভিধায় তাকে চিহ্নিত করা যায় না। শুধু তাই নয়, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রেরণার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে গদ্য-ভঙ্গী ও গীতি-ধর্ম মিশ্র এই বিচিত্র গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বহু পূর্ব থেকেই।২ কবিতা এবং গদ্য-কবিতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয় প্রবণতার মিলন ঘটিয়েছেন যে পুরোহিত তাঁর মনে এবং মননে এই জাতীয় একটি সমীকরণের চিন্তা দীর্ঘকাল পূর্ব থেকেই স্থান পেয়েছে। 'লিপিকা' রচনার প্রস্তুতি এবং প্রেরণার উৎস-সন্ধান তাই সূচনাতেই কাম্য।

পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে, যে গদ্য এবং কবিতার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও মূলত উভয় রীতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই উপলব্ধি বহুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে গদ্যও যে দীপ্ত-কল্পনার স্পর্শে গীতিপ্রাণ ও রম্য হয়ে উঠতে পারে, কবিতা ও ছোট-গল্পের সমান্তরালে প্রবণতা যে বিশেষ মানসিকতার অনুঘটনে মিশ্রিত হতে পারে এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক ও মধ্যপর্বের সাহিত্য-নিদর্শনগুলির মধ্যে বহু স্থানেই পাওয়া যাবে। গীতি ধর্ম ও আখ্যান ধর্ম এই উভয় রীতিই যে পরস্পর-সাপেক্ষ, একটি অপরটির বিহনে প্রায়শঃ অসহায় তার অনন্য পরিচয় আছে 'সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি'র বহু কবিতায়, 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে, 'গল্প গুচ্ছে'র বহু গল্পে, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', "প্রাচীন সাহিত্য" প্রভৃতি আলোচনা গ্রন্থে। প্রকৃত পক্ষে, সমালোচকের ভাষায়ঃ "একান্ত বিস্তৃত অর্থে কবিতা এমন একটি গুণ যাকে নানা রূপ প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।"৩ আসলে, "কবিতা ও গদ্য একটি সাহিত্যিক প্রকাশ কার্যের দুরকম পদ্ধতি মাত্র।" কবির মর্জি গদ্যেও ছন্দ সংক্রামিত করে, এবং সময় বিশেষ কাব্যের প্রধান উপকরণ আলেখ্য ও সঙ্গীত গদ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার মধ্যে কবিতার আমেজ এনে থাকে। যে ছন্দস্পন্দ কবিতার প্রাণ-বায়ু, গদ্যের মধ্যে তার স্পন্দন সুষমা

ও লাবণ্যের বাণী বহন করে' আনে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে, ডায়রী-ধর্মী রচনায় (পথের সঞ্চয়), প্রবন্ধে, বিশেষত ব্যক্তিগত প্রবন্ধে কাব্য লক্ষণা ক্রান্ত গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ নয়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' এই প্রসঙ্গে একটি আকর-গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যে এই "মহাকবির হাতের প্রবন্ধ ব্যক্ত হয়েছে এমন গদ্যে যা গদ্য লেখকের অসাধ্য।" ৪ গদ্যের বক্তব্য-প্রাধান্য ও যুক্তি-নির্ভরতার সঙ্গে এখানে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে কাব্যের গীতি ধর্ম ও চিত্রলতা। তাঁর গদ্য প্রায়শই দীক্ষিত হয়েছে কাব্য ধর্মে। একটি উদাহরণ এই বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হবে। 'লিপিকা'র 'মেঘদূত' কবিতাটির(?) সঙ্গে বিচিত্র প্রবন্ধের নববর্ষা' প্রবন্ধের ভাব গত কোন মৌল প্রভেদ নেই। 'নববর্ষ'র নিবিড়, মন্থর, ভাব-গুণিত গদ্যরীতিও লেখকের অজান্তে এখানে কবিতার দায়িত্ব পালন করেছে। কেকা ধ্বনি', 'বসন্ত যাপন' "শরৎ" ইত্যাদি রচনার কিছু কিছু অংশও অনায়াসে গদ্য-কবিতার ছাঁচে সাজানো যেতে পারে। 'ছিন্নপত্র,' পথে ও পথের প্রান্তে ইত্যাদি পত্রগুচ্ছেও মাঝে মাঝে গদ্যকে কবিতার সমীপবর্ত্তী করে' তোলা হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র ভাষা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মতে হয়ত স্থানে স্থনে 'পৈট্রির মত শুনতে হবে'। ৫ "প্রাচীন সাহিত্য" ও 'আধুনিক সাহিত্যে'র প্রবন্ধগুলিও প্রাবন্ধিক সুলভ যুক্তি-নিষ্ঠার ছদ্মবেশে কবির আন্তরিক গীতি-স্বভাবকেই প্রতিফলিত করেছে। প্রসঙ্গত, মানসীর 'মেঘদূত' কবিতাটি ও 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি তুলনীয় এবং স্মরণ্য। আবার ছোট গল্প ও গীতিকবিতা যে একই উৎসের দুই প্রবাহ, একটি অভিপ্রায়ের দ্বৈত অভিব্যক্তি তা' রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-চর্চার প্রথম পর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর 'ঘাটের কথা' ইত্যাদি আদি-গল্পগুলির মধ্যে ছোট গল্পের আঙ্গিকে লিরিক ব্যঞ্জনা পরিবেশনের চেষ্টা করা যায়। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা ক্রমশঃ একটি নিটোল পূর্ণতা লাভ করেছে 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ' ইত্যাদি গল্পের মধ্যে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গদ্যের পরিসরে কবিতার সঞ্চার-সম্ভাবনার কথা তিনি বহুদিন আগেই অনুভব করেছিলেন। আসলে, তাঁর প্রতিভার ধর্ম অনুযায়ী এই উভয় রীতির সংমিশ্রণ ছিল স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁর স্বীকারোক্তিতে—'মাই রিলিজন্ ইজ্ এসেন্শিয়ালি এ পোয়েটস্' রিলিজন্'।

(দি রিলিজন্ অব্ এন্ আর্টিষ্ট)।

এলিয়ট একবার বলেছিলেন সার্থক কবিতায় মধ্যে ভালো গদ্যের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। তিনি আবার অন্যত্র প্রায় এই বক্তব্যের সূত্র ধরেই বলেছেন যে 'দি পোয়েম কামস্ বিফোর দি ফরম্, ইন্ দি সেন্স দ্যাট্ এ ফরম গ্রোজ — আউট অব দি এ্যাটেমষ্ট অব সাম বডি টু সে সামথিং।'৬ সুতরাং ফরমস্ হ্যাভ টু বি ব্রোকেন এ্যান্ড রিমেড্।'৬ শুধু তাই নয়, তাঁর মতে 'কথোপকথনে'র ভাষাও সহজ কবিতার অঙ্গ হতে পারে। অতএব গদ্য এবং কাব্যের মধ্যে সপত্নী সম্বন্ধ কল্পনা করে যাঁরা এই রীতিকে দুই কোটি তে নির্বাসিত করতে চান তাঁদের কোন মতে সমর্থন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, কবিতা একটি রীতি বা আঙ্গিক মাত্র নয়—এটি একটি আবেগ-নির্ভর মানস-প্রবণতা। রিচার্ডস-এর সংজ্ঞায়— সুপ্রীম ফর্ম অব ইমোটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ' ৭ তাই যেকোন মাধ্যমের সাহায্যে এই প্রবণতাকে রূপায়িত করা চলে। আমাদের জীবনে কাব্য-উপাদানের অপ্রতুলতা নেই। এবং সেই উপাদানকে অক্রান্ত বিস্ময় ও অসীম রহস্যে যিনি অনুভব করেন তিনিই কবি। মালর্সে তাই কবিতাকে আমাদের অস্তিত্বের রহস্যময় অংশের সঙ্গেই এককরে দেখেছেন। অর্থাৎ যিনি উপলব্ধির সংগে নিজেকে প্রকাশ করতে চান, কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তাঁর পক্ষে কবিতার সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কবিতার এই সর্বব্যাপিনী সম্ভবনার কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই কবিতার অধিকার প্রশস্ত করতে তাঁর প্রচেষ্টার

অন্ত ছিল না। সাহিত্যের তাবৎ শাখাতেই একটি নির্দ্দিষ্ট, সঙ্কীর্ণ অভিধার ব্যূহ ভেদ করে এই ধরণীকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা স্পষ্ট মূর্ত্তি লাভ করেছে 'বলাকায়'। এই কাব্যের মুক্তক ছন্দ (যাকে 'ভার্স লিবের' বলা যায়) এই শৃঙ্খল মোচনের প্রাথমিক পরিচয় বহন করেছে। কবিতার দেহে গদ্যের স্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চারের প্রচেষ্টা হিসাবে এটিকে মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ-প্রবর্তনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। 'বলাকা'র মধ্যে যা প্রচেষ্টা, 'লিপিকা'য় তা'ই হয়ে উঠেছে পরীক্ষা। বহু পূর্ব্বে উপ্ত গদ্য-কবিতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে এই গ্রন্থে। চিত্রী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি ও ভাবুক রবীন্দ্র-নাথের যে একটি গভীর মিল ছিল 'লিপিকা'র গদ্য-রীতি তার পরিচয় বহন করছে। একটি উদাহরণে লিপিকা'র গদ্য ভঙ্গী যে কবিতায় কত নিকটবর্ত্তী তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। চিত্র ও তক্ষণ কলার "ইমপ্রেসানিস্টিক"—রীতি, অনাড়ম্বরতা, সংকেত ও ইঙ্গিত-নির্ভর ভাষা 'লিপিকার' উপজীব্য।

লিপিকার 'পায়ে চলার পথ' রচনাটি আরম্ভ হয়েছে এই ভাবেঃ 'এই তো পায়ে চলার পথ। এসেছে বনের মধ্য দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া ঘাটের পাশে গাছের তলায়' এবং 'তারপর তিসির ক্ষেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে কোন গাঁয়ে গিয়ে পৌছেচে জানিনে।' ৮ ঠিক এই রচনার পাশে যখন 'পুনশ্চে'র গদ্যচ্ছন্দে লেখা' 'খোয়াই" কবিতাটি রাখিঃ

'এই পথে ধেয়ে এসেছে কাল বৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড় সওয়ার বর্গী সৈন্যের মত—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়ে ঝাউ-এর মাথা,
'হায় হায়' রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।

তখন বলা বাহুল্য উপরে উদ্ধৃত অংশদয় অর্থানুগ যতি ও চরণ বিভাগের পার্থক্য ব্যতিরেকে প্রায় সমধর্মী বলে মনে হয়।

লিপিকার এই গদ্য কবিতা গুলি (রচনাকাল ১৩২৪—২৯) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ভীরুতাবশতঃই এগুলিকে 'পদ্যের মত খণ্ডিত' করে ছন্দে সাজানো হয়নি। অর্থাৎ এদের কাব্য-লক্ষণ সম্পর্কে তিনি যে অবহিত ছিলেন না তা' নয়, তথাপি সমকালীন সমালোচনার উদ্যত যষ্টির জন্যে তিনি সরাসরি এগুলিকে কবিতার আসরে বসিয়ে দিতে সাহস পান নি। কিন্তু পরবর্ত্তী 'পরিশেষ' থেকে "শ্যামলী' পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩৩৭ সাল থেকে ১৩৪৩ সালের) কাব্য গ্রন্থগুলির কবিতা সমূহ পর্যালোচনা করলে গদ্য কবিতার বিবর্তন-ক্রমটিই শুধু স্পষ্ট হবে না 'লিপিকা'র রচনা গুলি যে কবিতার কত কাছাকাছি তা'ও প্রতিভাত হবে। লিপিকার রচনা শৈলী গদ্যাত্মক হলেও এর ভাব-বস্তু যে পদ্যাত্মক তার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অনুভূতিপ্রবণ, সমবেদনা-নিষ্ঠ (কখনো ব্যঙ্গ প্রবণ) কবি মানসের নিবিড় স্পর্শ 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে কবিতার দীক্ষা দিয়েছে।

'লিপিকা'র রচনাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চের ভূমিকায় যা বলেছেন প্রসঙ্গত তা'ও অনুধাবনীয়ঃ 'গীতাঞ্জলির গান গুলি ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেছিলুম। এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে, সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝং-

কার না রেখে ইংরেজীর মত বাংলায় গদ্য কবিতার রস দেওয়া যায় কী না। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি—লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।

এছাড়া আরো নানা প্রবন্ধে এবং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কবিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন। 'পুনশ্চে'র 'নাটক' নামক কবিতায় গদ্য ও পদ্যের নানা সম্ভাবনা ও বিবর্ত্তনের আলোচনা আছে। 'ছন্দ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি অন্য এক জায়গায় বলেছেনঃ 'ছন্দটাই ঐকান্তিক ভাবে কাব্য নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয়।··আজ গদ্য কাব্যের উপর প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।' শুধু তাই নয়, কবির সিদ্ধান্ত ঃ 'যা আমাকে' রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য-রূপেই আসুক, তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।'

কিন্তু গদ্য-কবিতা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনার পূর্বে আমরা প্রথমে যদি একটি সংক্ষিপ্ত ও অবিকল সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি তবেই মনে হয় আমাদের দায়িত্ব পালিত হতে পারে। জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে গদ্য-কবিতা হচ্ছে— a type of poetry in which the line is based on the natural cadence of the voice, following the phrasing of the language, rather than a repeating metrical pattern. The *rhythm* of a free verse line is marked by the grammatical and rhetorical pattern of normal speech.১ এই বিবৃতিতে গদ্যকবিতার বহিরঙ্গ রূপের নির্দিষ্ট অর্থে অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 'রীদম্'ই হচ্ছে গদ্য-কবিতার প্রাণ। তথা ভিত্তি। 'রীদম' শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ স্বরূপ আমরা 'ভাবচ্ছন্দ কথাটি গ্রহণ করতে পারি। এ যাবৎ কাল "রূপছন্দ" বা মীটারের দ্বারাই ভাবছন্দ নিয়ন্ত্রিত হত। অথচ, প্রকাশ ব্যাকুল ভাবাবেগ যখন কবির হৃদয় থেকে স্বতোৎসারিত হয় তখন তার দেহে আপনা থেকেই ছন্দ সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তখন বরং নির্দিষ্ট ছাঁচে (যতি, পর্ব ও অন্ত্যানুপ্রাসে গ্রথিত করে) তাকে প্রকাশ করতে গেলে এই স্বতস্ফূর্তি ব্যাহত হবারই সম্ভাবনা। অথচ বিশেষ ছাঁচ থেকে মুক্তি পেলে গদ্যচ্ছন্দ সহজেই মনোভাবের বিশ্বস্ত ও স্বাধীন বাহক হয়ে উঠতে পারে। তখন যতি পাত ও চরণ বিন্যাসও হয় কবির অন্তরের ভাব-রস অনুযায়ী। পক্ষান্তরে, কঠিন ছন্দ-বিধি কবির স্বাধীন কল্পনা বেগকে অনেক ক্ষেত্রে শুধু প্রশমিতই করে না বিক্ষপ্তও করে থাকে। মনে হয় বিহারীলালের কবিতা এর পরিচয় বহন করছে।

এই গদ্যচ্ছন্দের আগমনী-সংগীত হিসাবে 'লিপিকার' রচনাগুলির একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। গদ্যকে পদ্যের সন্নিহিত করে 'গদ্যচ্ছন্দের' থেকে ঈষৎ ভিন্ন একটি নতুন রীতি আবিষ্কার করার চেষ্টা এই পর্ব্বে লক্ষিত হয়ে থাকে। এই রীতি বাঙলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব।

অবশ্য গদ্য এবং কবিতার মধ্যে যে কোন দুরতি ক্রম্য ব্যবধান নেই একথা রবীন্দ্রনাথের গদ্যচ্ছন্দ পরিকল্পনার বহু পূর্বেই একজন বাঙালী লেখকের রচনায় আলোচিত হয়েছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় একটি রচনায় রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যাত্মক ও পদ্যপৌঙক্তিক গদ্য লেখার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'বর্ষার মেঘ' নামে স্বরচিত একটি গদ্যাত্মক কবিতাও সেখানে উদাহৃত হয়েছে। প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে এই রচনাটি আমাদের স্মরণ্য। এছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের অনেকেই ইতিপূর্ব্বে গদ্যচ্ছন্দ ব্যবহার করেগেছেন।—সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে। মিলটন, ভার্জিল, গ্যয়তে প্রমুখ আদি গুরুদের কথা বাদ দিলে ওয়াল্ট হুইটম্যান নামীয় উনিশ শতকী মার্কিন কবিই গদ্যচ্ছন্দের প্রথম প্রবক্তা। 'প্রোজ ভার্স' রচনার ইনিই পথি-

কৃৎ। এছাড়া চৈনিক কবি লি পো কয়েক শতাব্দী পূর্বে কবিতাকে গদ্যের ভাষায় লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উভয়ের রচনার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। তাই প্রেরণার কথা স্বতই মনে আসতে পারে। অবশ্য হুইটম্যানের কবি স্বভাব রবীন্দ্রনাথের কবি ধর্মের এতই বিপরীত ও বিরুদ্ধ যে কোন স্পষ্ট প্রেরণার অনুমান অবিবেচকের মত হবে।

হুইটম্যানের কবিতায় গদ্যচ্ছন্দের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটলেও তার বহু পূর্ব থেকেই ছন্দ স্পন্দময় গদ্যরচনা ইংরেজীতে প্রচলিত ছিল। বাইবেলের 'নিউ টেস্টমেন্ট', হিব্রু সঙ্গীতে (সঙ্‌ অব সলোমন) ও প্যারাবেল-জাতীয় উপাখ্যানে যে সচ্ছন্দ, সহজ, সুষম গদ্য ব্যবহৃত তা' বহুলাংশে কবিতার সম্ভাবনায় আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথ বাইবেলের এই কাব্য ধর্মী ভাষায় মোহিত এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার প্রমাণ গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ। বাইবেলের গদ্য-রীতির আদর্শে গীতাঞ্জলির গদ্য পরিকল্পিত হয়েছে। ইয়েটস, পাউন্ড এবং আঁদ্রে জীদ এই দীপ্ত স্নিগ্ধ গদ্যেই যে মূল-কবিতায় আস্বাদ পেয়েছিলেন তার প্রমাণও আছে তাঁদের প্রশস্তিবাক্যে।।

'লিপিকার' গল্প-কল্প ও রূপক-নির্ভর রচনা গুলির সঙ্গে অস্কার ওয়াইল্ডের আশ্চর্য সুন্দর রূপকথা ও ছোট গল্প গুলির সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। প্রথম বিলাত প্রবাস কালে এগুলির এবং কার্লাইলের গীতি ধর্মী প্রবন্ধ ও পত্রের সঙ্গে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, জনৈক সমালোচক টুর্গেনিভের "ড্রিম টেলস্‌ এ্যান্ড প্রোজ পোয়েমস্‌"—এর সঙ্গে লিপিকার পরিকল্পনাতীত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। ১০ ফ্রাউড্‌ রচিত রূপক কাহিনী সমূহের প্রেরণাও যে লিপিকার নেপথ্যে কাজ করেনি এ কথা বলা যায় না। ফ্রাউডের এর 'অক্স এ্যান্ড দি লায়ন' গল্পের সঙ্গে লিপিকার 'তোতাকাহিনী" ইত্যাদি বাস্তবানুগ, ব্যঙ্গাত্মক রূপকথার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। টাইমস্‌ লিটারেরী সাপ্লিমেন্টের' সমালোচক 'লিপিকার' ইংরেজীঅনুবাদ প্রসঙ্গে লুসিয়ানের কথোপকথনের প্রভাবঅনুমান করেছেন।

অবশ্য পূর্ব্বেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অত্যদ্ভূত স্বী-করণ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অন্যের ভাব—সম্পত্তি তাই যখনই গ্রহণ করেছেন তখনই তাকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন করে নিয়েছেন।

বরং বিভিন্ন আন্তপ্রেরণা গদ্য কবিতার পূর্বসূরী এই অভিনব রচনা-গ্রন্থটির জন্ম দিয়েছে। ছন্দ সম্পর্কে নানা বিচিন্তা এবং ছোট গল্প, রম্য প্রবন্ধ ও কবিতার সমন্বয় চেষ্টা 'লিপিকার' আগমন-পথ প্রস্তুত করেছে। তারপর এসেছে সেই দেবদূত কল্পনার পাখায় ভর করে—তখন কাব্যের স্বর্গ এবং গদ্যের মর্ত একাকার হয়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে এক মায়াবী জগতের। এই জগৎই হচ্ছে 'লিপিকার' অন্বিষ্ট॥

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

---

১. কবিতার কথা। জীবনানন্দ দাশ

২. জ্যোতিরিন্দ্রের পত্নী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিকমৃত্যু (২০মে ১৮৮৪) শোকোচ্ছ্বাসে রবীন্দ্রনাথ 'পুষ্পাঞ্জলি' (অধুনা অচলিত) নামে যে রচনাসংকলন প্রকাশ করেন লিপিকার সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। ৩ সাহিত্য-শিল্প (গদ্য ও পদ্য)। মনোমোহন ঘোষ

৪ প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র ভূমিকা। অতুল গুপ্ত ৫ ছিন্নপত্র। ইন্দিরা দেবীকে লেখা।

৬. Selected Prose (Music of Poetry). T. S. Eliot.

৭. Principles of literary Criticism (Page 273) I. A. Richards.

৮. প্রবন্ধকার কর্তৃক কাল চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

৯. The Reader's Companion to World literature: Ed. C. S. Brown.

১০. Western Influence in Bengali literature: P. R. Sen.

বি দে শী সা হি ত্য

সাহিত্য সংবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় এমন কয়েকজন নবীন লেখকের আবির্ভাব ঘটে যার ফলে আমেরিকার সাহিত্যজগতে প্রভূত আলোড়ন উপস্থিত হয়। এই লেখকগোষ্ঠী, প্রচলিত সাহিত্যরীতি পরিত্যাগ করে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন। উদ্দেশ্য, আমেরিকার তৎকালীন সাহিত্যে ফরাসী এবং ইংরাজি সাহিত্যের বিন্যাসরীতির যে অভাবনীয় প্রভাব ছিল তা বর্জ্জন করে আধুনিক প্রকাশভঙ্গির এক বিশেষ রীতি প্রবর্ত্তন।।

সাহিত্যে আমেরিকানিসম্ প্রবর্ত্তনের পুরোভাগে যে সকল লেখকগণ লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বিস্মৃতির অতলগর্ভে হারিয়ে গেছেন কিন্তু কয়েকজন শক্তিধর লেখক প্রগতিশীল সৃজনধর্ম্মী রচনার স্রষ্টা হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করতে যে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

গৃহযুদ্ধের তীব্র হলাহল পানের পর মুমূর্ষু আমেরিকানগণ যখন হতাশাময় জীবন-যাপনের আবর্ত্তে আবদ্ধ তখন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা কাব্য এবং কথাসাহিত্যের সহায়তায় যে সকল লেখক জনসাধারণের জড়চেতনার কুয়াশা অপসারণে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরাই আধুনিক আমেরিকান সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনকারী সাহিত্যসেবী হিসাবে স্বীকৃত। তাঁদের সৃষ্টি আজ আমেরিকার ভৌগলিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপন গরিমায় বিরাজমান। এই নূতন প্রকাশভঙ্গির প্রভাব আজো ফক্‌নার, হেমিংওয়ে, ও'হারা অথবা ওয়েলটির রচনায় নিয়তই পরিলক্ষিত হয়।

স্যামুয়েল লংহর্ণ ক্লিমেন্স সেই উজ্জ্বল পরিবৃত্তিকালের অন্যতম স্রষ্টা যাঁর সৃষ্টি চিরায়ত সাহিত্য হিসাবে বিশ্বের পাঠকসমাজে সমাদৃত। সেই বিখ্যাত উক্তি—'নামে কি আসে যায়' যে অর্থ পরিবহন করে তা কিন্তু স্যাম ক্লিমেন্সের নিরর্থক বলে মনে হয় কারণ নামটি পাঠক সমাজের কাছে প্রায় অপরিচিত অথচ মার্ক টোয়েন ছদ্মনামটি শ্রবণমাত্র কি যেন অমৃতের স্বাদ বয়ে আনে এবং চকিতে টম সয়আর ও হাকলবেরী ফিনের দুঃসাহসিকতার চমকপ্রদ বর্ণনাভঙ্গি স্মরণে আসে।

মার্ক টোয়েন, আমেরিকা তথা বিশ্ব-পাঠক সমাজের কাছে অত্যন্ত আদরণীয় সাহিত্য-সেবী হিসাবে অদ্যাবধি পরিগণিত। সাহিত্যসেবার পূর্বে তাঁর জীবন বৈচিত্র্যময় জীবিকার বেড়াজলে আবদ্ধ ছিল, কখন তাঁকে দেখা যেত ছাপাখানায় অক্ষর সাজানোর কাজে নিরত আবার কিছুদিন পরেই হয়ত সেই কাজে ইস্তফা দিয়ে মোটর-লঞ্চের সারং হয়ে মিসিসিপি নদীতে যাত্রী পারাপারের কাজে ব্যস্ত অথবা কোন এক সময়ে কয়লা খনিতে শ্রমিকের দলে অবাধে মিশে গেছেন। এই চঞ্চল জীবন কিন্তু তাঁর সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে কোনদিনই কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি পরন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে সর্বস্তরে মানবজীবনের উত্তাপ অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই যখন তাঁর প্রথম রচনা—"দি সেলিব্রেটেড জাম্পিং ফ্রগ অব কালাভেরাস কাউন্টি" প্রকাশিত হয় আমেরিকার পাঠক সমাজ তা সমাদরে গ্রহণ

করেছিল এবং একটিমাত্র রচনায় যে সুনাম তিনি অর্জ্জন করেছিলেন সে যুগে এইরূপ সৌভাগ্য মুষ্টিমেয় সাহিত্য সেবীই লাভ করেছেন।

পরবর্ত্তীকালে মার্ক টোয়েনের সাহিত্য জীবন কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অতিবাহিত হতনা। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা "দি এ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরী ফিন" রচিত হয় দীর্ঘ আট বৎসরের ব্যবধানে। ১৮৭৬ সালে তিনি উইলিয়ম ডিন হাওয়েলসকে এক পত্রে জ্ঞাত করান যে কিশোরদের জন্য অপর একটি গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন কিন্তু চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮০ সনে দেখা গেল হাকলীবেরী ফিন অর্দ্ধসমাপ্ত। ১৮৮৩ সালের অপর এক পত্রে হাওয়েলসকে জানাচ্ছেন যে তিনি কাহিনীটিকে শেষ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এবং দৈনিক প্রায় চার হাজার শব্দ ব্যয় করে হাক্ ফিনের দুর্জ্জয় কীর্ত্তির বর্ণনা বিস্তারে ব্যস্ত আছেন। অবশেষে ১৮৮৪ সালে "দি এ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরী ফিন" ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রকাশিত হয় এবং প্রথম সপ্তাহে পঞ্চাশহাজার কপি নিঃশেষিত হয়। সে যুগে প্রথম সপ্তাহে কোনও পুস্তকের পঞ্চাশহাজার কপি বিক্রীত হওয়া এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল।

সুবক্তা হিসাবে মার্ক টোয়েনের খ্যাতি অপরিসীম ছিল, এককালে ভারতবর্ষেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমেরিকায় তিনি যখন বক্তৃতা ভ্রমণে নির্গত হতেন তখন প্রায়শঃই তাঁর সহযাত্রী হতেন অপর এক আমেরিকান সাহিত্যিক ও বাগ্মী জর্জ ওয়াশিংটন কেবেল। যদিও তাঁদের বন্ধুত্ব নিবিড় ছিল কিন্তু ব্যক্তিত্বে তাঁরা ছিলেন বিপরীতধর্মী। মার্ক টোয়েন ছিলেন পরিহাস প্রিয় উদ্দামপ্রকৃতির মানুষ পক্ষান্তরে কেবেল সংযত, ঈশ্বরপরায়ণ এবং শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। মার্ক টোয়েনের নির্ম্মম উপহাসের বস্তু ছিল কেবেলের ঈশ্বরপরায়ণতার গোঁড়ামি। মার্কের পরিহাস বন্ধুর বুকে শক্তিশেলের মত বাজত কিন্তু কেবেলের একমাত্র চিন্তা ছিল মার্ককে চার্চ্চের আওতায় এনে তাঁকে ঈশ্বরভক্ত করে তোলা এবং কেবেল কিঞ্চিৎ সফলও হয়েছিলেন। কেবেলের পীড়াপীড়িতে মার্ক মাঝে মাঝে চার্চ্চে গিয়ে পাদরীর বক্তৃতায় মনোনিবেশ করতেন কিন্তু তাও ক্ষণকালের জন্য। কেবেল তাঁর এক পত্রে লিখেছেন—'অবশেষে তাঁকে আমি চার্চ্চে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি বস্তুতঃ কেবেলের পক্ষে এ ঘটনা প্রায় ওয়াটারলু বিজয়ের মত। মার্ক এবং কেবেলের চরিত্রের মধ্যে দস্তুর ব্যবধান তো ছিলই এবং প্রায়ই তাঁদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার দরুণ তাঁরা বিবাদ করতেন কিন্তু তাঁরা দুজনেই দুজনের প্রতি বন্ধুবৎসল এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন অথচ সে যুগের আমেরিকান সংবাদপত্রের প্রিয় শিরোনামা ছিল— টোয়েন ও কেবেল বিবাদ করে দুজনেই দুজনের মুখদর্শন করছেন না। কিন্তু কেবেল সম্বন্ধে মার্ক তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন "....ব্রেভ্ সোল এ্যান্ড এ গ্রেটম্যান"। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তির মধ্যে কোনও পরিহাস ছিল না।

তৎকালীন আমেরিকান সংবাদপত্রের এই ধরণের রটনা যে নিছক কল্পনাপ্রসূত গল্পকথা তা প্রমাণিত করবার জন্য অধ্যাপক আরলিন টার্নার সম্প্রতি মার্ক টোয়েন এবং কেবেলের কতকগুলি পত্র সঙ্কলিত করে সম্পাদনা করেছেন "মার্ক টোয়েন এণ্ড জর্জ ওয়াশিংটন কেবেলঃ দি রেকর্ড অব লিটারারি ফ্রেণ্ডসিপ" নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি সুসম্পাদিত। প্রতিটি পত্রের শেষে অধ্যাপক টার্ণার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে সর্ট-নোটস দিয়ে পাদপূরণ করেছেন, ফলে গ্রন্থটি আমেরিকান সাহিত্যের নবপর্য্যায়ের দুই অন্যতম হোতার জীবন-পরিচ্ছেদের শ্রেষ্ঠকালের (১৮৮১-১৮৮৫) কথা বিধৃত হয়েছে যা ইতিহাসবোধক এবং সার্থক পত্রসাহিত্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন হিসাবে পাঠকসমাজের কাছে ভিন্নতর রসাস্বাদনের অন্যতম আকরগ্রন্থরূপে আদৃত হবে বলে আশা করা যায়। এজন্য অধ্যাপক

টার্ণার ধন্যবাদার্হ।

Mark Twain and George W. Cable : The Record of literary Friendship. By Arlin Turner. East Lansing, Michigan.

Michigan State University Press. 1960.144Pp.

নূতন গ্রন্থ

সাইবেরিয়া

স্বনামধন্য ইদ্দিশ কবি এব্রাহাম সুৎস্‌কিফার লিথুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইদ্দিশ কাব্য-সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য্য। কবি বাল্যকালে একবার পিতার অনুগামী হয়ে চিরতুষাররাজ্য সাইবেরিয়ার ওমস্ক নগরীতে কিছুদিন ছিলেন। সাইবেরিয়ার ভয়াল-সুন্দর রূপ তাঁকে প্রচণ্ডরূপে আকৃষ্ট করে। তাই পরিণত বয়সে কবি বাল্যস্মৃতি মন্থন করে সেই রূপের প্রতিবিম্ব তাঁর সাইবেরিয়া কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত করেছেন। কাব্যটি প্রায় বিশবৎসর পূর্বে রচিত হলেও কাব্য-রসপিপাসু গুণীজনের নিকট আধুনিকতায় এবং স্বকীয় বৈশিষ্টের এক অন্যতম নিদর্শন বলে প্রতিভাত হবার সম্ভাবনা আছে। সাইবেরিয়া কাব্য সম্প্রতি ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং এই সংস্করণটি শিল্পী মার্ক শাগালের ব্যঞ্জনাময় শিল্পকর্মে সুচিত্রিত হওয়ায় এর আবেদন বহুলাংশে বর্দ্ধিত হয়েছে বলে প্রকাশ। কবি এখন ইস্রায়েলে বসবাস করেন।

The sun wears a fur of fire
Frost, the artist, with its glittering pen
paints legendary tales full of colour
upon my skull, as if it were a window pane- -

ওয়াটারস অব দি নিউ ওয়ার্ল্ড।

ওয়াটারস অব দি নিউ ওয়ার্ল্ড। দুঃসাহসিক অভিযানে জীবন তুচ্ছ করে যে সব গুণীজন সাগরপারের দেশ ভ্রমণের নেশায় সামান্য কাঠের ভেলা সম্বল করে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাচ ঔপন্যাসিক জান দ্য আরতোগ অন্যতম। তিনি উত্তাল অতলান্তিকের সর্বনাশা ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমেরিকায় পৌঁছেই ক্ষান্ত হননি সেই কাঠের ভেলার সাহায্যে নদীপথে টেক্সাস হতে নান্টুকেট অবধি জল জলভ্রমণ করেন। এই বিচিত্র অভিযানের ইতিবৃত্ত তার ওয়াটারস অব দি নিউ ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে পাওয়া যাবে। সমালোচক-গণের মতে আরতোগের এই রচনা আদিম উপায়ে সমুদ্রযাত্রার অপূর্ব্ব বর্ণনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নদীপথে আমেরিকার অভ্যন্তর পরিদর্শনের যে নিপুণ বর্ণনা আরতোগ দিয়েছেন তা অন্য কোনও ইউরোপীয় লেখক আমেরিকা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তার সামান্যতম অংশও গ্রথিত করতে সক্ষম হননি। সম্ভবতঃ—আরতোগের কবিমন আমেরিকার বিজ্ঞাপন-কলঙ্কিত শিল্প সহরের বিলাসবহুল অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি পরন্তু আমেরিকার প্রকৃতির অকৃপণ দানের ভাস্বর বর্ণসুষমা বোধকরি তাঁকে চমৎকৃত করেছিল এবং সেই দুর্লভ রসস্বাদনের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা এই সুখপাঠ্য গ্রন্থের অন্যতম অলঙ্কার।

দি কমপ্লেসান্ট লাভার। গ্রাহাম গ্রীণ আধুনিক ইংরাজ লেখকদের মধ্যে এ্যাংগ্রি, ম্যান হিসাবে পাঠকসমাজে পরিচিত। সমালোচক জন সুইনির মতে গ্রাহাম গ্রীণ বর্তমান ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম কথা সাহিত্যিক। গ্রীণের গল্পে সাধারণতঃ যে সিরিয়াস্ মুডের পরিচয় পাওয়া যায় "দি কমপ্লেসান্ট লাভার" নাটকে তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এই নূতন নাটকটির গল্পাংশ এক রসোজ্জ্বল ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী যা ইংলণ্ডের দর্শকসমাজ সাদরে গ্রহণ করেছে। লণ্ডনে নাটকটি গেল মরসুমে বেশ সাড়া তুলেছিল এবং আশা করা যায় নিউইয়র্কের শীতকালীন নাট্যোৎসবেও সমভাবে অভিনন্দিত হবে।

রামানুজ রায়

শিল্প সমালোচকের দায়িত্ব ও সংবাদপত্র

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্র একটি আবশ্যক অঙ্গ। সংবাদপত্র মাধ্যমে জনসাধারন জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষণ সম্পর্কিত আলোচনা এবং সমালোচনার সহিত পরিচিত হয়। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র সেই অবশ্য কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পরাম্মুখ। মানুষের জীবনে চিত্রের স্থান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেই প্রয়োজনকে স্বীকার করার ব্যাপারে বাংলা সংবাদপত্র এখনও অভ্যস্থ হয়ে ওঠেনি। মরশুমী প্রদর্শনীর ওপর সংবাদপত্রগুলির আলোকপাত (?) পর্য্যাপ্ত নয়। কারণ প্রদর্শনীগুলির সমালোচনার ব্যাপারে বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাদিক পত্র পত্রিকাগুলি এমন ধরণের অর্বাচীন সমালোচনার অবতারণা করে যে তাতে করে আধুনিক চিত্র সম্পর্কে মানুষের একটা নৈরাশ্যব্যঞ্জক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। অনেক সমালোচক বিজ্ঞতার ভাণ করে উপদেশামৃতবলী বিতরণ করেন, সেখানে নিজের অজ্ঞানতাকে এমনভাবে প্রকাশ করে ফেলেন যে পাঠক চিত্র বিমুখ হতে বাধ্য হয়। যে কোন স্তরের যে কোন দৃষ্টিকোণ সম্ভূত চিত্রসৃষ্টি সমালোচনার মূলে সমালোচকের সহৃদয়তা এবং চিত্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যেমন প্রকাশ পায় তেমনি রসিক সমালোচকও চিত্রবিচারে আপন বিদগ্ধ মানসিকতা প্রকাশ করেন। শিল্পী ও রসিকমন উভয়ের সংমিশ্রণে শিল্পের বিভিন্ন পর্য্যায় সম্ভবপর হয়। কোন বাংলা বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের সমালোচক তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশকে মূলধন করে আধুনিক শিল্প আন্দোলন সম্পর্কে অর্বাচীন উক্তি করে চলেছেন। যে নবীন শিল্পীদের তিনি কিছু মাস আগেও আবেগ চঞ্চল বক্তব্যে সাধারণ্যে প্রকাশ করেছেন তাঁদেরই পূর্বতন স্বীকৃতিকে আবার নিজের অক্ষমতাজনিত আক্রোশবশবর্ত্তী হয়ে নাকচ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই ধরনের অসুস্থ পরিবেশে কোন সুস্থ সমালোচনা হতে পারে না। এই সমস্ত ব্যাপারে সম্পাদকদেরও যে কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে হয়না। যদি থাকত তা হলে ভদ্র সমালোচনা অবশ্যই সাধারণ্যে মর্য্যাদা পেত। বাধ্য হয়েই এইকথা স্বীকার করতে হবে যে বাংলাদেশের সম্পাদকমণ্ডলীর শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্বাচীন। সাহিত্যালোচনা, সিনেমা, নব নাটক আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ ইত্যাদি এমনকি বাজারদরের অবতারণা দৈনিক সংবাদপত্রের অবশ্য অঙ্গ। কিন্তু যে শিল্প মানুষের রুচি বিচারকে পরিমার্জিত করতে ও সংবেদনশীল করতে অধিক সক্ষম তার প্রতি অবজ্ঞা সম্পাদকমণ্ডলীর বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

একথা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে বর্ত্তমানে বাংলাসংবাদপত্রে সমালোচকদের চিত্র বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। সমালোচনা বিষয়ে গলদ থাকলে অগণিত পাঠক, যাঁদের রুচি গঠনে সংবাদপত্রের অবদান প্রভূত, সেখানে সেই পাঠকদের বিভ্রান্ত করা হয়। দেশে এখনও অনেক বিদগ্ধ সমালোচক এবং চিত্রামোদী ব্যক্তি বেঁচে আছেন। প্রতি সপ্তাহে চিত্রবিষয়ে আলোচনার অবতারণা সংবাদপত্র মাধ্যমে হলে অনেকেই উপকৃত হবেন। বিদগ্ধ

চিত্র সমজদারদের দিয়ে সেই সাপ্তাহিক পাতাটিকে পরিচালিত করলে সেখানে সুফল পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। কোন বিভাগের প্রতি কটাক্ষ না করেই বলছি—যে প্রতি সপ্তাহে যেখানে সিনেমার পাতা একটি, সাপ্তাহিক সাহিত্যজগত, নাটক সম্পর্কে খবরাখবরের জন্যে প্রতি সপ্তাহে আর একটি করে পাতা রাখা হয় সেখানে আর একটি পাতা শিল্প সম্পর্কে থাকলে বোধ হয় পত্রিকার অঙ্গহানি হয় না। যেখানে উপযুক্তবিচারে দেখা যায় যে মানব সভ্যতার প্রথম স্ফুরণ ছবিতে, সেই ছবির বিভিন্ন উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়েছে—সেখানে সেই চিত্র বিষয়েই আমাদের অবহেলা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমাদের রুচি সম্মত জীবন যাপনের দিককে আলোকিত করতে হলে ছবির বিষয়ে সম্যক আলোচনা এবং বিদগ্ধমনের বিকাশ বিশেষ-ভাবেই প্রয়োজনীয়। সেই প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করছি—এতে করেই নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতির দিককে দেওয়ালে তুলে বন্ধ করে রাখছি। বিভিন্ন বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে—শিল্প বিষয়ে আলোচনা এত কম যে সেখানে সেই সাপ্তাহিক সমূহের পাঠকরা অবশ্যই শিল্প ইতিহাস থেকে দূরে আছেন। সমালোচনা প্রকাশিত হয়—এক সঙ্গে তিন চারজন শিল্পীর বিশেষ বিশেষ শিল্প আন্দোলনের বিভিন্ন পরিভাষা সমন্বিত সমালোচনা। সেখানে চিত্র বিষয়ে জ্ঞান অজ্ঞানতাকেই প্রকট করে তুলছে। ধারাবাহিক আলোচনা, বিশেষ বিশেষ শিল্পী যাঁরা সত্যই অন-বদ্য সৃষ্টির আধার তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা এবং শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়কে বিভিন্ন আলোচনা—পর্য্যালোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করলে সুস্থ শিল্পবোধ গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

স্যুরিয়ালিজিম মতবাদের পূর্বপুরুষ

ওডিলোঁ রেদোঁ, গুস্তাব মোরো এবং রোডলফ্ ব্রেসডেঁ প্রমুখ শিল্পীত্রয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে নিউইয়র্কের ম্যানহ্যাটন আর্টগ্যালারীতে। স্যুররিয়ালিজিম মতবাদের যদি কোন পূর্বপুরুষ থেকে থাকে তাহলে উল্লিখিত শিল্পীত্রয়ের ছবিই সেই দাবী উপস্থাপিত করতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন শক্তিশালী শিল্পীরা ইমপ্রেসিনিষ্ট ও রিয়ালিষ্ট পর্য্যায়ে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে প্রকাশ করে চলেছেন তখন অন্যত্র কিছুসংখ্যক শিল্পী আর এক বিস্ময়কর জগত আবিষ্কার করলেন। সেই জগত স্বপ্ন এবং কল্পনার অদ্ভুত সংমিশ্রণে এক চমৎকারিত্ব পরিবেশন করলো। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই স্বপ্ন এবং কল্পনার জগত সন্ধানকারী এই শিল্পীদের পূর্ব-পুরুষদের সাধারণে অনায়াসে ভুলে গেল। স্বপ্নস্মৃতি জনসাধারণ রেদোঁ, মোরো এবং ব্রেস-ডেঁকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হলো। রেদোঁকে মনে রাখলো তাঁর অদ্ভুত ফুলের বর্ণসুষমার জন্যে। কিন্তু মোরো স্মৃতির আবছায়ায় মিশে গেলেন। শুধুমাত্র ব্রেসডেঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো রেদোঁর গুরু হিসাবে। এই তিনজনের মধ্যে মোরোই সর্বাপেক্ষা অবজ্ঞাত। তিনি পরিচিত ছিলেন কিন্তু অবজ্ঞা কুড়িয়েছিলেন তার থেকেও বেশী। সম্প্রতি প্যারীর সংস্কৃতি মন্ত্রী আন্দ্রে ম্যালেরেক্স মোরোর চিত্রাবলী সাধারণের সামনে পরিবেশন করেন। সকলে তখন চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলো যে মোরো শুধুমাত্র ম্যাতিস্ কিংবা রুয়োর গুরু হিসাবেই নয় তাঁকে আধুনিক চিত্রচিন্তার জগতের পূর্বপরুষ হিসাবেও বন্দিত করা উচিত। মোরো পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকার আগে শুধুমাত্র বলিষ্ঠ রঙের অবতারণা করে বিষয়বস্তুকে স্কেচের আবরণে আনতেন। সেই রঙের মধ্য থেকেই চিত্রের ইমেজকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হতো। একটি অতীন্দ্রিয়জগতের ইঙ্গিত বিস্ময়কর স্বপ্নীল আবেষ্টনীর মধ্যে ফুটে ওঠে। মোরো ছবিতে কল্পনার স্বপ্নতরঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তবের সন্ধিক্ষণে মনকে ভাসিয়েছেন। ফুলের বর্ণসুষমায়

রে'দো অদ্ভুত। তাঁকে সেইভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হলো। কিন্তু মানুষের পরিচিত জগতের বাইরের আর এক বিস্ময়কর জগতের সন্ধান তিনি এনেছেন। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজের জন্মস্থান যে শহরে সেটি শহর দর্শনে গিয়ে নিজের চিত্র সৃষ্টির মূল সূত্রটিকে আবিষ্কার করেন।

তিনি নিজে লিপিবন্ধ করেছেন, "আমি নিজে এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি কেন আমি শিবানন্দময় অন্য এক জগতের সন্ধান ছবিতে করেছি। শহরটিকে বলা যেতে পারে একটি বিহার শহর। যার নিরানন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে একজন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। একটা একাকিত্বের ভার সবসময়ে সে অনুভব করে ভীত হয়ে উঠবে। স্বাভাবিকভাবে নিজের এই একাকিত্বের মধ্যে অবাস্তব কিছুকে কল্পনা করে নেওয়া হয়। কেননা এই—একাকিত্বের নির্বাসনের মধ্যে নিরবলম্বকে অনুভব করতে গেলেই ভীত সংকুচিত মন আমাকে বাস্তবযুগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। সেই নিরাবলম্ব অস্তিরতা আমাকে সুন্দর সবকিছুর থেকে বিবিক্ত করে তুলতো।" মোরো যেখানে অবাস্তব ফিংকস্ কিংবা রমণীসুলভ পুরুষ চিত্রে অবতারণা করেছেন, সেখানে রেদোঁ দেখেছেন নিরাবলম্ব একাকিত্বের মধ্যে বিরূপ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব। রেদোঁ তার লেখাতে আরও বলেছেন "অবাস্তবতার জন্ম আমাদের অজ্ঞাত অতল মনের গভীরতা থেকে। কল্পনায় সেই অদ্ভুত আবছায়ার ছবি মনের অতল থেকে উঠে আসে।"

ব্রেসডে' ছবিতে এনেছিলেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তুলির কাজ যন্ত্রে যা দেখা যায় না শিল্পীর কল্পনা সেখানে পৌঁচেছে। অদ্ভুদ সূক্ষ্মতায় দূরের কাছের প্রকৃতির অণুপরমাণু তিনি বাস্তবে জীবন্ত করেছেন। ব্রেসডে' মনের অতল থেকে কল্পনার পাখা বিস্তারকারী অবাস্তবতাকে বাস্তবের কাঠামো দিয়ে গড়ে তুলেছেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি হিসাবে। ভিক্টর হিউগো এবং বোদালিয়র তাঁর ছবির সমাজদার ছিলেন কিন্তু তবুও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো সারভেস্ শহরের এত শীতল ঘর থেকে। পরিচিতির উজ্জ্বলতার মধ্যে যেমন তাঁর জন্ম হয়নি—তেমনি অপরিচয়ের অবজ্ঞার মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান হলো। এই শিল্পীত্রয়ের প্রদর্শনী আধুনিক শিল্প-ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সংযোজিত করবে। স্যুরিয়ালি-জমের জন্মদাতা হিসাবে এ'দের অবদান অনস্বীকার্য।

আরচিপেনকো

আলেকজান্ডার আরচিপেনেকো আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন। বর্তমানে আরচিপেনকোর বয়স চুয়াত্তোর। ভাস্কর হিসাবে তিনি অতীতে গৌরব অর্জন করেছিলেন কিন্তু আজকের জগতে তিনি একটি বিস্মৃতিপ্রায় নাম মাত্র। কিন্তু আরচিপেনকোর অবদান আধুনিক ভাস্কর্য্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মান হ্যাটনের পার্ল গ্যালারীতে তাঁর সম্প্রতি একটি ভাস্কর্য্য প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। কিয়ভে আরচিপেনকোর জন্ম। তাঁর পিতার যান্ত্রিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদানের সঙ্গে আরচিপেনকোর ছোটবেলা থেকেই পরিচয় ছিল—যদিও যন্ত্রের পরিকল্পনা তবুও তিনি এতেই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আস্বাদন করতেন। পরবর্তী কালে তাঁর এই সৌন্দর্য্যপ্রীতি তাঁকে কম্পোজিশনের গঠন পদ্ধতিতে নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে উদ্দীপিত করে। একুশ বছর বয়সে আরচিপেনকো প্যারীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যন্ত্রবিদ হিসাবে—তখনও ভাস্কর আরচিপেনকোও সমজদার মহলে যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছিলেন।

প্যারীতে যখন পিকাশো এবং ব্রাক্ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম কিউবিষ্ট ছবির প্রদর্শনী করেন তখন থেকেই আরচিপেনকো ভাস্কর্য্যে নতুন ফর্মের উদ্ভাবন করতে সুরু করেন। তিনিই প্রথম ভাস্কর্য্যে কিউবিজিমের অবতারণা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আরচিপেনকো আমেরিকায় রেদোঁর পর শক্তিমান শিল্পী হিসাবে অভিনন্দিত হলেন। তিনি ভাস্কর্য্যে অহেতুক প্রকৃতিগত রূপ-বিকাশে, বাহ্যিক রূপবিকাশকে বর্জন করে নিছক ফর্মের সমন্বয় সাধনে এক অদ্ভুদ প্রথার অবতারণা করেন। তিনি তাঁর ভাস্কর্য্যে যাদের মধ্যে ছবির সুরটাও পাওয়া যেত, সেখানে বিভিন্ন ফর্মকে বিভিন্ন রঙে রঙীন করে তুলতেন। এই ভাস্কর্য্যের বিচিত্র গঠন পদ্ধতিতে তিনি কাঁচ ঝিনুক, কাঠ, লোহা সবরকম কিছুকে তাদের আকৃতিগত বৈষম্যের মধ্যেই সংযোজিত করতেন। এতে করে সেই বৈষম্যের মধ্যেই একটা অদ্ভুদ, আশ্চর্য্য জগত আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে ওঠে। হেনরী মুর তাঁর ভাস্কর্য্যে স্পেনের সীমাহীনতাকে প্রকাশ করতে ফর্মের মধ্যে গোলাকার গর্ত্তের অবতারণা করেন। এই প্রথার প্রবর্ত্তন আরচিপেনকোই প্রথম করেছিলেন।

নিখিল বিশ্বাস

রহস্যময় রূপকুণ্ড ॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'রহস্যময় রূপকুণ্ডু' বাংলা সাহিত্যে এক দুঃসাহসী যুবকের অভিযান-কাহিনী। অভিযান-কাহিনী বললুম, কেননা, ভ্রমণ-কাহিনী বললে পুরোপুরি ভ্রমণকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এ-কাহিনী ভ্রমণের নেশায় এক দুঃসাহসিক অভিযান। অভিযাত্রী দলে মাত্র দুজন—হিমালয় অভিযানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লেখক বীরেন্দ্রনাথ সরকার আর তাঁর সহকর্মী-বন্ধু রথীন গুপ্ত; এছাড়া পথপ্রদর্শক রাইচাঁদ সিং আর দুজন মালবাহক। সম্বল দুর্জয় সাহস আর রহস্যময় রূপকুণ্ডের মোহিনীমায়ার হাতছানি—যে আকর্ষণে চতুর্দশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে রূপকুণ্ডের রহস্যের সন্ধানে ছুটে এসেছে। রূপকুণ্ড অভিযানের পিছনে লেখকের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এবং এই দুই বাঙ্গালী অভিযাত্রী প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি নগণ্য আর্থিক সম্বল নিয়ে কোনপ্রকার অভিযান-সাজসরঞ্জাম ব্যতিরেকে অনাহারে অনিদ্রা মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে তাঁদের অভিযান সম্পন্ন করেছিলেন। এ-সংবাদ ও তাঁদের অভিজ্ঞতার কাহিনী হয়তো কোনদিন কেউ জানতেও পেতোনা, যদিনা তাঁরা রূপকুণ্ডের তীর থেকে ফটোসহ সংগৃহীত নরকঙ্কাল, মুদ্রা ইত্যাদি নিদর্শন এনে আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে বিস্মিত করতেন।

বলা বাহুল্য রূপকুণ্ড অভিযানে গ্রন্থকার বীরেন্দ্রনাথ সরকার পথিকৃৎ নন। তাঁর আগেও অনেকে রূপকুণ্ড অভিযানে গিয়েছেন, কেউ পথেই প্রাণ হারিয়েছেন, কেউ বা কোনমতে ফিরে এসেছেন। তাঁদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। ১৯৪২ সনে মিঃ মাধোয়াল সিং-এর অভিযানের পর হ্যামিল্টন সাহেব যখন ঐ বছরই রূপকুণ্ড অভিযান করে কুণ্ডের তীর থেকে চপ্পল, ছতোলীর ভগ্নাংশ নিয়ে ফিরে এলেন, ঠিক তখনই সভ্য জগতের কাছে রূপকুণ্ডের কথা প্রচারিত হল। রহস্যের সন্ধান চলল। অসংখ্য মৃতমানুষের দেহাবশেষ আকীর্ণ বীভৎস এই কুণ্ড। হিমালয়ের বুকে ১৬০০০ ফুট উচ্চে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। সারা বছর যার নীল স্বচ্ছ জলের উপর বরফের আস্তরণ পড়ে থাকে আর ঢেকে রাখে একদা বিপর্যস্ত মানুষের পরাজিত মৃত শবদেহগুলিকে। কতশত বছরের পুরাতন এই দেহাবশেষ তা কেউ আজো আবিষ্কার করতে পারেনি। আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা কাহিনী, কিংবদন্তী, ছড়া, লোকগাথা, জাগার। স্থানীয় লোকের মনে ভয়, মৃত্যুর বিভীষিকা। কিন্তু মানুষের অভিযান থেমে থাকেনি। ১৯৫৫ সনে মিঃ মাধোয়াল সিং দ্বিতীয়বার রূপকুণ্ড অভিযান করলেন। তিনি যে সব নিদর্শন সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা জমা দেয়া হল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনেসোটা বীক্ষণাগারে সে-সব নিদর্শন পরীক্ষিত হয়ে ফিরে এল এবং বৈজ্ঞানিক ফলাফলসহ একটি রিপোর্ট প্রচারিত হল। তারপর থেকে কৌতুহল বেড়ে গেল মানুষের এই রহস্যকে জানার। কিন্তু রূপকুণ্ডের রহস্য আজো অনুদ্ঘাটিতই রয়ে গেছে। রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির সদস্য স্বামী প্রণবানন্দ এ-বিষয় কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি নিজে অভিযান

পরিচালনা করেছেন ১৯৫৭-৫৮ ও১৯৫৯ সনে। এ-ছাড়া সরকারী ভাবে দুবার অভিযান পরিচালনা করেন নৃতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এন দত্ত মজুমদার ১৯৫৬ সনে। ঐ বছরই মে ও সেপ্টেম্বরে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বর্গীয় ডি· এন· মজুমাদার বৈজ্ঞানিক-দল নিয়ে অভিযান করেন। প্রথমবারের ব্যর্থতার পর দ্বিতীয়বারের অভিযানে তিনি সফলতা অর্জন করেন। এমনি ব্যক্তিগত চেষ্টায় বা সরকারীভাবে অভিযান পরিচালিত হয়েছে কিন্তু মৃতদেহগুলির ইতিহাস অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। বরং নানা তথ্যের ভীড়ে ও অনুমানে ইতিহাস যেন জট পাকিয়ে গিয়েছে। 'কোন্ অতীত যুগের মানুষ? এরা কি খেয়ালী বাদশাহ্ বিন্ তোগলকের সৈন্যদল—চীন অধিকার করতে গিয়েছিল বাদশাহের খেয়াল চরিতার্থ করতে? অথবা প্রাণভয়ে ভীত পলায়নপর দারা শিকোর ছেলে সুলেমান শিকোর দল—আওরঙ্গজেবের রোষবহ্নি থেকে রেহাই পেতে এসেছিল এই পথে? না এরা রাজা যশোদয়াল সিং-এর রাজকীয় তীর্থযাত্রীদল? তোগলবংশ আর মোগলবংশ মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।'

রূপকুণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে লেখক স্বভাবত ইতিহাস ও সংগৃহীত নিদর্শনের উপর নির্ভর তথ্যাদির আশ্রয় নিয়েছেন। কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রচলিত লোকগাথা, হোমকুণ্ড তীর্থ সম্পর্কিত বড়ি নন্দজাত উৎসবের জাগার বা ব্যালাডগুলির মধ্যে থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। স্বামী প্রণবানন্দের সংগ্রহাদি ও গাড়োয়াল-রাজপুরোহিত নুটিয়ালদের তাম্রলিপি ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে লেখক প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে এই রহস্যময় কুণ্ডের ভয়াবহ ট্র্যাজিডি বর্তমান কালের নয়। কয়েকশত বৎসর পূর্বেকার। এই দেহাবশেষগুলি মহম্মদ বিন্ তোগলকের নয়, নিঃসন্দেহরূপে তীর্থযাত্রীদলের। 'স্বামীজীর ধারণা, রূপকুণ্ডের তীরে মৃতদেহাবশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে হত তীর্থযাত্রীদলের। আর এই তীর্থযাত্রীদল যশোদয়াল-কা রাস্যায় বর্ণিত কনৌজের রাজা যশোদয়ালের।' লেখক কলকাতার নৃতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টকে নানা যুক্তির সাহায্যে ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করে স্বামীজীর Pilgrim theory-কে সমর্থন করেছেন। যদিও এ-বিষয় ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব গবেষকগণ এখনো একমত হতে পারেননি।

আশার কথা এ-গ্রন্থ শুধুমাত্র ইতিহাস কন্টকিত নয়। লেখকের পরিমিতিবোধ ইতিহাস ও কাহিনীর সামঞ্জস্যবিধানে ও কাহিনীর রসাস্বাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 'রহস্যময় রূপকুণ্ডকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। প্রস্তুতিপর্ব ও অভিযান অংশ। প্রস্তুতি পর্বে মুরি থেকে আলমোড়া হয়ে বাসে ডাঙ্গোলী; ডাঙ্গোলী থেকে হাঁটা পথে দেবল হয়ে ওয়ান গ্রাম এবং ওয়ান থেকে রূপকুণ্ড পর্যন্ত অভিযান অংশ। লেখক এই দীর্ঘ ভ্রমণে বিচিত্র-চরিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন; অজানা অচেনা দেশে যে সব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের সঙ্গ তাঁর মনে রেখাপাত করেছে। তাদের হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। তাই সর্দারজী ও শর্মাজীকে ভোলা যায় না। এমনি আরো অনেক চরিত্রকে লেখক অতি অল্প কথায় জীবন্তকরে তুলেছেন এবং তাদের কাহিনী বিবৃত করেছেন। বাগেশ্বরের কুষ্ঠ হাসপাতালের ডাক্তার এরল ফ্লিন্সের দীর্ঘ আঠারো বছরের নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী লেখক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নন্দাদেবীর শৃঙ্গ, নন্দাকোট, ত্রিশূল প্রভৃতি পর্বত ও নন্দাযাত্রা উৎসবের তাৎপর্য সম্পর্কে কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে পুরা-কাহিনী প্রচলিত আছে তা অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন লেখক। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এই সব পর্বত অভিযানের ব্যর্থতা, এমনকি রূপকুণ্ডের ট্র্যাজিডিও নন্দাদেবীর অভিশাপের ফল। দেবীর অভিশাপের

ভয়ে তারা অভিযাত্রীদলের সঙ্গে যেতে রাজী হয় না। ১৮৫৫ সনে অ্যাডলফ সাহেবকে অভিযান কালে নন্দাদেবীর পুজোর জন্য দুজন ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিতে হয়েছিল। এমনি অনেক বিচিত্র-তথ্য লেখক কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেছেন। অভিযান অংশে লেখক রূপকুণ্ড অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্লেশ ও সহনশীলতার সঙ্গে তুষারপাত ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তুচ্ছ করে খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে এগিয়ে যাবার যে মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে দুর্জয় সাহসের পরিচায়ক। এই অভিযান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বলে দুর্গম পথের বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ চলার পথে হিমালয়ের নৈসর্গিক শোভা, ব্রহ্মকমল অর্কিড পপি একোনাইট প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ফুলের সৌন্দর্যে লেখক মুগ্ধ হয়েছেন। সৌন্দর্য বিলাসী লেখক হিমালয়ের প্রাকৃতিক শোভাকে পথ চলার মাঝে মাঝে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নিসর্গ শোভাই নয়, হিমালয় দুহিতারাও ধরা পড়েছে। তাই দুর্গাকে ভুলতে পারেন না লেখক। লোহাজঙ্গে বাধ্যহয়ে রাত কাটাতে হয়েছিল তাঁদের। দোকানের মালিকের নাবালিকা স্ত্রী দুর্গা। সে তার স্বামীর নোক্‌রি পাবার প্রত্যাশায় বসে আছে। সাহেবরা ফিরে গিয়ে তার মরদের চাকরি করে দেবে। যারাই এ পথে আসে তাদেরি কাছে সে আর্জি পেশ করে। দুর্গার জীবনের আর্তি লেখকের হাতে ভাষা পেয়েছে। পাথরনাচুনি, কৈলুবিনায়ক, বাল্‌পা রাণী-কা সুলেড়া প্রভৃতি স্থানের নামকরণের ইতিহাস চমকপ্রদ। কিন্তু যে-সব প্রচলিত কাহিনী এই-সকলস্থানের নামকরণের উৎস সেগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা না করে স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে গল্পচ্ছলে শোনা কাহিনীগুলোকে অভ্রান্ত মনে করার কারণ নেই। যে-সব জাগারে রূপকুণ্ডের ট্রাজিডি নিহিত, বিশেষ যশোদয়াল-কা রাস্যা ও লাটু দেবতার জাগার থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে গাড়োয়ালী ভাষার পাশা পাশি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দিলে মনে হয় লেখকের যুক্তিগুলি আরো বেশি প্রামাণ্য হতে পারতো। যাহোক লেখক রূপ-কুণ্ডে ঐতিহাসিকের সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আসেননি, এসেছেন হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে। সে-সৌন্দর্য দর্শন লেখকের সার্থক হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা নিছক ভ্রমণ মাত্র না হয়ে সাহিত্য রসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। লেখকের ভাষা বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্ট ও আবেদন-শীল করার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে।

রতন সান্যাল

সমকালীন

প্র ব ন্ধ - মা সি ক প ত্রি ক

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখে)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে'প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধ-পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ** ও **কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য :

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোনঃ ২৩-৫১৫৫

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিনামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা-১

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 Feb. '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চলেছে যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মানেহীন বলে তারে, ওকে অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে যে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বাহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব রেলওয়ে

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

নবম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৬৮

যাঁহাদের
নিদ্রা
হয় না
যাঁহাদের নিদ্রা হয় না তাঁহাদের পক্ষে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল পরম হিতকারী। ইহা দেহ ও মনের ক্লান্তি দূর করে ও সুনিদ্রা আনয়ন করে
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA

নবম বর্ষ। ১১ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

X-100
MOTOR OIL
X100
2T
SHELL
ROTELLA
OIL
FOR DIESELS
a winner every time...
you can be sure of SHELL

নবমবর্ষ । একাদশ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' আটষট্টি

শিক্ষায় সাহিত্য

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানিং গোটা দেশেই শিক্ষাসংস্কার নিয়ে বিষম হট্টগোল শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা যখন হস্তামলকে পরিণত হল, তখন বকেয়া আমলের জীর্ণ-শীর্ণ বিধিবিধানকে আমূল বদলে নেবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগাই স্বাভাবিক। এবং শিক্ষার রীতিনীতি ও প্রকার-প্রকরণকে যে অতি দ্রুতবেগে পালটে নেবার জন্য আমাদের রাজপুরুষ ও শিক্ষাবৃক্ষারূঢ় দেবতারা মরীয়া হয়ে উঠবেন, তাতে বিস্ময়ের কি আছে? সকলেই জানেন দুনিয়ার সেরা দেশগুলোর সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামতে হলে আমাদের মতো শিল্প-ও যন্ত্রবিদ্যায় অনগ্রসর জাতির পক্ষে টেকনলজির সিন্ধবাদ দৈত্যের শরণ নিতে হবে। বহুকাল আগে শ্রীরামপুরের কেরী সাহেব ভারতের শিক্ষা রীতিকে ভারতীয় করণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমাদের উনিশ শতকী শিক্ষার কর্ণধারেরা ইটন-হ্যারো আর অক্‌স্‌ফোর্ড-কেমব্রিজের আদর্শে ভারতীয় শিক্ষার কলেবর গঠনের চেষ্টা করেছিলেন এবং বিগত শতাব্দীর শিক্ষা সাধারণতঃ কলাবিদ্যা ও সাহিত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল—ইদানীং যাকে 'হিউম্যানিটিজ্' বলা হচ্ছে। এই শিক্ষা ইংরেজী ভাষার দুতিয়ালীর জন্য খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও স্মরণযোগ্য, এই শিক্ষাই—বিদেশী ভাষার মারফতে হলেও, স্বাধীন ভারতকে গড়ে তুলেছে; রাষ্ট্রনীতি, সমাজদর্শন, আত্মনিরীক্ষা, ইতিহাসচেতনা, স্বাদেশিকতা—এক কথায় জীবনের সর্বাঙ্গীণ জাগরণ, যা উনিশ ও বিশ শতককে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে, তার মূলে আছে ইংরেজী ভাষাবাহী সাহিত্য-কলা-প্রধান মননপ্রণালী। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর থেকে রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ তিলক গোখেল থেকে গান্ধিজী নেতাজী এই বিশেষ ধরণের সাহিত্য কলাশ্রিত শিক্ষাকেই প্রাণের ধাত্রী বলে গণ্য করেছিলেন।

উনিশ ও বিশ শতকের কিছুকাল পর্যন্ত ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে ইউরোপ-আমেরিকার সাধারণলোকে এদেশকে সাপ-বাঘ হাতী আর দড়ি খেলোয়াড় যাদুকরের দেশ বলে কৌতুক বিস্ময়মিশ্রিত অবজ্ঞা করলেও পাশ্চাত্যের যাঁরা একটু মননপ্রকর্ষের চর্চা করতেন, তাঁরা যে-ভারতকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেন, সে ভারত ছিল উনিশ শতকী সাহিত্য-কলা শিক্ষায় পারঙ্গম।

তারপর এল পালা বদলের ঝড়ো হাওয়া। স্বাধীনতা এল। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণের দিকে রাষ্ট্রধুরন্ধরদের সতর্ক দৃষ্টি পড়েছে। মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান-চারুকলা-যন্ত্রবিদ্যা টেক্‌নলজির ঢালাও ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রাচুর্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক শিক্ষা-অধিনায়কগণ টেক্‌নলজি ও যন্ত্রবিদ্যার দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছেন; এ'রা সাহিত্য ও কলা-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে ঈষৎ অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে রেখে "নম যন্ত্র নম যন্ত্র" বলে বিশ্বকর্মার পূজো চড়াচ্ছেন মহোৎসাহে। কারখানার চিমনি থেকে দেবোদ্দেশে অবিরত হোমধূম নির্গত হচ্ছে, হাতুড়ি-নেহাইয়ের 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই' শব্দে দেবারতির কাঁসরঘন্টা বাজছে, আটটা-পাঁচটায় কাজে যাবার বাঁশী বেজে শঙ্খধ্বনির অনুকরণ করছে। এ সব ভাল লক্ষণ। খঞ্জ দেশ অকস্মাৎ উল্লম্ফনে প্রস্তুত হলে যন্ত্রবিদ্যার 'বলা-অতিবলা' মন্ত্রের সাধন করতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা বোধ হয় উচিত। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা আজ যে রকম টেক্‌নলজির কুক্ষিগত হয়েছে, তাতে ভারত ভাগ্যবিধাতার ভবিষ্যৎ ভেবে কিছু আশঙ্কার উদয় হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যবোধ-বর্জিত বুদ্ধিমান 'এফিশিয়েন্ট' যন্ত্রধর্মী কারিগরে দেশ ছেয়ে গেলে তাতে গোটা জাতিটাই জাহান্নামের পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। এখন যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে বিজ্ঞান বা যন্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা অর্জন করতে যাবে, তাদের আর ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনই হবে না। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা শুদ্ধ করে বাংলাটাও লিখতে শিখল না, তারা অচিরে সাহিত্য কলা চর্চা ছেড়ে দেবে—কেন না তার প্রয়োজন হবে না। ফলে গোটা দেশেই হৃদয়হীন, উচ্চতর কল্পনা ও প্রাণরস বর্জিত একটা যান্ত্রিক অটোমেটনের সৃষ্টি হবে, সৃষ্টি হবে রক্তমাংসের রবটের। এরা যন্ত্রের মতো কাজ করবে, উপরওয়ালার বোতাম চাপে তাসের দেশের দুরিতিরির মতো তালে তালে পা ফেলে চলবে। কিন্তু যাকে মনুষ্যত্ব বলে, তার আশু বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে। যাকে এখন 'হিউম্যানিটিজ' বলে স্কুলের সবচেয়ে ওঁছা ঘরে অনাদরে ফেলে রাখা হয়েছে—শুধু তাই-ই মানুষকে টেক্‌নলজির ময়দানবের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

তা বলে আমরা টেক্‌নলজির অনর্থক পরিবাদ ক'রে অপরিণামদর্শী ও অবান্তর কলা-চর্চার সমর্থন করছিনা। আঁখক্ষেতকে রক্ষা করবার জন্য যেমন কৃষাণ পণ্ডাশুরের পূজো করে, আমরাও সেই রকম শিল্প-কলা-সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শনকে বাঁচাবার জন্য যন্ত্রাসুরের পূজো দেবার প্রস্তাব করছি। যন্ত্র, কারিগরী বিদ্যা, টেক্‌নলজি—এসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, এবং গোটা জাতটাকে টেনে তুলতে হলে এই রকম যন্ত্রতন্ত্রের সাধন প্রণালী আয়ত্ত করতেই হবে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর একে তো চারিত্রভ্রষ্ট, নীতিহীন, নিষ্ঠাবর্জিত, নাস্তিক্যবাদী 'প্র্যাগমাটিজ্‌ম্' রাষ্ট্রনীতির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একমাত্র ভোটমন্ত্র হয়েছে, এখন যদি আবার কলাসাহিত্য প্রধান শিক্ষাকে অবহেলা করে অয়স্‌কে অয়স্কান্ত করবার জন্য 'তনু-মন'অর্পণ করি, তা হলে জাতটা দাঁড়াবে কোথায়? মনে রাখতে হবে, গুহামানবও টেকনলজিতে কম পারদর্শী ছিল না; কাঠের গুঁড়িকে জলে ভাসিয়ে নদী পার হওয়া, বা গাছের ডালপালা

পাকিয়ে ঝুলন্ত সাঁকোর সাহায্যে যথেচ্ছা যাওয়া আসা করা নিশ্চয়ই টেক্‌নলজির গোড়ার দিকের কথা—এবং টেক্‌নলজির ইতিহাসের প্রাথমিক ভূমিকা। কিন্তু মানবসত্তার ইতিহাস তো টেকনলজির অগ্রগমনের ইতিহাস নয়; মানুষের সভ্যতা আসলে মানুষের কথা। টেক্‌নলজি সেই মানবসভ্যতার ইঁট কাঠ পাথর। কিন্তু এখন যদি লোষ্ট্রখণ্ডকে গণ্ডকী শিলা বলে ভক্তিভরে গলবস্ত্র হয়ে পড়ি, তা হলে এ জাতকে অপঘাত থেকে ঠেকাবে কে? সাহিত্য ও সাহিত্য-আশ্রিত শিক্ষাই আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্ব দেবে—আমাদের শিক্ষা বিভাগের কর্ণধারদের কর্ণযুগলে একথাটা যত তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে ততই জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে মঙ্গল দেখা দেবে। এমন কি যাঁরা কারুবিজ্ঞানী, বাস্তুবিদ বা অন্যকোন ব্যবহারিক বিজ্ঞানে কর্মব্যস্ত, তাঁরাও যদি সাহিত্য-কলা-ইতিহাস-দর্শনকে অপ্রয়োজনের, অলসের, কল্পনার ব্যাপার বলে শুধু কারখানা ঘর আর ল্যাবরেটোরীকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় মনে করেন, তা হলে তাঁরাও অচিরে আনন্দহীন আবেগহীন শুষ্ক নীরস রুটিনবাঁধা জীবনে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করবেন। কারখানা কক্ষ এবং শয়ন-মন্দির, প্যার্সোনাল সেক্রেটারী এবং সহধর্মিনী—এদের মধ্যে যে মূলত পার্থক্য আছে সেটা তো স্বীকার করতে হবে।

টেক্‌নলজি ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের দিকে ভারত সরকার সম্প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য আজকাল অতিদ্রুত বেগে দেশকে অন্নবস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে গেলে এই দুটি দেবতার ভোগের মাত্রা কিছু বাড়াতে হবে, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু মাত্রা ঠিক রাখতে না পারলে শুধু জাপানের মতো কারুবিদ্যা ও প্রয়োগবিজ্ঞানে প্রয়োজনের সুরাহা হলেও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকে ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তো হাতে হাতে নগদ কড়ি দেয় না; সেখানে একনিষ্ঠ সাহিত্য ও শিল্প সাধকের মতো 'মমকার' ত্যাগ করে আত্মনিবেদন করতে হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানী ও কলারসিকে কোন তফাত নেই। দুজনেই উদরভরণের জন্য ব্যস্ত নন। দুজনের হাতেই একই রঙের তুলি, একটির নাম আনন্দ, অপরটির নাম কৌতূহল। দুজনেই প্রয়োজনের তাগিদ ছেড়ে অপ্রয়োজনের অনুসন্ধিৎসায় উধাও। কিন্তু টেক্‌নলজির তেল-নুন-লক্‌ড়ীর দিকে সব প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হ'লে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্থান হবে যাদুঘরে, জীবন্ত প্রাণের মধ্যে নয়।

এই জন্য আমরা বলতে চাই যে, শিক্ষা সংস্কারের নাম করে এবং বহু অর্থ ব্যয় ক'রে এই যে বিরাট বিরাট স্কুলবাড়ী তৈরী হচ্ছে, আসলে এখান থেকে কি ধরণের শিক্ষা বিতরিত হবে? আগে ভাগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইমারত তৈরি করে পাটোয়ারী বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীসভার রদবদল হলে শিক্ষাখাতে টাকাকড়ির হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু ইমারত তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সরকার বদলালেও না। এই হিসাবী বুদ্ধি তারিফের যোগ্য। অবশ্য অনেকে বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সেই তোতা পাখীটার খাঁচার মতো এই তো বেশ মস্ত শিক্ষাভবন নির্মিত হয়েছে। আর কি চাই? এবার ঢালাও শিক্ষা চালাও। কিন্তু নিন্দুকের তো অভাব নেই তারা বলবে মার্কিণী ধাঁচে বিরাট বিরাট স্কুল বাড়ী করে এতো টাকার শ্রাদ্ধ কি না করলেই চলছিল না? কিন্তু দেশটাকে যে রাতারাতি টেকনলজির মায়াপুরী করে তুলতে হবে। কাজেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাব, ইস্কুল থেকেই টেকনলজির বিদ্যা শুরু হোক। যে বয়সে ছেলে জগৎ জানবে পুঁথি পত্রের মধ্যে, জীবনের মহৎ মূল্যবোধগুলিকে আয়ত্ত করবে সাহিত্য ইতিহাস থেকে, সেই বয়সে তাকে লায়েক করা হবে অর্থকরী কারিগরী বিদ্যায়। ফলে গোটা জাতটাই একটা

ইহসর্বস্ব টেক্‌নিশিয়ান বিকৃতি পাবে।

এখন পথ কোথায়? মূল্যমানের পরিমাণবোধ রক্ষা করে টেক্‌নলজি ও কারুবিজ্ঞানের যথাযথ স্থান নির্দেশই হচ্ছে বাঁচার একমাত্র পথ। শিল্প সাহিত্যকে আবার জীবন ও শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন না করলে এ জাতির আশু উন্নতি হলেও অদূর ভবিষ্যতে একটা বড় রকমের আত্মিক অধঃপতন হবে। 'আত্মিক' কথাটায় আঁৎকে ওঠবার কারণ নেই। আত্মিক বলতে আমরা মানুষের গোটা অধিমানসকে বলছি। সেই আত্মিক মানুষই যথার্থ মানুষ, অশিক্ষিত বাউলকবি যাকে 'মনের মানুষ' বলেছেন। অবশ্য মনোবিজ্ঞানীর মতো কেউ যদি মনটাকেও জৈবমস্তিষ্কের দেহঘটিত ক্রিয়ামাত্র বলে এড়িয়ে যেতে চান, তা হলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়। তবু মন থাকবে, এবং মন বলতে একক ব্যক্তিমন। টেকনলজির রোলার চালিয়ে সব মনকে এক ছাঁচে গড়া যায় না, আমাদের শিক্ষাবিধাতারা এ কথাটা কবে বুঝবেন?

মরিস্ উইন্ট্যারনিট্স্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তৎকালীন অষ্ট্রিয়া রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত হর্ণ নামক ক্ষুদ্র নগরীতে এক ইহুদী ব্যবসায়ী পরিবারে উইন্ট্যারনিট্স জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই উইন্ট্যারনিট্সের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তিনি হিব্রুর ন্যায় দুরূহ ভাষা পড়িতেও লিখিতে পারিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা শেষ করিয়া উইন্ট্যারনিট্স ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন তাঁহার পাঠ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে সুবিখ্যাত ভারত-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বুল্যের্ ও অন্য দুইজন সহকারী অধ্যাপক ফ্রীড্রিখ্ মুল্লার (ইনি ম্যাক্সমূল্যের নহেন) এবং অয়গেন হুলট্শ্ ভারতবিদ্যার প্রতি উইন্ট্যারনিট্সের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর গণ্ডীর বাহিরে পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নের ফলে উইন্ট্যারনিট্স্ অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এইরূপে দর্শন এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্র হইলেও সংস্কৃত ভাষাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আপস্তম্বীয় বিবাহ বিধি সম্বন্ধে সন্দর্ভ রচনা করিয়া উইন্ট্যারনিট্স্ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ্ ডি উপাধি লাভ করেন (১)। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্ধিত ও সংশোধিত রূপে "ভিয়েনা একাডেমি অফ্ সায়েন্স" এর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯২)। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা হইতেই তিনি আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রের মূল পুস্তক দুইটি টিকা সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (২)।

এই সময়ে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কার্যে সহায়তার জন্য আচার্য ম্যাক্স্-মুল্ল্যারের একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়। বার্ধক্যহেতু এই গুরু পরিশ্রমসাধ্য কাজ একাকী সম্পন্ন করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভিয়েনায় অধ্যয়নকালেই উইন্ট্যারনিট্স্ অধ্যাপক বুল্যেরের সবিশেষ প্রিয়পাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমোদন ক্রমে উইন্-ট্যারনিট্স্ ম্যাক্সমুল্ল্যার কর্তৃক এই কাজের জন্য মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উইন্ট্যর্-নিট্স অক্সফোর্ডে আসেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চারিবৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ম্যাক্সমুল্ল্যর এই তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ সহ-কারীর কর্মদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উইন্ট্যর্নিট্স্ বিবাহ করেন। ঋগ্বে-দের কাজ শেষ হইয়া গেলেও তিনি অক্সফোর্ড ত্যাগ করিলেন না, সংস্কৃত চর্চার সুবিধার জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডেই বাস করেন। নিজের ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্য এই সময়ে তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, এমনকি গৃহশিক্ষকতার কাজও করিতেন। কিছুকাল তিনি অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীর গ্রন্থগারিকের কাজ করেন। অক্স-ফোর্ড বাসের শেষ দিকে একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি জার্মান ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উইন্ট্যারনিট্স্ অক্সফোর্ডের বড্লেয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত আরম্ভ করেন, অক্সফোর্ড বাস কালের মধ্যে তিনি এই তালিকা সম্পূর্ণ করিতে না পারায় অধ্যাপক ব্যারিডেল কীথ্ ইহা সম্পন্ন করেন, পরে তালিকাটি দুইজনের নামেই প্রকাশিত হইয়াছিল (৩)। এই সময়ে উইন্ট্যর্নিট্স লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে

রক্ষিত দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত পুঁথি সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (৪)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে থাকিতেই আপস্তম্বীয় সূত্রের প্রার্থনাগুলির ইংরাজী অনুবাদ সমন্বিত তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৫)। দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে প্রাচীন হিন্দুর এই স্মৃতি গ্রন্থ উইনট্যারনিট্‌সকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার এই পুস্তকের প্রতি অবিরত মনঃসংযোগ হইতেই বুঝা যায়। এই সময়েই ম্যাক্সমুল্লারের অনুরোধে উইনট্যারনিট্‌স তাঁহার সম্পাদিত "সেক্রেড্‌ বুকস অফ দি ঈষ্ট" গ্রন্থমালার ৪৯টি খণ্ডের মধ্যে উল্লিখিত নাম ও বিষয়গুলির সূচী সঙ্কলন করেন। বহু পরিশ্রম ও ভূয়োদর্শনের ফলশ্রুতি-স্বরূপ এই পুস্তকটি সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অফ দি ঈষ্ট গ্রন্থমালার পঞ্চাশত্তম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় (৬)।

দীর্ঘকাল অক্সফোর্ডে বাস করিয়া উইনট্যারনিট্‌স সংস্কৃত চর্চার সুযোগ এবং সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ভালভাবে জীবিকার্জনের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশের মত ইউরোপের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেই অল্পবিস্তর দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইয়াছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত অধ্যাপক পদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকায় সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেরই অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

যাহা হউক, অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উইনট্যারনিট্‌স তাঁহার স্বদেশস্থ প্রাগ্‌ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য-ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব (ইথ্‌নোলজি) বিষয়ে লেক্‌চারারের পদলাভ করিয়া অক্সফোর্ড ত্যাগ করেন। তিনবৎসর পর তিনি এই বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক হন ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রধানাধ্যাপকের মর্যাদা লাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উইনট্যারনিট্‌স দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তির আনুকুল্যে অষ্ট্রিয়ার চেক্‌ ভাষী জনগণ পুরাতন অষ্ট্রিয়ার অংশ লইয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করে, প্রাগ্‌ নগরী এই নবগঠিত স্বাধীনরাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী হয়। পুরাতন অষ্ট্রিয়ার মোরাভিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিরা ছিল জার্মান ভাষী, ইহারা সকলেই এখন হইলেন চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের নাগরিক; এই জার্মান ভাষী নাগরিকদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় রাখিয়া চেক্‌ভাষিদের জন্য প্রাগে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয়। ডাঃ উইনট্যারনিট্‌স জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকিয়া জান, কারণ তিনি নিজে ছিলেন জার্মান ভাষী। উইনট্যারনিট্‌সের জীবনের অক্ষয় কীর্তি তাঁহার রচিত "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।" জার্মান ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬০০ পৃষ্ঠায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় (৭)। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ আধুনিকতম গবেষণা লব্ধ তথ্য সমন্বিত ও সুবিস্তৃত পুস্তক ইতি-পূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় সাহিত্যের বিশ্ব-কোষ স্বরূপ এই গ্রন্থের সবিশেষ উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষানায়ক স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে উইনট্যারনিট্‌স ইহার ইংরাজী সংস্করণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। জার্মান ভাষায় এই পুস্তকের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবার পর ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে সদা সতর্কচক্ষু উইনট্যারনিট্‌সের নিকট নিত্যনূতন তথ্যাবলী জমিতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি এই পুস্তকের সব কয়টি খণ্ডের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মান জাতির আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থের জার্মান প্রকাশক নূতন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব লইতে কুণ্ঠা বোধ করেন এমন

সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ইংরাজী সংস্করণ প্রস্তুতের আমন্ত্রণ লাভ করিয়া উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্ সবিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া তিনি এই পুস্তকের দুইখণ্ডের অনুবাদ তথা পুনর্লিখন সম্পন্ন করেন, তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড (বৈদিক, পৌরানিক ও মহাকাব্য যুগ) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (কলিকাতা)। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড (বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড ও (অলঙ্কার-কাব্য) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৮)। এই তিনখণ্ড ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়নে দুইজন বিদুষী মহিলা শ্রীমতী কেতকার ও কুমারী কহ্ন উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। উইন্‌ট্যার্‌নিটস কৃত ভারতীয় সাহিত্যের তিনখণ্ড ইতিহাস প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কবিগুরু যখন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি রূপে প্রাগে আগমন করেন তখন ফ্যাকাল্‌টি অফ্ আর্টসের ডীন্‌রূপে অধ্যাপক উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌সই তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। প্রায় সমবয়সী বিশ্বকবির সহিত ভারতবিদ্যাবারিধি উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্ অচিরেই গভীর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন, আজীবন উভয়ের মধ্যে এই প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কবিগুরুর অনুরোধে উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্ বিশ্বভারতীর পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে (ভিজিটিং প্রফেসর) ভারতে আসেন। তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সহকর্মী অধ্যাপক লেজনীও তাঁহার সঙ্গে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক রূপে আসিয়াছিলেন। প্রায় একবৎসর কাল উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্ বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) উত্তর বিভাগে (স্নাতকোত্তর) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্রকে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদন ও ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্" বিশ্বভারতীর এই মহান আদর্শের সহিত একাত্ম উইন্‌ট্যারনিট্‌সের শান্তিনিকেতন বাসে তত্রস্থ আশ্রমিকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বভারতীতে উইন্‌ট্যরনিট্‌সের অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সারিতে রবীন্দ্রনাথকেও খাতা পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা সূত্রে এই মনীষীর ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে অপর একটি জাতীয় শুভউদ্যোগ সবিশেষ ফলবতী হয়। ইহা হইল পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুতের কাজ।

প্রথম যৌবনে অক্সফোর্ডে অবস্থান সময়ে উইন্‌ট্যার্‌নিট্‌স্ বোড্‌লেয়ন্ লাইব্রেরীর এবং রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির (লণ্ডন) লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুতের কালে মহাভারতের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সংস্পর্শে আসেন। এইগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ইহতে সংগৃহীত ও বিভিন্ন লিপিতে লিখিত। এই সব পুঁথিগুলির মধ্যে পাঠের ও বিষয় বস্তুর বহু অসামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেন, ভাষাতত্ত্বের বিচারে আধুনিক অনেক শ্লোকও তিনি কোন কোন পুঁথির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পান। এই সময় হইতেই মহাভারতের অবিকৃত রূপ উদ্ধার করা তাঁহার জীবনের পরম অভীষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে মহাভারত পাঠের মধ্য দিয়াই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ভারতবিদ্যার্থীর পক্ষে অবিকৃত মহাভারত পাঠ পরম প্রয়োজনীয় অথচ প্রামাণিক সংস্করণ একটির ও অস্তিত্ব নাই। মহাভারতের একটি

প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগিদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপে আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যাকংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হইয়া তিনি এবিষয়ে বার বার প্রতিনিধিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন (প্যারিস, ১৮৯৭; রোম ১৮৯৯; হ্যামবুর্গ, ১৯০২)। ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় এবিষয়ে তিনি প্রবন্ধাদিও লেখেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস উইন্‌ট্যরনিট্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি সংস্থা (ইণ্টার্‌ন্যাশন্যাল্‌ এসোসিয়েশন অফ্‌ একাডেমিস্‌) এই প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করেন। গোটিঙ্গেন, লিপজিগ্‌, মুনিক্‌, ভিয়েনা প্রভৃতি ভারতচর্চার কয়েকটি কেন্দ্র হইতে প্রস্তাবিত কার্যের জন্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স, পণ্ডিত লুডর্স ও জ্যাকোবির সহায়তায় একটি বিস্তৃত কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হিসাবে গোটিঙ্গেনের অধ্যাপক লুডর্স মহাভারতের আদিপর্বের ৬৭টি শ্লোক সহ একটি 'আদর্শ' 'কাপি' প্রস্তুত করেন। অর্থসংগ্রহের কাজ চলিতে থাকা কালে ইউরোপে সমরানল (প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪) প্রজ্জ্বলিত হয় ও এই অগ্নিতে ইউরোপে মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস সমাধিলাভ করে।

ইউরোপে মহাযুদ্ধের অবসান হইলে পুণা নগরীর ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্‌ উইন্‌ট্যরনিট্‌স্‌ পরিকল্পিত এই শুভ কাজ ভারতেই সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। উইন্‌ট্যরনিট্‌স্‌ এই সংবাদে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেন ও সর্ববিধ সহযোগিতা দানে প্রতিশ্রুত হন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া প্রথমেই তিনি পুণা নগরীতে আগমন করেন। কয়েকদিন এখানে থাকিয়া তিনি ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের কর্মীদের আবশ্যকীয় পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। উইন্‌ট্যরনিটসের শান্তিনিকেতন বাস কালে তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভের জন্য ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের অন্যতম কর্মী ডাঃ নারায়ণ বাপুজী উৎগিকর কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ফলতঃ এই সময়ে শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতীই মহাভারত প্রকাশের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এইখানেই ডাঃ উইন্‌ট্যর্‌যাট্‌স্‌ মহাভারতের সমগ্র খণ্ডগুলির প্রকাশের কার্য প্রণালী নির্ধারিত করিয়া দেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কার্যে সহযোগিতা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ ও বিধুশেখর কর্তৃক বিচারিত ও অনুমোদিত বিরাট পর্বটি ডাং উৎগিকর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের এইটিই প্রথম প্রকাশিত খণ্ড। মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুতের কাজে শান্তিনিকেতনস্থ মহাভারত পুঁথি সংগ্রহ বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মহাভারত প্রকাশনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজনীয়। এই মহাভারত সঙ্কলনের কাজে মহাভারতের ৫৯টি সম্পূর্ণ পুঁথি পুণা, লণ্ডন, লাহোর, বরোদা, নেপাল, শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী), ঢাকা (বিশ্ববিদ্যালয়) ইন্দোর,, মহীশূর, তাঞ্জোর, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। এই পুঁথিগুলি শারদা (কাশ্মীরী, দেবনাগরী, মৈথিলী, বাঙ্গালী, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি অক্ষরে (লিপিতে) লিখিত। এই সব বিভিন্ন লিপিতে লিখিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রতিটি শব্দের পাঠ বিচারান্তে শুদ্ধপাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ঐ শব্দটি শ্লোকের মধ্যে

গ্রহণ করেন। পাঠভেদগুলি পাদটিকায় (ফুটনোটে) সন্নিবিষ্ট করা হয়। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্তৃক প্রতিশব্দ ও ছত্রের শুদ্ধ পাঠ ও পাঠভেদ সমন্বিত এক একটি পর্ব প্রকাশযোগ্য করিতে যে কত সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণের আদিপর্ব ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বিষ্ণু শুকথঙ্কর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ডাঃ শুকথঙ্করের অকাল মৃত্যুর পর এক বা একাধিক খণ্ড মিঃ এডগারটন, ডাঃ রঘুবীর, ডাঃ সুশীলকুমার দে, শ্রীপাদ বেলভেলকর বৈদ্য, ডাণ্ডেকর, ভেলাঙ্কর, পরাঞ্জপে, কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাভারতের শেষ পর্ব (স্বর্গারোহণ পর্ব) ডাঃ শ্রীপাদ বেলভেলকর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আশাকরা যায় পরিকল্পিত ২৪টি খণ্ডের বাকী ৫টি খণ্ড, (হরিবংশ, সূচি প্রভৃতি) অচিরেই প্রকাশিত হইবে। গতশতকের শেষ ভাগে উইন্‌ট্যর-নিট্‌সের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে বিদেশে মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয় অর্ধশতাব্দীরও পরে ভারতবর্ষের মৃত্তিকাতে সেই উদ্যোগ যে সাফল্য-মণ্ডিত হইতে চলিয়াছে ইহা ভারতবাসির পক্ষে বিশেষ শ্লাঘা ও পরিতোষের বিষয়। মহাভারত প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে ভারতের বহু বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যানুরাগী ধনী (বিশেষতঃ আউন্ধের রাজা বালাসাহেব পন্ত প্রতিনিধি) ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে আর্থিক সাহায্য দান করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি রাজ্যসরকার প্রকাশন ব্যাপারে অর্থ সাহায্য দেন। এই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ও অন্যতম। বাঙ্গলা দেশের পুঁথিগুলি সম্পাদন কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিশ্বভারতী কিছুকাল মহাভারত প্রকাশ কার্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, বাঙ্গালী পণ্ডিত মনীষী সুশীলকুমার দে এই মহাগ্রন্থের উদ্যোগপর্ব ও দ্রোণ পর্বের (মোট উনিশটি খণ্ডের তিনখণ্ড) সম্পাদন করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও এই কার্যে অর্থ সাহায্য দিয়াছেন সুতরাং মহাভারত প্রকাশরূপ মহাযজ্ঞে বাঙ্গালী সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করিয়াছে ইহা ভাবিয়া আমরা গর্ববোধ করিতে পারি।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপকতার অবসরে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বিদ্বজ্জন সভায় ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ ছয়টি "রীডারশীপ লেক্‌চার্" বা ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতাগুলির বিষয় বস্তু ছিল (১) বেদের কাল (এজ্ অফ দি ভেডস্) (২) প্রাচীন ভারতের ধর্ম সাহিত্য (য়্যাসে-টিক্ লিটারেচর্ অফ্ ইণ্ডিয়া) (৩) প্রাচীন ভারতের গাঁথা সাহিত্য (৪) ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য (৫) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও (৬) ভাস। এই ভাষণগুলির মর্মার্থ ছিল ইহাই যে মানব জাতির ইতিহাসে ভারতীয় সাহিত্য অতি উজ্জল ও অপরিহার্য এক অধ্যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বেদকে খৃষ্টজন্মের ১২০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। উইন্‌ট্যরনিট্‌স্ তাঁহার বেদের কাল নামীয় বক্তৃতায় ইহাই যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেন যে বেদের পুরাতন অংশগুলি খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ২০০০ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত, ইহা কোন-মতেই পরবর্তী কালে রচিত হইতে পারে না। অবশ্য উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ এই বক্তৃতায় ইহার বিপ-রীত মতটিকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহার "ঋগ্বেদের যুগে ভারত" (রিগভেডিক্ ইণ্ডিয়া) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেন যে ঋগ্বেদ রচনা কালে সিন্ধুনদের পূর্ব হইতে আসাম পর্যন্ত মহাসমুদ্র প্রবাহিত ছিল

সেখানে ভূখণ্ডের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই হিসাব মত ঋগ্বেদ কয়েক কোটি বর্ষ পূর্বে "নিয়েনডারথ্যাল" মানুষের যুগে রচিত। ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ডাঃ দাসের এই 'আজগুবি' মতের সমর্থন করে না। ঋগ্বেদ পাঠ হইতে বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ রচনার কালে ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বর্তমান কাল হইতে বিশেষ ভিন্ন ছিল না এবং মানুষ এই সময়ে বর্তমান কালের মানুষের ন্যায়ই অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ডাঃ হারাণ চন্দ্র চাকলাদারও ডাঃ দাসের এই অবৈজ্ঞানিক মতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন (দ্রষ্টব্য—এরিয়্যান্ অকুপেশন অফ্ ঈস্টার্ণ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান্ ষ্টাডিজ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬১)। উইন্‌ট্যর্‌নিটসের এই বক্তৃতাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "সাম প্রব্লেমস্ অফ ইণ্ডিয়ান্ লিটারেচর" নামে প্রকাশিত হয় (৯)।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক উইন্‌ট্যরনিট্‌স্ শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায় সভায় কবিগুরু এক আবেগ পূর্ণ ভাষণে উইন্‌ট্যরনিট্‌সকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি শান্তিনিকেতনে সকলের যে পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি সকলের সেই পরিমাণ প্রীতি জন্মিয়াছে, স্বল্পকালের জন্য তাঁহার যে সান্নিধ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা সকলের স্মৃতিতে শাশ্বত হইয়া থাকিবে।

"....On the day when we must bid you farewell let us assure you that our love for your personality has become equal to our reverence for your scholarship and that though in outward appearance the time of your stay with us has been short, spiritually it has acquired a permanence in our heart.".... Visvabharati Quarterly, October, 1923.

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণ কালে কবিগুরু পুনরায় প্রাগ নগরী পরিদর্শন করেন, এই সময়ে প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও প্রাগে কবিগুরুর সহিত একই হোটেলে অবস্থান করেন। উইন্‌ট্যরনিট্‌স্ এই সময় সর্বাই ইহাঁদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ের ভ্রমণ বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে প্রাগের সর্বজনসম্মানিত অধ্যাপক উইন্‌ট্যরনিট্‌স্ তাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় প্রেরিত কবিগুরুর ও রামানন্দের চিঠিপত্র পার্শ্বেল প্রভৃতি একটি বৃহৎ ব্যাগে স্বয়ং বহন করিয়া আনিতেন (দ্রঃ—সম্পাদকের চিঠি, প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৪)। প্রাগে কোন ভারতীয় ছাত্র উপস্থিত হইলে অধ্যাপক উইন্‌ট্যরনিট্‌স্ তাঁহার প্রতি অনুরূপ স্নেহ ও আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন।

উইন্‌ট্যর্‌নিটস্ কবিগুরুকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহার পরিচয় তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নিম্ন লিখিত উৎসর্গ পত্র হইতে বুঝা যাইবে।

To Rabindranath Tagore, The great poet, educator and lover of men, This English version of the History of Indian Literature is dedicated as a token of loving admiration and sincere gratitude of the author.

উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া জার্মান ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকাটি কবির পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের শ্রদ্ধার্ঘরূপে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডাঃ উইন্‌ট্যর্‌নিটস শুধু ভারত তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন না, মানব প্রেমিক হিসাবে তিনি বিশ্বে সুপরিচিত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিও তিনি গভীর শ্রদ্ধার পোষণ করিতেন ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধ ও অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী ছিলেন। ইউরোপের শান্তিবাদী সংস্থা ও সম্মেলনগুলি তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিত। বৈদিক

সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির ফলে নারীজাতির প্রতি বৈদিকঋষিদের সমদৃষ্টি ও শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নারীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে সকল আন্দোলনেরই তিনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি বৈদিক ধর্মে নারী জাতির অবস্থা সম্বন্ধে একটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন (১১)।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উইন্‌ট্যারনিট্‌স্‌ পুনরায় প্রাগে তাহার স্ব-পদে যোগদান করেন। সম্যগ্‌রূপে ভরতচর্চার সুবিধার্থ তিনি "আর্কিভ ওরিয়েন্টিল" নামে একটি পত্রিকা প্রবর্তন করেন। এই পত্রিকায় এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে প্রকাশিত প্রাচ্য-বিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড বৌদ্ধও জৈনসাহিত্যের উপর লিখিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং ইহাদের মাধ্যম পালি ও প্রাকৃত ভাষায় উইন্‌ট্যরনিট্‌সের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস রচনা ব্যতীত তিনি বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার কয়েকটি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন (১২)। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ধর্মসংক্রান্ত কোষ গ্রন্থের বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় খণ্ডটি ডাঃ উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ কর্তৃক লিখিত হয় (১৩)। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম সম্বন্ধে ও উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ বহু প্রবন্ধ রচনা করেন, ইহার মধ্যে "দি জৈনস ইন্‌ দি হিষ্ট্রি অফ্‌ ইণ্ডিয়ান লিটারেচর" প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (ইণ্ডিয়ান্‌ কালচার ১৯৩৪)। জীবনের শেষ দিকে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ তন্ত্র শাস্ত্র ও যোগ বাশিষ্ঠের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের পত্নীর (দ্বিতীয়া) মৃত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগী বন্ধুরা তাঁহার সম্মানার্থে একটি স্মারক গ্রন্থ (ফেষ্টস্ক্রিপ্ট) প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষ্যে উইন্‌ট্যারনিট্‌স্‌ প্রবর্তিত 'আর্কিভ ওরিয়েন্টেলনির' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৩৫ বৎসর কাল অধ্যাপনার পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ প্রাগ্‌ নগরীকে ভারতবিদ্যাচর্চার একটি মুখ্য কেন্দ্রে পরিণত করেন। অবসর গ্রহণের পরও উইনট্যরনিটস নিজের বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। উইন্‌ট্যরনিট্‌স সারা জীবনে প্রায় পাঁচশত পুস্তক ও নিবন্ধ রচনা করেন, ইহার মধ্যে ভারততত্ত্ব ব্যতীত ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত রচনাও ছিল। মানব জাতির ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার ভারততত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য রচনার উপজীব্য বিষয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারীতে উইন্‌ট্যর্‌নিটস্‌ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাগে পরলোক গমন করেন। জানুয়ারী মাসের শেষ দিবসে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইলে আশ্রমের সকলেই এই দুঃসংবাদে বিশেষ দুঃখিত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘদিনের সুহৃৎ ও সমমর্মী সহকর্মীর মৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হন (দ্রষ্টব্য-রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়।) কবি উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের ভগ্নীর নিকট সমবেদনা সূচক একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার দীর্ঘজীবনে সমগ্র বিশ্বপরিক্রমায় এমন একজনও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন নাই, যাঁহার অপেক্ষা অধ্যাপক উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ কম শ্রদ্ধার যোগ্য। তিনি আরও লেখেন যে অধ্যাপকের মৃত্যুতে তিনি একজন অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত অনুগামী হারাইলেন আর ভারতবর্ষ হারাইল একজন বরেণ্য প্রকৃত পণ্ডিত।

উইন্‌টার্‌নিট্‌সের মৃত্যুতে মানব সমাজ হইতে একজন দরদী মানব প্রেমিকের অন্তর্ধান ঘটিল। *

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি পত্রিকার উইন্‌টার্‌নিটস্‌ স্মৃতি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী প্রেরণ করেন। ইহাতে কবি লেখেন যে গভীর ও উদার মানব প্রেম, বিস্ময়জনক পাণ্ডিত্য, এবং যে ভাবে তিনি মধ্য ইউরোপের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সাহস ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে আপন আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন তাহার জন্য আমাদের পরমতম শ্রদ্ধা তাঁহার (উইন্‌টার্‌নিট্‌সের) প্রাপ্য।+

উইন্‌টার্‌নিট্‌সের মৃত্যুতে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এক মহাগৌরবময় যুগের অবসান হয়। আচার্য সিলভাঁ লেভির মৃত্যুর পর উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যা মহারথীদের তিনিই ছিলেন সর্বশেষ প্রতিনিধি।

*"During my long life and extensive travels I never met a savant more worthy of respect than the learned Doctor.....In him, I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friend and humanity one of its most sincere champions"—Rabindranath Tagore.

†"The news of the sudden passing away of Dr. Winternitz were most painful to us, who were used to looking upon him as one of the truest and most respected friends of India in the outer world. His deep and broad humanity, brightened as it was with his amazingly wide scholarship, his devotion to truth and the courage with which he held fast to his idealism in the midst of a glowingly hostile atmosphere in central Europe, are his claims to our homage"—Winternitz Memorial No. Indian Historical Quarterly, 1938, Calcutta.

(১) Ancient Indian Marriage Ritual according to Apastamba compared with the marriage customs of Indo European people.

(২) Apastambiya Grihya Sutra with extracts from commentaries of Haradatta and Sudarsana, Vienna, 1887.

(৩) Catalogue of Sanskrit Mss in the Bodleian Library, Vol. II, Oxford, 1905.

(৪) A catalogue of South Indian Mss belonging to Royal Asiatic Society, London, 1902.

(৫) The Mantrapatha or the prayer book of Apastambin with English Translation, Oxford, 1897.

(৬) A general index to the names and subjects matter of the Sacred Books of the East Series, Oxford, 1910 (Vol. 50 in the Series) Re-issued in 1925 under title—A Concise Dictionary of Eastern Religion.

(৭) Geschite der Indischen Litteratur (3 Vols.), Leipzig, 1908-1922.

(৮) History of Indian Literature (Calcutta University, Vol. I, 1927; Vol. II, 1933, Vol. III 1959).

(৯) Some problems of Indian Literature, Calcutta University, 1925.

(১০) Rabindranath Tagore. Religion und Wetanschaung, Prague, 1936.

(১১) Die Frau in Brahmanismus, Leipzig, 1920.

(১২) Der Mohayana Buddhism, Tubingen, 1930.

(১৩) Der aeltre Buddhismus nach Texten des Tipitaka. [Ed. by A. Bertholet] Tubingen, 1908, 1929.

রামেন্দ্রসুন্দর ও বাঙালী সমাজ-মন

অলোক রায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনা সম্বন্ধে আমাদের সহজ সংস্কার এই-যে, বৈজ্ঞানিক মনন সম্পন্ন পদার্থবিদ নির্লিপ্ত নিরাসক্ত জিজ্ঞাসায় সরল স্বচ্ছ ভাষায় প্রবন্ধ লিখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। বর্তমান কালে রামেন্দ্রসুন্দর বহু-আলোচিত লেখক নন—তা সত্ত্বেও বিরলদৃষ্ট যে সকল আলোচনা এযাবৎ হয়েছে তাতে সর্বত্রই রামেন্দ্রসুন্দরের নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধের সাহিত্যিক গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু যুগ ও দেশের পটভূমিকায় রামেন্দ্রমানসের সামগ্রিক পরিচয় লাভের চেষ্টা করা হয়নি।

রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই তিনি 'ভারতী' 'সাধনা' ও "সাহিত্য" পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। বিভিন্ন সময় লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলি পরে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়; প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), কর্মকথা (১৯১৩), চরিত কথা (১৯১৬) ও শব্দ কথা (১৯১৭)। তাঁর মৃত্যুর পর 'বিচিত্র জগৎ', 'যজ্ঞকথা', "জগৎ কথা" ও "নানা কথা" প্রকাশিত হয়। তিনি শেষ জীবনে ঐতরেয় ব্রাহ্মণেরও বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের কোনো আত্মজীবনী নেই। তাঁর মনোজগতের বিভিন্ন পটপরিবর্তনের ইতিহাসও আমাদের অজানা। তবে তাঁর সমসাময়িক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে এবং তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমাদের মনে হয় যে প্রথম জীবনে তিনি চিত্তসংকটের রুধিরাক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু এই নাস্তিবোধে যাত্রা সুরু হলেও অস্তিবোধেই তিনি মানস-পরিণতি লাভ করেছেন। অবিশ্বাসী এবং সংশয়ী মন বিশ্বাস এবং হিন্দুত্বের শান্ত উপলব্ধিতে আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি'র সকল প্রবন্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক এবং 'জিজ্ঞাসা'র অর্ধেক প্রবন্ধ ও তাই। এই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি তাঁকে জিজ্ঞাসু করেছিল, সংশয়ী করেছিল এবং ক্রমেই নৈরাজ্যবাদী করে তুলেছিল। কিন্তু সত্যানুসন্ধানই 'জিজ্ঞাসা'র শেষের দিকের প্রবন্ধ-গুলিতে বস্তুসত্তার অতীত এক অমূর্ত জগতের চিন্তা এনে দিয়েছে,—এবং ক্রমে রামেন্দ্রসুন্দর ভাববাদী দার্শনিকের ভূমিকাগ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও 'কর্ম কথা'য় স্পষ্টই রামেন্দ্রসুন্দর 'বিধি এবং নীতি'র মূলসূত্র নিয়ে বেশি চিন্তিত—এবং বলাই বাহুল্য এখন থেকে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হলো 'কি হয়েছে নয়, কি হওয়া উচিত' তাই। এর মধ্যে সমাজ এবং ব্যক্তির সমস্যা প্রাধান্য পেলেও মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের অনুশীলনতত্ত্বের মতই এ একটা 'মূর্তিমান থিওরি' হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের "চরিত কথা' গ্রন্থটির কিছু বিস্তৃত আলোচনা করবো। এই গ্রন্থটিকে বিশেষ করে বেছে নেওয়ার কারণ, 'চরিত কথা' রামেন্দ্র সুন্দরের পরিণত মননের সৃষ্টি,—তাঁর রচনাবলীর কেন্দ্রস্থলে অবিস্থিত। এবং 'চরিতকথা'র প্রবন্ধগুলি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য রচিত হওয়ার ফলে এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরকে কিছুটা পরিমাণে আবিষ্কার করা সম্ভব। অন্যথায় তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-গুলির মধ্যে প্রাবন্ধিক-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ স্বল্পই লক্ষিত হয়।

'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্‌ময় জগৎ, প্রাণময় জগৎ, প্রজ্ঞার জগৎ, প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির সঙ্গে 'জিজ্ঞাসা'র অনেক প্রবন্ধের সাদৃশ্য আছে। তবে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রের তাড়নায় লিখিত ও প্রকাশিত হওয়ার ফলে তার মধ্যে মানসিক ধারাবাহিকতা আবিষ্কার সহজ নয়। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত অসমাপ্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যে পরিণত রামেন্দ্র সুন্দরকে স্পষ্ট চিনতে পারা যায়। প্রধানতঃ যজ্ঞের দার্শনিকতত্ত্ব আবিষ্কারেই তিনি অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯১১ খৃীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত রামেন্দ্র সুন্দরের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র বঙ্গানুবাদও উল্লেখ্য। তখন থেকেই বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে যে গভীরতর সত্য নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, তার আলোচনা সুরু করেন।

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রামেন্দ্র সুন্দরের শেষ পর্বের রচনাবলী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—'রামেন্দ্রবাবু কেমন করিয়া বৈদিক যুগের কথা, বিশেষতঃ যজ্ঞের দার্শনিকতত্ত্ব এমন সুন্দর ভাবে বলিতে পারিতেছেন! আমি যখন কলেজে কাজ করি, তখন তাঁহাকে প্রায় নাস্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, এখন তিনি হার্বার্ট্ স্পেন্সার হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা রামেন্দ্র সুন্দরকে পত্রে লিখেছিলেন—"গোল্ডস্মিথ লিখেছে 'England with all thy faults I love thee still.' আমি তেমনি বলতে পারি 'Trivedi with all thy doubtings and floutings I love thee still'। তার সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই যে—doubtগুলো উপড়ে ফেলে cultivate faith and hope—আমাদের পুরাণ শাস্ত্র কথা will help 'you to do thiswith greatest facility।" পরে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র অনুবাদ প্রকাশিত হলে দ্বিজেন্দ্রনাথই রামেন্দ্রসুন্দরকে "ধন্য ধন্য" জানিয়েছেন।

রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনীকার এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল সমসাময়িক সকলেই নানা প্রকারে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, শেষ জীবনে রামেন্দ্র সুন্দর ক্রমেই ভক্তি পরায়ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আগেই বলেছি, এসম্বন্ধে বাইরের প্রমাণ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিগত মনোজগতের সাক্ষ্য পাওয়া বর্তমানে অসম্ভব। কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতেই হয় যে, 'প্রকৃতি'র 'কোয়েস্ট ফর আননোন', 'যজ্ঞকথা'য় "কনকোয়েণ্ট অফ আলটিমেট্ রিয়ালিটি"তে শেষ হয়েছে।

এখন এই পরিণতি ধারা বা পরিবর্তনের ইতিহাস ব্যক্তি উপলব্ধি নির্ভর অথবা সামাজিক প্রতিফলন সঞ্জাত, তা লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন—'রামেন্দ্র সুন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার।' শব্দচয়নে এই মন্তব্যটি কৌতুকের উদ্রেক করলেও এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন 'খাঁটি বাঙালী', যে বাঙালীত্বের গর্ব করেছে, উনিশ শতকের শেষের দিকের এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের সকল বাঙালী মনীষী। সংস্কারে আচরণে, মননে এবং জীবনচর্যায় এই বাঙালীত্বকে রামেন্দ্রসুন্দর সারাজীবন অক্ষুন্ন রেখেছেন। ইংরেজীতে একেই হয়তো একধরণের 'পিউরিট্যানিজ্‌ম' বল্‌তে পারি, যদিও নিন্দার্থে নয়। পণ্ডিত জানকীনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়—'তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার আত্মসংযম ও তাঁহার নম্রতা, তাঁহার রচনারীতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। এগুলি যেমন তাঁহার ব্রতসাধনপক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, তাঁহার প্রকৃতির পক্ষেও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি যে ভাবে অল্প বয়স হইতে অনুরাগ বশবর্তী হইয়া জীবনের একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভা ও বেষ্টনীর সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া যেরূপ অবিচলিত ভাবে এই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা

প্রণিধান করিলেই তাঁহার জীবন ও কীর্তিকলাপের অর্থ পাওয়া যায়।'

॥ দুই ॥

রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয়তো মোটের ওপর পাওয়া গেল, এবার ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ মানসের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছর ইংরেজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়, শান্তি স্থাপনে শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপৃত থেকেছেন, এবং বাঙালী ক্রমশঃ বিদেশী শাসনের অনিবার্যতায় অভ্যস্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংঘাতে বাঙালী-চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি হোলো—এই আলোড়নকেই আজকাল ভুল করে রেনেসাঁস নাম দেওয়া হয়েছে। নামকরণে ভুল হলেও মূল সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালী মনে এক অদ্ভুত কর্মোৎসাহ দেখা দিয়েছিল, যার ফলে সমাজ সংস্কার সুরু হোলো, রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্‌লো এবং সর্বোপরি সাহিত্যে নতুন যুগের সৃষ্টি হোলো। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করবো একটা বাঁধ ভাঙা, বাঁধন না মানা প্রচণ্ডতা। এবং কয়েক শতাব্দীর নির্জীবতা, মৃতপ্রায় স্থানুত্বের পর এই জাগরণের প্রয়োজন ছিল। বলাবাহুল্য ভাঙনের প্রবল স্রোতেই সমাজ ও সাহিত্যের সর্বত্র পরিবর্তন পেয়েছি—এবং রামমোহন রায়, ইয়ংবেঙ্গল এমন কি বিদ্যাসাগরে পর্যন্ত, সর্বত্র প্রাচীনকে যাচাই করে নেওয়া, নতুনকে সাদরে বরণ করা, সংস্কারকামী চিন্তা এবং কিছুটা বিদ্রোহাত্মক জীবন চেতনা লক্ষ্য করেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের এই আলোড়নকে যদি আমরা নদীর জোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিই, তাহলে বলবো, দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই ভাঁটা সুরু হয়ে গেছে। জোয়ারের স্রোতে যেমন প্রচণ্ড গতি এসেছিল, সেই সঙ্গে অনেক আবিলতাও এনেছিল। এই প্রচণ্ড গতির মুখে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করার অবকাশ খুব কমই ছিল—তখন তাই তর্ক বিতর্ক সংগ্রামপ্রিয়তায় সমাজমন চঞ্চল। ভাঁটার সময় শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন বাঙালী আবার ফিরে পেল—এবং ক্রমে চিন্তার প্রাধান্য, দর্শনের উপস্থাপনা, চিত্তের স্থৈর্য বাড়তে লাগলো। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই এই যুগের সুরু।

অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী ব্যক্তি ছিলেন না এমন নয়, আবার দ্বিতীয়ার্ধেও চঞ্চল আন্দোলনপ্রিয় ব্রাহ্মনেতাদের লক্ষ্য করেছি। আসলে এই যুগ বিভাগ নিতান্তই প্রবণতার প্রাধান্যবিচারে।

বঙ্কিমযুগ যদিও সুরু হয়েছে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে, তবুও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভাঁটার পরিপূর্ণ রূপ চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোধর্মে নানা ঘাতপ্রতিঘাত থাকায় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশ্লেষণ অসম্ভব। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের একটা পুনরভ্যুত্থান দেখা দেয়। অনেক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, যে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বর্তমান ছিল;—কিন্তু আবার বলি, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের যাঁরা প্রধান পুরুষ, হিন্দুত্ব বা বাঙালীত্বই তাঁদের প্রধান পরিচয় নয়। তাঁরাও দেশকে ভালোবাসতেন—সকলেই নাস্তিক ছিলেন তাও নয়। কিন্তু তাঁদের প্রধান পরিচয় সংস্কারক রূপে। রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল নেতৃবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, এমনকি মাইকেল মধুসূদনেরও এইই প্রধান পরিচয়। কিন্তু হিন্দু পুনরভ্যুত্থান যুগে বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মনীষী চিন্তানায়কদের দল হিন্দুধর্মের দিকে অস্বাভাবিক রকম ঝুঁকে পড়েন—এবং আর্যত্বের অহমিকায় সত্য-মিথ্যার জ্ঞান হারান। অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের উদাহরণ নিয়েই বলা ভালো যে, বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী, 'সাম্য' গ্রন্থের লেখক যখন শেষ পর্যন্ত

'অনুশীলন তত্ত্ব' প্রচার করছেন তখন মূল পরিবর্তন এই যে, আদর্শ সর্বস্ব অবাস্তব ভাববাদী ধর্মদর্শনে বাঙালী বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এই যুগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই অসাধারণ মনীষা বলে নিজেকে যথাসাধ্য হিন্দুধর্মের রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যথায় তাঁর সমসাময়িক বাঙালী কেউই প্রায় নিজেকে অকলঙ্ক রাখতে পারেন নি। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকজনের নাম করতে পারি—শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজনারায়ণ বসু, (১৮২৬-৯৯), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বীরেশ্বর পাঁড়ে, পূর্ণচন্দ্র বসু, নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। (এ ছাড়া কবিতা, উপন্যাস এবং নাটক রচনার ক্ষেত্রে অন্য বহুতর লেখকের উল্লেখ সম্ভব)॥

॥ তিন ॥

আমরা দেখেছি রামেন্দ্রসুন্দরের অধিকাংশ প্রবন্ধ রচনার কাল এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর। এবং সম্পূর্ণ যুক্তি-অনুমোদিত পথেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে রামেন্দ্রসুন্দরের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন নির্মোহ সংশয়ী চিন্তানায়কও ধীরে ধীরে যুগানুবর্তী হয়েছেন। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দেওয়ার পূর্বে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়, যার সাহায্যে রামেন্দ্র সুন্দরের গভীর স্বদেশানুরাগ, স্বধর্ম প্রীতি এবং স্বাজাত্য বোধ প্রমাণিত হবে। (দ্রঃ আশুতোষ বাজপেয়ী লিখিত রামেন্দ্র সুন্দরের জীবনগ্রন্থ)। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মী ব্রতকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিণত মননধারা স্পষ্ট লক্ষ্য করি : 'মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না, ও পরের ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটো বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো।..ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।' এই ব্রতকথার আন্তরিক ভাবালুতা বাদ দিলেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কোনো অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যিকের লেখনী থেকেও এর সৃষ্টি সম্ভব নয়। অবশ্য অতীত ভারতবর্ষের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মণত্বের সহজাত অহংকার বোধ পূর্ব থেকেই তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি,—রবীন্দ্রনাথও তাই লিখেছিলেন : 'তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সঙ্গে তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞান গাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সঙ্গত হইয়াছিল।'

আমরা এইবার 'চরিতকথা' গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে যুগানুগত রামেন্দ্রসুন্দরের মানসিকতা বিশ্লেষণ করবো। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মনীষীর চরিতকথা এখানে বর্ণিত হয়েছে: এ গুলির রচনাকাল ১৮৯৬-১৯০৬ খৃীষ্টাব্দ॥ বর্তমান প্রবন্ধগুলি রচনার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক সুলভ তথ্যপ্রিয়তা এবং নিরাবেগ প্রকাশ ভঙ্গী লক্ষিত হয় না। বরং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রশস্তি (ট্রিবিউট) রচনার যে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত ছিল জীবনীকারদের সম্মুখে. রামেন্দ্রসুন্দরও সেই পথ গ্রহণ করেছেন। এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাই লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি, শ্রদ্ধা, অনুভূতি প্রধান হয়েছে,—এবং প্রায়শই এই আবেগমুখ্যতা প্রবন্ধগুলিকে সহজে সাহিত্যগুণান্বিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগুলি রচনার মূল উৎস. বাঙালীর সম্মুখে বাঙালীর গৌরব মহিমা দীপ্ত ভাষায় বর্ণন. এবং স্বাজাত্য বোধের প্রকাশ। (চরিত কথায় অবাঙ্গালী চরিত্র দুটি আছে, ম্যাক্সমূলর ও হেলমহোলৎজ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়ার একমাত্র কারণ

ম্যাক্সমুলরের ভারতভক্তি—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা। তবে হর্মান হেলমহোলৎজ-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি স্থানচ্যুত হয়ে এই গ্রন্থে এসে পড়েছে— আসলে 'প্রকৃতি' নামে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংকলনের প্রবন্ধটির প্রথম আবির্ভাব। রচনাকালের দিক দিয়েও এই প্রবন্ধটিকে আমরা 'চরিত-কথা'র বাইরে ফেলেছি।)

অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, রসায়ন বিদ্যা এবং পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক গভীর চিন্তাশীল রামেন্দ্রসুন্দর 'চরিত কথা' গ্রন্থে অন্ধ জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে 'প্রকৃতি' এবং 'জিজ্ঞাসা'র লেখক বিশ্লেষণমুখী ঐহিকতাবাদী ডারউইন-স্পেন্সারের ভক্ত রামেন্দ্রসুন্দরকে 'চরিত কথা' গ্রন্থে কখনো কখনো আবিষ্কার করা যায় না এমন নয়। কিন্তু এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের মনের স্ববিরোধ, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ চিন্তানায়কই এড়াতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, উমেশ বটব্যাল, রজনী গুপ্ত এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই প্রবন্ধগুলি লিখিত। এই প্রবন্ধগুলি থেকে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজ, সাহিত্য, জীবন, ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা জানতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত রেনেসাঁস সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয় : 'একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজকীয় শাসনে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে।....কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।' (বিদ্যাসাগর) কারণ, রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস, বাঙালী চরিত্রে কোনো আত্যন্তিক পরিবর্তন সূচিত হয়নি—বাঙালী আরও বেশী পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। অথ সিদ্ধান্ত : বাঙালীকে 'খাঁটি বাঙালী' হতে হবে, যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর। বলাবাহুল্য 'চরিত কথা'র প্রথম প্রবন্ধ থেকেই এই বাঙালীত্ব চেতনা দেখা দিল।

অন্য প্রবন্ধে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) আরও স্পষ্ট করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন—'আমার বিবেচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না; আমরা স্বদেশীয়কে বিদেশীয় ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না।'—এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য 'এই অস্বাভাবিক প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া' দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় 'উৎকট ত্যাগ স্বীকারে' প্রস্তুত হওয়া। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে রামেন্দ্রসুন্দরের এই আত্মচিন্তা, প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সমাজমনেরই যথার্থ পরিচয়।

বিজ্ঞানের অনেক অংশেই এখনও অপূর্ণতা আছে এবং অধিকতর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণই আমাদের নবতর সত্যের সন্ধান দেবে, একথা রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন না, এমন নয়। কিন্তু আধুনিক সোসিওলজি যে হেতু বাঙালী সমাজের ত্রুটি নির্ণয়েই অধিক তৎপর, তাই সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা যতকম হয় ততই ভালো। রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তি : 'সমাজ তত্ত্ব-সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।' এই ইউটিলিটারিয়ান জীবন দর্শনকেও তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। একমাত্র অধিকাংশ মানুষ যদি ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান সিদ্ধার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কল্যাণ প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে তখন 'রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতি প্রচারক ও ধর্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং

কারাগার ও গির্জা ঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্রশালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ বিশেষের সাক্ষ্য দিবে।' বলাবাহুল্য এই প্রচণ্ড আদর্শবাদিতা, অতীত ভারতবর্ষের দিকে মোহমুগ্ধ দৃষ্টি এবং ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ঘোরাবার সর্বজনীন প্রয়াস, বাংলা দেশে বিশেষ একটি সময়ের মানসপ্রবণতা। হিন্দুদেশাচারগুলির সংস্কারের বিরুদ্ধে রামেন্দ্রসুন্দর যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা আমাদের কমলকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুরের 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র যুক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগরের প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ,—কিন্তু হিন্দুদেশাচারের সংস্কার সাধন সম্বন্ধে তাঁর মত: 'প্রাকৃতিক নির্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সময় সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজশরীরের চিকিৎসক বিস্ফোটক-ভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।' আবার সেই স্ববিরোধ! বঙ্কিমচন্দ্রও এই স্ববিরোধ অতিক্রম করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিশ্লেষণকালে রামেন্দ্রসুন্দরের হার্বার্ট স্পেন্সারীয় জীবনের পারিভাষিক সংজ্ঞা অবলম্বনে 'ধর্মবুদ্ধি' এবং 'লোকস্থিতি'তে পৌঁছুনো নিঃসন্দেহে আমাদের মনে কৌতুক সৃষ্টি করবে। বঙ্কিমের উপন্যাসে 'নৈতিক জীবন' আবিষ্কারের প্রয়াস অবশ্য রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিক ব্যাখ্যা নয়—ঊনবিংশ শতকের দুই দশকে অধিকাংশ সমালোচকই এই পথে এগিয়েছিলেন। এবং স্পষ্টতই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে 'বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন। ও মাতৃমন্দিরে আনন্দ মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।' তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের মানসবিবর্তনধারা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন: "বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু 'প্রচারে'র পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বাদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন।'

বর্তমান প্রবন্ধে স্বতন্ত্রভাবে 'চরিত কথা'র প্রত্যেকটি প্রবন্ধ থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে উমেশচন্দ্র বটব্যালের বৈদিক ভারতবর্ষীয় সম্বন্ধে গবেষণা, রজনীকান্ত গুপ্তের স্বদেশীয় ইতিহাস আবিষ্কারের প্রয়াস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্বের রচনায় প্রকাশিত 'স্বদেশী সৌন্দর্য অনুরাগ ও প্রীতি' যে রামেন্দ্রসুন্দরের সশ্রদ্ধ প্রশস্তি লাভ করবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আসলে রামেন্দ্রসুন্দরেরই ভাষায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাঙ্গালী যে 'আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল' হয়েছিল, 'চরিত কথা'র প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তারই পরিচয় পেয়েছি।

একে রক্ষণশীলতা বা প্রতিক্রিয়াপন্থী মনোভাব বলবো না। আসলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজের উদ্ভবের মধ্যেই যে স্ববিরোধ লুকিয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পনেরো বছরের 'নব্য হিন্দু আন্দোলনে' সেই আদি ও অকৃত্রিম পিছুটানই প্রকাশ পেয়েছে। এই আন্দোলনকে নিন্দা করার প্রশ্ন ওঠেনা। যেমন তথাকথিত 'রেনেসাঁস' নিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করাও অসমীচীন। ইতিহাসের তথ্যকে অবলম্বন করে বাঙ্গালী সমাজ মন বুঝতে হবে, এবং তাহলেই বাঙ্গালী প্রাবন্ধিকের সাহিত্য প্রয়াসেরও প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো॥

অনৌচিত্য ও হাস্যরস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

হাস্যরসের মূল হইতেছে অনৌচিত্য, এবং এই অনৌচিত্য সকল রসের মধ্যেই থাকিতে পারে। রসের মধ্যে কোনও প্রকারের অনৌচিত্য দেখা গেলে তাহা বিভাব, অনুভাব অথবা ব্যভিচারিভাবের মধ্যেও দেখা যাইতে পারে। এজন্য হাস্যরসের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। হাস্যরসের উদ্বোধক কারণগুলি 'আলম্বন' এবং "উদ্দীপন" ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আলম্বন 'অর্থে' চিত্তের হাস্যমূলক বিকারের বিষয়। যেমন হাস্যরসপ্রধান সাহিত্যে বিদূষক হাস্যমূলক বিকারের বিষয়, উদ্দীপনবিভাবগুলি হইতেছে সহকারি কারণ, তাহারা আলম্বন বিভাবের মধ্যে যাহা অস্ফুট এবং অপ্রকাশিত তাহাকে স্ফুট ও প্রকাশিত করিয়া তুলে, এজন্য বলা হয় "উদ্দীপনবিভাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তিসে।" হাস্যরসের উদ্দীপন বিভাব হইতেছে বিকৃত পরবেষ, অলঙ্কার, নির্লজ্জতা, চঞ্চলতা (অর্থাৎ কোনও কার্যে অনভিনিবেশ), অসৎ প্রলাপ (অলীক উক্তি অত্যুক্তি এবং মিথ্যা কথোপকথন), কক্ষগ্রীবা প্রভৃতি স্পর্শ করা, নাসাচক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গবিহীন হওয়া অথবা অধিক অঙ্গ লইয়া জন্মগ্রহণ করা, অপরের দোষের উদাহরণ, যাহার মধ্যে যে দোষ নাই তাহার কীর্তন, রহস্যচ্ছলে কোনও ব্যক্তিকে অলীক ভীতিপ্রদর্শন প্রভৃতি ভরত বলিয়াছেন—"স চ বিকৃত পরবেষালঙ্কার ধার্ষ্ট্যলৌল্যকুহকাসৎপ্রলাপ ব্যঙ্গ-দর্শনদোষোদাহরণাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে।" হাস্য রসসৃষ্টির মূল বৈষম্য অথবা অসঙ্গতি ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই বৈষম্য দেশ, কাল, প্রকৃতি বয়স, অবস্থা এবং চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্য হইতে জন্মলাভ করে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার অভিনবভারতী টীকায় দেশকাল প্রভৃতির বৈপরীত্যের প্রত্যয় উদাহরণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে বেশবাস পরিধান, কেশবন্ধন, অলঙ্কার-ধারণ প্রভৃতির মধ্যে দেশকাল ও বয়স ভেদে কোনও বৈপরীত্য দেখা গেলে তাহা হইতে হাস্য সৃষ্টি হয়।১ যে দেশে যেরূপভাবে বস্ত্র পরিধান করা উচিত তাহা না করিয়া অন্যদেশীয় লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিলে অথবা অলঙ্কার ধারণ করিলে তাহা বৈপরীত্যের জনক হইয়া হাস্যের সৃষ্টি করে। বৈপরীত্য এই সকল ক্ষেত্রে অসঙ্গতির কারক। এজন্য অলঙ্কার মহোদধিগ্রন্থে বলা হইয়াছে—"দেশকাল বয়োবর্ণ বৈপরীত্যাদ বিকৃত বেষেণাদ্যশব্দমর্ত্তনানা গত্যাদ্যনুকরণাদিভির্বিভাবৈর্যুক্তঃ নাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দন দৃষ্টি ব্যাকোশাকুঞ্চনাদীনামনুভাবানাং জন্মকৃত্।" দেশ, কাল, বর্ণ, বয়স প্রভৃতির বৈপরীত্য হইতে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় ইহা স্বীকার করিলে সকল রসই হাস্যরসের বিভাব হইয়া পড়ে। যেমন শৃঙ্গার রসসৃষ্টির উপযোগী যে দেশ, যে কাল, যে বয়স প্রভৃতির প্রয়োজন তাহার মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য দেখা গেলে ২ তাহা হাস্যের বিভাবে পরিণত হয়। এইরূপে করুণ রসের উপযোগী আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপনবিভাবের বৈষম্যে তাহারা হাস্যের বিভাব হইয়া দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি যাহার বন্ধু নহে সে যদি তাহার নিমিত্ত শোক করে তাহা হইলে স্থায়িভাবের উৎপত্তির মধ্যেই অনৌচিত্য থাকায় করুণ রস জন্মলাভ করিবে না এবং সে ক্ষেত্রে করুণরসসৃষ্টির মধ্যে এই বৈষম্য হাস্যেরই জনক হইবে। শৃঙ্গার রসের অনৌচিত্য হইতেও হাস্যের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের নিষ্পত্তিতে কোন প্রকারের অনৌচিত্য দেখা গেলে তাহা হাস্যেরই বিভাবে পরিণত হইবে। উদাহরণস্বরূপে কাব্যাদর্শের নিম্নোক্ত শ্লোক-টিকে বিচার করা যাইতে পারে ঃ —

"ইদমম্লানমানায়াঃ লগ্নং স্তনতটে তব,
ছাদ্যতামুত্তরীয়েণ নবং নখপদং সখি।"

এই স্থলে মানিনী নায়িকা আলম্বনবিভাব, গোপনসম্ভোগের নিদর্শনগুলি উদ্দীপনবিভাব, উপহাসাত্মক মনোবৃত্তি স্থায়িভাব—কিন্তু শৃঙ্গাররসের উপযোগী আলম্বনবিভাব থাকিলেও শৃঙ্গাররস এখানে পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই। রসনিষ্পত্তির বৈষম্যে এস্থলে হাস্যরসেরই সৃষ্টি হইয়াছে। গোপনে প্রণয়নিরতা নায়িকার বাহ্য অভিমান প্রদর্শনে আচরণের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সখীজনের চিত্তে 'হাস'রূপ স্থায়িভাবকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। অর্থাৎ যাহা একস্থানে বিভাব প্রভৃতির সংযোগে রসবিশেষে পরিণত হইতে পারিত তাহাতে কোন প্রকারের অনৌচিত্য তাহাকে হাস্যরসের বিভাবে পরিণত করিয়া তুলে। যেমন রাবণের সীতাবিষয়ক রতিতে সীতার রাবণের প্রতি অনুরক্তি না থাকায় শৃঙ্গার অন্যতরনিষ্ঠ; এজন্য তাহা অনৌচিত্যমূলক। মৃচ্ছকটিক নাটকে রাজশ্যালক শকারের বারাঙ্গণা বসন্তসেনার প্রতি আকর্ষণ অন্যতর আলম্বন-নিষ্ঠ হওয়ায় শৃঙ্গারাভাস এবং অনৌচিত্যমূলক হাস্যের জনক।৩ বসন্তসেনার শকারের প্রতি কোন অনুরাগ নাই কিন্তু শকার মোহবশতঃ বসন্তসেনার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। শকারের নির্বুদ্ধিতা তাহাকে শৃঙ্গারের আলম্বনে পরিণত না করিয়া হাস্যেরই বিভাবে পরিণত করিয়াছে। দেশ, বেষ, ভাষণ, প্রভৃতির অনৌচিত্য যে একরসের বিভাবকে অন্য রসের বিভাবে পরিণত করে তাহা স্বীকার করিয়া ভরত অন্যত্র বলিয়াছেন—

"অদেশজো হি বেষস্তু ন শোভাং জনয়িষ্যতি।
মেখলোরসিবন্ধে চ হাস্যায়ৈবোপজায়তে।" (নাট্যশাস্ত্র অঃ, শ্লো)

যে দেশে যে বেশ প্রচলিত এবং উপযোগী তাহার বিপরীত—যেমন বক্ষে মেখলা পরিধান,—প্রভৃতি হইতে হাস্য সৃষ্ট হয়। শারদাতনয় তাঁহার 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে শৃঙ্গাররস হইতে হাস্যরসের উৎপত্তির ক্রম যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে হাস্যরসের বিভাবগুলির স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভাবপ্রকাশে বলা হইয়াছে —

"জটাজিনধরো ভোগিভূষণঃ সাগ্নিলোচনঃ
ভস্মাঙ্গরাগশ্চ যদা দেব্যা কাময়তে রতিম্।
তদা সখীনাং দেব্যাশ্চ হাসঃ সমুদভূন্মহান্।
তস্মাদ্ধাস্যসমুৎপত্তিঃ শৃঙ্গারাদিতি কথ্যতে।"

শ্লোকাংশের তাৎপর্য হইতেছে যে জটাজূটধারী সর্পভূষণ মহাদেব ধূলিমলিন দেহে যখন পার্বতীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা-প্রকাশ করিলেন তখন পার্বতীর চিত্তে এবং সখীগণের মধ্যেও প্রবল হাস্যের সৃষ্টি হইল; অতএব শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উৎপত্তি হইল। এই আখ্যানকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মহাদেবের চিত্তে পার্বতীসম্পর্কীয় রতির উদয় হইলেও শৃঙ্গাররসের সৃষ্টির উপযোগী উদ্দীপন বিভাব প্রভৃতি নাই। অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের সৃষ্টি করিতে গেলে যেরূপ উজ্জ্বলবেশ, মনোহরপ্রাকৃতিক দৃশ্য, নরনারীর অনুরাগমূলক আচার ব্যবহার প্রভৃতির আবশ্যকতা তাহা নাই। সর্প এবং অগ্নি কখনই অনুরাগকে জাগাইতে পারে না এবং শৃঙ্গারের উদ্দীপক হইতে পারে না। সুতরাং উদ্দীপনবিভাবের মধ্যে অনৌচিত্য বর্তমান থাকায় এবং অনুচিত রতি জন্মলাভ করায় সমগ্র পরিবেশ হাস্যরসেরই বিভাবে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো" নামক প্রহসন হইতে শৃঙ্গারের অনৌচিত্য হইতে কিরূপে হাস্যরস জন্মলাভ করে তাহা দেখান যাইতে পারে। কৃপণ ও স্বার্থপর জমিদার রাজীবলোচন বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। পল্লীর যুবকগণের মধ্যে একজন কন্যাবেশে সজ্জিত হইয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত

হয়। ছদ্মবেশী পাত্রীর সহিত বৃদ্ধের বিবাহের অভিনয় সমাপ্ত হইলে বাসরগৃহে বৃদ্ধ রাজীব কন্যার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার চেষ্টা করিলে বধূবেশী যুবক রতা রাজীবের কর্ণ বিমর্দন করিয়া দেয়। তখন রাজীবের আর্তনাদ ও মোহভঙ্গ পাঠকও দর্শকের নিকট সমভাবেই হাস্যের জনক হইয়া উঠে। এই স্থলে বৃদ্ধ রাজীবের বয়স, আকৃতি এবং বিবাহের উন্মত্ততা—কোনো-টিই শৃঙ্গার রসের উপযোগী উদ্দীপনাবিভাবের সৃষ্টি করে না। এবং তথাকথিত বিবাহের অনুষ্ঠানের পর নিভৃত আলাপের স্থলে কর্ণবিমর্দন—ইহাও শৃঙ্গারের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আনিয়া দেয়। সুতরাং বয়স, আকৃতি, আচরণ, পরিবেশ—সকলের মধ্যেই বৈষম্য বর্তমান থাকায় সমগ্র পরিবেশ শৃঙ্গারের অনৌচিত্যের সূচক হইয়া দাঁড়ায়। শৃঙ্গারের অনৌচিত্য এই রূপে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। "মানসী" কাব্যগ্রন্থে 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' শীর্ষক কবিতাও বর কন্যার মধ্যে বয়সের ব্যবধান এবং তজ্জনিত অনুরাগের বৈষম্যের নিমিত্ত শৃঙ্গারাভাসের সৃষ্টি করে। শৃঙ্গারাভাস এই ক্ষেত্রে লঘু কৌতুকের জন্ম দেয়। শৃঙ্গাররস ও হাস্যরসের সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করিতে যাইয়া ভরত বলিয়াছেন—"শৃঙ্গারানুকৃতি র্যাতু স হাস্য ইতি কীর্তিতঃ।" অভিনবভারতীতেও বলা হইয়াছে "শৃঙ্গারানুকৃতিরিত্যত্র তু শব্দোবীপ্সায়াম্। দ্বিতীয়ো হেতৌ, তেনৈবং যোজনা, যা অনুকৃতিঃ স হাস্যো যতঃ প্রকীর্তিতঃ এবং বিভাবকো হাস্য ইতি শেষঃ।" শৃঙ্গারানুকৃতি বা শৃঙ্গারাভাস হইতে হাস্যের সৃষ্টি হয়। অনুকৃতি বলিতে অমুখ্যতা বা আভাস প্রভৃতি অর্থ সূচিত হয়। এজন্য শৃঙ্গারানুকৃতি বলিতে শৃঙ্গাররসের অমুখ্যতা বা আভাস বুঝা যায়। যেখানে যেখানে শৃঙ্গাররসের অসম্পূর্ণতা বা অপরিপুষ্টি সেই সেই স্থলে হাস্যের সৃষ্টি। সুতরাং শৃঙ্গার হইতে হাস্যের উৎপত্তি হয় ইহা বলিলে শৃঙ্গারানুকৃতি হাস্যের জনক এই অর্থ প্রতীত হয়। শৃঙ্গারাভাস এইরূপে হাস্যবিভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে কেবলমাত্র শৃঙ্গারা-ভাসই নহে করুণ রসের আভাস, বীররসের আভাস প্রভৃতিও হাস্যরসের জনক হইতে পারে। হাস্যরসের মূল যে অনৌচিত্য ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে এবং এই অনৌচিত্য সকল রসে, বিভাবে, অনুভাবে এমনকি ব্যভিচারি ভাবেও থাকিতে পারে। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে শান্তরসের আভাসও হাস্যে পরিণত হইতে পারে। হাস্যরসের উৎপাদক কারণগুলিকে বিচার-করিলে সহজেই দেখা যায় যে সকল রসই হাস্যে পরিণত হইতে পারে। ঔচিত্যই হইতেছে রসের প্রাণ সুতরাং অনৌচিত্য রসকে রসাভাসে পরিণত করে। ক্ষেমেন্দ্র একটি সুন্দর উদাহরণে অনৌচিত্য হইতে কিরূপে হাস্য রসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা দেখাইয়াছেন, যেমন —

> "কন্ঠে মেখলয়া, নিতম্বকলকে তারেণ হারেণ বা,
> পানৌ নূপুরবন্ধনেন, চরণে কেয়ূরপাশেন বা,
> শৌর্য্যেণ প্রণতে, রিপৌ করুণয়া, নায়াপ্তি কে হাস্যতাম্,
> ঔচিত্যেন বিনা রুচিং প্রতনুতে বালংকৃতির্ণো গুণাঃ,"

অর্থাৎ যদি কেহ কন্ঠে মেখলাদাম পরিধান করে, নিতম্বে মুক্তাহার ধারণ করে, হস্তদ্বয়ে নূপুর এবং চরণে কেয়ূরবন্ধন করে ও প্রণত ব্যক্তির নিকট শৌর্য্যপ্রকাশ এবং রিপুর প্রতি করুণা প্রকাশ করে তাহা হইলে সে অবশ্যই হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়। রসপ্রধান কাব্যে ঔচিত্যই কাব্যের জীবন-স্বরূপ কিন্তু হাস্যরস প্রধান কাব্যে বা সাহিত্যে অনৌচিত্যই তাহার আত্মা, অর্থাৎ অনৌচিত্য হাস্যের পক্ষে উদ্দিত।' রবার্ট ব্রিজেস্ তাঁহার পোয়েটিক্ ডিক্শন্ ইন ইংলিশ প্রবন্ধে ইহাকে "হারমোনাইসিং মিডিয়ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং অন্য স্থলে এই ঔচিত্যকে "কিপিং" নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "But in aesthatics no property is absurd if

itis in keeping' অতএব অনৌচিত্যই হাস্যরসাত্মক নিবন্ধের প্রাণস্বরূপ, এজন্য ধ্বন্যালোকে বলা হইয়াছে—

"চার্বর্ণৌচিত্যমেবৈকা হাসস্যোপনিষৎপরা।
অনৌচিত্যং রসাভাসকাব্যস্য স্থির জীবিতম্। (তৃতীয় উদ্যোত)

অর্থাৎ, অনৌচিত্য সকল রসেরই আস্বাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেও হাস্যরসের ক্ষেত্রে বিঘ্ন উৎপাদন করে না। অন্য রসের পক্ষে যাহা অনুচিত হাস্যের পক্ষে তাহাই উচিৎ এজন্য অনৌচিত্য হাস্যরসের পক্ষে শ্রেষ্ঠ গুণ। এই অনৌচিত্য যে কত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার 'ঔচিত্যবিচার চর্চা'গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছে। ভাবের অনৌচিত্য, চিন্তার অনৌচিত্য, সংস্থান ও সন্নিবেশের অনৌচিত্য, শ্রুতিদুষ্টতা, উপমা প্রয়োগের জটিলতা সকলই একক অথবা মিলিত ভাবে যে কোন সাহিত্যে হাস্যরসের উদ্দীপক। এস্থলে কেবল ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে অন্যান্য সকল রসের আভাসই হাস্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু হাস্যের আভাস হাস্যরসের জনক হয় না। উপযুক্ত বিভাব অনুভাব প্রভৃতির সমাবেশ না হইলে হাস্যরস 'রস'রূপ লাভ করে না। এজন্য অসম্পূর্ণ হাস্য হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে কৌতুকের সৃষ্টি করে মাত্র।

১· দেশকাল প্রভৃতির বৈষম্য হইতে যে হাস্যরসবিভাব জন্মলাভ করে তাহার নিদর্শন রবীন্দ্র-সাহিত্যেও বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যেমন 'শেষের কবিতা'য় অসিতের বেশ এবং আচরণের বর্ণনা তুলনীয়—"স্ল্যাঙ্ বিকীর্ণ ইংরাজী ভাষার উচ্চারণটী বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত—সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।" নিমচাঁদের চরিত্র অথবা কমলাকান্তের নেশাগ্রস্ততা—এই দুইটিই হাস্যরসের উদ্দীপক। শ্রীকান্তে নতুনদার বর্ণনা পরিপূর্ণভাবেই হাস্যরসের বিভাব। চরিত্রের অসঙ্গতি, ব্যবহারের নিষ্ঠুরতা, আকৃতির প্রতীয়মান গাম্ভীর্য কিন্তু অন্তঃসারশূন্যতা—এইগুলি মিলিতভাবে নতুনদাকে হাস্যরসবিভাবে পরিণত করিয়াছে। হাস্যের উদ্দীপক এই সকল কারণের অস্তিত্ব ম্যাকডুগল্ তাঁহার আউটলাইনস্ অব সাইকোলজি গ্রন্থেও স্বীকার করিয়াছেন—"Another great class of things ludicrous are awkward, defective or bizzare modes of attire, of address, of speech......we laugh at all these things."

২· রাজশেখর বসুর 'চিকিৎসাসংকট' গল্পে নন্দবাবুর চিকিৎসার জন্য পত্নীগ্রহণ বয়স ও ঘটনার মধ্যের অসঙ্গতির উপর আলোকপাত করিয়া মৃদু হাস্যের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে হনুমানের পত্নীসংগ্রহের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ এবং পরিশেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসা ইহাও স্বভাব ও আচরণের এবং অনুরাগের বৈষম্য হেতু হাস্যের সৃষ্টি করে।

৩· ধ্বন্যালোকের 'লোচন' টীকায় বলা হইয়াছে—"যথা রাবণকাব্যাকর্ণনে শৃঙ্গারাভাসঃ, যদ্যাপি শৃঙ্গারানুকৃতির্যাতু স হাস্যঃ' ইতি মুনিনা নিরূপিতম, তথাপৌত্তরকালিকং তত্র হাস্যরসত্বম্।" দূরাকর্ষণমোহমন্ত্র' ইত্যত্র তু ন হাস্যচর্বণারসবঃ। অতএব তদাভাসত্বং বস্তুস্তত্র স্থাপ্যতে শুক্তৌ, রজতাভাসবড়। এতচ্চ শৃঙ্গারানুকৃতিশব্দং প্রযুঞ্জানো মুনিরপি।

মনীষী ভল্‌তেয়ার

হরিপদ ঘোষাল

মুখবন্ধ। লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হয়ে ফ্রান্সের চিন্তা রাজ্যে ভল্‌তেয়ারের আবির্ভাব হয়। জীবিত কালে তাঁর কথোপকথন, আলাপ-আলোচনা, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী ও অনুকরণীয় ভাষার জন্য সমসাময়িকদের কাছে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সেই ভাষা নীরব হয়ে গেল। কিন্তু নিরানব্বই খণ্ডে বিভক্ত তাঁর রচনাবলীর প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর অপূর্ব প্রতিভা যে স্বাক্ষর রেখে গেছে দুরন্ত কাল তা মুছে দিতে পারেনি।

তিনি বলেছিলেন, যে কোন শিল্পে সাফল্য অর্জন করতে হলে ভিতরে সয়তান থাকা চাই। একজন সমালোচক বলেছিলেন, তাঁর দেহে সয়তান ছিল। অসংখ্য গুণের সমবায়ে তাঁর প্রকৃতি গঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল, অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, বন্ধুবৎসল এবং শত্রুর প্রতি নির্মম কঠোর। তিনি দেখতে কুৎসিত ছিলেন। অশ্লীলতা, বাচালতা, নীতি-জ্ঞানশূন্যতা, বিবেকহীনতা, এমন কি অসাধুতা প্রভৃতি যুগোচিত সমস্ত দোষে তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর মনের অফুরন্ত শক্তি, তাঁর জ্বলন্ত প্রতিভা এবং তাঁর নানা বিষয়ে বহুমুখী জ্ঞান বিস্ময়ের বস্তু ছিল।

তিনি বলেছিলেন, আমি মনে যা চিন্তা করি কথায় তা প্রকাশ করি। আমার এই নেশা। প্রকৃতপক্ষে তিনি যা ভাবতেন তা বলবার মতো করে বলতেন এবং যা বলতেন সুন্দর করে বল-তেন। অপূর্ব প্রতিভার আলোকপাতে তাঁর ক্রোধ, ব্যঙ্গ ও কৌতুক সুন্দর ও হৃদ্য হয়ে উঠত। ইতিহাসে তিনি ছিলেন মানসিক শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী। সে যুগে তাঁর মতো কঠোর পরি-শ্রমী আর কেউ ছিল না। তিনি বলেছেন, কাজে নিযুক্ত না থাকা এবং মৃত্যু একই কথা। অলস ব্যক্তি ছাড়া আর সকল মানুষই ভালো। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমার কাজের আবশ্যকতা বেড়ে যাচ্ছে। যদি তুমি আত্মহত্যা করতে না চাও, তবে সর্বদা কোন কিছু কাজে নিযুক্ত থাক। তিনি ছিলেন তাঁর শতাব্দীর প্রাণশক্তি। ভিক্টর হিউগো বলেছেন, ভল্‌তেয়ারের নাম করলেই অষ্টাদশ শতাব্দীকে বোঝায়। ইতালিয় গর্ব নবজাগরণ। জার্মানির গৌরব ধর্মান্দোলন। ফ্রান্সের ঐশ্বর্য ভল্‌তেয়ার। তাঁর জন্মভূমির পক্ষে তিনি ছিলেন একাধারে এই সব আর ফরাসী বিপ্লবের অর্ধাংশ। মণ্টেনের এবং রসরাজ র‍্যাফ্যলের ভাবধারার ধারক এবং বাহক ছিলেন তিনি। লুথার, ইরাসমাস, ক্যালভিন বা মেলাংকথনের চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠুরভাবে তিনি সে যুগের কুসংস্কার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

যে অস্ত্রে মিরাবো, ডান্টন এবং রোবস্‌পীয়র অত্যাচারী এবং দুর্নীতিপরায়ণ রাজশক্তির উচ্ছেদ করেছিলেন, তিনি সেই অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যদি কাজ দেখে মানুষকে বিচার করতে হয়, তাহলে ভলতেয়ার ছিলেন আধুনিক ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তিরাশী বৎসর দীর্ঘ জীবনে তিনি তাঁর সময়ের বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করে বিজয়ী বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

জীবদ্দশায় আর কোন লেখক তাঁর মতো এতখানি প্রভাব অর্জন করতে পারেন নি। কার্ব এবং রাষ্ট্রের হাতে তিনি নির্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। তাঁর প্রায় সকল পুস্তক নিষিদ্ধ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি বিবেকানুমোদিত সত্যের পথে চলতে ভীত হন নি। অব-

শেষে রাজা পোপ এবং সম্রাটের গঠিত মন্তব্য তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেছিল। পৃথিবীর অর্ধেক লোক তাঁর প্রতিটি কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত। নীট্সে বলেছিলেন, হাস্য-রসিক দার্শনিকের জন্ম হবে। তাঁর কথা সত্য হয়েছিল ভলতেয়ারের আবির্ভাবে। তাঁর অট্টহাসি ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছিল।

ফিউডাল এবং বুর্জোয়া শাসনের মধ্যবর্তী যুগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্তর্লীন শক্তির বাণীময় রূপ ছিলেন রুসো এবং ভল্তেয়ার। নিঃসর্গের পূজারী রুসো এবং বুদ্ধিমুক্তির দূত ভলতেয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত কৃত্রিম বন্ধনের নির্মমতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত ছিলেন না। বিপ্লবের মতো তাঁরাও ছিলেন সেই অন্তর্লীন শক্তির সন্তান। তাঁরা ছিলেন ফরাসী বিপ্লবরূপ আগ্নেয়গিরির উত্তাপ এবং আলো। প্রথমে চিন্তা, তারপর বিষয়। আগে দর্শন, তারপর ইতিহাস। অবচেতন মনের নির্জ্ঞান ভাব চেতন মনের নিকটে চিন্তার আকার ধারণ করে।

দার্শনিক চিন্তার শক্তি অনস্বীকার্য। কারাগারের লাইব্রেরীতে ভলতেয়ার এবং রুসোর রচনাবলী দেখে চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, এই দুটি ব্যক্তি ফ্রান্স অর্থাৎ আমায় রাজবংশকে ধ্বংস করেছে। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, কালি ও কলমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বুর্বোণরা নিজেদের রক্ষা করতে পারত। মসী বর্তমান সমাজকে হত্যা করবে। ভলতেয়ার বলেছিলেন, পুস্তক পৃথিবী শাসন করে। যে সকল জাতির লিখিত ভাষা আছে তাদের উপর লেখনী প্রভুত্ব করে। শিক্ষা মনের বন্ধন ঘুচায়। জাতি যখন চিন্তা করতে আরম্ভ করে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। ভলতেয়ারের আবির্ভাবের সঙ্গে ফ্রান্স চিন্তা করতে শিখেছিল।

জন্ম ও শিক্ষা। ১৬৯৪ সালে প্যারিসে ভলতেয়ারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা সরকারী দলিল লেখক ছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল। তাঁর মা সম্ভ্রান্ত বংশের দুহিতা ছিলেন। পিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বদমেজাজ এবং মাতার চাপল্য ও বুদ্ধিমত্তা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁর মাতার মৃত্যু ঘটে। ধাত্রী ভেবেছিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি এবং দুর্বল শিশুটি একদিনের বেশি বাঁচবে না। তাঁর একটু ভুল হয়েছিল। শিশুটি প্রায় চুরাশী বৎসর জীবিত ছিল। পীড়া-জীর্ণ দুর্বল দেহ তার মনের অজেয় শক্তি প্রকাশের অন্তরায় হয় নি।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরমাণ্ড প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁর বাবা বলেছিলেন, আমার দুটি ছেলেই নির্বোধ। এদের মধ্যে একজন পদ্য আর একজন গদ্য লেখে। নাম লিখতে পারার সঙ্গে ভলতেয়ায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন দেখে তাঁর বিষয়ী পিতা বুঝেছিলেন, যে তাঁর দ্বারা কোন কিছু ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নগরের এক গুণমুগ্ধ বারবণিতা যুবক ভলতেয়ারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। মৃত্যুর সময় পুস্তক ক্রয়ের জন্য তিনি ভলতেয়রকে দু হাজার ফ্রাঙ্ক দান করে যান। সেই অর্থে তিনি যে সকল পুস্তক ক্রয় করেন তাতে তাঁর প্রথম শিক্ষা হয়। এক চরিত্রহীন যাজক তাঁকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে তোলে। যেসুইটদের কাছে তিনি তর্কশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি সুনিপুণ তার্কিক হয়ে ওঠেন।

যখন ছেলেরা বাল্যপ্রকৃতির আবেগ উন্মুক্ত স্থানে খেলাধুলা করত, যখন তারা প্রকৃতি জননীর ওপর সহস্র রকমের দৌরাত্ম্য করে শরীরের পুষ্টি সাধন এবং মনের আনন্দ ভোগ করত, তখন ভলতেয়ায় পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্রের আলোচনায় মসগুল থাকতেন। ক্রমে জীবিকা

অর্জনের বয়স উপস্থিত হল। পিতার মত জানা সত্ত্বেও যেন তার মনে কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁকে জানালেন যে তিনি সাহিত্যচর্চাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করবেন। পিতা বলেছিলেন, যে ব্যক্তি সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, সে সমাজে অকেজো এবং পরিবারের ভারস্বরূপ হয়। পিতার ঘোর আপত্তিসত্ত্বেও তিনি সাহিত্যকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করলেন। কিন্তু সাহিত্যিকের শান্তভাব এবং পাঠানুরাগ তাঁর ছিল না। আমোদ-প্রমোদকারীদের সংগে হৈ-হল্লা করে আড্ডা দিয়ে তিনি অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরতেন। উচ্ছৃংখল যুবককে সংযত করার জন্য পিতা তাঁকে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে গৃহে আবদ্ধ রেখে তাঁর উপর কড়া নজর রাখতে আত্মীয়কে অনুরোধ করলেন। কিন্তু অভিভাবক তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। পিতা তাঁকে হেগে নির্বাসন দিয়ে তাঁর উপর কড়া নজর রাখার জন্য সেখানকার ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু যুবক সেখানে একটি রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে গোপনে তার সংগে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলেন। তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রত্যেক প্রেমপত্রে লেখা থাকত, আমি তোমাকে চিরদিন ভালোবাসব।

তাঁর গোপন প্রেমাভিনয় আবিষ্কৃত হওয়ার পর তাঁকে স্বগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি প্রেমিকাকে একেবারে ভুলে গেলেন।

রাজদরবার ও ব্যাষ্টিল বাস। চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর সময় তিনি প্যারিসে উপস্থিত হলেন। পরবর্তী সম্রাট শাসনকার্যে অনুপযুক্ত ছিলেন। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা একজন রাজপ্রতিনিধির হাতে আসে। ভলতেয়র উচ্ছৃংখল সম্রাটের সহযাত্রী হলেন। কিন্তু প্রতিভা কখনও ভস্মচ্ছাদিত থাকে না। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। ব্যয় সংকোচের জন্য রাজপ্রতিনিধি সম্রাটের আস্তাবলের ঘোড়ার সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন শুনে ভলতেয়র বলেছিলেন, রাজদরবার থেকে কতগুলো গাধাকে দূর করে দিলে বেশি বুদ্ধির কাজ হত। যে সকল নোংরা কথা নিয়ে প্যারিসের লোক কানাঘুষা করত তার দায়িত্ব তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। রাজপ্রতিনিধি জোর করে সিংহাসন দখল করতে চাচ্ছেন, এই বিষয় নিয়ে তাঁর লেখা দুটি কবিতাও দুর্ভাগ্যবশত গোপন আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কবিতা দুটি রাজপ্রতিনিধির রোষ উদ্রেক করে। একদিন নগরের একটি উদ্যানে ভ্রমণের সময় দুজনের সাক্ষাৎ হয়। রাজপ্রতিনিধি তাঁকে বলেছিলেন, আমি শপথ করে বলছি আমি তোমাকে এমন একটি স্থান দেখাবো যা তুমি ইতিপূর্বে কখন দেখনি। ভলতেয়র জিজ্ঞাসা করলেন সেটি কোন স্থান? উত্তর এলো, ব্যাস্টিল। পরদিন ভলতেয়র সেই স্থান দর্শন করলেন।

ব্যাষ্টিলে বাস করার সময় তিনি যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন সেই নামে তিনি জগতে পরিচিত। ব্যাষ্টিল কারাগারে তাঁর অন্তর্নিহিত কবিত্বের স্ফুরণ হয়। সেখানে এগারো মাস অবস্থান কালের মধ্যে তিনি হেনরিয়াডি নামে একখানি সুদীর্ঘ উচ্চস্তরের মহাকাব্য রচনা করেন। রিজেণ্ট তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে কারামুক্ত করেন এবং মাসহারা ব্যবস্থা করে দেন। ভলতেয়র রিজেণ্টকে একখানি চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কারাগার থেকে রঙ্গমঞ্চ। কারাগার থেকে তিনি যেন এক লম্ফে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। ১৭১৮ সালে 'ইডিনি' নামে তাঁর একখানি বিয়োগান্ত নাটক একাদিক্রমে পঁয়তাল্লিস দিন অভিনীত হয়। তার বৃদ্ধ পিতা তাঁকে তিরস্কার করার জন্য এসে অভিনয় দেখেন। পুত্রের নাট্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মনের আনন্দ গোপন করার অছিলায় বলেছিলেন—এই সেই পাজি ছেলেটা! এই সেই পাজি ছেলেটা!

নাটকের ভিতরও তিনি নিজের মনোভাব গোপন করেন নি। একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন, সাদাসিদে মানুষ যা ভাবে পুরোহিতরা তা নয়। তাদের পাণ্ডিত্য আমাদের

অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এক স্থানে বলা হয়েছে—আমরা যেন নিজেদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে নিজেদের চোখ দিয়ে যেন সব দেখি।

এই নাটকের অভিনয় থেকে চার হাজার ফ্রাঙ্ক তাঁর হাতে আসে। এই টাকায় তিনি গভর্ণমেন্টের একটা লটারির সমস্ত টিকিট ক্রয় করে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। অর্থশালী হওয়ার সঙ্গে তিনি আরও উদার হন এবং বহু লোকের আশ্রয় হয়ে ওঠেন। তাঁর দ্বিতীয় নাটক ব্যর্থ হয়। তারপর কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসেন। তাঁর প্রথম নাটকের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হয়। ক্রমে তিনি ঐতিহ্যানুগত ইয়োরোপীয় বৈদগ্ধ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী হন। সমাজের উপরতলায় মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে তাঁর আট বৎসর কাটে। কিন্তু বড়োর পিরীতি বালির বাঁদ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণিকে চাঁদ। শীঘ্রই তাদের প্রীতি ও ভালোবাসার স্রোতে ভাঁটা পড়ল। সমাজে উচ্চ স্থান ও সম্মান লাভের জন্য যার প্রতিভাই একমাত্র সম্বল, তার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা—উচ্চ শ্রেণীর লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। কয়েকজন অভিজাত তাঁর খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হল। একদিন একটি ভোজসভায় যখন ভলতেয়রের স্বভাবসিদ্ধ বচনভঙ্গী এবং বাকপটুতা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মনযোগ আকর্ষণ করছিল তখন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিরক্তির সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোন ছোকরা অত চিৎকার করছে হে? ভলতেয়র উত্তর দিলেন, তার বড়ো নাম নেই। তবে নামের জন্য সে সকলের কাছে সম্মান পায়। তাঁর ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়ে সেই ব্যক্তি তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য একদল গুণ্ডা নিযুক্ত করে তাদের বলেন, লোকটাকে ঘা কয়েক উত্তমমধ্যম দিও কিন্তু তার মাথায় আঘাত করো না। তার মগজ থেকে কিছু ভালো জিনিস বেরোবে আশা করা যায়। পরদিন দেহের ক্ষত স্থানে পট্টি বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভলতেয়র রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। শত্রুকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করলেন। প্রাণহানির সম্ভাবনায় ভীত হয়ে তিনি পুলিশ মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পুলিশ ভলতেয়রকে গ্রেপ্তার করে তাঁর সেই পরিচিত স্থান ব্যাষ্টিলে পাঠিয়ে দিল। কারাগার তাঁর চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। বাস্তব জীবনের অকরুণ পরিবেশে অর্জিত অভিজ্ঞতা কার্যকর হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে নির্বাসনের সর্তে তিনি কারামুক্ত হলেন। প্রহরীর সঙ্গে তিনি ডোভরে উপস্থিত হওয়ার কিছু পরেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি ছদ্মবেশে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সে হাজির হলেন। তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় তিনি পুনরায় চ্যানেল পার হয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলেন এবং সেখানে তিন বৎসর বাস করতে লাগলেন।

প্রবাসের পত্রাবলী। এক বৎসরের ভিতর তিনি ইংরিজি ভাষা এবং সে যুগের ইংরিজি সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করলেন। সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ইংল্যাণ্ডের একটি জিনিস তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল। এখানে বোরিংব্রোক, পোপ, অ্যাডিসন এবং সুইফ্‌ স্বাধীনভাবে লেখনী পরিচালনা করেন। এখানকার লোকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। এখানে তারা ধর্মকে পুনর্গঠন করেছে, রাজাকে বলি দিয়েছে, বিদেশ থেকে একজন রাজা আমদানি করেছে। এমন একটী শাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে যে যার ক্ষমতা ইয়োরোপের কোন রাজার ক্ষমতার চেয়ে কম নয়। এখানে ব্যাষ্টিল নেই। এখানকার উপর তলার কোন মানুষ নিচের তলার কোন মানুষকে বিনা বিচারে এবং বিনা কারণে কারাগারে প্রেরণ করতে পারে না। এখানে তিরিশটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। একাধিক পুরোহিত আছে। এখানকার কোয়েকার নামে সর্বাপেক্ষা সাহসী ধর্মসম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মে আস্থাহীন হয়েও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের সমান ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অবিচলিত ছিল।

সে যুগের ইংল্যাণ্ডে ধমনী নতুন চিন্তার উষ্ণ শোণিত প্রবাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তখনও মনীষী বেকনের নামের যাদুমন্ত্রে ইংলাণ্ডের আকাশ বাতাশ অনুরণিত হচ্ছিল। তাঁর নবাবিষ্কৃত যুক্তিপ্রণালী জ্ঞানের রাজ্যে নতুন যুগের অবতারণা করেছিল। রেনেসাঁসের সন্দেহবাদ এবং বেকনের আরোহ ন্যায়ের সমবায়ে যুক্তিনিষ্ঠ হবস্ একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট জড়বাদ প্রপঞ্চিত করেছিলেন। এই ধরনের মত প্রকাশের ধৃষ্টতা ফ্রান্সে অপরাধ হিসাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হত। দার্শনিকপ্রবর লক্ অতীন্দ্রিয় শক্তির অনুমান নিরপেক্ষ মনস্তত্ব বিশ্লেষণ সম্বন্ধে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কলিন্স, টিন্ডেল প্রভৃতি লেখকরা চার্চের ধর্মশিক্ষার বিরূপ সমালোচনা করলেও তাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। অনন্যসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অধিকারী নিউটনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বিপুল জনসমাবেশে ভলতেয়র উপস্থিত ছিলেন। তাঁর প্রতি জাতির উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ ভক্তি নিবেদনের দৃশ্য তাঁর মনের উপর যে গভীর রেখাপাত করেছিল তা কখনও মুছে যায় নি। তিনি লিখেছিলেন, কিছু দিন আগে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভিতর প্রশ্ন উঠেছিল—সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কে? সীজার, আলেকজাণ্ডার টামার লেন, না, ক্রমওয়েল? এই প্রশ্নের উত্তরে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, আইজ্যাক নিউটনই যে মনীষী তাতে কোন সন্দেহের অবসর নেই। ভলতেয়র তাঁর মত সমর্থন করে বলেছিলেন, যিনি সত্যের শক্তিবলে আমাদের মন জয় করেন, যিনি পাশবিক শক্তিদ্বারা আমাদের মনকে দাসত্ব শৃংখলে বন্ধ করেন না, তিনিই আমাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভক্তি গ্রহণের যোগ্য। ভলতেয়র মনযোগের সহিত নিউটনের রচনাবলী পাঠ করেছিলেন এবং ফ্রান্সে তাঁর ভাবধারার প্রধান সমর্থক ও প্রচারক হয়েছিলেন।

প্রবাস বাসের সুফল। কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অতি অল্প সময়ের ভিতর ভল্‌তেয়র ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমস্ত শিক্ষণীয় বস্তুগুলি আয়ত্ত করেছিলেন, কিভাবে তিনি ইংল্যাণ্ডের সংস্কৃতি ও জ্ঞান আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, এবং কিভাবে তিনি দেশের সাহিত্য ও দর্শনের নতুন জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাব ফরাসী সংস্কৃতির অনলে পরিশুদ্ধ করে ফ্রান্সের জাতীয় মানস গঠনে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ইংল্যাণ্ড থেকে লিখিত তাঁর পত্রাবলীতে "বিশ্বাস ঘাতক অ্যালবিয়নে"র রাজনৈতিক ও মানসিক স্বাধীনতার সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের রাজনীতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যাচার ও পরাধীনতার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, ফ্রান্সের আলস্যপরায়ণ অভিজাত শ্রেণীর উন্নাসিকতার ও যাজকসম্প্রদায়ের অর্থগৃধ্নুতার নিন্দা করেছেন, চার্চের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উত্তরস্বরূপ ব্যাষ্টিল কারাগারের শাস্তি ভোগের কথা বলেছেন এবং ফ্রান্সের মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ইংল্যাণ্ডের মতো রাষ্ট্রে তদের সঙ্গত স্থান অধিকার করতে উপদেশ দিয়েছেন। নিজের অজ্ঞাতসারে ভল্‌তেয়য় ফরাসী বিপ্লবের পথিকৃৎ ছিলেন।

বৈপ্লবিক মত প্রকাশের জন্য পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি বন্ধুবান্ধবদের ভিতর প্রচলিত হয়েছিল। শাস্তির ভয়ে প্রকাশিত হয়নি।

ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন। রিজেন্টের অনুমতিক্রমে ১৭২৯ সালে ভলতেয়র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসর তিনি প্যারিসের বিলাস-হিল্লোলে গা ভাসিয়ে দিলেন। মদ্যপান এবং এবং লেখনীচালনা যুগপৎ চলতে থাকে। পত্রাবলীর পাণ্ডুলিপি একজন ধূর্ত প্রকাশকের হাতে পড়ে। লেখকের অজ্ঞাতসারে সে পত্রাবলী পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বিক্রয় করতে থাকে। এই ঘটনা সংপ্রকৃতির ফরাসী এবং এমন কি ভলতেয়রের মনে ভীতি উৎপাদন করে। রাষ্ট্র ধর্ম ও নীতির পক্ষে লজ্জাজনক ও ক্ষতিকর বলে গভর্ণমেন্টের আদেশে বইখানি পুড়িয়ে দেওয়া হল। আসন্ন

কারাদণ্ডের সম্ভাবনা দেখে ভলতেয়র এক ব্যক্তির বিবাহিত পত্নীকে নিয়ে পলায়ন করলেন।

নতুন প্রেম। তাঁর এই নতুন প্রেমিকা মার্কুইস্ মহিষীর বয়স তখন আঠাশ বৎসর এবং ভলতেয়রের বয়স চল্লিশ। অঙ্কশাস্ত্রে এই মহিলার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিউটনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রিনসিপিয়ার পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিকাযুক্ত অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ফরাসী আকাদমির প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ভলতেয়রকে পরাজিত করেন। এই ধরনের অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণীরা সাধারণত পরপুরুষের সঙ্গে গোপনে পলায়ন করেন না। তাঁর এই নিন্দিত আচরণের কারণ ছিল। তাঁর স্বামী মার্কুইস কাঠ-খোট্টা স্থূলবুদ্ধি মানুষ ছিলেন। ভলতেয়রের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এই রমণীর হৃদয় আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর চোখে ভলতেয়র ছিলেন ফ্রান্সের উজ্জ্বলতর রত্ন, এবং সকল বিষয়ে তাঁর হৃদয়দানের উপযুক্ত পাত্র। গুণমুগ্ধ ভলতেয়র সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর প্রেমনিবেদন গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন, এই রমণী একটি বিরাট পুরুষ কিন্তু তাঁর একমাত্র দোষ এই যে তিনি নারী। সে যুগের ফ্রান্সে তাঁরা এবং তাঁর মতো বহু বিদুষী রমণীর সাহচর্য থেকে তিনি নারী এবং পুরুষের সাম্যসম্বন্ধে নিজের মত গঠন করেছিলেন। প্যারিসের উষ্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সিরের প্রাসাদ ভলতেয়রের নিরাপদ আশ্রয় স্থান ছিল। গৃহে স্ত্রীর অঙ্কশাস্ত্র চর্চার উৎপাতে ঝালাপালা হয়ে মার্কুইস যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য চালনার কাজে ব্যাপৃত থেকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। পারিবারিক ব্যাপারে নতুন ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি ছিল না। সে কালের সামাজিক রীতি অনুসারে প্রবীণ ধনীরা সুন্দরী যুবতীদের বিবাহ করতে বাধ্য হত। যুগোচিত সমাজনীতি স্ত্রীর দ্বিতীয় প্রেমিক গ্রহণে আপত্তি করত না। বিশেষত প্রতিভাবান ব্যক্তিকে প্রণয়ী হিসাবে পছন্দ করলে স্ত্রীর সাতখুন মাপ হয়ে যেত।

সিরের প্রাসাদে তাঁদের প্রেম অবসর বিনোদনের বস্তু ছিল না। পুস্তক পাঠে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হত। পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণায় উপযোগী করে ভলতেয়র পরীক্ষাগারকে মূল্যবান যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে এবং আলোচনায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। তাঁদের গৃহে বহু অতিথির সমাগম হত। সান্ধ্যভোজনের পর রাত্রি নটায় কখনো তাঁরা সখের থিয়েটারে অভিনয় দেখতেন। অথবা ভলতেয়র স্বরচিত গল্প পড়ে শোনাতেন। তাঁদের গৃহে ফ্রান্সের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভলতেয়রের বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, মদ্য আস্বাদন এবং স্বরচিত নাটকের অভিনয় উপভোগের আনন্দে তাঁরা আকৃষ্ট হতেন। তিনি নিজে হাসতেন এবং অপরকে হাসাতেন। রাশিয়ার রাণী ক্যাথ্রিন তাঁকে 'আনন্দের দেবতা' নাম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আনন্দহীন জীবন দুর্বহ। মাঝে মাঝে নির্বোধ হলে মধুর লাগে। যে দার্শনিক হাসির প্রলেপ দিয়ে মুখমণ্ডলের উপর বার্ধক্যের রেখা মুছে দিতে না পারে, সে হতভাগ্য। আমি মনে করি গাম্ভীর্য একটা ব্যাধি।

সাহিত্য সাধনা ও খ্যাতি। এবার তিনি কতগুলি মনোরম রসন্যাস রচনা করলেন। এদের নাম জাডিগ, ক্যানডিড মাইক্রোমিনাস ইত্যাদি। এদের ভিতর যে খাঁটি ভলতেরিয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ হয়েছে তা তার বিরাট রচনাবলীর অন্য কোন পুস্তকে দেখা যায় না। এগুলি প্রকৃত উপন্যাস নয়, ক্ষুদ্র আকারের হাস্যরসোজ্জ্বল চিত্র। এই সকল গল্পের নায়করা ভাবের, দুর্বৃত্তরা কুসংস্কারের এবং ঘটনাবলী চিন্তাধারার প্রতীক হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। ভলতেয়র কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের সমদর্শিতা এবং দার্শনিকের কোমলতার অভাব ছিল।

তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত

যারা আসতে পারত না তারা পত্রদ্বারা তাঁর সঙ্গে আলাপ করত। তাঁর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রিন্স ফ্রেডরিক লিখেছিলেন, আপনার মতো মনীষীর সমকালীন বলে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আপনি ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকলে মানুষকে হাসাতে পারে না। মনের আনন্দ সকল আনন্দের সেরা।

ফ্রেডরিকের প্রকৃতি অনুরূপ উপাদানে গঠিত হয়েছিল। ধর্মসম্বন্ধে তাঁর মত স্বাধীন ছিল। ধর্মের উপদেশ তাঁর ঘৃণার বস্তু ছিল। ফ্রেডরিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উত্তরে ভলতেয়র লিখেছিলেন যে সম্রাটের সিংহাসনে অধিরোহণের পর তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠবেন। এই ধরণের অতিমাত্র স্তুতিবাদ ফ্রেডরিক পছন্দ করেন নি দেখে ভলতেয়র তাঁকে লিখেছিলেন, এমন কোন পোপ নেই যিনি নিজেকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করে। এমন কোন রাজা নেই যে চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট হয় না। ফ্রেডরিক তাঁর লেখা 'অ্যান্টি মেকিয়াভেল' নামে পুস্তকখানি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই পুস্তকে তিনি লিখেছিলেন, যুদ্ধ অন্যায়। শান্তিরক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। শান্তিকামী যুবরাজের পুস্তক পাঠ করে ভলতেয়র আনন্দে অশ্রুপাত করেছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই সম্রাট হওয়ার পর ফ্রেডরিক সাইলিসিয়া আক্রমণ করে কয়েক বৎসরের জন্য ইয়োরোপকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিলেন।

১৭৪৫ সালে ভলতেয়র তাঁর অঙ্কশাস্ত্রবিদ প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিসে উপস্থিত হলেন। তিনি ফ্রেঞ্চ আকাদমির সভ্যপদ প্রার্থী হলেন। এই অনাবশ্যক সম্মানলাভের মোহে তিনি নিজেকে সৎ ক্যাথলিক হিসাবে পরিচয় দিলেন, কয়েকজন প্রভাবশালী যেসুইটদের প্রশংসা করে তাদের মনোরঞ্জন করলেন এবং এই সকল ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যে ভাবে আচরণ করে তিনিও তা করেছিলেন। তাঁর সকল চেষ্টা বিফল হল। পর বৎসর তিনি সভ্য হলেন। এই উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সভায় তাঁর অভিভাষণ ফরাসী সাহিত্যে ক্লাসিকের স্থান অধিকার করেছে। আঠারো বৎসর বয়সে ইডিপ লেখার সময় থেকে তিরাশী বৎসর বয়সে আইরিণি রচনার সময় পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি একখানির পর একখানি বহু নাটক রচনা করেছিলেন।

ইতিপূর্বেই তাঁর জীবনে দুখদুঃখের রৌদ্র ছায়ার খেলা আরম্ভ হয়েছিল। পনের বৎসর পরে চ্যাটিলেটের প্রতি ভালোবাসায় উষ্ণতা কতকটা হ্রাস হয়ে গেল। এমন কি পরস্পরের মধ্যে কলহবাদ হয়ে গেল। ১৭৪৮ সালে মার্কুইস মহিষী একটি সুদর্শন যুবকের সঙ্গে প্রেমে পড়লেন। এই যুবকের নাম মার্কুইস ডি সেণ্ট-ল্যাম্বার্ট। তাঁদের ভিতর গোপন প্রেমাভিনয় আবিষ্কৃত হল। ভলতেয়রের ক্রোধের সীমা ছিল না। সেণ্ট-ল্যাম্বার্ট তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ভলতেয়রের ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যুবককে আশীর্বাদ করলেন। এখন তাঁর জীবন নদীতে ভাঁটা আরম্ভ হয়েছিল। দার্শনিকসুলভ উদাসীনতার সহিত তিনি বলেছিলেন, আমি রিচলিউকে স্থানচ্যুত করেছিলাম। ল্যাম্বার্ট আমাকে স্থানভ্রষ্ট করল। এই নিয়ম। একটা প্রেম আর একটা প্রেমকে এই ভাবেই সরিয়ে দেয়। জগতের রীতি এই। কয়েক ছত্র পদ্যে তিনি লিখেছিলেন, সেন্ট ল্যামবার্ট, তোমার ভোগের জন্য ফুল ফোটে। আমার ভাগ্যে গোলাপের কাঁটা আর তোমার জন্যই গোলাপ। এক বৎসর পরে সন্তান প্রসবের সময় চ্যাটিলেটের মৃত্যু হয়। সে যুগের রীতি অনুসারে তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্বামী, ভলতেয়র এবং ল্যামবার্ট মিলিত হয়ে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। যখন নিজেকে কাজের ভিতর ডুবিয়ে দিয়ে ভলতেয়র প্রণয়িনীর বিয়োগ ব্যথা ভুলতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ফ্রেডরিকের আমন্ত্রণ তাঁর শোকবিধুর হৃদয়ে শান্তির বাণী বহন করে এনেছিল। রাস্তা খরচের জন্য তিন হাজার ফ্রাঙ্কের লোভ সংবরণ করতে না পেরে তিনি উপস্থিত হলেন পটসডামে। ফ্রেডরিকের প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত

কক্ষ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। তিনি এক্ষণে ইয়োরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী সম্রাটের সঙ্গে সমভাবে বাস করতে লাগলেন। তিনি পটস্‌ডাম সম্বন্ধে লিখেছিলেন, এখানে আছে দেড় লক্ষ সৈন্য, গীতিনাট্য ও মিলনান্ত নাটকের অভিনয়, দর্শন ও কাব্যের আলোচনা। এখানে আছে আড়ম্বর, সঙ্গীত সমাজ ও স্বাধীনতা। তিনি চেয়েছিলেন এই ধরনের একটা পার্থিব স্বর্গে বাস করতে এবং পটস্‌ডাম ছিল তাঁর এই পার্থিব স্বর্গ।

ভলতেয়র সরকারী ভোজে অংশ গ্রহণ করতেন না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সম্রাট কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুকে স্বগৃহে যে ভোজ দিতেন তাহাতে ভলতেয়রও যোগ দিতেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ফ্রেডরিক নিজেকে কবি ও দার্শনিক হিসাবে পরিচয় দিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এই ক্ষুদ্র আলোচনা চক্রে ফরাসী ভাষায় কথোপকথন চলত। তাঁরা সকল বিষয়ে আলোচনা করতেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতেন। বুদ্ধির প্রাখর্যে ফ্রেডরিক ও ভলতেয়র উভয়েই সমান ছিলেন। একমাত্র ভলতেয়র ফ্রেডরিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ ছিলেন। অন্তর্দাহ সৃষ্টি না করে তিনি ধীর সংযত ভাষায় ফ্রেডরিকের মত খণ্ডন করতেন। ভলতেয়র আনন্দের সহিত লিখেছিলেন, এখানে আমরা সাহসের সহিত চিন্তা করি। এখানে আমরা স্বাধীন। পঞ্চাশ বৎসর ঝড়ঝাপটা সহ্য করার পর আমি এখানে নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় পেয়েছি। প্রুশিয়ার রাজার ব্যক্তিত্ব আশ্রয়দাতার ঔদার্য, দার্শনিকের সংলাপ এবং মধুর ব্যবহারের ত্রিবেণীসঙ্গম। তিনি আমাকে বিপদে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ফ্রেডরিক তাঁর উপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বিপদের সম্ভাবনা দেখে ভলতেয়ার পলায়ন করলেন (১৭৫২)। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনে কারারুদ্ধ করা হয়। মুক্তিলাভের পর স্বদেশের সীমা অতিক্রম করার সময় দেশ থেকে নির্বাসনের কথা শুনে তিনি জেনেভার নিকটবর্তী স্থানে 'লে ডোলাসেস' নামে একখানি বাগান বাড়ি ক্রয় করে পরের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

"শার্লেমেন থেকে ত্রয়োদশ লুই পর্যন্ত নীতি ও জাতি
সকলের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী" বিষয়ক প্রবন্ধ

তাঁর সুবিখ্যাত সুবৃহৎ এবং বৈশিষ্ট্যমূলক গ্রন্থখানি বার্লিনে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পুস্তকে নির্ভীক মত প্রকাশের জন্য তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সিরের প্রাসাদে বাস করার সময় তিনি এই পুস্তকখানি লিখতে শুরু করেন।

চ্যাটিলেট বলতেন, বর্তমান কালে যে ইতিহাস লেখা হয়, তাকে ইতিহাস বলা যায় না। তাকে পুরানো পঞ্জিকা বলা চলে। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস পড়ে আমি আনন্দ পাই। আধুনিক জাতিদের ইতিহাস অনাবশ্যক তথ্য রসকষহীন খুটিনাটি ঘটনা বা যুদ্ধের অসংখ্য ক্লান্তিকর কাহিনীর মনোযোগাঁথা মাত্র। যে পাঠ মনের উপর আলোকপাত করে না, এবং তাকে ভারাক্রান্ত করে, তাকে আমি ঘৃণা করি।

ভলতেয়র চ্যাটিলেটের কথায় সায় দিয়েছিলেন এবং তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইতিহাস অপরাধ এবং দুর্ভাগ্যের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি হোরেস অরাল পোলকে লিখেছিলেন, ইয়র্কিষ্ট ল্যাটেকাম্প্রিয়ানদের ও আরও অনেকের ইতিহাস চোর-ডাকাতদের ইতিহাস। ইতিহাসকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে হলে দার্শনিকদৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে হবে। কেবল মাত্র দার্শনিকদের ইতিহাস লেখা উচিত। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের নিচে মানব মনের যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাকে আবিষ্কার করাই ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ। কাহিনী উপকথা কিংবদন্তীর আবর্জনায় সকল জাতির অতীত ইতিহাস

আচ্ছন্ন, দার্শনিক চিন্তা সম্মার্জনী যুগযুগান্তের জঞ্জাল দূর করে আলোকপাত করার পূর্বেই আবার অনুষ্ঠান, স্মৃতিস্তম্ভ ও ঘটনাবলী মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণিত করে। মৃত্যুকে প্রতারণা করার কৌশলসমষ্টির নাম ইতিহাস। ভবিষ্যতের অভীষ্ট ইচ্ছা অনুসারে আমরা অতীতকে রূপান্তরিত করি। ফলে ইতিহাস প্রমাণ করে যে যে-কোন বস্তু ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

যেমন খনি খননকারী কঠোর পরিশ্রম করে সোনার কণা সংগ্রহ করে, তেমনি ভলতেয়র মিথ্যার হিমালয় স্তূপ থেকে সত্যের কণা আবিষ্কার করে মনুষ্য জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্যে বৎসরের পর বৎসর নিরলস পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। ক্ষুধাতুর লোভীর মতো তিনি শত শত পাণ্ডুলিপি, জীবনী, স্মৃতি-কথা প্রবন্ধ ও পুস্তক পাঠ করলেন। প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করলেন। কিন্তু কেবলমাত্র তথ্য ও ঘটনাবলীর সমাবেশ তো ইতিহাস নয়। সৈনিকের তল্পি-তল্পায় ভারিবোঝার মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের প্রাচুর্য ইতিহাসের প্রতিবন্ধক। ভলতেয়র এমন একটি সাধারণ সূত্র অনুসন্ধান করছিলেন, যার সাহায্যে ইয়োরোপের সভ্যতার ইতিহাসের অন্ত-র্নীল মর্ম উদ্ঘাটন করা চলবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সাংস্কৃতিক ঐক্যই সেই সূত্র। তিনি বলেছিলেন, আমি রাজরাজড়া যুদ্ধ বা বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে চাই না। আমি লিখতে চাই সাধারণ মানুষের, মনুষ্য জাতির এবং মানব মনের অগ্রগতির ইতিহাস। আমার পরিকল্পনায় যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লবের স্থান অতি অল্প। সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধে জয়-পরাজয়, নগর অধিকার প্রভৃতি সব দেশের ইতিহাসের সাধারণ ঘটনা। কি ভাবে পরিবারে ও সমাজে বাস করে, তাঁদের কি শিল্পকলা ছিল, কি ভাবে তারা বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে—এই সকল বিষয় আমার ইতিহাসের উপজীব্য। ভলতেয়র ইতিহাস থেকে রাজাদের নির্বাসন দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে তারা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

তিনিই প্রথমে ইতিহাসের দর্শন লিখেছিলেন। তিনিই প্রথমে ইয়োরোপীয় মানস বিকাশের স্বাভাবিক কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পুস্তকে তিনি ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দুর্লভ ও অসাধারণ। অতিপ্রাকৃত বা ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবমুক্ত না হলে প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম হয় না। বাকলের মতে ভলতেয়রের পুস্তক আধুনিক যুগে ইতি-হাস--বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছিল। গীবন, নিকুব এবং প্রোট কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি এদের সকলের পথ প্রদর্শক ছিলেন। এই বিষয়ে এখনও তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তাঁর মতে, বর্বরদের ভিতর খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার রোমানদের সংশক্তি নষ্টের কারণ। ফলে তাদের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তিনি জুডিয়া এবং খৃষ্টান দেশগুলির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলেন। চীন, ভারত এবং পারস্যের ধর্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ আলোচনা করেছিলেন। এজন্য খৃষ্টান পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হয়েছিল। যে ব্যক্তি প্রথমে নিজেকে মানুষ এবং তারপর ফ্রান্সের লোক বলে ভাবে, তাকে ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ করতে দেওয়া চলে না। এই অপরাধের জন্য তাঁর স্বদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। সত্য কথা বলার অপরাধের জন্য তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

তীর্থস্থান ফারনি। তিনি ফ্রান্সের সীমার বাইরে সুইজারল্যান্ডের ভিতরে ফারনি নামক স্থানে স্থায়ী নীড় রচনা করে সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন। তখন তাঁর জীবন-সূর্য পশ্চিম গগনে অনেকখানি ঢলে পড়েছিল। তাঁর বয়স তখন চৌষট্টি বৎসর। ফারনি কোবিদ গুণী ও জ্ঞানী মনীষীদের তীর্থ স্থানে পরিণত হল। সন্দেহবাদী ধর্মযাজক, উদার মতাবলম্বী অভিজাত, বিদুষী রমণী, পণ্ডিত, সংস্কৃতিবান রাজা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অথবা চিঠিপত্রে তাঁর প্রীতি সম্মান দেখাতে লাগলেন। এখানে এসেছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে গীবন এবং বসুওয়েল, ফ্রান্স

থেকে এসেছিলেন ডালাসবর্ই হেলভিশিয়াস্ প্রভৃতি বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবী। অসংখ্য দর্শনার্থীদের স্রোতে তাঁর গৃহ প্লাবিত হয়ে গেল। তাঁর গৃহ যেন ইয়োরোপের পান্থশালায় পরিণত হল। দিনের পর দিন অতিথি সৎকারের ব্যয় ভারে তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন। একটি ভদ্রলোক তাঁর গৃহে ছয় সপ্তাহ থাকবেন বলেছিলেন। তাঁর কথা শুনে ভলতেয়র বলেছিলেন, মশায়, ডন কুইক্সোটের সঙ্গে আপনার প্রভেদ কোথায়? সে সরাইখানাকে ভদ্রলোকের বাসগৃহ ভেবেছিল, আর আপনি ভদ্রলোকের বাসগৃহকে সরাইখানা মনে করেছেন। এমন বন্ধুদের হাত থেকে ভগবান যেন আমাকে রক্ষা করেন।

দিনের পর দিন অসংখ্য অতিথির পান ভোজনের ব্যবস্থা করা ছাড়া অসংখ্য চিঠিপত্রের উত্তর দিতে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। পত্রলেখকদের ভিতর বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন অবস্থার লোক ছিল। জার্মানির এক নগরের মেয়র গোপনে জানতে চেয়েছিলেন "ঈশ্বর আছেন কি না"। সুইডেনের তৃতীয় গস্টেভাস, ডেনমার্কের সপ্তম ক্রিসিয়ান, রাশিয়ায় দ্বিতীয় ক্যাথরিন, এমন কি সম্রাট ফ্রেডরিক এক বৎসর নিস্তব্ধ থাকার পর ফারনির রাজার সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করেছিলেন

শিল্পী বিভূতিভূষণ

'শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে—কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যাকে বলেছেন—

'Transient sorrows, simple wiles, praise, blame, love, kisses, tears and smiles'—জীবনের এই বিভিন্ন অবস্থা থেকেই বিভূতিভূষণ তাঁর মাধুকরী সংগ্রহ করেছেন।

প্রতিদিনের তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যেও যে-সৌন্দর্য যে-আনন্দ ও অমৃতের মাহেন্দ্রস্পর্শ, বিভূতিভূষণ তার মধ্যেই ভূমাকে খুঁজে পেয়েছেন, পেয়েছেন 'গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী'র উৎসমুখের সন্ধান।

বস্তুতঃ শরৎচন্দ্রের পর যে কজন শক্তিশালী লেখকের সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি-লাভ করেছে তাঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য। তাঁর কোন কোন লেখায় শরৎ-চন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব থাকলেও তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জীবনবোধে উত্তীর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বে ও লিপিকুশলতায় তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ণ রসমাধুর্যের সন্ধান এনে দিয়েছে। এতো মাধুর্য, মমতা এবং প্রসাদগুণ বোধহয় তাঁর সমসাময়িক আর কারুর রচনায় নেই।

শিল্পী হিসেবে বিভূতিভূষণকে কোন দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। নিঃসঙ্গ তারার মতো তিনি একক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

শরৎচন্দ্রের মতো তিনিও প্রধানতঃ পল্লীজীবনের ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর দু'-একটি স্বল্পখ্যাত উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে শরৎচন্দ্রের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়—যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার অন্ততঃ দু'খানি উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব সুস্পষ্ট কিংবা শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র অনুকরণ অনস্বীকার্য।

তবে শরৎচন্দ্রের সংগে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও গভীর। শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তির সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাহিনী গাঢ়বন্ধ, চরিত্র চিত্রণে গভীর মুন্সীয়ানা এবং মনোবিকলনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অনভূতির তীব্রতা এবং হৃদয়বৃত্তির উদ্দাম অভিব্যক্তি থাকলেও কচিৎ তাঁর কল্পনা পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করে ভাব-লোকে প্রসার লাভ করতে পেরেছে। অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় প্রকৃতি তাঁর সাহিত্যে উদ্দীপন বিভাব মাত্র, আলম্বন বিভাব হয়ে ওঠেনি কখনো।।

কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যের চালচিত্ররূপে রয়েছে মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর সমন্বিত এক দার্শনিক পটভূমি, আর তাঁর এই দার্শনিক প্রত্যয় প্রাত্যহিক জীবনের ছায়াতপে গড়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' এবং তাঁর "পথের পাঁচালী" মূলতঃ একই সত্যকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে, অথচ দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে এই দুটি উপন্যাসের রসস্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং কালিদাস রায়—রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের এই কবি-পঞ্চকের মতো বিভূতিভূষণও রবীন্দ্র যুগের ভাবধারায় লালিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যদি বলি জীবনসভার বীণাকার, তবে বিভূতিভূষণকে বলতে হয় একতারাবাদক। মানসধর্মে তিনি মূলতঃ বাউলের মতো নিরাসক্ত, আবার বৈষ্ণবের মতো মাধুর্যবাদী।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মাধুর্যের সংগে ঐশ্বর্য এবং বোধির সংগে বুদ্ধির মিলন ঘটেছে। তাঁর রচনা তীক্ষ্ন, মননশীল এবং ওজঃগুণসম্পন্ন। তাঁর নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায়, কোন একটি বিশেষ ধারার অনুবর্তন করেনি বেশিদিন।

রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের প্রতীক যদি হয় পদ্মা (শেষ জীবনে কোপাই), তবে বিভূতি-ভূষণের কবিকর্মের প্রতীক ইছামতী। রবীন্দ্রনাথ কখনো বলেছেন, ইন্দ্রের বাহন যেমন ঐরাবত তেমনি তাঁর বাহন পদ্মা, আবার কখনো পদ্মাকে তাঁর ঘর-সংসার এবং সন্ধ্যাতারাকে তাঁর গৃহ-লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করেছেন। আর বিভূতিভূষণের কাছে ইছামতী 'চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক'; 'পাড়াগাঁয়ের গরীবঘরের মা'র মতো। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের বিবর্তনে পদ্মার দুকূলপ্লাবী তরংগোচ্ছ্বাস আছে, আছে বিশ্বজীবনের সমুদ্রসংগমের গান। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যে আছে প্রধানতঃ এই 'গরীব ঘরের মা'র মুখের শান্ত "ঘুমপাড়ানি গান।' তাঁর তীর্থপরিক্রমা অনুভূতির পায়েচলা পথে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মের প্রতিনিধিমূলক নিদর্শন বলতে প্রথমেই 'পথের পাঁচালী' 'দৃষ্টি-প্রদীপ' "আরণ্যক' এবং "দেবযান'—এই পাঁচখানা গ্রন্থের কথা মনে পড়ে। এর মধ্যে প্রথম দু'খানা লেখকের আত্মজীবনীমূলক। অপু তাঁর নিজেরই জীবনের ছায়াতপে গড়া। মানুষের মধ্যেকার চিরন্তন শিশুকে তিনি অত্যন্ত পুংখানুপুংখভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অপুর মধ্যে। আতুর থেকে একেবারে বৃহত্তর জীবনের চক্রবালনেমিতে তিনি তাকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। সে প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছে। এই চরিত্রসৃষ্টিতে শিল্পী বিভূতিভূষণ যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন, কল্পনাশক্তি ও অনুভূতির সূক্ষ্মতার যে-পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে জেন অস্টেন সম্পর্কে জনৈক রসিক সমালোচকের উক্তি স্মরণ করে তাঁকেও বলতে ইচ্ছে হয়—'এ মিনিয়েচারিস্ট অন্ আইভরি।'

অপু সম্পর্কে 'অপরাজিত'তে তিনি বলেছেন—'সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেব-শিশুর মত।' 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' মূলতঃ এই দেবশিশুরই প্রগাঢ় বিস্ময় ও জীবন-সন্ধিৎসার কাহিনী। শিশুমনের এই কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ সম্পর্কে বলতে গিয়েই ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ একে বলেছেন ঃ—'ভার্জিন প্যাশান অফ্' এ সোল কম্যুনিং উইথ দি গ্লোরিয়াস্ ইউনিভার্স।'

আসলে অপু হলো আমাদের প্রত্যেকেরই শৈশবের প্রতিনিধি। তার সংগে রয়েছে আমাদের এক গভীর একাত্মবোধ। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের সেই 'বালক বীরের বেশে' সে যেন আমাদের 'বিশ্ব জয়' করে নিয়েছে। যে বাৎসল্যরস অপুর মধ্য দিয়ে 'পথের পাঁচালী'তে পরিবেশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার আস্বাদ নতুন কিছু নয়। বৈষ্ণব পদাবলীর বাল্যলীলা-বিষক পদগুলিতে যশোদাদুলাল শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এবং শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গান-গুলিতে উমার মধ্যে এই বাৎসল্য রসের নিবিড়তম প্রকাশ।

উপন্যাসের লক্ষণ মিলিয়ে 'আরণ্যক'কেই অনেকে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মনে করেছেন। 'আরণ্যকে' প্রকৃতি ও মানুষকে উপস্থাপিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন এক পরিপ্রেক্ষিতে। বিহারের পূর্ণিয়া জেলার আরণ্য-প্রকৃতির রুদ্র, রুক্ষরূপ এবং সুকঠিন বৈরাগ্যের পটভূমিকায় সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ছবি তিনি এঁকেছেন আশ্চর্য নিপুণতার সংগে। আদিম অরণ্যের ধ্যানগম্ভীর একটি নিখুঁত ক্লাসিক্যালরূপের সংগে বিভূতিভূষণের লিরিক কল্পনার সমাবেশে আরণ্যকের পরিবেশ রচিত। তাই বন্যমহিষদের দেবতা টাঁড়বারোর অধিষ্ঠান-ভূমি মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও শ্বাপদসংকুল মহালিখারূপের পর্বতমালার পাশেই সরস্বতী কুন্ডী এবং লবটুলিয়া বইহারের দুধ্লিফুলের সমারোহ, প্রাচীন বনস্পতিরাজির অটল-গাম্ভীর্যের পাশেই বসন্তে অখ্যাত কাঁটাগাছের ফুলের অর্ঘ্য সাজানোর ছবি।

আর ভানুমতী, কুন্তা, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, ধাতুরিয়া, রাজু পাঁড়ে এবং সবশেষে মহুয়াবীজ ভেঙে তেল বার করার কাজে নিরত সেই বুড়ি—যার দৈনন্দিন চিন্তাধারা জানবার জন্যে লেখক তাঁর এক বছরের উপার্জন দিতে রাজী—এদের কিছুতেই ভোলা যায় না। সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ঠিক এ ধরনের চরিত্রসৃষ্টি আর কেউ করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

লেখকের ভাবজীবনের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে 'অপরাজিত'ই যেন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ, এতে 'পথের পাঁচালী'র কাহিনীর পরিণতি যেমন আছে তেমনি 'আরণ্যক,' 'দৃষ্টি-প্রদীপ' ও "দেবযান'—এই চারটি উপন্যাসের সম্ভাবনা ও যেন সূত্রাকারে নিহিত আছে দেখতে পাই।

'অপরাজিত'তে জীবন ও জগত সম্পর্কে অপুর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং অমরকন্টকের আরণ্য বর্ণনা যথাক্রমে 'দৃষ্টি-প্রদীপ' ও 'দেবযানে'র এবং "আরণ্য'কে পরিণতি লাভ করেছে। 'দৃষ্টি-প্রদীপে' মূলতঃ 'অপরাজিত'র ভাবধারার অনুবর্তন থাকলেও বর্ণনাভঙ্গির গুণে তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ভাষা যে কত ব্যঞ্জনাময় ও সুললিত হতে পারে তার প্রমাণ এই বইখানির প্রতিটি ছত্রে। 'দেবযানে' বিষয়-নির্বাচনের দিক থেকে লেখক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু পারলৌকিক রসের আধিক্যে এর শিল্পসুষমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

উপন্যাস ছাড়াও নানা ছোট গল্প এবং ডায়েরীর মধ্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিমানসের পরিচয়টি নিবিড়ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'পুঁইমাচা' 'কিন্নরদল' "মৌরীফুল' "দ্রবময়ীর কাশীবাস,' 'মেঘমল্লার' প্রভৃতি গল্প অবিস্মরণীয়। বিশেষতঃ 'মেঘমল্লার' গল্পের সুরেলা ভাষা এবং লেখকের রোম্যাণ্টিক পরিবেশ রচনার দক্ষতা গল্পটিকে একটি অনবদ্য রসমাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। 'স্মৃতির রেখা' 'তৃণাঙ্কুর' "উৎকর্ণ" "ঊর্মিমুখর" "হে অরণ্য কথা কও" বই ক'খানা প্রাত্যহিক জীবনের দিনলিপি হলেও জীবনশিল্পী বিভূতিভূষণের হৃদয়ের নিভৃত নিরাভরণ প্রকাশে এগুলোর সাহিত্য-মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে বলেছেন—'ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া আর কিছু নাহি জানে।' এই দিনলিপি বা ডায়েরীজাতীয় রচনা-গুলিতে ক্ষণিকের চকিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে বিভূতিভূষণের চিরন্তনের বাণীরূপটি অংকন করেছেন। 'ওয়ান্ আওয়ার অব্ গ্লোরিয়াস লাইফ ইজ্ ওয়ার্থ এ্যান এজ্ উইদাউট এ নেম' কথাটির সত্যতা বিভূতিভূষণের ডায়েরী পড়ে যেন নতুন করে উপলব্ধি করা গেলো।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র সংগে বিভূতিভূষণের ডায়েরীশ্রেণীর রচনাগুলির কিছু কিছু মিল আছে। কিন্তু 'ছিন্নপত্রে' লেখক ও পাঠকের মাঝখানে একজন তৃতীয় ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া এর বিষয়বস্তু এবং রসও বিচিত্র। কিন্তু বিভূতিভূষণের ডায়েরী-গুলির মূলসুর একটা বিশেষ স্বরগ্রামে বাঁধা।

'বনে-পাহাড়ে' ও 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণ কাহিনী এবং ডায়েরীর মধ্যবর্তী এক নতুন ধরণের রচনা। 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশির বিন্দু'—দেখবার মানসে ভ্রমণের যে-অভিলাষ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন, এ দু'খানি গ্রন্থে ঠিক অনুরূপ অনেক অখ্যাত স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে।

বিভূতিভূষণ মূলতঃ করুণ রসের কবি। তাঁর প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ রচনারই অঙ্গীরস করুণ রস, অশ্রুসিক্ত বেদনার তিনি কথাকার; তবে তিনি কয়েকটি হাসির গল্পও লিখেছেন। 'আইন-ষ্টাইন ও ইন্দুবালা' 'জহরলাল ও গড' এবং 'মুলো-র‍্যাডিস-হর্সর‍্যাডিস' প্রভৃতি গল্পে তাঁর পরিহাসপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর একটি কবিতাও আমরা 'উৎকর্ণ' গ্রন্থের মধ্যে পাই, তবে কবিতা হিসেবে তার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই।

'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থে 'সাহিত্যের কথা' নামে তাঁর যে প্রবন্ধটি আছে তা সুলিখিত এবং তাঁর শিল্পিমানস বোঝবার পক্ষে উপযোগী।

বিভূতিভূষণের কয়েকটি কিশোর পাঠ্য উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থও আছে। তাঁর 'চাঁদের পাহাড়' একটি সার্থক উপন্যাস। এ গ্রন্থ ছোটদের জন্যে লেখা হলেও এর রসাবেদন বড়দের কাছেও কম নয়।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং এই স্বল্পপরিসরে তা সম্ভবও নয়। তাঁর শিল্পিমানস ও জীবনদর্শনের সামান্য পরিচয়মাত্র দেওয়া হলো। শিল্পী হিসেবে তিনি কতটা সমাজসচেতন কিংবা যুগধর্মী ছিলেন এবং সাহিত্যের মূল্যায়নে সেটাই চরম নিরিখ কিনা সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিভূতিভূষণের সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর জীবনচর্যারই অংগ। তাই একাধারে তিনি জীবনশিল্পী এবং সাহিত্য-শিল্পী দুই-ই। এ প্রসংগে তাঁর নিজেরই উক্তি স্মরণীয় ঃ—

'বহু দূর ভবিষ্যতের শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচিমুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময়!—ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কতশত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কিভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে'— [অপরাজিত]

ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থও অনেকটা অনুরূপ কামনা ব্যক্ত করেছেন তাঁর একটি কবিতায়—

'I might leave some monument behind me which pure hearts should reverence'.

তাঁর সে বাসনা সফল হয়েছে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও এক ঊর্ধ্বমুখী বেদনার উত্তরাধিকার তোলা রইলো চিরকালের রসপিপাসুদের জন্যে।

অরুণকুমার সেন

কলকাতার চলতি বছরের প্রদর্শনী

কলকাতার বিভিন্ন পরিচিত প্রদর্শনীগৃহে গতবছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রদর্শনী হয়ে চলেছে। আজ থেকে দশবছর আগে কলকাতা শহরে এত প্রদর্শনীর রেওয়াজ ছিল না। প্রধান প্রদর্শনী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ছিল আকাদেমীর বাৎসরিক প্রদর্শনী, হঠাৎ হঠাৎ ক্যালক্যাটা গ্রুপের প্রদর্শনী আর দলবদ্ধভাবে চিত্রাংশুর প্রদর্শনী। তবে মোটামুটি ভাবে বছরে গোটা সাত আটেক প্রদর্শনীর খবর জানা যেত। কাগজেও এই বিষয়ে যথেষ্ট কম লেখা হতো। আনন্দ-বাজার তো "বিশেষ বিজ্ঞপ্তি"তে সামান্য একটু খবর পরিবেশন করত। আস্তে আস্তে প্রদর্শনীর রেওয়াজ বাড়ল। আরও অনেক শিল্পী দলবদ্ধভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে লাগলেন। লোকের ছবি দেখার প্রীতিও বেড়ে চললো। খবরের কাগজেও এই বিষয়ে যথেষ্ট লেখা হতে থাকল। বর্তমানে তো প্রদর্শনীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে—তাতে লোকও হয় প্রচুর। ছবি বেশী বিক্রী না হলেও ছবি দেখার দর্শক বেড়ে গেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে এই বছ-রের মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনীর মরশুম চলবে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত কোন প্রদর্শনীগৃহ থাকলে গরম কালেও আমরা ছবি দেখতে পেতাম। যতগুলি প্রদর্শনী কলকাতায় হয়েছে তাদের সামগ্রিক মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনেক নতুন শিল্পী—তাঁদের নাম সংযোজন করেছেন। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই নতুন কিছু আমরা দেখছি। সর্বক্ষেত্রেই যে সেই প্রয়োগ পদ্ধতির নতুনত্ব উজ্বল প্রতি-শ্রুতি এনে দিয়েছে তা নয়। তবে নব্য ধারার বিভিন্ন পথ আমাদের সামনে তাঁরা মেলে ধরেছেন। একথা খুবই সত্যি যে আধুনিক কালে বাংলা দেশের শিল্পক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নানা ধারণা এবং মত ছবিতে আত্মপ্রকাশ করছে। সমালোচনাতেও আমরা দেখছি যে শিল্পীরা ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় তত্ত্ব পরিবেশনে তৎপর হয়েছেন। ভারতীয়ত্ব কথাটি ব্যাপক। আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে এই ভারতীয়ত্ব কথাটির পিছনে। ভারত শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমরা ভাস্কর্য্য এবং ছবির দুইএরই অদ্ভুদ এবং শক্তিশালী সংযোজন শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐতিহাসিক মূল্যে লক্ষ্য করেছি। শক্তিশালী ক্লাসিক শিল্পকলা শিল্পে মধ্যযুগীয় অত্যধিক অলংকরণ এবং তার পরে নির্জীব শিল্পধারার পরে অবনীন্দ্রযুগ সবই ভারতীয়। সামাজিক পটভূমিতে শিল্পের নানা কলাচাতুর্য এবং প্রথা প্রকরণ প্রযোজিত হয়। ভারত শিল্পে "আইডিয়া" বা "আইডিয়োলজী" বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবন ধর্ম থেকে বিবিক্ত ছিল না। অনেক আধুনিককালের যন্ত্রণাময় পরিস্থিতিতে সমাজ বিষাক্ত হয়নি, জীবনের মূল্যবোধ এক সন্তুষ্টির পথে বলয় পরিক্রমায় সীমাবদ্ধ ছিল। ভাববাদী শিল্পকলায় আমরা তখন আনন্দ পেয়েছি—নিজেদের সাংসারিক দীনতাকে ভুলে ধর্মানন্দে নিজেদের ভুলিয়েছি। শিল্পকলায় সমাজের সেই ঢালাও পটভূমিতে প্রথমত ধর্ম আলোকিত রাস্তা ধরে এগুলেও অনেক জটিল গ্রন্থিবন্ধনে পরে নানা "সিমবলিজিমের" উদ্ভব ঘটছিল। তন্ত্রের আবির্ভাব এক অন্ধকার গলিপথে শিল্পকে চালিত করেছিল। মূল্যবোধ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উৎকট ধর্মান্ধতায় পথভ্রষ্ট হলো।

বর্তমানে মানুষের উপযুক্ত মূল্যায়নের পথে সেই ধর্মীয় পটভূমিতে উদ্ভূত সিমবলিজিমের কোন স্থান নেই। তাকে ফিরিয়ে আনার মধ্যে বেশ চমক আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা সেখানে নেই। যুগ যুগ ধরে মানুষের আত্মার ক্রন্দন শিল্পীর বধির কানের কাছে ঘোষিত হয়েছে। তাকে উপযুক্ত মূল্যায়নের পথে অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানসিকতার প্রতিষ্ঠিত করাই সেখানে শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। মিষ্টি মিষ্টি ভারতীয়ত্ব থেকে শিল্পীরা মোহমুক্ত এখনও হন নি। ভারতীয় বিগতদিনের ধর্মীয় মতবাদ প্রসূত বিভিন্ন কর্মকে চিত্রে অলংকৃত করলেই সেটা ভারতীয় হবে না। কিংবা ভারতীয় ষাঁড় কিংবা ভারতীয় বিবাহদৃশ্য আঁকলেই সেটাও ভারতীয় নয়। বর্তমানের সমাজ এত সহজ এত সরল নয়। মানুষকে তার অসীম সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে, তার যন্ত্রনার জগত থেকে উত্তরায়ণের পথে যে বেদনা যে সংঘাত আছে তা বুঝতে হবে। শিল্পীকে অভিজ্ঞতায় কঠোর কঠিন আর উদ্যত উদ্যমে উদ্ধৃত হতে হবে। এই প্রতিফলনের পথ থেকে আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে দূরে সরিয়ে রাখলে যে শিল্প উদ্যম হবে তাকে আমরা মোটেই আমাদের নিজেদের বলে চিহ্নিত করতে পারব না। বহুজন স্বীকৃতিযুক্তিতে যে জগতকে আমরা জানি, সেই জানা জগতকেই বার বার ফিরে ফিরে আঁকড়ে ধরছি। কিছুতেই তার মোহ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছিল না। জীবন স্থবির নয়—তার ক্রমশঃ বর্দ্ধমান পরিসরকে নিজেদের ভীষণ ভয়ের মধ্যে বার বার স্তব্ধ করতে চাচ্ছি। ছোট খাটো চাহিদা, ছোট ছোট সংস্কারের ছবি এঁকে সেই ভয়কে আরও বড় করে দেখছি। যে জগত আমার পূর্বপুরুষ দেখেছেন তাকেই বার বার আঁকছি—তার বাইরে যে দিগন্ত বিস্তারিত হলো তাকে জানতে উদ্যম ফুরিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানের প্রদর্শনীগুলোতে এই ধরণের আঁকড়ে ধরার একটা দুর্বলতা এসেছে। রং আর রেখার চমকটা কাটলেই ভেতরের যে দুর্বল মোহ আছে তা তার আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে আসে। যদিচ পিয়োর ফর্ম কিন্তু বিশুদ্ধ রূপ স্বীকার সেখানে কম। রং আর রেখার যে নন্দন তত্ব গত আবেদন সেই আবেদন তখন সাড়া আর দেয় না। পৌরাণিক তত্ব এবং আংশিক জীবনবোধের কাছে নন্দন তত্ব কঠিন শীতল। অনেকে নিজেদের ছবিতে হিন্দুয়ানী প্রতিপন্ন করতে জোর করে নিজেদের ভুল বোঝাচ্ছেন। অনেকে ভারতীয় তত্ত্ব তথাকথিত আধুনিক ভাবে প্রকাশ করেছেন। সত্যি কি এটা, যে আমরা এসব করছি বিদেশী ট্যুরিষ্টদের তারিফ পাবার জন্যে? কিংবা বাজারের এই ধরণের ছবির চাহিদা এখন বেশী? ভারতীয়ত্ব শুধুমাত্র বিদেশীদের উৎকট চরিত্র সাধন নয় কিংবা নিজেদের ক্ষীয়মান পৌরানিক কিংবদন্তী সম্বলিত বিলীয়মান গন্ডীবদ্ধ জীবন বোধও নয়। আমাদের জীবনে—তার বোধের মধ্যে তার বর্তমানের জটিল যন্ত্রনার বিভিন্ন প্রসারিত ক্ষেত্রে ভারতীয়ত্বের বীজ উপ্ত।

জীবনের মূল্যবোধকে তার মুক্তিকে, তার অসীম প্রসারিত উৎসাহিত বিস্তারকে আমার জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই প্রকাশকে জানতে হলে নিজের চোখ আর মন দুটিকে খোলা রেখে চলতে হবে। জীবনবোধের উত্তর সর্বকালের শিল্পকাজে মানুষ পেয়েছে। আধুনিককালে বাংলাদেশের শিল্পীরা কি জীবনকে ভুলে গেলেন?

সং স্কৃ তি সং বা দ

পিকাশো ও ক্লাইন

বর্তমান শিল্প জগতে পিকাশো একটি বিশিষ্ট নাম। আধুনিক কালের শিল্প কলার ক্ষেত্রে এঁর অবদান অনস্বীকার্য্য। তবুও বর্তমানে পিকাশোর শিল্প প্রতিভার সঙ্গে আধুনিক মত-

বাদের অন্যান্য শিল্পীদের সংঘাত দানা বাঁধছে। কিছুদিন আগে বার্ণাড বুফে ফরাসী দেশকে আড়োলিত করে তুলেছিলেন। ছবির মূল্য পিকাশোর ছবির তুল্যই ছিল। অল্প বয়সেই বুফে অনেক বেশী নাম কিনেছিলেন—কিন্তু বুফের ক্রমবিলীয়মান মূর্তির পাশে আর এক বুদ্ধি-বাদী—শিল্পীর অদ্ভুদ মতবাদের স্ফুরণ দেখা দিল। আধুনিক কালে ফরাসী দেশে তাঁর অসামান্য আধিপত্য। এ'র নাম ক্লাইন। ইনি জীবন্ত নারীদেহের সম্মুখভাগে রং লাগিয়ে মডেলকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ক্যানভাসে চলাফেরা করতে বলেন— তাতে করে যে সমস্ত ফর্মের সৃষ্টি হয় তাকে ক্লাইন বিশুদ্ধ ফর্ম বলে ঘোষণা করছেন। অনেক সময় স্বল্পসময়ে বেশী ছবি আঁকার তাগিদে মডেলের গায়ে রং লাগিয়ে ক্যানভাসে ছাপ তুলে নেওয়াও এ'র আর একটি পদ্ধতি। নীল রঙ্ এ'র মাধ্যম। এর মডেল সর্বদাই পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী নারী। আগে বুফে এবং পরে ক্লাইন—এ'দের উদ্ভব ফরাসী দেশে শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব বাঁধিয়েছে। তবুও বুফের শিল্পকাজে আধুনিক জগতের প্রতিফলন দেখি, সেখানে তিনি আশ্চর্য্য তুলির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছিলেন এক অদ্ভুদ শিল্প-মানস। কিন্তু ক্লাইন অ্যাকসিডেন্টাল কাজ করে শিল্পক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ফর্মের আমদানী ঘটাতে চাচ্ছেন। এই ধরণের বিশুদ্ধফর্ম নিয়ে পরীক্ষা সব দেশেই ঘটচ্ছে। বিশেষভাবে আমেরিকায় বর্তমানে শিল্পীরা রং ব্যবহারের মাধ্যমে—অ্যাকসিডেন্টাল ফর্মের আবিস্কারকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। তবে ক্লাইনের কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি জীবন্ত তুলি ব্যবহার করেছেন ওঁরা তা করেন নি। ক্লাইনের এই উদ্ভট-তত্ত্ব জানিনা কতকাল জনমানসের স্মৃতিতে থাকবে। তবে পিকাশোর কাজ এখনও আধুনিককালের এই ধরনের কাজের কাছে চ্যালেঞ্জ বিশেষ। অ্যাকসিডেন্টাল ফর্ম নিয়ে জগতজুড়ে আন্দোলন চলেছে। পিকাশোর কাজেও তার ছাপ আছে। তবে পিকাশোর কাজে একজন পিকাশোকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এ'দের কাজে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে ব্যক্তিসত্ত্বার বিলীয়মান বলয়ের মাঝখানে। আধুনিক কাজে এই প্রশ্ন আসছে— ব্যক্তিত্বের ক্রমশঃ বিলুপ্তির সংকেত কি পাওয়া যাচ্ছে? ছবিতে ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটে আমরা কি সবাই গণ্ডার হয়ে যাব?

আর্ট এ্যাপ্রিসিয়েসন কোর্স

কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে "আর্ট এ্যাপ্রিসিয়েসন কোর্স" আছে। শিল্পকলা বোঝার ক্ষেত্রে এই কোর্স নাকি অবশ্য পাঠ্য। সত্যি বলতে কি আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে এই সমস্ত বাজার চলতি সমালোচকেরা কি সেই কোর্স পড়ে শেষ করেছেন। বোধ হয় করেছেন তা না হলে এই ধরণের সমালোচনার ফল আমরা হাতে হাতে কি করে পাই। সমালোচকদের জন্য একটা স্কুল করা বিশেষ প্রয়োজন। বিখ্যাত সমজদার কিংবা বিদগ্ধ শিল্পীরা সেই স্কুলে পাঠ. নেবেন। শিল্পীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তখন আমরা কিছু সমালোচক পেতে পারি। জানিনা কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিল্পী শিল্প বিষয়ে ভাষণ দেন কিনা। সেখানে শিল্পীদের দিয়ে শিল্প-বিষয়ে আলোচনা করালে সমালোচকদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে তখন সমালোচনা আমরা পেতে পারি।

লণ্ডন

লণ্ডনে সম্প্রতি টমাস লরেন্সের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে রয়াল আকাদেমীর ডিপ্লোমা গ্যালারীতে। টমাস লরেন্সের ছবির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তিনি বুদ্ধজয়ী ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেনানায়ক এবং রাজপরিবারের বিশেষ শ্রেণীভুক্তদের প্রতিকৃতি এ'কেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে সেই সমস্ত ছবির মূল্য থাকলেও রস বিচারে সেগুলি মহৎ সৃষ্টির পর্য্যায়ভুক্ত নয় এই মত সমালোচকরা পোষণ করেন। উজ্জ্বল বর্ণের আধিক্য ছবিগুলিকে চাক্ষুষ চমৎকারিত্বে উপস্থিত করবে কিন্তু অতিরিক্ত কমনীয়তা ছবিগুলিকে বহুক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ করে তুলেছে। ছবির

পরিবেশ সৃষ্টিতেও শিল্পী অনেক সময় কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

স্যার জেকব এ্যাপষ্টিন বিখ্যাত ভাস্কর। লণ্ডনের টেট্ গ্যালারীতে এ্যাপস্টিনের বহু ভাস্কর্য্য নিদর্শনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। এ্যাপস্টিনের মানসিকতায় বিরাজ করছে বার্ণাড শ এবং অগাষ্টার্স জনের মাঝামাঝি সময়ের পটভূমি। অনেকক্ষেত্রে তাঁর ভাস্কর্য্য রীতিতে তিনি পুরোনো দিনের কারিকুরিকে উপস্থাপিত করেছেন। যখন ইউরোপের অন্যান্য শিল্পীরা নতুন কিছুর সন্ধানে অস্থির তখন তিনি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রীতিকে আপন শিল্প চাতুর্যে অনেক ক্ষেত্রে অভিনবত্ব দিয়েছেন। সেইকারণে তাঁর ভাস্কর্যে ডাচ্ শিল্পীর মানসিকতা অনুপ্রবেশ করেছে। তাঁর ভাস্কর্য নিদর্শন অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিকৃতিতে অ্যাসীরিয় পদ্ধতির পরিমার্জিত অবতারণা লক্ষ্যণীয়। তাঁর সৃষ্ট ল্যাজারসের মূর্তির পরিকল্পনাতে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। অধুনা সৃষ্ট ভাস্কর্য্য জেকব ও এঞ্জেল মূর্তিদুটিতে প্রিমিটিভ বন্যতার সঙ্গে তাঁর কল্পনা প্রবণতার সার্থক ও যথাযথ ছন্দভুক্তি ঘটে নি। যখনই তিনি তাঁর কল্পনা প্রবণতার সঙ্গে বিভিন্ন মতবাদের সূত্রগুলিকে একত্রিত করতে চেয়েছেন তখনই তাঁর ভাস্কর্য রীতিতে ছন্দভুক্তি অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এই মোহ থেকে যখনই তিনি নিজেকে মুক্ত করেছেন তখনই তিনি নিজ উপলব্ধিগত সত্যে উপনীত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি যথাযথভাবে রিয়্যালিষ্ট্। তখনই সেক্ষেত্রে শক্তিশালী ছন্দভুক্তিতে ভাস্কর্য অসামান্য প্রতিভায় উপস্থাপিত হয়েছে।

মাদ্রিদ্

এই বছরের শরৎ ঋতুতে মাদ্রিদ শহরের ক্যাসো ডেল রেটিরোতে ফ্রান্সিসকো গ্যয়োর একটি একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। গ্যয়ো শক্তিশালী শিল্পী। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক চিত্রই এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। গ্যয়ো প্রথাগত চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে বহুক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ বেদনার প্রতিচ্ছবি বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় চিত্রে স্থান দিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য শিল্প-কর্ম বিক্রয়ার্থে নীত

(ক) দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধর্মীয় মূর্তি। সমালোচকদের মতে মূর্তিটি ওলমেক্ সংস্কৃতিভুক্ত। মূর্তিটির প্রাপ্তিস্থান টাবাসকো, মেক্সিকো। সময়কাল খৃষ্ট-পূর্ব ৮০০-৫০০। মূর্তিটি সবুজ জেড পাথরের। উচ্চতায় সাড়ে তিন ইঞ্চি। মধ্য আমেরিকায় কলম্বসপূর্ব যে সভ্যতার উন্মেষ দেখা যায় তার উৎস মেক্সিকোর সমুদ্রকুলবর্তী লাভেন্টা শহরের আদি ওলমেক সভ্যতা। খৃষ্ট জন্ম দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে এই সভ্যতার বিকাশ হয় এবং আমেরিকার বিশেষতঃ মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এই সভ্যতার ধারা লক্ষিত হয়। লাভেন্টা শহর খনন করে জানা গেছে যে শহরের বয়স কাল অনেক। তবে যে মূর্তিটি খনন কাজের ফলে পাওয়া গেছে তার আনুমানিক সময় খৃষ্ট পূর্ব ৮০০ বৎসর।।

(খ) এডগার দ্যেগা কৃত "লা বেন" আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প কর্ম বিক্রয় কেন্দ্রে আনা হয়েছে। দৈর্ঘ্য সাড়ে ষোল ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাড়ে বারো ইঞ্চি এই ছবিবটি প্যাস্টেলে আঁকা। এই ছবিবটি প্রথম ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দ্যেগার চিত্রসূচীতে স্থান পায়। কাজটির মনোরম রমণীয়ত্ব মুগ্ধকর।

(গ) ক্যামিলী পিজারো অঙ্কিত আর একটি চমৎকার শিল্পকাজ বিক্রয়ার্থে এসেছে। দৈর্ঘ্যে ষোলইঞ্চি এবং প্রস্থে ১২ ইঞ্চি এই তেল রঙে আঁকা ছবিবটি ১৮৭১ সালে প্রথম প্রদর্শিত হয়। ইমপ্রেসোনিজিমের বয়সকালে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নিখিল বিশ্বাস

সাহিত্য সংবাদ

অশীতিপর এক বৃদ্ধ সাহিত্যিক দিন গুণছেন, কবে তাঁর পরবাসী জীবনের শেষ দিনটি ঘনিয়ে আসবে, কবে তাঁর নশ্বর দেহ নিঃশব্দে, অজ্ঞাতসারে সমাধিস্থ হবে আর তাঁর মৃত্যুসংবাদ গোপনে মস্কোর ক্রেমলিনের স্তব্ধ হাওয়ায় সামান্য ঢেউ তুলবে? এই চিন্তাই সেই পরবাসী বৃদ্ধ সাহিত্যিকের সকল চিন্তার সার হয়েছে কারণ কোনও নির্বাসিত লেখকের রচনা জনসাধারণের পাঠযোগ্য নয় যতক্ষণ না সেই লেখক মৃত বলে প্রমাণিত হচ্ছে আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এখনও সোভিয়েত রাশিয়ায় এই বিধিনিষেধ নিরঙ্কুশভাবে বর্তমান। সুতরাং নিয়মের পেষণে সাহিত্যিক মৃত্যু কামনা করছেন আর রাশিয়ার জনসাধারণ এক মহান সাহিত্যিকের সাহিত্যপাঠে সততই বঞ্চিত। আইভান বুনিশ কিম্বা স্পেলেফ ও সম্ভবতঃ এইরূপ চিন্তাই করেছিলেন কারণ তাঁদের জীবদ্দশায় সোভিয়েতের সাহিত্যপাঠকরা এই দুই দিকপাল সাহিত্যিকের রচনার স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

এই ত সেদিনের কথা, বুনিন প্যারিসে এবং সেরঘীব-ৎসেনেস্কি রাশিয়ায় পরলোক গমন করেছেন, এ'দের মৃত্যুর সাথে সাথে সোভিয়েত দেশের কালান্তরসেতুর এক একটি স্তম্ভ সময়ের স্রোতের ঘূর্ণিতে ধ্বসে পড়েছে কারণ এ'রা জার আমলে এবং বর্তমান সোভিয়েত আমলের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এবং সার্থক সাহিত্যিক। এই কালান্তরের সাহিত্যিক সাক্ষী সম্ভবতঃ আর একজন জীবিত আছেন, তিনি হলেন অশীতিপর বৃদ্ধ সাহিত্যিক বরিস জাইৎসেক যিনি বহুযুগ ধরে নির্বাসিত এবং স্বভাবতঃই পরবাসী। এখনও যাঁর সাহিত্যসম্ভারে বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ায় যে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল তার স্বাদ পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দী। মস্কোভা নদীর তীরে ওরেল সহর। সেকালের ওরেল সহরের দৃশ্যাবলী ছিল মনোরম, যেন তুর্গেনেফের কোনও উপন্যাসে বর্ণিত মধ্য-এশিয়ার বর্ণাঢ্য পশ্চাপদট। শহরের একপ্রান্তে খনিবিভাগের এক ইঞ্জিনীয়ার বসবাস করতেন, এই পরিবারেই ১৮৮১ সালে বরিস জাইৎসেফ জন্মগ্রহণ করেন। সহর হলেও ওরেলের সমাজে গ্রাম্য পরিবেশের প্রভাব ছিল উপরন্তু বিদ্বৎজনের অভাব ছিল না। এমত পরিবেশে যাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় তাঁর সাহিত্যজীবনে প্রকৃতির প্রভাব যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? মাত্র একুশ বৎসর বয়সে, ১৯০২ সালে তাঁর প্রথম গল্প "দি উলভস্" প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস "দি ফার কান্ট্রি" তিনি রাশিয়ার পাঠক সমাজকে উপহার দেন মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে, সেটা, ১৯১৩ সালের কথা কিন্তু যে উপন্যাসটির নাম সেকালে সকলের মুখে মুখে ফিরত তা রচিত হয় আরও পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালে যখন তিনি মস্কোয় বসবাস করতেন এবং সেই উপন্যাসটি আজও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে সর্বজনস্বীকৃত। উপন্যাসটির ইংরাজি অনুবাদের নাম "আসুর স্টার", পটভূমিকা মস্কো সহর। রচনাটি গীতিধর্মিতার আবরণে মধুর যার স্পর্শ শেকফের রচনায় সততই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু "আজুর স্টারের" লেখশৈলী

জাইৎসেফের একান্ত নিজস্ব।

স্রেদা শব্দের অর্থ বুধবার, সপ্তাহের এই দিনটিতে কয়েকজন তৎকালীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আলাপ আলোচনায় মগ্ন হতেন এবং তাঁদের সেই সাহিত্য-বাসরের নাম ছিল "স্রেদা"। সমিতির সভ্য সংখ্যা সীমিত-সংখ্যক হলেও প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং চিরায়ত সাহিত্যের স্রষ্টা। কয়েকজনের নাম বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আজও পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত যেমন শেকফ বুনিন, গর্কী, আন্দ্রিভ প্রভৃতি। বরিস জাইৎসেফ স্রেদার অন্যতম সাহিত্যিক-সভ্য ছিলেন। আজকে রাশিয়ায় স্রেদার কোন চিহ্নই হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু জাইৎসেফ আজো জীবিত আছেন।

১৯২১ সালে জাইৎসেফ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাওয়া বদলের জন্য তিনি স্বদেশের সীমা ত্যাগ করবার ছাড়পত্র লাভ করেন। জাইৎসেফ যখন বিদেশ গমনের জন্য প্রস্তুত সেই সময় আলেক্সি তলস্তয়, স্মেলেফ, বুনিন, মেরঝেকফ্স্কি, কুপরিন বলমন্ত এবং অপরাপর প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ অক্টোবর বিপ্লবের সমালোচনার জন্য এক সভায় মিলিত হন, জাইৎসেফ সম্ভবতঃ সেই সভায় যোগদানের জন্য বিদেশ গমন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রাখেন। জাইৎসেফ প্রথমে বের্লিনে উপস্থিত হন এবং জার্মান পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এখানেই তাঁর সাহিত্য সম্ভারের এক বিশেষ সংস্করণ ছয়খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জার্মানীর পর ইতালী ভ্রমণ শেষ করে তিনি ১৯২৪ সালে প্যারি সহরে বসবাস আরম্ভ করেন।

পরবাসী জীবন সম্বন্ধে আক্ষেপ থাকলেও জাইৎসেফের পক্ষে তা স্মরণীয় কারণ "এ্যবাউট মাইসেলফ" রচনায় তিনি বলেছেন "আমার পরিণত রচনাগুলি নির্বাসিত জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা—" অর্থাৎ তাঁর অন্যতম রচনাগুলির জন্মভূমি বিদেশ, স্বদেশ নয়। সারা ইউরোপের মধ্যে সম্ভবতঃ ইতালী তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে এবং তারই ফলস্বরূপ দেখি তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও রচনার পশ্চাদ্ভূমি ইতালী। জাইৎসেফ ফ্লোরেন্সের অমর কবি দান্তের মহাকাব্য রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। নির্বাসন ও স্বদেশত্যাগের পর ১৯২৬ সালে তাঁর সুদীর্ঘ উপন্যাস "গোল্ডেন প্যাটার্ণ" প্রকাশিত হয়, উপন্যাসটির বিষয়বস্তু চমকপ্রদ কিছু না হলেও তৎকালীন পাঠকসমাজে সাড়া জাগিয়েছিল কারণ রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন যা জাইৎসেফের রচনায় একান্ত বিরল।

রাশিয়ার বিদ্রোহের প্রথম কয়েকটি দিনের যে ছবি "আন্না" উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন তা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এই প্রসঙ্গে "স্ট্রেঞ্জ জার্ণি", "আফদোত জা-দি ডেথ" গল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য। রচনাগুলি ১৯২৯—৩০ সালের ফসল, এই সময় তিনজন বন্ধুর জীবনী রচনা করেন। তুর্গেনেফ, জুকফ্স্কি ও শেকফের জীবনকথা তিনি তুলির আঁচড়ে এঁকে রেখেছেন।

জাইৎসেফ প্রায় পনের বৎসরকাল আত্মজীবনীমূলক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৫২ সালে এই বৃহৎ রচনা ট্রিলজির আকারে প্রকাশিত হয়। জাইৎসেফের পরবাস-জীবনের মধ্যে স্বদেশ-চিন্তার অন্যতম স্বাক্ষর এই ট্রিলজি যা "গ্লেবস্ জার্ণি" নামে পরিচিত। এইত সেদিন মিউনিকে তাঁর উপন্যাস "মস্কো"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে।

রুশীয় সাহিত্যরথীদের মধ্যে জাইৎসেফের স্থান নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার কারণ তাঁর সাহিত্যকীর্তি কাব্যসুষমামণ্ডিত বাকধারায় পরিপুষ্ট, জীবনের প্রতি মমতা এবং শান্তিবাদের একান্ত পূজারী, তিনি সম্ভবতঃ শেকফ্ এবং বুনিনের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সারবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ পণ্ডিত পিয়ের পাস্‌কাল তাঁর সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করেন। জাইৎসেফের রচনার নিখুঁত সমালোচনার দ্বারা পাসকাল এক নিবন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার শেষে জাইৎসেফকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"Nobody would think of including you in the realists, there is too much tenderness, goodness and sympathy toward people in your works for that you have too much faith in the fact that human fate is not exhausted by earthly reality."

মানুষের নিয়তি এবং তার অমোঘ পরিণতির প্রতি বিশ্বাস জাইৎসফের আছে কিন্তু এই বিশ্বাস তাঁর কাছে ম্লান হয়ে আসে যখন তিনি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ প্রতিকৃতির দিকে ক্ষীণদৃষ্টি তুলে ধরেন। এখনও মুক্তির আশা তিনি পোষণ করেন, হয়ত মানুষ হিংসা দ্বেষ ভুলে গিয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে শিখবে। এই আত্মবিশ্বাস আজকের রূঢ় বাস্তববাদের যুগে যে ক্ষীয়মান কোনও নক্ষত্রের স্তিমিত আলোকের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর এই উপলব্ধির কথা তাঁরই এক উপন্যাসের নায়কের উক্তিতে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে —

"I have a belief which perhaps seems strange to anyone else: that my star is a protectress. I was born under her. I notice her first of all whenever I look at the heavens. For me she is beauty, truth, divinity. Besides that, she is a woman, and send me the light of love."

নিজের জীবন সম্বন্ধে জাইৎসেফের উপলব্ধি প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেছেন, আমি যা পেয়েছি তার তুলনা নেই কি দুঃখ, কি সুখ সব কিছুই লাভ করেছি অবিমিশ্র আনন্দের মাধ্যমে, বেদনা যেটুকু আছে তা ভুলবার অবকাশ কোথায়? একথা ভাবতে কষ্ট হয় যে আমার জীবনে আর স্বদেশের উন্মুক্ত প্রান্তরে লিলাক ঝোপের পাশে আঁকাবাঁকা মেঠোপথ ধরে বহুদূরে হারিয়ে যেতে পারব না। আজ আমি অশীতিপর বৃদ্ধ কিন্তু আজো অতীতের ওরেল সহরের ছোট গীর্জার মধুর ঘন্টাধ্বনি আমার স্থবির মনকে নাড়া দিয়ে যায় কেন?

সোভিয়েতের বর্তমান পাঠকসমাজ জাইৎসেফের রচনার কোন পরিচয়ই লাভ করে না কারণ তাঁর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু তার রচনা সোভিয়েতের সাহিত্যিক মহলে আজো পেঁছায় বিশেষতঃ "আজুর স্টার" উপন্যাসটি তাঁদের বিশেষ প্রিয়। সম্ভবতঃ আগামীকালে জাইৎসেফের রচনা রাশিয়ায় প্রকাশিত হবে কিন্তু মানুষ জাইৎসেফ তখন জীবিত থাকবেন না, সাহিত্যিক জাইৎসেফ হয়ত অমরত্ব লাভ করবেন। এই প্রসঙ্গে অপর এক হতভাগ্য সাহিত্যিকের কথা মনে পড়ে, তিনি হলেন "ডাঃ জিভাগোর" স্রষ্টা যিনি স্বদেশে পরবাস জীবন যাপন করেছেন, যাঁর কলম বন্দীদশা থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্ত হয়ে অসন্তোষের বারুদে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু প্রতিদানে তিনি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত সোভিয়েত জনসাধারণকেই করতে হবে। জাইৎসেফ ও পাস্তেরনাকের পরিচয় বহুদিনের, চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিল।

ইলিয়া এরেনবুর্গ সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় সমগ্র রাশিয়ার কাছে যে প্রশ্ন করেছেন তার সার মর্ম হল—মানুষ আজ গ্রহান্তর যাত্রার জন্য সচেষ্ট কিন্তু মনের আকাশ উন্মুক্ত করবার সঙ্গীত আজ কে শোনাতে চায়, সেই চারণ-কবিরা কোথায়? তলস্তয় কোথায়? শেকফ কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব সোভিয়েত জনসাধারণ দিতে পারবে না কিন্তু হয়ত আমরা পারি—আমরা পরমানন্দে বলতে পারি হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতে পারে এমন স্রষ্টা আজও পথ

দেখবার জন্য ধ্রুবতারা হয়ে আকাশে ধিকধিক জ্বলছে, যে আকাশে স্পুৎনিক হাউইয়ের মত এক বিঘ্ন বিশেষ। সে স্রষ্টা আজও জীবনবেদের মন্ত্র সোচ্চারে শোনাতে সক্ষম তিনি হলেন অশীতিপর কথা সাহিত্যিক বরিস জাইৎসেফ, কালান্তরের পরবাসী পথিক।

নূতন গ্রন্থ

দি লোটাস এণ্ড দি রোবোট : কোয়েস্‌লার।

আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাজগতের দিকপাল প্রবক্তাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসে তার মধ্যে অন্যতম হল এত প্রাচুর্যের মধ্যেও ইউরোপীয়রা এত অসুখী কেন? কিসের বুভুক্ষায় তারা দিশাহারা, কোন নীতি তাদের মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে?

এই প্রশ্ন এবং অপরাপর প্রশ্নের জবাব দেবার মত প্রাজ্ঞ ঋষি আজকের ইউরোপে সম্ভবতঃ একজনও অবশিষ্ট নেই তাই পাশ্চাত্যের চিন্তানায়করা প্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে আছেন, উদ্দেশ্য যদি কিছু সমাধান মেলে কারণ বহু উৎকট সমস্যার সমাধান প্রাচ্যের স্বল্পবাস ঋষিদের কৃপাতেই হয়েছে। প্রাচ্য, ইউরোপের এই আধ্যাত্মিক ও মানসিক বুভুক্ষার হুতাশন যজ্ঞে কতটুকু গব্যঘৃত দান করতে সক্ষম হবে তা পরীক্ষা করবার জন্য ওদেশের বহু দিকপাল সাহিত্যিক প্রাচ্যে অবাধ ভ্রমণে ব্যস্ত আছেন।

এমনই এক চিন্তাশীল লেখক সম্প্রতি প্রাচ্যে ভ্রমণ ও নিরীক্ষা সমাপ্ত করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হলেন আর্থার কোয়েস্‌লার, তাঁর নবতম রচনা দি লোটাস এণ্ড দি রোবোট গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় মিলবে। তিনি লোটাস ও রোবোট প্রতীক চিহ্নদুটি যথাক্রমে ভারতবর্ষ এবং জাপান দেশের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন। এই দুটি দেশ ভ্রমণ করে তিনি যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত আমাদের কাছে তেমন আবেদন করতে সক্ষম হবে না কিন্তু যে নির্মম সত্যের ছবি তিনি এঁকেছেন সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতাও সম্ভবতঃ আমাদের নেই।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তা কয়েকটি কথায় বিবৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ভারত এখন অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত তদুপরি আত্মিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কারণ এদেশের আত্মা কঠোর বাস্তববাদ বনাম চিরায়ত আধ্যাত্মিকতার অমোঘ আকর্ষণে ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা লাভ করেছে, এই সেই দেশ যেখানে আত্মা জৈবিক আকাঙ্খা এবং প্রবল কৃচ্ছসাধনের স্বপ্নে বিভোর। তারপর জাতীয় সরকার ও সমাজ পিতৃচ্ছায়ার আবছা অন্ধকারে আসন পেতেছে অর্থাৎ "বাপুক্রেসীর" ভজনা করছে—কোয়েসলার বাপু শব্দের অভিধানগত অর্থই ধরেছেন। ভারত সম্বন্ধে একজন প্রখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্যিকের মতামত আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে কোনরূপ সহায়তা করবে কিনা তা বিশেষরূপে বিচার্য্য।

ভারত ভ্রমণ শেষ করে কোয়েস্‌লার জাপানে গিয়েছিলেন, জাপান সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক হওয়াই উচিত কিন্তু তাঁর সেই বিবরণ পেশ করতে রাজী নই কারণ জাপান সম্বন্ধে তিনি যতই বক্রোক্তি করুন না কেন ইউরোপের বাইরে কোথাও যদি বসবাস করতে হয় তাহলে তিনি জাপানেই গমন করবেন। তবু আশার কথা এই যে সমগ্র এশিয়া তাঁকে একদম নিরাশ করেনি, প্রাচ্যে এখনও এমন একটি দেশ আছে যা ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট করতে পারে। এশিয়া সম্বন্ধে স্পষ্টভাষী কোয়েসলারের শেষ ইঙ্গিতটুকু উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে —

"To look to Asia for mystic enlightment and spiritual guidance has become as much anachronism as to think of America as the 'Wild West'......."

নো লংগার এ্যাট ইজ : সিনুয়া আকিবি।

অতলান্তিকের বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে স্লেভকোস্টের সোনালী বালুর তীরভূমিতে। ভেঙে পড়া ঢেউ ফিরে যায়, আবার ফিরে আসে দ্বিগুণ আক্রোশে, রেখে যায় কিছু ঝিনুক আর শামুকের রঙিন ঝিলিমিলি। উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল ছোটাছুটি করে সমুদ্রের ফেনা সংগ্রহের আশায়। বালুর উপর বিছান মাছ ধরা জালে অর্দ্ধ উলঙ্গ মানুষেরা মেরামতি কাজে ব্যস্ত, দারিদ্রের চিহ্ন তাদের সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। কিন্তু কিছু দূরেই লাগোস সহর যেখানে সব কিছু ছিমছাম ওখানে সাহেবেরা বাস করে অবশ্য কালাআদমী যে নেই এমন কথা বলা যায় না, তারা সাহেবদের থেকেও খারাপ।

ওবি ওকোনকো সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরেছে। সমগ্র ইবো উপজাতি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা চায় ওবি তাদের গ্রামে ফিরে আসুক কিন্তু সে সহরের মায়া কাটাতে পারছে না, লাগোস তাকে অসংখ্য প্রলোভনে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ওবির মানসিক চাঞ্চল্য সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, সেদিন থেকেই, যেদিন মোহময়ী ক্লারা ওবিকে বাহুডোরে বেঁধে কানের কাছে গুণ গুণ করে তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, সে ঘর বাঁধতে চায় সহরে, গ্রামে নয়। ক্লারার প্রেমগুঞ্জন আর গ্রামের হাতছানি ওবির মনে বিষম আলোড়ন তুলেছে, বিশেষভাবে সে সর্দারের কথাই ভাবছে তার আহ্বানকে উপেক্ষা করবার শক্তি ওবির আছে কি?

সহরের পঙ্কিল আবিলতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে ওবি ওকোনকোর কি পরিণতি হল তার সম্যক পরিচয় নাইজেরীয়ান কথা সাহিত্যিক সিনুয়া আকিবির "নো লংগার এ্যাট ইজ" উপন্যাসে পাওয়া যাবে। আধুনিক নাইজেরিয়ান সাহিত্যে পুরোভাগে যাঁরা আছেন তরুণ সিনুয়া আকিবি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। লেখকের গল্প বলার বলিষ্ঠ ভঙ্গী ও জটিল মনস্তত্ত্বের সরল বিশ্লেষণ উপভোগ্য। নাইজেরীয়ার আধুনিক সমস্যার প্ররিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রথম থপন্যাস "থিংস ফল এ্যাপার্ট" নাইজেরিয়ান কথা-সাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর অবদান।

অজিত দাস

স মা লো চ না

য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শতবার্ষিকী গ্রন্থমালা। বিশ্বভারতী। ৫.

আঠারো বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডেকাটান। অবশ্য বয়সের হিসাবে দুবছর মনে হলেও তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন দেড় বছর। এই সময়ে পত্রাকারে কয়েকটি রচনা লেখেন। তার কিছু প্রকাশিত হয় ভারতীতে, কিছু অন্য উদ্দেশ্যে লেখা।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। তারপর হিতবাদী সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়। তারপর সুদীর্ঘকাল কবি এগ্রন্থের আর পুনর্মুদ্রণ হতে দেননি। ১৩৪৩ সালে পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের মধ্যে আবার এ বইটিকে দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই বই যখন লেখেন তখন সবে কৈশোর প্রান্ত পার হচ্ছেন। অন্যবাঙালীর ছেলেরা ইংলণ্ডে গেলে মুগ্ধ হয়ে পড়ে তিনি যে মুগ্ধ হননি এইটী বোঝাবার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছিলেন ইংলণ্ডীয় সমাজের। এই রকম মনোভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয়নি।"

পরে এই আচরণের মধ্যে একটি আনন্দের বিষয় লক্ষ্য করেছেন সেটা হলো এই 'লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল-এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিষটা তারা আচ্ছন্ন করেছিল কিন্তু নষ্ট করে নি। এইটে আবিষ্কার করে আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে।'

পাশ্চাত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির দুটি দিক আছে একদিকে তিনি উদ্যমশীল, সচেষ্ট, সজীব প্রখরবুদ্ধি ইউরোপকে বোঝবার ও জানবার চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে তিনি তার স্বার্থপরায়ণ যন্ত্রানুগামী যান্ত্রিক রূপটিকেও দেখতে ভোলেন নি। তিনি কোন স্থির মতামতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ভালমন্দ দুই নিয়েই ইউরোপ; দুটো দিককেই তিনি বোঝবার ও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। অন্ধ বিদ্বেষ ও অন্ধ মোহ কোনটাই তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত ছিলনা।

য়ুরোপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের নানা আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র। সেদিক থেকে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম।

আর আশ্চর্য সাবলীলতা এর ভাষাতে। তিনি নিজেই বলছেন "য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে, সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলাসাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।" চলতি ভাষায় লেখা বই এর আগেও ছিল কিন্তু চলতি ভাষায় যথার্থ সাহিত্য রসের সঞ্চার যে এই প্রথম সে বিষয় নিয়ে বোধহয় কোন তর্ক নেই।

গ্রন্থশেষে মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জীতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ আছে। পাঠকের পক্ষে এর সহায়তা যে কতদূর যারা এর নিত্যব্যবহার করে থাকেন তারাই জানেন।

মঞ্জুলা বসু

Statement in Form IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1. Place of Publication	Calcutta.
2. Periodicity of its publication	Monthly.
3. Printer's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
4. Publisher's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
5. Editor's Name Nationality Address	Anandagopal Sengupta. Indian. 24, Chowringhee Road, Calcutta.
6. Names and addresses of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24, Chowringhee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated, 1st March, 1962.

(Sd.) A. G. SENGUPTA,
Signature of Publisher.

gd. No. C3597 Phone : 23-5155 March '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

ওই একটুখানি সরু শিকলে

কত মূল্যবান সময়ের অপচয় না হয়, ওর অপব্যবহার কত না নিদারুণ বিপদ ডেকে আনে। অথচ জরুরী অবস্থায় ট্রেন থামানোর প্রয়োজনেই তো ওই শিকল।

তুচ্ছ কারণে অবিবেচকের মতো এই বিপদ শিকল টেনে অগণিত যাত্রীর অসুবিধা ঘটানো, ট্রেন চলাচলে বিলম্ব ও রেলওয়ের ক্ষতি সাধন করা প্রায় নিয়মিত ঘটনা। বিপদ শিকলের এমনি অপব্যবহার যারা করে কর্তৃপক্ষের হাতে তাদের তুলে দেওয়াই সঙ্গত।

রেলওয়ে বিপদ শিকলের এই অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। ট্রেন চলাচলের নির্দিষ্ট সময় রক্ষা এবং আপনার ভ্রমণ ত্বরান্বিত করতে এই অভিযানকে সহায়তা করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

সম্পাদক—আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমাদের পত্র-পত্রিকা

১। উইক্‌লী ওয়েস্টবেঙ্গল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬, টাকা। ষাণ্মাসিক ৩, টাকা।

২। কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩, টাকা, ষাণ্মাসিক ১.৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২, টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১.৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিমবাংলা—নেপালী ভাষায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০

৬। মগরেবী বংগাল—সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩, টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়

খ। সবগুলিতে বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি, পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

এই ঠিকানায়
প্রচার অধিকর্তার
নিকট লিখুন

নবম বর্ষ। ১২ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' আটষট্টি

স ম কা লী ন

সূ চী প ত্র

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মনীষী ভল্‌তেয়ার

হরিপদ ঘোষাল

মোহভঙ্গ নতুন জীবন দর্শন—যুবা বয়সে ভলতেয়ার প্যারিসের সেলনে বিলাসহিল্লোলে ডুবে থাকতেন। বাস্টিল কারাগারে দুঃখভোগসত্ত্বেও তিনি জীবন সরোবরের আনন্দবারি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। সহৃদয় বন্ধু হিসাবে তিনি অতিথি সৎকারের প্রাণখোলা আনন্দে তাঁর হৃদয় পরিতৃপ্ত হত। তিনি নারী প্রেমের মধু উপভোগ করেছেন। জীবন ভোগের দুর্নিবার আসক্তি-সত্ত্বেও তিনি লাইবনিজের আশাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

উপর্যুপরি নির্যাতন, দুঃখভোগ, কারাবরণ, বার্লিন ও ফ্রাঙ্কফোর্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা আশার কুহক ভেঙে দিয়েছিল। তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে লিসবনের ভূমিকম্পে তিরিশ হাজার নরনারীর মৃত্যু সংবাদ তাঁর আশা ও বিশ্বাস সমূলে উৎপাটন করেছিল। অল সেন্টস্ ডে—খৃস্টান সাধুদের স্মৃতি উৎসব পালনের পর্ব-দিনে অসংখ্য ভক্ত ও উপাসকদের সমাগমে গির্জায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। মৃত্যু দূত ভূমিকম্পের রূপ ধারণ করে নিমেষের মধ্যে একত্রিত বহু লোকের উপর দারুণ আঘাত হেনেছিল। ফ্রান্সের পুরোহিতরা এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে লিসবনের অধিবাসীদের পাপের শাস্তি বলে প্রচার করেছিল। এই কথা শুনে ভলতেয়ারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।

ভগবান পৃথিবী থেকে অমঙ্গল দূর করতে পারেন, কিন্তু করেন না অথবা দূর করার ইচ্ছাসত্ত্বেও দূর করতে পারেন না—এই চিরন্তন জটিল প্রশ্ন সমাধান করার উদ্দেশ্যে ভলতেয়ার একটি কবিতা লিখেছিলেন। স্পাইনোজা বলেছিলেন, মঙ্গল এবং অমঙ্গল মানবিক সংজ্ঞা। সাধারণ মানুষের কাছে যা মঙ্গল বা অমঙ্গল, বৈশ্বিক দৃষ্টিতে তার অস্তিত্ব নেই। অনন্তের পটভূমির উপর মানুষের দুঃখ অতি তুচ্ছ বস্তু। ভলতেয়র এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি লিখেছিলেন, আমি বিরাটের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সকল প্রাণী, সমস্ত চেতন বস্তু নির্মম নিয়তির বিধান অনুসারে জীবন ধারণের দুঃখ বহন করতে বাধ্য হয়। তারা আমার মতো দুঃখ ভোগ করে, বাঁচে এবং মরে। এক সময়ে আমি জীবনের সুধারস পান করে আনন্দে গান করেছি।

ঘনায়মান অন্ধকারের ভিতর আলোর সন্ধান করেছি। কিন্তু এখন আমার সে বয়স নেই। আমার অবস্থা ধূলিশায়ী জীর্ণপত্রের মতো। দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অনুশোচনা না করে দুঃখ-ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কয়েক মাস পরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের 'সাত বৎসরের যুদ্ধ' আরম্ভ হয়। ভলতেয়র বলেছিলেন, এই আত্মঘাতী যুদ্ধ নিছক পাগলামি। সুদূর কানাডায় বিঘা কয়েক তুষারাচ্ছাদিত জমি অধিকারের জন্য ইয়োরোপে অনর্থ সৃষ্টি করা অর্থহীন।

জিন জেমস রুশো ভলতেয়রের কবিতার উত্তরে বলেছিলেন, মাদ্রিডের দুর্ঘটনার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। যদি আমরা ঘনবসতিপূর্ণ নগরে বাস না করে মুক্ত আকাশের তলায় বাস করতাম, তাহলে ঘরবাড়ি ভেঙে আমাদের মাথার উপরে পড়ত না। পাইকারি হারে একসঙ্গে এত লোকের ভবলীলা সাঙ্গ হত না। রুশো ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। তাঁর প্রকৃতি পূজা-ধর্মের জনপ্রিয়তা দেখে ভলতেয়রের আশ্চর্যের সীমা ছিল না। তীক্ষ্ণধী লেখক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য শ্লেষের শাণিত তরবারি ব্যবহার করেন। ভলতেয়র সেই অস্ত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর মতের সমালোচক এই পাগল লোকটিকে আক্রমণ করার জন্য ১৭৫৯ সালে তিন দিনের মধ্যে তিনি 'কানডিড্' নামে যে ছোট গল্পটি লেখেন সাহিত্যে তার তুলনা নেই।

এই গল্পটির মাধ্যমে ব্যঙ্গচ্ছলে ভলতেয়র মধ্যযুগীয় ধর্মশাস্ত্র এবং লাইবনিজের আশা-বাদের অসারতা প্রমাণিত করেছেন। বৃহত্তর সত্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে যে সব গোষ্ঠীগত এবং ব্যক্তিগত শ্রান্ত মতবাদ মানুষের সভায় প্রণতি দাবি করে, অসামান্য মানসিক শক্তি ও শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভলতেয়র তার অযৌক্তিকতা পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে-ছেন। একটি ছোট গল্পের সহজ স্বচ্ছ সরল বাক্যবিন্যাসের কৌশলে হাসি ও আনন্দ পরিবেশনের ভিতর দিয়ে তিনি পাঠকের মনে 'জগৎ দুঃখময়', এই মত বদ্ধমূল করে দিতে চেয়েছেন। বর্ণনামূলক এবং সংলাপপ্রধান এই ছোট গল্পে লেখক ব্যঙ্গ ও শ্লেষের শাণিত ছুরির সাহায্যে কতকগুলি প্রমাণিত ভ্রান্ত ধারণার মূল উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন।

বিদ্যাদিগগজ অধ্যাপক প্যানগ্লোস কানডিড নামে একটি সরলমতি নিরীহ যুবককে উপদেশ দিচ্ছিলেন, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। ঠিক সেই সময়ে বুলগার সৈন্য তার বাবার প্রাসাদ আক্রমণ করে। কানডিড বন্দী হল। সকল মানুষ এবং প্রাণীর পদদ্বয় ব্যবহার করার অধিকার আছে ভেবে সে পলায়ন করল। কতকটা পথ যেতে না যেতে সে ধরা পড়ল। সৈন্যদের ভিতর দাঁড়িয়ে তাকে ছত্রিশ ঘা বেত খেতে হবে, নইলে দুটো সীসার গুলি তার মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে, এই শর্তে সে মুক্তি পাবে তাকে জানান হল। সে জানত সকল মানুষের চিন্তায় স্বাধীনতা আছে। এজন্য সে কোন প্রকারের শাস্তি নিতে স্বীকার করল না। তাকে শর্ত মানতে বাধ্য করা হল। কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মতের স্বাধীনতা। এজন্য সে ছত্রিশ ঘা লৌহমুষ্টির গাঁট্টা খেতে রাজী হলো। দু'ঘা গাঁট্টা খাওয়ার পর লিসবনে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্টীমারে প্যানগ্লোসের কাছে শুনল যে তার পিতামাতাকে হত্যা করার পর তাদের প্রাসাদ ধ্বংস করা হয়েছে। অধ্যাপক বললেন, এই ঘটনা অপরিহার্য। কারণ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য সমষ্টির সৌভাগ্যের জনক। ব্যক্তির দুর্ভাগ্য বৃদ্ধির অনুপাতে সাধারণের মঙ্গল হয়।

লিসবনের ভূমিকম্পের পর এক দাসী তাদের বলেছিল, আমার দুর্ভাগ্যের তুলনায় তোমাদের দুর্ভাগ্য কিছুই নয়। আত্মহত্যা করে কতবার দুঃখ দূর করতে ইচ্ছা করেছি। জীবনকে ভালবাসি বলে তা করতে পারি নি। মনুষ্য চরিত্রের একটা মারাত্মক দুর্বলতা এই। যে দেহভার মানুষ—যে কোন মুহূর্তে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। তাকে সর্বদা বহন করার চেয়ে

হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু আছে কি? আর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে বলা যায়, যে শাসনকর্তার জীবনের চেয়ে দাঁড়িমাঝির জীবন বেশি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে এই বিষয়ে পরীক্ষা করার কষ্ট স্বীকার না করাই ভাল।

আগুনে পুড়ে মরার শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কানডিড পারাগেতে পালিয়ে গেল। সে দেখল সেখানকার যেসুইট পুরোহিতরা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী আর সাধারণ লোক নিঃস্ব। এমন ন্যায় ও সুবিচারের সুব্যবস্থা দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। একটা ডাচ্ উপনিবেশে তার সঙ্গে একজন নিগ্রোর দেখা হল। তার একখান হাত, একটা পা এবং পরণে এক টুকরো ন্যাকড়া। সে বলেছিল, যখন আখের ক্ষেতে কাজ করতে করতে কলে আমাদের একটা আঙুল কেটে যায়, তখন আমাদের একখানা হাত কেটে দেওয়া হয়, আর যখন আমরা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করি, তখন আমাদের একখানা পা কেটে দেওয়া হয়। ইয়োরোপে আপনাদের চিনি খাওয়ার এই মূল্য আমরা দেই। কানডিড কিছু সোনা সংগ্রহ করে সমুদ্র-তীরে এসে ফ্রান্সে আসার জন্য একখানা স্টীমার ভাড়া করল। কিন্তু স্টীমারখানা তাকে ফেলে রেখে সোনা নিয়ে চলে গেল। কানডিড জেটির উপর বসে চিন্তা করতে লাগল। একখানা টিকিট কিনে কানডিড বোর্দোর স্টীমারে উঠল। স্টীমারের উপর তার সঙ্গে মার্টিন নামে এক বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হল। কানডিড তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বিশ্বাস করেন, আজকালকার মতো পূর্বেও কি মানুষ পরস্পরকে হত্যা করেছে? সকল যুগের মানুষ কি মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক; ডাকাত দস্যু চোর নির্বোধ পাজি পেটুক মাতাল হিংসুক, উচ্চাভিলাসী নিন্দুক ব্যভিচারী ধর্মোন্মাদ নির্বোধ ভণ্ড?

তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর চিরকালই বাজপাখী পায়রা দেখলে তাকে ধরে খায়? কানডিড উত্তর দিল, নিঃসন্দেহে আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি বললেন, যদি বাজপাখীর প্রকৃতি চিরকাল এই থাকে, তাহলে মানুষ তার প্রকৃতি বদলাবে কেন? কানডিড বলল, তা বটে; কিন্তু মানুষের যে বিচারশক্তি আছে!

এই ভাবে নানা প্রকৃতির মানুষের ভিতর বহু দুঃখ ভোগ করে কানডিড তুরস্কে এসে কৃষক হিসাবে বাস করতে লাগল। প্যানগ্লোস তাকে বলেছিলেন, মনুষ্য বাসের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ স্থান এই পৃথিবীতে একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটি শিকলের গ্রন্থির মতো সংযুক্ত আছে। প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত না হলে, তোমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা না হলে, আমেরিকায় পালিয়ে না গেলে, তোমার সোনা চুরি না হলে, তুমি আজ এখানে লেবু আর পেস্তা খেতে পেতে না। কানডিড বলেছিল, আপনি যা বলছেন তা সব ভাল। আসুন, আমরা এখন বাগানের কাজে লেগে যাই। এই ভাবে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথনের সঙ্গে গল্পটি শেষ হয়ে গেল।

বিশ্বকোষ দর্শনের অভিধান—কানডিডের মতো সংশয়বাদের সমর্থক পুস্তকখানি যুগমানসের দিক-দর্শন যন্ত্র। চতুর্দশ লুই-এর সময়ের অভিজাতরা ঐতিহ্য এবং ধর্মমতবাদে আস্থাশীল ছিল না। ধর্মান্দোলন জার্মেনি এবং ইংল্যাণ্ডে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করলেও ক্যাথলিক ফ্রান্সের গোঁড়া আচারনিষ্ঠ সমাজকে স্পর্শ করতে পারেনি। ধর্মানুষ্ঠান এবং প্রাচীন ঐতিহ্যে অন্ধবিশ্বাসী যে ফ্রান্স উদারমতাবলম্বী হিনিটদের রক্তে হস্ত কলুষিত করেছিল, সেই ফ্রান্স লা মেট্রি, হেলভেশিয়াস, হল্‌ব্যাক এবং ডিডরো পিতামহদের ধর্মের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। লা মেট্রি (১৭০৯—৫১) ছিলেন যুদ্ধের চিকিৎসক। 'আত্মার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস' নামক

পুস্তক লেখার জন্য তিনি চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। "মানুষ একটি যন্ত্র" নামক পুস্তক রচনার জন্য তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত হন। তিনি ফ্রেডরিকের রাজ সভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সংস্কারমুক্ত ফ্রেডরিক প্যারিসের নবতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। লা মেট্রির মতে বিশ্বজগৎ ও মানুষ একটি যন্ত্র। আত্মা জড়। জড়েরও চেতনা আছে। তাদের প্রকৃতি যা হোক না কেন, তারা পরস্পরের উপর এমনভাবে কার্য করে এবং তাদের জন্মও বুদ্ধি এমনভাবে হয় যাতে তাদের সাদৃশ্য ও পারস্পারিক নির্ভরশীলতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। আত্মা বিশুদ্ধ হলে উৎসাহে দেহের উষ্ণতা অথবা জ্বরে মনের বিকার সম্ভব হত না। চেতনের পারস্পরিক কার্য এবং পরিবেশের ভিতর দিয়ে একটি মৌল বীজ পরিণমিত হয়েছে। প্রাণীর বুদ্ধি আছে। উদ্ভিদের বুদ্ধি নেই। এর কারণ এই যে, প্রাণী খাদ্য সংগ্রহের জন্য গমনাগমন করে এবং স্থাণু উদ্ভিদ যা পায় তাকেই খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। সকলের চেয়ে মানুষের বেশি অভাব ও গতিশীলতা আছে। এজন্য মানুষ সকলের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। যে সকল প্রাণীর অভাব নেই, তাদের মনও নেই।

লা মেট্রির মতের ভিত্তির উপর হেলভেশিয়াস্ (১৭১৫—৭১) 'মানুষ সম্বন্ধে' নামক পুস্তক রচনা করেন। লা মেট্রি নিরীশ্বরবাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। হেলভিশিয়াস্ তার নীতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বললেন, অহমিকা, আত্মপ্রীতি সকল কাজের মূল। বিবেক ঈশ্বরের বাণী নয়, পুলিশের ভয়। পিতামাতা শিক্ষক ও পুস্তকের উৎস থেকে বিধিনিষেধের যে স্রোত তরঙ্গ মনের উপর বয়ে চলে, তার তলানির নাম বিবেক। ধর্মশাস্ত্রকে নৈতিকতার ভিত্তি না করে সমাজ-বিজ্ঞানের উপর তার ভিত্তি রচনা করতে হবে। সমাজের প্রয়োজন নিয়ত পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনীয় ঐশী নির্দেশ কল্যাণপ্রসূ নয়।

বিপ্লবী লেখকদের প্রধান ছিলেন ডেনিস ডিড্রো (১৭১৮—৮৪)। হোলব্যাকের (১৭২৩—৮৯) বৈঠকখানায় ডিডরো'র সাঙ্গপাঙ্গদের মিলন স্থান ছিল। হোলব্যাকের মতের প্রতিধ্বনি করে ডিডরো বলেছেন সুদূর অতীতে অজ্ঞানতা ও ভয় থেকে দেবতাদের জন্ম হয়েছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বৈরতন্ত্রে নতিস্বীকার। এদের উত্থান ও পতন সমকালীন। সর্বশেষ পুরোহিতের নাড়িভুঁড়ির সঙ্গে সর্বশেষ নরপতির ফাঁসি দিলে মানুষ স্বাধীন হবে। স্বর্গ ধ্বংসের পর পৃথিবীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জড়বাদ চার্চের বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র। এর চেয়ে ভাল অস্ত্র না পাওয়া পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও শিল্প প্রসারে উৎসাহ দিতে হবে। শিল্প শান্তি স্থাপনে সাহায্য করবে আর জ্ঞান একটি নতুন ও অকৃত্রিম নৈতিকতা সৃষ্টি করবে। বিশ্বকোষের মাধ্যমে ডিড্রো এবং ডাল্যামবার্ট এই প্রকারের চিন্তাধারা প্রচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৭৫২—১৭৭২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বকোষের এক-একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। চার্চ বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ডগুলি নিষিদ্ধ করে দিল। বিরুদ্ধতা বৃদ্ধির সহিত ডিড্রোর বন্ধুরা তাঁকে পরিত্যাগ করল। এখন তিনি সঙ্গীহীন, একক। রোষদীপ্ত ডিড্রোর লেখনী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। তিনি বলেছিলেন, ধর্মশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কথা শুনলে মনে হয়, আস্তাবলে গরু-বাছুরের প্রবেশের মতো মানুষকেও খৃস্টান-ধর্মে আশ্রয় নিতে হবে। পেইন বলেছিলেন এই বুদ্ধি-যুক্তির বিচারের কষ্টি-পাথরে প্রকৃত কল্যাণ এবং সত্যকে যাচাই করা প্রয়োজন। বিচার-বুদ্ধি শৃংখল-মুক্ত হলে কয়েক পুরুষের মধ্যে নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে। এই সময় তিনি রুসোকে প্যারিসের পরিশীলিত সমাজে পরিচিত সমাজে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। প্রেম-প্রবণ শুচিবায়ুগ্রস্ত রুসোর মনে মুক্ত বুদ্ধির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হচ্ছিল তার সম্বন্ধে ডিড্রো কোন সন্দেহ করেন নি।

বিশ্বকোষ সম্পাদনায় যোগদান—ভল্টেয়ার বিশ্বকোষ সম্পাদকদের চক্রে প্রবেশ করলেন। তাঁরা আনন্দের সহিত তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে নিলেন। তিনি বিশ্বকোষের জন্য অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করলেন। এই বিষয়ে তাঁর কার্য সমাপন করে তিনি স্বয়ং একখানি বিশ্বকোষ রচনায় লিপ্ত হলেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম দর্শনশাস্ত্রের অভিধান। তাঁর বৈদগ্ধ ও জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অসংখ্য মণিমুক্তা চয়ন করে তিনি একটি অপূর্ব হার গেঁথে বিশ্বজনকে উপহার দিয়েছেন। বর্ণানুক্রমিক অনুসারে দর্শনের বিবিধ বিষয় তিনি এমন সংক্ষেপে অথচ সুললিত ভাষায় লিপি-বদ্ধ করেছেন যে, এই বিশ্বকোষ তাঁর অসংখ্য রসন্যাস ও নাটকের মধ্যমণি হিসেবে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা, বহুমুখী জ্ঞান বিরাট পাণ্ডিত্যের অবদানস্বরূপ অবিস্মরণীয় ক্লাসিকের স্থান অধিকার করেছে। শব্দের অনপচয়তায়, অর্থের স্পষ্টতায় ও বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রতিটি নিবন্ধ আদর্শ-স্থানীয়। কোন লেখকের একটি মাত্র রচনা বাগ্‌বাহুল্যে ক্লান্তিকর। অসংখ্য রচনায় ভলতেয়রের বাকসংযম অপূর্ব। এই বিরাট গ্রন্থে তাঁর আসল রূপটি ফুটে উঠেছে। কবিতা উপন্যাস ছোট গল্প রসরচনা নাটক বা রসন্যাসের লেখক হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি দার্শনিক ছিলেন।

বেকন দেকার্তে লক এবং অন্যান্য আধুনিক লেখকদের মতো সংস্কারমুক্ত খোলা মন নিয়ে তিনি আলোচনা আরম্ভ করতেন। সন্দেহ, সংশয়কে পাথেয় করে দার্শনিকতত্ত্বের গহনে প্রবেশ করতেন। তিনি বলেছিলেন, দর্শন-শাস্ত্রের প্রাণীরা হাতুড়ে-বিশেষ। দার্শনিকদের পক্ষে অধ্যাত্ম-বিদ্যা স্ত্রীলোকদের পক্ষে উপন্যাসের মতো একটা বিলাসের বস্তু। আমার এই ধারণা চিন্তা রাজ্যে অগ্রগতির সঙ্গে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়তা ধূর্তের লক্ষণ। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈশ্বর দেবদূত ও মন কি এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি জানতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি কি ভাবে সৃষ্টি হয়েছিলাম এবং কি ভাবে আমি জন্মেছিলাম তা আমি জানি না। জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসরের ভিতর আমি যা দেখেছিলাম, শুনেছিলাম বা অনুভব করেছিলাম তার কারণ আমি জানতাম না। সিরিয়াসের মতে বৃহত্তম নক্ষত্র এবং ক্ষুদ্রতম অণুকে জড়-পদার্থ বলে আমি জানি কিন্তু জড় কি বস্তু তা জানি না। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি সৎ ব্রাহ্মণের গল্প বলেছেন। ব্রাহ্মণ বলেছিল, আমি না জন্মালেই ভাল হত। তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—আমি চল্লিশ বৎসর শাস্ত্র পাঠ করছি। এখন দেখছি ঐ সময়টা বৃথা নষ্ট হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আমার দেহ জড়-পদার্থে গঠিত। কোন বস্তু চিন্তার জনক, জিজ্ঞাসা করলে তার সদুত্তর দিতে পারি নি। আমি অনেক কথা বলি। বলা শেষ হলে বিভ্রান্ত হই এবং যা বলেছি তার জন্য লজ্জাবোধ করি। আমার এক বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী জানে না আত্মা কি। এ সম্বন্ধে সে এক মুহূর্তও চিন্তা করে না, এমনকি, চিন্তা করার শক্তিও তার নেই। সে বিশ্বাস করে বিষ্ণুর অনেক অবতার আছে। আর সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য এক ঘটী গঙ্গা জল পেলে সে নিজেকে সুখী মনে করে। আমি হাজার হাজার বার ভাবি যে ঐ মেয়েটির মতো নীরেট অজ্ঞ হতে পারলে সুখী হতাম। তাহলেও এই ধরনের অজ্ঞতার সুখ আমি চাই না। কল্পনাপ্রসূত নতুন নতুন দর্শন উদ্ভাবন করার চেয়ে আমাদের এই অল্প জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। হিসেব করা, চিন্তা করা, মাপ করা দেখা প্রাকৃতিক দর্শন। আর সব নিছক কল্পনা।

জীবনের নতুন অধ্যায়—এই সময় থেকে ভলতেয়রের জীবনে একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি হয়তো দার্শনিকসুলভ স্থৈর্য ও শান্তির মধ্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়ে দিতেন। অভিজাতমণ্ডলী এবং বিদগ্ধ সমাজ তাঁর বিচার-প্রধান মতবাদ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেছিল। এমন কি ধর্মবাতিকগ্রস্ত, নির্বিচার বিশ্বাসচালিত গোষ্ঠীবদ্ধ ধর্মগুরুরা তাঁর

সংশয়বাদের প্রতি কতকটা উদাসীন ছিল। এজন্য তর্ক-বিতর্কের অবসর ছিল না। কিন্তু ঘটনা-চক্রের অনিবার্য আবর্তনে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। চার্চের গোঁড়ামি ও অবিবেচক কার্যের ফলে তিনি পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তাঁর বাসস্থান ফেরনির অনতিদূরে ফ্রান্সের সপ্তম নগর টুলোতে ক্যাথলিক পুরোহিতদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতাগর্বে অন্ধ যাজকরা নানটিসের (Nantes) নির্দেশ প্রত্যাহার এবং সেন্ট বার্থোলোসিউ-এর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিদিবস পালন উপলক্ষ্যে একটি বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করে। সেখানকার কোন নাগরিক ব্যবহারজীবী চিকিৎসক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা, মুদী বা মুদ্রাকর হতে পারত না। কোন ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভৃত্য বা কেরাণী নিযুক্ত করতে পারত না। ১৭৪৮ সালে একজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট স্ত্রীলোককে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করার অপরাধে একটি মহিলাকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা দিতে হয়।

টুলো নগরের জিন ক্যালাস নামে এক প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভদ্রলোকের একটি মেয়ে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে। তাঁর এক পুত্র সম্ভবত ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে। ঐ স্থানের আইন অনুসারে আত্মঘাতীর শবদেহকে উলঙ্গ করে একটা পাটার উপর উপুড় করে শুইয়ে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি-কাঠে ঝুলানো হত। এই অবমাননাকর শাস্তির হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার পিতার আত্মীয়স্বজনরা স্বাভাবিক মৃত্যু বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল। পাছে পুত্র ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে, এই ভয়ে পিতা পুত্রকে হত্যা করেছে বলে লোকের ভিতর কানাঘুষা চলতে থাকে। এই কল্পিত অপরাধের জন্য ক্যালাসকে গ্রেপ্তার করা হল। তার উপর কঠোর নির্যাতন চলে। ফলে তার মৃত্যু হয়। উৎপীড়ন ও ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পাড়িবার জন্য তার পরিবারবর্গ ফেরনিতে ভলতেয়রের নিকট পলায়ন করে। তিনি স্বগৃহে তাদের আশ্রয় দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। তাদের উপর এই ধরনের মধ্যযুগীয় বর্বর উৎপীড়ন দেখে ভলতেয়রের হৃদয় দুঃখে ও আশ্চর্যে অভিভূত হয়।

ঠিক এই সময়ে এলিজাবেথ সিরভেনস্ নামে একটি মহিলা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছে দেখে প্রোটেস্ট্যান্টরা নাকি তাকে কূপের জলে ডুবিয়ে মারে। একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোকের পক্ষে এই ধরনের গর্হিত কাজ সম্ভব নয় ভেবে তারা রক্ষা পায়।

১৭৬৫ সালে লা বারি (La Barre) নামে একটি ষোল বৎসর বয়স্ক যুবককে ক্রুশে বিদ্ধ যিশুখৃস্টের কয়েকটি প্রতিমূর্তি ভেঙে দিবার অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করার ফলে সে দোষ স্বীকার করে। তার শিরচ্ছেদন করা হয়। তাহার শবদেহকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তার কাছে ভলতেয়রের একখানি দর্শনশাস্ত্রের অভিধান ছিল। শবদেহের সঙ্গে পুস্তকখানিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

ক্যাথলিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষ ঘটনায় ভলতেয়রের হৃদয় ক্রোধে ও দুঃখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। জীবনে এই প্রথম তিনি ভাবগম্ভীর হয়ে উঠলেন। তাঁর মতো ডান্যাথার্টও রাষ্ট্র, প্রচলিত ধর্ম এবং সাধারণ মানুষের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের উপর বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করতেন। ভলতেয়র বলেছিলেন, এখন তামাসার সময় নয়। বিদ্রূপের সঙ্গে হত্যা খাপ খায় না। এই কি দর্শন ও আনন্দের দেশ? এই কি সেন্ট বার্থোলিউ-এর হত্যাকাণ্ডের দেশ নয়? ড্রেফাসের ব্যাপারে জোলা ও আনতোল ফ্রান্সের মতো ভলতেয়রও চার্চের অন্যায় অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি দর্শন ও সাহিত্য চর্চার শান্তিময় পথ ছেড়ে তিনি কর্মের কঠোর পথ গ্রহণ করলেন, অচলায়তন চার্চের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ফ্রান্সের সুপ্ত চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর শক্তিশালী লেখনী পরিচালিত হল। তাঁর দর্শন অগ্নিগর্ভ

ডিনামাইটে পরিণত হল। এই অস্ত্রের সাহায্যে তিনি শাস্ত্রের গোঁড়ামি ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের দুর্গপ্রাচীরের উপর অবিশ্রান্ত আঘাত হানতে আরম্ভ করলেন। তাঁর লেখনীনিসৃত বিচার ও যুক্তির অনলে প্রধান ধর্মগুরুর মস্তকের মুকুট দগ্ধ হয়ে গেল। তাদের শক্তির দুর্গ ভেঙে পড়ল। এমনকি সম্রাটের সিংহাসন টলমল করে উঠল। তিনি বন্ধু ও অনুগামীদের ডেকে বললেন, এসো দুর্ধর্ষ ডিড্রো! এসো সাহসী বীর ডালাথার্ট। তোমরা মিলিত হও। ধর্মোন্মত্ত শয়তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। তাদের প্রাণহীন নীরস বক্তৃতা, কুতর্ক, মিথ্যা ইতিহাস, তাদের অসংখ্য ভ্রান্ত যুক্তি ভেঙে চুরমার করে দাও। নির্বোধের কাছে বুদ্ধিমানকে মাথা নত করতে দিও। অনাগত কালের নতুন মানুষের সামনে যুক্তি ও স্বাধীনতার দরজা খুলে দাও।

কার্ডিনাল পদের প্রলোভন দেখিয়ে মাদাম দি পম্পাদুর চার্চের সঙ্গে তাঁর সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু বুদ্ধির রাজ্যের মুকুটহীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটকে ক্রয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাঁর প্রত্যেক চিঠির উপসংহারে দ্বিতীয় কেটোর মতো লিখতেন, দুর্নীতি ধ্বংস কর।

'পরমতে সহিষ্ণুতা' নামক পুস্তকে তিনি লিখেছিলেন, পুরোহিতরা যে ধর্ম প্রচার করে তদনুসারে যদি তারা নিজেদের জীবন গঠন করতে পারত, তাহলে আমি তাদের অযৌক্তিক ধর্মমত মেনে নিতে পারতাম। যে ব্যক্তি বলতে পারে, আমার মতো বিশ্বাস না করলে ভগবান তোমায় শাস্তি দিবেন, সে পরমুহূর্তে বলবে, আমার মতে বিশ্বাস না করলে আমি তোমায় খুন করব। অন্যের উপর নিজের মত চাপিয়ে দিবার অধিকার কারোর নেই। পুরোহিতদের শক্তির ভিতর পরমতে অসহিষ্ণুতার বীজ নিহিত আছে। সেই শক্তির ধ্বংস সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম সোপান। বাইবেলে যে কথায় নামগন্ধ নেই তারই অর্থহীন চুলচেরা তর্কের ফন্দিবাজীতে চার্চ-ধর্মের ধুরন্ধরেরা মস্তিষ্কের অপব্যবহার করে প্রাকৃত মানুষের ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।) চার্চের অনাচার দুর্নীতি অত্যাচার কুসংস্কার অবিবেক কার্যের বিরুদ্ধে নিজের নামে ও ছদ্মনামে পুস্তক-পুস্তিকা প্রবন্ধ নিবন্ধ সংলাপ চিঠিপত্র কবিতা গল্প কাহিনী ইতিহাস ভাষ্য ব্যঙ্গ রচনা উপদেশ ব্যঙ্গ রচনার বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল। আর কেউ দর্শনকে এমন রসনীয় ও জীবন্ত ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নি। আর কেউ লেখনী চালনায় এত নিপুণতা দেখাতে পারে নি। ভলতেয়রের প্রতিভা ফরাসী জাতির অমূল্য সম্পদ এবং জগতের বিস্ময়।

তিনি বিনয়ের সহিত বলেছিলেন, আমি যা ভাবি তা স্পষ্ট করে লিখি। আমি যেন ক্ষুদ্র নদী। তার গভীরতা নেই বলে তার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। তাঁর রচনা সকলে, এমনকি পুরোহিতরা পড়তো। সেকালে পাঠক সংখ্যা অল্প হলেও তাঁর কোন কোন পুস্তক তিন লক্ষ বিক্রয় হয়েছিল। এই ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসে অপূর্ব। তিনি বলেছিলেন, আজকাল বড় বই অচল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই সত্তর বৎসর বয়স্ক লোকটির অক্লান্ত পরিশ্রম, অভাবনীয় উৎসাহ এবং চিন্তার প্রাচুর্য জগতের লোকের বিপুল বিস্ময় উৎপাদন করেছিল।

বাইবেলের সমালোচনা—ভলতেয়র বাইবেলের প্রামাণিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের সমালোচনা করেছিলেন। পুরোহিত পদপ্রার্থী জাপাটার প্রশ্নমালা নামক পুস্তকে তিনি বলেছেন, জাপাটা সরল মনে জিজ্ঞাসা করেছিল, চার হাজার বৎসর ধরে যখন আমরা সাত শত ইহুদীকে পুড়িয়ে মেরেছি, তখন আমরা কি করে বলব যে তারা বিশেষভাবে ঈশ্বরের

স্নেহভাজন ছিল! ভণ্ড টেস্টামেণ্টের কাহিনী এবং তারিখের অসামঞ্জস্য দেখে এবং দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণ কি বুঝতে না পেরে সে সোজাসুজিভাবে প্রস্তাব করেছিল যে ঈশ্বর সকলের পিতা। তিনি সৎ-কাজের জন্য পুরস্কার দেন, পাপের জন্য শাস্তি দেন এবং ক্ষমা করেন। সে মিথ্যার জঞ্জালের ভিতর সত্য আবিস্কার করেছিল, ধর্ম থেকে ধর্মোন্মত্ততাকে পৃথক করেছিল, ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিল এবং সৎভাবে জীবন গঠন করেছিল। কিন্তু এই রকম সৎ দয়ালু ভদ্র বিনয়ী ব্যক্তিকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

ভলতেয়র ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, খৃষ্টান ধর্মের মতো পবিত্র ধর্ম আর নেই, যেহেতু এত দুর্বৃত্ততা ও নির্বুদ্ধিতাসত্ত্বেও এই ধর্ম সতের শত বৎসর জীবিত আছে। প্রাচীন কালের প্রায় সকল জাতির পৌরাণিক কাহিনী একই ধরনের। সুতরাং পুরোহিতদের কপোলকল্পিত। প্রথম শ্রেণীর সয়তান প্রথম পুরোহিতের সঙ্গে প্রথম নির্বোধের দেখা হয়েছিল। পুরোহিতরা ধর্ম সৃষ্টি করেনি, তাঁরা ধর্মশাস্ত্র সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করেছে। মাথায় ঘাম পায়ে ফেলেছে, আর তারা সুখে অলস জীবন কাটিয়েছে, তারা মানুষকে এমনভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মোন্মত্ত করে তুলেছে যে তারা ঈশ্বরকে ভয় না করে পুরোহিতদের ভয় করতে শিখেছে।

ভলতেয়রের ধর্মমত—ভলতেয়রের কোন ধর্মমত ছিল না, তা নয়। তিনি যে নাস্তিকতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিরীশ্বরবাদের মতে তিনি স্পাইনোজার সর্বেশ্বরবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভলতেয়র গোঁড়া হয়ে গেছেন। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, বিশ্বকোষ প্রণেতাদের এই অভিযোগের উত্তরে তিনি ডিড্‌রোকে লিখেছিলেন, জন্মান্ধ সনডারসনের মতো আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করি না। হয়তো আমার ভুল হতে পারে। বিশ্বজগতের সকল বস্তুর ভিতর এমন একটা আশ্চর্য শৃংখলা, এমন একটা সুন্দর নিয়ম আছে যে তা দেখে তাদের পিছনে একজন বিরাট সর্বশক্তিমান জ্ঞানময় কর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। তিনি কি এবং তাঁর সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে যেমন ধৃষ্টতা তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করাও তেমনি ধৃষ্টতা। তুমি তাঁর সৃষ্টির অন্যতম অংশ অথবা সেই অতি প্রয়োজনীয় অনন্ত বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কি না তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। তুমি যা হও না কেন, তুমি সেই বাক্যমনাতীত বিরাটের একটি যোগ্য ক্ষুদ্র অংশবিশেষ।

তিনি অনন্ত জ্ঞানময় স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও উপাসনার সার্থকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। দৈব সকল ঘটনার নিয়ন্তা। যথার্থ উপাসনা প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করার উদ্দেশ্যে পরিগণিত হয় না। ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় নিয়মকে গ্রহণ করাই প্রকৃত উপাসনা। ভলতেয়র বিশ্ববিধানের অমোঘতায় বিশ্বাস করতেন। সেই বিধানের ভিতরে ভগবান নিজেও হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ ঈশ্বর নিজেই বিধান। তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করেছেন। আত্মা সম্বন্ধে তিনি দুর্জ্ঞেয়বাদী। তাঁর মতে আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস নৈতিকতার জন্য আবশ্যক। পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তিতে বিশ্বাস না থাকলে ঈশ্বর বিশ্বাসের নৈতিক মূল্য নেই। সৎ-কার্যের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ কার্যের জন্য শাস্তি দিবার জন্য একজন ঈশ্বরের প্রয়োজন। ঈশ্বর না থাকলেও আমাদের সুবিধার জন্য তাঁকে সৃষ্টি করা দরকার। সাধারণ মানুষের হিতার্থে পুরস্কার ও শাস্তিদাতা ঈশ্বর অনস্বীকার্য।

বেইলের (Baylc) প্রশ্নের উত্তরে ভলতেয়র বলেছিলেন সমাজের সকল লোক দার্শনিক হলে নাস্তিক সমাজ থাকতে পারে। কিন্তু মানুষ ক্বচিৎ দার্শনিক হয়। সততার জন্য ধর্মের প্রয়োজন। আমার উকীল, আমার দর্জী এবং আমার স্ত্রী ঈশ্বর বিশ্বাসী হলে তারা আমার কম

চুরি করবে, আমাকে কম ঠকাবে। আমি মনে করি সত্যের চেয়ে সুখ ও জীবনের মূল্য বেশি। ধর্মের চেয়ে কুসংস্কার বেশি ক্ষতি করেছে। কুসংস্কার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনার পরম শত্রু। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে মানুষ বহু অপকর্ম করেছে। যিশুখৃষ্টের নামে তাঁর ভক্তরা অন্যায় করেছে, বলে তিনি সাধুদের ভিতর বসে দুঃখে অশ্রুপাত করছেন, ভলতেয়র এর একটি সুন্দর বর্ণনা করেছেন। অবশেষে তিনি নিজে একটি গির্জা নির্মাণ করে তার উপর লিখে দিয়েছিলেন, ইয়োরোপে এই একটি মাত্র গির্জা ভগবানের নামে উৎসর্গ করা হল।

ঈশ্বরভক্ত বা আস্তিককে—যে ব্যক্তি মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক। সে জানে ঈশ্বর নির্দয় না হয়ে পাপীকে শাস্তি দেন, সৎ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেন। ঈশ্বর প্রেমিক সকল সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে। মানুষ পরস্পরের ভাষা না বুঝলেও তার ভাষা সকলে বোঝে। পিকিন থেকে পেরু পর্যন্ত সকল মানুষ তার ভাই। সকল সাধুই তার বন্ধু। সে জানে দুর্বোধ্য অধ্যাত্ম শাস্ত্র এবং আড়ম্বর ধর্ম নয়। ঈশ্বর আরাধনা ও ন্যায় প্রকৃত ধর্ম। সৎ কার্যই তাঁর পূজা। ভগবানের কাছে আত্মসমর্থনই তার ধর্ম। মুসলমান তাকে মক্কায় তীর্থযাত্রা সুরু করতে বলে। খৃস্টান পুরোহিত তাকে গির্জায় যেতে বলে। সে হেসে তাদের কথা উড়িয়ে দেয়। কিন্তু দুঃখীকে সাহায্য করে এবং নির্যাতিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়।

রাজনৈতিক মতবাদ—ভলতেয়র চার্চের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দিনের পর দিন পুস্তকরূপ শত শত মানস-সেনা প্রেরণ করেছিলেন। প্রধান সেনাপতির মতো যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁর মন এতো ব্যস্ত ছিল যে তিনি রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অত্যাচারের দিকে লক্ষ করার সময় পান নি। তিনি বলেছিলেন, রাজনীতি আমার কার্যসূচীর বাইরে। মানুষের নির্বুদ্ধিতা দূর করে তার আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যারা নিজেদের খোপে বসে শাসনকার্য চালায় এবং যে সকল আইন-প্রণেতা গৃহে স্ত্রীকে শাসন করতে অসমর্থ, তারা বৃহত্তর জগৎ পরিচালনা করে আনন্দ পায়। আমি তাদের উপর বিরক্ত।

ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সংগে তিনি রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের অভাব মোচনের একমাত্র ঔষধ সম্পত্তি। সম্পত্তি ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ করে এবং মর্যাদা ভান সৃষ্টি করে। সম্পত্তি সচেতনতা মানুষের শক্তি দ্বিগুণ করে। নীতির দিক দিয়ে তিনি গণতন্ত্রের পক্ষপাতি। এর মহৎ দোষ দলগত বিরোধ সৃষ্টি। এর ফলে গৃহযুদ্ধ হয় না, কিন্তু জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়। যে স্বল্প পরিসর নিরাপদ ভৌগোলিক সীমার ভিতর মানুষের মন ঐশ্বর্যের বিষে কলুষিত হয় নি, সেইরূপ স্থানে গণতন্ত্র সার্থক হয়। সাধারণ মানুষ আত্মশাসনে অসমর্থ। গণতন্ত্র স্বল্পায়ু। সমাজের প্রথম অবস্থা গণতন্ত্র। তখন কয়েকটি মাত্র পরিবার একত্র বাস করে। আমেরিকার অনুন্নত ইণ্ডিয়ানদের ভিতর গোষ্ঠীগত গণতন্ত্র ছিল। আফ্রিকায় এই ধরণের অসংখ্য গণতন্ত্র আছে। ধনীরা অভিজাততন্ত্র চায়। সাধারণ লোক গণতন্ত্রের ভক্ত। রাজারা রাজতন্ত্রের পক্ষপাতি। মার্কাস ওরেলিয়াসের মতো রাজা থাকলে রাজতন্ত্র ভাল। দরিদ্রদের পক্ষে সকল গভর্ণমেণ্ট সমান। তারা একটা সিংহ অথবা একশটা ইঁদুরের ভক্ষ্য হয়।

জাতীয়তা ও যুদ্ধ সম্বন্ধে ভল্‌তেয়রের মত—ভলতেয়র জাতীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। সাধারণ অর্থে তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন না। নিজের দেশ ছাড়া অপর সকল দেশের প্রতি ঘৃণার নাম করা স্বদেশ প্রেম। যে ব্যক্তি অন্য দেশের ক্ষতি না করে নিজের দেশের উন্নতি করতে চায়।

সে একাধারে বুদ্ধিমান দেশপ্রেমিক এবং বিশেষ নাগরিক। যখন ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও প্রুশিয়ার সংগে যুদ্ধে লিপ্ত তখন তিনি ইংল্যান্ডের প্রশংসা করেছিলেন। রণোন্মাদে মত্ত সকল জাতিই সমান। তিনি যুদ্ধকে সকলের চেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। যুদ্ধের চেয়ে বড় অন্যায় আর নেই। আক্রমণকারী অন্যায়কে ন্যায়ের আবরণে ঢেকে দেয়। একটা মানুষকে হত্যা করলে শাস্তি হয়। রণভেরীর সহযোগে অসংখ্য লোককে হত্যা করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা নেই।

মাতৃগর্ভে মানুষ উদ্ভিদের অবস্থায় থাকে। শৈশবে তার অবস্থা ইতর শ্রেণীর মতো। কুড়ি বছরে তার বুদ্ধিশক্তির উন্মেষ হয়। দেহাবয়ব গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে তিন হাজার বছর লাগবে। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে অনন্ত কালও যথেষ্ট নয়। কিন্তু তাকে হত্যা করতে এক মুহূর্তের বেশি লাগে না।

রাষ্ট্র চিন্তা ও বিপ্লব—বিপ্লব এই অবস্থার প্রতিকার নয়। ভলতেয়র সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, সাধারণ মানুষ যখন বিচার করতে বসে, তখন সব পণ্ড হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ সর্বদা ব্যস্ত। সত্য অন্বেষণ ও দর্শন করার মতো সময় তার নেই। আজিকার গৃহীত সত্য যতদিন না মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় তত দিন সে মিথ্যাকেই সত্য বলে মনে করে। এইভাবে একটি ভ্রান্ত ধারণা আর একটি ভ্রান্ত ধারণার স্থান গ্রহণ করে। রাজনীতিক ভ্রান্ত ধারণার সুযোগ নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করে।

সমাজ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসাম্য শিকড় গেড়ে বসে আছে। মানুষ যত দিন মানুষ এবং জীবন যত দিন যুদ্ধ থাকবে তার শিকড় উপড়ে ফেলা কঠিন হবে। যারা বলে সকল মানুষ সমান তারা যদি ভাবে সকল মানুষ সমান ভাবে স্বাধীনতা, সম্পত্তি এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী, তাহলে তাদের কথা সত্য। কিন্তু পৃথিবীতে সাম্য যেমন স্বাভাবিক তেমনি অবাস্তব। অধিকার ভোগ করা পর্যন্ত সাম্য স্বাভাবিক। সম্পত্তি ও ক্ষমতাকে সমান ভাবে বণ্টনের চেষ্টায় সাম্য অবাস্তব হয়ে পড়ে। দেশের সকল লোক সমানভাবে শক্তিশালী নয়। কিন্তু তারা সমান-ভাবে স্বাধীন হতে পারে। স্বাধীন হওয়ার অর্থ আইন ছাড়া আর কারোর কাছে মাথা নিচু না করা। টার্গো কণ্ডরগেট, সিরাবো প্রভৃতি ভলতেয়রের শিষ্য ও উদার-পন্থীরা শান্তির পথে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অত্যাচার-পীড়িত লোক স্বাধীনতার চেয়ে সাম্য বেশি চেয়ে-ছিল। সাধারণ মানুষের বাণীময় প্রতিনিধি রুসো শ্রেণী বিন্যাসের প্রধান শত্রু ছিলেন। সমাজের উপর তলার মানুষ এবং নিচের তলার মানুষের ভিতর পার্থক্য দূর করে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যখন ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্ব রুসোর শিষ্য মারাঠ ও রোবসপীয়রের হাতে এসে পড়ল তখন তারা স্বাধীনতাকে হত্যা করে সাম্যের জয়গান করতে লাগলেন।

আদর্শ-বিলাসী বিপ্লবীদের কাল্পনিক রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প সম্বন্ধে ভলতেয়র সন্দিহান ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখায় অথবা সতরঞ্চের ছক কেটে সমাজ গড়া যায় না। সময়ের গতির সংগে সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। মানুষ নিয়েই সমাজ। মনুষ্য চরিত্র অত সহজ জিনিস নয়। যুক্তিবলে ভাবপ্রধান বা কর্মপ্রধান সীমার ভিতর সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সংসারের নিয়ত পরিবর্তনশীল বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে সমস্তই ওলট-পালট হয়ে যায়। অতীতের সূত্রকে একেবারে ছিন্ন করে, ঐতিহ্যকে পুরামাত্রায় নির্বাসন দিয়ে আইন-বলে অভিনব কাল্পনিক সমাজ সৃষ্টি করতে গেলে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ার মতো হয়। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে না দিলে অতীত জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকবে। যে জগতে আমরা বাস করি সে জগত থেকে দুঃখ ও অন্যায়কে দূর করার উপায় উদ্ভাবন করাই প্রধান সমস্যা। সত্য

বিচারবুদ্ধির দুহিতা। চতুর্দশ লুই-এর সিংহাসন অধিরোহণে বৃহৎ সংস্কারের আশায় সে উৎফুল্ল হয়েছিল দেখে বিচার-বুদ্ধি বলেছিল, আমি আরও বেশি সংস্কার চাই। কিন্তু সেজন্য সময় ও চিন্তা আবশ্যক।

ক্ষমতা হস্তগত করে টার্গো ভলতেয়রকে লিখেছিলেন, আমরা সুবর্ণ-যুগের প্রবেশ দ্বারে উপনীত হয়েছি। জুরির বিচার, পুরোহিতদের খাজনা লোপ, গরীবদের খাজনা থেকে অব্যাহতি প্রভৃতি আপনার অভিপ্রেত সকল প্রকার সংস্কার প্রবর্তিত হবে। পত্রের উত্তরে ভলতেয়র লিখেছিলেন, আমি দেখছি সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়ানো হচ্ছে। বিপ্লব। অবশ্যম্ভাবী। তাকে দেখার আনন্দ আমার ভাগ্যে নেই। ফরাসীরা সব কাজ বিলম্বে করলেও শেষ পর্যন্ত তা করে। তরুণদের ভাগ্য ভালো। তারা একটি সুন্দর জিনিস দেখবে।

ভলতেয়র এবং রুসো—প্যারিস এবং জেনেভা থেকে রুসো ভাবাবেগপূর্ণ চিন্তাধারার আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ফ্রান্সের জটিল হৃদয় দুটি মানুষের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। এ'দের প্রকৃতি বিরুদ্ধ-গুণবিশিষ্ট হলেও এ'দের হৃদয় ছিল ফরাসীসুলভ ভাবের অধিকারী। এক দিকে ছিল প্রতিভার আলো, মাধুর্য, অকাট্য যুক্তি, মুক্তবুদ্ধির ঔদ্ধত্য—অপর দিকে ছিল অগ্নিস্রাব, ভাবোন্মাদ, স্বপ্ন-বিলাস, একদিকে ভলতেয়রের বিচারবুদ্ধি পরিশীলিত মনে স্নিগ্ধতা সঞ্চার করেছিল, অন্যদিকে রুসোর সহজ বুদ্ধির উত্তেজনা জনমনে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। বিচারের সঙ্গে সহজাত বুদ্ধির সংঘাত এই দুই যুগমানবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। ভল্‌তেয়র চেয়েছিলেন বিচারবুদ্ধি ও লেখনী পরিচালনায় মানুষকে উন্নত এবং উপযুক্ত করে তুলতে। বিচারে রুসোর আস্থা ছিল না। তিনি ছুটে চলেছিলেন দ্বিধাশূন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ড আকর্ষণে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে। বিপ্লবের দুঃখ ও বিপদের সম্ভাবনায়, তাঁর বিফলতার নৈরাশ্যে তাঁর মন অবদমিত হয় নি। তিনি চেয়েছিলেন ঘাত-প্রতিঘাত বিক্ষিপ্ত সমাজের পৃথক অংশগুলিকে ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণ-শৃংখলে বেঁধে দিয়ে এবং সমাজের চিরাচরিত অন্যায় আচার-ব্যবহারের দৃঢ় শিকড়গুলিকে আমূল উৎপাটন করে ফ্রান্সে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কৃত্রিম আইনের বন্ধন ছিড়ে দিলে মানুষের ভিতর সাম্য ও ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁর মতে সভ্যতা বিজ্ঞান ও সাহিত্য কৃত্রিম সৃষ্টি। কৃত্রিম সমাজ সৎ জীবনের পরিপন্থী। এজন্য মানুষকে প্রকৃতির শান্তিরসাশ্রিত রাজ্যে ফিরে যেতে হবে। নিসর্গের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক স্থাপন করে তার সঙ্গে এক হয়ে মিলে যেতে হবে। স্বভাবের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার অবস্থাই সরলতা। সরলতা মানসিক স্বাস্থ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিচিত্র মতামত মনের স্বাস্থ্য নয়। স্বভাবের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্ব। নগরের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল থেকে দূরে আরণ্যক প্রকৃতির সৌন্দর্য-সুষমার ভিতর প্রাকৃত মানুষ এবং জীবজন্তুর অবস্থাই পরম কাম্য।

রুসোর প্রেরিত 'অসাম্যের উৎপত্তি' সম্বন্ধে পুস্তকখানি পাঠ করে ভলতেয়র রুসোকে লিখেছিলেন, আপনার মতো আর কেউ মানুষকে পশু বানাবার চেষ্টায় এতো বুদ্ধির পরিচয় দেয় নি। আপনার বই পড়লে হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ষাট বৎসর আগে আমায় এই অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আবার সেই অভ্যাসটা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। রুসোর 'সামাজিক চুক্তি' নামক পুস্তকে মানুষকে পশুত্বে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে ভলতেয়র লিখেছিলেন, একটা বানরকে মানুষ বললে যা বোঝায় রুসোকে দার্শনিক বলাও তাই। তিনি "ডাইওজিনিসের পাগলা কুকুর।" সুইস গভর্নমেণ্ট রুসোর বই পুড়িয়ে দিয়েছে শুনে

তিনি সুইস গভর্নমেণ্টকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি রুসোকে লিখেছিলেন, আমি আপনার লেখার একটি কথাও বিশ্বাস করি না। তবে আমার শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত আমি আপনার লেখার অধিকার সমর্থন করব। যখন রুসো তাঁর অসংখ্য শত্রুর ভয়ে পলায়ন করে-ছিলেন, তখন মত প্রকাশের স্বাধীনতায় একনিষ্ঠ সাধক এবং রুসোর মতের বিরুদ্ধবাদী মনীষী ভলতেয়র রুসোকে তাঁর গৃহে বাস করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ভলতেয়র মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা বালকোচিত নির্বুদ্ধিতা। বহু শতাব্দীর ধীর অগ্রগতির সঙ্গে সভ্যতা গঠিত এবং পুরুষ-পরম্পরায় মানুষের হৃদয়রসে অনুরঞ্জিত ও পুষ্ট। শৈবালসমাচ্ছন্ন সরোবর প্রস্ফুটিত কুমুদ কহ্লার-কোকনদে মনোরম হয়ে ওঠে। তেমনি বহু কুসংস্কার ব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্নীতি-দুষ্ট-সভ্যতা জাতির ঐতিহ্যে লাবণ্যমণ্ডিত হয়েছে। বর্বর মানুষের চেয়ে সভ্য মানুষের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদী। মনে রাখতে হবে যে মানুষ স্বভাবত শিকারী প্রাণী। সভ্য সমাজ তার আদিম পশুপ্রকৃতিকে সংহত করে, হিংসবৃত্তিকে সংযত করে এবং তার মন ও বুদ্ধিকে শতদলের মতো বিকশিত করে। সভ্যতার অনেক দোষত্রুটি আছে সত্য। যে রাষ্ট্র কঠোর পরিশ্রমী মানুষকে কর দিতে বাধ্য করে আর আলস্যপরায়ণ কর্মকুন্ঠ ব্যক্তিদের কর মকুব করে। সে রাষ্ট্র বর্বর পদবাচ্য। প্যারিসে বহু দুর্নীতি আছে। আবার তার বহু সুন্দর বস্তুও আছে। সেখানে অবাঞ্ছিত আমোদ-প্রমোদের মাদকতা আছে, দুঃখীর ক্রন্দন আছে, বিলাসিতায় আতিশয্য আছে, নৈরাশ্যের হা-হুতাস আছে। তা সত্ত্বেও সেখানে সভ্যতা লক্ষ্মীর সুবর্ণ আসনও পাতা আছে। সাহিত্য শিল্প, দর্শনের চর্চা আছে। বিদগ্ধ সমাজ আছে।

'পৃথিবী যেমন চলছে' নামক পুস্তকে ভলতেয়র বলেছেন, পার্সিপোলিক নগরকে ধ্বংস করা হবে কি না স্থির করার আগে দেবদূত ব্যাবুককে নগর পরিদর্শন করতে পাঠালেন। সেখানে পাপ ও দুর্নীতির রাজত্ব চলছে দেখে ব্যাবুক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুকাল পরে নাগরিক-দের চপলতা, কুৎসা প্রচারের অভ্যাস ও গর্বসত্ত্বেও তাদের সৌজন্য ভদ্রতা ও দয়াদাক্ষিণ্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাদের ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু তাঁর ভয় হয়েছিল যে দেবদূত দুর্নীতির জন্য তাদের শাস্তি দিবেন। একটি অভিনয় উপায়ে তিনি দেবদূতের কাছে তাঁর বিবরণ পেশ করলেন। মহামূল্য মণিমাণিক্য হীরা জহরতের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে দিয়ে একটি সুন্দর মূর্তি গড়িয়ে দেবদূতের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই মূর্তিটি পুরাপুরি হীরা-মাণিকে গড়া নয় বলে কি আপনি একে ভেঙে ফেলবেন? তখন দেবদূত পার্সিপোনিস ধ্বংস করার কথা ভাবতে পারলেন না। পার্সিপোনিস যেমন ছিল তাঁকে তেমনি রেখে দিলেন। এই গল্প দ্বারা ভলতেয়র বলতে চাইছেন, দুনিয়া যেমন তাকে তেমন ভাবে চলতে দাও। যখন কেউ মানুষের প্রকৃতিকে না বদলিয়ে প্রতিষ্ঠানকে বদলায়, তখন তার অপরিবর্তিত প্রকৃতি প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে ধ্বংস করে।

এখানেও সেই পাপচক্র—বীজ আগে, না গাছ আগে? মানুষ প্রতিষ্ঠান গড়ে, না, প্রতিষ্ঠান মানুষকে গড়ে? ভলতেয়র এবং উদারপন্থীরা ভেবেছিলেন যে, মানুষের বিচারশক্তি উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তাকে শিক্ষা দিয়ে শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে এই পাপচক্র ভেঙে পড়বে। রুসো এবং চরমপন্থীরা ভেবেছিলেন যে তীব্র ভাবাবেগপ্রসূত কর্ম সেই গোলকধাঁধা ভেদ করে প্রাচীন বিধিব্যবস্থা ও স্থবির প্রতিষ্ঠানের ইমারতকে ভেঙে চুরমার করে দিবে। তখন যে নতুন

প্রতিষ্ঠানের জন্ম হবে তাতে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতার রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে। কিন্তু সত্য কোথায়? সম্ভবত এই দুই মতবাদের উপরে। সহজাত আবেগের দুর্বার শক্তি ধ্বংস করে। বুদ্ধিই নতুনকে গড়ে। প্রতিক্রিয়ার বীজটি চরমপন্থী রুসোর মতবাদে অন্তর্নিহিত ছিল। শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগ সেই অতীতের কাছে নতি স্বীকারকরে, যে অতীত তাদের জনক এবং যার বেড়ী ভাঙতে তাদের এই উদ্দাম প্রয়াস। বিপ্লবের অগ্নিশিখা নির্যাতিত হৃদয়ের প্রয়োজনে দেখা দেয় অতীন্দ্রিয়তার নির্মল আলোকদ্যুতি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ফিরে আসে পুরাতন দিনের বাঁধাধরা নিয়ম ও শান্তি।

মাঝে মাঝে মানুষ জীবনের যাত্রাপথে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে। বিশ্বে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। পুরাতনকে পরিবর্তন করেছে। পাকা খুঁটিকে কাঁচিয়ে দিয়েছে। কারণ পরিবর্তনই মানবিক ধর্ম। কিন্তু পরিবর্তনের সংগে কিছুটা অপরিবর্তনীয় অংশ থেকে যায়। এমন কি পরিবর্তনের ভিতরেও অপরিবর্তনীয় অংশ উঁকি-ঝুঁকি মারে। পরিবর্তনের পালা শেষ হয়ে গেলে মানুষের ভিতর অপরিবর্তনীয় বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করে।

এমন কি যখন ফরাসী বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। যখন সাম্য মৈত্রীও স্বাধীনতার মন্ত্রে ফ্রান্সের আকাশ বাতাস অনুরণিত হচ্ছিল, তখন এ সেই অশীতিপর মানবতাবাদী বৃদ্ধ দার্শনিক ভলতেয়র ঋষিসুলভ প্রশান্তির মধ্যে ফেরনির উদ্যানে কৃষিকার্যে চিত্তবিনোদন করছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই আমাদের সেরা কাজ। তিনি আজীবন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন। তাঁর অলৌকিকের প্রতি টান ছিল না। তিনি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেননি। সুখের দিনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান নি। বিপদের সময় ত্রাণকর্তার কাছে প্রার্থনা করেননি। অথচ তাঁর পূর্বগামী এবং সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি কারোর চেয়ে কম ধার্মিক ছিলেন না। কবিতায়, গদ্য রচনায় নাটকে কোন তত্ত্ব প্রচার করেননি। তিনি প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ছিলেন কিন্তু চার্চের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুণ দার্শনিক চিন্তায় সমাহিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি প্রয়োগে তিনি সমাজনীতি ধর্মনীতি এবং রাজনীতির ভ্রান্তধারণা মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। বদান্যতায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। পরামর্শ গ্রহণের জন্য বহু লোক তাঁর কাছে আসত। তাদের উপর অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য তাঁর শক্তিশালী লেখনীর সাহায্য প্রার্থনা করত। অপরাধী বিশেষভাবে তার করুণার পাত্র ছিল। তার অপরাধ মার্জনার ব্যবস্থা করতেন। দীনদুঃখী মানুষের সমস্যাকে নিজের সমস্যা বলে ভাবতেন। সৎ-কাজে নিযুক্ত করে তাদের জীবিকা অর্জনের উপায় করে দিতেন। তাদের উপরে নজর রাখতেন এবং উপদেশ দিতেন। এক দম্পতী তাঁর কোন জিনিস চুরি করার পর হাঁটু পেতে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের হাত ধরে মাটি থেকে তুলে বললেন। ক্ষমা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত জানবে। ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর কাছে জানু নত করো না। তাঁর দরিদ্র ভাইঝির লালন পালন, তার শিক্ষা ও বিবাহের যৌতুকের ব্যবস্থা করা তাঁর প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাকে কেউ আক্রমণ করলে তার সংগে আমি সয়তানের মতো যুদ্ধ করি। আমি কারোর কাছে মাথা নিচু করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ভাল সয়তান জেনো। আমি শেষে হাসি।

১৭৭০ সালে তাঁর বন্ধুরা তাঁর আবক্ষ প্রতিমূর্তি নির্মাণের জন্য চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেছিল। বহু বড় লোক চাঁদা দিতে অগ্রসর হয়েছিল। তাদের কাছে সামান্য মাত্র চাঁদা নেওয়া হয়েছিল। ফ্রেডরিক জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে কত চাঁদা দিতে হবে। ভলতেয়র জানিয়েছিলেন, মাত্র পাঁচ শিলিং আর তাঁর নাম।

বহু বৎসর তিনি প্যারিসে থেকে নির্বাসিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর যৌবনের লীলা-স্থানকে দর্শন করার জন্য চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও পথশ্রম স্বীকার করে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। পরদিন তিন শত দর্শনার্থী তাঁর গৃহে এসে রাজকীয় সম্মানের সহিত তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে এমন কি সম্রাট ১৬শ লুই পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হলেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দর্শনার্থীদের অন্যতম ছিলেন। বৃদ্ধ মনীষী তাঁর পৌত্রের মাথার উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, ঈশ্বর ও স্বাধীনতার কাছে আত্মোৎসর্গ কর।

আকাদমিতে যাওয়ার পথে শোভাযাত্রায় হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। তিরাশী বৎসর বয়সে তিনি আইরেনী নাটক লিখেছেন দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্যাথলিক পুরোহিতদের আপত্তির জন্য অ্যারিনের সীমার বাইরে তাঁকে গোর দেওয়া হয়। বিপ্লবের পর ১৭৯১ সালে জাতীয় মহাসভার চাপে ১৬শ লুই তাঁর দেহের ধ্বংসাবশেষ প্যারিসে ফিরিয়ে আনতে আদেশ দেন। প্যারিসের রাস্তার দুধারে সমবেত ছয় লক্ষ নরনারীর দৃষ্টির সমক্ষে এক লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে শবাধার বহন করে এনেছিল। তার উপর লেখাছিল—তিনি মানুষের মনে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি আমাদের প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর সমাধির উপর লেখা ছিল—ভল্‌তেয়র এখানে শায়িত আছেন। অতুলনীয় প্রতিভাশালী ভল্‌তেয়রের জীবন এবং মৃত্যু এইরূপ ছিল। তাঁর জীবন যেমন মহীয়ান ও মৃত্যুও তেমনি গরীয়ান ছিল।

হাস্যরসের রূপ ও রসাভাস

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

হাস্যরসকে লইয়া আলোচনা করিতে গেলে হাস্যরসের আস্বাদনের বৈশিষ্ট্য এবং হাস্যরসের আভাস হইতে হাস্যরসের ভেদ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়। সকল রসেরই আস্বাদন সাধারণতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে—শব্দ প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং আঙ্গিক প্রধান অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, বিস্ময়, শান্ত প্রভৃতি স্থায়িভাব হইতে রসের নিষ্পত্তিতে সহৃদয় হইতেছে প্রধান কেন্দ্র, তাহার মধ্যে স্থায়িভাব বর্তমান থাকে। শৃঙ্গার রসে দুষ্যন্তের মধ্যে শকুন্তলার বিষয়ে যে রতিরূপ স্থায়িভাবের উদয় হইয়াছে তাহার আলম্বন শকুন্তলা। সুতরাং দুষ্যন্ত স্থায়িভাবের আশ্রয় এবং শকুন্তলা আলম্বন। সামাজিক অথবা পাঠক কোনক্রমেই স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ তাহারা বোদ্ধা বা রসবেত্তা। সামাজিকের হৃদয়ে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত, করুণ প্রভৃতি রসের উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু হাস্যরসের নিষ্পত্তি ধারাকে বিচার করিলে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। হাস্যরসাত্মক কোন দৃশ্যের যে ক্ষেত্রে অভিনয় হইতেছে, অথবা হাস্যরসপ্রধান প্রহসন যখন কোন পাঠক পাঠ করিতেছে তখন কেবলমাত্র আলম্বনেরই জ্ঞান হয়। শৃঙ্গার রসের ক্ষেত্রে যেমন নায়িকাবিষয়ক রতির আশ্রয় স্বয়ং নায়ক, হাস্যের ক্ষেত্রে সেইরূপ কোন স্থায়িভাবের আশ্রয় নাই। সাহিত্যদর্পণের লেখক বিশ্বনাথ এজন্য বলিয়াছেন—

> "বিকৃতাকার বাগ্বেষচেষ্টাদেঃ কুতুকাদ্ ভবেৎ।
> হাস্যো হাসস্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথ দৈবতঃ।
> বিকৃতাকারবাগ্বেষং যাদালোক্য হসেজ্জনঃ
> তদত্রালম্বনং প্রোক্তং তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।
> যস্য হাসঃ স চেৎ ক্বাপি সাক্ষান্নৈব নিবধ্যতে
> তথাঽপ্যেষ বিভাবাদি সামর্থ্যাদুপলভ্যতে।
> অভেদেন বিভাবাদি সাধারণ্যাৎ প্রতীয়তে
> সামাজিকৈস্ততো হাস্যরসোঽয়মনুভূয়তে।"

বিরূপ আকৃতি, বিকৃত বচন, অদ্ভুত বেশ প্রভৃতি হাস্যরসের আলম্বন, এজন্য "যদালোক্য" পদটি ব্যবহার করা হইয়াছে। বিকৃত ও অস্বাভাবিক যে কোন প্রকারের আচরণই উদ্দীপন। কিন্তু 'হাস্য'রূপ স্থায়িভাবের আশ্রয়রূপে কোন নায়কের অস্তিত্ব নাই। বিশ্বনাথ এজন্য বলিয়াছেন যে যাহার মধ্যে 'হাস্য'নামক স্থায়িভাবের প্রথম উদয় হয় তাহাকে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না।১ হাস্যরসাশ্রিত ও বীভৎসরসাশ্রিত পদ্যে বা গদ্যকাব্যে কেবলমাত্র আলম্বন-বিভাবেরই জ্ঞান হয়। সামাজিক আপনাকে নায়ক-নায়িকার সহিত অভিন্ন জ্ঞান না করিলে রসসৃষ্টি হয় না, অথচ স্থায়িভাবের আশ্রয় যে নায়ক সে হাস্যরসে অনুপস্থিত থাকায় হাস্যরস জন্মলাভ করিবে না। হাস্যরসের আশ্রয় যে সামাজিক বা বোদ্ধা, সে স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে না, কারণ লৌকিক জীবনের হাস, জুগুপ্সা, প্রভৃতি ভাব এবং অলৌকিক রস ইহাদের একাশ্রয়ে স্থিতি অসম্ভব। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও২. এই প্রকারের আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"ননু রতিক্রোধোৎসাহভয়শোক বিস্ময় নির্বেদেষু প্রাগুদাহৃতেষু যথালম্বনাশ্রয়য়োঃ

সংপ্রতায়ঃ, ন তথা হাসে জুগুপ্সায়াং চ, তত্রালম্বনস্যৈব প্রতীতেঃ। পদ্যশ্রোতুশ্চ রসাস্বাদাধিকরণত্বেন লৌকিক হাসজুগুসাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরিতি চেৎ। সত্যম্....“ অর্থাৎ হাস্যরসে আলম্বন ও স্থায়িভাবের আশ্রয়ের স্থলে কেবলমাত্র আলম্বনেরই প্রতীতি হয়। চিত্তবৃত্তিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে একই ক্ষণে কোন মানুষ রতি, হাস, শোক, প্রভৃতি লৌকিক ভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া সেই ভাবেরই পরিবর্তিত সীমাহীন আনন্দরূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ চিত্তবৃত্তির যে দুইটি ক্ষণে এই দুই প্রকার ভাবের অনুভব হয় তাহারা মূলতঃ ভিন্ন। অতএব হাস্যরসাত্মক দৃশ্যের অভিনয়ে সামাজিক 'হাস'রূপ স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারিবে না। এই প্রকার আশঙ্কা সত্য হইলেও হাস্যরসাশ্রিত পদ্যকে বিচার করিলে দেখা যায় যে শব্দসমষ্টির সংযোগে গঠিত যে শ্লোক অথবা পদ্যের অংশ পাঠ করা হইতেছে তাহাই স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের নিম্নলিখিত উদাহরণে—

“গুরোর্গিরঃ পঞ্চদিনান্যধীত্য বেদান্তশাস্ত্রাণি দিনত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্কবাদান্ সমাগতাঃ কুক্কুটমিশ্রপাদাঃ।”৩

কবিতাটির অর্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে কুক্কুটমিশ্র এস্থলে আলম্বন, তাহার পণ্ডিতম্মন্যভাব হাস্যরসের উদ্দীপন, গৌরবব্যঞ্জক উক্তি অনুভব, কিন্তু স্থায়িভাবের কোন আশ্রয় নাই। আমরা যদি এই স্থলে পদ্যটিকেই স্থায়িভাবের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে রসসৃষ্টিতে কোন হানি হইবে না। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য হইতে উদাহরণ লইয়া আমরা এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করিতে পারি। শ্রীমধুসূদন রচিত “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ” শীর্ষক প্রহসনে ভণ্ড ভক্তপ্রসাদ বাবু হাস্যরসের আলম্বন। তাহার সমস্ত আচার ও আচরণ, এবং সর্বশেষে হানিফ গাজীর নিকট হইতে পদাঘাত ও প্রহার লাভ, ইহারা মিলিতভাবে হাস্যের উদ্দীপন, কিন্তু ভক্তপ্রসাদের ব্যবহার দেখিয়া হাসরূপ স্থায়িভাবের দ্বারা অভিভূত হইতেছে এইরূপ কোন চরিত্র প্রহসনে নাই। সুতরাং হাসস্থায়িভাবের আশ্রয় প্রহসনে অনুপস্থিত। অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্মল হাস্যরসের আশ্রয় নিম্নোক্ত কবিতাটিকে বিচার করা যাইতে পারে ঃ—

“বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আটটা।
পেতল আঁটা লাঠি কাঁধে
গালেতে গালপাট্টা।
শালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে।
রায়বেশে নাচ নাচার ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে
বর হেসে কয় ঠাট্টা। (খাপছাড়া)”

কবিতাটির অর্থ বোধগম্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মর্মান্তিক রহস্যকারী বর হাস্যরসের আলম্বনে পরিণত হয়, তাহার বেশভূষা ও শালীর সহিত নিষ্ঠুর রহস্য ক্রমে উদ্দীপনবিভাবে পরিণত হয়, কিন্তু ক্ষণস্থায়িভাবের আশ্রয়রূপে কোন নায়কের সন্ধান পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা ছন্দোবন্ধ শব্দসমষ্টি রূপে যে কবিতাটি পাঠ করিয়াছি সেই কবিতাটিকেই (অর্থাৎ কবিতার চরণগুলিকে) হাস্যরূপে স্থায়িভাবের আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে রসসৃষ্টির পথে কোন তাত্ত্বিক বাধা রহিল না। পদ্যপাঠের ক্ষেত্রে না হয় ইহা সম্ভব হইল কিন্তু অভিনয়ের

ক্ষেত্রে কি হইবে? অভিনয়ে আলম্বনরূপে বিদূষক প্রভৃতি হাস্যকারী চরিত্র উপস্থিত, কিন্তু স্থায়িভাবের আশ্রয় নাই। অতএব এক্ষেত্রে স্থায়িভাবে আশ্রয়রূপে কোন পুরুষের কল্পনা করিতে হইবে, অর্থাৎ উদ্দীপনবিভাব প্রভৃতি যে আলম্বনে রহিয়াছে তাহাকে ছাড়া অপর কোন পুরুষের কল্পনা করিতে হইবে। এই পুরুষের স্থান কোথায় হইবে এবং এই প্রকার অনুমান রসাস্বাদে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কিনা এই শ্রেণীর শঙ্কার উদয় হইলে বলিতে হয় যে পুরুষান্তর কল্পনা করিলে বিভাব, আশ্রয়, এবং সামাজিক হইতে ভিন্ন পুরুষ বিশেষের প্রয়োজন নাই। সামাজিক অথবা দ্রষ্টা স্বয়ং সেই পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ স্থায়িভাবের আশ্রয় ও দ্রষ্টা সামাজিক এবং অলৌকিক রসের আস্বাদকও সেই সামাজিক স্বয়ং। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে লৌকিক হাস, শোক, প্রভৃতির যে আশ্রয় সেই ব্যক্তিই কি অলৌকিক রসের আশ্রয় হইতে পারে? কারণ আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে অলৌকিক রসের আস্বাদক কখনই স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে না। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে লৌকিক অনুভূতির এবং অলৌকিক রসের স্বাদের একাশ্রয়ে অবস্থান সকলক্ষেত্রেই সম্ভব। কারণ, কোন ক্ষেত্রে সামাজিকের কান্তা, অভিনয়ে নায়িকা এবং সামাজিক স্বয়ং দ্রষ্টা, সুতরাং স্বীয় পত্নী সম্পর্কীয় রতিস্থায়িভাবকে সামাজিক স্বয়ং লৌকিক রতির আধার হইয়াও আস্বাদন করিতে পারে এবং তাহাতেও শৃঙ্গাররস উৎপন্ন হয়। এজন্য অপর ৪ একস্থলে বলা হইয়াছে "বিভাবাদিং বিনা রসাভাব ইতি যত্র ন তদন্যতমস্য সাক্ষান্নির্দেশ স্তত্র উদ্দীপনাদিবদালম্বনস্যাপ্যঙ্গীকার্য্যত্বে তেন সমং সামাজিকস্যাপ্যভেদোঽঙ্গীকর্তব্যঃ।" বিভাবাদি ছাড়া রসবোধ হইবে না ইহা স্বীকৃত হইলে যেস্থলে আলম্বনবিভাব, স্থায়িভাবের আশ্রয়, নায়ক প্রভৃতির কোনএকটির অনুপস্থিতি দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে সামাজিকের সহিত তাহাদিগের অন্যতমের অভেদ অঙ্গীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ সামাজিক স্বয়ংই স্থায়িভাবের আশ্রয় হইবে। এস্থলে অপর একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়—রসের আলম্বন এবং আশ্রয় এই দুইএর উপস্থিতি রসনিষ্পত্তিতে প্রয়োজন, তাহার বিপরীত কিছু হইলে তাহা ত দোষের হইবে। এজন্য অনুভয়নিষ্ঠ রতি রসাভাসের জনক। কিন্তু হাস্যরস কি রসাভাস হইবে? ইহার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"সদ্ভাবশ্চেম্বিভাবাদের্দ্বয়োরেকতরস্য বাভবেৎ ঝটিত্যনসমাক্ষেপেতদাদোষো নবিদ্যতে অন্যসমাক্ষেপশ্চপ্রকরণবশাৎ। বিভাব প্রভৃতির কোন একটি যদি উপস্থিত না হয় তবে প্রসঙ্গ হইতে বক্তবোদ্ধব্য ভেদে তাহাকে কল্পনা করিতে হইবে, অথবা বিভাবের সাধারণীকরণ সামর্থ্য হইতেই ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অনুমান হইতে রসের সৃষ্টি সম্ভব নহে, অথচ রসের সৃষ্টি না হইলে হাস্যরসনিষ্পত্তিও সম্ভব নহে—এজন্য এই জাতীয় প্রয়োজন বোধ হইতে বিভাব প্রভৃতির সাধারণীকরণ সৃষ্টিতে যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই স্থায়িভাবের আশ্রয়কে কল্পনা করিয়া লইবে। অতএব হাস্যরসের রসাভাসে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় যে দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাষ থাকিলে যেরূপ হেতুর অবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ রসাভাস ও রসের একাধিকরণ স্থিতিও অসম্ভব। এজন্য শৃঙ্গাররসের আভাস ও শৃঙ্গাররস একস্থলে থাকিবে না, শৃঙ্গাররসের আভাস হাস্যরসবিভাবে পরিণত হইবে। কিন্ত আবার প্রশ্ন উঠে যে আলঙ্কারিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন হাস্যরস নীচপাত্র প্রযুক্ত—অর্থাৎ হাস্যরসের আলম্বনবিভাব নীচপাত্র। জর্জ মেরিডিথও "এসে অন কমিডি" গ্রন্থে বলিয়াছেন—"Comedy was never the most honoured of the muses." সুতরাং মার্জিত রুচিসম্পন্ন সাহিত্যরসিক কি অধম চরিত্রের স্থূল অঙ্গবিকৃতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি দেখিয়া আপনাকে আলম্বনের স্থানে বসাইয়া রসাস্বাদন করিতে পারিবে? বিভাব সম্পর্কে কোন অনুচিত বোধ থাকিলে বিভাবত্বসিদ্ধ হইবে না, সুতরাং উহাতে রসাভাস

হইয়া যাইবে। রসগঙ্গাধরে বলা হইয়াছে—"অনুচিত বিভাবালম্বনত্বং রসাভাসত্বম্।" এই অনৌচিত্যের স্বরূপ কি সে প্রসঙ্গেও বলা হইয়াছে যে, লোকব্যবহার হইতে ইহা জানা যাইবে। কিন্তু হাস্যরসের বিভাবের অনৌচিত্য লোকব্যবহার হইতে কিরূপে নির্ণয় করা যায়? সাহিত্য-দর্পণে বলা হইয়াছে যে গুরু, নমস্যব্যক্তি, অথবা মুনি প্রভৃতি হাস্যের বিভাব হইলে হাস্যরস সেই স্থলে হাস্যরসাভাসে পরিণত হয়। লোকব্যবহার হইতে হাস্যরসের আলম্বনের অনৌচিত্য জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আলম্বন যদি অধর্মচরিত্রের হয় তাহা হইলে প্রথম হইতেই ত অনুচিতজ্ঞান জাগ্রত থাকিবে! এজন্য "লোকব্যহারতঃ" কথাটির অর্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভরত বলিয়াছেন যে উচ্চশ্রেণীর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে হাস্যরস প্রচুর ভাবে দেখা যায় না। সামাজিক উত্তমপ্রকৃতির হইলে তাঁহার চিত্তে "ইহারা অধমপাত্র, ইহাদের মধ্যেই এই প্রকার স্থূলে আচরণ সম্ভব" এই প্রকার জ্ঞান জাগ্রত থাকে। এই জ্ঞান ঠিক বিভাবের স্বরূপের প্রতিবন্ধক নৈতিমূলক জ্ঞান নহে, অথচ ইহাতে সহৃদয় ও আলম্বন বিভাব এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে। পূর্বে ৫ হাসরূপ মনোভাব উদিত হইবার কারণরূপে অবজ্ঞা, ঈর্ষা, উপহাস প্রভৃতি সকল ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে সহৃদয়ের চিত্তে জাগ্রত থাকিয়া সহৃদয়ের চিত্ত ও আলম্বনবিভাব ইহাদের মধ্যে ভেদ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবে, সুতরাং রস-নিষ্পত্তির মূলে যে সাধারণীকরণ তাহা সিদ্ধ হইবে না। "নীচপাত্র প্রয়োজিতঃ" এই উক্তি এই অর্থকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলে। অতএব হাস্যরস রস হইল না, কিন্তু উহাকে হাস্যরসাভাসও বলা চলে না, তাহা হইলে অলঙ্কারশাস্ত্রে হাস্যরসের স্থান কোথায়, অন্যান্য রসের আভাস ও হাস্য কি অভিন্ন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে রস ও রসাভাসের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং রসাভাসের নিষ্পত্তির ধারা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। ধ্বন্যালোক গ্রন্থের লোচন টীকায় হাস্যরসের রসরূপ প্রাপ্তির পর্য্যায়গুলি বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শব্দের বাচ্য-শক্তি হইতে বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি, অথবা রসধ্বনি অনুমিত হয়। কিন্তু ধ্বনি সকল ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনাশক্তির কার্য্য তাহা কোনক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় হইবে না। রসাভাস, রসপ্রশম, প্রভৃতিও কোনক্ষেত্রেই শব্দেরদ্বারা বাচ্য নহে। ইহাদের মধ্যে ধ্বনিই প্রধান, অপর কোন ব্যাপার নাই। অতএব প্রশ্ন উঠে রস ও রসাভাস উভয়ক্ষেত্রেই যদি ধ্বনি প্রধান হয় তাহা হইলে রস ও রসাভাসের মধ্যে প্রভেদ থাকিল কোথায়? রসসৃষ্টিতে যেমন প্রথমে মুখ্যার্থের নিষেধ, তাহার পরে লক্ষণাশক্তির কার্য্য, তাহার পরে মুখ্যার্থের সহিত যোগও ব্যঞ্জনা ব্যাপার, প্রভৃতি ৬ ক্রমলক্ষ্য করা যায়—রসাভাস, রসপ্রশম প্রভৃতির মধ্যেও সেইরূপ মুখ্যার্থবোধ, লক্ষণাশক্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তির কার্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং রসসৃষ্টির অন্তিম পর্য্যায় যেমন পূর্ণ সত্ত্বগুণের জাগরণে আনন্দের অনুভূতি হইবে রসাভাসেও সেইরূপ। আলঙ্কারিকগণ কিন্তু রস ও রসাভাসকে পৃথক শ্রেণীরূপেই নির্দিষ্ট করিয়াছেন। লোচন টীকায় ৭ রসাভাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলাহইয়াছে যে কোন স্থায়ি চিত্তবৃত্তি ঔচিত্যের সহিত প্রবর্ত্তিত না হইলে, অর্থাৎ স্থায়িভাবের স্বরূপে বা প্রকাশে কোনও রকমের অসঙ্গতি থাকিলে তাহা রসাভাসের সৃষ্টি করিবে। এই অনৌচিত্য শব্দের কোন অনৌচিত্য নহে। অতএব রসাভাসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হইবে যে ইহাতে স্থায়িভাবে রসসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবে অনৌচিত্যের মধ্য দিয়া। এই অনৌচিত্যও একমাত্র উদ্দীপন বিভাবের মধ্যেই থাকিবে, কারণ, স্থায়িভাব রসরূপ প্রাপ্তির পর্যায় তখনই অনুসরণ করিবে যখন স্থায়িভাব স্বয়ং সিদ্ধ হইবে। স্থায়িভাব সিদ্ধ হওয়ার অর্থ রতি, শোক, হাস প্রভৃতি ভাবে কোন দোষ থাকিবে না। লোচন-টীকায় উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে "রাবণস্যেব সীতায়াং রতেঃ", যেমন রাবণের সীতার বিষয়ে

রতিরূপ স্থায়িভাব রাবণের চিত্তে জাগ্রত হইলেও সীতার চিত্তে রাবণবিষয়ক রতির উদ্রেক হয় নাই। রতি উভয়নিষ্ঠ না হইলে তাহা আর রতি থাকে না, কেবলমাত্র রাবণের চিত্তের অনুরাগ প্রবল দেহগত কামনার প্রকারভেদমাত্র। অতএব স্থায়িভাব যথার্থ স্থায়িরূপে প্রকাশ পায় নাই। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাবণ নায়ক হইলেও সীতার প্রতি তাহার কামনার স্থূলত্বের জন্য দর্শক বা পাঠক আপনাকে রাবণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে না। এজন্য স্থায়িভাব জাগ্রত হইলে তাহা অনুচিত ভাবেই জাগ্রত হইবে। সামাজিক বা পাঠকের চিত্তে এই ক্ষেত্রে অনুরাগমূলক শৃঙ্গারের উদয় হইবে না। অতএব অনৌচিত্যের রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। রাবণের সীতার প্রতি অনুরাগ দর্শনে সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত প্রথমে রাবণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং অনৌচিত্যজ্ঞানের পূর্বে রাবণকে সীতাবিষয়ক রতির 'আলম্বন'রূপে এবং সীতাকে রাবণবিষয়ক রতির আলম্বনরূপে সহৃদয়ের জ্ঞান হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে শকারকে প্রথমে দেখিয়া বসন্তসেনাবিষয়ক রতির আলম্বনরূপে এবং বসন্তসেনাকে শকারবিষয়ক রতির আলম্বনরূপে ভ্রম হইতেছে। উদ্দীপন বিভাব প্রভৃতিও রতি স্থায়িভাবকে জাগ্রত করিবার অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়া আনিতেছে। রাবণের কামনা ও তীব্র অভিলাষ প্রথমে তাহার সীতাবিষয়ক রতিকে সামাজিকের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতেছে এবং সামাজিক তন্ময়ভাবে রাবণের সীতাসম্পর্কীয় রতিকে আস্বাদন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে এখনও রসসৃষ্টি হয় নাই, কারণ সীতার হৃদয় রাবণবিষয়ক—অথবা বসন্তসেনার হৃদয়ে শকারসম্পর্কে রতি জাগ্রত হয় নাই, এবং সীতার মৌনীভাব ও অসম্মতি যাহা বস্তুতঃ তাহার অসম্মতিরই প্রকাশক, তাহাকে রতি বলিয়া রাবণ এবং দর্শক উভয়েই ভুল করিতেছে। পাঠক অথবা দর্শকের চিত্তও ক্রমে তন্ময় হইয়া উঠিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সীতার মনে রাবণ সম্পর্কে বিরাগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত রতিস্থায়িভাব শৃঙ্গাররসে পরিণত হইবার পথ অবলম্বন করিতেছিল এবং সামাজিক ও পাঠককুল সেইরূপ শৃঙ্গাররসের আস্বাদ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু রাবণবিষয়ক রতির আলম্বন হইয়াও সীতার চিত্তে যে মুহূর্তে বিরাগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল সেই মুহূর্তেই সীতার রতির আলম্বনত্ব বিনষ্ট হইয়া গেল। সহৃদয় পাঠক ও দর্শকের চিত্ত তখন রতির নিষ্পত্তিতে সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আলম্বনবিভাব স্থায়িভাব প্রভৃতির পৌর্বাপর্য্য ক্রম বিচার করিতে থাকে এবং বিভাবের অনৌচিত্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিভাবাভাসত্বজ্ঞান হয়। বিভাবাভাসত্ব অর্থে আলম্বনের অপূর্ণতা। বিভাবের অসম্পূর্ণতা হইতে স্থায়িভাবেরও আভাসত্ব আসিয়া পড়ে। সুতরাং রতি আর রতি স্থায়িভাবরূপে প্রতিভাত হয় না। অনুচিতভাবে প্রবর্তিত রতি এইস্থলে রতিরূপকে ত্যাগ করিয়া হাসস্থায়িভাবকে জাগ্রত করিল। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অভিনয়কালে রতিই ছিল স্থায়িভাব কিন্তু দর্শকগণের মধ্যে কেন হাসস্থায়িভাবের উদয় হইবে? রতি অসম্পূর্ণ হইলে ত তাহাতে অসম্পূর্ণ রতি বা রত্যাভাস বোধই হইবে। তাহা হইলে কি আটটি রসের যাহা আভাস তাহাই হাস্য, হাস্য নিজস্ব কোন রস নহে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে হাস্যরস ও রসাভাস এক নহে; কিন্তু রসাভাস হইতে হাস্য জন্মলাভ করে। কোন রসের অনৌচিত্য সেই রসের স্থায়িভাবের অনৌচিত্য হইতে জন্মলাভ করে, যেমন অনুচিত রতিতে শৃঙ্গারাভাস। কিন্তু হাস্যরসের স্থায়িভাব হাস্যে অনুচিত নহে, হাস্যের পক্ষে হাসস্থায়িভাব ঔচিত্যজনক, হাস্যের স্থায়ী অনুচিত হইলে তাহাতে হাস্যরসাভাস সৃষ্ট হইবে। নাট্যশাস্ত্রের টীকায় অভিনবগুপ্ত এবং নাট্যদর্পণে ৮ রামচন্দ্র গুণচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সকল

রসের আভাস হইতে হাস্যরসের জন্ম। অভিনবভারতী টীকা হইতে ইহা বিশেষভাবে বুঝা যায় যে রসাভাসকে সেস্থলে হাস্যবিভাবরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। রসচর্বণার কোন ক্ষেত্রে রসাভাস হইবে তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে কোন প্রধান রসের আস্বাদন হইতে হইতে তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইলে হাস্যরসের আস্বাদন হয়। হাস্যরস সৃষ্টির ক্রম ও রসাভাস ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য দেখা গেলেও মৌলিক ভেদ বর্তমান। শৃঙ্গার অথবা করুণরসের আস্বাদন চলিতেছে এইরূপ অবস্থায় যদি সহসা কোন অনৌচিত্যজ্ঞান উদিত হয় তাহাহইলে আর পূর্বের ন্যায় আস্বাদন হইতে পারে না। প্রবল লৌকিক সংস্কার সহসা জাগ্রত হইয়া অনুচিত বোধের সৃষ্টি করে। পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে পূর্বে আমরা ত দেখাইয়াছি যে স্থায়িভাব অনুচিতালম্বনকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তিত হইলে রসাভাস হইবে। তাহা হইলে অনৌচিত্য বোধ প্রথম হইতেই জাগ্রত না থাকিয়া অকস্মাৎ কেন রসাস্বাদনের মধ্যে জাগ্রত হইবে? লোচনটীকায় ৯ বলা হইয়াছে যে রসাভাস ভাবাভাস প্রভৃতিতেও রসের ন্যায় ব্যঞ্জনা-শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। ব্যঞ্জনাশক্তির প্রভাবেই রসাস্বাদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে কিন্তু অনৌচিত্যের জন্য কোন প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় না। কবির কাব্যরচনার এরূপ মহিমা অথবা অভিনয়ে অভিনেতৃবর্গের অনুকরণের এমনই শক্তি যাহাতে এই অনুচিত বুদ্ধি কাব্যপাঠের প্রথম হইতে অথবা অভিনয়দর্শনের প্রথমক্ষণ হইতেই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। রাবণের সীতার প্রতি আকর্ষণ দেখিয়া, অথবা শকারের বসন্তসেনার প্রতি স্থূল অনুরাগ দেখিয়াও কাব্যের রচনার নৈপুণ্যে অনুচিত বুদ্ধি প্রথম হইতেই সুপ্ত থাকে। রাবণের পক্ষে সীতাতে আসক্তি কামজ মোহমাত্র, শকারের পক্ষেও কামজ আসক্তি; কিন্তু দর্শক বা পাঠক ইহাকে অনুরাগ বলিয়া ভুল করে। নায়িকার অসম্মতিসূচক আচরণও সেই প্রকারে তাহার সলজ্জবিলাসরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই যথার্থ কোন অনুরাগ নাই, সামাজিক ভুল করিয়া এই অবস্থাকে পরস্পরাশ্রিত অনুরাগ রূপে গ্রহণ করিয়াছে, অথবা কাব্যের চমৎকৃতি ও বর্ণনার নৈপুণ্যের নিমিত্ত সামাজিকের অনুচিত বোধ সুপ্ত রহিয়াছে। এইরূপ স্থলে যথার্থ 'রতি' নাই, অথচ তাহাকে 'শৃঙ্গার' এই শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। রসিক পাঠক অথবা সহৃদয় সামাজিক কাব্যের মহিমায় অথবা অভিনয়ের নৈপুণ্যে এরূপ অভিভূত যে অনুচিত জানিয়াও তাহার আস্বাদন হইতে আনন্দ লাভ করিতেছে। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ সামাজিক নাটক ও উপন্যাসের পক্ষে এই যুক্তি প্রযোজ্য। বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি অনুরাগ, অথবা "বড়দিদি" উপন্যাসে সুরেনের প্রতি নিরুপমার অনুরাগ অথবা "চরিত্রহীন" উপন্যাসে দিবাকর ও কিরণময়ীর পরস্পর সম্পর্ক ইহাদের কোন ক্ষেত্রেই লৌকিকসংস্কার বা নিষেধজ্ঞান জাগ্রত হয় না। লোচন-টীকাকার এই অবস্থাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে শুক্তিতে সহসা যেমন কোন লোকের রজতভ্রান্তি হয়, অর্থাৎ শুক্তি দেখিয়া প্রথমে "ইহা রূপা" এইরূপ ভুল হয় ও পরে বিশেষভাবে দেখিয়া সেই ভুল নিবৃত্ত হয়,—এস্থলেও সামাজিক বা পাঠক যাহা বস্তুতঃ শৃঙ্গারাভাস তাহাকে শৃঙ্গাররূপে জ্ঞানকরে তাহাতে শৃঙ্গাররসেরই আস্বাদন হয়। এজন্য লোচনে ১০ বলা হইয়াছে "অতএব তদাভাসত্বং বস্তুতস্তত্র স্থাপ্যতে, শুক্তৌ রজতাভাসবৎ। এতচ্চ শৃঙ্গারানুকৃতি-শব্দং প্রযুঞ্জানো মুনিরপি সূচিতবান্। অনুকৃতিরসুখ্যতা আভাস ইতি হ্যেকোঽর্থঃ।" শৃঙ্গাররসের যেখানে অসম্পূর্ণ প্রকাশ—যাহাকে আমরা শৃঙ্গরাভাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি তাহাতেও শৃঙ্গাররসেরই আস্বাদন হয়। অবশ্য এই আস্বাদন ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। ভ্রান্তি-তেও এই আনন্দের আস্বাদন হয়। রামচন্দ্র গুণচন্দ্র ১১ এজন্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"উন্মিষন্তি চ ভ্রান্তেরপি শৃঙ্গারাদয়ঃ।" ধ্বন্যালোকের টীকায় ১২ হাস্যরস যে প্রধানভাবে

শৃঙ্গারাভাসরূপে ইহা দ্বিধাহীনরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সকল রসের আভাসও হাস্যরসের সৃষ্টি করিতে পারে। শৃঙ্গারাভাস হইতে হাস্যরসের সৃষ্টির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এইখানে যে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থায়িভাব সম্পর্কে কোন অনৌচিত্য জ্ঞান জাগ্রত হয় নাই ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রান্তিতেই সাধারণীকরণ ও রসাস্বাদ এই দুইটি পর্য্যায় সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু যে মুহূর্তে পৌর্বাপর্য বিচারের দ্বারা অনুচিত জ্ঞানের সৃষ্টি হইল সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ রসে তাহা আরোপিত হইল। বস্তুতঃ অলৌকিক আনন্দময় রস কোনক্ষেত্রেই আভাস নহে। শৃঙ্গাররসের আভাসে যে রসাস্বাদন হয় তাহা শৃঙ্গাররসেরই আস্বাদন, এই আস্বাদনের পরবর্তী-কালে হাস্যরসের আস্বাদন। লোচনটীকায় এজন্য বলা হইয়াছে যে ভ্রান্তিতে সাধারণীকরণ হইলে তন্ময়রূপে রসের আস্বাদন, পরবর্তীকালে অনৌচিত্যজ্ঞান জাগ্রত হইলে হাস্যরসের সৃষ্টি।১৩ অতএব রস ও রসাভাস এক নহে ইহাই আলঙ্কারিকগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। শৃঙ্গাররসের আভাস হইতে হাস্যরসসৃষ্টির এই ক্রম বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসাত্মক প্রহসন "বিয়ে পাগলা বুড়ো" হইতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যায়। ১৪ রবীন্দ্রনাথের "নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ" শীর্ষক কবিতায় দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক বর নবীন যৌবনের অনুরাগের আতিশয্যে নববিবাহিতা বধূকে সম্বোধন করিতেছে—

'জীবনে জীবনে প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুল্য নাই।
এস, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।

ভাষার অন্তর্নিহিত মাধুর্য এবং শৃঙ্গাররসের উপযুক্ত পরিবেশ প্রথমেই রসিক পাঠকের হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করিয়া দেয়, কিন্তু যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বধূ সরোদনে বলিয়া উঠে "আইমার কাছে শুতে যাই" তখনই বরবধূর বয়সের ব্যবধান এবং তাহাতে রতিরূপ স্থায়িভাবের উদ্রেকের অসম্ভাব্যতা রসিক পাঠকের নিকট ফুটিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। রতির অনৌচিত্য জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে রতিস্থায়িভাবের স্থলে সহসা প্রবল হাস্যের উদ্রেক হয়। এবং হাস্যের অনুভূতিই সহৃদয় পাঠকের অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়। করুণ রসের আভাস হইতেও যে হাস্যরসের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধির বাহিরে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত পাঠ করিলে জানা যায়। ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বঙ্গসন্তান যখন তাহার বিবাহিতা ব্রহ্মদেশীয়া স্ত্রীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া জাহাজঘাটে কপট রোদনের সহিত আংটি খুলিয়া নিয়াছে তখন স্ত্রীর নিকট বিদায় যতই করুণ হউক উপস্থিত দেশত্যাগীগণের নিকট তাহা নিষ্ঠুর হাস্যেরই জনক হইয়াছে।

রস ও রসাভাস লইয়া এই আলোচনার উদ্দেশ্য রসাভাসের স্বীকৃতি যে সার্বজনীন নহে তাহাই প্রতিপন্ন করা। হাস্যরস রসাভাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রসাভাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন যে বিভাব অনুভাব প্রভৃতির অনৌচিত্য হইতে রসাভাস-সৃষ্ট হয় এবং এই অনৌচিত্য লোকব্যবহার হইতে জানা যায়।১৫ কিন্তু এই লোকব্যবহারের অনৌচিত্য যুগভেদে দেশভেদে কালভেদে এমনকি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হইবে। সুতরাং রসাভাসের মূল হিসাবে যে অনৌচিত্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহা দুর্বল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যে রসাভাসের উল্লেখযোগ্য কোন উদাহরণ নাই। কুমারসম্ভব কাব্যের "মধুদ্বিরেকঃ কুসুমৈকপাত্রে" এই শ্লোকটিতে তির্য্যক্ যোনির রতি বর্ণিত হওয়ায় রসাভাস স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্য কোথাও লোকব্যবহারের অনৌচিত্যের জন্য রসাভাসের সৃষ্টি হইয়াছে এমন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিভাব প্রভৃতির অনৌচিত্যও অনেক ক্ষেত্রেই আরোপিত, সুতরাং রসা-

ভাসের মৌলিক কোন সত্তা নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত আমাদিগকে আশ্রয় করিতে হয়। রসাভাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র ইহাই বলা যায় যে বিভাব অনুভাব প্রভৃতিতে লোকব্যবহারের অনৌচিত্যের জন্য যে বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হয় তাহাই রসাভাস। এই বৈলক্ষণ্য কোন না কোন প্রকারে অসঙ্গতির মাধ্যমে চিত্তবৃত্তিকে আঘাত দিয়া হাস্যের সৃষ্টি করে। ইংরাজী সাহিত্যে রসাভাস-জাতীয় রসাস্বাদের কোন বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি পাঠ করিবার পর পাঠকচিত্তে পঠিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুর যোগ্যতা ঔচিত্য, অনৌচিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যে সন্দেহ ও দ্বিধার সৃষ্টি হয় তাহা অধ্যাপক হড্‌সন তাঁহার এ্যান্ ইন্‌ট্রোডাকশন টু দি ষ্টাডি অব লিটারেচার নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। যেস্থলে এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে অনৌচিত্যের জ্ঞান হয় তাহাকে আমরা রসাভাসের পর্যায়ভুক্ত করিতে পারি। এই প্রসঙ্গের অনুকূলে অধ্যাপক হড্‌সনের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা আলোচনা সমাপ্ত করিতে পারি ঃ—

"We can only suggest the importance of watching carefully the aftereffects of fiction upon ourselves. If, the spell of the moment being broken, we look back on a novel we have just been reading and become conscious that we have been tricked into strong feeling without sufficient or upon unworthy cause, that our emotion has been merely factitious and will not stand the impartial judgement of the next day, on that the interest aroused has been of that gross and morbid kind which leaves a taint upon the mind, then, no matter what may be its artistic merits, the book must stand condemned (page 209)".

১· কাব্যপ্রকাশের সুধাসাগর টীকাতেও বলা হইয়াছে "যস্য হাসস্তদনিবন্ধেঽপি সামর্থ্যাওদবসায়ঃ।"

২· বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সংযোগে রসসৃষ্টির যে ক্রম রসসঙ্গাধরে উক্ত হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য নন্দনতত্ত্বেও তাহার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ক্রোচে বলিয়াছেন — The complete process of aesthetic production can be symbolized in four stages which are (i) impressions (ii) expression or spiritual aesthetic synthesis (iii) hedonistic accompaniment, or pleasure of the beautiful (iv) translation of the aesthetic fact into physical phenomena (sounds, tones, movements, combinations of lines and colours etc.)".

৩। সাহিত্যদর্পণ পৃষ্ঠা ২০৮

৪· সাহিত্যদর্পণ, রুচিরা টীকা পৃঃ ২৬৬, কাব্যপ্রকাশ শ্রীধরী টীকা, পৃঃ ৮২

৫· সমকালীন পৌষ ও মাঘ সংখ্যা ১৩৬৮

৬· "মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোহথ প্রয়োজনাৎ। অন্যোহর্থো লক্ষ্যতে যৎস লক্ষণাহহরোপিতা ক্রিয়া" (কাব্যপ্রকাশ দ্বিতীয় উল্লাস) আরও বলা হইয়াছে "যস্য প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণা সমুপাস্যতে, ফলে শব্দৈকগম্যেহত্র ব্যঞ্জনান্নপরা ক্রিয়া। (দ্বিতীয় উল্লাস)

৭· ঔচিত্যেন প্রবৃত্তেরাস্বাদ্যত্বে স্থায়িন্যা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাস...। যদ্যপি তত্র হাস্য রসংগপতেব শৃঙ্গারাদি ভাবন্ধাস্য" ইতি বচনাৎ, তথাপি পাশ্চাত্যেয়ং সামাজিকানাং স্থিতিঃ। তন্ময়ীভবনদশায়াং তু রতেবেব আস্বাদ্যতা ইতি শৃঙ্গারতা এব ভাতি পৌর্বাপর্য্যবিবেকাবধীরণেন।" (পৃঃ ৭৮—৭৯ প্রথম উদ্যোত)

৮" "অনৌচিত্য প্রবৃত্তিকৃতং হি হাস্যবিভাবত্বম্। তচ্চানৌচিত্যং সর্বরসানাং বিভাবানুভাবাদৌ সম্ভাব্যতে।" (অভিনব ভারতী পৃঃ ২৯৬)

"সর্বরসানাং চাভাসা অনৌচিত্য প্রবৃত্তত্বাদ্ হাস্যরসস্য কারণম্। রাবণস্য হ্যবিষয়প্রবৃত্বাদ্ শৃঙ্গারাভাসঃ সতাং হাস্যমুপজনয়তি। (নাট্যদর্পণ পৃঃ ১৮৫)।" ।

৯। রসভাবতদাভাসতৎ প্রশমাঃ পূর্ণ কদাচিদভিষীয়ন্তে, অথ চাস্বাদ্যমানপ্রাণতয়া ভান্তি। তত্র ধ্বনন-ব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্।......পৃঃ ৭৮

১০· লোচনটীকা, চৌখাম্বা সংগ্রহ। পৃঃ ১৭৮

১২· পূর্বে ৭নং ১০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩· পাশ্চাত্ত্য তন্ময়ীভবনকালোত্তরকালভবা। পূর্বাপরবিবেকদশায়াং বিভাবাসজ্ঞানদ্বারা স্থায্যাভাস নিশ্চয়ন। বিভাবরত্যাদ্যোর্যৎ পৌর্বাপর্য্যং তদ্বিবেকস্যাবধীরণেন····(পৃঃ ৭৮-৭৯)

১৪· সমকালীন, ফাল্গুন সংখ্যাদ্রষ্টব্য। বৃদ্ধ রাজীবলোচন বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব। যুবক রতাকে কন্যার ছদ্মবেশ পরাইয়া উপস্থিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে রাজীবের চিত্তে তাহার সম্পর্কে প্রবল কামনার সৃষ্টি হয়। ইহা কিন্তু অনুরাগ নহে, কামনামাত্র। রতার ছদ্মবেশে উপস্থিত হইবারপর লজ্জাবনত মৌনভাব এবং রাজীবের আসক্তি এই দুইটি মিলিয়া শৃঙ্গাররসের পরিবেশ সৃষ্টি করিলেও ইহার অন্তর্নিহিত অসংগতি যেই ধরা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গারের আস্বাদন শেষ হইয়া যায়। অপরিণত শৃঙ্গার হাসস্থায়িভাবে পরিণত হয়।

১৫, "বিভাবাদৌ অনৌচিত্যং পুনর্লৌকিকব্যবহারতো বিজ্ঞেয়ম্!।" রসগঙ্গাধর পৃঃ ৯১৮

জীবন প্রেমিক ঃ কবি ওমর খৈয়াম

মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্র সফেন জীবন। নিস্তরংগ প্রশান্ত মৃত্যু। কর্ম সমুদ্রের সমস্ত তরংগ, সংহত হয় নৈস্কর্ম-দ্বীপের বিধাতার ক্ষমাহীন আলিংগনে। জীবন ও মরণ—জানা ও অজানা—পরিচিত ও অপরিচিত—সুস্পষ্টও অস্পষ্ট রহস্যময়। কুল ও অকুল। এ-নিয়ে আমাদের চিন্তার হিমালয় তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে। এর বিরাম নেই—শেষ নেই। যা আছে, তা নিয়ে আমরা তুষ্ট নয়; তা নিয়ে আমাদের মন হয়নি তৃপ্ত। তাই অন্তরের পরিতৃপ্তির মরুমায়াতে আমরা অজানার অভিসারে ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাত উপেক্ষা করে যমুনায় জল আনতে যাই। 'মন-রাই' অভিসারে চলে। কর্মে ও ধ্যানে হয় সত্যকার আত্মীয়তা। পথ পরিক্রমা চলতে থাকে অনন্তের পথে। অসীম চলার পথে নিত্য চলার ছন্দে জেগে ওঠে অনন্ত জিজ্ঞাসা। অনন্তপ্রশ্নের সমাধান খুঁজতে খুঁজতে একে একে বহু হোল সমাধিস্থ। অভিসার রজনী তবু পোহালো না—রহস্যের কুহেলী আবরণ উঠ্‌লো না। মানুষ তবু হার মানবে না। অমৃতের পুত্র মানুষ নিজেকে অমর করতে চায়, তাই সে যুগ-যুগান্তর ধরে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য সন্ধান করে চলেছে। সেই কবে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে বিচ্ছেদ এনে দিল মানব মনে মৃত্যুর রহস্য সন্ধানের নেশা, তার অবগুন্ঠন উন্মোচন করার অদম্য কৌতুহল। অজানা-কে জানার প্রচেষ্টা শুরু হোল। অতন্দ্র সাধনা চললো। রূপহীন মরণের রূপ উদ্ঘাটনের জন্য চললো সমুদ্র-তপস্যা। কবিরা এলেন, দার্শনিকগণ এলেন; এলেন কত কত দূত অবধূত—সন্ন্যাসী—তপস্বী। সবাই এলো, আর গেলো। মৃত্যু তবু 'উষার উদয় সম অনবগুন্ঠিতা' হোলনা। অজানা তবু মানুষকে ডাকে; মানুষ ছুটে যায়। মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করে, আর রহস্যের অতলে তলিয়ে যায় ঃ খৈয়াম বলছেন —

অজানা সে ওপারের লইতে উদ্দেশ পায়নি তো' কেউ সন্ধানে!
নিজেদেরই তাই কিগো একে একে যেতে হয় শেষ? অজ্ঞাত সে পথের খবর

কবি এখানে যদিও প্রশ্নের মাধ্যমে আপন বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তথাপি কবির মনে মৃত্যুর অমোঘ পরিণতি বিষয়ে কোন সংশয় ছিল বলে মনে হয় না। কারণ খৈয়াম-কবি যেখানে বলছেন ঃ—

সেখানে তিনি স্পষ্টই নাস্তিক্যবাদী, মৃত্যুর রূপকে অদ্ভুত ভাবালুতার দ্বারা আচ্ছাদিত করে অস্পষ্টতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি জীবন প্রেমিক—জীবন বিমুখিন হতে—তিনি চান নি। এ-পার ছেড়ে, অন্যপার তাকে মুগ্ধ করেনি। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভংগি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মৃত্যু তাঁর কাছে চরম—জীবন-ই পরম সম্পদ। তাই মৃত্যুকে খৈয়াম কবি 'মোহন'রূপে বা 'নবজীবনের যোগসূত্র' বা 'ক্রাউন লাইফ্' রূপে দেখেন নি। দিন-জীবনের প্রতি আস্থাবান কবির মনে দিনান্তজীবন কোন মোহ সঞ্চার করতে পারে নি। মৃত্যু তাঁকে কোন নূতন জীবনের শুভ সংকেত দেয়নি। তাই মৃত্যুকে তিনি চরম সমাপ্তি রূপেই দেখেছেন। জন্মান্তরবাদ ও পরকালে অবিশ্বাসী কবির এ ধারনা তাঁর বহু 'রোবাই'-এ স্পষ্ট প্রতিভাত হয় ঃ—

"মুহূর্তের শুধু অভিনয় গাঢ়তম চির অন্ধকারে
চলেছে লো এই বিশ্বময়, নট-নটী করিছে প্রবেশ!
সাংগ হলে রংগলীলা যবনিকা পারে, জীবনের অবসানে নাটকের-ও হয়ে যায় শেষ!"

যেখানে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের চেতনার প্রদীপ্ত উদার অংগীকার হোল ঃ

এক্‌কুল হইতে নবজীবনের কুলে
চলেছি আমরা যাত্রা করিতে সারা।

'মৃত্যু নব জীবনের সূচনা' এ-ভাবটী স্পষ্টতর হোল 'পূরবী'র 'বিস্মরণ' কবিতায় ঃ—

শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এধরণী যায় যদি বা ভুলি —
সেই ধূলারই বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে,

যেখানে কীট্‌স্‌, মেরেডিথ্‌, রোঁমা রেঁলা, সক্রেটিস্‌ প্রভৃতি বহু মনীষী দার্শনিক মৃত্যুকে এক জীবন থেকে আর এক জীবনে, দিন জীবন থেকে দিনান্ত জীবনে উপস্থিত হবার সেতু হিসেবে দেখেছেন; ওমর খৈয়াম সে-স্তরে পেঁছাতে পারেন নি না বলে, চান নি বললেই কবির প্রতি সুবিচার করা হবে। দিন-জীবন-ই ছিল তাঁর বড় প্রিয়। জীবন থেকে দূরে সরে তিনি জীবনকে কোন বড় কথার মোহে ভুলিয়ে রাখতে চান নি। তিনি জীবন-প্রেমিক, 'আত্মা'র চেয়ে 'অহং'কে তিনি গৌণ করে দেখেন নি। 'অহং'কে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'অহং'-ই তাঁর প্রিয়তম, 'আত্মা' নয়। তাই অদৃশ্যের চেয়ে দৃশ্যের, অজানার চেয়ে জানার, অস্পষ্টের চেয়ে সুস্পষ্টের, কল্পনার চেয়ে বাস্তবের, ইন্দ্রিয়াতীতের চেয়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের ও পরকালের চেয়ে ইহকালের প্রতি-ই তাঁর আস্থা তাঁর বিশ্বাস তাঁর প্রেম। কিন্তু অজানাকে জানার জন্য মোহান্ধ মানুষকে তিনি বিদ্রূপ করলেও নিজে সে চেষ্টা একেবারে করেন নি, একথা বলতে পারি না। চেষ্টা করে তিনি দেখলেন ঃ—

কেবল গেল না বোঝা যে রহস্য বুঝিবার নয়,
দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য চিরকাল —
মানুষের মৃত্যু আর ললাটের ভাগ্য-লিপি জাল!

জীবনকে তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষ প্রতি পদে-পদে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের জের টেনে চলতে গিয়ে এ-ভুবনের অপার আনন্দকে বরণ করতে ভয় পায়। ইহকাল-পরকালের হাজার রকম ভয় মানুষকে নিরন্তর মিথ্যাশংকার মোহে ফেলে রেখে এ ধরার আনন্দ যজ্ঞ হতে দূরে সরিয়ে রাখে। হিসাব করে তারা চলে—আশংকায় তরংগ গুণে তারা পা ফেলে আর পা তোলে। মুক্ত জীবনকে বন্দী করে রাখে। জীবনের অবাধ গতি পথহারা হয়। মৃতু-শংকায় শংকিত না থেকে কবি প্রাণ অনন্ত এ নিখিলের অসার আনন্দ উপলব্ধি করতে ব্যাকুল। ক্ষণস্থায়ী এ-জীবনে কবি তাই শাস্ত্র-বাক্যের নিষেধ শুনতে চান নি। জীবনের আহ্বান তাঁর কানে তাঁর প্রাণে সুমধুর সংগীতের সুর-মূর্চ্ছনা ঢেলে দিয়েছে। জীবন-মৃত্যুর প্রহেলিকার প্রশ্ন মেটাতে চিরদিন প্রাণান্ত যত্ন না করে ক্ষণিকের পার্থিব আনন্দকেই কবি-প্রাণ আদরে বরণ করে নিয়েছে। দুর্লভ এ-মানব জীবন যেদিন অনন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, সেদিন অনুতাপের তীব্র দহনে জ্বলতে হবে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন'-এর জন্য। ধূলার বোঝা ধূলায় মিশে যাবে—অন্তহীন অসাড় শীতল দেশ থেকে আর কোনদিনই সে এই বিপুল আনন্দধামে ফিরে আসবে না, তাই জীবনকে 'শুধু অন্ধ-বিশ্বাসের জোরে' বয়ে না নিয়ে জীবন-সুরা নিঃশেষ পান করতে বলেছেন ঃ—

পান করে নাও রাজা, যে কটা দিন এই জগতে জীবন আছে তাজা!
মুষড়ে যেদিন পড়বে মৃত্যুমুখে ফিরবে না আর কোনো কালেই এই ধরণীর বুকে।

'নৈবেদ্য'র কবিও বলেছেন ঃ—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।

জীবনকে ভালবাসাই কবির মুখ্য কাজ। জীবন বিমুখীন হতে তিনি নারাজ। ম্যাক্সিম্ গর্কি বলেছেন :—'টু নো লাইফ্ এ্যান্ড ইয়েট টু লাভ্ ইট্' ওমর কবি তাই করেছেন।

বৃথা তর্কের জাল বুনে বুনে জীবনকে উপবাসী রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। জীবনের স্বাদ পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য তিনি আপন খেয়ালেই চলেছেন এবং যারা নানা মিথ্যাশঙ্কায় মুষড়ে পড়েছে তাদেরকেও তিনি ডেকে বল্‌লেন :—

কতকাল ?—বল ওগো, আর কতকাল,—
দ্বিধায় ঘুরিবে শুধু লয়ে বৃথা তর্কের জঞ্জাল ?
রিক্তউপবাসী থেকে কিংবা তিক্তফলে
কেন মিছে সিক্ত হও ব্যর্থ আঁখিজলে ?
তৃপ্ত করো তার চেয়ে জীবনের সাধ,
কণ্ঠে ভরি দ্রাক্ষা-সুধা-অমৃত-আস্বাদ।
আনন্দ উচ্ছ্বাসে অনুরাগে
আজ যদি বর্তমানই শুধু ভাল লাগে,
কেন তবে অকারণে ভেবে তুমি হারাও সম্বিত
অনাগত কাল আশে —অথবা যা হয়েছে অতীত।

প্রত্যক্ষ বর্তমান-ই কবির প্রিয়। অপ্রত্যক্ষ ভাবীকাল নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন। অর্থাৎ ইহলোক তার প্রিয়, পরকাল নয়। ভারতীয় বেদান্ত দর্শন'র সাথে গভীর পরিচয় থাকা সত্বেও, 'যেনায়ম্ নামৃতাস্যাম" তত্ত্ব তাকে ভুলতে পারেনি। আত্মার আত্মীয় যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, তার কান্না হাসির গঙ্গা যমুনার চেয়ে বৈতরণী তাকে বেশী আবিষ্ট করতে পারেনি—তিনি ইহকালের অনুরাগী। জীবনের পরপারে কিছু আছে, এ-যেন তাঁর বিশ্বাসই হয়নি। তাই :—

পাঠাইয়াছিনু একদিন
আমার আত্মারে সেই পরিচয়হীন
সুদূর অদৃশ্যলোক যথা—
জানিবারে জীবনের ওপারের দু' একটি কথা!

দীর্ঘদিন পরে মোর আত্মা এসে ফিরে
ডেকে বলে ধীরে
চেয়ে দেখ স্বামী
স্বর্গও নরক তব একাধারে আমি।

কবি জীবনেই আত্ম-সমাহিত। 'মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর—'ঐ একই ভাবের পুনরাবৃত্তি। মানুষের মধ্যেই তিনি সবকিছু সীমিত করে দেখেছেন। জীবনের প্রতি তাই তাঁর গভীর অনুরাগ। জীবনকে তিনি তাই নিঃশেষে পান করতে চেয়েছেন :—

জীবন-সুরা শূন্য হবার আগে,
পাত্রখানি নাও ভ'রে নাও নিবিড় অনুরাগে

জীবন একবার নিষ্পেষিত হলে তা আর বেঁচে ওঠে না। বসন্ত চলে গেলে প্রকৃতির দরবারে আবার বসন্ত আসে কিন্তু জীবনে বসন্ত একবারই আসে। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে ষড় ঋতুর খেলা বিরাম-হীন—শেষহীন। শীতের রিক্ত বক্ষে বসন্ত আসে, গ্রীষ্ম এসে দগ্ধ করে বসন্তের সহাস শ্যামলিমা, প্রকৃতির দরবারে ওঠে মরুর হাহাকার, বর্ষার আগমনে আবার ভরে ওঠে মায়ের অঞ্চল—সবুজের সমারোহে. ঋতু পর্যায়ে শরৎ-হেমন্তের অবসানে আবার ভরে ওঠে ঝলমলিয়ে ওঠে মায়ের কোল পুষ্পের হাসিতে। এল বসন্ত। কিন্তু। মানবজীবন চিরশ্যাম তৃণের মত নয়, একবার দলিত হলে আর জাগে না। তাই দুঃখ-মগ্ন এই সংসারের তীরে যেটুকু সুখ, যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায়, কবির মতে তাকে ভোগ করে নেওয়াই শ্রেয় :—

মানবের সুখলিপ্সু ইন্দ্রিয়নিচয়
অবিরত কানে কানে কয়
নাও, নাও—ভোগ করে নাও —
সহস্র দুঃখের মাঝে যতটুকু সুখ হেথা পাও!
তারা বলে—ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন;
নহে ইহা চিরশ্যাম তৃণের মতন
নিষ্পেষিত হয়ে তবু বাঁচিবে আবার;
জীবন দলিত হলে জাগেনাক আর!

জীবনকে কবি ভাল বাসতেন বলে মৃত্যুকে তিনি ভয় করতেন না। 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগের পনে হরণ করার জন্য নিরন্তর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে মৃত্যু, তাকে হাসিমুখেই তিনি জীবন-রত্ন তুলে দিতে চেয়েছেন ঃ—

দিনকতকের মেয়াদ শুধু
ধারকরা এই জীবন মোর
হাস্যমুখে ফেরত দেবো
সময়টুকু হলেই ভোর।

'গীতাঞ্জলি'র কবি-কন্ঠেও সুর উঠ্লো ঃ—

ভরা আমার পরাণখানি,
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকেও অস্বীকার করেন নি, জীবনকেও মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। খৈয়াম ও তাই। জীবনের মহৎ পরিণতি মৃত্যুকে উভয়েই স্বীকার করেছেন, তবে সুন্দরের উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের অমৃত সঞ্চয় করেছেন; উপনিষদের 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' মন্ত্র জীবনে অনুভব করে এই পৃথিবীর ধূলিকণাকেও মধুময় বলে জেনেছেন; কিন্তু তাঁর এই অনুভূতির অন্তরালে গভীর অধ্যাত্মানুভূতি ছিল ঃ—সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি। তাই তিনি লিখলেন ঃ—এই জেনে এ কুলায় রাখিনু প্রণতি। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে ভাল-বেসেছেন তার মধ্যেও নিত্যের জ্যোতি দেখে মৃত্যুর অমৃত রূপ দেখে তিনি জীবনের জয় ঘোষণা করেছেন, মৃত্যুকে জয়ের চেষ্টা করেছেন ঃ—মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব। কিন্তু ওমর খৈয়াম মৃত্যুকে চরম বলে দেখেছেন। মৃত্যুর রুদ্র রূপই তিনি দেখেছেন, কল্যাণ রূপ তিনি দেখেন নি। খৈয়াম মৃত্যুর বিরহ-বেদনাবিধুর দিকটাই দেখলেন আর রবীন্দ্রনাথ তার মিলনান্ত দিকটা দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাই জীবন-মৃত্যুকে সমভাবেই সানন্দে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। জীবন-মৃত্যু উভয়-ই রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে আনন্দময়ের দুই রূপ। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'এসউ অব্ জয়েস'-এর ফর নট্ লাইফস জয়েস অ্যালোন আই সিঙ, রিপিটিং—দি জয় অব এ ডেথ' ছত্রটি কিন্তু খৈয়াম-কবি সে দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর কাছে 'রক্ত গোলাপ, রঙীন সুরা'-ই প্রিয়; তাই তিনি সমস্ত ভাবনা ভুলে সুরার ভিতরে—জীবনের জানার ভিতরে, ডুবে থাকতে চেয়েছেন ঃ—

যাক্‌গে, ও সব জটিল ব্যাপার ভাবনা যত ডুবিয়ে দি।
জীবন গেলেও মিটবে কি? আয়লো সাকী সুরায় আজি

অজ্ঞেয় তাঁর কাছে মরুমায়া। মৃত্যু তাঁর চরম প্রাপ্তি হলেও, পরম প্রাপ্তি—জীবন।

সাহিত্যে বাস্তবতা

দেবব্রত চক্রবর্তী

শুধু গথিক রোমান্স, পিকারেস্ক অ্যাডভেঞ্চার, রূপককাহিনীর বিকল্পনা নয়, ক্লাসিক রচনা ও রক্ষণশীল নীতিবিদ্যা এবং মধ্য-উনিশ শতকে বিভাবিত অসংখ্য অবাস্তবের বিপরীতে বাস্তবতা শব্দটিকে যদি আমরা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করি তবে নান্দনিক রীতিরূপে বাস্তবতা চিত্রণশিল্পে ও সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টিপথে আসে প্রায় একই সময়ে, ১৮৫৫ সালে করবেটের প্রদর্শনীতে এবং ১৮৫৬ সালে ফ্লবেয়ারের মাদাম বোভারি' প্রকাশনায়। ফ্লবেয়ারের বাস্তবতার তত্ত্ব ছিল ঔপন্যাসিকের পেশাগত কার্যপ্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত। উপাদানের পর্যবেক্ষণে তিনি অবলম্বন করতেন বৈজ্ঞানিক বিপ্রযুক্তি, শান্তভাব ও নিবিড় মনোযোগ। তিনি তাঁর রচনায় লেখনীকে তীক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেছেন। সে সঙ্গে এ কথা কদাচিৎ বলা যায় যে, তাঁর উপন্যাসগুলি প্রধানত প্রকাশ করেছে প্রাকৃতিক বিষয়ের হীন রূপান্তর। চিত্রণের বাস্তববাদী আন্দোলনের সহগামী তাত্ত্বিক মতবাদে এরকম কোনো বিকৃতীকরণ নেই। সমকালীন চিন্তা রীতি ও ভাবধারা নিয়ে চিত্রকর তাঁর জীবনকে সেই কালের অনুসারী করে তোলেন। তিনি সমগ্র সমাজন্তর্গত অনুভূতিকে গ্রহণ করেন, তারপর আমাদের কাছে তা প্রত্যর্পণ করেন চিত্রের মাধ্যমে যেখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমাদের স্বরূপ এবং আপন পরিপার্শ্বকে। এই সত্যদৃষ্টিকে কখনোই হারালে চলবে না যে, আমরাই শিল্পের বিষয় ও বস্তু, আমাদের স্বার্থে আমাদেরই দ্যোতনা হচ্ছে শিল্প।

মধ্য-উনিশ শতকে জারের রাশিয়ায় সাহিত্যের একটি নীতিমূলক তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রবর্তিত হল শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দ্বারা নয়, বরং সমাজসচেতন ঔপন্যাসিকের উত্তর-সূরীর যথার্থ প্রাক্‌প্রতিষ্ঠা দ্বারা। জার্মান রোমান্টিক সাহিত্য-ইতিহাস-লিখনবিদ্যায় এবং রোমান্টিক জাতীয়তার ভাববাদে এই ধারণা গভীরভাবে অন্তর্নিরূঢ় ছিল যে, জাতীয় ভাব ও চেতনার প্রকাশ, জাতির আন্তর্জীবনের প্রতীক হচ্ছে সাহিত্য। প্রথম রাশিয়ান সমালোচক ভিসারিয়ন বেলিন্‌স্কির লেখায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী দশকের লেখকদের রচনায় এর পরিচয় সমুজ্জ্বল। বিশ শতকের মার্ক্সবাদী সমালোচকেরা বেলিন্‌স্কির প্রতি অর্পণ করেছেন সম্ভ্রমের দৃষ্টি। বাস্তবতা ও সামাজিক কালোচিত্যের ক্রমবর্ধনশীলভাবে অতিশয়িত মান অনুসারে বেলিন্‌স্কি ও তাঁর ভাবশিষ্যদের প্রবন্ধ ও সমালোচনার বিষয় হয়েছেন পুশকিন, গোগোল, লারমন্তভ, তুর্গেনেভ, দস্তয়ভ্‌স্কি ও তলস্তয়। এই সব সমালোচকেরা ইতিহাসে গুরুত্বের জন্যে, সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের জন্যে এবং সাহিত্যে অনুরূপ গভীরতার জন্যে অবহিতচিত্তে প্রায়োগিক বাস্তবতার অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, একমাত্র বাস্তব সাহিত্যই ঐতিহাসিকভাবে বর্ধিষ্ণু জাতীয় চেতনার প্রকাশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবের ভাষিক আন্দোলন। ঐ আন্দোলনে রয়েছে ক্ষণিক ও চিরন্তনের মাঝে প্রভেদ নিরূপণের রীতি। শ্রেষ্ঠ লেখকেরা জনসমাজ ও তার বিবর্তনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একীভূত। তাঁরা তাঁদের সমকালীনকে উপস্থাপিত করে তার চেতনাকে প্রকাশ করে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেন। বেলিন্‌স্কির ভাবশিষ্য ডবরোল্যুবভ এরকম একটি ভাব উদ্গত করেছেন যে, আপন সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা স্বাধীনভাবে ঔপন্যাসিকদের ঐ মহৎ ক্রিয়া সাধন করা উচিত।

ঘটনাগত অলঙ্কারের উদ্দেশ্যে আনুপৌর্বিক বিবৃতির সূক্ষ্ম উপস্থাপন বিশেষভাবে কমেডিতে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে অঙ্কিত সজীব বিবরণ প্রয়োগের সঙ্গে সংসৃষ্ট হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যের সকল পর্যায়ে। প্রধান তত্ত্বরূপে অথবা সমগ্র সাহিত্যকৃতির নিয়ন্ত্রণকারী পরম নান্দনিক লক্ষ্যরূপে বাস্তবতা বিশেষিত হয়েছে প্রধানত পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রাতিস্বিকের সম্পর্ক, তার জীবন ও স্বকীয়তার পূর্ণ আকৃতি এবং তার জীবন-কেন্দ্রিক ঘটনাপুঞ্জের প্রকাশের দিক থেকে যাথার্থ্যের অনুরূপায়ণে শ্রেষ্ঠ অনুরক্তি দ্বারা। এটি জ্ঞানের এমন একটি তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল যার অনুসারে বোধ-প্রতীতির দ্বারা প্রকটিত একটি বস্তু ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দ্বারা বোধ-প্রতীতী থেকে অনুমিত অলক্ষ্য বস্তু উপলব্ধ বা পরিজ্ঞাতরূপে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। বাস্তববাদী রচনায় ঘটনার বিবরণে লেখক একটি বস্তুধর্মী মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি চান বর্ণনা করতে, প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করতে, অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে। এভাবে তিনি যথারীতি আপন অনুভূতি, বিশেষ মান-প্রতিষ্ঠাকারী বিবেচনা, দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ক্রিয়ার অনুমোদনকে তার অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর লক্ষ্য নিহিত রয়েছে আনুপৌর্বিক বিবরণের পরিবেশানুগতা ও আপেক্ষিক পূর্ণতা দ্বারা পাঠকের কাছে এতে অংশগ্রহণের একটি গভীর বোধ উপহার দেবার দিকে। ফ্লবেয়ারের সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকগোষ্ঠী বাস্তবতার চর্চা করেছেন অথবা তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁদের বিশেষ প্রবণতায় গ'ড়ে উঠেছে উনিশ শতকের শেষার্ধে উন্নমিত বাস্তববাদী আন্দোলন, আজও অব্যাহত রয়েছে এর গতিবেগ। তাঁদের প্রবণতা বস্তুধর্মিতার অভিমুখী, প্রকৃত তথ্যের উদ্ঘাটনের অভিমুখী, অভিজ্ঞতার সাধারণ দিকের বিসৃতীকরণের অভিমুখী। হাওয়েল্‌সের অনুসারীরা সামান্য জিনিসের বাস্তবতাকে গ্রহণ করলেও নৈতিক বিধিকে লঙ্ঘন করতে অনিচ্ছুক। মপাসাঁর ভাবশিষ্যেরা প্রত্যক্ষবাদের পরিধিতে অনুপ্রবেশের অভিলাষী। মানবিক জীবন ও মানবিক চরিত্রের স্পষ্ট অনলংকৃত সত্যকে প্রকাশ করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। বাস্তবতার সর্বাপেক্ষা সজীব ও শাশ্বত ক্রিয়া হচ্ছে সাহিত্যের নোতুন বিষয়বস্তু থেকে এমন সব পরিবেশ ও ভাষার সযত্ন অনুসন্ধান যা পূর্বে ধর্ম ও কার্মবিধির বহির্ভূত ছিল।

এ দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নমন হচ্ছে মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, এটি দস্তয়-ভস্কির আদর্শ ও ফ্রয়েডের মতো বিশশতকীয় নিগূঢ় মনোবৈজ্ঞানিকের আবিস্কার থেকে উৎসারিত নৈপুণ্য। বাস্তববাদীর অভীপ্সিত বিষয় প্রত্যক্ষভাবে পরিদৃশ্য, অথচ মনের অন্তর্নিহিত বস্তু যদি অলক্ষ্য থাকে তাহ'লে আন্দোলনের এই দিক অনেকাংশে রীতিবিরুদ্ধ। তবু স্বাভাবিকভাবে বাস্তববাদীর চিন্তার অবনমনকারী স্থূল জড়বাদ প্রকৃতির অধিকতর ব্যাপক চিত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আন্দোলন হিসেবে বাস্তবতার প্রগতি অনেকটা উন্নতাবনত। ফ্লবেয়ার, জোলা, মপাসাঁর রচনার মধ্যে দিয়েই তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল। স্বয়ংসিদ্ধ বাস্তবতার মশাল জ্বেলে ধরলেন রাশিয়ার তলস্তয় ও তুর্গেনেভ। বিশেষ ক'রে ফরাসী বাস্তবতার আতিশয্য থেকে উত্তরণের সরণি হিসেবে এই দ্বিতীয় প্রবাহ হ'য়ে উঠল প্রভাবশালী। মার্কিন সাহিত্যে হাও-য়েল্‌সের রচনায় ও মতবাদে বাস্তবতার পরিচয় থাকলেও উনিশ শতকের শেষের দিকে সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দুর্বার ধারায় আত্মপ্রকাশ করে।

নিকোলাই কারনিশেভ্‌স্কি, দ্মিত্রি পিসারেভ প্রভৃতি রাশিয়ান সমালোচক বাস্তবতা বলতে বুঝেছেন পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানসম্পন্ন বাস্তবতা। তাঁহার মতে বাস্তবতা হচ্ছে সমাজের তথা রাষ্ট্রের দারিদ্র্য এবং সাহিত্যের মাঝে এর প্রতিফলনই গ'ড়ে ওঠে বাস্তব সাহিত্য। তাঁরা বলে-ছেন, বাস্তব সাহিত্য হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে উদ্দীপিত জাতীয় চেতনার এবং রাষ্ট্রব্যাপী রাজ-

নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবের আন্দোলনের সার্থক প্রকাশ। শিল্পকৃতির বৈশিষ্ট্য তার বিষয়-বস্তুর মহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রতার ওপর নির্ভর করে না। এমন কোনো বিষয় নেই যা শিল্পের সৃষ্টি-ক্ষমতার কাছে অননুপ্রবেশ্য। শিল্পের প্রধান গৌরব হচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে আমরা সামান্য জিনিসকেও তার নিজস্ব আকৃতি ও আলোকসহ পূর্ণরূপে দেখতে পাই। বালজাক মানবিক জীবনের তুচ্ছতম বিষয়কে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। ফ্লবেয়ার অতিক্ষুদ্র চরিত্রের নিগূঢ় বিশ্লেষণ করেছেন। জোলার কয়েকটি উপন্যাসে আমরা পাই এঞ্জিনের কলকব্জার, গুদাম-ঘরের ও কয়লাখনির সূক্ষ্ম বিবরণ। এই সব বাস্তববাদীর শিল্পকর্মে এমন একটি মহৎ প্রাকল্পনিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যা রোমান্টিক লেখকের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। এ কথা সত্য, নগ্ন বাস্তবতা শুধু নিরপেক্ষ হ'তে পারে, তবে তার একটি প্রবণতা রয়েছে অসুন্দর ও প্রজ্ঞাহীনের অভিমুখে, সে কারণে সমালোচনার সমস্যাসৃষ্টির অভিমুখে। তখন তাকে বলা যায় অনুকরণগত পদ্ধতির ভ্রান্তি। আদর্শ বাস্তবতা হচ্ছে এমন জিনিস যার মধ্যে লেখক দেখতে পান নিজেকে, এবং তারই অনুবর্তী হিসেবে সমগ্র সমাজ, আপনার যথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করে।

অনেকে বলবেন, কবি ছন্দের মাঝে প্রকৃত তথ্যের একজন সংগ্রাহক নন, প্রকৃত তথ্য অনেক যত্নে সংগ্রহ করেন ঐতিহাসিক। কবির কাজ হচ্ছে বোধের অতীত বিষয়ের শিল্পকলা দ্বারা, অপ্রাকৃতের আহ্বান দ্বারা, ভাবের কল্পনামধুর সযত্ন সম্পাদন দ্বারা কাব্যের স্বাধীন চেতনাকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে প্রকৃত তথ্যের সবিশেষ প্রামাণ্য বিবরণের মতো নয়, দেদীপ্যমান আত্মার ভবিষ্য-ভাষণাত্মক উচ্চারণের মতো তাঁর রচনা ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে পাঠক-মনের আদিগন্ত। কবির পক্ষে এটাই পরম বাস্তবতা। ক্লাসিক বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করে বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে। বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে যে-বাস্তবতা চিত্রিত হয় শিল্পে তা-ই সার্থক।

ওয়াইল্ডের মতে, রীতি হিসেবে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। প্রত্যেক শিল্পী পরিহার করবেন আকৃতি ও বিষয়বস্তুর আধুনিকতা। কারণ লেখকের সমকাল ছাড়া অন্য যে কোনো শতকই তাঁর শিল্পসৃষ্টির পক্ষে উপযোগী। যা চিরন্তনভাবে প্রাচীন রীত্যভিমুখী তা-ই একমাত্র আধুনিক। জোলা আমাদের উপহার দিয়েছেন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের চিত্রা-বলী, কিন্তু বর্তমানে কেউ আর সে সম্বন্ধে কৌতূহলী নয়। ওয়াইল্ড উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, আমাদের শিল্প স্বয়ম্ভূ নয়, বিভিন্ন জিনিসের কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। তাদের অলক্ষ্য তাৎপর্যে অথবা অসংখ্য বিনিময় ও যোগাযোগে এক পরম রহস্য আবিষ্কার ক'রে শিল্প তাদের ওপরেই একে বিস্তৃত ক'রে দেয়। ঐ বাস্তবতার পরিধির বাইরে শিল্পের কোনো মূল্য নেই, কারণ তারই কেন্দ্রে আমরা সংস্থাপিত। শিল্প কোনো কিছু সৃষ্টি করে না, রূপান্তর ও সংকলনের সাহায্যে তা মূর্ত হ'য়ে ওঠে। শিল্পী তাঁর মনের মধ্যে দিয়ে অতিক্রমী বিশ্বজগৎকে সামান্য পরিবর্তিত ক'রে তার ওপর আপন মানসের চিহ্ন মুদ্রিত করেন। মনের কাছে অধীনতা স্বীকার করবার জন্যেই অনুকরণ এবং অনুরূপতার নীতি আমাদের শিল্পের স্বার্থে চিরন্তন, তবে তা অনেকাংশে সংস্কৃত। তাই বোধের কাছে উপস্থাপিত বাস্তবতার তুলনায় শিল্পীর পুনঃসৃজিত জগৎ অনেক বেশি বাস্তব।

বাস্তবতাকে সেই সব সাহিত্যরীতি থেকে পৃথক করা উচিত যাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড় ও সাদৃশ্য বেশি। প্রথমত, দুঃসহতম পরিবেশে সাধারণ মানুষের বাস্তববাদী চিত্রণ পাঠককে নিয়ে যেতে পারে নৈতিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। কিংবা লেখক নিজেই যদি

এ রকম সিম্ধান্তে উপনীত হন এবং অন্যায়-অবিচারের জন্যে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেন তবে তাঁর উপন্যাস সামাজিক সমালোচনার শ্রেণীভুক্ত হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিকতা শব্দটি প্রায়ই বাস্তবতার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বলা যায়, স্বাভাবিকতাবাদী উপন্যাস একটি বিশেষ দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর ঘটনাবলীর তাৎপর্য প্রকাশ করে। ফলে তা বাস্তবতার দৃঢ় সীমাকে অতিক্রম ক'রে যায়।

স্বাভাবিকতাবাদী লেখক যদিও অতিলৌকিক দেবত্ব, মানবের অন্তর্নিহিত অতিলৌকিক উপাদান এবং নান্দনিক ও নৈতিক মূল্যের অতিলৌকিক ভিত্তিকে অস্বীকার করেন, তবু মানসের দিক থেকে তিনি জড়বাদী নন, অথবা নীতির দিক থেকে অহংবাদী নন। তবে বৈবর্তিক স্বাভাবিকতার কয়েকটি রীতি এমন সব নৈতিক প্রণালীর সঙ্গে সম্পর্কিত যা সকল উদ্দেশ্যকে নিয়ে যায় আত্মধৃতি অথবা ইচ্ছাশক্তিতে। বাস্তববাদী রীতি ও উপাদান গ্রহণ ক'রে স্বাভাবিকতা চায় দর্শনের একটি বিশেষ রূপকে আকারিত করতে। ব্যাপক অর্থে বলতে পারি, স্বাভাবিকতাবাদী রচনা স্পষ্টভাবে বা বিশ্রব্ধভাবে অভিজ্ঞতার একটি দৃষ্টিকে উপস্থাপিত করে যাকে বিশেষিত করা যায় নৈরাশ্যবাদী জড়বাদী নিয়তিবাদরূপে। এটি মানবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তির এবং মানবিক প্রজ্ঞা ও নৈতিক দায়িত্বের সীমাচিত্রী আদিম ও অসংজ্ঞাত শক্তির দৃঢ়তাকে গভীরভাবে প্রকাশ করে। এখানে একমাত্র মৃত্যু বা নিশ্চলতার অভিমুখী অকপট সংগ্রামরূপে জীবনকে দেখবার একটি প্রবণতা রয়েছে।

অনেকের মতে, কবিতা যখন বিস্ময়ের দৃষ্টিকে হারায় তখন সে আপন গুরুত্ব ও যাথার্থ্যকেও হারায়। আমাদের তুচ্ছ সামান্য জগতে কবিতা সফল হ'তে পারে না। অলৌকিক, অপরূপ ও নিগূঢ় হচ্ছে প্রকৃত কাব্যিক রীতির একমাত্র বিষয়। কবিতা সম্বন্ধে এই ধারণা শিল্পসৃষ্টিপ্রণালীর মৌলিক মর্যাদা নয়, বরং একাধারে গুণ ও পরিমিতি। এ ক্ষেত্রে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদীরা তাঁদের সানুরাগ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিকে রোমাণ্টিক প্রতিকূলতার চেয়ে শিল্পপদ্ধতির দিকে নিবন্ধ রেখেছিলেন। তাঁরা সমর্থন করেছেন আত্যন্তিক ও স্বয়ংসিদ্ধ স্বাভাবিকতাকে। এই স্বাভাবিকতাই সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদের নিয়ে গিয়েছে শৈল্পিক রীতির অধিকতর প্রগাঢ় প্রতীতির গভীরতায়। করবেটের সমালোচকেরা তাঁর সংশয়ী প্রকৃতি-অনুকরণ ও সাম্যবাদী তুলির কথা উল্লেখ করেছেন। তবু ফরাসী বাস্তবতায় তাঁর শিল্পকলাটি বিষয়ান্তরগত গুরুত্বরূপে সম্বর্ধিত হয়েছে। এর সমাজ বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যে আন্তর্নিরূঢ় সম্প্রতিকালে সাম্যবাদী সত্য ছিল সাধারণের ধারণা, সে কারণে বৈচিত্র্যহীন দুর্বল নগ্ন অক্ষম এমন কি নিকৃষ্ট জীবনের বাণী। এবং এই বাস্তবতাই দ্রুতগতিতে প্রখর হ'য়ে উঠেছে স্বাভাবিকতায়। এর মহত্তর প্রতিনিধি ছিলেন জোলা। সাহিত্যগত বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা গদ্য উপন্যাসে কেন্দ্রায়িত একটি নন্দনসৌন্দর্যকে গ'ড়ে তুলেছে, এটি এমন একটি সাহিত্যরীতি যা সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে উনিশ শতকীয় সমাজসমস্যার অভিসারী। স্বাভাবিকতাবাদী ঔপন্যাসিক হচ্ছেন সাহিত্যের বীক্ষণাগারে আপন প্রকল্প নিয়ে গবেষণারত সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী। গবেষণার বিষয় সামাজিক সংগঠন। তিনি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেন স্বপ্নরাজ্যের সিংহদ্বার নয়, এই সমাজের জীবনসত্যের পর্ণদ্বার। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, দ্রষ্টার নয়ন চিত্রকে রঙীন ক'রে তোলে; সাহিত্যশিল্পী আপন হৃদয়বৃত্তির মাধ্যমে অবলোকিত প্রকৃতির একটি বিশেষ দিককে নোতুনভাবে সৃষ্টি করেন ভাষার কারুকাজে। ঔপন্যাসিকের প্রয়োজন স্থির পর্যবেক্ষণের যা তাঁকে নিয়ে যাবে সমাজের উন্নতির জন্যে ব্যবহারিক তাৎপর্যসমৃদ্ধ প্রশান্ত জ্ঞানগভীরতায়। তাঁর চরম লক্ষ্য থাকবে ভালোমন্দকে নিয়ন্ত্রণ করবার, জীবনকে সমাজকে পরিচালনা করবার সূত্র আবিষ্কারের দিকে।

হাওয়েল্‌সের রচনায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি শিষ্ট ভাববাদের সঙ্গে পরিমিতরূপে উন্নত সংঘাতে বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা, অথবা ফ্রাঙ্ক নরিস দেখালেন যে, স্বাভাবিকতার দৃঢ় কার্য-পদ্ধতি বৈকল্পনিক, এমন কি গথিক উপলব্ধির যোগ্য। তাঁর উপন্যাসে রয়েছে জোলার মতো সূক্ষ্ম সবিশেষ বিস্তৃত বিবরণের সংকলন, আর রুগ্ন ক্রূর ও প্রচণ্ড চরিত্রের আকারপ্রদ হিসেবে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সুগভীর অধ্যয়ন। তাঁর কাহিনীপটে শুধু দুর্বলতা আর কৃপণতাই ভিড় করেনি, এসেছে আদিম বলিষ্ঠ মানব ও সতেজ অদম্য মানবী। তিনি নিস্পৃহভাবে বৈজ্ঞানিক বস্তুধর্মিতাকে মানবতার সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবর্তনগত আশাবাদের সঙ্গে সংমিশ্রত করেছেন। সেজন্যে তাঁর তত্ত্ব অভ্রান্তভাবে স্বাভাবিকতাবাদী নয়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—স্বাভাবিকতাবাদী লেখক সাধারণ লোকের সম্বন্ধে অনুৎসাহী, অবশ্য সেই সব সাধারণের সম্বন্ধে যাদের অনুরাগ যাদের জীবন ও জীবনের সংঘটিত বিষয় অসামান্য কিছু নয়। স্বাভাবিকতাবাদী গল্পের চরিত্রাবলীতে কোনো চরম বা আত্যন্তিক ঘটনা অবশ্যই জড়িত থাকবে। তারা সামান্য অবস্থা থেকে আবর্তিত হ'য়ে দৈনিক জীবনের শান্ত ঘটনাবিহীন চক্র থেকে নিক্ষিপ্ত হবে বিস্তীর্ণ ও চরম কাহিনীধারার যন্ত্রণায়। তারপর কাহিনীর পরিসমাপ্তি অনাবদ্ধ অতিরাগে, রক্তাপ্লুত ভীষণতায়, আকস্মিক মৃত্যুতে। নরিস জানতেন, স্বাভাবিকতাবাদী গল্প হচ্ছে রোমাঞ্চময় কথামালার একটি বিশেষ শ্রেণী। স্বাভাবিকতা বাস্তবতার আন্তরবৃত্ত নয়, তা এক ধরণের রোমান্টিকতা। স্বাভাবিকতার একটি সর্বাঙ্গীন দাবী রয়েছে সমাজের দিক থেকে উজ্জ্বল হবার অভিমুখে। এটি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক বিবেচনাকে উপস্থাপিত করে। পরিখা-পরিবৃত দুর্গ, ক্ষুদ্র বীর, বিদেশী প্রেমোপাখ্যান, সীমান্ত-দস্যু এবং বর্তমান কালানুপযোগী সামন্ত-অতীত সম্বন্ধে অসংখ্য বিকল্পনা অথবা অতীত জগতের সংস্মৃত অংশ এর অন্তর্ভূত নয়, সাম্প্রতিক জনসাধারণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্য ও সমস্যা এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ স্বাভাবিকতা বাস্তবানুসারী অথচ সামাজিকভাবে নীতিগর্ভ।

উদ্ভবের সময় থেকে প্রায়ই বাস্তববাদী আন্দোলন সম্বন্ধে অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হয়েছে সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করবার জন্যে অর্থাৎ মানবিক হৃদয়কে অবনমনের জন্যে, উন্নাসিক ব্যতিক্রমী জটিল ও প্রশংসনীয় চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা মানবিক প্রকৃতির অমর্যাদার জন্যে, এর আনুষঙ্গিকরূপে ট্র্যাজেডির মহিমা সম্পাদনের অক্ষমতার জন্যে, অঙ্গবিন্যাসহীন কথাবস্তুর অনুশীলনের জন্যে, সবার উপরে যে নান্দনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা সাধারণ সাংবাদিকতার সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ নির্ণয় করা হয় তার একান্ত অভাবের জন্যে। তবু বাস্তবতা মুছে যায় নি, আজও রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে থাকবে তার চিহ্নও সুস্পষ্ট।

সাহিত্য সংবাদ

বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ যাঁরা আমাদের দান করতে পারেন তাঁদের নিদ্রাভংগ হওয়ার কোনও আশু লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা অথচ বুভুক্ষ পাঠকমন নবতর রসের সন্ধানে সদাই অস্থির এবং রসদের অভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। স্বভাবতঃই নিরাশার কুয়াশায় পথের দিশা আবিষ্কারে আমাদের বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় তথাপি অজানা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয় সংগ্রহ করার প্রচেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকাই সমীচীন। এই সীমিত প্রচেষ্টায় ফলস্বরূপ আরব সমাজের এক শ্রদ্ধেয় মনীষীর পরিচয় লাভ করা গেছে।

আরব্যোপন্যাসের পরিচয় সাহিত্য পাঠকের অজানা নয় কিন্তু তৎপরবর্তী আরব সাহিত্য এবং সাহিত্যসাধকের পরিচয় সম্ভবতঃ আমাদের অজানা, আধুনিক আরব সাহিত্যের কথা বাদই দিলাম। আধুনিক আরব সাহিত্যের জনক ডক্টর তাহা হুসেন সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা পরিবেশন করে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের নিকটতম সাংস্কৃতিক আত্মীয়ের সংগে আত্মীয়তা রক্ষা করার ক্ষীণতম চেষ্টা করা যাক।

ডক্টর হুসেন আধুনিক আরব সাহিত্যের পুরোভাগে আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত। এই অন্ধ কথা সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ আরব সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কারণ বর্তমান আরব সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন এবং তাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মূলে আছে ডক্টর হুসেনের একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, যার সুদূরপ্রসারী ফল বহু উদীয়মান আরব কথাসাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করেছে।

ডক্টর হুসেন প্রায় চল্লিশটি সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা এবং আধুনিক আরব সভ্যতার উপর বহু প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন। ইতিহাস ও দর্শনের বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধগুলি সম্ভবতঃ তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন ডক্টরেটের জন্য গবেষণাধীনে ছিলেন তখন বহু মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ইউরোপীয় দার্শনিকদের আলোচনাসভার একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন ডক্টর হুসেন এবং সম্ভবতঃ সেই জন্যই দেকার্তের তেজস্বী যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হন।

আরব সমাজ নিজ ভাষায় বিদেশী সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছে প্রধানতঃ ডক্টর হুসেনের রচনার মাধ্যমে, তিনি সাফোক্লিসের সম্পূর্ণ রচনার অনুবাদ করেছেন এ ছাড়া গ্রীক নাট্যসাহিত্যের জনক ইসকাইলাসের বহু বিয়োগান্ত নাটকের সার্থক অনুবাদ তাঁরই কৃতিত্ব। বর্তমানে তিনি আরবী ভাষায় সেক্সপীয়রের সম্পূর্ণ অনুবাদে ব্রতী এবং এ বিষয়ে তাঁকে প্রায় কুড়িজনেরও অধিক আরব পণ্ডিত সাহায্য করছেন।

১৯৫৫ সালে আরব লীগ কালচারাল কমিটি সেক্সপীয়র অনুবাদের প্রস্তাবে রাজী হন এবং কমিটি প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করেন। এই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যমণি ডক্টর হুসেনকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় কারণ অনুবাদের বৃহৎ-ক্ষুদ্র যে কোনও সমস্যার সমাধান তাঁকেই করতে হয়।

তারপর সুয়েজে ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি যে গোলমাল বাঁধায় তার চাপে এই প্রয়াসটি কিছু শ্লথগতি লাভ করে। শান্তির পর হঠাৎ কালচারাল কমিটির মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়, সেক্সপীয়রের অনুবাদ লেখ্য ভাষায় হওয়া উচিত অথবা কথ্য ভাষাকে প্রধান্য দেওয়া দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে বহু তর্ক বিতর্কের পর ডক্টর হুসেনের মত সর্বজনগ্রাহ্য হয়, তিনি ক্লাসিক ভাষার পক্ষপাতী কারণ বহু বাধার উল্লেখ করে বলেন যে কথ্য ভাষা সেক্সপীয়র অনুবাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

অনুবাদের কাজ এখন প্রায় পরিসমাপ্তির পথে। এই বৃহৎ সংকল্পের সমাপ্তি ঘটলে আধুনিক আরব সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যদিও ডক্টর হুসেনের নিজস্ব রচনা আরব সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

নূতন গ্রন্থ

এ সাইলেন্স অব ডিজায়ার : কমলা মার্কণ্ডেয়

ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় সাহিত্যিক ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন, এই প্রসঙ্গে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি হলেন মুলকরাজ আনন্দ এবং উল্লেখ করতে বাধা নেই যে তিনি এক্ষেত্রে একজন সফল পথিকৃৎ। মুলকরাজের পর যে কয়েকজন উদীয়মান সাহিত্যিক ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য সাধনা করছেন তাঁদের মধ্যে কমলা মার্কণ্ডেয় সম্ভবতঃ কনিষ্ঠতম। সম্প্রতি নিউইয়র্ক থেকে তাঁর সার্থক উপন্যাস "এ সাইলেন্স অব ডিজায়ার" প্রকাশিত হয়ে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছে। উপন্যাসটির গল্পাংশ আধুনিক ভারতের একটি সমস্যার উপর নির্ভর করে ধীর পদক্ষেপে সঞ্চারমান। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মানসিক গতির দ্বন্দের যে চিত্র লেখিকা পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন তার পিছনে কতটুকু সত্য এবং সেই সমস্যাচিত্রণে তিনি কতদূর সফলকাম হয়েছেন তার বিচার বিদগ্ধ পাঠক সমাজ করবেন।

গল্পের নায়ক দান্দেকার সরকারী চাকুরিয়া। সে পরিশ্রমী এবং তার দৃঢ় চরিত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ ও বন্ধুমহলে তার বেশ সুনাম আছে। দান্দেকারের দৃষ্টিভঙ্গি বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তববাদের উপর নির্ভরশীল। নায়িকা সরোজিনী। দান্দেকার ও সরোজিনী বিবাহিত জীবনের বেশ কয়েক বৎসর সুখেই কালাতিপাত করেছে কিন্তু তাদের সেই সৌভাগ্যের আকাশে সম্প্রতি কালো-মেঘের সঞ্চার হয়েছে। তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ প্রথমতঃ সরোজিনী কয়েক মাস যাবৎ টিউমারের যন্ত্রনায় কাতর এবং সে কথা সে স্বামীর কাছে ব্যক্ত করেনি যার জন্য তার শারিরীক অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রোপচারের জন্য দান্দেকার সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা করেছে কিন্তু সরোজিনী তার প্রস্তাবে রাজী নয় উপরন্তু যন্ত্রনা উপশমের জন্য সরোজিনী দান্দেকারের নিষেধ সত্বেও নিকটবর্তী এক আশ্রমের স্বামীজির কাছে প্রায়ই যাতায়াত করে এবং অর্থ ও অলংকারাদি স্বামীজীকে দান করে। ক্রমশঃ দুজনেই পরস্পরের সাহচর্য এড়িয়ে যেতে চায় এবং পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে ওঠে যে দান্দেকার অধঃপতনের সহজ আবিলতায় নিজেকে ছেড়ে দেয়। দান্দেকারের চরিত্রে যে কুঅভ্যাসের কোন স্থান ছিলনা সেগুলি একে একে তার মনে ভীড় করে আসে এবং এমন সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে যে স্ত্রীর গমনাগমনের উপর গুপ্তচরবৃত্তির সুযোগ নিতেও সে লজ্জাবোধ করে না।

এইভাবে পরিস্থিতি যখন ক্রমশঃ আরও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তখন হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনায় দান্দেকার তার আত্মপ্রত্যয় ফিরে পায় এবং পুনর্জীবন লাভ করে। দান্দেকার কৌতূহলী হয়ে একদিন স্বামীজির আশ্রমে যায় এবং লক্ষ্য করে যে স্বামীজি বেদীর উপর ধ্যানমগ্ন। কিছুকাল অপেক্ষার পর অধৈর্য্য দান্দেকার স্বামীজির এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করে তিনি এইভাবে স্থির হয়ে কি করছেন? চাষী—শিষ্যটি সরল ভাষায় উত্তর দেয়—কি করছেন? কিছুই না, গাছ তো চলাফেরা করতে পারেনা, স্থির থাকে কিন্তু সে কি কিছু করেনা। তার ফুল, ফল সবই হয়। দান্দেকার হতবাক। তার মনে একটি প্রশ্নই বার বার উঁকি দিয়ে তাকে অস্থির করে তোলে, সে ভাবে তার নিষ্ক্রিয়তার জন্যই কি সরোজিনী আজ অতদূরে সরে গেছে? কিছু একটা করা দরকার। কি করা যায়, কি উপায়ে সরোজিনীকে আবার আপন করা যায়, এই চিন্তা করে দান্দেকার অস্থির হয়ে উঠে। অবশেষে সে স্বামীজির বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন করে যে তাঁকে উৎখাত করা হোক। স্থানীয় সরকার এবিষয়ে তাঁকে কোনরূপ সাহায্য করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

তারপর দান্দেকার রাহুমুক্ত হল এক নাটকীয় সংঘটনের ফলে। হঠাৎ স্বামীজি সহর ত্যাগের সংকল্প করলেন এবং সরোজিনীকে হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য ভর্তি হবার উপদেশ দিয়ে গেলেন। দান্দেকারের সকল সমস্যার সমাধান হল। এই সুখপাঠ্য উপন্যাসের সরল, স্বচ্ছ এবং অনুত্তেজক বর্ণনাভঙ্গি উপভোগ্য। লেখিকার মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে প্রতীকধর্মী উপমার সাহায্যে গল্পের ভারসাম্য রক্ষার সফলময় প্রচেষ্টায় তিনি ধ্যানমগ্ন স্বামী-জীর সঙ্গে চিরস্থির বৃক্ষের সুন্দর ও মহার্ঘ্য তুলনার দ্বারা নায়কের মনে কর্মযোগের আশু ইংগিতের ইন্ধন যুগিয়েছেন।

পাশ্চাত্যের পাঠক-সমাজ উপন্যাসটি সাদরে গ্রহণ করেছেন। ইলিনয়েসের অধ্যাপক ঈভি, কমলা মার্কণ্ডেয় এবং তাঁর রচনার ভূয়সী প্রশংসা করে অনেক কথাই বলেছেন।

হ্যাণ্ডবুক অব লাতিন আমেরিকান স্টাডিজ ঃ নাথান এ হ্যাভারস্টক, সম্পাদক।

স্প্যানিশ সভ্যতার আদিমতা যে মানবগোষ্ঠীকে আজও আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়, কিন্তু লাতিন আমেরিকার সাহিত্য সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা কিছুকাল পূর্বেও দুরূহ ব্যাপার ছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হয়ে লাতিন আমেরিকার বিচিত্র জীবন-যাত্রা, সাহিত্য, কলাশিল্প এবং বহুবিধ সংস্কৃতি প্রসঙ্গের উপর আলোকসম্পাত করতে সক্ষম হয়েছেন "হ্যাণ্ডবুক অব লাতিন আমেরিকান স্টাডিজ" গ্রন্থমালা প্রকাশনের মাধ্যমে। এই অতি-প্রয়োজনীয় এবং মহামূল্য গ্রন্থটির ২১তম সংখ্যা অধ্যাপক নাথান এ হ্যাভারস্টক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আকর গ্রন্থটির এই সংখ্যায় হাইতি দ্বীপের সমাজজীবন, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাইতি সাহিত্যের প্রায় ৫৩৪২ গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সমালোচনা বিশেষ উপভোগ্য। আকর গ্রন্থ হিসাবে "হ্যাণ্ডবুক অব লাতিন আমেরিকান স্টাডিজ" এর আবেদন চিরায়ত হবার দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

অজিত দাস

আধুনিক আফ্রিকার শিল্প

বর্তমানে সমালোচক মহলে আফ্রিকার আধুনিক শিল্প নিয়ে বেশ একটা সাড়া পড়েছে। আফ্রিকার আধুনিক শিল্পকলায় মধ্যযুগীয় বাইজেনটাইন বিশ্বাস ও রীতির খ্রীষ্টিয় মতবাদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক মূল্যে সেই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে বেশ আনন্দিত হয়েছেন। তাঁরা আফ্রিকার আধুনিক শিল্প কলায় খ্রীষ্টিয় ধারার সুসভ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে বলেছেন যে বর্তমানে আফ্রিকার শিল্পীরা তাঁদের আদিম বর্বর ভূমিকা ত্যাগ করে সুমহান খ্রীষ্টিয় চিন্তায় নিজেদের নিয়োজিত করে শিল্পায়নে নূতন মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট।

আফ্রিকার য়ুরোবা, নুপো গোষ্টির মধ্যে এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানগত বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আফ্রিকা আপন মানস পরিক্রমায় যে চিন্তার স্ফূরণ কার্যে বিশ্বাস ও জীবনের বিভিন্ন কল্পনাকে বিধৃত করেছিল আজ মিশনারী প্রচার কার্যের ফলে সেই চিন্তাগত বিশ্বাস ও কঠিন জীবনবোধ থেকে আফ্রিকার শিল্পীরা চ্যুত।

মধ্যযুগে রাজ্য বিস্তারের সংগে ধর্ম বিস্তার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাসক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রীতিনীতি শোষিত সম্প্রদায় সর্বদাই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সেই গ্রহণের মধ্যে মূলতঃ নির্মম অত্যাচারের কথাই লিপিবদ্ধ। বাইজেনটাইন সম্রাটদের রাজ্যলিপ্সা সুদূর সাহারার প্রান্তদেশেও প্রসারিত হয়েছিল। প্রসারিত হয়েছিল তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন রীতি এবং অনুশীলন। ইষার (যীশু) মহান বাণী বহন করবার গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁরা সর্বদাই সচেতন ছিলেন। যেজন্য সাগর পার থেকে শাসকদের বিশ্বাস ও ধর্ম পালন শাসিত আফ্রিকায় মানুষের জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধকে ভিন্নমুখী করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল।

শাসনের উদ্যত দণ্ডের তাড়নার মধ্যেই যীশুর মূর্তি আফ্রিকা দেখেছিল। সেই দেখার মধ্যে শান্তির মহিমা অবশ্যই কম ছিল। সেখানে গ্লানির দারুণ বোঝাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তবুও খ্রীষ্টিয় মতবাদের অনুপ্রবেশ সেখানে ধীরে ধীরে পক্ষবিস্তার করেছিল। কিন্তু ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণে বাইজেনটাইন মহিমা ধূলিসাৎ হয়ে শাসকের উদ্যত দণ্ড শাসন পরবর্তীকালে মানসিক প্রতিক্রিয়ায় সেই শাসক জাতির ধর্মপালন রীতি নিজের বিশ্বাস আর জীবন বোধের কাছে ক্রমশঃ আত্মস্থ হয়ে বিলুপ্তির পথে সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ধর্ম প্রচারকরা আবার আফ্রিকার অধঃগামী (?) জাতগুলোর উদ্ধার কল্পে যীশুর মহিমা প্রচারে দারুণ তৎপর হয়ে পড়েছেন। তরোয়াল অপেক্ষা এর কাজ আরও শক্তিশালী। যীশু অপেক্ষা যীশু পরবর্তী বিভিন্ন সংস্কার নির্মোকই সেখানে বেশী বলবতী এবং সেই সংস্কার পর মত অসহিষ্ণু। এই আধুনিক সৈন্যবাহিনীর তৎপরতায় মানুষ নিজের বিশ্বাস ও জীবন থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে এক যূথবদ্ধজীবে পরিণত হয়ে তথাকথিত সভ্যতার যূপকাষ্ঠে নীত। দক্ষিণ রোডেশিয়ার সেরিমা প্রদেশে মিশনারীদের এক বিরাট কেন্দ্র। সেখানে মাসামো জাতের শিল্পীরা খ্রীষ্টিয় মতবাদ চিন্তায় শিল্পকলায় নিজেদের আপন সত্তার বিলুপ্তি সাধনায় রত। সমালোচকরা

আনন্দে উর্ধ্ববাহু নৃত্যে জানিয়েছেন যে এখন এই শিল্পীরা আর বর্বর (?) নেই। এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কোন শিল্পী গোষ্ঠীকে আপন চিন্তা জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখলে সুধী জন আনন্দিত হতে পারেন! আধুনিক আফ্রিকার শিল্পীরা নিগ্রো শিল্পকলার যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতাকে বিসর্জন দিয়ে মার্জিত, ভঙ্গুর শিল্প কার্য্যে নিজেদের আত্মাহুতি দিয়েছেন। একথা বলার কোন বাসনা নেই যে জীবনের ক্রমশঃ ব্যাপ্তির পথে নূতন মূল্যবোধ সম্পর্কে চিন্তার সচেতনতা থাকবে না। তবে তার মানেও এই নয় যে মানুষকে তার আপন প্রকৃতিগত সত্ত্বা থেকে বিবিক্ত করে ফেলা। আফ্রিকার শিল্পকলায় নূতন চিন্তার সংযোজন অবশ্যই ভাল কিন্তু এও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে মিশনারীদের তৎপরতায় তাঁরা আপন চিন্তা মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। আফ্রিকার শিল্পকলা বর্বরই থাকুক। সেখানে আদিমতাই কাম্য। তাকে নিশ্চিহ্ন করে মধ্যযুগীয় বিগত চিন্তার দীনতা দর্শনে আমরা মোটেই উৎফুল্ল নই।

মু ঘ ল চি ত্র

মুঘল চিত্রকলার সাম্প্রতিক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আকাদেমীর পরিচালকবর্গ বিশেষ শিল্পপ্রীতির নিদর্শন দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে অবনীন্দ্রযুগে মুঘল এবং রাজপুত চিত্রকলা সম্পর্কে আলোচনা এবং ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্পর্কিত প্রদর্শনী ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রাচীন চিত্রচর্চার প্রাবল্য ছিল। ঠিক সেই ধরণের সমালোচক এবং রসবেত্তা মানুষের আজ সত্যই অভাব আর সেই অভাব বোধের জন্যই প্রাচীন চিত্র চর্চা সম্পর্কে আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত যথেষ্ট পরিমাণ কম। এতই কম যে যার জন্যে ঐতিহাসিক জ্ঞান চেতনাও আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ কমে আসছে। আর এর প্রতিক্রিয়ায় ফলহিসাবে লাভ হয়েছে চিত্রবিচারের মূল কথাটির সম্পূর্ণ বিস্মৃতি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমরাও অকারণ অসহিষ্ণুতায় এই চিত্র চর্চা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছি।

পারশিক, মুঘল, রাজপুত ইত্যাদি চিত্রকলার অনবদ্য সংযোজনে চিত্রশালাটি সত্যই চমৎকার। এই মূল্যবান সংগ্রহকে সহজগম্য কোন কক্ষে স্থানান্তরিত করলে দর্শকজনের সুবিধা হয়। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি বলি যে প্রাচীন চিত্রচর্চা ভুলে গিয়ে আমরা মুঘল রাজপুত ছবি দেখার বিশেষ পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়েছি। সামনা সামনি দেওয়ালে ছবি রেখে ছবি দেখলে মুঘল রাজপুত চিত্রকলার যে অভিনব বেদের (ডাইমেন সন্) ঘনত্ব এবং বর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে দূরত্বসূচক জমির সমীকরণ এর উপলব্ধি কোন মতেই আসে না—ছবি কোন কিছুর ওপর শুইয়ে রেখে ওপর থেকে ঝুঁকে দেখলে এই চিত্রকলার রেখাও জমির অভিনব সমীকরণ বোঝা যাবে। বর্তমানের আলোচ্য প্রদর্শনীতে মুঘল নরপতিদের বিভিন্ন সময়ের বহু মূল্যবান চিত্রের সংযোজন ছিল। বাস্তবিক পক্ষে মুঘল চিত্রকলা পারশিক চিত্রবিদ্যারই আর এক পক্ষ বিস্তার। তবে ভারতীয় মুঘল নরপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পারশ্য দেশীয় চিত্রকলা ক্রমশঃ ভারতীয় এবং স্বকীয়তায় উজ্বল হয়েই পরিস্ফুট হয়েছিল।

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ভারত জয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু এদেশে থেকে ভারতীয়ত্বে নিজেকে পরিবর্তিত করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর স্মরণে সমরখন্দ তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য নিয়ে সর্বদাই নিজের আসন সঙ্গোপনে সযত্নে লালিত করেছে। মনে তিনি অল্পমাত্রায় ভারতবাসের কারণে অসুখীই ছিলেন। কিন্তু তাঁর পৌত্র আকবর ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন আর যে কারণে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে মুঘল সংস্কৃতিকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। আকবরের সিংহাসন আরোহনের কিছু পূর্বে পারশ্য দেশীয় শিল্পী বিহজাদ অনন্য-

সাধারণ প্রতিভায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী বিহজাদের পারশ্য দেশীয় শিষ্য প্রশিষ্যদের আকবর তাঁর স্বাভাবিক চিত্রপ্রীতির জন্য ভারতে এনেছিলেন এবং পারশ্য চিত্রমালারও এক অপূর্ব সংগ্রহকে তিনি আপন চিত্রশালায় স্থান দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে আকবরই মুঘল চিত্রকলার প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি। দেশীয় শিল্পীদের সহযোগে এবং পারশ্য-আগত শিল্পীদের রচনা রীতি প্রকৃতির সহযোগে ক্রমশঃ ভারতে মুঘল চিত্রকলার অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভবপর হলো।

পারশ্য চিত্রকলা এবং তার মিশ্রণ এবং মিশ্রণের ফলে স্বকীয় চিত্রসৃষ্টি এ সবেরই চিত্র সংযোজনে প্রদর্শনীটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুঘল আমলের বিখ্যাত শিল্পী মনসুর আলীর অপূর্ব চিত্রবিদ্যার নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে সংযোজিত হয়েছিল। এখানে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে চিত্রবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল ক্যালিগ্রাফি বা হস্তলিপির সৌকুমার্য্য আপন সৌন্দর্য্য মহিমায় মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরের চিত্র এবং হস্তলিপি দুটি বিষয়েই যথেষ্ট সহৃদয় গুণমুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন। চিত্রচর্চ্চা মুঘল নরপতিদের সাংস্কৃতিক অঙ্গ ছিল বললে ভুল হবে না। তবে শাহজাহানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দারা শিকোহো পর্যন্তই মুঘল চিত্রকলা যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার কারণে মুঘল চিত্র বিদ্যা দিল্লী দরবার থেকে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে গেল। আলোচিত প্রদর্শনীতে মুঘল রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সমস্ত চিত্র সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিল, এছাড়াও যখন মুঘল রাজদরবার থেকে চিত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত প্রায় তখন বিভিন্ন দেশীয় নরপতিদের পোষকতায় যে সমস্ত শিল্পী বিভিন্ন দেশজ শিল্পের সংমিশ্রণে মুঘল তুলির কারুকার্য্যতা প্রমাণ করেছিলেন সেই সমস্ত চিত্রের কিছু কিছু উদাহরণও উদ্যোক্তরা এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়েছিলেন এতে করে দর্শকদের পক্ষে এই প্রদর্শনী দেখে মুঘল চিত্রকলার চূড়ান্ত প্রতিভার কাল থেকে অবনতির লক্ষণযুক্ত সময়টিকে চিনে নিতে ভুল হবে না।

মুঘল চিত্রকলাকে সামগ্রিক বিচারে দেখলে দেখা যাবে যে দার্শনিক চিন্তায় এই চিত্রমালা সার্থকভাবে সুফী মতাবলম্বী। জীবনের নির্মম সাদা কালো, সুরু মোটা, বেদনা সংঘাতের বাইরে যে জগত, সেই জগতে মুঘল চিত্রকলা আনন্দ বিলাসের নির্ঝরণী প্রবাহিত করেছে। রাজসিক মহিমায় মহিমান্বিত মুঘল চিত্রকলা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রেখার সংযোজনে, রং ব্যবহারের অমিত বিলাসে এক অদ্ভুদ চিত্র বৈভবকে আমাদের সামনে হাজির করে। যদিও মুঘল শিল্পকলা বিশেষ ব্যক্তিকেই প্রচণ্ডভাবে প্রধান করেছে এবং গৌণ অসংখ্য মুখাকৃতির মধ্যেই সম্রাটের অতি মানবীয়তাকে প্রধান করেই প্রকাশ করেছে তবুও তার মধ্যে শিল্পীর কারু কৌশল চাতুর্য আর এক জগতে আমাদের নিয়ে যায় যে জগতে বিলাসের আনন্দই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, যেখানে রমণীর লাবণ্য মণ্ডল নায়কের চিত্ত বিভ্রম ঘটায় কাব্যের রক্তিম সুরায় যেখানে নায়কের নিশা অভিসার আর যে অভিসারে নায়িকার ব্যাকুল আলিঙ্গন জীবনকে বিলাসে সুখে ঘিরে রাখে সেই জগতের অন্দর মহলের সংখ্যাহীন গীতি মাল্য মুঘল চিত্রকলা থরে থরে সাজিয়ে তুলেছে। এঁদের চিত্রসৃষ্টিতে সোনার তুলি সার্থক।

নিখিল বিশ্বাস

পেশা হিসেবে বাংলা সাহিত্য

কল্লোল যুগের একজন সাহিত্যিক সাম্প্রতিক কালের তরুণ সাহিত্যিকদের একজনকে বলেছিলেন, তোমরা কষ্টের অনেক দরজা পেরিয়ে এসেছ, কারণ প্রতিবছর অন্ততঃ একলক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়, আমাদের আমলের কথা ভাবতে পার? কবিতা লেখা সে যুগে অপরাধ বলে ভাবা হত, অন্যায় করা হচ্ছে ভেবে সে যুগে লুকিয়ে লুকিয়ে কালিকলম নিয়ে বসতে হত, তোমরা, একালের তরুণেরা অন্ততঃ সে যুগে জন্মগ্রহণের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে পেরেছ।

দুঃখ বা অভিমান প্রসূত উক্তিটি থেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা যায় যে আজকে আর সেদিনের মত সাহিত্যের তেমন অসুবিধে নেই। তেমন অসুবিধে নেই এই অর্থেই বলছি যে সাহিত্যের দায়িত্ব লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে আনুপাতিক হিসেবে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার মনে হয় উপরোক্ত আলোচনা বাংলা সাহিত্য প্রসংগে ঠিক প্রযোজ্য নয়। তার অবস্থা একটু অন্যরূপ।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা ক্ষণজন্মা। অতএব, আমরা সেই অনুযায়ী বাংলাকে অন্যান্য ভাষার পারিপার্শ্বিকে বিচার করলে কিছুটা হতাশ হব। কারণ সাহিত্যের বাজার সাহিত্য ভাষাভাষী অঞ্চলের আয়তন। সেখানকার অধিবাসী এবং তাদের সংখ্যা, সামাজিক রুচি অথবা বাধানিষেধ এবং অন্যান্য সাহিত্যের সংগে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা সাহিত্যকে যতটা বেগ পেতে হচ্ছে, প্রথম পংক্তির সাহিত্য হিসেবে অন্য কোন সাহিত্যকে এ দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা সন্দেহ।

সাহিত্যের 'বাজার' বলতে বিশেষ ধরণের সাহিত্য, সাহিত্য পিপাসু এবং যারা সেই সমস্ত তথাকথিত জনপ্রিয় সাহিত্যের স্রষ্টা, তাদের এ আলোচনা বাদ দেওয়া সহজেই সম্ভব হত, কিন্তু নিম্নমানের সাহিত্যও এই দুই বাংলার জনসমষ্টির মধ্যে নিজেদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নিজেদের দলে টানতে সক্ষম হয়েছে বলে, এবং তাতে করে বিস্তৃত অর্থে সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যের লাভ বা ক্ষতির অঙ্ক ওঠানামা করছে বলে, নিঃসন্দেহে সেই সমস্ত সাহিত্য এবং পাঠক গোষ্ঠিকে বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করা চলে।

এখন প্রশ্ন হল সাহিত্যকে আমরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি কি না? অনেকে এমন ধারণা পোষণ করেন যে সাহিত্য যখন নিপুণ শিল্প তাকে নিয়ে দরকষাকষি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ তাতে সাহিত্যের মর্যাদা তথা যে ভাষায় রচিত সাহিত্য সেই ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আবার একদল বলেন, না, বর্তমান সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করলে সাহিত্যের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্রষ্টাকে যখন স্বজনপোষণ এবং নিজের রোজগারের অন্যপথ ধরতেই হয়, তখন তার আপন অন্তরে নিহিত প্রতিভাকেই যদি ব্যবহার করে সে সমস্যার সমাধান হয় তবে অযথা সময় তথা শক্তির অপচয় ঘটেনা। এদিকে পাঠকও প্রস্তরে অথবা পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠ করতে যখন অভ্যস্ত নয়, যখন তাকে মূল্যের বিনিময়ে গ্রন্থক্রয় করতে হয় তখন অন্যদিকে লেখকের ভাগ্যে বৃথা বিপর্যয় কেন ঘটবে? আজ-

কের মানুষ আত্ম সচেতন, পাঠক তার তৃষ্ণার পরিধি প্রতিনিয়ত বিস্তারের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। অতএব আজকের সাহিত্যিক যদি বলে আমি লেখার বিনিময়ে অর্থ চাই, তবে সে চাহিদা অযৌক্তিক নয়।

আয়তনের দিক থেকে বাংলা ভাষার ক্যানভাস ছোট। কিন্তু ক্যানভাস ছোট হলেও কম্প্যাক্টনেসের দিক থেকে চিন্তিত হবার কোন কারণ নাই। লোকসংখ্যা এবং সাহিত্য রসিকের সংখ্যার দিক থেকে সেই ক্ষুদ্র ক্যানভাসখানি অনেক গভীরতর উপাদানে পরিপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের সেই ক্যানভাস খানি যদিচ দ্বিখণ্ডিত, অর্থাৎ একটা কাল্পনিক রাজনৈতিক রেখাদ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যেখানে ভাষার অনেক গভীরে ঐতিহাসিক শিকড় এক এবং অখণ্ড, সেখানে ভীত না হলেও চলবে।

লোকসংখ্যা এবং অধিবাসী প্রসংগে আর একটি দিক একটু ভেবে দেখলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। উনিশ শ সাতচল্লিশের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যার এক বিরাট অংশকে আন্দামান বা দণ্ডকারণ্য অথবা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে। এতে সেই সমস্ত বাঙগালীরা আগামী কতদিন পর্যন্ত বাংলা কথা বা অক্ষরের সংগে পরিচিত থাকতে সক্ষম হবে সে বিষয় সন্দেহ আছে। এখনই অনেকে যে প্রদেশের বাসিন্দা সে প্রদেশের ছাঁচে নিজেদের ঢেলে নিচ্ছেন। অবশ্য এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তর তাদের যথেষ্ট সাহায্য করছে, এবং এই পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রলোভন যে তাদের অল্প সময়ের মধ্যে মাকে 'মাই' এবং বাবাকে 'বাপু'তে পেৌঁছে দিতে পারবে সে বিষয়েও আমরা যথেষ্ট আশা পোষণ করতে পারি।

কিন্তু উপজাতিদের বেলায়? সাঁওতাল পরগণায় বিরাট এলাকা অথবা উত্তর বঙ্গের পাহাড়ী উপজাতি, ত্রিপুরা চট্টগ্রামের পার্বত্য উপজাতি কোন ভাষায় প্রভাবিত হবে তাও এক চিন্তার বিষয়।

আমার মনে হয়, সাঁওতাল জাতির লোকেরা তাদের জীবিকা, তাদের সামাজিকতায় বাংলাদেশ থেকে বিহার প্রদেশ দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত। কারণ তাদের প্রতিদিনের আপাতঃ সংযোগ যারা রক্ষা করে তারা প্রায় সকলেই 'হিন্দী' জানা এবং যেহেতু হিন্দীর সহজ ব্যবহার, ব্যবহারের স্বল্প জটিলতা অনেকাংশেই আকর্ষণীয়, সেহেতু সেদিক থেকেও সাঁওতালদের বাংলা সাহিত্যের আঁওতা থেকে সরে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে, বাঁকুড়া, বীরভূমের যে কজন সাঁওতাল প্রায়-বাংলা ভাষায় উৎসাহিত তাদের সংখ্যা বেশী নয়।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য উপজাতির মধ্যেও বাংলার চেয়ে অন্যভাষা বেশী ব্যবহৃত, যেমন নেপালী, ভূটিয়া, মদেশীয়া, পাহাড়ীয়া এবং আসামের পার্বত্য উপজাতীয় ভাষা।

এখন রইল চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরার উপজাতি। এরা হয়ত বাংলা ভাষার এবং সাহিত্যের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারবেনা।

রুচি এবং সামাজিক নিয়মকানুনের দিক থেকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা ভয়াবহ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। এই রুচিবোধ একদিক থেকে জনপ্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই যখন একই দোকানে ইংরাজী ফিক্‌সন এবং বাংলা উপন্যাস পরিবেশিত হয় তখন ক্রেতা বাংলা বই রেখে ইংরাজী খানাকেই পছন্দ করবে।

এযুগের জীবন যাত্রায় পারম্ভারসান প্রকট হয়ে উঠেছে। চিন্তা বা ভাবনা এবং কঠিনতম আনন্দ মানুষকে যতটা আকৃষ্ট করে, রোমাঞ্চ এবং বহিঃব্যবহারিক ভাব ও উচ্ছলতা মানুষকে তারথেকে অনেক কম সময়ে ছিনিয়ে নিতে পারে।

এসব অসুবিধা বাংলা সাহিত্য কোনকালে কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট

সন্দেহ আছে। তবে পেশা হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে গ্রহণ করার বিপদ লেখককে চিন্তিত করে তুলবে। কারণ একমাত্র লেখা দিয়ে জীবিকা অর্জন আজও সম্ভব কি?

লেখক লিখবে তার আনন্দ থেকে সে আনন্দ আর্থিক অসচ্ছলতায় নিপীড়িত হবে, নিম্ন-মানের সমকালীন অন্যভাষার সাহিত্য-পাঠকদের দ্বারা অযথা অনাদৃত হবে, কিন্তু লেখা কখনো কাতর হয়ে থেমে যাবে না।

একদিন হয়ত এত পরিশ্রম এত চেষ্টা সব সংস্কৃত সাহিত্যের মত ক্ল্যাসিক্যাল, অর্থাৎ 'পুরোনো' কিংবা ডেড্ ল্যাংগুয়েজ বলে অভিহিত হবে। কিন্তু আজকের এই আনন্দসন্ধ্যা, যে সন্ধ্যায় সারাবিশ্বের লোক অবাক বিস্ময়ে পঞ্চদশী চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল আগামীকালের ইতিহাসকারদের সে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকবেনা।

শান্তি লাহিড়ী

রবীন্দ্রসাহিত্যে আধুনিকতা

ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী রবীন্দ্রপ্রতিভার বয়স একশো পেরিয়ে যেতে চলল। অর্থাৎ ব্যক্তি বা দল-বিশেষের কাছে কবি আরও কিছুটা পিছ-তারিখী হয়ে পড়লেন।

কিন্তু কেন? আধুনিকতা কী? সম্পূর্ণ নতুন কোন ঘটনার সাথে তাৎক্ষণিক পরিচয়ের অন্ধকারবিহ্বল আমরা "আধুনিক" আখ্যা দিয়ে ঐ বিশেষটিকে পরিচিত ঘটনাশ্রেণী থেকে পৃথক করি। আভিধানিক অর্থে পঞ্জিকার নতুন সংস্করণও আধুনিক। কিন্তু এ হল "আধুনিক" নামক অর্থবহ শব্দটির কেবলমাত্র ভগ্নাংশের সাথে পরিচয়স্থাপন।

প্রত্যেক যুগের সাহিত্যই সেই যুগের কাছে আধুনিক। প্রবোধকুমারের ভাষায় "আজকের আধুনিক, কালকে প্রাচীন।" তাই আধুনিকত্ব কোন সাহিত্যিকের অর্জিত গুণাবলীর অন্যতম নয়। তা জন্মসূত্রে পাওয়া নামগোত্রেরই নামান্তর। "আধুনিক" শব্দের এক বিশেষ ভাবদ্যোতনা আছে।

আধুনিক আমরা সেই সাহিত্যকে বলতে পারি যে সাহিত্য যুগচেতনার অনুভবে সচেতন, যে সাহিত্যে সেই বিশেষ যুগের ক্রন্দন অনুরণিত। রবীন্দ্রসাহিত্য এবংবিধ সাধনায় সিদ্ধ কিনা তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যুগচেতনায় রবীন্দ্রমানসের কতখানি উন্মুখ সচেতনতা ছিল তা দেখতে হলে রবীন্দ্রযুগের স্বরূপ কী তা ভাবা দরকার। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনেক লিখিয়ে নিয়েছে যে যুগ সেই বিংশ-শতাব্দীর হাতে সময় ছিল কম কাজ বেশী। মানুষেরা ব্যস্ততার প্রতিমূর্তি। কূলের সান্ত্বনা-ঘেরা কোন নদীর উচ্ছলতা নয় —ফুটন্ত লাভার এক ভয়াল সাগর এ যুগের পটভূমি। এ এক সংঘাতময় যুগ। আদর্শে আদর্শে সংঘাত। নূতনে পুরাতনে সংঘাত। অশুভবুদ্ধি ও কল্যাণ-ময়তার সংঘাত। সময় দুলকি চালের পাল্কিতে চলে না— রকেট চাই। চাই মুহূর্তে মুহূর্তে বদল। এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার ইন্ধনী। বন্ধনীও। জীবনজিজ্ঞাসার ভারে নিপীড়িত মানুষ হানা দিচ্ছে ধর্মের দুয়ারে—উত্তর নেই। ছুটছে বিজ্ঞানের দরগায় যার নেই শেষ। ফলে এক চরম অতৃপ্তি রেখেছে মানুষকে বিস্রস্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় জীইয়ে। মানুষের এই অশান্ত মনের খবর, অতৃপ্তির বেদনা যে সাহিত্যে ব্যক্ত তাই-ই আধুনিক।

বিংশশতাব্দীর সমাজ তার অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে বিশিষ্ট। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ যুগেই বিজ্ঞানের কল্যাণে ধনোৎপাদন বেশী। অথচ প্রোলেতারিয়েতের সংখ্যা এই যুগেই ভয়াবহরূপে ক্রমবর্ধমান। শোষণমূলক এই অদ্ভুত সমাজব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি যে সাহিত্য—আধুনিক সেই সাহিত্যই। এখন প্রশ্ন— এই আলোকে রবীন্দ্রনাথ কি আধুনিকরূপে প্রতিভাত ?

নিশ্চয়ই। আলোচনা পল্লবিত না করে রবীন্দ্রকাব্য প্রান্তরে একছুট দিয়ে এলেই বোধহয় প্রাগুক্ত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাহস পাওয়া যাবে। নষ্টনীড়ে গভীর সমাজচিন্তার প্রকাশ। দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানুষের আন্তররহস্যের উদ্ঘাটনপ্রচেষ্টার সাক্ষর বইটিতে সর্বত্র। চতুরঙ্গ। তখনো বঙ্কিমী রাজা-মহারাজা সন্ন্যাসী-সাহেবের যুগ কাটেনি। নবযুগীয় সমাজ চেতনার উন্মেষ তখন সবেমাত্র দিগন্তরেখায় পরিদৃশ্যমান। কোন সুনির্দিষ্ট রূপলাভ করবার ব্যাকুলতায় বেগবান নয়। এই অপরিণত পরিস্থিতির মধ্যেই এল পরিণত চতুরঙ্গ। ঘরেবাইরের সন্দীপ যুগযন্ত্রণার এক মূর্ত প্রতীক। চরিত্রটি তৎকালীন সমাজসমীক্ষার এক দুঃসাহসিক অনুশীলন। এই উপন্যাসেরই মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশকে স্থাপন করেছেন নব্যযুগীয় উন্মাদনার লঘুতার প্রতি, যুবশক্তির অবক্ষয়ের প্রতি অংগুলিনির্দেশের কারণে। নিখিলেশরূপী রবীন্দ্রনাথের উপদেশ হল—ছাইটা আধুনিক বটে কিন্তু তাহাই জরা। সেযুগের সংকীর্ণ সমাজচেতনাকে বিশ্বপ্রেমের বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টায় গোরার জন্ম। ছোটগল্পগুলি সমাজের বিভিন্নদিকের সুচিন্তিত সমালোচনার ও মানবমনের চিরকালীন আশা-আকাংখা, স্নেহ-প্রেম, জৈব কামনা-বাসনার এক একটি নিটোল ধারাবিবরণী। প্রবন্ধে রাজনীতি সমাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের মৌলিক গবেষণা। ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে হৃদয়ের দাবীকে অস্বীকার করার চরম পরিণতি অংকনে সাংকেতিক নাটকগুলি হয়ে উঠেছে চিরকালীন মানবধর্মের জয়গানের স্বরলিপি। তারপর শেষের কবিতার বিস্ময়। এই আশ্চর্য কাব্যের কবি বয়সে প্রাচীন কিন্তু নবীনতার বন্যা তাঁর অন্তরে। দেহ ও মনের এহেন অসামঞ্জস্য, সাধারণ নিয়মের এবংবিধ ব্যতিক্রম বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রেও খুব বেশী পরিদৃষ্ট নয়। অন্যান্য সাহিত্যের ক্রনোলজিকাল পাঠে মোটামুটি সাহিত্যিকের মানসিক ক্রমপরিণতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্ষানুক্রমিক পাঠ রবীন্দ্রমানসের ক্রমপরিণতির পরিচয় লাভে হতাশ হবার পক্ষে যথেষ্ট। গীতাঞ্জলির পরবর্তী যুগে বলাকা পূরবী শেষসপ্তক ইত্যাদি কাব্য ও শেষের কবিতার সৃষ্টি আমাদের বিমূঢ় করে। ১৪০০ সালের দ্বিতীয় দশকই তাঁর কবিত্বের তুংগশীর্ষ নয়। তৎপরবর্তী যুগে তাঁর প্রতিভা ম্রিয়মান হওয়া তো দূরের কথা—অশীতিপর বৃদ্ধ সাহিত্যিকের তরুণ মনের গ্রহীষ্ণুতা বয়সে নবীন কিন্তু দেহমনে প্রবীণ আজকেকার আমাদেরও লজ্জা দেয়। শেষের কবিতার প্রত্যেকটি শব্দচয়নে তাঁর আধুনিকত্ব। প্রতিটি পংক্তিতে তারুণ্যের সবুজ দ্যুতি বিচ্ছুরিত। শেষের কবিতায় কবি সৃষ্টি করেছেন চিরযৌবনা এক ভিন্ন জগৎ।

সমসাময়িককালের জগৎ ও জীবন নিয়ে রচিত হলেই সাহিত্য আধুনিক হয়না। ইদানিং অভিযোগ—সাধারণ সর্বহারা মানুষের বিচরণ রবীন্দ্রসাহিত্যের বাইরে। অভিযোগটি হয়ত পুরোপুরি অস্বীকার্য নয়। কিন্তু জেলে মুচি বা একটি গোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায়ের জীবনের ইতিবৃত্তি হলেই তা সৎসাহিত্য সবসময় হয়ে ওঠেনা। রসোত্তীর্ণ হওয়াও চাই। রবীন্দ্রোত্তর কোন সাহিত্যিকের একক কন্ঠ হয়ত বহুজনের কানে পৌঁছবার মত যথেষ্ট প্রবল নয়। কিন্তু তঁদের সম্মিলিত গোষ্ঠীশক্তিকে উপেক্ষা করা চলে না। সেই গোষ্ঠীশক্তি আরও বলশালী হতে হতে পারত যদিনা তার দেহে আধুনিক প্রসাধনের নামে সস্তা নতনত্বের মোহ ও ভঙ্গীসর্বস্বতা পচন ধরাত। এই মোহের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁর এক

পত্রে আবার জানা গেল।

"জীবনে আমরা যে কোন পদার্থকে গভীর করে পেয়েছি, অর্থাৎ অনেকদিন ধরে অনেক করে জেনেছি, সত্যিকার নতুন তারই মধ্যে। তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্যসব মূল্যবান জিনিসেরই মতো নতুনকে সাধনা করে লাভ করতে হয়, অর্থাৎ পুরনো করে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি বলে মনে হয়, সে ফাঁকি— দুদিন বাদেই তার যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে।"

মহৎ সাহিত্যিক কোন বিশেষ যুগের নন। নিজের যুগ তাঁর সাহিত্যের উপাদান যোগায় সত্য, কিন্তু সে সাহিত্য যুগজয়ী সর্বদেশের সর্বকালের হয়ে না উঠলে তা ঐ বিশেষ অর্থে আধুনিক নয়। তথাকথিত আধুনিকতার পৃষ্ঠদেশে তিনি আরও কষাঘাত হেনেছেন— "আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না।" নিবিষ্ট প্রত্যয়ে স্থির কবির কাব্যের আসল পরিচয় গভীর উপলব্ধিতে। তাই তিনি যেমন আধুনিক, তেমনি ভবিষ্যতেরও। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—মহাকালের এই ত্রিধারা রবীন্দ্রসাহিত্যের ত্রিবেণীসংগমে এসে একাকার হয়ে গিয়েছে। এ যুগের বেশীরভাগ সাহিত্যিকই "আধুনিক" পাত্রে যে সাহিত্যমদ পরিবেশন করছেন তার দর্শন ও ত্রিধারারই অভিজ্ঞানর্নির্যাস।

আধুনিকতার সংজ্ঞানির্ধারণে আর একবার কবিরই শ্বারস্থ হয়ে বলি ঃ

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন
আদিমকালের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

রবীন্দ্রনাথ নামক আধুনিক বৃক্ষের শাখায় শাখায় অজস্র কাব্যের সেই চিরকালীন পুষ্পসম্ভারই প্রস্ফুটিত। যতদিন জগতের আয়ু ততদিনই সেই পুষ্পের সৌরভবিতরণ। সে সৌরভ আধুনিক নয়, প্রাচীনও নয়। তা হল চিরকালীন।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

স মা লো চ না

বাঙলা সনেট ॥ জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত। কথাশিল্প—১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

সনেটের জন্মস্থান ইতালি এবং এর উৎপত্তি সম্ভবত তের শতকের প্রথম ভাগে। এই হিসাবে শত-বর্ষীয় বাঙলা সনেট নিতান্তই অর্বাচীন, কিন্তু বয়সের আপেক্ষিক অল্পতা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে সনেট আজ স্বপ্রতিষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সনেটের সঙ্গে তুলনীয়। মহাকাব্যের মতো সনেট ও মধুসূদনের সৃষ্টি এবং পরবর্তী বাঙলা কাব্য সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" "মেঘনাদবধ কাব্যে"র চেয়েও অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাকাব্যের যুগ মনে হয় চিরকালের জন্য অতিক্রান্ত হয়েছে, মধ্যযুগীয়, এমন কি উনিশ শতকের লিরিক রচনারীতিও এখন পরিত্যক্ত। সনেট সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কিন্তু অপ্রযোজ্য। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, কান্তিকচন্দ্র ঘোষ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ লেখকবৃন্দের রচনাতে মধুসূদন প্রবর্তিত সনেটের যে উত্তরসাধনা চলতে থাকে আজও তা অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং সনেটের স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশ্যস্বীকার্য। জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও শক্তিব্রত ঘোষের যুগ্ম সম্পাদনায় এবং কথাশিল্প কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সম্প্রতি যে সনেট সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই মর্যা-দাই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সম্পাদকদ্বয়ের নির্বাচনপদ্ধতি সুপরিকল্পিত এবং বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ সনেট তাঁদের সূক্ষ্ম রসানুভূতির পরিচায়ক। সনেটগুলির ভাবৈশ্বর্য লক্ষণীয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিষয় বিভাগ করলে দেখা যায় কবিতাগুলির প্রধান অবলম্বন নরনারীর প্রেম, নিসর্গপ্রীতি, পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজচেতনা, দেশাত্মবোধ এবং প্রাত্যহিক জীবনের হর্ষ-বিষাদ। কিন্তু সার্থক কাব্য রচনার ক্ষেত্রে এরূপ বিষয়ানুগ শ্রেণীবন্ধের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না, কারণ স্থূল অর্থে যে সব কবিতা সমবিষয়ক তাদের মধ্যেও ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুটি কবিতা উল্লিখিত হতে পারে—মোহিতলাল মজুমদারের "উপমা" ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের "অলক্ষ্যে।" দুটিতেই মৃত্যুচেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক কবির চেতনা যেন বহুবিধ স্তরে বিন্যস্ত এবং যে স্তর বিন্যাস আমরা একটি কবিতায় লক্ষ্য করি অপর-টিতে তা অদৃশ্য। এখানে দুজন কবি একই রচনারীতি অনুসারে দৃষ্টত একই ভাবের রূপায়নে সচেষ্ট হয়েছেন অথচ প্রত্যেকের আয়াসের ফলে যা মূর্ত হয়ে উঠেছে তা অনন্য। এই অনন্যতাই যথার্থ কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং "বাঙলা সনেটের" মতো সমজাতীয় কবিতাবলীর সংগ্রহে উক্ত বৈশিষ্ট্য যত অনায়াসবোধ্য নানা জাতীয় কবিতাসমূহের সংকলনে ঠিক ততটা নয়। এদিক দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটির সার্থকতা প্রশ্নাতীত। তাছাড়া কবিতাগুলির কালানুক্রমিক সংস্থানহেতু বাঙলা সনেটের বিবর্তন এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—এবং জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে তারও মূল্য কম নয়।

ভূমিকাটি জীবেন্দ্র সিংহরায়ের রচনা। সনেট সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা স্থানে স্থানে একটু বিতর্কমূলক হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চতুর্দশপদী কবিতা মূলত গীতিকাব্যধর্মী, কিন্তু আবেগের অতিশয্য এর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এর রূপ সংযত ও সংহত

এবং পরিসর সুনির্দিষ্ট। কবির হৃদয়ভাবের গতিপথ সরল বা সর্পিল যাই হোক না কেন—কোনো ক্ষেত্রেই তা চতুর্দশী পদের সীমা অতিক্রম করতে পারে না এবং ছন্দোবিধিও এখানে অলঙ্ঘনীয়। প্রসঙ্গতঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় সনেটের অষ্টক-ষটক বিভাগের বিচার করেছেন। থিওডোর ওআট্‌স্‌ ডান্‌টনের মত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন "সাগরতরঙ্গ যেমন স্ফীত হয়ে বেলাভূমির ওপর পড়ে" এবং নিমেষমাত্র স্থির থেকে আবার সাগরগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি ভাবের তরঙ্গ অষ্টকের শব্দে ছন্দে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে এবং চকিত যতির শেষে নিমেষমাত্র স্থির থেকে ষট্‌কের বিপরীত আবর্তনে শেষ হয়ে যায়।"

ভাবের এই রকম উত্থান পতন সনেটের একটা প্রধান বিশেষত্ব কিন্তু সর্বত্র তা অষ্টক-ষট্‌ক-বিভাগের উপরে নির্ভর করে না। ইংরাজী ও বাঙলা সনেটে এর অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়।

সনেটের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েও যে কবি-কল্পনা মুক্তপক্ষ হতে পারে প্রবন্ধকার সে বিষয়ের সম্পর্কে অবহিত। প্রমথ চৌধুরী এই বন্ধনের মধ্যে মুক্তিলাভ করেন এবং ওআর্ডস ওয়ার্থের অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ ঃ

> In truth the prison, unto which we doom
> Ourselves, no prison is.

বস্তুত 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—এই আশার উদ্দীপন ও পূরণ একটি বিশেষ সৃজনমুহূর্তের ব্যাপার এবং কবির সৃষ্টিশক্তি যখন সক্রিয় তখন তিনি আত্মপ্রকাশের প্রেরণাতেই নিজেকে শৃংখলাবন্ধ করেন।

এখানে রূপ এবং ভাবের প্রশ্ন উত্থাপন অযৌক্তিক হবে না। ভাবকে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি কোনো বিশেষ রূপ বন্ধের মধ্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। প্রাথমিক ভাব ও অভিব্যক্ত ভাব, এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। কিন্তু যা অভিব্যক্ত হয় তার আধার কবি নির্বাচিত রূপ বন্ধ এবং এই আধারের সংগে আধেয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাব ও রূপের অভেদ কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটা যুক্তিসংগত কিনা সে বিষয়ে প্রবৃত্ত হব না। কবি কেন একটা বিশেষ রূপের প্রতি আকৃষ্ট হন, এখানে শুধু এই বিষয়ের আংশিক আলোচনা করবো। স্পেনসার প্রভৃতি এলিজাবেথীয় কবি, মধুসূদন, প্রমথ চৌধুরী, ওআর্ডস্‌ওআর্থ এবং আরও অনেকে কতকটা সচেতনভাবে সনেট চর্চা করেন। এর কারণ স্বরূপ জীবেন্দ্র বাবু তাঁদের মনের বিশিষ্ট গড়নের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উল্লিখিত একাধিক কবি একই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনায় ব্রতী হয়েছেন। অতএব কবির মানস সত্তা পরিবর্তনশীল, এরূপ অনুমান অসংগত হবে না। ভূমিকার রচয়িতার ও বক্তব্য হয়তো তাই, কিন্তু তিনি তা পরিস্ফুট করেননি। আমাদের মনে হয় রূপনির্বাচনক্রিয়া যেখানে সজ্ঞান ভাবে সম্পাদিত হয় সেখানেও ভাবের প্রকৃতি কবি মানসে এক বিশেষ ধরণের রূপপ্রবণতার সৃষ্টি করে, এবং তখন 'ভাবচেতনা' ও 'রূপসাধনার' মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। জীবেন্দ্রবাবু ও "ভাব ও রূপের সুন্দর সামঞ্জস্য" উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু 'সনেটে রূপের প্রসাধন কবি প্রযত্নের প্রধান কথা ; আর অন্যান্য ক্ষেত্রে কবির ভাবের টানে রূপের প্রকাশ'—তাঁর এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সনেট ও অন্যবিধ কবিতার এই রকম পার্থক্য নির্ণয়ের অর্থ কবিকর্মরূপ জটিল বিষয়ের অতিরিক্ত সরলীকরণ। এই প্রসংগে ভাষা প্রকৃতি বিশেষভাবে বিচার্য এবং জীবেন্দ্র বাবু সে দিকেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ

করেছেন। রূপবন্ধ সর্বতোভাবে ভাষা সাপেক্ষ, এবং যে রূপের সাধনা এক ভাষায় সুসাধ্য অপর ভাষায় তা দুষ্কর হতে পারে। বাঙলা ভাষায় যে সনেট রচনা সম্ভব হয়েছে তার অন্যতম কারণ এই ভাষার 'অন্তর প্রকৃতি' ও শব্দসম্পদ'। আরও একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। কথ্য রীতি থেকে অন্তত আংশিকভাবে কাব্যভাষার প্রাণশক্তি আহৃত হয়। কবিতার ভাষা যখন চলিত ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই কবিতার মুমূর্ষু দশা ঘটে। এখনও পর্যন্ত বাঙলা সনেটের এই রকম কোন বিপর্যয় ঘটেনি এবং তার হেতু প্রচলিত ভাষার প্রতি কবি সম্প্রদায়ের আনুগত্য।

ছান্দসিক জীবেন্দ্রবাবুর পরিচয় আমরা অন্যত্র পেয়েছি। এখানে সে পরিচয় আরও নিবিড় হয়েছে। ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজী ও বাঙলা সনেটের আসল ছন্দোরূপ প্রত্যক্ষ এবং আমাদের প্রত্যক্ষীভূত করেছেন। তাঁর ছন্দোবোধ যেমন গভীর আত্মপ্রত্যয়ও তেমনি সুদৃঢ় এবং এবং সেইজন্য মতামত প্রকাশে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তাঁর অধিকাংশ মন্তব্য সুচিন্তিত এবং সমর্থনযোগ্য। যেমন ছন্দধ্বনি ও ভাবগাম্ভীর্যের সমতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং যুক্ত ব্যঞ্জনমূলক মিল প্রয়োগের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে যা বলেছেন দৃষ্টান্তসহ তিনি তা প্রতিপন্ন করেছেন। তবে তাঁর দু একটি উক্তি একটু আপত্তিজনক মনে হয়। তাঁর মতে পয়ারী বা যথেচ্ছ মিলের চতুর্দশ-পদী কবিতা সনেট হিসাবে গণনীয় নয়। কিন্তু এইরূপ কোনো কবিতায় যদি সনেটের ভাবৈক্য বা গাম্ভীর্য অনুভূত হয় তা হলে তাকে 'সনেট' আখ্যা দেওয়া অশোভন হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্যের' অন্তর্গত অনেক কবিতা "উৎসর্গের" হিমালয় সম্পর্কিত কয়েকটি কবিতা এবং 'পূরবীর' সমুদ্র বিষয়ক তিনটি রচনা ভাবানুগ ধ্বনিগাম্ভীর্য হেতু নিঃসন্দেহে সনেটপদবাচ্য এবং ইতালীয় ফরাসী বা ইংরেজী রূপান্তর যখন আমরা মেনে নিয়েছি তখন তার বাঙলা প্রকারভেদও স্বীকার করা উচিত।

বিমলকৃষ্ণ সরকার

স ম কা লী ন

ন ব ম ব র্ষ ॥ ১৩৬৮

॥ সূ চী প ত্র ॥

প্র চ্ছ দ প ট : স ত্য জি ৎ রা য়

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 April '62 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALI

আপনার মাল
পিপ্যাক এল লেবেল এম মার্কা
পদ্ধতিতে রক্ষা করুন
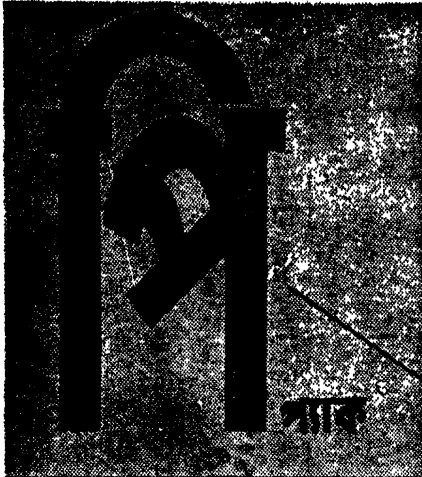
ক্ষতিগ্রস্ত বা হারানো মালের খেসারত মেটাতে প্রতি বছর রেলওয়ের কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। আপনার সামান্য যত্নে জাতীয় অর্থের এই বিরাট অপচয় প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হতে পারে।

আপনার করণীয় :

- পাকাপোক্ত ভাবে পেরেক লাগান।
- বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে এমন জিনিষ প্যাকিং এর কাজে ব্যবহার করুন।
- একটি বা দুটি পরিচয় পত্র এবং লেবেলের একটি নকল বাক্সের ভেতরে রাখুন।
- পুরনো মার্কা তুলে ফেলুন।
- পাকা কালিতে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ক'রে ঠিকানা লিখুন।
- নির্ভুলভাবে মার্কা দিন।
- কি ধরনের মাল তা' লিখে দিন।

পূর্ব রেলওয়ে